ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৫৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত স্বপনকুমার সেন ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বিলাতের পুলিশ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার আই-পি, জে-পি

বিলাতের পুলিশ প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে আমাদের পুলিশ ও আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে সুরু করছি। পাশাপাশি তুলনা ফুটে ওঠে ভাল। ছোটবেলায় কুষ্টিয়া শহরে মানুষ। রাত্রিবেলায় ছোট শহরের নিস্তব্ধতা ভেদ করে পাহারাওয়ালা হেঁকে যেতো "হুঁসিয়ার রহ"; ভয়ে জড়সড় হয়ে মায়ের কোল ঘেঁসে শুতাম, আর দিনের বেলায় দুষ্টুমি করলে মা ভয় দেখাতেন "দাঁড়া, পাহারাওয়ালা ডাকছি।" শিশুকাল থেকে পুলিশের উপর হয়েছিল দুর্ব্বার ভয়। কিছু বড় হয়েও এ ভয় একেবারে কেটে যায়নি; কলেজে পড়ার সময় লালবাজারের পাশ দিয়ে যেতে হলে দূরের ফুট-পাথ ছাড়া হাঁটি নাই।

পুলিশ-ভীতি আমার মত অনেকেরই দেখেছি, অথচ আমরা কেউই আইন-অমান্যকারী নই। আবার আমিই একদিন পিতামাতার অজ্ঞাতে আই-পি পরীক্ষা দিয়ে বসলাম। গ্রীষ্মের ছুটী, বাড়ীতে গেছি, সন্ধ্যার ডাকে পরীক্ষার ফল এল—আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছি। মাকে খবরটা দিতে মা বল্লেন—"এত চাক্‌রী থাক্‌তে তুই শেষকালে পুলিশে ঢুক্‌লি।" বাবা শুনে বল্লেন "আমার আশা ছিল তুই একটা ভদ্রোচিত চাকরী কর্‌বি।" অপ্রত্যাশিত সাফল্যের আনন্দ মুহূর্ত্তে উবে গেল। কয়েকদিন ধরে অনেক আলোচনার পর মা-বাবার অনুমতি পেলাম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হল যে জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় কাজ করব না বা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবো না।

কাজে ঢুকে মনে মনে বল্লাম—"পুলিশের বদনাম ঘোচাতে হবে। এতদিন সবাই সমাদর করেছে, আর পুলিশে ঢুকেই হেয় হয়ে যাবো?" কার্য্যক্ষেত্র যে কত সুকঠিন তা পদে পদে দেখেছি। আমার পদস্খলন হয়েছে কিনা জনসাধারণ তার সাক্ষ্য দেবেন। পুলিশের লোকের

(ছোট কি বড় যে অফিসারই হউন) উপর জনসাধারণের কিরূপ ধারণা ও অবিশ্বাস আছে তা শিক্ষা-নবিশী করার সময়ই দেখেছি। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। স্বদেশী মামলা, খবর হচ্ছে—গুলি, বন্দুক পাওয়া যাবে। ভোর রাতে বাড়ী ঘেরাও হ'ল। আমার সঙ্গে ধুরন্ধর ডিঃ-আই-বি ইন্‌সপেক্টার; সমস্ত বাড়ী খুঁজে ভাঙ্গা বাক্‌সের মধ্যে পাওয়া গেল মরচে-ধরা এয়ার-গান একটা। পুলিশের এ সম্বন্ধে মাথা-ব্যথার কিছু আছে মনে হল না; কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টার বল্‌লেন "কলিকাতায় পাঠিয়ে পরখ করতে হবে; এয়ার-গানের লাইসেন্স লাগে, অস্ত্র-বিশারদের মতামত নেওয়া দরকার।" অনভিজ্ঞ, শিক্ষানবীশ আমি, চুপ করে পদ্ধতি দেখ্‌লাম। লিষ্টিভুক্ত করে দু'জন সাক্ষীর সাম্‌নে জিনিষটা নেওয়া হল। মালিক আমাকে বল্‌লেন "ভাল করে বিবরণটা লিখে দিতে বলুন।" আমি বল্‌লাম—"কি দরকার, এ বন্দুকের জন্য কোন মাম্‌লা হবে না; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" তিনি বল্‌লেন "না, মশায়, আপনি লেখান, কে জানে বন্দুক বদ্‌লে আমাদের বিপদে ফেলবে কি না।" একথা শুনে আমার বেশ রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি বললাম "আমার উপর এটুকু বিশ্বাস রাখ্‌তে পারেন"। কিন্তু উত্তর পেলাম "আপনি তো পুলিশ-ডিপার্টমেন্টের বাইরে নন"। কথাটা বলে ফেলেই কথাটা রূঢ় হয়ে গেল মনে করে একটু নরম সুরে বল্‌লেন "আপনি তো বরাবর এখানে থাক্‌বেন না, দুদিন বাদে চলে গেলে অন্য লোক এসে কি করবে কে জানে।" আমি আর বাক্য-ব্যয় না করে নিজে হাতে লিখ্‌লাম "মর্চ্চে-ধরা অকেজো অবস্থায় পাওয়া গেছে।" এ অবিশ্বাস হওয়া যে একেবারে অমূলক নয় তা অন্য ক্ষেত্রে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম এবং নিজের অনভিজ্ঞতার জন্য লজ্জা অনুভব করেছি।

অতএব দেখ্‌তে পাচ্ছি আমরা পুলিশকে করে এসেছি ভয়, ঘৃণা ও অবিশ্বাস। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তাদের রাখ্‌তে চেয়েছি শত-হস্ত দূরে। অন্ততঃ এ যাবৎ এই ছিল আমাদের পুলিশের উপর ধারণা।

এ ধারণা যে অযথা নয়, তা আপনি ও আমি একবাক্যে স্বীকার করব। 'পুলিশি মেজাজ' কথাটা আমাদের ভাষায় পর্য্যন্ত স্থান পেয়েছে। আমরা পুলিশ বল্‌তে বুঝি—এ বিভাগের প্রায় সকলেই রুক্ষ,উদ্ধত, বদমেজাজী ও অসৎ, আর কাজে একেবারে অদক্ষ।

এবার বিলেতে পৌছে কি দেখেছি তাই বলি।

১৮ই এপ্রিল ১৯৪৭ সন, বেলা ৪টা। ফ্রাঙ্কোনিয়া জাহাজ সাদাম্পটন (Southampton) বন্দরে পৌছিল। জাহাজে যাত্রী প্রায় এক হাজার; ঘাটে বহু লোক আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবকে সম্বর্দ্ধনা করতে এসেছেন। সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য, জাহাজে সকলে ডাঙ্গায় চেনা-লোকের মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে জাহাজ ঘাটে ভিড়্‌লো; ওঠা-নামার সিঁড়ি লাগানো হল। একটা পুলিশ কন্‌ষ্টেবল অমন্থর গতিতে এসে সিঁড়ি আগ্‌লে দাঁড়াল।

ছবিতে ও বইএ বিলিতি পুলিশের চেহারা দেখেছি, সজীব মূর্ত্তি এই প্রথম দেখ্‌লাম। ধীর, স্থির, নম্র অথচ দৃঢ়; অনাড়ম্বর তকৃতকে ঝকৃঝকে সদ্য-ইস্ত্রি-করা নীল রঙ্গের পোষাক পরা—৬ ফুট লম্বা, ব্রিটিশ পুলিসের একমাত্র প্রতিনিধি—সারা পৃথিবী থেকে আনা সহস্র আগন্তুকদের যেন বল্‌ছে "তোমরা নির্ভয়ে চলে এসো, আমি তোমাদের রক্ষা করব।"

চারিপার্শ্বে আর কোন পুলিশের লোক নজরে পড়্‌লো না; আশ্চর্য্য ঠেক্‌লো, এত বড় পৃথিবীব্যাপী নাম-করা বন্দর, কিন্তু একটীমাত্র পুলিশ কন্‌ষ্টেবল। কোন অফিসার পর্য্যন্ত আসে নাই! অথচ বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়ার সময় পুলিশের ছড়াছড়ি ও হাঁকাহাঁকি দেখে এসেছি। সারা রাত জাহাজ থেকে মালপত্র নামল, ডাঙ্গায় নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে সাজানো হল, কত কুলি আনা-গোনা কর্‌লে, কিন্তু কারুর একটা জিনিষ চুরি গেছে বলে শুনি নাই।

আর একটী জিনিষ লক্ষ্য কর্‌লাম, সিপাইটী সুদীর্ঘকাল পাহারায় রইল কিন্তু কোথাও একটু বস্‌লে না। কখন বদ্‌লী হয়েছিল লক্ষ্য করি নাই। কয়েক মাস লণ্ডন ও আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি; রাস্তায়, ঘাটে, বাগানে বহু পুলিশ টহল দিচ্ছে দেখেছি—কিন্তু কোনদিন একটী লোককেও বসা অবস্থায় দেখি নাই। অথচ আমাদের দেশে পথে, ঘাটে সর্ব্বত্র পাগ্‌ড়ী, পেটী খোলা অবস্থায় বসা তো ভাল, শুয়ে ঘুমন্ত সিপাই নিত্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ওখানকার পুলিশের কর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

"তোমাদের সিপাইরা রাস্তার বসে না"। উত্তর পেলাম "প্রকাশ্য স্থানে এরকম অশোভনীয় কাজ আমাদের সিপাইরা করে না।" এদের ডিউটিতে সিগারেট খেতেও দেখি নাই।

১৯শে এপ্রিল সকাল ১১টায় বোট-স্পেশালে লণ্ডন রওনা হলাম। বেলা দুটা নাগাদ ওয়াটারলু ষ্টেশনে পৌঁছুছাই। ব্রেক্-ভ্যান থেকে মালপত্র নামানো হল, নামের অক্ষর অনুসারে সাজানো হ'ল। কুলিরা হাত-গাড়ী নিয়ে এলে, আমরা প্রত্যেকে নিজেদের মাল বেছে গাড়ী বোঝাই করালাম। কুলি বল্লে—"সঙ্গে চলো, পুলিশ মাল দেখে ছাড়্বে।" এত ভিড়, কার মাল কার সঙ্গে চলে না যায় বা চুরি না হয়, এই হল উদ্দেশ্য। কুলিরা একজনের পর একজন সার বেঁধে চলেছে আর দুটী পুলিশ কনষ্টেবল গাড়ীগুলি পরখ করে ছেড়ে দিচ্ছে। ছাড়ার আগে মালিককে জিজ্ঞেস কর্‌ছে তার নাম ও মালের সংখ্যা। এ কাজে তারা এত পটু যে প্রত্যেকটী মাল দেখে ছাড়ছে, অথচ সময় লাগছে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। নামের লেবেল উঠে গেলে কিংবা সহজে দেখা না গেলেই গোল বাধে; লাইন থেকে সরে দাঁড়িয়ে মালিকানা প্রমাণ করলে ছাড়ান পায়।

প্ল্যাটফর্ম্ম পেরিয়ে এবার গাড়ী-চড়ার পালা। মোটর ছাড়া অন্য কোন যানবাহন নেই। এখানেও দুটীমাত্র সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথম ট্রাফিক পুলিশ দেখলাম; পার্থক্য কিছু নেই, একই রকম পোষাক পরিহিত, লম্বা, চওড়া—যেন একাই একশ। বাড়ীর গাড়ী ও ট্যাক্সি দুলাইনে দাঁড়িয়ে আছে; যাত্রিরাও এসে দু জায়গায় কিউ করে দাঁড়াল। পুলিশের ইঙ্গিত মতন গাড়ীগুলি এক এক করে এসে মাল তুলে নিয়ে নিজের গন্তব্যপথে চলে গেল। কোন হট্টগোল, চীৎকার, হাঁকাহাঁকি নেই। এত লোক, এত মাল, কিন্তু অল্প সময়ে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সব পার হয়ে গেল।

কয়েক মাস পরে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে গ্রীষ্ম-অবকাশের ভিড় দেখেছি, আমাদের পূজার ভিড় এর তুলনায় কিছুই নয়। মনে হচ্ছিল লণ্ডন সহর বুঝি খালি হয়ে গেল; কিন্তু অল্প-সংখ্যক পুলিশ কি সুচারুরূপে সমস্ত কাজ সমাধান কর্‌ছে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়; আমার লাগতো লজ্জা, আর মনে হত—কবে আমরা আমাদের দেশে এমন সুদক্ষ পুলিশবাহিনী তৈয়ারী করতে পারবো। ভারতবাসী অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন "আপনারা আমাদের দেশে এমন পুলিশ-বাহিনী তৈয়ারী করতে পারবেন?" দেশী, বিদেশী—সকলেই এখানকার পুলিশ দেখে তারিফ করে। অনেক ইংরাজ গর্ব্বের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন "আমাদের পুলিশ দেখে আপনার কি মনে হয়।" ইংলণ্ডবাসী তাদের পুলিশকে জাতীয় গৌরব বলে মনে করে এবং প্রত্যেকটী পুলিশও মনে করে যেন তাদের এ গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। একটা বইএ পড়েছিলাম "লণ্ডন পুলিশের ধীর, শান্ত, নির্ব্বিকার আচরণ জগৎ বিখ্যাত; এরা অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ, বিরক্তিকর অবস্থার মধ্যেও কখনও রাগান্বিত হয় না।" এতদিন যা বইএ পড়েছিলাম, তা চাক্ষুস উপলব্ধি করলাম।

কোথায় একটু কটু কথা, চীৎকার বা অসৌজন্য চোখে পড়ে নাই। এ পর্য্যন্ত পোষাক-পরা পুলিশের কথাই বলেছি; কিন্তু এদের সি-আই-ডি ও অন্যান্য পুলিশের কথা বারান্তরে বলার ইচ্ছা রইল।

এই কার্য্যদক্ষ সুন্দর পুলিশবাহিনী একদিনে তৈয়ারী হয় নাই। এর পিছনে বহু শ্রম ও শিক্ষা রয়েছে, আর আছে উত্তরোত্তর উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা।

বৈষ্ণব

শ্রীশীতল বর্দ্ধন

কে বলে কাঙাল তোমা সর্ব্বৈশ্বর্য্য ত্যাগী?
দ্বারে বসি সীমাহীন প্রেম ভিক্ষা লাগি।
অরূপে দিয়াছ রূপ, অসাধ্য সাধন,
ত্যাগ তব সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের যাজন।

বৈকুণ্ঠ এনেছ বুকে অশ্রু মন্দাকিনী,
অমৃত উজান বহে মধু ঝঙ্কারিণী।
চলে সেথা মহা লীলা রাসের হল্লীষ,
জপ-তপ প্রেম-গান সুখ অহর্নিশ।

সীমান্ত-সৈনিক

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

রাস্তায় হকারেরা চীৎকার করে চলেছে—টেলিগ্রাম, জোর-খবর বাবু, জোর খবর। বড়লাটের ঘোষণা বেরিয়েছে—স্বাধীন ভারত।

বাসের বাম্‌পারে দাঁড়িয়ে সুধাকান্ত শুনলেন, স্বাধীন ভারতের কথা। অফিসেও আজ এই নিয়ে উত্তেজনা লক্ষ্য করেছেন। কেরাণীবাবুরা টেবিল চাপ্‌ড়ে বলছিল—এইবার একবার শালাদের দেখে নেবো; কী অত্যাচারই না করেছে আমাদের 'পর। কিন্তু সে কথায় কান দেবার সময় পান নি সুধাকান্ত। এমনই অফিসে আসতে আজ তাঁর দেরি হয়ে গিয়েছিল। ট্রাম বাসে যা ভীড়, কার বাবার সাধ্যি উঠতে পারে! সাহেব লেট্ মার্ক করেছে, তারপর ষ্টেট্‌মেণ্টের গাদা জমে আছে। পাঁচটার আগেই আবার অফিস থেকে বার হওয়া দরকার, যা দিনকাল। সন্ধ্যের অন্ধকারে কোথায় আততায়ীর গুপ্ত ছোরা লুকিয়ে আছে, কে জানে!

লীওসের মোড়ে ভীড়টা একটু পাতলা হোল। বাম্‌পার থেকে নেমে সুধাকান্ত ঠেলাঠেলি করে বাসের ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কানের মধ্যে তখন তাঁর বাজছে কাগজ-ওয়ালাদের চীৎকার—স্বাধীন ভারত!

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পুরাতন সদাগরী অফিসের পাকা কেরাণী সুধাকান্ত। জীবন-সংগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে হাড় পাকিয়ে ফেলেছেন তিনি। জীবনে অভিজ্ঞতাও তাঁর কত! কাগজ-ওয়ালাদের এমনি গাল-ভরা কথা ইতিপূর্বে কত না শুনেছেন। সহরের রাজপথে সত্যাগ্রহী ছাত্রদের'পর পুলিশের গোলাগুলি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উন্মত্ত ছোরাছুরি প্রভৃতির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পরিণত বয়সে এখনও দশটা পাঁচটার নিয়মিত কেরাণী যিনি, জীবনের অভিজ্ঞতা তার কত বেশি! অফিস থেকে বেরিয়ে বাসের বাম্‌পারে এখনও তিনি লাফিয়ে ওঠেন, রেশনের সারিবদ্ধ জনতায় ধাক্কাধাক্কি করেন। কাগজ-ওয়ালারা এমন জীবনের কতটুকু খোঁজ রাখে? সুতরাং খবরের কাগজ তিনি পড়েন না। ও একটা অপব্যয় মাত্র, অভাবগ্রস্ত সংসারে বাজে-খরচ করা চলে না।

যুদ্ধের সময় কেবল তিনি নিয়মিত কাগজ কিনতেন—জাপানি বোমা কতদূর এগিয়ে এলো তার খোঁজ রাখবার জন্যে। সেই থেকে যে কী দিনকাল পড়েছে—একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। তবে কাগজ আর তিনি নিয়মিত কেননা না; কেবল সব ধাপ্পাবাজীর খবর। কাগজের খবর সত্যি হলে এতদিন কবে সুভাববাবু দেশে ফিরে এসে এইসব গুণ্ডাদের সায়েস্তা করতেন। তাহলে কা আর এই ঝগড়াঝাঁটি চলে, না বাঙলা দেশের এমনি দুরবস্থা হয়?

কিন্তু হকারদের চীৎকারে আজ অন্য রকম সুর শোনা যাচ্ছে—স্বাধীন ভারত। এ্যাটিলি সাহেবও বলেছেন স্বাধীন ভারতের কথা।

চার পয়সার টেলিগ্রাম চার আনা দাম হয়েছে। কাগজের চাহিদা এত বেশি। চার পয়সা এখন আর অপব্যয় বলে মনে করা চলে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। কত দেশ-সেবকের জীবনব্যাপী সাধনায়, কত শহীদের তাজা রক্তের স্বাক্ষরে পরাধীন ভারত স্বাধীনতা লাভ করছে—দিনের কেরাণী সুধাকান্তকেও সে খবর রাখতে হবে বৈকি! চার আনা পয়সার হিসেবকে আজ আর গোণা চলে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, স্বাধান ভারতের স্পন্দনকে সুধাকান্ত অনুভব করেন চলন্ত বাসের মধ্যে।

বাড়ি ফিরলেন সুধাকান্ত অপেক্ষাকৃত দ্রুত পদে।

গৃহিণীকে সর্বাগ্রে সুখবরটা দেওয়া দরকার। অবরুদ্ধা জীবন-সংগ্রামক্লিষ্টা নারী পাবে স্বাধীন দেশের মেয়ের মর্য্যাদা। যে মেয়েদের তিনি দেখেন চৌরঙ্গীর রাস্তায় লীওসের বাজারে। সম্ভ্রমে যাঁদের পথ ছেড়ে দিতে হয়। জেনানা বলে যাঁদের অপমান করা চলে না; লেডী বলে যাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তাঁদের অফিসের মিস্ হেরিস্।

কীই বা কাজ করে; কীই বা বিত্তবুদ্ধি! তবুও স্বাধীন দেশের মেয়ে। মোটরে চড়ে অফিস যায়; দামী পোষাক পরে!

সুধাকান্তের স্ত্রী লাঞ্চ না হয় না খাবে। ওসব অখাদ্য হিন্দু মেয়ের খাতে সইবে না। মোটরেও না হয় না চড়লো! অত বাবুয়ানিতে দরকার নেই। তা হলেও অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন তো কাটাতে হবে না। নিত্য অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নিশ্চয়ই সে বলবে না—ভগবান, কবে যে আমায় তোমার পায়ে টেনে নেবে, হাড় ক'খানা জুড়োবে আমার! আর যে পারি নে সইতে!

কিন্তু বাড়ি ফিরে সুধাকান্ত কী দেখলেন?

পায়রার খোপের মতন ঘরখানিতে আসন্ন সন্ধ্যায় অবচেতন অন্ধকারের কালিমা—অবরুদ্ধ বাতাসে থম্ থম্ করছে।

ছেলেমেয়েগুলির মুখ গম্ভীর। বড় মেয়ের বিয়ে দিতে যে টাকা ধার করেছিলেন নিকট আত্মীয়ের কাছে চড়া সুদে—সুদে আসলে তা অনেক টাকার অঙ্কে দাঁড়িয়েছে। পাওনাদার আত্মীয় আজ আত্মীয়তার মুখোস ছেড়ে কাবুলীওয়ালার রূপ ধরেছেন। আজ তিনি অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে নালিশের ভয় দেখিয়ে গেছেন।

মেজ-মেয়েটিও মাথায় মাথায় অনেকখানি ডাগর হয়ে উঠেছে। গিন্নী কর্ত্তার আশা ছেড়ে দিয়ে নিজেই পাত্র সন্ধানে মনোনিবেশ করেছেন।

গঙ্গার ঘাটে কোন সহৃদয়া স্নানার্থিনী একটি পাত্রের সন্ধান দেয়। সন্ধ্যের দিকে শহরের রাজপথ বিপদসঙ্কুল। বিকেলে তারা পাত্রী দেখে অপচ্ছন্দ করে গেছে। ক্রুদ্ধা জননী মেয়েকে তাই যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন। বাপকে দেখে মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠলো—অপমানের অসহ বেদনা আজ তাকে অতিমাত্রায় তিরস্কৃত করেছে। সুধাকান্ত বিমূঢ় হয়ে গেলেন। জীবনের নিত্যকার এই গ্লানির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে বটে, এ তাঁর গা-সওয়া। কিন্তু আসন্ন স্বাধীন ভারতের মানুষ তিনি। পৃথিবীতে যারা মাথা উঁচু করে চলে তিনি আজ তাদেরই একজন। এ চেতনা আজ তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিতে থাকে। তিরিশ বছরের কেরাণী-শোণিতে আজ কেন এ উষ্ণ রক্ত-স্রোতের প্রবাহ?

উত্তেজনার আধিক্যে স্নায়ুতন্ত্রীগুলি তাঁর স্ফীত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা? কোথায় স্বাধীনতা? বিক্ষোভের জ্বালায় হাতের টেলিগ্রামখানি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি দ্রুতপদে আবার বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান।

খোলা গঙ্গার হাওয়ায় সুধাকান্ত স্বাভাবিকতার মাঝে আবার ফিরে এলেন।

তিরিশ বছরের কেরাণী তিনি—অফিসে আর গৃহে এমনিতর নিত্যকার জীবন দ্বন্দ্বে মৃত্যুমুখী। কিন্তু এ মৃত্যুকে তিনি অনুভব করতে পারেন না। অবচেতনার গাঢ় অন্ধকারে যে ছোট্ট ঘরখানি তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন—সেখানে দিনের সূর্য প্রবেশাধিকার লাভ করে না; সেই অন্ধকার কারাগৃহের অধিবাসী তিনি।

রাত্রে আহারাদি সেরে নিত্যকার প্রথা মতন তিনি শুনলেন—সংসারের সহস্রাধিক অভাব অভিযোগের কথা। লণ্ঠনের ধূমায়িত আলোকে তিনি পাঠ করলেন—বড় মেয়ের মর্মস্পর্শী চিঠিখানি। জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্বে দরিদ্র পিতার অক্ষমতায় মেয়ের লাঞ্ছনার আর সীমা নেই! কত বেদনার অশ্রু আঁখরে আঁকাবাঁকা লেখাগুলি অশ্রু-মলিন।

কিন্তু কী আশ্চর্য—সুধাকান্তের চিত্তে তার জন্যে এখন আর বিক্ষোভের কোন স্পন্দন নেই। বিদ্রোহও প্রকাশ করেন না তিনি।

গিন্নীকে এক কথায় বুঝিয়ে দিলেন—গরীবের মেয়েকে এমনি অনেক লাঞ্ছনাই সহ্য করতে হয়? এ কথা আবার বিনিয়ে বিনিয়ে বাপ মাকে জানানো কেন? মনে নেই তোমার কত তত্ত্ব তোমার বাপের বাড়িতে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল; মা তোমাকে কত কথাই তো তার জন্যে বলতেন?

গভীর রাত্রে সুধাকান্ত অতিমাত্রায় আবেগের সঙ্গে সৌদামিনাকে মনের কথাগুলি শোনালেন—রামকান্তর বয়স হোল আঠার বছর। অত বড় ছেলে ঘরে থাকতে বাপ মায়ের এত কষ্ট? পড়ে-শুনে আর কী হবে? তার

চেয়ে এই বেলা তার চাকরি-বাকরির চেষ্টা করা দরকার। আর তার বিয়ে দেওয়া উচিত। সেই যৌতুকে বরঞ্চ বড় মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করা যাবে!

স্বামীর কথায় সৌদামিনী বিক্ষোভ প্রকাশ করে—সে ভাগ্যি কী করেছিলাম? ছেলে কী আমার বশে? চাকরি নাকি সে করবে না। আজকালকার ছেলে। কী যে সব উদ্ভট কথাবার্তার ছিরি। ওরা মানুষ হলে বুড়ো বাপ-মায়ের এত কষ্ট হবে কেন?

সৌদামিনীর কথায় সুধাকান্ত বলেন—চাকরি-বাকরি করবে না তো কী করবে শুনি? খাবে কী করে? বুড়ো বাপ চিরকালই ওর জন্তে মোট বইবে—না চিরকালই ওর জন্তে বেঁচে থাকবে?

সৌদামিনী সে কথার কী উত্তর দিতে পারে! বলে—আমি তার কী জানি? তুমি তার বাপ, তুমি জিজ্ঞেস করলেই পারো!

সুধাকান্ত তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন—হ্যাঁ, বাপের পয়সায় অমন নবাবী চাল সকলেই দেখাতে পারে! বয়েসকালে আমরাও অমন কতই না বলতুম।

সৌদামিনী অন্ধ পুত্রস্নেহে হঠাৎ বলে ফেলে—না গো না, সত্যিই তার মতিগতি অন্ত রকম। সে নাকি দেশের সেবা করবে? এখন থেকেই কত বড় বড় কথা বলে।

সুধাকান্ত প্রশ্ন করেন—কী কথা সে বলে?

—আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ; আমি কী সে সব জ্ঞান-গম্যির কথা বুঝি, না জানি? বলে কিনা—আমি আনবো দেশের স্বাধীনতা, আমি ভাঙবো সমাজের কুপ্রথা! জানো, এই দরিদ্র দেশে অনাহারে কত লোক মরে যায়। আমাদের আর তেমন দুঃখ কিসের? আমরা তবু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই।

সৌদামিনী অকস্মাৎ অত্যন্ত ভীতিগ্রস্তা হয়ে পড়ে। অন্ধকারে স্বামীর অত্যন্ত কাছে সরে এসে ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে অনুনয় জানায়—'দেখো, ওকে নিয়ে সত্যিই আমি বড্ড ভাবনায় পড়েছি। কোনদিন যে কী করে বসে! স্বদেশী করতে গিয়ে কোনদিন হয়ত বাছা আমার পুলিশের গুলিতেই প্রাণ হারাবে।

অন্ধকার ঘরের নিশীথ অন্ধকারের অবচেতনা থেকে মুক্ত হয়ে সুধাকান্ত অকস্মাৎ আবার জীবন-শিখার আলোর রশ্মি দেখেন। মৃত্যুর মাঝে তিনি অস্বাভাবিক ভাবে জীবন-স্পন্দনকে অনুভব করেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে সমাজের আবর্জনাকে সরিয়ে ফেলে—কারা আনবে দেশের স্বাধীনতা? কারা উপভোগ করবে গৌরবময় জীবন?

তিরিশ বছরের কেরাণী জীবন-মৃত সুধাকান্ত স্পষ্টই দেখেন—পরাধীন ভারতে প্রত্যাসন্ন স্বাধীন সূর্যের নব অরুণোদয়।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে সরকারী কর্ম্মচারী

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল

রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'শিশু' হইতে, 'ডাক্তার' পর্য্যন্ত আলোচিত হইলেও এ যাবৎ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সরকারী কর্ম্মচারীর স্থান সম্পর্কে কোন গবেষণার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্যে কেন, সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যেই সরকারী কর্ম্মচারীর দানই শুধু নয়, স্থানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, অচিন্ত্যকুমার আমাদের দেশের ও দশের এই সেবকবৃন্দের জীবন ও জমক, চরিত্র ও আচরণ অকুণ্ঠিত আলোকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ও শেষোক্ত দুইজনই সরকারী কর্ম্মচারী হওয়ায় স্বসম্প্রদায়ের চরিত্র বর্ণনে তাঁহাদের লেখনী আরও ক্ষমাহীন ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়ায়' রাখীবন্ধন সম্বন্ধীয় কোন এক মিটিংরুমে পুলিশসাহেবের করাঘাতে ভীত উপস্থিত এক ডেপুটীবাবুকে পাশের ড্রেসিং রুমে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মুখ টিপে হাসার বর্ণনা পাওয়া যায়। আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সরকারী কর্ম্মচারীকে আগাগোড়াই এই মুখ টিপে মুচকি হাসার ভাব নিয়েই দেখিয়াছিলেন; যদিও শাসনব্যবস্থার হৃদয়হীনতা ও অপটুতা এবং ব্যক্তিবিশেষের—বিদেশগন্ধী দাম্ভিকতা ও হীনতাকে তিনি কোনদিন মার্জ্জনা করেন নাই। স্থানে স্থানে কবির লেখনী তাই রূঢ় ব্যঙ্গে অতি নিষ্করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের শ্লেষ বঙ্কিমচন্দ্রের কশাঘাতের ন্যায় প্রত্যক্ষ, তীব্র ও রূঢ়

হয় নাই। কাহারও কাহারও কুম্মাণ্ডের ন্যায় মঞ্চোপরি অবস্থিতি বর্ণনা করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি কোন মুচিরাম গুড়েরও সৃষ্টি করেন নাই। তিনি কুমুদরঞ্জনের ন্যায় কাব্যে একদিকে নিকৃষ্ট শ্রেণীকে কশাঘাত ও অন্যদিকে কেরাণী হইতে I. C. S.—জরীপ-বিভাগ হইতে P. W. Dর সেরা ব্রতীদের ব্যষ্টির ক্ষুদ্রতাবিজয়ী সমষ্টির গৌরবময় কর্ম্মজীবনের সহৃদয় বর্ণনা করেন নাই। তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিদের ন্যায় ব্যঙ্গ কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি অচিন্ত্যকুমারের ন্যায় সরকারী কর্ম্মচারীর ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতা, নীচতা ও খাপ-ছাড়া অমানবতাকে স্বতন্ত্র ব্যঙ্গচিত্রের উৎকটতায় প্রকাশিত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সাধারণ সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিয়াছিলেন। তাহাদের ব্যর্থতা তাঁহাকে ব্যথিত করিত, তাহাদের ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য ও দম্ভ তাঁহাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করিত। কয়েকটী সাধারণ চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে তিনি তাহাদের ক্ষুদ্রতা, অযোগ্যতা ও দাম্ভিকতার আপেক্ষিক কদর্য্যতা ও উপহাস্যস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্র পূর্ব্বযুগে অসাধুতার উল্লেখ প্রচুর পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ দুই এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যতীত হৃদয়ের ও বুদ্ধির অসাধুতা ভিন্ন অন্য কোন অসাধুতার উল্লেখ করেন নাই।

সরকারী কর্ম্মচারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও বিদ্রূপের কারণ "গোরা"র কথায় অনেকটা ধরা পড়ে। "গবর্মেণ্টের কাজ যারা করে তারা গবর্মেণ্টের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে একটা গর্ব্ববোধ করে এবং দেশের লোকের থেকে একটা ভিন্ন শ্রেণীর হয়ে ওঠে—যতদিন যাচ্ছে আমাদের এই ভাবটা ততই বেড়ে উঠছে। আমি জানি, আমার একটি আত্মীয় সাবেক কালের ডেপুটি ছিলেন···। তাঁকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বাবু, তোমার বিচারে এত বেশি লোক খালাস পায় কেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন—সাহেব, তার একটি কারণ আছে; তুমি যাদের জেলে দাও তারা তোমার পক্ষে কুকুর বিড়াল মাত্র, আর আমি যাদের জেলে দিই তারা যে আমার ভাই হয়। এত বড়ো কথা বলতে পারে এমন ডেপুটি তখনো ছিল এবং শুনতে পারে এমন ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটেরও অভাব ছিল না। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে চাকরির দড়াদড়ি অঙ্গের ভূষণ হয়ে উঠেছে এবং এখনকার ডেপুটির কাছে দেশের লোক ক্রমেই কুকুর বিড়াল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এমনি করে পদের উন্নতি হতে হতে তাঁদের যে কেবলই অধোগতি হচ্ছে এ কথার অনুভূতি পর্য্যন্ত তাঁদের চলে যাচ্ছে। পরের কাঁধে ভর দিয়ে নিজের লোকদের নীচু করে দেখব এবং নীচু করে দেখবা মাত্রই তাদের প্রতি অবিচার করতে বাধ্য হবো, এতে কোনো মঙ্গল হতে পারে না।"* বঙ্কিমচন্দ্রের কুম্মাণ্ডের ছবিতে এমন ভিন্ন শ্রেণীবোধ ও অধঃপতনের প্রতি কশাঘাত আছে, কিন্তু এই বেদনাবোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই যাহা রবীন্দ্রনাথে পাই।

বিদেশী সরকার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রবীন্দ্রনাথের চক্ষে যে ঘৃণায় ধিকৃত তাহারই ব্যাপকতা বিদেশী কর্ম্মচারীকে এবং বিদেশী সরকারের দেশী কর্ম্মচারীকে অঙ্গাঙ্গীভাবে অভিশপ্ত করিয়াছিল। আমাদের সমাজের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের যোগাযোগহীন শ্রেণী বিভাগ রবীন্দ্রনাথের মতে সরকারী কর্ম্মচারীর সকল উৎসাহ ও কর্ম্মকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করে। "রাশিয়ার চিঠি"তে সমবায় আন্দোলনের আলোচনায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কবির দৃষ্টিতে দেশের নিবিড় দারিদ্র্যের পাশে মোটা মাহিনার সিভিল ও মিলিটারী চাকুরীয়াগণ অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকিত। এই মোটা মাহিনার সহিত যখন মোটা অযোগ্যতাও তিনি যুক্ত দেখিয়াছেন তখন তাঁহার ক্ষোভ আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছিলেন যে আফিসমুখী সিভিলিয়ানী শাসনব্যবস্থার সমাজের হৃদয়ের সহিত যোগ নাই। কর্ম্মচারীদের কর্ম্মকোলাহল তাই সমাজে বেসুর বাজিয়াছে।

ব্যবস্থা ও ব্যক্তির বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটু প্রভেদ লক্ষিত হয়। ব্যবস্থার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ কঠোর; ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কনে তিনি হালকা ভাবে কঠিন কথা বলিয়াছেন। শিল্পের পথে, শিক্ষার পথে লজ্জাকর বাধা, আপিসের কাজে যোগ্য লোকের অনুপস্থিতি তিনি হাসিয়া ভুলিতে পারেন নাই। তবে দেশী বিদেশী ব্যক্তির অযোগ্যতার, হৃদয়হীনতার, দাম্ভিকতার ও ক্ষুদ্রতার এবং সহায়হীন ব্যক্তিসংঘাতের যে চিত্র তিনি গল্পে, উপন্যাসে ও কবিতায় আঁকিয়াছেন তাহাতে মুচকি হাসার বিদ্রূপ ও বেদনাবোধ দুইই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিসংঘাতের যে কয়েকটী চিত্র পাওয়া যায় তাহা সমাজসাধারণের দৃষ্টিতেই আঁকা। তাহাতে কর্ম্মচারী ব্যক্তিটীকে মানবতার ও সেবাব্রতের নিম্নস্তরেই দেখা যায়। তবে কবি হৃদয়ের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বেদনা ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ছড়ার ভারহীন হালকারূপেই বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে।

কয়েকটী চরিত্র চিত্রের উল্লেখ করিলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রবীন্দ্রনাথ কোন রামরাজত্বে বা ঋণসালিশী বোর্ডের যুগে বিচারকগণকে কার্য্যাভাবে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিতে পরশুরামের ন্যায় দেখেন নাই। তিনি তাহাদের কর্ম্মব্যস্ত জীবনের ক্ষুদ্রতার একটি ছবি আঁকিয়াছেন "উলুখড়ের বিপদ" গল্পে। কোথায় দুই মুন্সেফের খিটিমিটি হইয়াছিল, একজন তখন কিছু করিতে না পারিয়া পরে আপীলের বিচারক হইয়া অপরের রায় দেখিবামাত্র উল্টাইয়া তাহার শোধ লইলেন। ইহাতে বিপদ যাহা হইল তাহা কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই।

"মেঘ ও রৌদ্র" গল্পে এক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখা যায়। তাঁহার মেথরের সাহেবের কুকুরের জন্য চার সের ঘি চাহিয়া নায়েব মহাশয়কে বিপর্য্যস্ত করার ক্ষমতা ও নায়েব মহাশয়ের অবশেষে সাহেবের কৃপায় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার দক্ষতা রবীন্দ্র বিদ্রূপের ব্যাপকতা ও চিক্কণতা প্রকাশ করে। এই ঘৃতঘটিত বিপদের ছবি আমরা রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় আর এক জায়গায় পাই।

"বাবু বলে, 'দাম খুব জেয়াদা'
কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা।"

---

*"গোরা"—রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড—২৩৯-৪০ পৃঃ

এই চাপরাশী শ্রেণীর অত্যাচারও রবীন্দ্রনাথের চক্ষু এড়ায় নাই। "রাজটিকা" গল্পে কলেক্টার সন্দর্শনে আগত আগন্তুকের মনের অবস্থা ও সন্দর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বেরসিক চাপরাশীর বকসিশের জুলুম চোখে পড়ে।

পুলিশকে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের চক্ষেই অত্যন্ত গরম ও প্রতাপান্বিত দেখিয়াছেন। পুলিশ সাহেব ও দারোগার ছবি অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। তবে "দুর্বুদ্ধি" গল্পের ডাক্তারের ভিটা ছাড়ার যবনিকাপাতে, না দারোগাটীর ক্ষমতার অপব্যবহারের হীনতা ও অমানবতাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোকে ধরা হইয়াছে মনে হয়। সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার কবিকে অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত করিত। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রবলপ্রতাপ বিভাগের চৌকীদারের হাঁচি লইয়া ছড়ায় তাঁহার কঠিন বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"দত্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি হাঁচি পড়া
আঁৎকে উঠে কাঁখের থেকে বৌ ফেলে দেয় ঘড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

*　　*　　*　　*

অন্ত দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর সে।"

চৌকীদার না হউক, পুলিশের অঙ্গুলী সঞ্চালনে এজলাসে বিচারককে চমকিত হইতে দেখা আমাদের দেশে বিরল ছিল না।

শুধু চরিত্রবিশেষের মধ্য দিয়া নয়। দুই এক স্থানে দেখা যায় যে হৃদয়হীন, সামঞ্জস্যহীন, অপটু শাসনব্যবস্থার বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতিই কবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। 'খাপছাড়া'র নিম্নলিখিত ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের শ্লেষ সুতীব্র ও সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"মহারাজা ভয়ে থাকে
পুলিশের থানাতে,
আইন বানায় যত
পারে না তা মানাতে।
চর ফিরে তাকে তাকে
সাধু যদি ছাড়া থাকে
খোঁজ পেলে নৃপতিরে
হয় তাহা জানাতে,
রক্ষা করিতে তারে
রাখে জেলখানাতে।"

রূপান্তর

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

—"মড়া, ওখানে মরতে উঠেছো কেন?" দাঁতে দাঁত চাপিয়া হেমলতা তার তিন বৎসর বয়স্কা সপ্তমা কন্যাকে সম্বোধন করেন!

ইন্দিরা মায়ের এ ধরণের উক্তিতে অভ্যস্ত। মন খারাপও হয় না, পাল্টা জবাবও আসে না। ধীরে ধীরে খাটের বিছানা হইতে নামিতে নামিতে মায়ের পঞ্চম পুত্র বাসুকে দেখাইয়া সে বলে—"ছেজদা, ছুতোপায়..."

কথাটা শেষ করিতে হয় না। হেমলতা সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়া পড়েন বাসুর উপর—"লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, দাঁড়া, তোর পিণ্ডি চটকে দিই একেবারে, জুতোর সঙ্গে রাজ্যির নোংরা নিয়ে মড়া শোবার ঘরে এসেছো?"

কপাল মন্দ। বাসুর নয়, বাসুর বাবার। তাই ঠিক এমনি সময়, পাড়াপড়শীর সাথে প্রাত্যহিক প্রভাতী পরচর্চ্চা-পরনিন্দা করিয়া ঘরে ফিরিয়াই বিশ্বনাথবাবু তাহার স্ত্রী হেমলতার একেবারে সামনাসামনি পড়িয়া গেলেন! অফিসের সময় হইয়া গিয়াছে, কোন রকমে মাথায় তেল চাপড়াইতে চাপড়াইতে ঘরের মধ্যে গামছাটা নিতে আসিয়াছিলেন তিনি! তুবড়িতে আগুন দিবামাত্র যেমন সেটা আগুনের ফুলঝুরি উদ্গীরণ করিতে থাকে, বিশ্বনাথবাবুর দর্শনমাত্র তার স্ত্রীরও সেই অবস্থা হইল!—

—"দ্যাখো, অত নবাবীয়ানা চল্‌বে না! তেল মেখে, চান করে, ভাত গিলে যে অপিস যাবে—অত নবাবীয়ানা চল্‌বে না! সকালে উঠে ছেলে ধরেছিলে? বলো না ধরেছিলে?...তা ধরবে কেন? পাড়ার মড়াগুলো আছে তাদের সঙ্গে আমার ছেরাদ্দর ব্যবস্থা করতে গেছিলে!...

বাসু এই তালে ঘর থেকে সরিয়া পড়িল।

স্ত্রীর এই ধরণের বাক্যবাণে বিশ্বনাথবাবুও অভ্যস্ত। আসামীর মত নিরুত্তরে এবং নির্ব্বিবাদে কল ঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন তিনি!

—"কথাগুলো যেন কানেও যায় না, কানের মাথা খেয়ে আছেন কিনা !...বাপ্‌রে বাপ্‌। এই পোড়া সংসারে আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেলো !...ঘরে ঢুকেই দেখি একটি খাটের বিছানায় উঠে মরছেন, একটি জুতো পায়ে ঘরে ঢুকে আমার পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছেন, আর একটি তো সমস্তক্ষণ আমার কোলেই মরছেন।"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া হেমলতা আবার হাঁকিলেন—

—"এই সাবি, আমার কোল থেকে এই মড়াটাকে নিয়ে যা শীগ্‌গির, সমস্তক্ষণ হিঁ হিঁ করেই আছে আপদটা —লক্ষীছাড়া কোথাকার।"

হেমলতার এই ভৈরবী রূপ তাহার প্রথমা কন্যা সবিতার কাছেও নূতন নয়। কথাটি না বলিয়া, নিরীহ অবোধ ছোট্ট ভাইটিকে মায়ের কোল হইতে নিজের কোলে নিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় সে।

—"উনুনের ছাই দেবো আজ"—বলিতে বলিতে হেমলতা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। সত্যই আফিসের দেরী হইয়া গিয়াছে আজ—তাড়াতাড়ি ভাত বাড়িয়া না দিলে বিশ্বনাথবাবুর ভাল করিয়া খাওয়াই হইবে না!

বাড়ীশুদ্ধ সকলেই হেমলতাকে ভয় করে, এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে। মুখরা হেমলতার বিষোদ্‌গীরণের সামনে দাঁড়াইতে পারে এমন সাহস কাহারও নাই। হেমলতা বাড়ীর লোক ছাড়া আত্মীয় অনাত্মীয় কাহারও সাথে বড় একটা কথা বলেন না। সমস্ত জগতটাই এঁর কাছে তিক্ত হইয়া গিয়াছে যেন। লোকে যেমন তাহাকে এড়াইয়া চলে, তিনিও তেমনি লোকালয় পছন্দ করেন না। নিজের সংসারে একাধারে ঝি-চাকর-বামুনের কাজ, আটটি ছেলেমেয়ে সামলে রাখা এবং বিশ্বনাথবাবুর সব কিছু খুঁটি-নাটি সুখসুবিধার জোগাড় দিতে দিতেই দিনের পর দিন কাটিয়া চলিয়াছে তার। বৈচিত্র্যহীন এই জীবনে কোন বৈচিত্র্য আসিলেও তা উপভোগ করিবার সময় নাই। মনেরও মৃত্যু হইয়াছে যেন!

* * * *

ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রি। আকাশভরা জ্যোৎস্না ধার গম্ভীর পৃথিবীটাকে হাসকুটে, চঞ্চল এবং মুখরা করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশটা জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। আবহাওয়ায় একটা ঝল্‌মলে স্নিগ্ধ ভাব। দূরে কোন্ একটা বিবাহবাড়ী হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—বিবাহবাড়ীতে ফুলশয্যার রাত্রি আজ।

হেমলতা ছাদে একা দাঁড়াইয়া ছিলেন। যে দিক হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন তিনি। রাত্রি অনেক হইয়াছে—ছেলেমেয়েরা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বনাথবাবুও ঘুমাইয়াছেন। আনমনা হইয়া হেমলতা বহুক্ষণ একই জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুক্লপক্ষের এম্‌নি এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রের কথা বার বার মনে পড়িতে লাগিল তার। বিশ্বনাথবাবু এবং হেমলতার ফুলশয্যার রাত্রের স্মৃতি তা'কে পাইয়া বসিল যেন। ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বনাথবাবুর পায়ে নাড়া দিয়া ঘুম ভাঙাইলেন তাঁর। চম্‌কাইয়া উঠিয়া বিশ্বনাথবাবু বলিলেন—

—"কি ব্যাপার?"

—"ত্যাখো, আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছো, কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছে আজ?"

বাহিরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের এই বিপুল ঐশ্বর্য্য, ঘরে দু'জনে আলাপ আরম্ভ করিলেন।

বিশ্বনাথবাবু একটু থমকিয়া গিয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে বোধ হয়?"

গভীর আবেগভরা এবং আব্দারের সুরে হেমলতা বলিলেন—"না, অম্‌নি করে বল্‌লে হবে না!"

বিশ্বনাথবাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতো হেমলতার পানে চাহিয়া থাকিলেন। হেমলতা আগের আবেগভরা সুর টানিয়া আবার বলিলেন—"এমনি এক পূর্ণিমার রাতে—মনে পড়ে আমাদের ফুলশয্যার কথা?"

বিশ্বনাথবাবুর তখনও যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসে নাই! তিনি বলিলেন—"সে তো বহু বছর আগেকার কথা। কেন বলো তো?"

—"সে রাতের আলাপের কথা মনে আছে তোমার?"

—"না, সব মনে নেই, তা কি থাকে? সে কি আজকের কথা, বিশ বছর আগেকার ঘটনা—তাই না?"

হেমলতা বিশ্বনাথবাবুর অতি কাছে আসিয়া তাঁর ডান

হাতটি নিজের দুটি হাতের মধ্যে নিয়া বলিলেন—"আমি কিন্তু ভুলিনি—না, একটা কথাও ভুলিনি। বিশ্বাস হল না নিশ্চয়ই? কী বিরাট পরিবর্তনই হয়েছে আমার—না? ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশে ফিরে আসে কিন্তু দেখে বিশ্বরূপান্তর। সেই বহুদিন আগেকার সেই রাতটার আবহাওয়া এবং স্মৃতি ফিরে এসেছে আজ, কিন্তু আমি গেছি বদ্‌লে—অদ্ভুত আশ্চর্য্য পরিবর্তন হয়েছে—না?...এই বোধ হয় জগতের নিয়ম।...তোমার সব কথা মনে নেই হয়তো—সংসারের ঝড় ঝাপ্‌টায় সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ভুলিনি।...মনে পড়ে—প্রথমে তুমিই কথা বলেছিলে। কথাগুলো সহজ করে বলবার চেষ্টা করলেও গলার স্বর তোমার কেঁপে গেছ্‌লো। তুমি বলেছিলে—'নাম তোমার জানি, তবুও তোমার মুখ থেকে নামটা শুনতে ইচ্ছা করে, বলবে?' আমি ঘাড় নীচু করে খাটের পাশে দাঁড়িয়েই রইলুম—চেষ্টা করেও কথা বল্‌তে পারলুম না। তুমি আবার বল্‌লে—'বলবে না তোমার নামটা?'

অস্ফুট স্বরে কোন রকমে তখন বলেছিলাম—"হেমলতা।"

—"ভারী সুন্দর শুনতে নামটা। আমি কিন্তু আরও সুন্দর ছোট্ট নামে ডাকতে চাই তোমায়। "লতা" বলে ডাকি যদি, আপত্তি করবে না তো?"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই শুধু।

—"তোমার ভয় করছে না তো?"

মুখ নীচু করে ঘাড় নেড়ে জানাই—"না।"

—"তবে ওভাবে একঠায়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে? না শুলেও বসতে তো পারো? বাড়ীতে নতুন-বৌ এসে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে এটা কি ভাল দেখায়?"

অনেকটা ভয় কেটে গেছে তখন। সহজ গলায় বলে ফেল্‌লাম—"বসতে বল্‌লেই বসবো।"

—"এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। শোনো কাছে এসো," বলে নিজেই এগিয়ে এসে মুখটা আমার তুলে ধরে একদৃষ্টে কী যেন দেখেছিলে অনেকক্ষণ। বাইরে ফিনিক-ফোটা চাঁদের আলোতে কোন্ এক বৌ-কথা-কও পাখী তার অভিমানিনীর মান ভাঙাচ্ছিল তখন। আমার কপালের অসংযত চুলগুলো পিছু দিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলেছিলে তুমি—"আচ্ছা লতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক উত্তর দেবে বলো?" তোমার স্বর তখন অনেক সহজ হয়ে এসেছে।

ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানাই আবার।

—"আমাকে তোমার ভাল লেগেছে কি? কলেজে পড়ি এখন, পরে কি চাকরী করবো কে জানে..."

—"হয়েছে, হয়েছে, থাক্" বলে থামিয়ে দিয়েছিলাম তোমায়।

—"কিন্তু ভাল লেগেছে কিনা বল্‌লে না তো?"

আবার মাথা নেড়ে জানাই—"লেগেছে।" ভাষায় তা বল্‌তে চাইলেও কিছুতেই ছাই মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না তখন। মনে মনে প্রশ্ন উঠেছিলো—"আর আমাকে?" কিন্তু ভাষা হারিয়ে মূক হয়ে গেছি তখন। সেই প্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করা হল না কোনদিনও। হ্যাগো, আজ যদি সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি ক র, উত্তর দিতে পারো?"

বিশ্বনাথবাবু অভিভূত হইয়া হেমলতার কথাগুলো শুনিয়া যাইতেছিলেন—বহু দূরে পিছনে-ফেলে-আসা স্মৃতিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন তিনি। হঠাৎ যেন চমক ভাঙিল তাঁর। একটু থামিয়া উত্তর দিলেন বিশ্বনাথবাবু—"আশ্চর্য্য, অদ্ভুত এই তোমাদের মেয়েজাতটা। বিশ বছর আগেকার ফুলশয্যার স্মৃতির সাথে, অক্ষরে অক্ষরে আমাদের কথাগুলো, এমন কি হাবভাব, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি পর্য্যন্ত সব মনে আছে তোমার। তোমার অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর হয়তো তখন ঠিক দিতে পারতাম না; কিন্তু আজকের এই আকাশভরা জ্যোৎস্নার মাঝে তোমার স্বরূপ দেখে, তোমাকে সত্যিই বড় ভাল লাগ্‌ছে লতা।"

হেমলতা আকাশপানে চাহিয়া ধীর গম্ভীর আবেগভরা সুরে বলিলেন—"আকাশের সব তারাই লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরে।"

কত আলাপে আদরে বিশ্বনাথবাবু ধীরে ধীরে আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। হেমলতার কণ্ঠস্বরেই ঘুম ভাঙিল তাঁর। কিন্তু এ কী রূপান্তর!

—"মড়া ঝি মরেছে আজ। একেবারে মরে না কেন, হাড় জুড়োয় আমার। এই একরাশ বাসন নিয়ে এখন আমি—"

বিশ্বনাথবাবুর গত রাত্রের কথা কেবলই মনে পড়িতে লাগিল।…"স্বপ্ন? তাই বা কেমন করে হবে? স্বপ্ন কি কখনও এত সত্য হয়?"

সাহস করিয়া হেমলতাকে এই রহস্যাবৃত রাত্রির কথা কিছুতেই বিশ্বনাথবাবুর জিজ্ঞাসা করা হইল না। দৈনন্দিন নিয়মানুসারে তিনি দাঁতন করিতে করিতে পাড়ার প্রাত্যহিক প্রভাতী আসরের উদ্দেশে হেমলতার সামনে দিয়া চলিয়া গেলেন।

হেমলতা একবার তাঁর দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না পর্য্যন্ত।

সামাজিক আলোড়ন ও বিপ্লবের জয়যাত্রা

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

আজ আমরা এক বিরাট ওলট-পালটের আবহাওয়ায় বাস করছি। চারিদিক থেকে পরিবর্তন আসছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, আর তার ধাক্কা লাগছে সমাজের মর্মমূলে। প্রচণ্ড আঘাতে সমগ্র সমাজ-সৌধই প্রায় ধ্বসে পড়ছে। নিদারুণ বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও ধ্বংসলীলা দেশের নানা প্রান্তে প্রবল আকার ধারণ করছে। জনসাধারণ আজ ক্ষুব্ধ অথচ বিভ্রান্ত। নেতাদের কণ্ঠেও গভীর বেদনার বাণী। এক অভূতপূর্ব নৈরাশ্যের ছায়া দিগন্তকে সমাচ্ছন্ন করতে চলছে। জাতীয় স্বাধীনতার জ্যোতির্ময় স্বপ্নও যেন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় ম্লান ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে। গান্ধীজীর মতো বরেণ্য নেতাও সেদিন বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে দুঃখপ্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বরাজের দিন অনেক পিছিয়ে গেলো। কংগ্রেস-লীগ বিরোধ যতখানি সত্য, জাতীয় স্বাধীনতার কথা ততখানি সত্য। অগণিত লোকের চেতনায় এধরণের বেদনাদায়ক চিন্তা ক্রমশই মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। অথচ বাস্তব দৃষ্টিতে এই চিন্তা একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। সম্মুখের বাধা-বিপত্তিতে উদাসীন থাকা বিপ্লবীদের পক্ষে যেমন মারাত্মক, তেমনি আবার নিজের শক্তির যথার্থ উৎসগুলিতে অচেতন থাকাও সর্বনেশে। প্রথম বিষয়টিতে সজাগ দৃষ্টি আজ আমাদের অনেকেরই এসেছে, আর সেকাজের দায়িত্ব গ্রহণও করেছেন অনেক বরেণ্য নেতা। তবে দ্বিতীয় পথের সচেতন যাত্রী নিতান্তই কম। তাই সেদিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বর্তমান রচনার উদ্দেশ্য।

একথা সত্য, কলিকাতা নোয়াখালী বিহার অঞ্চলে অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞ সভ্যতার মাপকাঠিতে যেমন দুঃখের, তেমনি লজ্জার। সুসভ্য সমাজের অধিবাসী হয়েও বর্বরতার অভিযানে আদিম যুগের মানুষকে হার মানানো হয়েছে। নৃশংসতা ও পাশবিকতার জঘন্যতম সত্যগুলি সমাজ-সেবী প্রত্যেক নর-নারীকে ভীষণভাবে বিঁধ্‌ছে,—এতে আর সন্দেহ কি? পরিমাণের দিক থেকেও এ ক্ষয়-ক্ষতির তুলনা ইতিহাসে আর মিলে না। ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে ও খাপ্‌ছাড়া বিচারে বর্তমানের দুঃখ সত্যই সীমাহীন ও অর্থহীন। তবুও বিশাল পটভূমিকায় প্রসারিত দৃষ্টিতে ঘটনাটি অর্থপূর্ণ বলেই মনে হয়, আর, তখনই আমরা বুঝ্‌তে পারি যে বর্তমানের ক্ষতি শুধু ক্ষতিই নয়, তা আমাদের কাছে অদৃশ্য অমূল্য উপহারও বহন করে এনেছে। বিষয়টি বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

প্রথমত, সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্ঞ মুস্‌লিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপকে অতি নগ্ন-মূর্তিতে প্রকটিত করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পাকিস্থান অর্জনের প্রয়াস একদিকে যেমন লীগের অবাস্তব আদর্শকেই আঘাত করেছে, তেমনি আবার অন্যদিকে জাতীয়তাবাদের আদর্শকেও পরোক্ষভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে। বর্তমানে এটুকু অন্তত: উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে কংগ্রেস-লীগ বিরোধ আসলে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ নয়, তা হলো আসলে প্রগতিশীল শক্তির সাথে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সংঘর্ষ। কংগ্রেস ছিল জাতীয়তাবাদী ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, লীগ ছিল সাম্প্রদায়িক ও ফিউড্যাল। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা, আর লীগের প্রচেষ্টা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে মিতালি করে একালে অথচ মধ্যযুগ থেকে বহন করে আনা সামন্ত স্বার্থকে কায়েম করা। তাই বলছি, কংগ্রেস-লীগ মিলন কখনোই সম্ভব নয়, যদিও হিন্দু-মুসলিম জনগণের মিলন সম্ভব। হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণের মিলন কংগ্রেস-লীগ মিতালির উপর নির্ভরশীল নয়। এ মিলন হতে পারে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের শক্তি দিয়ে ধ্বংস্ করে, তার আগে নয়। মুসলিম লীগের মতো সম্প্রদায়গত ও রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানের সংগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের কোনো আপোষই হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেও স্বীকার করবো, আবার জাতীয় স্বাধীনতাও চাইবো এ যেমন হয় না; ধনতন্ত্রবাদকেও বাঁচিয়ে রাখ্‌বো আবার সাম্যবাদকেও ছাড়বো না তাও যেমন সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি ফিউড্যালিজম্‌ ও সাম্প্রদায়িকতার সংগে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মিল বা মিলন সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, খিলাফৎ আন্দোলনের পর থেকে ১৯৪৬ সনের ভিতর যতবার গান্ধী-জিন্না বা জিন্না-জওহরলাল আলাপ-আলোচনা চলেছে কংগ্রেস-লীগ মিলন ও তার মারফৎ হিন্দু-মুসলিম মিলন-সাধনের জন্য, ততবারই সে-সকল চেষ্টা হয়েছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত। কংগ্রেস-লীগ মিলনের মারফৎ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য-সাধনের সম্ভাবনার বর্তমান

পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের বিশ্বাস প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং লীগের প্রতি এক আপোষবিরোধী ও অনমনীয় কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বানও এসেছে নানা নেতার কণ্ঠ থেকে। সমাজ-তান্ত্রিক নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া-প্রদত্ত এক বক্তৃতায় এই সুরের সুস্পষ্ট ঝংকার ছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আরও উগ্র হতে হবে এবং যে কোনো উপায়ে হোক প্রতিক্রিয়াশীল লীগকে দমন করতে হবে,—এই উক্তিই ডাঃ লোহিয়া বক্তৃতাকালে করেছিলেন। এই উক্তির ভিতরই কংগ্রেসের ভবিষ্য কর্মপন্থার ইংগিত রয়েছে। নিস্তেজ মনোভাবের বদলে আজ গড়ে তুলতে হবে কংগ্রেসী দলের এক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী, আপোষ-নীতি ও তোষণ-নীতির পরিবর্তে তাকে গ্রহণ করতে হবে এক নির্ভীক ও দৃঢ়পন্থা। কংগ্রেস আজ যতটা পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির প্রতি দৃঢ় নব্য আপোষবিরোধী হতে পারবে, হিন্দু-মুসলিম জনগণের মিলন ও স্বরাজের পথে ভারতীয় মহাজাতির অগ্রগমন ততটা পরিমাণে দ্রুত হয়ে উঠ্‌বে। ভবিষ্য চলার পথে বর্তমানের আলোড়ন সুস্পষ্ট আলোক-সম্পাত করে বিপ্লবীদের অভিযানকে আরও সুগম করে তুলেছে। এই তো গেলো পাকিস্থানী বক্ষযন্ত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আশীর্বাদ।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম জনসাধারণের ভিতর ব্যাপক-ভাবে গঠনমূলক কর্মের বিপুল প্রয়োজন কংগ্রেস আজ সামাজিক বিক্ষোভের ফলে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। গঠনমূলক কর্মের পথে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যুবক কংগ্রেস বহুদিন পূর্বে পদার্পণ করলেও মুসলিম জনসাধারণের কাছে,—বিশেষতঃ বাংলা প্রভৃতি স্থানে,—তার ঢেউ গিয়ে তেমন ভাবে পৌঁছায়-নি। বর্তমানের প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে কংগ্রেসের দৃষ্টি ঐ পল্লী-অঞ্চলের উপেক্ষিত মুসলিমদের উপর অনেক সজাগভাবে পড়েছে এবং তার আন্দোলনের ব্যাপকতাও বেড়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও উৎপীড়িত মানুষদের দাবীতেও কংগ্রেসের চেতনা বর্তমান আলোড়নের ফলে আরও সজাগ ও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠ্‌ছে।

তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেশের জনসাধারণের কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ বা দেশী খৃশ্চান সকলের জীবনে নিয়ে এসেছে এক অভূতপূর্ব অশান্তি, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তাবোধ এবং তারই অনিবার্য পরিণতিতে এক বিরাট সজাগতা ও বাস্তববোধ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিদারুণ চাপে সাধারণ নরনারীর চেতনায় প্রচণ্ডতম ধাক্কা লাগ্‌ছে, আর সেই সজোর ধাক্কায় তাদের নিদ্রিতপ্রায় অচেতন মন কঠিন বাস্তবের কলরবের ভেতর জেগে উঠ্‌ছে। সাধারণ অবস্থায় বিবর্তনের প্রান্ত ধারায় ও গণজাগরণ আসতে সময় লাগ্‌তো অন্ততপক্ষে এক যুগ বা তার চেয়েও বেশী, অথচ বিপ্লবের অশান্ত আবহাওয়ায় সেই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে মাত্র তিনমাসের পরিসর।

চতুর্থত, ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আজ প্রগতিপন্থীরা পূর্বেকার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ হবার আবশ্যকতা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে। বিপ্লবের এ-হেন যুগসন্ধিক্ষণে বিচ্ছিন্নভাবে আদর্শ-পূজার সময় আজ নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সংঘবদ্ধ আক্রমণকে ব্যর্থ করার জন্য প্রগতিপন্থীদেরও গড়ে তুলতে হবে সচেতনভাবে এক প্রচণ্ড সংহতি। গণসংগঠন ও সংঘবদ্ধতার সাধনায় আজ যে-ভাবে স্বাধীনতা-কামী ও বিপ্লববাদীরা আত্মসমর্পণ করেছে, জাতীয় মুক্তি-অভিযানের বৃহত্তর পটভূমিকায় তা নিঃসন্দেহে অগ্রগতির লক্ষণ।

পঞ্চমত, অনুদার হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার মূলেও বর্তমান আলোড়ন এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছে। পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই দুর্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পড়ছিল। ভাঙনের সেই ধারায় বর্তমানে এসে লেগেছে এক বৈপ্লবিক আঘাত। এ আঘাত নিষ্ঠুর হতে পারে, তবুও নিরর্থক নয়। নতুন পথের অভিযাত্রীরা দুঃখের কল্যাণময় পরিণতিকেও বিস্মৃত হতে পারে না। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের পুরাণো শাসন-নীতি ও ধর্ম প্রায় সব কিছুরই অন্তঃসারহীনতা বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যুগযুগান্তের জীর্ণ আচার-ব্যবহার, বিধি-বিধানের ভগ্নস্তূপের উপর নতুন সমাজ-দর্শন গড়ে উঠ্‌বার পূর্বলক্ষণ সূচিত হচ্ছে দিকে-দিকে। মনুষ্যত্বের সহজ ও সত্যকার দাবী থেকে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ তার যে একটা বৃহৎ অংশকে (অর্থাৎ তথাকথিত হরিজনকে) এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছিল, আজ তাকেও সমাজে গৌরবমণ্ডিত আসন দেবার জন্য সমাজ-নেতারা প্রস্তুত হতে চলছেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের অভিনব উদার-নীতির বারংবার ঘোষণা তার আংশিক সাক্ষ্য বহন করছে।

অতএব বহুদিক বিশ্লেষণ করে pragmatismএর দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ পরিণতি-দর্শনের দিক থেকে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বর্তমানের দুঃখ ও যাতনা যত কঠিন ও তীব্রই হোক্ না কেন, মহাজাতির উত্থান-পতনের অবিচ্ছিন্ন ধারায় তা একেবারে ব্যর্থ হয় নি ; বরং বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে অর্থাৎ উন্নতির পথে আমাদের সজোর ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে উন্নতির ভবিষ্য সম্ভাবনাকে আরও নিকটবর্তী করে তুলছে।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৭

পরদিন প্রাতে শেখর ও পুষ্টপালের নিকট সংবাদ পাইলাম যে ধৃত সার্থবাহগণ, তাহাদের অপরাধের কোনও প্রমাণ না থাকায়, মুক্তিলাভ করিয়াছে। ক্ষত্রপ নগরপালকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোনও প্রমাণ না পাইয়া, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জনসাধারণকে যেন বিব্রত ও বিপর্য্যস্ত কিংবা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ধৃত বা অবরুদ্ধ করা না হয়।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, "এই সময়ে কি এই নির্যাতিত বণিক ও সার্থবাহগণের মধ্যে আমাদের ত্রাণসংঘের নীতি প্রচারের সুযোগ হইতে পারে না?"

আমি বলিলাম, "না।"

—কেন? উহারাও ত উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে।

—তাহা হইলেও সংঘে উহাদিগকে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

—কেন? উহাদিগকে কি বিশ্বাস করা যায় না?

—সাধারণত, উহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা নিরাপদ নহে।

পুষ্টপাল জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু দেবদত্ত, বণিক ও সার্থবাহশ্রেণীকে এরূপ সাধারণভাবে অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে কি?"

আমি বলিলাম, "অনেকগুলি কারণে আমি ঐ বিদেশী বণিক ও সার্থবাহসম্প্রদায়ের কাহাকেও আমাদের সংঘে গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারি না। প্রথমতঃ, উহারা সকলেই বিদেশী—বাণিজ্যের ব্যপদেশে উহারা কিছুদিনের জন্য বাহ্লিক ও গন্ধারে আসিয়া বাস করিয়া থাকে—উহাদের মধ্যে অনেকেই প্রতীচ্যবাসী—যবন, কাল্ডীয়, মীড্ ও পারসিক। আমাদের দেশের প্রতি তাহাদের আন্তরিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের সহিত উহাদের একমাত্র সম্বন্ধ, অর্থের জন্য উহারা অনেক অনর্থ ঘটাইতে পারে। গন্ধারবাসীরা যাহাই হউক—বণিক-শ্রেষ্ঠী-জনসাধারণ। বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ-সকল শ্রেণীর লোকের—তাহাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমির প্রতি যে প্রীতি, প্রেম ও শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তাহা ঐ বিদেশী অর্থলিপ্সু বণিক সার্থবাহগণের মধ্যে একান্ত অভাব—একেবারে নাই বলিলেই চলে।—কিরূপে তবে উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া সংঘে গ্রহণ করিতে পারা যায়? বিদেশীদিগকে আমাদিগের এই ত্রাণসংঘের মধ্যে আনয়ন করিয়া বিপদ বাড়াইতে আমি অভিলাষী নহি।"

শেখর আমার কথা স্থির হইয়া নীরবে শুনিতেছিল। পরে বলিল, "আমি প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে বিষয়টা বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখি নাই। তুমি যথার্থই বলিয়াছ—উহাদের সংঘে গ্রহণ করা সুবিধাজনক ও সুবিবেচিত হইবে না, বরং বিপদের সম্ভাবনাই সমধিক।"

পুষ্টপালও বুঝিল এবং অবশেষে শেখরও আমার সহিত একমত হইল।

এই সময়ে প্রজ্ঞা ও কীর্ত্তিবর্ম্মন্ আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইল। কীর্ত্তিবর্ম্মন্ সংবাদ আনিল যে সাম্রাজ্য-সীমান্ত হইতে বহির্শক্র তাহাদের বাহিনী আপাততঃ অপসারিত করিয়াছে। সম্রাট্‌কে ইহার জন্য প্রাক্তন সন্ধির সর্ত্তগুলির এবং কয়েকটি অভিনব গ্রথিত সর্ত্তের স্বীকৃতি ও তাহাদের প্রতিপালন প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করিয়ায়ুএ-চি অধিনায়ক কজুল-কদফিস্ বা খিউ-সিউ-কিওকে প্রভূত অর্থ দানে সন্তুষ্ট করিতে হইয়াছে। সন্ধি সর্ত্তসমূহের সম্যক্ প্রতিপালন সুনিশ্চিত করিবার জন্য য়ুএ-চি অধিনায়ক কদফিস্ সাম্রাজ্য হইতে দুইজন প্রভাবশালী নাগরিককে

তাঁহার পরিষদে প্রতিভূস্বরূপ রক্ষা করিবেন। প্রাক্তন সন্ধি সর্ত্তগুলি এ পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হয় নাই, বরং কয়েকটি অমান্য ও ভঙ্গ করা হইয়াছে; ভবিষ্যতে পুনরায় সেরূপ যাহাতে না হয় তাহার সুনিশ্চয় অভিজ্ঞান স্বরূপ সম্রাট্ হেরময় তাঁহার ভূতপূর্ব্বা প্রথমা সম্রাজ্ঞীর গর্ভজাতা একমাত্র কন্যার এই বিদেশী বর্ব্বর অধিনায়কের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অপমানজনক সন্ধি অনুসারে বিবাহ নিষ্পন্ন হইবার জন্য বাহ্লিক, কপিষা ও গন্ধার নগরীর রাজপ্রাসাদ ব্যতীত সাম্রাজ্যের অন্যত্র আর কোথাও এই বিবাহের নিমিত্ত আনন্দোৎসব হইবে না।

আমরা এই অভিনব সন্ধির কথা শুনিলাম, কিন্তু নবগ্রথিত প্রধান সর্ত্তগুলি ব্যতীত অন্যান্য সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে আমরা এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞ রহিলাম। আমাদিগের সংঘের অন্যতম নায়ক সুকৃতিবর্দ্ধনের পিতা পুরুষপুরের বিষয়পতিও গন্ধার ক্ষত্রপের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই সন্ধির সকল সর্ত্ত ও প্রতিপাল্য স্বীকৃতিসমূহ সম্বন্ধে বিশদ সংবাদ হয়ত সুকৃতিবর্দ্ধন কতকটা অবগত আছে এবং আপাততঃ সে সকল বিষয় না জানিলেও, সে যে সচেষ্ট হইয়া সে সকল যথাযথরূপে শীঘ্রই সংগ্রহ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে আমাদের নিঃসন্দেহ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আমি কীর্ত্তিবর্ম্মনকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলাম, যে আপাততঃ সে এই অভিনব সন্ধির সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে কিছু অবগত হইতে সক্ষম হয় নাই। আমি বুঝিলাম যে এখন সুকৃতিবর্দ্ধন ব্যতীত আর কেহ এই সন্ধির সর্ত্তগুলি বিশদভাবে জ্ঞাত নহে। তাহার দ্বারা তৎসংশ্লিষ্ট অপর সকল তথ্যও যে যথাযথভাবে সংগৃহীত হইতে পারিবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমি পুষ্টপাল, শেখর ও কীর্ত্তিবর্ম্মনকে বলিয়া দিলাম যে তাহাদের মধ্যে যে কেহ একজন যেন ফিরিবার পথে সুকৃতিবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে যেন বলিয়া দেয় যে সংঘের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সে সংগ্রহ করিয়া আমাকে অনতিবিলম্বে জানাইয়া দেয় এবং যদি সম্ভব হয় ত, অদ্য অপরাহ্নেই যেন ঐ সকল সংবাদ আমি প্রাপ্ত হই। পুষ্টপাল বলিল যে, সে জানে যে সুকৃতিবর্দ্ধন এই কার্য্যেই আপাততঃ ব্যাপৃত আছে, কারণ সংঘের কর্ম্ম নির্দ্দেশে এই সন্ধির সর্ত্তগুলির আলোচনার আবশ্যক বোধ হইতে পারে। সে আরও বলিল হয়ত সুকৃতিবর্দ্ধন এই সংগ্রহ কার্য্যে ইহার মধ্যেই সাফল্যলাভ করিয়াছে এবং অদ্য অপরাহ্নে সে সুকৃতি-বর্দ্ধনকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিবে। অতএব আমি এখন এ সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত রহিলাম। তবে সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে হস্তগত না হওয়া অবধি সংঘে তাহাদের আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করিতে বিলম্ব হইবে। আপাততঃ কথা রহিল যে অদ্য অপরাহ্নে সুকৃতি-বর্দ্ধন তাহার গৃহীত কর্ম্ম সমাপন করিয়া আমার নিকট আসিলে, আমরা সকলেই পুনর্ব্বার এখানে মিলিত হইব। এখনকার মত আমাদের সম্মেলন শেষ হইল এবং আমরা পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সকলে একে একে কার্য্যান্তরে গমন করিলাম।

অপরাহ্নে সুকৃতিবর্দ্ধন, শেখর ও পুষ্টপালের সহিত আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। প্রজ্ঞা ও কীর্ত্তিবর্ম্মন আসিয়া জুটিল। প্রাক্তন সন্ধির সর্ত্তসমূহের অদ্য এই পঞ্চবিংশতি বর্ষেও কোনটাই এ পর্য্যন্ত সম্মানিত বা প্রতিপালিত হয় নাই। বর্ত্তমান আক্রমণের ইহাও একটা অন্যতম কারণ। বরং পূর্ব্বসঙ্কলিত ও গৃহীত স্বীকৃতির কোনও কোনওটি সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ও অমান্য করা হইয়াছে। যাহাতে তাহা আর এরূপ না হয় তজ্জন্য বৃদ্ধ সম্রাট্‌কে নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রাচীন সন্ধির সর্ত্তের উপর আরও কয়েকটি অভিনব সর্ত্তও আরোপিত হইয়াছে। সম্রাট্ হেরময়ের দ্বিতীয়া সাম্রাজ্ঞীর গর্ভজাত কোনও সন্তান নাই। অতএব বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর কজুল কদফিস্ সমগ্র বাহ্লিক-গন্ধার বা কা-ফু ও কা-পিন্* সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইবেন এবং আপাততঃ তিনি যুবরাজ ও ভাবী সম্রাট্ বলিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবেন; সকলপ্রকার প্রচলিত মুদ্রায় বর্ত্তমান সম্রাটের প্রতিকৃতির সহিত কদফিসের প্রতিকৃতিও অঙ্কিত থাকিবে। যে সকল মুদ্রায় সম্রাট্ হেরময়ের প্রতিকৃতিসহ তাঁহার

* বাহ্লিক রাজ্যের চৈনিক নাম "কা-ফু" ও গন্ধাররাজ্য চীন ভাষায় "কা-পিন্" বা "চি-পিন্" আখ্যা পাইয়াছিল। "কা-ফু" বোধ হয় "কপিষা" শব্দের অপভ্রংশ। "কা-পিন্" ও "চি-পিন্" শব্দদ্বয় কপিষ, নগর, উদ্যান, গন্ধার ও কাশ্মীর এই সকল রাজ্যেরই সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

বর্ত্তমান সম্রাজ্ঞী কালিওপ্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়া প্রচলিত আছে তৎসমুদায়ের প্রচলন রোধ করিয়া এই নূতন মুদ্রার প্রচলন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। এই শেষোক্ত সর্ত্ত সম্বন্ধে বৃদ্ধ সম্রাট্ বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তরুণী ভার্য্যার তুষ্টি সম্পাদনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া য়ুএ-চি অধিনায়ক কজুল কদফিস্ বৃদ্ধকে বিলক্ষণ বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছেন। সম্রাট্ হেরময় প্রথমত এই সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহাকে এই স্বীকৃতিতে বাধ্য হইতে হইল। কারণ, আর উপায়ান্তর নাই। ক্ষমতাশালী বিজেতা শত্রু কোষমুক্ত অসি হস্তে সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান। দ্বিধা সন্দেহের বা ইতস্ততঃ করিবার আর সময় নাই।—সম্রাট্ ক্ষণিক চাঞ্চল্যে ও মোহে নিমেষে সব হারাইতে বসিয়াছেন। এক কঠোর আঘাতে প্রাচ্যে যবন সাম্রাজ্যের স্বপ্ন মেঘের প্রাসাদের মত পলকে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।—গত্যন্তর নাই দেখিয়া সম্রাট্ সন্ধিপত্রের সকল কঠোর সর্ত্তই গ্রহণ করিলেন।—কিন্তু ভবিষ্যতে এই সন্ধি হয়ত পুরাতন সন্ধির পথেই প্রয়াণ করিবে এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।—এখনও সাম্রাজ্যের সকল অংশ হইতে পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবেই সৈন্য সংগ্রহ হইতেছে।—তাহাতে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্ট হয় নাই বা তাহার প্রতিরোধকল্পে কোনও অভিনব রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই। ইহা হইতেই অনুমান হয় যে সন্ধির স্বাক্ষরিত সর্ত্তগুলি সম্মানিত ও প্রতিপালিত না হওয়াই সম্ভব এবং পুনর্ব্বার যুদ্ধবিগ্রহ অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা সমধিক। আমাদের কার্য্যেও এখন তদুপযুক্ত তৎপরতা অবলম্বনের আবশ্যক। সমগ্র বাহ্লিকে ও কপিষায় এবং তৎসহ গন্ধারে ও পুরুষপুরে সাগ্রহে সৈন্য-সংগ্রহ কার্য্য চলিয়াছে এবং, কতকটা গোপনে, কিন্তু অদম্য উৎসাহে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; সংগৃহীত সৈন্যগণকে ও শিক্ষা-দান করা হইতেছে। এখন আমাদের উদ্যমকে কোন পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক চালিত করিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া, অচিরে আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ বাঞ্ছনীয়। এখন হইতে ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সম্যক্ বিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। বৃথা কালক্ষেপের জন্য আর সময় নাই। সমগ্র পরিস্থিতি উপলব্ধির জন্য আমাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কার্য্যকুশল কাহারও বাহ্লিকে ও কপিষায় উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে। আমি পুষ্টপালকে বলিয়া দিলাম—সে যেন আর্য্য মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে অদ্য সন্ধ্যায়, আরত্রিকের পর, সংঘারামে ত্রাণসংঘের একটা পরামর্শ সভা আহ্বান করিবার জন্য আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করে এবং এই সভার কার্য্যসূচী মৎকর্ত্তৃক সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে। এখন ইহার স্বতন্ত্র বিজ্ঞপ্তির জন্য সময় ও সুযোগের একান্ত অভাব। পরামর্শ সভার আহ্বানের অনুরোধ লইয়া পুষ্টপাল আর্য্য মহাস্থবিরের সহিত সাক্ষাতের জন্য সংঘারামের উদ্দেশ্যে গমন করিল। আমাদের অপরাহ্ন সম্মেলন তখন ভঙ্গ হইল। স্থির রহিল, যে আমরা সকলেই সন্ধ্যার আরত্রিকের পর প্রথম যামের প্রথমপাদে পুরুষপুর বিহারের সংঘারামে আর্য্য মহাস্থবিরের কক্ষে সমবেত হইব।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে যবন-বর্ব্বর
সন্ধিনামক সপ্তদশ বিবৃতি (ক্রমশঃ]

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

বৈদিক দার্শনিক সমাজে বহুদিন হইতেই সম্প্রদায়ভেদ হইয়া গিয়াছে। দ্বৈতবাদিদল প্রচুর পুষ্টিলাভ করিয়াছেন। উপাসনাকাণ্ড ও ভক্তিমার্গের দুর্গ সুদৃঢ় হইয়াছে; তথাপি আশঙ্কা—প্রবল অদ্বৈতবাদীর দুর্ভেদ্য দুর্গ যেন দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্রসম্ভারে দুর্জ্জয়ই রহিয়া গেল। এমনই সময় আবির্ভূত হইলেন গৌড়ীয় দর্শনের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বৈদিক সম্প্রদায়সমূহ মধ্যে আপাতপ্রতীয়মান বিরোধের ত্রাণকর্ত্তা প্রেমদাতাগ্র শিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু।

প্রভু দেখিলেন—সকল আচার্য্যই এক সেই শ্রুতিপ্রমাণেই নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ, ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদও যেমন প্রতিষ্ঠিত, কেবলাদ্বৈতবাদও তো ঠিক তেমনি শ্রুতিপ্রমাণেই প্রতিপাদিত।

কেমন করিয়া এমন হইল? একই শ্রুতি কেমন করিয়া দুই বিরোধী মতবাদের প্রসূতি হইবেন? তাই স্বয়ং বেদপুরুষই আজ বেদ-ব্যাখ্যায় ব্রতী হইলেন। প্রভু দেখিলেন—অভেদবাদী শ্রুতিকে প্রবল-দুর্ব্বলভাবে বিভক্ত করিয়া লক্ষণাদ্বারা সত্তাপ্রতির অভিধাবৃত্তিপ্রাপ্ত

অর্থকে আবরিত করিয়াছেন। প্রভু আমার তখনই হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—

স্বতঃপ্রমাণ বেদ,—প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হয় হানি॥

কি সর্ব্বনাশ! বেদ যে আমার শ্রীভগবানের বাঙ্ময়ী শ্রীমূর্ত্তি! ইহাতে কি ভেদকল্পনা করিবার অবসর আছে? স্পষ্টলিঙ্গ-শ্রুতিকে লক্ষণাদ্বারা নিরাকার পক্ষে ব্যাখ্যা কখনই বেদানুগত্যের পূর্ণ-পরিচায়ক হইতে পারে না। কবিরাজের লেখনীমুখে কিছু পয়ার উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রভু কহে—"বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন।
ব্যাসরূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই অর্থ।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ব॥

সমগ্র ভক্তজগতে মহোল্লাসের বন্যা বহিল। প্রভু আমার অভিধাবৃত্তির প্রাধান্য দিয়া সমস্ত সাত্বত সম্প্রদায়কেই বলবত্তর করিয়া দিলেন। বারাণসীধামে দশ সহস্র সন্ন্যাসীর পরমাচার্য্য শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচার প্রসঙ্গে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ সিদ্ধান্তটি গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। বেদের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত উদ্‌ঘোষিত হইল—

ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার।
*
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিবার॥

পূজ্যপাদ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরমাত্মসন্দর্ভে এই তত্ত্বটিরই অপূর্ব্ব বিস্তার করিয়াছেন।

জীব সম্বন্ধেও মহাপ্রভু তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন—

ঈশ্বরের শক্তি যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি—কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্।

জ্বলিতজ্বলন শব্দে অগ্নিরাশিকে বুঝাইল। ঈশ্বরতত্ত্ব যেন তদ্রূপ। আর জীবতত্ত্ব হইল সেই অগ্নির স্ফুলিঙ্গকণাস্বরূপ। অঙ্গাঙ্গিত্ব পুরস্কারে ইহাদের যেমন অভেদ, তেমনি আবার ব্যাপ্যব্যাপক সম্পর্কে ভেদও আছে। রাশীকৃত অগ্নিকে যেমন অন্ধকার কিছুতেই আচ্ছাদিত করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াও ঈশ্বরকে আচ্ছাদিত করিতে পারে না।

যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার বিকার।

কিন্তু ঘনীভূত অন্ধকার যেমন স্ফুলিঙ্গকে পরাভূত করিতে পারে, তদ্রূপ মায়াও জীবকে অভিভূত করিতে পারে। এই যে একবার অভেদ, আর একবার ভেদ—দুই রকমই বুঝাইতেছে, ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর? শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিমত্তাবশতঃই ইহা সম্ভবপর। অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাব সাহায্যে এই যে ভেদ ও অভেদের সমাধান—ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

জগৎ সম্বন্ধেও বিবর্ত্তবাদ অপাস্ত করিয়া স্পষ্ট পরিণামবাদ স্থাপন ব্যাপারে ঘোর বিচার হইয়া গিয়াছে। "পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়িবেন, যেমন দুগ্ধের বিকার দধি, তেমনি ঈশ্বরেরও বিকারে বিশ্বরূপে পরিণতি হইয়াছে বলিতে হয়; ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রের সহিতই বিরোধ হইবে; কারণ কুত্রাপি ঈশ্বরে বিকারিত্ব দোষ নাই। তারপর বিকারীমাত্রেই বিনাশশীল; যথা দেহাদি; ইহাতে ঈশ্বরের অবিনাশিত্বেরও হানি হইয়া যায়—ফলে কোন শাস্ত্রেরই সহিত সঙ্গতি থাকে না।"—ইহাই বিবর্ত্তবাদ পক্ষে বড় যুক্তি।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এ তর্কেরও অবসর রাখেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—উহা কষ্টকল্পনা; বেদের লাক্ষণিক ব্যাখ্যাতেই এই সকল আশঙ্কার অবসর হয়। অভিধা বৃত্তিতে যেতো বা ইমানি ভূতানি'—এই শ্রুতি দ্বারা সুস্পষ্ট পরিণামবাদই প্রকাশিত হইয়াছে—উহা বিবর্ত্তবাদের স্থল নহে।

পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্ম বুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥

উদ্ধৃত পয়ারগুলির বিশ্লেষণ করিলেই বিবর্ত্তবাদিগণ যে আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার সুষ্ঠু সমাধান হইয়া যায়।

পরিণামী বস্তু মাত্রেই বিকারী—এই ন্যায় দ্বারা তুমি যে ব্রহ্মে বিকারিত্বের আশঙ্কা উঠাইয়াছ, তাহা ঠিক নহে। কারণ, তিনি যে অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত, ইহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবেই তিনি স্বরূপতঃ অবিকারী থাকিয়াও নিজ ইচ্ছায় জগৎ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে না পারিবেন কেন? এস্থলে প্রাকৃত চিন্তামণির দৃষ্টান্ত উপন্যাস করায় বাদীকে একরূপ নির্ব্বচনই হইতে হইয়াছে। চিন্তামণি রত্নরাশি প্রসব করিয়াও যেমন বিকার প্রাপ্ত হয় না—তাহার স্বরূপের অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে না, তদ্রূপ পরমেশ্বরও ইচ্ছাবশত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরাশি উৎপাদন করিয়াও যে স্বয়ং অবিকারী থাকিবেন, তাহাতে আবার বিস্ময়ের কি আছে?

এই প্রসঙ্গে কবিরাজের উক্তিটি কি সুন্দর!
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়?

শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্যশক্তিকথা সকল শাস্ত্রই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ ইহাতেই বেশী জোর দিয়াছেন। অচিন্ত্য হইলেও ইহা অনির্ব্বচনীয় নয়। শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী—

বেদ্যং বাস্তবমত্রবস্তু

এই অংশের ব্যাখ্যায় অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সূচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীব পরমাত্মসন্দর্ভে স্ফুটীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাবধি বিশদীকৃত করিয়া অন্ততঃ বাংলা ভাষায় পরিবেশিত হইবার সুবিধা হয় নাই। বিদ্বদ্বৃন্দের যখন দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন আশা হয় অতঃপর এ অভাব দূরীভূত হইবে।

বিষয়টি সত্যই অত্যন্ত গুরুতর। আপাতদৃষ্টিতে ভেদ ও অভেদ এই দুইটির যুগপৎপ্রতীতি অসম্ভব। লোকসিদ্ধ এমন কোন প্রমাণও নাই, যাহার দ্বারা দুই বস্তুর যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু গৌড়ীয় আচার্য্যগণের কি অপ্রাকৃত শক্তি, এ হেন দুরধিগম্য তত্ত্বটিও জীব-বুদ্ধির গোচরীভূত করিতে কি অসাধারণী প্রতিভারই না পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। অর্থাপত্তি বা অন্যথানুপপত্তি প্রমাণ সাহায্যে তাঁহারা যে অপূর্ব্ব কৌশলে এই অঘটনঘটন ঘটাইয়া গিয়াছেন তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্লাঘা করিবার কারণ রহিয়াছে। শক্তি-শক্তিমানের বিচার পূর্ব্বক ইহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে—

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে
শক্তি ব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিৎ
অভেদনির্দ্দেশঃ, একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তি
বৈবিধ্যদর্শনাৎ ভেদনির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ।"

এই ভেদাভেদতত্ত্বের সামঞ্জস্য সমাধানেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অদ্বৈতদর্শন ব্রহ্মভাবটিকেই চরমতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের মতে শুধু ব্রহ্মভাব নহে, পরন্তু ব্রহ্মানুভূতিটিই হইল চরম অবস্থা।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"

এই শ্রুতি অদ্বৈতবাদেরই পরম অনুকূল মনে হইয়াছিল; কিন্তু গৌড়ীয় দর্শন দেখাইলেন যে, ঐরূপ ব্যাখ্যায় অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতির সহিত বিরোধ হইয়া যায়।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বন্
ন বিভেতি কুতশ্চন।

ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতি এবং গীতোক্ত—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাস্তরন্তি তে—ইত্যাদি স্মৃতি শুধু ব্রহ্মভাব নহে, ব্রহ্মপ্রাপ্তিরই সংবাদ প্রদান করে। গৌড়ীয় দর্শনে ইহার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এই বলিয়া যে—

"ব্রহ্মৈব সন্ নিতি তৎসামান্য-তত্তাদাত্ম্যাপত্ত্যোবাভেদনির্দ্দেশঃ।"

অর্থাৎ—ব্রহ্মৈব ভবতি—এই বাক্যে মুক্তাবস্থায় জীবের যে ব্রহ্ম-সমানতা বুঝাইতেছে ঐ ব্রহ্ম-সমানতা শব্দের অর্থই হইল—ব্রহ্মতাদাত্ম্য—ব্রহ্মসাযুজ্য নহে।

ব্রহ্মতাদাত্ম্য বলিতে আমরা কি বুঝি? বুঝি যে, ব্রহ্মের যে যে ধর্ম্ম, জীবও তত্তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন হইল। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে—

"এষ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"

ব্রহ্মের এই যে আটটি গুণের কথা পাই, মুক্তজীবও তত্তদ্ গুণোপেত হইল। অগ্নি সংযোগে লৌহ যেমন অগ্নিধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, মুক্ত জীবটিও তদ্বৎ ব্রহ্মধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সুতরাং ব্রহ্মবৎই পরিলক্ষিত হয়। 'ব্রহ্মৈব ভবতি' বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য। মুক্তজীবকে ব্রহ্মের সমান দেখাইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্মের সর্ব্বোপাস্যত্ব ও অখিলরসময়ত্ব ধর্ম্ম তো তখনও রহিয়াই গিয়াছে—জীব মুক্ত হইয়া যতই ব্রহ্ম সমান হউক, ব্রহ্মের অসমোর্দ্ধ সমানতাধর্ম্মের তো বৈশিষ্ট্য থাকিবেই থাকিবে; সুতরাং অভেদবৎ প্রতীয়মান হইলেও ভেদ তখন রহিয়াছে বলিতে পারি, আবার এ ভেদ থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মসমানতা প্রযুক্ত অভেদই বা বলিতে না পারিব কেন?

বৃহদারণ্যক শ্রুতি তত্ত্বটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের অনুকূলভাবেই বরং স্ফুটীকৃত করিয়াছেন—

"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"

ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন্। এখানে ব্রহ্ম সন্ বলিতে যদি স্বসত্তার ব্রহ্মে বিলীনতাই অর্থ হইত, তবে তো পরবর্ত্তী 'ব্রহ্ম অপ্যেতি' বাক্যের বৈয়র্থ্যাপত্তি হইয়া যায়। অপ্যেতি ক্রিয়ার কর্ত্তা তখন কোথায়?

সুতরাং দুইটি অবস্থারই স্বরূপ আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মভাবাপন্নাবস্থায় অভেদ বা তাদাত্ম্যও যেমন সত্য, তদবস্থায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় বলায় ব্রহ্মের প্রাপক জীবের যে প্রাপ্য ব্রহ্ম হইতে ভেদ—ইহাও সত্য। এই দ্বিবিধ আপাত-বিরোধী সত্যের সমাধানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বলিতেছেন—

এই দ্বিবিধ অবস্থাই আছে; উভয়েই তুল্য বলশালী। কেবলানন্দের স্পর্শমাত্রাবস্থাটিকে লক্ষ্য করিয়াই অভেদ সিদ্ধান্ত, আর মুক্তচিত্তে সেই আনন্দস্পর্শ যেভাবে লীলায়িত হইয়া উঠে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভেদ সিদ্ধান্ত।

প্রসঙ্গাধীন সন্দর্ভ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি—

উভয়ত্রোক্তম্ স্পষ্টমেব। যথোদকং
শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি এবং
মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ইতি শ্রুতৌ।
তত্রৈব কারণে ন তু তদেব ভবতি, নতুবা
তদসাধর্ম্ম্যেণ পৃথগুপলভ্যত ইতি জ্ঞোততে।
স্কান্দে চ—উদকং তুদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা
ভবেৎ তদ্ বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে।
এবমেবং হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা,
প্রাপ্তোঽপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ
ইতি।

উদ্ধৃতাংশে মর্ম্ম উদ্ঘাটিত করিতে হইলে কঠোপনিষদের (২।১।১৫)

প্রসঙ্গটি অবগত হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্মরাজ নচিকেতাকে বলিতেছেন—

"হে নচিকেত! যেমন নির্ম্মল জল নির্ম্মল জলে মিশ্রিত হইলে তাহার মতই হয়; তদ্রূপ পরতত্ত্বানুভবসম্পন্ন মুনির আত্মাটিও পরতত্ত্ব-সদৃশই হয়।"

'তাদৃগেব ভবতি'—বাক্যের স্পষ্ট অর্থ হইল—'তাহারই মত হয়।' 'এব'কার অর্থ বাংলা ভাষার নিশ্চয়ার্থক 'ই'। 'ব্রহ্মের মতই হয়' বলিবার তাৎপর্য্য—ভেদ বুঝা যায় না; অথচ ঠিক যে 'তাহাই হইয়া গেল,' তাহাও নহে; অথচ সমানধর্ম্মতানিবন্ধন পৃথক্‌তাও উপলব্ধির বিষয় হয় না; অর্থাৎ ঠিক ভেদও নয় আবার ঠিক অভেদও নয়, অথচ ভেদও বটে আবার অভেদও বটে—ইহাই ব্রহ্মতাদাত্ম্য। আর ব্রহ্মতাদাত্ম্যের আনন্তর্য্য ফল হইল ব্রহ্মানুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দঘনস্বরূপাস্বাদন অর্থাৎ সেব্যসেবক সম্বন্ধজ্ঞানলভ্যসেব্য-সেবারূপসুখানুভূতি। এই যে ব্রহ্মতাদাত্ম্যাবস্থায় অভেদের ও ব্রহ্মানু-ভূতিসম্পন্নাবস্থায় ভেদের সমকালীনযুগ্মস্থতা—ইহাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন সিদ্ধান্ত—অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ।

স্পষ্টলিঙ্গ ও অস্পষ্টলিঙ্গ উভয়বিধ শ্রুতিরই তুল্য মর্য্যাদা দান করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন দার্শনিকসমাজে এক অভিনব আলোকপাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আচার্য্য শঙ্করকে কেবলাদ্বৈতপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রবল ও দুর্ব্বল প্রকারে শ্রুতিভেদ স্বীকার করিতে হইয়াছিল—বহু স্থলেই গৌণীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; ইহাতে শ্রুতিমূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বপূর্ণ স্বতঃপ্রমাণতার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা অমূলক নহে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন কিন্তু উভয় শ্রুতিরই সর্ব্বত্র তুল্যবলশালিত্ব প্রদর্শন করতঃ বৈদিক বাদ সমষ্টিকে পূর্ণায়ত করিতে পারিয়া নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"তচ্চ পরমং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভবতি। অস্পষ্ট-
বিশেষণত্বেন সুষ্ঠুরূপভূতবিশেষণত্বেন চ।"

বিশেষ শব্দে এস্থলে শক্তি ও শক্তিকার্য্যই বুঝাইয়াছে। শক্তি ও শক্তি-কার্য্যের অনভিব্যক্তিহেতু ব্রহ্ম হইলেন—অস্পষ্টবিশেষ আর শ্রীভগবানে তাহার পূর্ণাভিব্যক্তিহেতু তিনিই হইলেন—স্পষ্টবিশেষ। পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারব্যাপারে এই অস্পষ্টবিশেষকে অদ্বয়বাদে যে প্রাধান্য প্রদত্ত হইয়াছিল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই অস্পষ্টবিশেষ অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বটি স্পষ্টবিশেষ ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়াই পরমোৎকর্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই তত্ত্বটিই ঘোষণা করিলেন—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

বলা বাহুল্য এই ব্রজেন্দ্রনন্দন তত্ত্বটি সম্যক্ উপলব্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিপাদ্য তত্ত্বটি বুঝা হইল না।

এখানে অদ্বয়জ্ঞান হইল—উদ্দেশ্য। আর ব্রজেন্দ্রনন্দন বিধেয়।—"উদ্দেশ্য কহিয়ে তারে যেই বস্তু জ্ঞাত।" আমরা অদ্বয়জ্ঞান বুঝিয়াছি, কিন্তু উহা যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহা বুঝি নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বেদান্তের এই উদ্দেশ্য অদ্বয়জ্ঞানটির তাৎপর্য্য বিধেয় ব্রজেন্দ্রনন্দনে পর্য্যবসিত করিয়া জগদ্বাসী জীবকদম্বের অনন্যসাধারণ কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

এই ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই বৈষ্ণবের সাধনভজন নামকীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠী রস-আলাপন—সব কিছুরই চূড়ান্ত সার্থকতা। কানু ছাড়া গীত নাই—ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ছাড়িয়া গান কীর্ত্তন পাঠ কথকতা—স্থূল তুষাবঘাত মাত্র। সাধনার কোন্ স্তরে সমুন্নীত হইতে পারিলে এই ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বটি—এই মুনিমানসাতীত ব্রহ্মানন্দপর্য্যন্ত থুথুৎকৃত যাগযজ্ঞ তপস্যাতীত জ্ঞাতাজ্ঞাতসর্ব্ববিধসাধনাতীত ভক্তকৃপামাত্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী ভক্তিদেবীর করুণৈকসাধ্য এই ব্রজেন্দ্রনন্দনতত্ত্বটি হরিরূপে হৃদয়কন্দরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবেন—দার্শনিকবন্ধুগণ তাহা অনুধাবন করুন।

গৌড়ীয়দর্শনাচার্য্য বলিয়াছেন—আনন্দস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বহুল ধর্ম্ম থাকিলেও প্রীত্যাস্পদতাই তাঁহার অন্তরঙ্গধর্ম্ম। একমাত্র প্রীতিই হইল এই প্রীত্যাস্পদকে পাইবার উপায়। তত্র মূল্যমপি লৌল্যমেকলং—অর্থাৎ লালসা বা প্রীতিই হইল তাহাকে পাইবার একমাত্র মূল্য। যাহার যে পরিমাণ প্রীতিসম্পত্তি তাহার সেই পরিমাণেই এই আনন্দতত্ত্বের সাক্ষাৎকার সম্পত্তি লাভ। তাই এই প্রীতি বা প্রেমকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরম পুরুষার্থরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই প্রেমতত্ত্ব এক সুবিশাল পরমরমণীয় চিন্ময়ভূমির সন্ধান দান করে।

কচিদ্ভৃঙ্গী গীতং কচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা।
কচিদ্বল্লীলাস্যং কচিদমলমল্লীপরিমলঃ॥
কচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসভরো।
হৃষীকানাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবনমিদং॥

ইহাই ব্রজভূমি। প্রেমতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ব্রজভূমি বুঝিতে হইবে, ব্রজগোপী বুঝিতে হইবে, আর সর্ব্বোপরি গোপীযূথেশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরীর মহিমা বুঝিতে হইবে। সাধারণের বুদ্ধিগম্য নহে বলিয়াই তো প্রেমময়কে এই চিরাৎ অনর্পিতচরী প্রেমসম্পত্তিটিকে প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে।

এই স্বশক্তিশ্রীস্বরূপা প্রেমসম্পত্তিটি অনর্পিতচরী হইলেও কিন্তু অজ্ঞ পদার্থ নহে; ইহা নিত্যসিদ্ধ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদিশুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

প্রশ্ন হইতে পারে, যদি নিত্যসিদ্ধই হইল, তবে ইহার স্বতঃপ্রকাশ নাই কেন? গৌড়ীয়দর্শন ইহার উত্তরে বুঝাইয়াছেন যে, নিজস্বরূপে অজ্ঞানই ইহার কারণ। নিজস্বরূপে অজ্ঞান ও সংসারদুঃখপ্রাপ্তির কারণ হইল আবার—পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় বিষয় দুঃখ॥

রোগের কারণ নিবৃত্তি হইলেই যেমন রোগনিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্ব-জ্ঞানাভাব তিরোহিত হইলেই নিজস্বরূপগত অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি, সঙ্গে সঙ্গে সংসার দুঃখেরও একান্ত নিবৃত্তি ঘটে।

কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিতে গেলে ইহাই দাঁড়াইল, এই যে জীবের অজ্ঞান ইহা ভগবজ্জ্ঞানেরই অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব ভগবান্‌কে জানে না বলিয়াই নিজেকেও জানে না। সূর্য্য উদিত না হইলে কেহ নিজেকেও দেখিতে পায় না, ঘটপটাদি কোন বস্তুরই স্বরূপ দেখিতে পায় না। সূর্য্যাভাবজন্য তমোময়ী মায়াতেই অভিভূত হইয়া থাকে। কিন্তু একবার সূর্য্যোদয় দেখিতে পাইলে আরও নিজেকে দেখিতে অথবা ঘটপটাদি নিখিলবস্তুরই স্বরূপ দেখিতে স্বতন্ত্রপুরুষ প্রচেষ্টার প্রয়োজনই হয় না; তদ্রূপ একবার শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হইলেই জীব নিজস্বরূপ জ্ঞানও লাভ করে জগদ্বিষয়ক জ্ঞানও আপনি সিদ্ধ হয়।

আরও একটু সরল করিবার চেষ্টা করা যাক্—

জীবের নিজস্বরূপ উদ্বোধ না হইবার কারণ কি? না তাহার বৈমুখ্য দোষ। এ বৈমুখ্য দোষ কেন আসিল? যেহেতু সে মায়ামুগ্ধ। কেন সে মায়ামুগ্ধ হইল? যেহেতু সে অনাদি বহির্ম্মুখ। হইলই বা অনাদি বহির্ম্মুখ, তাহাতে মায়ার কি। অনাদিবহির্ম্মুখ মাত্রেরই উপর যে মায়ার অধিকার রহিয়াছে। এখন তাহা হইলে এ বৈমুখ্যদোষ কিরূপে দূর হইবে? যদি সে একবার কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে। অনাদিবহির্ম্মুখকে আবার কৃষ্ণোন্মুখ করিতে পারিবে কে? একমাত্র ভক্তিদেবী; কারণ তিনি যে—সান্দ্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ মা। শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিয়া জীবহৃদয়ে বসাইবার একমাত্র তাঁহারই এই অসাধারণীশক্তি আছে—অন্যান্য সাধনের এরূপ প্রত্যক্ষ শক্তি নাই। তবে এখন এই ভক্তিদেবীকেই বা কেমন করিয়া পাইব? একমাত্র সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রকৃপা হইতেই পাইবে। সে কৃপা পাইবার উপায়? তোমায় চিন্তা করিতে হইবে না; করুণাময় কৃষ্ণই জীবের এই বৈমুখ্যদোষ দূর করিয়া তাহাকে স্বচরণাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন।

> মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃকৃষ্ণজ্ঞান।
> জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥

বেদ কি উপদেশ দিল?

> "বেদ শাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ একসার।"

ইহাতে জীবের কি জ্ঞান হইল—

> "কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।"

এই জ্ঞানলাভ হইলেই তাহার নিত্যকৃষ্ণদাস স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে। সে দেখিবে—প্রভুকে সেবা করাই তাহার স্বধর্ম্ম। সে দেখিবে এই সেবানন্দে নিখিলভুবন ভরিয়া গিয়াছে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত ভালবাসা-ভরা হৃদয় লইয়া প্রাণপ্রভুর প্রেমসেবা করিয়া ধন্য হইতেছে। ইহা দেখিয়া নির্ম্মলচিত্তে তখন

> 'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বলে একবার।
> মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার।
> অন্নকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
> না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।
> সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
> ভক্তিফল প্রেম হয়—সংসার যায় ক্ষয়।

সাধুসঙ্গে এ ভক্তিফল কবে কে পাইবে?

> ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
> গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ।

আর তখন একবার যদি হৃদয়ে এই ভক্তিলতা বীজটি উপ্ত হয়, তবে তো সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়াই গেল। এ লতা তো আর সামান্য নয়; ইহাকে অবলম্বন করিয়াই একদিন নিশ্চয় সেই আনন্দবৃন্দাবনের কুঞ্জদ্বারে শ্রীগুরুরূপা সখীর অনুগা হইয়া যুগলকিশোরের দর্শনলাভে ধন্য হইতে পারিবে—সেবায় সহযোগিতার সঙ্কেতাদেশ পাইলে তো আর লাভের সীমা রহিল না।

> যং প্রাপ্য চাপরং লাভং ততো ন মন্যতেদধিকং।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অনুশীলন সেইদিন সার্থক হইবে—যেদিন দার্শনিক গোপবধূটীবীটব্রহ্মের রসলীলা আস্বাদনে উল্লসিত হইয়া বলিতে পারিবেন—

"আছে আছে এক ভুবন সুন্দর—গোপীসহস্রাবৃত কিশোরাকৃতি—সে যে—

> গোপবেশ বেণুকর নবকৈশোর নটবর

যাঁহার বেণুনাদলহরী নির্ব্বাণবাসনাকে নির্ব্বাসিত করিতেছে—যে রূপনিধির সৌন্দর্য্যমাধুরী সন্দর্শন করিয়া অযুত অযুত গোপীযূথের নীবীবন্ধ শিথিল হইয়া যাইতেছে—যাঁহার চরণে প্রণতজীবের আজ সর্ব্বাপবর্গের চূড়ান্ত সার্থকতা—সেই অখিলোদার কিশোরাকৃতি বস্তুটির চির জয় হউক। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কর্ণরসায়ন সেই অপূর্ব্বশ্লোকে আজ আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের প্রতিপাদ্যতত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করি—

> অস্তি স্বস্তরুণীকরাপ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং।
> বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্যাকুলং॥
> স্রস্ত স্রস্তনিবদ্ধনীবীবিলসদ্ গোপী সহস্রাবৃতং।
> হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি॥

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাড়ার সব-চাইতে বড়লোকের মস্ত বড় বাড়িতে এই প্রথম পা দিলে রঞ্জু।

পরিমলেরা বড়লোক, কিন্তু কত বড়লোক সেটা ধারণা করবার জো ছিলনা এতদিন। বিচিত্র চেহারার একটা মস্তবড় ফটক—পরিমল পরে বলেছিল ওটা নাকি বানগড়ের নাগ-দরজার অনুকরণে তৈরী। দু'দিক থেকে দুটো মস্ত মস্ত সাপ উঠে মাথার ওপরে একসঙ্গে ফণা মিলিয়েছে—সেখানে কালো পাথরের একটা পদ্ম বসানো। চারদিকে ঢেউ খেলানো নীচু পাঁচিল, ভেতরে ফুলের বাগান। লাল সাদা গোলাপে, স্থলপদ্মে, বড় বড় ম্যাগ্নোলিয়ায় আর নানা-রঙের অজস্র ক্রোটনে বাগান আলো হয়ে আছে। লাল সুরকির ফালি ফালি পথ, হেনার ছায়াঘন কুঞ্জের ভেতরে দু'তিনটে বসবার বেদী। এককোণে সমান করে ছাঁটা চিকণ-সবুজ ঘাসের জমি, সেখানে খুঁটির সঙ্গে লোহার একটা সরু শেকল দিয়ে একটা চিতি হরিণ বাঁধা। পায়ের শব্দ পেতেই হরিণটা বড় বড় কান খাড়া করে সজাগ হয়ে উঠল, নাড়তে লাগল বেঁটে ল্যাজটা, তারপর আশ্চর্য সুন্দর দুটি গভীর নীল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে।

রঞ্জু বললে—চমৎকার বাগান ভাই তোদের! আর কী সুন্দর ওই হরিণটা!

পরিমল হেসে বললে, বাগানটা বাবার সখ, আর হরিণটা মিতার।

—মিতা! মিতা কে?

পরিমল বললে, মিতা আমার বোন। বাবার আবার সেকেলে নামের ওপর ঝোঁক আছে কিনা, তাই নাম দিয়েছেন সংঘমিত্রা। অতবড় নামের সংক্ষেপ হল মিতা।

মিতা! নামটি বড় মিষ্টি লাগল কানে। ওই সুন্দর হরিণটার সঙ্গে নামটির আশ্চর্য একটা যোগাযোগ আছে। কেন কে জানে, একবার মিতাকে দেখবার জন্যে একটা সংকুচিত ভীরু ইচ্ছা জাগল রঞ্জুর মনে।

পরিমল বললে, আমরা যখন ডুয়ার্সে বেড়াতে যাই, তখন মিতা বায়না ধরে হরিণের ছানাটা কিনেছিল। এখন দিব্যি বড় হয়েছে, পোষও মেনেছে। কিন্তু হলে কী হবে, দুরন্তপনার শেষ নেই। একবার ছাড়া পেলেই বাগানের ফুল-পাতা কিছু আর আস্তো রাখবেনা।

হরিণটা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। নাড়তে লাগল ছোট ল্যাজটা, নীল চোখ দুটি থেকে যেন নিবিড় স্নেহ উছলে পড়তে লাগল। মনে হচ্ছিল—ওদের সব কথা সে বুঝতে পারছে, বোঝবার চেষ্টা করছে অন্তত।

পরিমল বললে, এখন আমি তোমায় আদর করতে পারবনা, আমার অনেক কাজ—বুঝেচ? চল রঞ্জু, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি।

ভারী সুন্দর বাড়ি—যেন ছবির মতো সাজানো। উজ্জ্বল তকতকে কালো রঙের মেজে, পা যেন পিছলে পড়তে চায়। এখানে ওখানে নানারকমের ছোটবড়ো পাথরের মূর্তি, বুদ্ধদেব, বাসুদেব এই সব। পরিমলের বাবার খেয়াল। দু-পা এগোতেই মস্ত বড় একটা হলঘর, ওদের ড্রয়িংরুম।

ঘরটায় ঢুকে বিহ্বলভাবে চারদিকে তাকালে রঞ্জু। আকাশী নীলরঙের দেওয়ালে বড় বড় ছবি। চারদিকে নানা আকারের বসবার আসন—সোফা, সেটি, কাউচ। ছোট বড় টেবিলে ব্রোঞ্জের মূর্তি; দুটো ফুলকাটা কাচের ফুলদানীতে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ ফুল, দেখা যায়না, অথচ কোথা থেকে মিষ্টি ধূপের গন্ধ এসে ঘরটাকে ভরে রেখেছে। হঠাৎ রঞ্জু নিজেকে অত্যন্ত অপ্রতিভ মনে করতে লাগল, যেন এমন একটা জায়গাতে এসে পা দিয়েছে যেখানে তার আসা উচিত ছিলনা।

পরিমল বললে, দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? ওপরে আয়—

—ওপরে ?

—হাঁ, আমার পড়বার ঘরে।

ভীরু পায়ে অগ্রসর হল রঞ্জু। অস্বস্তি লাগছে—পরিমলদের ঐশ্বর্য পীড়া দিচ্ছে ওকে। ভোনা, খাঁদু, পুর্ণকে যদি ওর ভালো লাগে, তা হলে এ জগৎটাও ওর জন্মে নয়। রঞ্জুর মনে হতে লাগল এ বাড়িটা থেকে বাইরে না বেরুনো পর্যন্ত যেন ও বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারবেনা।

হলঘরের কোণা দিয়ে শাদা ঝকঝকে সিঁড়ি। এত পরিস্কার যে কল্পনাও করা যায়না। ওই সিঁড়িটা দিয়ে ওপরে উঠতে হবে? কী আছে ওপরে, কী আশ্চর্য রহস্য আছে সেখানে। সাবধানে পা ফেলে ফেলে উঠতে লাগল রঞ্জু। ভয় করছে, আশঙ্কা হচ্ছে। তার ময়লা পায়ের ছোঁয়া লেগে এমন চমৎকার সিঁড়িটা হয়তো বা নোংরা হয়ে যাবে!

ওপরে ওঠে দুপা এগোলেই পরিমলের পড়বার ঘর। কাচের দরজা ঠেলে পরিমল ডাকলে, আয় রঞ্জু, বোস।

পড়বার ঘরই বটে। ছোট্ট ঘর,কিন্তু নিখুঁত সুন্দরভাবে গোছানো। সামনেই মস্ত বড় খোলা জানলা, তাই দিয়ে চমৎকার দেখা যায় নাচে ওদের বাগানটাকে, মিউনিসিপ্যালিটির রাঙা সুরকির রাস্তাটাকে, তার ওপারে ছোট ছোট বাড়িগুলোকে পর্য্যন্ত। সেই নারকেল গাছগুলোর ঝুলুনি বয়ে শির শির করে মিঠে হাওয়া ঢুকছে ঘরে। জানালা ঘেঁষে বড় একটা লম্বা টেবিল, কয়েকখানা ঝকঝকে বই তার ওপরে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; দোয়াত দানি, কলম পেন্‌সিল, ব্লটিং প্যাড। দুখানা গদী আঁটা চেয়ার, ফর্সা তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। ঘরের তিন দিকে আলমারি—রকমারি অজস্র বইতে একেবারে ঠাসা। একটা ছোট কাঠের ষ্ট্যাণ্ডের উপরে রূপোর ফ্রেমে আঁটা দুখানি ছবি; একখানা রঞ্জু চিনল—রবীন্দ্রনাথ; আর একখানা পরিমল পরে বলে দিয়েছিল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পরিমল বললে, এই হল আমার পড়বার ঘর। ঠিক আমার নয়—আমাদের দুজনের—আমার আর মিতার। এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বোস,বাড়ির কেউ এদিকে আসবেনা।

ইতস্তত করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রঞ্জু। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটা আধখানা প্রায় নীচের দিকে টেনে নিলে তাকে—ভয় করতে লাগল ছিঁড়ে একেবারে পড়ে না যায়। কিন্তু সহজ বুদ্ধিটা তাকে বলে দিলে এটা স্প্রিংয়ের চেয়ার, এদের ধরণই এই রকম।

পরিমল বললে, দাঁড়া, তা হলে একটু চায়ের জোগাড় করি।

—চা ?

—হ্যাঁ, একটু চা না হলে জমবে কী করে ?

—কিন্তু ভাই, চা তো আমি বিশেষ খাই না।

—এক কাপ খেলে তো কোনো ক্ষতি নেই। বোস, আমি দু মিনিটের মধ্যেই আসছি—

হরিণের চামড়ার চটিটার শব্দ করে বেরিয়ে গেল পরিমল।

রঞ্জু বসে রইল অভিভূত হয়ে। জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠে আসবার মতো কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে তার। নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন আর বিব্রত বোধ হচ্ছে। অসীম আশঙ্কা ভরে রঞ্জু ভাবতে লাগল, এখন যদি এ ঘরে এসে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসেকেউ যে সে কে এবং কেন এসেছে—তা হলে তার অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে। তার মুখে কথা আটকে আসবে—উত্তর জোগাবে না, তারপর আত্মরক্ষার জন্মে মরীয়া হয়ে সামনের জানালাটা দিয়ে সোজা নীচের বাগানটায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে তাকে।

রঞ্জু টের পেলে বাইরে থেকে এত বেশি হাওয়া আসছে বটে, তবু তার জামাটা ভিজে উঠেছে ঘামে, তার কপাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে দু ফোঁটা ঘাম। নিরুপায় হয়ে নিজেকে সে সামলে নেবার চেষ্টা করলে খানিকটা, তারপর ওই বিশ্রী চিন্তাটার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্মে প্রথমটা কড়িকাঠে, তারপরে চোখ বুলোতে লাগল দেয়ালের গায়ে।

এখানেও ছবি, এখানেও দেওয়ালে খানকয়েক যত্ন করে টাঙানো। সব চাইতে বড় ছবিখানা অয়েল-পেন্টিং—টকটকে চওড়া লালপেড়ে শাড়ীপরা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা ভারী সুন্দর চেহারার একটি মহিলা। রঞ্জুর দিকে যেন নিবিড় স্নেহভরে তাকিয়ে আছেন তিনি। ছবিটার ওপরে এক ছড়া শুকনো মালা দুলছে। পরিমলের মা নেই শুনেছিল, বোধ করি ইনিই মা। তা ছাড়া আরো

খানতিনেক ছবি আছে, কিন্তু সে সব অপরিচিত মুখ, রঞ্জু তাদের কাউকে চিনতে পারল না।

দেওয়াল থেকে চোখ নামিয়ে টেবিলের দিকে মনোনিবেশ করলে সে। ভীরু হাতে একটা বই টেনে নিতেই নিজের অজ্ঞাতসারে সে খুশি হয়ে উঠল—বাঃ, খাসা বই। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'।

প্রথম পাতাটা ওলটাতেই চোখে পড়ল মুক্তোর মতো সুন্দর অক্ষরে বইয়ের মালিকের নাম লেখা: কুমারী সংঘমিত্রা লাহিড়ী। সংক্ষিপ্ত 'মিতা' নামটি, পোষা হরিণটা আর এই সুন্দর হাতের লেখা—সব যেমন হওয়া উচিত তেমনি। খারাপ হাতের লেখা দেখতে পারে না রঞ্জু, কেমন নোংরা মনে হয়—শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে যায় মানুষের ওপরে। কিন্তু 'মিতা তাকে নিরাশ করেনি।

রঞ্জু পাতা ওলটাতে লাগল, তারপর এক জায়গায় গিয়ে দৃষ্টিটা থেমে পড়ল তার। লাল-নীল পেন্‌সিল দিয়ে ভারী যত্ন করে দাগানো একটা কবিতা, খুব মন দিয়ে মিতা সেটা পড়েছে। কবিতাটার নাম "গুরুগোবিন্দ।"

গুরুগোবিন্দের নামটা জানা আছে ইতিহাসের পাতায়, কিন্তু সে মানুষটিকে নিয়ে এমন কী কবিতা লেখা সম্ভব—যা এত করে দাগ দিয়ে দিয়ে পড়তে হবে?

রঞ্জু আকৃষ্ট হল কবিতাটার দিকে। কিন্তু লাইন কয়েক পড়তেই কবিতাটার সুর আর ছন্দ তার রক্তের মধ্যে যেন দোলা ধরিয়ে দিলে। কী আশ্চর্য, কী অপূর্ব উজ্জ্বল কবিতা। কেন সে এতদিন এমন একটা কবিতা পড়তে পায়নি! গুন্ গুন্ করে রঞ্জু দাগানো লাইনগুলো পড়ে যেতে লাগল:

"হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি
হাতে লয়ে জয় তূরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের পথে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি—"

নিজেই সে বুঝতে পারল না, কবিতার দ্রুত গতির সঙ্গে সঙ্গে কখন তার অপরিচিত পরিবেশের ভয় কেটে গেছে, মন থেকে মুছে গেছে অনধিকারের সংশয়! তার গলার স্বর ক্রমশ ওপরে উঠতে লাগল:

তুরঙ্গ সম অন্ধ-নিয়তি
বন্ধন করি তায়,
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন করে
সময়ের পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়—"

পেছন থেকে হাসিভরা মুখে পরিমল বললে, বাঃ, কবি যে একেবারে ভাবের রাজ্যে তলিয়ে গেলি দেখছি!

চটকা ভেঙে গেল রঞ্জুর। মুহূর্তের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে সে সজাগ হয়ে উঠল। মনে হল অপরাধ করে ফেলেছে, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে অনধিকার-চর্চার অপরাধ। সসংকোচে বইটা বন্ধ করে সে সরিয়ে রাখল, একটা ঢোঁক গিলে নিয়ে বললে, এই—একটু দেখছিলাম।

পরিমল হাসল, পাশের চেয়ারটাতে বসল এসে। বললে, কী বই পড়ছিলি? কথা ও কাহিনী?

মঞ্জু মাথা নাড়ল।

—ঠিক ধরেছি, নিশ্চয় কবি তুই। তাই কবিতার বইয়ের ওপরে এত ঝোঁক—নিজের আবিষ্কারের আনন্দে অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল পরিমল।

—যাঃ বাজে কথা—লজ্জায় রঞ্জু আরক্তিম হয়ে উঠল।

—কিন্তু বরাত ভালো, এবারেও পরিমল নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা বদলে দিলে। বললে, বলে এলাম, এক্ষুণি চা আসবে। আচ্ছা, দেওয়ালের ওই ছবিগুলোকে চিনতে পারিস?

—উনি বোধ হয় তোর মা।

—ঠিক ধরেছিস। আর ওগুলো?

—চিনতে পারলাম না।

—তোর দোষ নেই ভাই, দেশের দুর্ভাগ্য। সমস্ত ভারতবর্ষের সত্যিকারের গৌরব, তাঁদের ভুলে যাওয়াই আমাদের রেওয়াজ।

—কিন্তু ওঁরা কারা পরিমল।

পরিমল মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলল: আর একদিন বলব, আজ থাক।

আজ থাক। এ কথাটা আরো দু-একবার রঞ্জু শুনেছে ওর মুখে। প্রথম বোধ হয় বলেছিল সেই নিরালা কাঞ্চননদীর ধারে। কী একটা জিনিস একান্তভাবে

বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না ; কোথায় আটকে যাচ্ছে—কোথা থেকে একটা সংকোচ এসে বাধা দিচ্ছে তাকে। কী এমন একটা কথা, কিসের জন্তে এত সংকোচ পরিমলের ? একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হল রঞ্জুর—কিন্তু কী যে হয়েছে পরিমলের ছোঁয়া লেগে, ওরও কথা আটকে এল।

ভালো লাগছে না রঞ্জুর, কেমন বিরক্তি লাগছে একটা। কাছে থেকেও কাছে নেই পরিমল—চোখের দৃষ্টিতে ঘনিয়ে আছে দুরান্তীর্ণ একটা অন্যমনস্কতা। কী যেন ভাবছে, অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভাবছে। অথচ সে ভাবটাকে অনুমানও করবার ক্ষমতা নেই রঞ্জুর—সে ভাবনার সে অংশও নিতে পারবে না। একেবারে পাশটিতে বসে-থাকা মানুষের সঙ্গেও মনের হাজার মাইল জোড়া যে দুস্তর ব্যবধান ছড়িয়ে থাকে তার পরিচয় রঞ্জু পেলো এই প্রথম।

এ ভাবে চুপ করে আর বসে থাকা চলে না। রঞ্জু বললে, কই, বই দিবিনা ?

—হাঁ, দিচ্ছি—

পরিমল উঠল। রঞ্জু আশা করেছিল বড় একটা আলমারীর ভেতর থেকে একরাশ ঝকঝকে বই বার করে আনবে ও। কিন্তু তা করলনা পরিমল। ঘরের এক কোণে একটা শেলফ—সেখানে একরাশ মাসিকপত্র আর খবরের কাগজে ডাঁই হচ্ছে, সেই স্তূপ ঘেঁটে খবরের কাগজের প্যাকেট বের করেলে একটা। রঞ্জু বিস্মিত হয়ে গেল।

—দেখি, কী বই ?

—একটু পরে।—প্যাকেটটা কোলের ওপর নিয়ে পরিমল মিনিটখানেক চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা রঞ্জু !

—কী ?

—সত্যিই কি বিশ্বাস করিস্ অহিংসা দিয়ে স্বাধীনতা আসবে ?

রঞ্জু হাসল : আবার ও কথা তুলছ কেন ?

—না, এম্‌নি।—পরিমল আবার চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত : আচ্ছা, তুই বিপ্লববাদীদের কথা শুনেছিস কখনো ?

—শুনেছি বইকি।—রঞ্জু সোৎসাহে বললে, তারাই বোমা ছুঁড়ছে, গুলি করছে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে। ভয়ঙ্কর লোক সব—শৈশবের সংস্কারে ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : নিশ্চয় ক্ষুদিরামের দল।

পরিমল হঠাৎ নড়ে চড়ে বসল চেয়ারটাতে, কেমন অদ্ভুতভাবে তাকালো রঞ্জুর দিকে।

—খুব ভয়ঙ্কর লোক ওরা, না ?

—নিশ্চয়, কোনো সন্দেহ আছে ? যারা ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েবকে গুলি মারতে পারে, অসাধ্য কাজ আছে তাদের ?

পরিমল ঠোঁটে আঙুল দিলে। স্-স্-স্—আস্তে।

কাচের দরজা ঠেলে একটা চাকর ঢুকল। বাক্সের ডালার মতো একটা কাঠের পাত্র করে (পরে জেনেছিল ওকেই ট্রে বলে) দু পেয়ালা চা আর দু রেকাবী খাবার এনে রাখল টেবিলের ওপরে।

—নে রঞ্জু।

—সেকিরে, এত খাবার কেন ? না, না, ওসব আমি খাব না।

—আচ্ছা লাজুক ছেলে তো তুই। খাবার নিয়ে কখনো লজ্জা করতে আছে রে বোকা ! পাওয়া মাত্র মুখে পুরে দিতে হয়—এই হচ্ছে বুদ্ধিমানের নিয়ম। নে, নে, চটপট—

থালায় লুচি, মিষ্টি, আলু আর বেগুন ভাজা। সোনালি ফুল-পাতা আঁকা নীল রঙের পেয়ালাতে সোনালি রঙের চা। খাওয়ার চাইতে দেখতেই যেন বেশি ভালো লাগে।

—কেন আবার এত সব—

বাধা দিলে পরিমল : মিতা পাঠিয়ে দিয়েছে, আমার কিছু বলবার নেই।

মিতা ! কী সুন্দর নাম। আদর করে যেন বারবার নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে করে। রঞ্জুর চমৎকার লাগল লুচিগুলো, অনভ্যস্তভাবে চায়ে চুমুক দিয়ে জিভ একটু পুড়ে গেল বটে, তবু সে চায়ের স্বাদ এত ভালো লাগল বলবার নয়।

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ হল। একটু পরেই চাকরটা এসে যখন পেয়ালা পিরিচগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল, তখন আবার পুরোনো কথার খেই ধরলে পরিমল।

—তুই যেন কী একটা কথা বলছিলি ? ক্ষুদিরামের দল ?

রঞ্জু অপ্রতিভভাবে বললে, তাইতো শুনেছি।

—জানিস, কে ক্ষুদিরাম ?

—রঞ্জু বিব্রত বোধ করতে লাগল, শুনেছি অল্প অল্প।

—কী শুনেছিস্?—তেম্‌নি বিচিত্র ধরণে রঞ্জুর মুখের দিকে পরিমল তাকিয়ে রইল।

—শুনেছি—সন্দিগ্ধচোখে পরিমলের মুখভাবটা লক্ষ্য করে রঞ্জু বললে, মাটির তলায় তার কামানের কারখানা আছে।

—আর?

—আর—রঞ্জু একটা ঢোক গিললে: ক্ষুদিরাম লাটসাহেবকে মারতে চেষ্টা করেছিল।

হঠাৎ শব্দ করে সকৌতুকে পরিমল হেসে উঠল।

কেমন যেন একটা চমক লাগল রঞ্জুর। বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল বহুদিন আগেকার একটা কথা। ক্ষুদিরামের আলোচনা প্রসঙ্গে এম্‌নি করেই সেদিন অবিনাশবাবু হেসে উঠেছিলেন। আজ পরিমলের কণ্ঠে যেন তাঁরই সেই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল।

হাসি বন্ধ করলে পরিমল। তারপর শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, তুই ভুল শুনেছিস রঞ্জু।

কোথাও একটা ভুল আছে এটা রঞ্জু নিজেও অনুমান করেছিল। ক্ষীণভাবে বললে, তবে যে বৈরাগী গাইছিল—

—বৈরাগী?—পরিমল আবার হাসল, কিন্তু এবারে নিঃশব্দে।

রঞ্জু অভিভূত হয়ে আসছিল। আস্তে আস্তে বললে, তুমি জানো কিছু ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে?

—জানি।

—জানো?—রঞ্জুর শরীরটা শির শির করে উঠল। শূন্য কল্পনার একটা অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে এতদিন পরে কূল দেখতে পেয়েছে যেন। উদগ্র আকুলতার একটা তরঙ্গ এসে তার বুকের পাঁজরায় উচ্ছ্বসিত আবেগে ঘা দিতে লাগল: কী জানো তুমি?

—অনেক কথাই জানি। তুই জানতে চাস?

রঞ্জু মাথা নাড়ল। কথা বলবার শক্তি নেই তার।

পরিমল খবরের কাগজের প্যাকেটটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। চাপা গলায় বললে, ক্ষুদিরামের কথা আমি নিজে কিছু বলবনা, এই বইগুলোই বলবে। কিন্তু একটা কথা আছে রঞ্জু।

—কী কথা ভাই?

—বইগুলো লুকিয়ে রাখতে হবে—লুকিয়ে পড়তে হবে, লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—কেন?—রঞ্জুর মুখে ভয়ের রেখা দেখা দিলে।

—কেন?—পরিমল কঠিনভাবে বললে, যারা আমাদের গলা টিপে রাখতে চায়, তারা যে ওদের পরিচয় আমাদের জানতে দেবে না ভাই।

রঞ্জু হতাশভাবে বললে, তোর কথা কিছু বুঝতে পারছি না পরিমল।

—বইগুলো পড়লেই বুঝতে পারবি। পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবীর পরিচয়ই যে প্রথম অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে আসে। দুর্যোগের ভেতরে তারা আমাদের হাত বাড়িয়ে দেয় স্বাধীনতার আলোয় এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সুন্দর ভাবে, যেন ছাপার অক্ষরে সাজিয়ে কথাগুলো বলে গেল পরিমল। আর ওদিকে আবার একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ চমকে উঠল রঞ্জুর শরীরের মধ্যে।

—বিপ্লবী!

—হাঁ বিপ্লবী। আর সেই শহীদদের প্রথম অগ্রদূত ক্ষুদিরাম।

রঞ্জু বিহ্বলভাবে বলে ফেলল: তুমি কি বিপ্লবীদের দেখেছ পরিমল? চেনো তাদের?

—আচ্ছা ছেলেমানুষ তুই রঞ্জু!—পরিমল যেন লঘু কৌতুকে আবার সহজ হয়ে উঠল: তারা সব ভয়ঙ্কর লোক, আমি নিরীহ জীব, তাদের চিনব কী করে? তবে তুই যদি চিনতে চাস ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—আমি!

—হ্যাঁ, তুই। ভয় কি, তারা বাঘভালুক নয়। তারাও আমাদের মতোই সহজ মানুষ—শুধু তাদের মনটা বজ্র দিয়ে গড়া। আমাদের পাশে পাশেই তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমরা তাদের চিনতে পারি না!—পরিমল যেন সামলে নিলে নিজেকে: যাক গে, ও সমস্ত বাজে কথা এখন থাক। চল, বইগুলো তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

প্যাকেটটা ততক্ষণে পরিমল লুকিয়ে নিয়েছে জামার নীচে। দুজনে উঠে পড়ল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে, হলঘর পেরিয়ে আবার বাগানে চলে এল।

আর সেইখানেই দেখা হল মিতার সঙ্গে।

চঞ্চল পায়ে বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল, বোধ হয় প্রজাপতির সন্ধানে। ওদের কথাবার্তার শব্দে ফিরে তাকালো।

তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে, অর্থাৎ বয়সে রঞ্জুর সমান হবে। উজ্জ্বল টকটকে রং, কপালে কাঁচপোকার সবুজ টীপ, পরণে ডুরে-পাড় শাড়ী। আশ্চর্য সুকুমার আর শান্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়েছিল মেয়েটি।

পরিমল বললে—মিতা, এ আমার বন্ধু রঞ্জু—রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

দুখানি সুন্দর হাত কপালে ঠেকিয়ে স্নিগ্ধ কোমল স্বরে মিতা বললে, নমস্কার।

নমস্কার! রঞ্জু নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তাকেও কেউ কোনোদিন দুহাত তুলে নমস্কার জানাবে—ছোট্ট, ভীরু রঞ্জু একদিন নমস্কার পাওয়ার মতো বড় হয়ে উঠবে, একথা কি কখনো কোনো কল্পনাতেও ছিল তার।

প্রতি-নমস্কার করল না রঞ্জু, শুধু অর্থহীনভাবে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করে দ্রুত ফটকটার বাইরে চলে গেল।

পরিমল বললে, কি রে, অমন করে দৌড়ে পালাচ্ছিস্ যে? ভয় পেলি নাকি? দাঁড়া, দাঁড়া, আমিও আসছি—

পেছন থেকে রঞ্জু শুনতে পেল—মিতার মিষ্টি খিল্ খিল্ হাসির শব্দে সমস্ত বাগানটা ভরে উঠেছে। তার পালানোটা ভারী উপভোগ করেছে সে।

সেই প্রথম। সেই হাসির শব্দই বালক রঞ্জুকে হঠাৎ জাগিয়ে দিলে কৈশোরের রঞ্জনের মধ্যে। ম্যাগ্নোলিয়া আর গোলাপের গন্ধে মাতাল এক ঝলক বাতাসে একটা নতুন চেতনার চঞ্চলতা জেগে উঠল মনে।

বাল্য থেকে কৈশোরে। কল্পনার রূপকথা থেকে জীবনের রূপকথায়। সেই প্রথম নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই রঞ্জুর কথা শেষ হল, সুরু হয়ে গেল রঞ্জনের কাহিনী।

(ক্রমশঃ)

মৌনী-বাবা

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী এম-এ

নদীয়া জেলার আড়ুদিয়া একটি গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে শিবনাথ ঘোষ নামে এক পরমভক্ত সদ্গোপ বাস করিতেন। শিবনাথের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ প্যারীলাল ও কনিষ্ঠ কুঞ্জলাল। সদ্গোপ-প্রবরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্যারীলাল ঘোষই উত্তরকালে মৌনী-বাবা বলিয়া পরিচিত হ'ন।

প্যারীলালের জন্ম হয় ইং ১৮৫৬ সালে। পিতা শিবনাথ কর্ম্ম-ব্যপদেশে পাবনা শহরে বসবাস করিতেন। প্যারীলালও তৎসকাশে থাকিয়া পাবনার জেলা স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। বাল্য হইতেই প্যারী-লালের হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইয়াছিল, পাঠদ্দশাতেই বিদ্যালয়ের এক ব্রাহ্ম শিক্ষকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় প্যারীলালের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর সংসারের যাবতীয় ভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইল। দরিদ্রের সংসার, দিন চলা ভার। তাহার উপর কনিষ্ঠ ভ্রাতাটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল। সব দিক চিন্তা করিয়া প্যারীলাল জলপাইগুড়ির এক মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া পরিবারের ভরণ-পোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর তিনি রংপুর জেলার গোপালপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়েরও প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ খ্যাতির সহিত কর্ম্মপরিচালনা করিয়া থাকেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর তাঁহার মনে পুনরায় বৈরাগ্যের উদয় হইল। সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম্মের পর তিনি অধিকাংশ সময় ভজনানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, আহারাদির সংযম-রক্ষা এবং ব্রত উপবাসে মনঃসংযোগ করিলেন। দ্বাদশ বৎসর-কাল তিনি এইরূপে সংসারে থাকিয়াও সংসার-নির্লিপ্তভাবে অতিবাহিত করিলেন। সংসার-আশ্রমে বাস করিবার সময় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। প্যারীলাল যখন সংসারে থাকিয়াও তাহার সহিত সমস্ত সংস্রব এড়াইয়া চলিয়াছেন, তখন একদিন তাঁহার সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অমর-ধামের যাত্রী হইলেন। কনিষ্ঠ কুঞ্জলাল তখন পাঠ সমাপনান্তর উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন। প্যারীলাল দেখিলেন, কুঞ্জলাল যখন উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছে তখন সংসার-প্রতিপালনের আর তাঁহার চিন্তা কি? তিনি কনিষ্ঠের উপর সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া পরমানন্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এতদিনে প্যারীলাল যেন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি যে পথের সন্ধান করিতেছিলেন, আজ তাহার দর্শন মিলিয়াছে।

সংসারাশ্রম ছাড়িয়া প্রথমে তিনি যোগাভ্যাস মানসে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন। তিন বৎসর চিত্রকূটে অবস্থান করিয়া তিনি বোম্বাই

প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত খাণ্ডোয়া জেলার ওঙ্কারনাথ পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। লক্ষ্মীনারায়ণ শেঠ নামে এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার জন্ত ওঙ্কারনাথ পর্ব্বত-গাত্রে একটি গুহা প্রস্তুত করিয়া দেন। প্যারীলাল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্তায় রত হন। ছয়মাসকাল একাদিক্রমে গুহার মধ্যে অবস্থান করিয়া তপস্তা করিতে থাকেন, ক্ষুধা-পিপাসা, এমন কি প্রস্রাব-মলত্যাগের বেগও তাঁহাকে সে-সময়ে কর্ম্মচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময় তিনি মৌন অবস্থায় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া উত্তরকালে তিনি মৌনী-বাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তদুপর তাঁহার ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম উপস্থিত হইলে তিনি যোগদ্বারা এ নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধনোচিত ধামে গমন করেন। ওঙ্কারনাথের মোহন্ত মহারাজ বলিয়াছেন,—"মৌনীবাবার মত সাধু আমি একজনও দেখি নাই।"

এই সেই নদীয়ার সু-সন্তান, এই সেই মৌনীবাবা—মহান্ এবং সুন্দর, সৌন্দর্য্য মহত্বের অপূর্ব্ব মিলন-মাধুরী সমন্বিত শ্রেষ্ঠ সাধক-প্রবর—এখন লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়া অনন্তকালের জন্ত এক অন্তহীন আদর্শপট বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে।

নীতি-শাসন

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ঘোরতর নীতিবাদী : দেখ, লোকটা শাসিয়ে চিঠি লিখেছে, সে আমায় খুন করতে চায়। খামের ওপর দিব্বি দিয়ে লেখা আছে—স্বপাঠ্য ও গোপনীয়। এখন কি করা যায় বলত?

অবসরপ্রাপ্ত শাসন-পন্থী—পেনসন-ভোগী : চিঠিটা যখন স্বপাঠ্য ও গোপনীয় তখন তো পুলিসের আশ্রয় নেওয়া চলে না। ডিসিপ্লিন মানতে হ'লে, আমার মতে, খুন হওয়া ছাড়া তো অন্ত কোন উপায় দেখছি না।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

প্রথম আত্মীয় : তোমার ড্রাইভার আর একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে আমার কোমরটা দিলে জখম করে।

দ্বিতীয় আত্মীয় : (শ্রীংযুক্ত কুসন চেয়ারে ঝম্প প্রদান করিয়া) তোমার বসবার জায়গাটা বড় মজার, নীচ থেকে দোলা দেয়, এই দেখনা (পুনরায় ঝম্প প্রদান)

তৃতীয় (মহিলা) : রাস্তার মাঝে পর্দা থাকে, কোথাও শুনিনি বাপু, চলা ফেরার অসুবিধা হচ্ছিল, গুটিয়ে রেখেছি কিছু মনে কোরো না।

চতুর্থ আত্মীয় : (ছোট ছেলে, ভগ্ন প্যারিস মূর্ত্তির প্রতি সঙ্কেত করিয়া) তোমার পুতুল পড়লেই ভেঙ্গে যায়—ঐ দেখনা কি হয়েছে।

গৃহকর্ত্তা : আপনারা তা হোলে ত বেজায় অসুবিধায় পড়েছেন দেখছি।

প্রথম আত্মীয় : তবু কিছুদিন থাকতে হবে। গ্রহের ফের আর কাকে বলে, তিথ্য করতে এসে কি নাকালেই না পড়া গেল। কোমরটা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত বাপু ডাক্তারের ফি-টা তুমিই দিয়ে দিয়ো। হিসেবনিকেশ আমার ঠিক তেমন আসে না।

গান

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আমি চ'লে যাবো যবে,
তোমার পৃথিবী এমনি রঙীণ রবে ?
ভোরের আলোয় তেমনি ফুটিবে ফুল
পাতায় পাতায় শিশির ফোঁটার দুল,
অতীতের কথা হ'য়ে যাবে ভুল…

আমি যে গিয়াছি কবে ?
তুমি ত দাঁড়ায়ে রবে না দ্বারে
চির বিদায় বেলা বিদায় তারে,
অশ্রু সজল হবে না হা রে
তাই ত কাঁদিতে হবে।

বিভ্রম

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ

ভদ্রলোকের নাম ছিল উইলিয়াম। ব-সহরের প্রধান ধর্ম্মযাজক তিনি। সাধারণ লোকে তাঁকে ফাদার উইলিয়াম বলে জানে। দীর্ঘ ঋজু তাঁর দেহ—উদার সরল তাঁর হাবভাব চালচলন। বয়স তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি—হয়ত বা দুবছর এদিকে, না হয় ওদিকে। লোকটি ভদ্র, শান্ত, মিশুক এবং তার ওপরে সদালাপী। আরো অনেক গুণ আছে ভদ্রলোকের; কিন্তু গুরুতর রকমের খুঁৎ একটা আছে, যার জন্ত অনেক তাঁর গুণই চাপা পড়ে গিয়েচে। ভদ্রলোক অন্ধ—দু চোখের কোনটাতেই কিছু দেখতে পান না তিনি। অবশ্য চিরদিন তিনি এমন ছিলেন না—একদিন চোখে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ছিল, কিন্তু বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই বেচারি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। চিকিৎসা রীতিমতই হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ সুফল হয়নি তাতে।

অন্ধ হলেও কিন্তু যাজকের কাজ তাঁর চলছিল। সহরের অনেকের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং প্রায় সকলেই তাঁকে খাতির করতেন। তার ওপরে গোটা বাইবেলটা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং ধর্ম্মের কথা নিয়ে যিনিই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেচেন তিনিই চমৎকৃত হয়ে গিয়েছেন—ভদ্রলোকের গভীর চিন্তাশীলতা এবং শান্ত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে। অন্ধ হওয়ার পরেও তাই তাঁর চাকরি বজায় থেকে গেল।

কিন্তু চাকরি বজায় রাখা দিনে দিনে শক্ত হয়ে উঠছিল ভদ্রলোকের পক্ষে। অনেক পড়ে শুনে ভেবে চিন্তে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ভগবান বলে কেউ কোথাও নেই এবং যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর বলে জানি, আসলে তিনি মানুষেরই মনের সৃষ্টি। নিজের সেই নাস্তিক ভাব কিন্তু ভদ্রলোককে তাঁর নিজের মধ্যেই গোপন রাখতে হত—মুখ ফুটে বলতে সাহস পেতেন না তিনি কথাটা কাকেও। কারণ হিসাবমত তিনিই ছিলেন ভগবানের সঙ্গে মানুষের যোগসূত্র। তাঁর পক্ষে ভগবানকে অস্বীকার করার মানে অন্তের সম্পর্কে নিজের তাঁর প্রয়োজনকেই মিথ্যা করে দেওয়া। অত্যন্ত সাবধানে আত্মগোপন করে চলতে হত তাঁকে, যাতে তাঁর কথাবার্ত্তায় আচারে-আচরণে কেউ যেন তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে কোন সন্দেহ করতে না পারে। সে সন্দেহ হয়ত কেউ করেনি—কেউ হয়ত করেও থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক, নিজের আচরণের সেই লুকোচুরির জন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন ভদ্রলোক দিনে দিনে তিলে তিলে। সময়ে সময়ে এমনও তাঁর মনে হত যে সেইভাবে জীবনযাপন করার মানে নিজেকে ও অন্ত সকলকে প্রবঞ্চনা করা—ভুল বোঝানো—ঠকানো। যে ভগবানকে নিজের মনে তিনি মানতে পারেন না সেই ভগবানেরই কাছে সকলের হয়ে তিনি প্রার্থনা করেন—আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন সকলের জন্ত? সেই ভণ্ডামি অসহ্য হয়ে উঠছিল তাঁর নিজের পক্ষে এবং এমনও তিনি মনে করছিলেন যে যাজকতার সেই কাজ তিনি ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু মুশকিল সে পক্ষেও। চাকরি ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই কিছু শক্ত ব্যাপার ছিল না—শক্ত হবে বুঝছিলেন ভদ্রলোক, চাকরি ছাড়ার পরে বেঁচে থাকা। কি করে অতঃপর তিনি নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করবেন? কোন কাজই ত তিনি করতে পারবেন না। সে অবস্থায় কি খেয়ে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বাঁচবেন? বহুদিনের অভ্যাস বলেই ঐ যাজকতার কাজ তিনি চালিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু নূতন কোন কাজ যে তিনি ঠিকমত করতে পারবেন না সে বিষয়ে মনে তাঁর অণুমাত্র সংশয় ছিল না। তাঁর তাই মনে হত যে ঐ যাজকতার কাজ ছাড়ার মানে আত্মহত্যা করা—আর শুধু আত্মহত্যাও সে নয়—স্ত্রীহত্যাও তার পরে। অবশ্য নিজের মনের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্ত প্রয়োজন হলে মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্তও তিনি প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু সাধ্বী ধর্ম্মপত্নী মেরীকে মরণের পথে টেনে নিয়ে যাবার কি অধিকার তাঁর আছে? সাত পাঁচ ভেবে তাই ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে উঠছিলেন। বিশেষ অসুবিধা তাঁর এই হয়েছিল যে পরামর্শ করবার লোক কেউ কোথাও ছিলেন না। আর কাউকে সে সব কথা বলার যে কোন

মানেই হয় না, তা তিনি বিলক্ষণ বুঝতেন এবং এও তাঁর অজানা ছিল না যে মেরীও তাঁর সে মনোভাবের সমর্থন করবেন না।

অস্বস্তির অন্য কারণও ছিল এবং ছোট হলেও মিথ্যা ছিল না তার কোনটাই। ধর্ম্মগুরুর পদমর্যাদায় যাজকের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের সমাবেশ ছিল। মস্ত বড় অট্টালিকায় তিনি বাস করতেন। চারদিকে তাঁর দাসদাসী আশ্রিতজনেরা তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য প্রায় তটস্থ হয়ে থাকে। সহরের গণ্যমান্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। সেই সব সুবিধা ছেড়ে তার থেকে নিজেকে চিরদিনের মত বঞ্চিত করার মধ্যে আনন্দ বা উৎসাহের কোন প্রেরণা ছিল না এবং তাঁর মনে হয়েছিল যে সর্ব্বনাশের সামনে এসে দাঁড়িয়েচেন তিনি—একটু অনবধান হলেই আর কোন রকমেই আত্মরক্ষা করতে পারবেন না হয়ত। মনকে তাই তিনি বুঝিয়েছিলেন যে যেমন চলচে তেমনি চলুক। মনের তাঁর ভাবটা এই যে, আর যাই হোক আত্মহত্যা করবেন না তিনি।

স্থির একটা করলেন বটে, কিন্তু মনের অস্বস্তি তাতেও গেল না। দিনে দিনে অবস্থাটা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে গোটা জীবনটাকে অভিনয় হিসাবে চালিয়ে যাওয়া সহজ বা সুখকর হবে না কোনমতেই। সময়ে অসময়ে, কারণে অকারণে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়তেন তিনি এবং সেই সব অসতর্ক অবস্থার কৃতকর্ম্মের টাল সামলাতে রীতিমত বেগ পেতে হত ভদ্রলোককে। অগোচর মন তাঁর তাই নিজের বিরোধী হয়ে উঠছিল এবং তাঁর ভয় হচ্ছিল যে নিজের অন্তর বাহির যেন পরস্পরের সতীন হয়ে উঠচে দিনে দিনে তিলে তিলে। দেখেশুনে তিনি কথা কম কইতে আরম্ভ করলেন এবং ভাবটা দেখাতে চেষ্টা করলেন যেন ধ্যান-ধারণা নিয়েই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতে চান তিনি। বাইরের লোকে অনেকেই তাঁর সে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন এবং খুশিও ছিলেন তাঁর ওপরে অনেকে; কিন্তু নিজের মনকে মানানো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল ভদ্রলোকের। মনের সেই অবস্থার মধ্যে এক সময়ে তাঁর মনে হল যে তিনি যেমন ভগবানকে স্বীকার করতে পারেন না, তেমনি ত উল্টা দিকে এমন অনেক লোক আছেন দেবতাকে যাঁরা সর্ব্বান্তকরণে স্বীকার করেন। কথাটা ভাল করে ভাবতে গিয়ে তাঁর মনে হল যে তিনি বুঝলেন—ঐ দুই বিরোধী মনোভাবের কোনটাই হয়ত সম্পূর্ণ সত্য নয়—হলে মানুষ একই কথা এমন বিসদৃশ করে ভাববে কেন? নিজের মন যাচাই করতে গিয়ে অতঃপর তাঁর মনে হল যে ভগবানের সম্বন্ধে তাঁর মনের অবিশ্বাস গভীর সন্দেহ মাত্র—নিশ্চিত হতে পারেন নি তিনি একবারে। সে অবস্থায় তাঁরই মত আর একজন যদি ভগবানকে শুধু বিশ্বাস নয়, তাঁর ওপরে আত্মসমর্পণ করতে পারে—তাহলে তার মানেটা কি এই দাঁড়ায় না যে হয়ত নিজে তিনি ভুল করেচেন এবং তাঁর মনের সন্দেহ হয়ত একদিন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। তাঁর মনে হল—ভগবান আছেন কি নেই—সে সম্পর্কের যুক্তিতর্কসমূহের পাশ কাটিয়ে সরল মনে সরলভাবে যদি তিনি ভগবানকে স্বীকার করে খোদ ভগবানের কাছে তাঁর নিজের মনের দ্বিধার সমাধান করে নেবার জন্য প্রার্থনা করেন, তাহলে হয়ত এ সম্পর্কে সত্য কথাটা তিনি বুঝতে পারবেন—নিজের মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ হয়ে যাবে হয়ত। অবশ্য ভগবান যদি না থাকেন তাহলে তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হবে, কিন্তু তার ফলে নিজের মনে তিনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে ভগবান নেই। যাই হোক এ বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল যাজকের মন, কারণ ভদ্রলোক বুঝছিলেন যে কোন কাজই তিনি ঠিকমত করতে পারছিলেন না—তাঁর যাজকতার কাজও নয়, নিজের মনের মত ভাবে জীবনযাপন করাও নয় এবং ভাল লাগছিল না তাঁর সে অনিশ্চিতের অবস্থাটা। পরের রবিবার সকালের নিয়মিত উপাসনার পরে যাজক মন্দিরে তাঁর নিজের নিরালা ঘরটিতে গিয়ে বসলেন এবং অনেকক্ষণ ধরে একাগ্রমনে দেবতাকে স্মরণ করে তাঁর কাছে তাঁর নিজের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলেন—যেন দেবতা অতঃপর তাঁর অন্তরের দ্বিধা মিটিয়ে দেন। প্রত্যক্ষ ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেন মনের সন্দেহ সংশয়ের নিরসন হয়ে যায়। সেই তাঁর পরম প্রার্থনার মধ্যে যুক্তির অবতারণা না করে পারলেন না ভদ্রলোক এবং তিনি বললেন যে দেবতা যাদের কাছে ভক্তি পান বা চান, তাঁর নিজের সম্পর্কে তাদের অন্তরকে সংশয়াকুল রাখা সঙ্গত হবে না তাঁর পক্ষে—মনে তারা যদি তাঁর

সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারল তাহলে তাদের ভক্তিরও কোন গৌরব থাকল না। আরো কথা এই যে—ভক্তেরা যে ভগবানকে সত্য বলে অনুভব করেন, ধ্যানলোকের সেই দেবতার কর্ত্তব্য নয় কি নিজেকে তাঁর ভক্তদের কাছে সত্যস্বরূপ করে তোলা। এই ভাবের ভূমিকা করে নিজেদের জন্য দুটি প্রার্থনা যাজক করলেন—আছেন কি নেই যে দেবতা তাঁর কাছে। একটিতে তাঁর নিজের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরে চাইলেন। আর অন্যটিতে তিনি চাইলেন যেন তাঁর পত্নী মেরী তার মনে যে বেদনা গোপন করে রেখেছে, যার আভাষ সময়ে সময়ে তিনি পেয়েচেন অতর্কিত-তার দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে—সেই বেদনার কারণ যেন দূরীভূত হয়, যেন যা সে মনপ্রাণ দিয়ে চায় তা সে সত্যের স্বরূপে অনুভব করতে পারে, প্রত্যক্ষ করতে পারে।

অন্যদিনের মত যাজকের সেদিনের প্রার্থনাও দেবতার কানে গেল, কিন্তু ঠিক খুশি হতে পারলেন না যা তিনি শুনলেন তা শুনে। কারণ তাঁর মনে হতে লাগল যে তাঁর সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে যাজক সৃষ্টির বিচার করতে চাচ্চে। দেবতার মনে হল যে যাজককে সমঝে দেওয়ার দরকার যে নিজের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের বিষয়ে যে নিজে বিশেষ কিছু জানে না, তার পক্ষে ভগবানের কাজের দোষ ধরতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

গম্ভীর আবেগের সঙ্গে গদ্‌গদকণ্ঠে যাজক তাঁর প্রার্থনা শেষ করলেন। মনে সংশয় বোধ করছিলেন তিনি—দেবতা তাঁর সে প্রার্থনা শুনবেন কিনা, পূর্ণ করবেন কিনা। তাঁর মনে হল যদি প্রার্থনা তাঁর পূর্ণ হয়, তাহলে আর তাঁর সন্দেহ করবার কারণ থাকবে না যে ভগবান নেই।

তাঁর বরাভয়কর প্রসারিত না করে শুধু মুখের কথায় দেবতা বললেন—তথাস্তু।

অতি কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন ভদ্রলোক এবং দুচোখ দিয়ে অবিরল জলধারা গড়াচ্ছিল তাঁর—প্রার্থনা শেষ হতে নিজের চোখ মুছতে মুছতে যাজক আশ্চর্য্য হয়ে বোধ করলেন যে তিনি আবার দেখতে পাচ্চেন! দেবতা তাহলে তাঁর প্রার্থনা শুনেচেন—পূর্ণ করেচেন! আছেন তিনি তাহলে! আর কোন সন্দেহ সংশয় নেই তাঁর মনে অপ্রত্যক্ষ দেবতার সম্পর্কে। দেবতাকে অতঃপর নূতন করে তিনি তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন।

জয় ভগবান—বলে তখনই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মনে তাঁর আনন্দ উৎসাহ উদ্বেল হয়ে উঠল। তাঁর মনে হতে লাগল যে মেরীর সম্বন্ধে যে প্রার্থনা তিনি করেচেন, সম্ভবত তাও পূর্ণ করে দিয়েচেন দেবতা। মন তাঁর উৎফুল্ল হয়ে উঠল—কি সুখেরই হবে তাহলে তাঁদের দম্পতি-জীবন—যে জীবনের অর্দ্ধেক আনন্দ তাঁরা হারিয়েছিলেন নিজের অন্ধ হওয়ার ফলে। আজ আবার সেই হারাধন ফিরে পেলেন তাঁরা।

আর দেরি করতে পারলেন না ভদ্রলোক সেখানে—বাড়ী ফিরবেন তিনি তখনই—দেখবেন তিনি মেরীকে—বলবেন তিনি তাঁকে যে দেবতার বরে তাঁর চোখের দৃষ্টিশক্তি তিনি ফিরে পেয়েচেন। নিমেষের মধ্যে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মনে হতে লাগল যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি মেরীকে সব কথা বলতে পারচেন ততক্ষণ যেন তিনি স্বস্তি বোধ করতে পারবেন না তাঁর নিজের অন্তরে।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় নেমে পড়লেন ভদ্রলোক।

যে লোক রোজ গীর্জা থেকে হাত ধরে যাজককে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয়, ঘরের মধ্যেই তার নিজের জায়গাটিতে সে হাজির ছিল; কিন্তু ঠিক তৈরী হয়ে ছিল না সে সেদিন—কারণ সেদিন যাজকের আচার আচরণ ঠিক অন্যদিনের মত ছিল না এবং লোকটা ঠিক বুঝতে পারে নি কখন উনি বাড়ী ফেরবার জন্য উঠবেন নিজের জায়গা ছেড়ে। তার প্রভুকে হঠাৎ রাস্তার দিকে যেতে দেখে আশ্চর্য্য হয়েই সে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং আরো আশ্চর্য্য সে হয়ে গেল—যখন সে শুনল যে তার প্রভু বলচেন যে তার সাহায্যের আর দরকার নেই তাঁর।

চোখে দেখে যাজক তাঁর পথ চলছিলেন। কিন্তু বহুদিনের পরিচিত সে পথের অনেক পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যে হয়েছিল এবং আগেকার দিনের পথের সে ছবিও তাঁর মনে ছিল না। চলতে চলতে তাই তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন এবং না দেখে চলার অধুনাতন অভ্যাসের মধ্য দিয়ে পথের যে নতুন পরিচয় তিনি ইতিমধ্যে লাভ করেছিলেন তার হিসাবটা যাচিয়ে নিচ্ছিলেন—এখানে ওখানে সেখানে কয়বার থেমে থেমে। চলতে চলতে তাই তিনি থামছিলেন এবং থামতে থামতে চলছিলেন ভদ্রলোক।

মস্ত বড় একটা বাড়ীর সামনে এসে পথ তাঁর

শেষ হয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে হাতের স্পর্শে তিনি বুঝলেন যে তাঁর নিজের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। চোখ চেয়ে একবার তিনি প্রাসাদতুল্য সেই বাড়ীটার বাহরের চেহারা দেখে নিলেন এবং দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটির অভিবাদন স্মিতমুখে গ্রহণ করে প্রসন্ন প্রফুল্ল মনে সামনের সুসজ্জিত হল ঘরটির মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। সেখান থেকে পত্নী মেরীর ঘর অনুমান করে ত্রস্তপদে ভদ্রলোক সেইদিকে অগ্রসর হলেন। আর অপেক্ষা করতে পারছিলেন না তিনি—মেরীকে সেই শুভ সংবাদটি শোনাতে যে আবার তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু মেরীর ঘরের খোলা দরজার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক, কারণ ঘরের মধ্যে চেয়ে তিনি দেখলেন যে এক অপরিচিত যুবকের গণ্ডদেশে মেরী চুম্বন করচেন। অত্যন্ত অভাবিত সেই দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন ও চলবার শক্তি হারিয়ে ফেললেন যেন নিমেষের মধ্যে। স্থিরভাবে সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এবং তাঁর মনে হল যে তাঁকে সেখানে দাঁড়াতে দেখেও ঘরের ভেতরের ওদের প্রেম-লীলার অবসান হচ্চে না—তার কারণ ওরা এখনো জানে না যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন। যে কথা মেরীকে বলবার জন্য তিনি এত ব্যস্ত হয়েছিলেন—অতঃপর আর সে কথা তাকে বলবার জন্য কোন আগ্রহই মনে জাগল না তাঁর। অজানিতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে গেল তাঁর—যখন তিনি দেখলেন যে মেরীর মুখচোখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেচে এবং তার তাৎকালিক হাবভাবে যেন মনের আশা আনন্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেচে তার আচারে আচরণে। যাজকের মনে পড়ে গেল—এই মেরীর জন্যই তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বুঝলেন যে ঐ যুবককে পাবার পথে বাধা ছিল বলেই মেরী অন্তরে বেদনা বোধ করতেন—সে বেদনা তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে ফুটে বিভ্রম জাগিয়ে দিয়েচে তাঁর নিজের মনে কয়বার। নিজের মনে তাঁর ধিক্কার বেজে উঠল এবং আর সেখানে না দাঁড়িয়ে পাশের সিঁড়ি দিয়ে যাজক বরাবর ছাদের ওপরে উঠে গেলেন। এই ছাদ একদিন তাঁর অতি প্রিয় বিশ্রাম স্থান ছিল। ছাদের পূর্ব্বদিকের সুউচ্চ গম্বুজের চূড়ায়—যার মাথার ওপরের উদার আকাশ আর নীচের চার পাশের বিচিত্র প্রকৃতির বিরাট চিত্র দেখতে তাঁর বড় ভাল লাগত এবং সেই অপূর্ব্ব ছবির অন্তরের সৌন্দর্য্য তিনি ছাদের ওপরে উপবিষ্টা মেরীকে সমঝে দিতে চেষ্টা করতেন। তাঁর শত অনুরোধেও মেরী যে গম্বুজের চূড়ায় উঠতে সম্মত হন নি এবং সেই না ওঠার জন্য কি যে তিনি হারালেন সেই কথাই ভদ্রলোক বুঝিয়ে দিতে চাইতেন মেরীকে। বহুদিন পরে সেদিনও তিনি সেই গম্বুজের চূড়ায় উঠে গেলেন এবং একবার মাত্র চারদিকে চেয়ে নিমেষের মধ্যে সেই পরিব্যাপ্ত অসীমের অঙ্কে—মায়ের কোলে যেমন শিশু ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ভাবে—ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

চারদিক থেকে লোকজন সব হাঁ হাঁ করে এসে পড়ল, কিন্তু কোন উপকার কেউ তারা করতে পারল না ভদ্রলোকের—কারণ এত উঁচু থেকে নীচের কঠিন পাথরের ওপরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাজকের প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল—প্রাণহীন চূর্ণবিচূর্ণ তাঁর দেহমাত্র সেখানে পড়েছিল।

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সমবেত সকলে তাদের প্রিয় যাজকের কথা আলোচনা করছিলেন। তাঁর সেই অকাল-মৃত্যুর জন্য সকলেই তাঁরা অন্তরে বেদনা বোধ করছিলেন এবং সে বেদনা তাঁরা বেশি করে অনুভব করছিলেন এই জন্য যে অন্ধ হওয়ার জন্যই ঐ ভাবে ভদ্রলোকের প্রাণান্ত হল—চোখে দেখতে পেলে আর এ অঘটন ঘটতে পেত না।*

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

ভারতের বহির্বাণিজ্য

'কৌটিল্য'

ভারত এ পর্য্যন্ত বিশ্বের বাজারে কাঁচামাল সরবরাহ করে আসছে। কাঁচামাল সরবরাহ করা চলতে পারে দুই কারণে, প্রথমতঃ নিজেদের শিল্প কারখানার প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হলে, দ্বিতীয় কারণ হতে পারে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভাবের ফলে দেশের কাঁচামালের বিনিময়ে বিদেশ থেকে শিল্পজাত সামগ্রী আনার জন্য। প্রথম অবস্থায় মোটামুটি বুঝা যায় দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৌলত উৎপন্ন হচ্ছে; সুতরাং সে দেশের বহির্বাণিজ্য আয়ত্তাধীন ও লাভজনক। আর দ্বিতীয় অবস্থা যে দেশে বর্ত্তমান সে দেশ বাণিজ্য ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী, শিল্পজাত নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর জন্য তাকে সর্ব্বদাই বিশ্বের বাজারে ফিরতে হয়, আর স্বদেশের এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তাকে নিজের কাঁচামাল অলাভজনক সর্তে ছাড়তে হয়। ভারতের অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে রয়েছে। যে কারণে ভারতের এ অবস্থা হয়েছিল তা আজ দূর হয়েছে। পরাধীনতার আকাশভেদী প্রাচীর আজ ধূলিসাৎ, স্বাধীন ভারত বিশ্বের দরবারে আজ উপস্থিত।

জাপান ও জার্মানী আজ বিশ্বের ব্যবসায়বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে সরে পড়াতে শিল্পজাত সামগ্রী চালাবার যোগ্য বিশাল বাজার ফাঁকা পড়ে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, মলয়, প্রভৃতি স্থানে, মধ্য-প্রাচ্যে মিশর প্রভৃতি দেশে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় শিল্পজাত সামগ্রীর অফুরন্ত চাহিদা মেটাবার যোগ্য ব্যবসায়ী আজ নেই। এ যাবৎ আমাদের দেশ থেকে পাট, তুলা, চা, তৈলবীজ, চামড়া, লাক্ষা এবং অন্যান্য কৃষি ও খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়েছে। বিনিময়ে আমরা অধিকমূল্যে কাপড়, জুতা, তেল ও অন্যান্য অনেক জিনিষ আমদানি করেছি। আজ এই অবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। পাটের ব্যবসা ভারতের (পাকিস্থান সহ) একচেটে। তুলা এদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন হয়, ইচ্ছা করলে এই উৎপাদন আরও বাড়ান যেতে পারে। লাক্ষা ব্যবসায়ও ভারতের একচেটে। টাটা কোম্পানী ও বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান নিজ চেষ্টায় (এ যাবৎ সরকারী বিরোধিতা সত্ত্বেও) যেরূপ সাফল্য লাভ করেছে তাতে এদেশে খনিজ, রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধনের উপযুক্ত সামগ্রী ও সুযোগ আছে প্রমাণ হয়েছে।

১৯৪৬ সালে বহির্বাণিজ্যে মোট ৩০৩'৬ কোটি টাকার মাল এদেশ থেকে রপ্তানী হয়েছে। আর খাদ্যশস্যও (সরকারী খাতে আমদানী মাল বাদে) ২৬২'৬ কোটি টাকার বিদেশ থেকে খরিদ করা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে রপ্তানী ও আমদানির অনুরূপ অঙ্ক যথাক্রমে ২৪০'৬ কোটি টাকা ও ২৪১'৩ কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৯৪৫ সালে আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা ৭০ লক্ষ টাকা অধিক হয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালে রপ্তানি আমদানী অপেক্ষা ৪১ কোটি টাকা অধিক হয়েছে। দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ১৯৪৬ সালে পূর্ব বৎসর থেকে একটু ভাল হয়েছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে যে ১৯৪৬ সালে প্রায় ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ও ২০ কোটি টাকার সরকারী প্রয়োজনীয় বস্তু (রেলওয়ে ষ্টোর, ষ্টেশনারি ইত্যাদি) আমদানী করা হয়েছে যার হিসেব এতে নেই। সুতরাং মোট হিসেবে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালে আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা ৮০ কোটি টাকা অধিক হয়েছে। এই অবস্থা দেশের পক্ষে বড়ই হানিকর।

এতবড় একটা দেশ আমাদের, যার বিশাল জনবল ও বস্তুসম্ভার মজুত, আর যার চারি পাশে এশিয়ার বৃহৎ বাজার পড়ে রয়েছে—তার বহির্বাণিজ্যে রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হওয়া মোটেই উচিত নয়। এশিয়ার বাজারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আজ নিবদ্ধ। লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্র আমেরিকা অনেকদূর এ বিষয় অগ্রসরও হয়েছেন ইতিমধ্যে। আর আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির যে সব কল্পনা হচ্ছে তা সম্ভব শুধু আমাদের বহির্বাণিজ্যে আদান প্রদানে প্রচুর অর্থ আমাদের অনুকূলে উদ্বৃত্ত থাকলে। অনেকেরই এখন ভুল ভেঙ্গেছে—যে ষ্টার্লিং পাওনা আমাদের যুদ্ধের বাবদ জমেছে বলে আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম তা প্রকৃত হিসেবে ভুয়া। অধ্যাপক বি, আর, সিনয় তাঁর 'Starling assets of the Reserve Bank of India (1946) নামক গ্রন্থে সকল প্রকার হিসেব দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে মোট পাওনা ও দেনা ধরলে ভারত আজও ঋণগ্রস্ত। এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে—যে ষ্টার্লিং পুঁজি যুদ্ধের জন্য ভারতের জমেছে তার জন্য আমরা কেবল বাংলা থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ নরবলি অর্পণ করেছি ১৯৪৩,৪৪ সালের দুর্ভিক্ষে—আরও অগণিত নরনারীকে অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন রেখে যুদ্ধের রসদ জুগিয়েছি সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্রে। আজ সেই অজস্র প্রাণের, অপরিমেয় লাঞ্ছনার বিনিময়ে অর্জিত অর্থ যেমন তেমন ভাবে আমরা বিলিয়ে দিতে পারি না। কিন্তু আদবে হচ্ছে তাই। কোটি কোটি টাকা প্রতিদিন বেরিয়ে যাচ্ছে—বাইরে থেকে তিনগুণ চারগুণ মূল্যে খাদ্যশস্য আমদানী করতে। এ ছাড়া আরও কত অছিলা রয়েছে, বিদেশে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্য যাচ্ছেন, তাঁদের সকল খরচ এই ষ্টার্লিং পাওনা থেকে কাটা হয়। এঁরা আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কারখানায় শিল্প ও তৎসংক্রান্ত গবেষণামূলক শিক্ষালাভ করছেন। কথা হচ্ছে অচিরে শিক্ষালাভ করে যখন এঁরা দেশে ফিরে আসবেন তখন কাজ আরম্ভ করবেন কোথায়? দেশে উপযুক্তরূপ কারখানা ও গবেষণাগার কোথায়? আমাদের আশা ছিল—বহির্বাণিজ্যের স্রোত আমরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করব যাতে আমাদের আমদানি ও রপ্তানির

সাম্য অন্ততঃ বজায় থাকে এবং ষ্টার্লিং পুঁজির বিনিময়ে যাতে আমরা বিদেশ থেকে উৎপাদক কলকব্জা (Capital goods) আমদানি করে অচিরে দেশের শিল্প :শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারি। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। দেশে জমি পড়ে আছে, কতক অঞ্চলে অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ½ অংশ ফসল জন্মে, বাকী অঞ্চল একেবারেই অজন্মা হয়ে থাকে; প্রয়োজনের অতিরিক্ত তুলা আমরা উৎপন্ন করি তবু আমাদের ঘরের মেয়ে সেদিনও বিবস্ত্র থাকার লজ্জায় আত্মহত্যা করলো। ১৯৪৪, ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে আমদানী মাত্র কয়েকটি বস্তুর মূল্যের পরিমাণ পরীক্ষা করলেই বুঝা যাবে যে কিরূপ অহেতুক ও অনুৎপাদক সামগ্রী অগ্নিমূল্যে আমরা গ্রহণ করছি—

	১৯৪৪	১৯৪৫	১৯৪৬
যানবাহন (মোটর সাইকেল ইত্যাদি)	১°৪৪ কোটি টাকা	৭°৪৭ কোটি টাকা	১২°৯৩ কোটি
বাসন ছুরি কাঁচি ইত্যাদি	৬°৪৯ কোটি টাকা	—	১৪°৩৪ কোটি
মদ্য	—	১°৬৩ কোটি টাকা	৬°৬২ কোটি

এ সম্বন্ধে স্মরণ রাখতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার বহুবিধ বাধা নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ কমবেশি রাখা সত্ত্বেও বাণিজ্যের হাল এই।

কোন দেশের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা ভাল মন্দ বুঝবার আর একটি মাপকাঠি হলো—আমদানী ও রপ্তানী সামগ্রীর দামদস্তুর সুবিধাজনক রাখবার ক্ষমতা। কোন বস্তুর দাম সর্বদাই উৎপন্ন মালের পরিমাণ ও চাহিদার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। বাজারে যখন মাল কম ও চাহিদা তদনুপাতে খুব বেশি, তখন আমরা অধিকমূল্যে জিনিষ কিনতে বাধ্য হই; আর গরজের চাপে নিজের ঘরের জিনিস কম মূল্যে বিক্রয় করতে হয়। ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঠিক এই অবস্থা বর্ত্তমান। ১৯৩৯ দ্রব্যমূল্যকে ১০০ ধরলে তুলনায় ১৯৪৩ সালে আমাদেশ দেশের মাল আমরা ১৩৩ থেকে ১৩১ মূল্যে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, আর এই বৎসর বিদেশ থেকে ১৪৫ থেকে ২০০ মূল্যে মাল আমদানি করতে হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে আমরা সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্তে পৌঁছি তা এই যে—খাদ্যশস্য আমদানি অচিরে আমাদের বন্ধ করতে হবে, তাতে ১০০ কোটি টাকা বেঁচে যায়। উপযুক্ত বিনিময়ে টাকা আমাদের বাড়তি হলে ইচ্ছানুরূপ সে টাকা আমরা কাজে লাগাতে পারব। সুতরাং বহির্বাণিজ্য গড়ে তুলবার প্রধান ও প্রথম সোপান হবে—প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে দেশে মিটাবার জন্য খাদ্য শস্যের উৎপাদন অবিলম্বে বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সঙ্ঘ (International Trade Organisation) যুদ্ধকালীন বাণিজ্যের বাধা-নিষেধ স্থল বিশেষে হ্রাস করা ও তুলে দেওয়ার চেষ্টা দেখছেন। ভারত আরও ১৫টি জাতির সঙ্গে জেনেভাতে সম্প্রতি এক বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। হাভানাতে সঙ্ঘের পুনঃ বৈঠক নবেম্বর মাসেই (১৯৪৭) হচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধিগণ (বাণিজ্য-সচিব প্রমুখ) নিশ্চয়ই এ দেশের ন্যায্য স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখবেন। জেনেভার চুক্তির ফলে ভারতকে আমদানী মালের উপর বছরে প্রায় ৩১ কোটি টাকা শুল্ক হ্রাস করতে হবে; আর বিনিময়ে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা আয় হবে—এ দেশ থেকে রপ্তানী মালের উপর বিদেশে শুল্ক হ্রাস হওয়ার ফলে।

কবি কুমুদরঞ্জন প্রশস্তি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কুমুদ-রঞ্জন কবি, যবে রবি অপশ্রিয়মান
মলিন নলিনী দলে ফুটাইলে হসিত কুমুদ,
বঙ্গের সরসী জলে, মজাইলে বিদ্বান বিবুধ
কৌমুদী প্লাবনে তব, কেহ মগ্ন কেহ মজ্জমান।

'বন-তুলসীর' কবি পল্লী বন-মল্লী তব প্রাণ
ভুঁই-চাঁপা, স্বর্ণ-চাঁপা, ফুটাইয়া তুলিলে অর্ব্বুদ
গদ গদ কণ্ঠে তব গান নহে আনন্দ বুদ্বুদ
পল্লীর স্বভাব-কবি ভাগবত ভাবাতুর প্রাণ।

ওগো মাঝি তরী তব ভেসে চলে ভরানদী মাঝে
শিথিল বকুল ঝরে, চিতাপরে সে কোন বধূর
আজো তার কাঁকনের রিনিঝিনি কর্ণে যেন বাজে
ম্লান সন্ধ্যা ব্যথাতুর, অবিস্মরণীয় সে মধুর।

উজানি জাহ্নবী নীরে 'অজয়ে'র হে অজেয় কবি!
কবিকঙ্কণের তীর্থে লোচনের মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি।
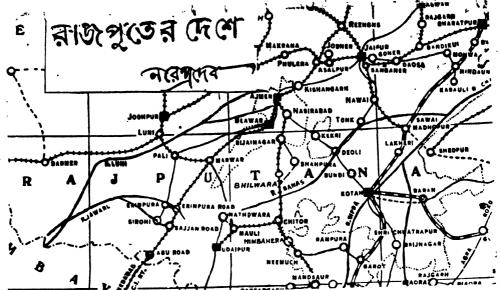
রাঠোর বংশীয় রাজপুতেরাই যোধপুরের অধীশ্বর। কাজেই যোধপুরে রাঠোরদেরই প্রাধান্য। এই রাজবংশের ইতিহাস রীতিমতো রোম্যান্টিক। আমি অবশ্য ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসে ইতিহাস আওড়াতে চাইনি। তবে সংক্ষেপে একটু বললে বোধ হয় এ দেশটাকে ও জাতকে বোঝা সকলের পক্ষে সহজ হবে। যোধপুরের প্রতিষ্ঠাতা

যোধপুর দুর্গ

রাওযোধা থেকেই আরম্ভ করা যাক। রাওযোধা ছিলেন রাও রণমলের জ্যেষ্ঠপুত্র। রাও রণমল মেবারের একচ্ছত্র অধিপতি হবার লোভে চিতোর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শিশু রাণাকুম্ভকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই হত হন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে মাণ্ডোরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। কিন্তু যুবরাজ রাও যোধার সাহস ও বীরত্বের গুণে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠানের পাঁচ ছ' বছর পরে পুরাতন রাজধানী মাণ্ডোর পরিত্যাগ ক'রে যোধপুরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যোধপুর শাসন করে ১৪৮৮ খৃঃ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ১৪টি পুত্র ছিল। এঁদের সকলের বিবরণ জানবার প্রয়োজন নেই। তবে এঁরই ষষ্ঠ পুত্র বীকা রাজপুতানার বীকানির রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং এরই প্রপৌত্র রাও জয়মল্ল ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে আকবরের আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করবার জন্য শৌর্যবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। যোধপুরের আর এক রাঠোর বংশীয় বীরনৃপতি রাও গঙ্গা ১৫২৭ খৃঃ অব্দে বাবর কর্তৃক মেবার আক্রমণের সময় রাণা সংগকে সর্ব্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ১৫৩২ খৃঃ অব্দে রাও গঙ্গার পুত্র রাওমল্লদেব যোধপুরের রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতির মুখবন্ধে মীরহাদী লিখেছেন যে এঁর রাজত্ব কালেই মেবার তার বীরত্ব গৌরবের চরম শিখরে উঠেছিল। মল্লদেবের সৈন্য-বাহিনীতে প্রায় আশী হাজারের উপর শুধু অশ্বারোহী সেনাই ছিল। তা ছাড়া পদাতিকের সংখ্যা ছিল অগণ্য। চিতোর রাণাদের অপেক্ষাও

এঁর শক্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ফেরিস্তার মতে রাওমল্লদেবই ছিলেন তখন হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী নৃপতি। তাঁর রাজ্যসীমা আগ্রা ও দিল্লীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পাঠান বীর শেরসাহ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে পলাতক হুমায়ুন মল্লদেবের শরণাপন্ন হয়ে একটু নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু মল্লদেব বীরধর্ম অমান্য করে—এই বিপন্ন শরণাগতকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন—তিনি বিধর্ম্মী নৃপতি বলে। কিছুদিন পরেই শেরশাহ রাও মল্লদেবের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হয়ে কোনও রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন। পরে অবশ্য শেরশাহ রাজ্যের বিভীষণদের সাহায্যে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে রাও মল্লদেবকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং শেরশাহের সঙ্গে তাঁর সন্ধি স্থাপিত হয়।

দুর্গের প্রবেশ পথ

১৫৬১ খৃঃ অব্দে আকবর মেবার আক্রমণ করেন। ১৭ বছর ধরে মোগলের সঙ্গে রাজপুতের যুদ্ধ চলে। মল্লদেবের সুযোগ্য পুত্র চন্দ্রসেন এই যুদ্ধে অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করে বার বার শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করেন। কিন্তু আকবর তাঁর সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে অবশেষে যোধপুরকে পরাস্ত করেন। মল্লদেব এই পরাজয়ে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ চার পাঁচ বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। চন্দ্রসেন পিতৃসিংহাসন পেলেও তাঁকে আকবরের অধীন রাজা হয়েই থাকতে হয়েছিল।

দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদ অঞ্চল

চন্দ্রসেনের পর উদয়সিং যোধপুরের সিংহাসন অধিকার করে নিজেকে 'রাজা' বলে প্রচার করেন। পূর্ব্বপুরুষদের 'রাও' উপাধিটা ইনিই প্রথম বর্জ্জন করে এই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি ভীষণ স্থূলকায় ছিলেন বলে এঁকে রাজ্যের সবাই 'মোটারাজ' বলে উল্লেখ করতো। এঁরই এক ছেলে কিষণ সিং রাজপুতানার কিষণগড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।
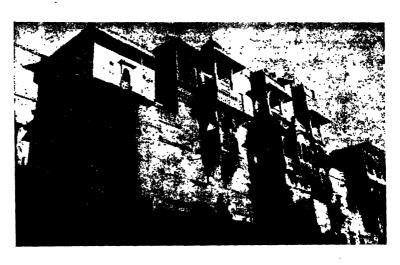
এর পর থেকেই অর্থাৎ ১৫৮৫ খৃঃ অব্দ থেকেই যোধপুর প্রকৃত পক্ষে মোগলের দাস হয়ে পড়ে। কূট রাষ্ট্রনীতিবিদ্ আকবর অসাধারণ কৌশলে এই সিংহতুল্য শক্তিশালী রাঠোর বীরদের বশীভূত করে এদেরই সাহায্যে শেষে সারা রাজপুতানা জয় করেছিলেন। রাজা শূর সিংকে তিনি এক মোগল সেনাবাহিনীর নায়ক করে দিয়েছিলেন এবং তার পিতা বর্ত্তমানেই তাকে 'সবার রাজ' উপাধিতে ভূষিত

যোধপুরী পিতা-পুত্র (দেহাতী রাজপুত)

করেছিলেন। ইনি মোগল বাদশাহ আকবরের সেনাধ্যক্ষ রূপে স্বদেশ-বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ক'রে সিরোহী রাজ্য, গুর্জ্জর রাজ্য ও ধুন্ধুক রাজ্য জয় করে মোগলের অধীনে নিয়ে আসেন। শূর-সিংহের আমলে যোধপুরের অনেক উন্নতি হয়। রাজধানীকেও তিনি সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন।

শূর সিংহের পুত্র গজ সিংহ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মোগল বাদশাহদের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন। দাক্ষিণাত্য জয় করে তিনি সেখানে মোগল বাদ-শাহের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বহু জায়গীর দান করেছিলেন। আগ্রায় এঁর মৃত্যু হয় ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে।

গজ সিংহের দুই বীর পুত্র অমর সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ মোগল যুগের ভারত ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। অমর সিংহ মোগলের দাসত্ব স্বীকারে অসম্মত হয়ে পিতার সঙ্গে উদ্ধত ও অসম্মানজনক ব্যবহার করায় গজ সিংহ তাঁর মৃত্যুর চার বছর আগেই জ্যেষ্ঠ অমর সিংহকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা ক'রে, কনিষ্ঠ যশোবন্ত সিংহকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনিই মোগল যুগের ভারত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর মহারাজ যশোবন্ত সিংহ। ভারতের তথা মোগল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ একাধিকবার মাত্র এঁর অঙ্গুলী হেলনের অপেক্ষায় ছিল। সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারা ও ঔরংজেবের ভাগ্য ছিল একদা এঁরই করতলগত।

ঔরংজেব হিন্দুকে বিশ্বাস করতেন না। যশোবন্ত সিংহকে তিনি রীতিমত ভয় করতেন এবং তাঁর প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। যশোবন্ত সিংহের বিরুদ্ধে ঔরংজেবের বরাবরই একটা তীব্র আক্রোশ ছিল। যদিও গুজরাট, আজমীর, দাক্ষিণাত্য ও কাবুলে পরপর তিনি বাদশাহের প্রতিনিধি রূপে শাসনকর্ত্তার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তবু ঔরংজেব তাঁকে কখনো বন্ধু রূপে গ্রহণ করতে পারেন নি। জামরুদের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। অসামান্য বীরত্বের গুণে যশোবন্ত সিংহই যোধপুরের রাজাদের মধ্যে প্রথম 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

যশোবন্ত সিংহের পুত্র অজিত সিংহের জন্ম হয় পিতার মৃত্যুর পর। এই সুযোগে ঔরংজেব সমস্ত মেবার রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর অজিত সিংহ বয়োপ্রাপ্ত হয়েই পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করেন। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার জন্য তিনি ১৭০৮ খৃঃ অব্দে মেবারের রাণা অমর সিংহ ও জয়পুরের মহারাজা জয় সিংহের

রাণীদের মহল

সঙ্গে একত্র সম্মিলিত হয়েছিলেন। অবশ্য যবনের অধীনতা পাশ থেকে

মুক্ত হবার জন্ত তাঁর এ প্রচেষ্টার মূলে আবাল্যের অভিভাবক, শিক্ষক, রণগুরু, পথপ্রদর্শক ও পরিচালক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহাবীর দুর্গাদাসের প্রভাবই নিহিত ছিল। দুর্গাদাস ছিলেন নিঃস্বার্থ এক দেশ-প্রেমিক, এ'কে মাতৃভূমির মুক্তি-সাধক একজন বীর সন্ন্যাসী বলা চলে। ধন অর্থ যশ মান রাজ্য সিংহাসন কিছুরই প্রতি এঁ'র লোভ ছিলনা। ইচ্ছা করলে অনায়াসে ইনিও একজন রাজপুত সর্দার নৃপতি হ'তে পারতেন। এ সুযোগ ও প্রস্তাব বার বার তাঁর কাছে এসেছিল, বার বার তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে শুধু চেয়েছিলেন—মেবারের স্বাধীনতা।

দুর্গাদাসের মৃত্যুর পর অজিত সিংহকে তাঁর পুত্র ভকত সিং সিংহাসনের লোভে ১৭২৪ খৃঃ অব্দে হত্যা করে। সিংহাসনের জন্য হত্যা, ষড়যন্ত্র, বিষপ্রয়োগ, বিদ্রোহ, রাজোয়াড়ার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। কতরাণী ও রাজকুমারীদের অবৈধপ্রেম ও স্বৈরাচার রাজস্থানের অন্তঃপুরকে নিন্দনীয় করেছিল মোগল হারেমের রংমহলের কুৎসার চেয়েও। এরপর ব্রিটিশ বিজয় পর্য্যন্ত প্রায় এক-শতাব্দীকাল রাজপুতানার ইতিহাসে শুধু গৃহযুদ্ধ, মহারাষ্ট্রীয়দের সংগে অবিরত সংঘর্ষ এবং পরাজয়, আর আমীর খাঁর আক্রমণে বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল এক জাতীয় অধঃ-পতনের ইতিহাস। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে রাঠোর বংশের শেষ নৃপতি মহারাজা মান সিং ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে আত্মরক্ষা করেন।

দুর্গপ্রাকারে সজ্জিত কামান শ্রেণী

যোধপুর যাদুঘরের সম্মুখে (আমরা ও মিঃ গুপ্ত)
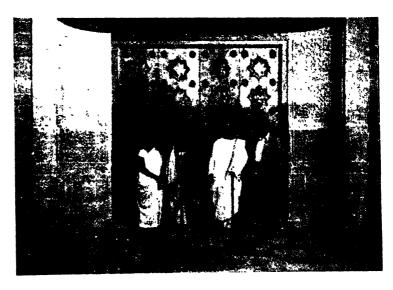
ইনি নিঃসন্তান মারা যান। আহম্মদনগরের মহারাজা তক্ত সিং তাঁর পোষ্যপুত্র রূপে যোধপুর সিংহাসনে বসেন। এঁ'রই আমলে সিপাহী বিদ্রোহ বা ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু ইনি সে যুদ্ধে যোগ না দিয়ে ইংরাজদেরই সাহায্য করেন এবং যোধপুর দুর্গের মধ্যে পলাতক ইংরাজ রাজপুরুষদের আশ্রয় দিয়ে তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করেন। সম্বর হ্রদের তীরবর্ত্তী যে অংশ যোধপুরের অধিকারে ছিল ইনিই সেটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে লীজ দিয়েছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আত্মযোগ

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ, রায়বাহাদুর

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অভ্যাসযোগ বা আত্মসংযমযোগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যোগটি যে সকল যোগের মূল তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ মনঃসংযম সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পক্ষেই একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ইন্দ্রিয় দুর্বার, মনের গতি স্বভাবতঃই চঞ্চল, বায়ুকে বশীভূত করা যেরূপ কঠিন, ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিবেকের অধীন করা তদপেক্ষাও দুষ্কর। অর্জুনের এইরূপ উক্তির উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সত্যই মনকে বশে আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন। মনকে যিনি বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনি প্রকৃত যোগী। তিনিই শান্তির অধিকারী হইতে পারেন, অপর কেহ নহেন। এই মনঃসংযম, যাহার উপর সমস্ত সুখশান্তি ও পরিণামে ব্রহ্মনির্বাণ নির্ভর করিতেছে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে সেই বিষয়ের অতি সুন্দর আলোচনা করা হইয়াছে।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।

যে ব্যক্তি আত্মসংযম লাভ করে নাই, যোগ তাহার পক্ষে দুর্লভ, ইহাই শ্রীভগবানের অভিমত।

সংসারে নিত্যনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনও কার্যে উন্নতি লাভ করিতে হইলে চাই সাধনা। ছাত্র তাহার অধ্যয়নে, ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ে, তপস্বী তাঁহার তপস্যায় যদি একান্ত ভাবে মন নিয়োজিত করিতে না পারেন, তবে সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। এমন কি যাহারা অবাঞ্ছিত কর্মে লিপ্ত, তাহারাও যদি কোন একটি নিয়ম মানিয়া না চলে, তাহা হইলে তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সর্ববিধ উন্নতি, সফলতা ও চরিতার্থতা নির্ভর করে মনঃসংযমের উপর। ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে চিত্ত কর্ণশূন্য অর্ণবপোতের মত তরঙ্গবাত্যাতাড়িত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি ইহার অর্থ এমন নহে যে, আমরা এখন হইতে প্রত্যেকের মর্জিমত যাহা খুসী করিতে পারিব, এখন আর আমাদের ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে কেহই নাই। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যখন বহুদিন পরে স্বাধীনতা করতলগত হইবার সম্ভাবনা আসিয়াছে, তখন এই ধারণাকেই দৃঢ় ও স্থায়িভাবে অবলম্বন করিতে হইবে যে কঠোরতর শৃঙ্খলা, সুদৃঢ় আত্মসংযম ও আত্মত্যাগ আবশ্যক হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে রাশিয়ার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন এবং মনে ভাবেন যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীর কৃষক এবং শ্রমিকেরাও সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার চরম ফল উপভোগ করেন। কিন্তু এই ধারণা যে কত বড় ভুল, তাহা সোভিয়েট রিপাব্লিকের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা স্বল্পমাত্র পরিচিত তাঁহারাও জানেন। সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হইতে হইলে অনেক নিয়মকানুন পালন করিতে হয়। সে সমস্ত নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোর। কাজেই অনেকের পক্ষে উহা সর্বতোভাবে পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। সেজন্য একদল সরকারী লোক আছে যাহারা দেখে কে কে নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছে। এই সকল নিয়মলঙ্ঘনকারীদিগের সদস্যপদ বাতিল করা হয়। ১৯৩৩ সালে এই পার্টির সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ; কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যে এই সংখ্যা ২০ লক্ষে নামিয়া আসিল। অর্থাৎ ইতিমধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক সদস্যকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। নূতন সদস্য লইয়া তবে বিশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশে যত রাষ্ট্র আছে, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিয়মের কড়াকড়ি এই নূতন সোভিয়েট রাষ্ট্রে। ইহা অসংকোচে বলা যাইতে পারে, যত দিন এই নবগঠিত নূতন প্রণালীর রাজ্যে জনগণ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকিবে, ততদিন এই রাজ্যও থাকিবে। নিয়মশৃঙ্খলা শিথিল হইলে ইহা অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া যাইবে।

তাই বলিতেছিলাম যে, আত্মসংযমের প্রশ্ন যে কোন উচ্চ চারিত্রিক ভূমিতেই আবশ্যক তাহা নহে। বর্তমান নূতনতম রাষ্ট্রসমূহেও রাজনীতিক ও সামাজিক প্রয়োজনেও ইহার আবশ্যকতা অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

গীতায় এই প্রশ্নটি যে ভাবে উত্থাপিত হইয়াছে এবং যে ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই কথাই মনে হইবে যে, উচ্চতম আদর্শের জন্যই যে কেবল আত্মসংযমের প্রয়োজন, তাহা নহে। অতি সামান্যভাবে জীবনধারণ করিতে হইলেও ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানবসাদয়েৎ।

আত্মাকে দিয়াই আত্মার উদ্ধার সম্ভব, অন্য কোনও কিছুর দ্বারা নহে। সংসার সাগর হইতে উদ্ধার পাওয়া না পাওয়া তোমার আমার নিজেরই উপরে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আত্মাকে অবনমিত করিবে না, আত্মাকে অধোগামী হইতে দিবে না, অবসন্ন হইতে দিবে না। কারণ আমি আমার উদ্ধার সাধন না করিলে, আর কেহই আমাকে তুলিতে পারিবে না। আমিই আমার বন্ধু, আমিই আমার শত্রু।

আত্মৈব আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

এমন কথা, এমন স্পষ্টভাবে আর কোথাও কেহ বলিয়াছেন কি না জানি না। এই সরল সার্বজনীন সত্যের সহিত বাইবেলের Sermon on the Mount-এর তুলনা হইলেও হইতে পারে। নিজের পায়ে দাঁড়াইতে, নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে যদি শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে গীতার ঐ একটি শ্লোকই লক্ষ শ্লোকের সমান মূল্যবান।

নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু এই কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে গিয়া গীতা বলিতেছেন: তোমার অবশীকৃত, অজিত, অসংযত আত্মাই তোমার শত্রু, আর বশীভূত হইলে আত্মার ন্যায় বন্ধু আর নাই।

আত্মা অর্থে এখানে মন, বিবেকবুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় গ্রাম সকলই বুঝাইতেছে। মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণ এবং বিবেকের দ্বারা মনের বা চিত্তের বিক্ষোভদমন—ইহাই আত্মযোগ বা অভ্যাসযোগের মূলকথা। গীতা বলেন: দেহাদি গ্রাহ্যপদার্থ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম শ্রেষ্ঠ; মন এই ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং মন হইতে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি—সদসৎ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান—সাধারণ কথায় যাহা বিবেক নামে পরিচিত। মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে আত্মসংযম-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। বাহিরের কর্ম বা অনুষ্ঠান সংযত করিলেই আত্ম-সংযম হইল না। একথা গীতা অতি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন:

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
গীতা—তৃতীয় অধ্যায়

যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্‌পাণি প্রভৃতির নিগ্রহ করিয়া ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের ভাবনা করে, সেই বিমূঢ় কপটাচারী বলিয়া পরিগণিত হয়।

কিন্তু প্রকৃত আত্মসংযম অর্থে কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়—উভয়ের সংযম। যাহারা বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় কখনও প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিচালিত হয় না, তাহারাই আত্মসংযমী, যতাত্মা বা যোগী। এইরূপ যোগী তপস্বী বা তপোনিষ্ঠ ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতেও আত্মসংযমী উৎকৃষ্ট। ইহাই গীতার অভিমত।

এই আত্মসংযমের ভারকেন্দ্র কোথায়? অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও তাহার একান্ত নিরোধ এই উভয়ের মধ্যে যে সুস্থ, সবল স্বাভাবিক মাত্রাজ্ঞান, তাহা কিরূপে লাভ করা যায়? ব্যাপার এই যে, আত্মসংযমের নামে প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন উপদিষ্ট হয় নাই। কেহ ইচ্ছা করুক আর না করুক, প্রবৃত্তির বশে, প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাকে কর্ম করিতেই হইবে। অতএব স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিয়া এমন একটি মাত্রা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে কর্মপ্রেরণাময়ী প্রবৃত্তিও একান্তভাবে নিরস্ত না হয়, অথচ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে এমন একটি সামঞ্জস্য থাকে যাহা আত্মাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সাধনায় অনুপ্রেরণা দিতে পারে। সেই জন্য গীতায় এই আত্মসংযমের মূলকেন্দ্র হইতেছে সমতা বা সাম্য। উচ্ছৃঙ্খলতা দূষনীয়, কঠোরতাও বর্জনীয়, মধ্যপন্থাই শ্রেয়ঃ। এরিষ্টটল্ ইহাকেই বলিয়াছেন Golden mean, বৌদ্ধেরাও এই মধ্যপন্থার গুণগান করিয়াছেন।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।

যিনি নিরাহারী, তাঁহার পক্ষে যোগসাধন কঠিন, আবার অতিরিক্ত ভোজীর পক্ষেও সহজ নহে। যাঁহারা মিতভোজী, এমন কি নিদ্রাও জাগরণ ব্যাপারেও মিতাচারী, তাঁহাদের পক্ষেই আত্মসংযমযোগ সুখলভ্য। 'যুক্তাহার বিহারস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।' আহার বিহার সমস্ত কর্মে যাহার সংযম, যোগসাধন তাহারই পক্ষে সম্ভব।

একটি প্রচলিত ধারণা আছে যে, ভারতবর্ষের সাধনা সন্ন্যাসের আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়াছে। বস্তুতঃ সাংখ্যযোগীরা কর্ম-বর্জন করাকেই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি সাধন করিতে হইবে, প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ করিতে হইবে, সংসার হইতে পলায়ন করিতে হইবে। গীতা এরূপ Escapism সমর্থন করেন না। আত্মনিগ্রহ বা একান্তভাবে আত্মনিরোধ এবং আত্মজয়—এতদুভয়ের মধ্যে আত্মজয়কে শ্রেয়ঃ বলিয়া গীতা গ্রহণ করিয়াছেন।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।

যিনি আত্মাকে জয় করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপার বশে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে এবং সেই চিত্তে ভগবানের অধিষ্ঠান হয়।

সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু এই প্রবৃত্তি দুষ্পূরণীয়—ইহার তৃপ্তি সম্ভব নহে। সীমার মধ্যে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা কঠিন। বায়ু সহযোগে অগ্নি যেমন ক্রমেই লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া সমস্ত পোড়াইয়া ছারখার করিবার জন্য অগ্রসর হয়, আমাদের কামনা বাসনা রাগদ্বেষ সেইরূপ সংযমের সীমা হইতে মুক্ত হইয়া মহা অমঙ্গলের সৃষ্টি করে। বহ্নি যেমন ধূম্রে আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন আগন্তুক মলিনতার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, মানুষের জ্ঞান সেইরূপ কামক্রোধের দ্বারা আবৃত থাকে। কাম এবং ক্রোধ একই; কাম-কামনা বাধা পাইলেই ক্রোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

কিন্তু মানবসমাজ এই সুপ্রাচীন সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। ভগবদ্গীতায় যে সত্য প্রচারিত হইয়াছে, পাশ্চাত্য জগতেও তাহা প্রাচীন কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এমন কি প্রাচীন সুখবাদী দার্শনিকগণ (Epicureans) পর্য্যন্ত ঐহিক সুখের তারতম্য বিচারে আত্মসংযমের মূল্য মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল কি হইল? ইয়ুরোপীয় বা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাধারণতঃ জড়বাদ-প্রধান বলা হয় এবং আমাদের প্রাচ্য সাধনাকে বলা হয় অধ্যাত্মবাদ-প্রধান। আমার বোধ হয় এরূপ শ্রেণীবিভাগের কোনও অর্থ নাই। ঐহিক সুখবাদ যদি জড়বাদের পরিণাম হয়, তবে তাহা আমাদের দেশে কিছু কম নাই। আদর্শের দিক দিয়া পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কোন পার্থক্যই নাই। কার্য্যক্ষেত্রে এই আদর্শের অনুসরণ উভয়ত্র ব্যর্থ হইতেছে—কোনও দেশে কম, কোন দেশে বেশী—এই মাত্র প্রভেদ। বস্তুতঃ আমরা যদি আমাদের আধ্যাত্মিক প্রবণতার দোহাই দিয়া প্রকৃত সাধনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকি, তবে আমাদিগকে পরিণামে অনুশোচনা করিতে হইবে, ইহা স্থির। বরং ইহা স্বীকার করাই ভাল যে, আদর্শ সম্বন্ধে সেই সুপ্রাচীনকাল হইতে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও, আত্মসংযমের গৌরবলাভ করিয়াও, আমরা কৃতকৃতার্থ হইতে পারি নাই। আমরা প্রবৃত্তির তাড়নায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছি। হয়ত জীবন-সংগ্রামের ক্রমবর্দ্ধমান কঠোরতা ইহার একটি কারণ। কিন্তু এই অবস্থার

ব্যাপকতায় যত আমরা সংযম হারাইতেছি, মনের বল হারাইতেছি, বিষয়-সুখের সন্ধানে অন্ধের মত ছুটিতেছি, ততই অন্নসঙ্কট ভীষণ হইতে ভীষণতররূপে দেখা দিতেছে। নহে কি? ফলে সাম্প্রদায়িক কলহ তীব্র হইতেছে, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রাণান্তকর যুদ্ধ বাধিতেছে এবং শান্তি ফানুষের মতো হাওয়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ ক্রমেই অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে। পুনরায় কোনও ব্যাপক যুদ্ধ বাধিলে আর যাহাই থাক্, বিশ্বে মানুষের অস্তিত্ব লোপ হইবে এবং সেরূপ বিশ্বসমরের সম্ভাবনা দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে, একথা আর অস্বীকার করা যায় না।

এখন উপায় কি?—তাহাই প্রশ্ন।

কাম, ক্রোধ এবং লোভ—ইহারাই মানুষের পরম শত্রু।

ত্রিবিধং নরকস্যেদংদ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥

—গীতা ১৬ অঃ। শুধু গীতায় কেন? পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই এই সত্য স্মরণাতীত কাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কোন একটি সত্য সর্বজনবোধ্য বা সর্ববাদিসম্মত বলিয়া যে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে বা তাহার উল্লেখ নিরর্থক মনে করিতে হইবে, তাহা কখনও হইতে পারে না। যাহা মৌলিক সত্য, অর্থাৎ যাহার ভিত্তি মানুষের প্রকৃতির সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে অস্বীকার করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। মানুষ সেই আত্মহত্যার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে, এখন পূর্ণাহুতি দিতে মাত্র বাকী।

মানুষের জীবনে দুইটি অর্দ্ধবৃত্ত মিলিত হইয়া একটি পূর্ণবৃত্ত নির্মাণ করিতেছে—তাহার একটি প্রবৃত্তি, অপরটি নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি লইয়া যে বৃত্ত গঠিত হয়, তাহাকে ধর্মচক্র বলা যাইতে পারে। প্রবৃত্তি প্রবলা হইলে নিবৃত্তি নিরুপায় হয়। এতদিন মানুষ প্রবৃত্তির অশ্ব ছুটাইয়া যতদূর যাওয়া যায়, প্রায় তাহার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখন ধীর স্থির ভাবে আত্মসমীক্ষার বলে একবার মোড় ফিরাইতে পারা যায় কিনা দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু সেজন্য যে বৈরাগ্য চাই, তাহা এখন এই ভোগপ্রাচুর্যের যুগে কে স্বীকার করিবে? কিন্তু আত্মযোগ বৈরাগ্য ব্যতীত সম্ভব নহে। প্রবৃত্তিকে পুরামাত্রায় তাহার প্রাপ্য বুঝাইয়া দিব, আত্মসংযমও করিব—ইহা হইতে পারে না। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, মন চঞ্চল, দুর্নিগ্রহ কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তাহাকে দমন করিতে হইবে। মন স্বভাবতঃ যায় অর্থের দিকে, যায় ভোগের দিকে, লুব্ধ হয় প্রকৃতের প্রলোভনে—তাহাকে ফিরাইয়া আনিব কিরূপে? ইহার সমাধানে বলা হইয়াছে যে একমাত্র বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তবিক্ষেপ শুদ্ধ করিতে পারা যায় এবং নিরন্তর তাহা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়সংযম আয়ত্ত হইয়া আসে ইহাই নিবৃত্তি, ইহাই গীতার শিক্ষা। সর্বকালে এই শিক্ষার উৎকর্ষ মানব সমাজে স্বীকৃত হইয়াছে ও হইবে। গীতা যদি শুধু এই চারিত্রনৈতিক শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত হইত, তাহা হইলেও পৃথিবীর ধর্ম-সাহিত্যে ইহা অমরত্বের দাবী করিতে পারিত।

বর্তমান জগতে এই আদর্শের মহিমা স্বীকৃত হইলেও, ইহার অনুসরণ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ বৈরাগ্যের সে সাধনা নাই, নিবৃত্তির স্থান নাই। ভগবদ্গীতা যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তাহার মূল্য আমরা স্বীকার করি নাই। সেই জন্যই মানব-সমাজ চরম দুর্গতির পথে দ্রুত ধাবিত হইতেছে। কিন্তু গীতার উপদেশ অনুসারে কর্ম করা কঠিন নহে। কারণ গীতা কর্মকে বর্জন করিতে বলেন না, প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে বলেন নাই। প্রবৃত্তি-নিচয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অনুশীলন-পূর্বক চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, সমস্ত কর্মফল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করাই গীতার উদ্দিষ্ট।

ভারতবর্ষের গণচিত্ত যে এই পবিত্র আদর্শের প্রতি এখনও পক্ষপাতী, ইহাই আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য-নিদর্শন বলিতে হইবে। এখনও এদেশে মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, যাঁহারা প্রতিকূল আবেষ্টনীর মধ্যেও সেই প্রাচীন শাশ্বত ধর্মের পতাকা ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া জগতের বিস্ময়স্তব্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করেন। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে। শ্রীচৈতন্যের ন্যায় সংসারের সুখভোগ তুচ্ছ করিয়া তিনি বহুদিন এক সুদূর সমুদ্রতীরে গিয়া নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়া সাধনা করিতেছেন। তাঁহার সেই মৌন সাধনার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বিশ্বের নরনারী স্রোতের ন্যায় পাণ্ডিচেরির সমুদ্রোপকূলের অভিমুখে চলিয়াছে। সে সাধনার কিছু বুঝি বা না বুঝি, তাঁহার সেই শান্ত, সমাহিত, আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট মূর্তি দেখিয়া মনে হইয়াছিল এই ত ভগবদ্গীতার জীবন্ত ভাষ্য! এই কলকারখানাময় দানবপুরীতে বিংশ শতাব্দীতেও মহা-যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট সাত্ত্বিক যোগসাধনার মূর্তিমান বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়! মনে হইল, জীবন্মুক্তির সেই চিত্র:

প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমো ভবেৎ॥

—যোগবাশিষ্ঠ

প্রাণহীন দেহে যেমন সুখ দুঃখের অনুভূতি থাকে না, প্রাণ থাকিতেও যদি সেইরূপ কাহারও হয় তবে তাহাকেই বলা যায় জীবন্মুক্ত পুরুষ।

শ্রীঅরবিন্দের অসামান্য অবদান 'ভাগবত জীবন' (Life Divine), তাঁহার চিন্তাশীলতার অপূর্ব নিদর্শন, 'গীতাভাষ্য' প্রভৃতি ভারতীয় সাধনার সুপ্রাচীন অথচ চিরনবীন আত্মবিকাশ।

স্বামী বিবেকানন্দ যে ভাগবত-জীবনের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তাহারই ধারা আজিও অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় ভারতের অস্থিপঞ্জরের নিম্ন গুহায় প্রবাহিত হইতেছে।
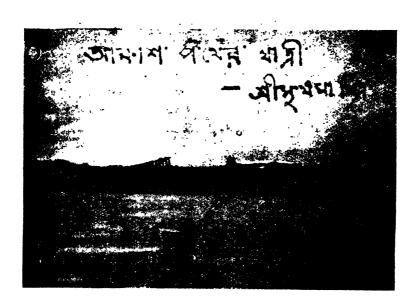
কোথাও কিছু নেই হঠাৎ স্বামী এসে বললেন "বিলেত যেতে হবে ; Dublinএর আন্তর্জাতিক-ধাত্রীবিদ্যা-কংগ্রেস থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে"। কিছুকাল থেকে বিদেশে যাবার কথা হচ্ছিল। কিন্তু এত শীগগির যে যেতে হবে তার জন্ম মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যাহোক যেতে হবে তো হবে। আমার শ্রদ্ধেয়া এক বন্ধু, চলতি ভাষায় তাঁকে আমি দিদিমণি বলি, খবরটা শুনে মহা উৎসাহিত হয়ে বললেন—"শুভস্য শীঘ্রম্। আশ পাশের ভাবনা ছেড়ে অর্ধাঙ্গিনীর অধিকারটা এইসময়ে পুরো বুঝে নাও। এরকম সুযোগ বেশী আসে না" ইত্যাদি। শেষটায় তিনি বললেন "তোমার ভ্রমণের একটা ডায়েরী লিখে নিয়ে এস, উপভোগ্য হবে"। দিদিমণির হুকুম মানবার জন্য সরস্বতী দেবীর অকৃপা উপেক্ষা করেই এই ডায়েরী লেখা।

বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং R. W. A. Cর সদস্যগণের বিদায় অভিবাদন

হিসেব করে দেখলাম তিনমাসে আমরা প্রায় ৩২ হাজার মাইল আকাশপথে বেড়িয়েছি এবং এই ৩২ হাজার মাইল ঘুরতে পৃথিবীর প্রায় সবরকম বিমানেই উড়তে হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে যাত্রা করবার পূর্ব্বেই সুইডেন আমেরিকায় কয়েকটি য়ুনিভারসিটি থেকে ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্ম আমার স্বামী ডাঃ মিত্রের কাছে নিমন্ত্রণ এসেছিল ; সুতরাং আমাদের সুইডেন, ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড, আমেরিকা (পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত) এবং ক্যানাডায় ঘুরতে মোট ১৬খানি বিভিন্ন বিমানে চড়তে হয়েছিল। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই তিন মাসে যতগুলো প্লেন রাস্তায় ভেঙ্গেছে, এক মাত্র যুদ্ধের সময় ভিন্ন আর কখনও এরূপ হয় নি। প্রতিদিনই সকালে খবরের কাগজ খুললে দেখতে পেতাম "Plane orash"। ভালো ভালো কোম্পানীর প্লেন ভেঙেছে এবং তার ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। নেহাৎ বৃহস্পতির জোর ছিল, তাই বোধহয় আমরা বেঁচে ফিরে এসেছি।

কলিকাতা থেকে ২৭শে এপ্রেল রবিবারে আমরা যাত্রা করলাম। ভোর ৬টায় B. O. A. C. কোম্পানীর অফিস ভিক্টোরিয়া হাউসে

মালপত্তর আর নিজেদেরও ওজন নেওয়া হল। ওদেরই কোচে চড়ে এরোড্রমে ৮টার সময় পৌঁছলাম। "যাত্রা সুরু হল এবার ওগো কর্ণধার—তোমারে করি নমস্কার—" আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে যেতে মন কেমন করতে লাগলো। দেশের এই সাম্প্রদায়িক গোলমাল এবং অরাজকতার মাঝে তাঁরা সবাই রইলেন; আমরা চলেছি বহুদূরে।—হয় ত খবর ঠিকমত পাব না। দমদম বিমান ঘাঁটিতে নেমে দেখি, মা ভাই বোন ও R. W. A. C.র কর্মীবৃন্দ আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন। বিমান ছাড়বার সময় অল্পই বাকি ছিল, তাড়াতাড়ি সকলের সাথে দেখা করে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠলাম। বন্ধু বান্ধবের

দমদম বিমান ঘাঁটিতে কন্যা-সহ লেখিকা

কণ্ঠে শেষ সম্বর্দ্ধনা "জয়হিন্দ" শুনে বিমানের ঘরের ভিতরে চলে গেলাম। বিমানটি ছোট, ভিতরে মাত্র ১২ জন যাত্রীর স্থান রয়েছে। আমরা চেয়ারে বসে বসে বেল্ট বেঁধে কানে তুলো দিলাম। চলা সুরু হল। আমি জানালার ধারে বসে সকলকে দেখতে লাগলাম। বিমান-ঘাঁটীর শেষ প্রান্তে এসে ভীষণ জোরে দম দিয়ে গর্জন করতে করতে বিমান আকাশে উঠে পড়লো। চাকা দুটী ডানার ভিতর ধীরে ধীরে গুটিয়ে গেল। আমরা শূন্তে ভাসতে লাগলাম। হঠাৎ আমার শরীরটা কেমন আনচান করে উঠলো। বিশ্রীরকম অস্বোয়াস্তি বোধ করলাম। ঝাঁকুনিতে ও আওয়াজে প্রাণ যায়। নিরুপায় হয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে রইলাম। হাওয়ায় ভেসে চলেছি, কখনও উঠছি কখনও নীচে নেমে পড়ছি।

আমরা ১০০০০ ফিট উপরে উঠেছি, ২৫০ মাইল গতিতে বিমান ছুটে চলেছে। এখানে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশে বিমান তীরের মত বেগে সোজা ছুটে চললো। আমি একটু সুস্থ হয়ে জানালায় তাকিয়ে দেখি নীচে যেন এক পুতুলের দেশ। সহরগুলি দোকানের সাজানো খেলনার মত, পাহাড় যেন মাটির ঢেলা, সুদীর্ঘ নদীগুলি একে বেঁকে 'লতেব তন্বী' হয়ে চলেছে। পাশেই দেখা যায় জিওমেট্রির যন্ত্রে টানা সোজা সরল রেখায় রাজপথ। পৃথিবীর এই নতুন রূপ দেখে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ষ্টুয়ার্ড এসে কাজুবাদাম, পেস্তা, লজেন্স, চুইনগাম আমাদের দিয়ে গেল। শেষে এক কাপ গরম

বিমানে আরোহণ

কফি পেলাম। পাইলট একটুকরা কাগজে তার বক্তব্য লিখে যাত্রীদের কাছে পাঠিয়েছে। তাতে লেখা আছে—

এখন যুক্তপ্রদেশের উপর দিয়ে যাচ্ছি। ১০০০০ ফিট উপরে ২৭৫ মাইল ঘণ্টায় চলেছি। বেলা ১২॥টায় দিল্লী পৌঁছাব। আকাশ পরিষ্কার।

বেল্ট বাঁধার হুকুম হল। দেখতে দেখতে আমরা দিল্লীর ভূমি স্পর্শ করলাম। বিমানঘাঁটীর সামনেই দেখা যায় দিল্লীর "লাল কেল্লা"। আমরা এখানে একঘণ্টা বিশ্রাম করব। লালকেল্লা দেখে খুব ভাবাবেগে গেয়ে উঠলো "লাল কেল্লায় জাতীয় নিশান তোল—দিল্লী চলো। ডাক আসতে আবার আমরা বিমানে গিয়ে উঠলাম। করাচী অভিমুখে

চলেছি। একটু দূরে এসে দেখা গেল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বিমান দুলতে লাগলো। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মেঘের মাঝে পড়ে ওঠানামা করতে করতে চলেছে। আমাদের অবস্থা কাহিল। খুকু বমি করে ফেলেছে, আমারও গা গুলিয়ে উঠলো. ষ্টুয়ার্ড একগেলাস জল ও ওষুধ দিয়ে গেল। বমির ভাব তবুও যায় না। ইতিমধ্যে সোঁ সোঁ করে বিমান উঠে পড়লো তেরো হাজার ফিট উপরে, নীচে রইল খোড়ো মেঘ। ষ্টুয়ার্ড এসে তাড়াতাড়ি সকলকে Gas mask পরিয়ে দিল। অক্সিজেন নিয়ে বেশ সুস্থ হলাম। লাঞ্চ্ এল, দিব্যি খেতে লাগলাম—কিছু টিনের মাছ, সব্জি ও এক পেয়ালা কফি।

আমরা রাজপুতানা পার হয়ে বিকেল ৪টের সময় করাচীতে নামলাম। B. O. A. Cর কোচ আমাদের করাচীর Palace Hotelএ নিয়ে গেল, কথা ছিল Thos Cook আমাদের জন্য একখানি ঘর এখানে পূর্ব্বেই রিজার্ভ করে রাখবে। অফিসে গিয়ে খবর পেলাম তারা Thos Cook এর কোন চিঠিই পায় নাই। যাহোক্, তারা তখুনি আমাদের ঘরের বন্দোবস্ত করে দিল। আমার মালপত্র রেখে চা খেয়ে একটি ট্যাক্সিতে করে সমুদ্রধারে বেড়াতে গেলাম। করাচী সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী ও ভারতের একটি বিখ্যাত বন্দর। এখানকার এই সমুদ্রসৈকতটির নাম ক্লিপ্‌টন্। তীরের উপর দিয়ে একটি বাঁধানো লম্বা রাস্তা সোজা জলের ধার অবধি চলে গেছে; তার উপর দিয়ে হেঁটে আমরা বালির উপর নামলাম। সেখানে আমাদের পরিচিত দু'তিনটি প্রবাসী বাঙ্গালীর সাথে দেখা হল। সন্ধ্যা হতে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে উঠে চা খেয়ে সহর ঘুরতে বেরোলাম। প্রথমেই গেলাম P. A. Aর অফিসে খবর নিতে যে বিমান কয়টায় লণ্ডন যাত্রা করবে। জানা গেল বিমান তখনও করাচী এসে পৌঁছয়নি, সুতরাং সব অনিশ্চিত। সেদিন আর যাওয়া হবে না জেনে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখা হল Mr. J. C. Guptaর সাথে; তিনিও লণ্ডনের পথে করাচী এসেছেন। তাঁর এক স্থানীয় বন্ধু সঙ্গে ছিলেন, তিনি আমাদের সহর দেখাতে নিয়ে গেলেন।

রাস্তায় মালবাহী উটের গাড়ী দেখে খুকুর আনন্দ আর ধরে না। ঘুরতে ঘুরতে বেলা ২টায় স্থানীয় আবহাওয়া অফিসের ডিরেক্টর ডাঃ শচীন সেনের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে উপস্থিত হলাম। তারপর সহর ঘুরে বেড়িয়ে প্রায় ৭টায় হোটেলে ফিরলাম। এরোড্রমে ফোন করে জানা গেল যে পরদিন সকাল ৯|১০টায় আমাদের বিমান লণ্ডন যাত্রা করবে।

পরদিন ২৯শে এপ্রেল সকাল ৭টায় আমরা হোটেল ছেড়ে P.A.Aর কোচে করে এরোড্রোমে পৌঁছলাম। সেখানে শুল্ক অফিস, পাশপোর্ট অফিস ও স্বাস্থ্য বিভাগের হাঙ্গামা সেরে বিমান ঘাঁটীর মাঠে এসে দেখি প্রকাণ্ড এক দৈত্যের মত বিমান মাঠের মাঝে হাত পা ও ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে বিমানে উঠ্‌লাম। যথাস্থানে বেল্ট্ বেঁধে বসেছি, বিমান আকাশে উঠলো। বিমানটি চার ইঞ্জিনের। আমরা মোট ৪২ জন যাত্রী চলেছি। তার মধ্যে ৪|৫ জন ভারতীয়, আর বাকি সব ইউরোপীয়ান। বিমানের ঘর এয়ার-টাইট, জানলাগুলি ডবল কাঁচের, বাইরের আওয়াজ খুব কমই ঘরের ভিতর পৌঁছায়। খুব আরামে চলেছি, কোন কিছু কষ্ট নেই। আমি জানলার ধারে বসে বাইরের অপূর্ব্ব শোভা দেখছি—

যাত্রা সুরু

পৃথিবীর ঘরবাড়ী মাঠ ঘাট নদী পাহাড় ক্রমশঃ ছোট থেকে ছোট হয়ে আসছে—দেখতে দেখতে তাও সব কোথায় মিলিয়ে গেল—এই বিশাল পৃথিবী আমাদের দৃষ্টির বাইরে একেবারে চলে গেল। উপরে নীচে পাশে তাকিয়ে দেখি চারিদিক শূন্য। আমরা শূন্যে ভাসছি। আমরা কোথায় আছি ঠিক বুঝতে না পেরে একটু যেন কেমন কেমন মনে হতে লাগলো। পৃথিবীর মানুষ আমরা, সমস্তক্ষণ পৃথিবীর মাটিতে জড়িয়ে থাকি। পায়ের তলায় মাটী নেই ভাবলেই ভয় করে। আমি আমেরিকান ষ্টুয়ার্ডেস্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম—কত হাজার ফিট উপর দিয়ে বিমান চলেছে। সে বললো প্রায় ১৭০০০ ফিট হবে, বিশ বাইশ হাজার ফিট উপর দিয়ে সারারাত বিমান চলবে। ইতিমধ্যে পাইলটের স্লিপ্ এল, পড়ে দেখলাম—

ঘণ্টায় ২৭৫ মাইল বেগে ১৮০০০ হাজার ফিট উপর দিয়ে বিমান চলেছে। তখন বাইরের টেম্পারেচার—১৫°, আকাশের আবহাওয়া ভালোই, বিমানের ঘর গরম, বাইরের ঠাণ্ডা আমরা কিছুই জানতে পারছি না। চারিদিকে নীরব নিস্তব্ধ, উপরে সূর্য্যের রশ্মি বড় প্রখর, নীচে মেঘের দল হু হু করে ছুটেছে। আমরা ইরাক ইরান পেরিয়ে পশ্চিমে তুরস্কের প্রায় শেষ সীমানায় এসে পড়লাম। বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠলো, ধীরে ধীরে আমরা তুরস্কের বন্দর—ইস্তাম্বুলে নামলাম। বিমান ঘাঁটিতে নেমে ওয়েটিং রুমে ঢুকলাম। তখন প্রায় ৫টা বাজে, আমরা এখানে এক ঘণ্টা থেকে সান্ধ্য আহার সেরে নেব। (ক্রমশঃ)

আগ্নেয়গিরির অতীত

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হীরাসিং তাহার নিস্পন্দ দেহের পানে তাকাইয়া ভাবিল প্রথম প্রণয়ভীরু কুমারীর স্বাভাবিক সলজ্জতা। আবেগ স্পন্দিত হৃদয়ে হীরাসিং তাহার হস্তস্পর্শ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল "মিঃ সিং, আমি কাল আপনাকে উত্তর দেবো, আজ আমি ভেবে দেখি।" উত্তেজনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। অতিক্রান্ত প্রহরের সীমায় যে ক্ষীণ চন্দ্রালোক বিস্তৃত হইতেছিল, তাহাতে সুখলতার মুখ দেখা যায় নাই। পাংশু বিবর্ণ মুখের ভিতর কালো দুটি চোখ অগ্নি জ্বালায় জ্বলিতেছিল।

৯

বিবাহের পরদিনই সুখলতার ইচ্ছায় তাহারা ফ্রান্স অভিমুখে রওনা হইল। ইউরোপ ভ্রমণ সারিতে হইবে যে? কেমন এক অদ্ভুত হাসি সুখলতার মুখে ফুটিয়া উঠিল। মাকে পত্র দিল যে সে এক পাঞ্জাবীকে সিভিল ম্যারেজ আইনে বিবাহ করিয়াছে। তাঁহারা অনুমতি দিলেই তাহারা দেশে রওনা হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ইংরাজী ও বাংলা দৈনিক ও মাসিকে তাহার বিবাহবেশে সজ্জিত যুগল ফোটো পাঠাইয়া দিল। বিলাতী পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীর বিবাহ। মিঃ হীরাসিং ও মিসেস সুখলতা সিং। আপন হস্তে প্রত্যেক পত্র প্রস্তুত করিয়া পোষ্ট করিল। রজত কোনও একটি কাগজ পড়ে তো?

কিন্তু অবাধ্য চক্ষু জ্বালা করিয়া জল আসে কেন?

ফ্রান্স পৌঁছিয়া ম্যাকার্থির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিল যে "সে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের স্কলারসিপ ত্যাগ করিল। ব্রেণ ফিবারের পর তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। সে রিসার্চ্চের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন ক্ষমা করেন।" বহু আকাঙ্ক্ষিত থাসিস অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

তাহার পর ভ্রমণ। ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী ঘুরিয়া ঘুরিয়া অশান্তচিত্ত কোনও মতে শান্ত হইতে চাহে না। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত কেবলি যেন স্থান খুঁজিয়া ফিরিতেছে। হীরাসিংও অবশেষে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধ রাত্রে যখন তাহার আলিঙ্গন পাশ ছিন্ন করিয়া সুখলতা জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইত, বিস্মিত ক্ষুব্ধ হীরাসিং ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহারি পাশে আসিয়া দাঁড়াইত। তাহার বিবর্ণমুখের পানে চাহিয়া হয়ত ভাবিত সদ্যরোগমুক্ত সুখলতার মস্তিষ্ক এমনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। কিন্তু তাহাই কি? হায় হীরাসিং, কেমন করিয়া জানিবে যে তাহাদের মাঝে কে বাধা হইয়া আছে? সেই দুস্তর অলঙ্ঘ্য বাধা অপসারিত করিয়া হীরাসিংহের নিকটস্থ হওয়া সুখলতার পক্ষে যে অসম্ভব।

প্রতিশোধ লইতে গিয়া সে পরাজিত হইয়াছে। আপনি ব্যথা পাইল—নিরীহ বিশ্বস্তহৃদয় হীরাসিংকে ব্যথা দিল। বিবাহের পরদিন হইতে তাহার ভুল সে বুঝিতে পারিয়াছিল। হীরাসিংয়ের চুম্বন তাহার দেহে মনে অসহ্য জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। ইহা সে চাহে নাই—ইহা সে বুঝিতে পারে নাই। সজোরে মুখ মুছিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিত, "ভাল লাগে না, আমার এসব ভাল লাগে না।" ব্যথিত হীরাসিংয়ের করুণ মুখের পানে চাহিয়া বেদনাবোধ করিত। আপন অস্থির মনের দোহাই দিয়া ক্ষমা চাহিত।

ক্রমে তাহার রুগ্ন প্রকৃতি তাহার নিজের নিকটই বিস্ময় সৃষ্টি করিত। হীরাসিং? বেচারি হীরাসিং, এই উন্মার মত আগামরী নারীকে পাইয়া সে নাকি সুখী হইয়াছিল।

দুর্ব্যবহার করিবার পর ক্ষমা চাহিলে হীরাসিং যাহা বলিত, তাহা এখনও যেন কর্ণে আসিয়া বাজে "সু আমি তোমার পেয়েই সুখী, আমার মত অযোগ্যের ভাগ্যে তুমি যেন কোহিনুর। তোমার কোনও অপরাধ আমি বুঝতে পারি না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা তুমি অসুস্থ।"

অল্পায়ু হীরাসিং—বিবাহের বৎসর কয়েক পরেই তাহার মৃত্যু হয়। হয়ত হীরাসিং বাঁচিয়া থাকিলে তাহার অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেমযত্নে তাহার ব্যথাহত চিত্ত বেদনা ভুলিত।

তাহারি ইচ্ছায় হীরাসিং বোম্বেতে প্র্যাকটিশ সুরু করিয়াছিল।

আশ্চর্য্য তাহার জীবন! যে দিন সে ভারতবর্ষের ভূমি ত্যাগ করিয়াছিল, সেই দিনই সে তাহার পিতামাতা ভ্রাতা-ভগ্নী প্রেমাস্পদ সবাইকেই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। আর কাহারো সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহাদের সহিত কোন সম্পর্কই থাকে নাই।

তাহার বিদেশে থাকিয়া পাঞ্জাবী বিবাহের খবর শুনিয়া পিতা লিখিয়াছিলেন যে "তুমি আর কোন দিন আমাদের সম্মুখে আসিও না, আমরা ভাবিব যে আমাদের প্রথমা কন্যা নাই, কোন দিন ছিল না। তোমার উপর অনেক ভরসা রাখিয়াছিলাম যে তুমি সুশিক্ষিতা হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। তোমার শিক্ষার ফলাফল দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছে, বংশের আর কোনও কন্যাকে কোনও দিন লেখাপড়া শিখাইব না। যাক তুমি আমার উচ্চ আশার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছ। আর কোন দিন তুমি বা তোমার পত্র যেন আমার গৃহে না আসে, তাহাতে আমার গৃহ কলঙ্কিত হইবে।"

টাকার অভাব কোনও দিন সুখলতা অনুভব করে নাই। হীরাসিং যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন কি যাপন করা যায়? একাকী বোম্বে আর ভাল লাগিতেছিল না। কোথায় যাইবে ভাবিতেছিল। এমন সময় সুদূর বিহার প্রদেশের একটি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে এই চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল।

তাহার শিক্ষার অথবা ডিগ্রীর উচ্চতা দেখিয়া কর্তৃপক্ষ সানন্দে তাহার আবেদন মঞ্জুর করেন।

ক্রমে জীবনে অনাথা বালিকা রেবার স্থান হইয়াছে, কন্যা স্নেহে তাহাকে সে প্রতিপালন করিতেছে।

কত বৎসর তাহার পর চলিয়া গেল? উঃ তাহার পর আরো কত বৎসর আসিবে? আরো কতদিন? কতদিন এই নিঃসঙ্গ মরুভূমির মত জীবন যাপন করিতে হইবে? হে ভগবান!……

ঘরের মধ্যে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠিল। রেবা আসিয়াছে। সুখলতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, অবিরাম প্রবাহিত অশ্রুধারায় তাঁহার সমস্ত মুখটা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য!

বিস্মিত রেবা সেদিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিয়া বলিল—"খাবে এস মা, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে, তুমি ঘুমিয়েছ ভেবে কেউ তোমায় ডাকতে পারে নি।"

ঘন কৃষ্ণ মেঘের অন্তরালে চাঁদ একবার দেখা দিয়া আবার অবলুপ্ত হইয়া গেল।

টুক্‌রা কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

কত যে আশায় বালুকা বেলায়
বাঁধে সবে সুখে ঘর
কালের চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে
তোলে আসি সেথা ঝড়;

যত কিছু আশা গৃহ ভালবাসা
নিমেষে উড়িয়া যায়
দিবস রজনী শূণ্য বাতাসে
করে শুধু হায় হায়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম রেল বাজেট

গত ২০শে নভেম্বর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যানবাহন সদস্য মিঃ জন মাথাই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে স্বাধীন ভারতের প্রথম রেল বাজেট উপস্থাপিত করেন। এই বাজেট একটি সম্পূর্ণ বৎসরের নয়, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার হাতে লওয়ার দিন হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ বা চলতি (১৯৪৭-৪৮) আর্থিক বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত এই সাড়ে সাত মাসের সরকারী রেলপথসমূহের আয়-ব্যয়ের আনুমাণিক হিসাব ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ভারতবিভাগের পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের অবশিষ্টাংশের বাজেট পৃথকভাবে উপস্থাপিত করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বাজেটের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও একথা খুব দুঃখের সঙ্গেই বলিতে হয়, ডাঃ জন মাথাই আলোচ্য বাজেট দেশবাসীকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। যুদ্ধের চাপে এ দেশের লোক দীর্ঘকাল বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, যুদ্ধ থামিবার পর স্বস্তিলাভের আশা করিলেও সে আশা তাহাদের পূর্ণ হয় নাই। এখন স্বাধীনতালাভের পর তাহারা মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার লাভের স্বপ্ন দেখিতেছে, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপরিচালকদের দিক হইতে এ সম্বন্ধে উৎসাহ বাণীও তাহারা শুনিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আলোচ্য রেল বাজেটের ন্যায় ব্যবস্থা দেখিয়া তাহারা হতাশ না হইয়া পারে না। আলোচ্য বাজেটে রেলকর্ম্মচারীদের কিছুটা সুখ সুবিধা বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সম্ভাব্য ঘাটতি রোধ করিতে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে বিপন্ন দেশবাসীর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠা স্বাভাবিক। তাছাড়া যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পয়সায় রেলের আয়—অথচ যাহারা এতকাল কুকুরবিড়ালের মত কোনমতে বাক্সবন্দী হইয়া রেল ভ্রমণে বাধ্য হইয়াছে, এবারের স্বাধীন ভারতের রেল বাজেটেও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা হয় নাই।

বাজেটে অনুমান করা হইয়াছে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ, এই সাড়ে সাত মাসে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহের মোট আয় হইবে ১০৮ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা (সাধারণ খাতে ১০৭ কোটি টাকা। বিবিধ খাতে ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা) এবং মোট ব্যয় হইবে ১২০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা (সাধারণ খাতে ১০৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও সুদের দরুণ ১৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা), কাজেই এই সময়টুকুর মধ্যে ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য যানবাহন সদস্য ভাড়া মাশুল বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে মোট ৯ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে এবং ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাকী ঘাটতি মজুত তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে।

দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য রেলপরিচালনায় খানিকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং তজ্জন্য রেলপথের আয় কিছুটা কমিয়াছে। তবু গত ফেব্রুয়ারী মাসে উপস্থাপিত ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে মোট ১২৬ কোটি টাকা (সাধারণ খাতে ১২৩ কোটি টাকা, বিবিধ খাতে ৩ কোটি টাকা) আয়ের যে অনুমান হইয়াছিল, ভারতের মোট রেলপথের এক পঞ্চমাংশ মাত্র পাকিস্তানে চলিয়া যাওয়ায় তদনুসারে আলোচ্য সাড়ে সাত মাসের আয়ের হিসাবে এতটা অবনতি অবশ্যই আশা করা যায় না। পাকিস্থানে রেলপথ পড়িয়াছে মাত্র ৬,৭৪৮ মাইল, পক্ষান্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ২৪,৫৬৫ মাইল রেলপথের মধ্যে ২১,১৮০ মাইল ভারতবিভাগের ফলে কোনদিক হইতে আঘাত পায় নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে আয় হ্রাস যদি আশঙ্কা করাই হয়, তাহা সাময়িক মনে করাই উচিত এবং তদনুসারে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবের সহিত ডাঃ মাথাইয়ের উচিত ছিল—পরবর্ত্তী বৎসরের আশঙ্কামত আয় হ্রাস না ঘটিলে বর্দ্ধিত ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইবে,—এই ধরণের একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

ভারতীয় রেলপথের ব্যবস্থা একেবারে জঘন্য। নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের কথা না তোলাই ভাল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরাও অধিক ভাড়া দিয়া কোন দিক হইতেই আশানুরূপ সুখ সুবিধা পান না। এইভাবে একে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, তাহার উপর আবার যাত্রীসাধারণের স্কন্ধে ভাড়াবৃদ্ধির চাপ পড়িল। বৃদ্ধির হারও উপেক্ষার মত নয়। তৃতীয় শ্রেণীর ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের মাইল পিছু গড়ে যথাক্রমে ৩·৬ পাই ও ৫·৭ পাই ভাড়া দিতে হইত, নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতি মাইলে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মেল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যথাক্রমে ৫ ও ৪ পাই হিসাবে এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের মেল ও প্যাসেঞ্জার ট্রেণে যথাক্রমে ৯ পাই ও ৭½ পাই হিসাবে ভাড়া দিতে হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও অবশ্য ভাড়া বাড়িয়াছে (প্রথম শ্রেণী মাইলে ২৪ পাইয়ের স্থলে ৩০ পাই এবং দ্বিতীয় শ্রেণী মাইলে ১২ পাই স্থলে ১৬ পাই), তথাপি এই শ্রেণীর যাত্রীদের ব্যয়-সামর্থ্য বেশী বলিয়া তাহাদের তুলনায় দরিদ্র তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের কষ্ট অনেক বেশী হইবে। যাহারা ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করেন, বাজেটে তাহাদের ভাড়াও শতকরা ১২½ ভাগ হইতে শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কয়লা চালানে রিবেট দেওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং টারমিনাল চার্জ্জ ও সারচার্জ্জ বাড়ানো হইয়াছে,

এইভাবে রেলবিভাগে কিছু আয় বাড়িতে পারে, কিন্তু কয়লার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ইহাতে দেশবাসীর দুর্গতি বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এবারের বাজেটে রেলকর্ম্মচারীদের সুখ-সুবিধা বিধানের যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দরিদ্র ভ্রমণকারীদের উপর এতটা চাপ না পড়িলে তজ্জন্য আমরা অবশ্যই উচ্ছসিত আনন্দপ্রকাশ করিতাম। পে-কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রেলকর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াইবার ও তাহাদিগকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য এবারের বাজেটে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। এইভাবে কর্ম্মচারীদের কল্যাণসাধন ছাড়া যানবাহন-সদস্য আর একটি ভাল কাজ করিয়াছেন। এতদিন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিলিটারী যাত্রীরা অর্দ্ধ ভাড়ায় যাতায়াত করিতেন, এবার এই অযৌক্তিক সুবিধা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ছাড়া আসাম ও উত্তর বঙ্গের যোগাযোগের জন্য, জি-আই-পি রেলপথে ভীমসেন-বৈরাদা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাবে রূপোর-তালোরা লাইনের জন্য যানবাহন সদস্য যে ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন, নূতন লাইনের প্রয়োজনের বিবেচনায় তাহাও দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিবে। একমাত্র অযোধ্যা-ত্রিহুত রেলপথ যে কোন সুকৃতির ফলে ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির দুর্ভোগ হইতে রেহাই পাইল, যানবাহন সদস্য সে সম্বন্ধে কিছুই খুলিয়া বলেন নাই।

১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে ৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত অনুমান করা হইয়াছিল এবং ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল, যানবাহন সদস্য জানাইয়াছে যে অর্থাভাব হওয়ায় রাজস্ব তহবিলে এই টাকা এবার আর দেওয়া হইবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন ইহার ফলে রাজস্ব তহবিলের বিশেষ ক্ষতি হইবে। রেলপথ উন্নয়ন তহবিলেও (Betterment fund) এবার কোন টাকা রাখা হইবে না, পরন্তু এই তহবিল হইতে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা তুলিয়া লইবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে এই প্রয়োজনীয় তহবিলটিকে একান্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইবে। এই তহবিলটি মাত্র ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ইহাতে জমা আছে ৮ কোটি ৭ লক্ষ টাকা।

মোটের উপর স্বাধীন ভারতের জনপ্রিয় মন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন, কিছু অসুবিধা হইলেও সহানুভূতির সহিত তাহা বিবেচনা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। যুদ্ধের সময় অভাবনীয় পরিস্থিতিতে রেল-পথসমূহের যে আয় বাড়িয়াছিল, যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একাংশ হ্রাস পাইয়াছে, অথচ যুদ্ধের সময়কার বর্দ্ধিত ব্যয়ভার এখনও কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ অবস্থায় ভাড়া বাড়াইয়া বা অন্য কোন উপায়ে আয়বৃদ্ধি ছাড়া রেল কর্তৃপক্ষের উপায়ও নাই। সকল দিক হইতে দেশবাসীর জীবনযাত্রার ব্যয় হার বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে রেলের ভাড়া বাড়িলে তজ্জন্য খুব বেশী গণ্ডগোল করিয়া কর্তৃপক্ষকে উত্যক্ত করার পূর্ব্বে দেশবাসীর উচিত দেশের সমগ্র আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা।

অবশ্য যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় এখনই রেলের ভাড়া ও মাশুলের হার শতকরা ৫৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে এই বৃদ্ধিও কম নয়। ইহার উপর নূতন ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাবে তাহাদের আতঙ্কিত হওয়াই স্বাভাবিক। এইভাবে ক্রমাগত ভাড়া বাড়াইয়া যাওয়া অপেক্ষা রেলের বিভাগীয় দুর্নীতির প্রতিরোধে এবং বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থায় কড়াকড়ি করিলে রেলকর্তৃপক্ষ অবশ্য বহু বাড়তি আয়ের সংস্থান করিতে পারেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কতটা মাথা ঘামাইতেছেন তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বলিয়াও যানবাহন সদস্যের বাজেট প্রস্তাবে চারিদিকে এত বেশী বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। শুধু জনসাধারণ নয়, রেল কর্ম্মচারীদের অনেকে পর্য্যন্ত এই ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অযৌক্তিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। নিখিল ভারত রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস গুরুস্বামী গত ২০শে নভেম্বর দিল্লি হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, দেশের অস্বাভাবিক পণ্যমূল্যের কথা বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান ভাড়া-বৃদ্ধির প্রস্তাবকে ন্যায়সঙ্গত বলা চলে না।

'কনট্রোল' রহিতের আন্দোলন

দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে 'কনট্রোল' বা নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হইয়া থাকে। ইহার দুটি দিক আছে,—পণ্যযোগান সার্ব্বজনীন করা এবং ন্যায্য মূল্যে দেশবাসীর প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্নতম পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করা। বিশেষ করিয়া মুদ্রাস্ফীতির যুগে পণ্যাভাবগ্রস্ত দেশে যদি 'কনট্রোল' চালু না হয়, তাহা হইলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত দেশবাসীর পক্ষে আয়ত্তাধীন মূল্যে প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ একান্ত অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। পণ্যমূল্য যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল বলিয়া এ অবস্থায় জিনিষপত্রের জন্য বাড়তি দাম দেওয়া শুধু বিত্তবান শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময়কার নিয়ন্ত্রণপ্রথা এখনও চলিতেছে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে জনপ্রিয় হয় নাই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বরাদ্দনীতি সার্ব্বজনীন তো হয়ই নাই, রেশন এলাকাকেও যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী মাথাপিছু দেওয়া হইতেছে, তাহা লোকের নিম্নতম প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম। বলা বাহুল্য, দেশবাসী চিরকাল এইভাবে অভাব সহ্য করিয়া মুখ বুজিয়া থাকিতে পারে না। লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি যে সব পণ্যে পারমিটের ব্যবস্থা আছে, তাহাদের অবস্থাতো আরও শোচনীয়। হদিশ জানা না থাকায় তদ্বির তল্লাসের অভাবের জন্য এবং মুরুব্বির সুপারিশ সংগ্রহ করিতে না পারায় সাধারণ দেশবাসী অতি প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ন্যায্যদরে এই সব পণ্য সংগ্রহে ব্যর্থকাম হইতেছে এবং ইচ্ছা না থাকিলেও বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে চোরাকারবারীর দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। সরকারী কর্তৃপক্ষের দুর্নীতিমূলক আচরণের সম্পর্কে কোন কথা না তুলিয়াও বলা যায় যে, সরকার অবশ্যই দেশের উৎপন্ন পণ্যের সঠিক হিসাব রাখিতেছেন না, না হইলে এত অধিক পরিমাণ পণ্য কোথা হইতে চোরাবাজারে আসিতেছে? দোষ ধরা পড়িলেই অসাধু পণ্য-

উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা হইলে দেশের পণ্য পরিস্থিতির অবশ্যই লক্ষণীয় উন্নতি হইত।

এই অব্যবস্থার জন্যই কিছুদিন হইতে কনট্রোল তুলিয়া দিবার জন্য এদেশে জোর আন্দোলন চলিতেছে। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান দুর্নীতিমূলক আবহাওয়ায় বিরক্ত হইয়া কনট্রোল রহিতের পক্ষে মত দিয়াছেন। ভারতের সরকারী খাদ্যশস্য নীতি কমিটি (Food Grains Policy Committee) এবং এ আই সি সি'র বহু সদস্যও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার পক্ষে। তবে অব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইয়াও এবং কনট্রোল রহিতের আন্দোলনের তীব্রতা স্বীকার করিয়াও ভারত সরকার বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তাঁহাদের ধারণা পরিস্থিতি এখন যতটা খারাপ হউক, কনট্রোল একেবারে তুলিয়া দিলে ইহা তদপেক্ষা অনেক বেশী শোচনীয় হইয়া পড়িবে। দেশে এখন খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি আবশ্যকীয় পণ্যের দারুণ ঘাটতি রহিয়াছে, কাজেই ভারত সরকারের আশঙ্কা কনট্রোল তুলিয়া দিলে উৎপাদক, দালাল ও ব্যবসায়ীরা অবস্থার সুযোগ লইয়া পণ্যমূল্য এত বাড়াইয়া দিবে যে সাধারণ দেশবাসী সেই স্ফীত মূল্যরেখায় জিনিষপত্র কিনিতে পারিবে না। মোটের উপর ভারত সরকার ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিতের সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে শীঘ্র চিনি ছাড়া কাপড়, যন্ত্রপাতি, কাগজ প্রভৃতির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাইবে। মহাত্মা গান্ধী ভারত সরকারের যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই আশঙ্কার যৌক্তিকতা অস্বীকার করিতে পারে নাই। তিনি সাধারণতঃ মানুষের অন্তরের কাছে আবেদন করিয়া ফললাভে বিশ্বাসী, এক্ষেত্রেও সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে তিনি ব্যবসায়ীদের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। গত ২২শে নবেম্বর দিল্লীর এক প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় তিনি দালাল, ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের উদ্দেশ করিয়া আবেদন জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন সরকারের আশঙ্কা দূর করেন ; তাঁহারা যেন সরকারকে এই আশ্বাস দেন যে কন্ট্রোল তুলিয়া দিলে জিনিষপত্রের দাম তাঁহারা বাড়াইয়া দিবেন না এবং খোলাবাজারে চোরা-কারবার ও দুর্নীতির অবসান ঘটিবে।

কন্ট্রোল রহিতের আন্দোলনকারীরা সরিষার তৈলের দৃষ্টান্তটিকে খুবই কাজে লাগাইতেছেন ; কলিকাতায় সরিষার তেলের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলে বাজারে অদৃশ্যপ্রায় তৈল প্রচুর পরিমাণে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা সত্য কথা। তবে আমাদেরও অভিমত সরিষার তৈলের ন্যায় একটি ছোট জিনিষের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র নিয়ন্ত্রণ প্রথা নাড়াচাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। তাছাড়া সরিষার তৈলের নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল্যবৃদ্ধিও লক্ষ্য করিতে হইবে। দেশের খাদ্য পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। বস্ত্র, সিমেন্ট লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন, তৈলবীজ, চিনি ও গুড় ইত্যাদি যে সব পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু আছে, ইহাদের অধিকাংশের উৎপাদন রেখাতেই অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইলে চাহিদা ও যোগানে যে বিরাট অসামঞ্জস্য দেখা দিবে, তাহাতে পণ্যবাজারে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার এখন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমস্যার চাপে বিপন্ন, এসময় তাঁহাদিগকে জোর করিয়া নূতন এবং বড় কোন সমস্যার সম্মুখীন করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যাবশ্যক জিনিষগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু থাকা অত্যাবশ্যক। তবে বিভাগীয় দুর্নীতি এবং চোরা-কারবার বন্ধের জন্য সরকার যতক্ষণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া চরম কঠোরতার পরিচয় না দিবেন, ততক্ষণ এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপরিচালকগণের নিকট হইতে দুর্নীতি দমনের এই কঠোরতা অবশ্যই আশা করা যায়।

পণ্যমূল্য সম্পর্কে পরামর্শ দানের জন্য ভারতসরকার বিশেষজ্ঞদের লইয়া যে বোর্ড (Commodity Prices Board) গঠন করিয়াছেন, সেই বোর্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টেও কনট্রোল তুলিবার বিপক্ষে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অনেকে শুধু খাদ্যদ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিয়া বাকি পণ্য খোলা বাজারে ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়া বোর্ড বলিয়াছেন যে,—(১) এইরূপ করিলে খাদ্যশস্য নয় এমন সব কৃষিজাত পণ্যের দর বাড়িয়া যাইবে এবং ফলেকৃষিজীবীরা অধিক মুনাফার আশায় খাদ্যশস্যের চাষ কমাইয়া দিবে ; এবং (২) এক্ষেত্রে তাহারা খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের উপর কন্ট্রোল চালু রাখিয়া ক্ষতি স্বীকার করিতে রাজী হইবে না। বলা নিষ্প্রয়োজন ভারতের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতিতে বোর্ডের এই যুক্তিগুলির মূল্য কিছুতেই অসঙ্গত মনে করা যায় না।

কনট্রোল রহিতের পরিবর্ত্তে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রণ প্রথার গলদসমূহ দূর করিবার চেষ্টা করা অধিকতর সুবিবেচনার কাজ হইবে, এ সম্পর্কে বোর্ডের ইহাই সুদৃঢ় অভিমত (*)। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া বিশেষজ্ঞগণের এই সকল মূল্যবান পরামর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তথা বিরক্ত দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবেন।

* "Not abolition but improvement of the system of controls will have to be undertaken, specially if long-term plans involve regulation and direction of economic activity by the state." ২৮।১১।৪৭

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ছাদের সান্ধ্য-সম্মিলনে সেদিন শনির দৃষ্টি লাগিয়াছিল। সভা জমা ত দূরের কথা, এক সময়ে সভাসদগণের ছল ছল চোখে বর্ষার ঢল নামিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত বিয়োগান্ত নাটকাভিনয়ের মত মনগুলা খিঁচড়াইয়া রহিল। ঘটনাটা প্রথমাবধি এই :

মুকুল বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। ছাদের সান্ধ্য-সভায় আলো থাকে না, আজও ছিল না, 'কার চিঠি ?' বলিয়া জয়দ্রথ দালানের আলো জ্বালিয়া দিয়া আসিয়া আর্ম চেয়ারে বসিয়া, শিরোনামাটুকু পড়িয়া লইয়া কহিল, মার চিঠি।

হুঁ।

পত্র পাঠ করিয়া জয়দ্রথের মুখ দিয়া কথা সরিল না ; মুকুলের পানে চাহিতে দেখিল, তাহার পাংশু মুখে নিরুত্তর পাঠই লিখিত রহিয়াছে। মুকুলের চোখ দু'টি ব্যথায়, বেদনায় ও জিজ্ঞাসায় ভরা। নিশাবসানে মুদ্রিতপল্লব কুমুদের মত মুকুলের উদাস ব্যাকুল নয়ন দু'টি অভ্যাসবশে স্বামীর পানেই চাহিয়া আছে। জয়দ্রথ তাহাতে আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া কহিল, এখন উপায় ?

উত্তর যাচ্ঞা করিয়া এই প্রশ্ন করা হয় নাই। ইহা হতাশার অভিব্যক্তি মাত্র ! আকাশে নক্ষত্রের মেলা বসিয়াছে, তাহাদের পানে চাহিয়া উপায় পাওয়া যায় না ; বসন্তের সুরভিত সমীরণ শরীর জুড়াইয়া দিতে পারে : কিন্তু সমস্যার সমাধান করিতে পারে না।

অবিনাশ ও মনোরমা ছাদে আসিতে, জয়দ্রথ ম্লানমুখে শুষ্ক হাসি টানিয়া বলিল—মুশ্‌কিল হয়েছে ভাই, কাশী থেকে আমার শ্বশুর শাশুড়ী আসছেন।

"তাই নাকি ?" বলিয়া অবিনাশ ও তাহার স্ত্রী মনোরমা হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সান্ধ্য বেশ বাসে সুসজ্জিত হইয়া এই দম্পতি প্রফুল্ল আননে প্রাত্যহিক সান্ধ্যসভা জমাইতে আসিয়াছিল : এক মুহূর্ত্তে, ভূত দেখিলে মানুষের চেহারা যেমন বদলাইয়া যায়, অবিনাশ দম্পতিরও মুখ যেন ছাই হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশ শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কবে আসছেন ?

পরশু, মঙ্গলবার !

ও বাবা, সময়ও ত নেই !

কিছুক্ষণ নিঃশব্দেই কাটিল ; তারপর অবিনাশ বলিল, তাঁদের মেয়ে জামাইয়ের ঘর, তাঁরা ত আসবেনই : না আসাই অন্যায় ! কিন্তু আমরা কি করি বল ? তোমাদের কাছে তাঁদের যে রকম নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণদ্বয়ের পরিচয় শুনেছি, তা'তে :আমরা কোনও দিন এ বাড়ীতে বাস করেছি জানলে, তাঁরা হয়ত এখানে উঠতেই চাইবেন না।

কথাগুলি কঠোর হইলেও সত্য, সেই জন্য কেহই তাহার প্রতিবাদ করিল না। অথচ সত্য কথা এই যে—জয়দ্রথ ও মুকুল উভয়েই অন্তরে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। অবিনাশ আবার বলিল, আমার জন্যে আমি একটুও ভাবি নে, অফিসের মেসে কারও সঙ্গে একটা খাট

মনোরমা মুকুলের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—

বিছিয়ে প'ড়ে থাকতে পারি, মুশকিল মনোরমাকে নিয়ে। ওর যে বাবার কোনও বায়গাই নেই !

অথচ একদিন তাহার সবই ছিল। তাহার বাপ ছিলেন, দু'টি বড় ভাই ছিল। মুর্গিহাটায় মস্ত কারবার ও বাসা ছিল। আগষ্টের নরমেধ-যজ্ঞে সব বলি গিয়াছে। মরিয়ম তাহার স্বামী আব্বাসের বাসায় ছিল এবং জয়দ্রথ মিলিটারী ট্রাক্ লইয়া গিয়া তাহাদের উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজেদের গৃহে হিন্দু পরিচয়ে হিন্দু নামে আশ্রয় না দিলে,

তাহাদেরও চিহ্ন থাকিত না। কথা ছিল, কলিকাতা শান্ত হইলে, সহরে বাড়ী পাইলে, ইহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়া হিন্দু বেশ ও হিন্দু-নাম পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরিচয়েই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আব্বাসকে লইয়া কোন অসুবিধাই হয় নাই, খুব সহজেই সে অবিনাশ হইতে পারিয়াছিল; কিন্তু মরিয়মকে মনোরমা করিতে মুকুলকে প্রতি পদে কত যে প্রতিবন্ধকতা, কত যে অসুবিধা, কত যে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল, তাহা সেই জানে। মুকুলের বুড়ী দাসী সরোজিনী মনোরমার হাত ও পায়ের আঙুলের কারুশিল্প দেখিয়া কত আগড়ম বাগড়ম যে তুলিল, সে আর বলিবার নহে। মুকুল বুঝাইল, বাঙ্গাল্ দেশের মেয়েরা মেদি পাতার রং করে। দাসী বলিল, কিন্তু বাঙ্গাল্ মাগীরা লঙ্কার ঝাল খায়, এ কেন তবে লঙ্কার নামে আঁৎকে ওঠে? মুকুল বলিল, ওর বাপ কলকাতাতেই থাকেন কি-না—মনোরমাও

ওরা কেউ ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিল না, আমি বাজি ধরতে পারি

কলকাতাতেই জন্মেছে, তাই কলকাতার মেয়েদের মত ঝাল খেতে শেখে নি। সরোজিনী উকিল হইলে ভাল জেরা করিতে পারিত; বলিল, মর্-ছুঁড়ি, চোখে সুর্মা দেয় কেন? মুকুল বায়োস্কোপ ও হলিউডের সপিণ্ডকরণ করিল। সরোজিনী শেষ পর্য্যন্ত সওয়াল করিয়া কহিল, তুমি যাই বল আর যাই কর বৌদিদিমণি, ও ছুঁড়ী নির্ঘাৎ ছোট জাতের মেয়ে। নইলে রামসীতার গল্পকে ভূতের গল্প বলে। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার—বাঙ্গাল্দের দশাই ঐ!

তাহার পর প্রায় দশ-এগারো মাস কাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা ঈগল জননী যেমন বিশাল পক্ষপুটে শাবককুলকে রক্ষা করে, মুকুলও তেমনই সতর্ক স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া মুসলমান যুবক যুবতীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ছেলেবেলায় মুকুল তাহার বোনেদের যেমন ভালবাসিত, দেখিতে দেখিতে মনোরমাকেও তেমনই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। মনোরমা যে তাহার কেহ নহে, সে যে তাহাদের জাতির বা সমাজেরও কেহ নহে এবং তেলে ও জলে মিশিবার কোন সম্ভাবনা যে কোন কালেই নাই তাহা ভুলিয়া গিয়াই ভালবাসিয়াছিল। তাই আজ সে মনোরমার মুখের পানেও চাহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ এক সময়ে মনোরমা উঠিয়া গিয়া মুকুলের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল, আমি কোথায় যাব দিদি? কোন ভাগাড়ে আমার যে কেউ নেই দিদি!—বলিতে বলিতে মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল। মুকুল অকস্মাৎ কিছুই বলিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিল, মাসীমারা যতদিন থাকবেন, আমি যদি তোমার ঘর ঝাড়ু দিই, উঠোন্ ধুই, সরোজিনী-ঝির ঘরের পাশের ঘরে থাকি, তা হলেও কি আমাকে তুমি বাড়ীতে থাকতে দিতে পারবে না, দিদি?—তবু মুকুলের মুখে কথা নাই দেখিয়া মনোরমা মুকুলের একটা পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না।

এতক্ষণে যেন মুকুলের হুঁস হইল; দু' হাতে মনোরমাকে তুলিয়া ধরিয়া নিজের ফিরোজা রঙের নতুন বেনারসীর আঁচলে তাহার চোখের শতধারা মুছাইতে মুছাইতে বলিল, ছি, ভাই, পায়ে হাত দিতে নেই।

মনোরমা বৃষ্টি-ভেজা ফুলের মত ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বলিল, তুমি বলো, আমায় ফেলবে না?

মুকুল বলিল, তোমাকে ফেলবো আমি কি এমনই পিশাচী, মনু?

অবিনাশ বলিল, কিন্তু মাসীমা যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী। সে গল্প ত তোমাদের কাছেই শুনেছি বৌদি! যে বাড়ীতে তাঁরা থাকবেন সেই বাড়ীতে মুসলমান থাকা যে সত্যিই অধর্ম্ম হবে বৌ-দি! তাঁরা জানুন আর নাই জানুন, আমরা মুসলমানের ছেলে মেয়ে জেনে শুনে এত বড় অধর্ম্ম করলে কেয়ামতের দিনে, আমরাই বা আল্লার কওমে কি কৈফিয়ৎ দেব?

মুকুল বলিল, আজ রাত্রি, কাল সমস্ত দিনরাত সময় ত রয়েছে, ভেবে একটা কিছু উপায় বার করতেই হবে। কি বল গো, তাই না?

নিশ্চয়, বলিয়া জয়দ্রথ গড়গড়া টানিতে লাগিল।

মুকুলের মা'র চোখ কাটাইতে হইবে, তাই তাঁহারা কলিকাতার অশান্তি ও হাঙ্গামা উপেক্ষা করিয়াই কলিকাতায় আসিতেছেন। কাশীর ডাক্তাররা স্পষ্টই বলিয়াছে, শক্ত অপারেশন কলকাতাতেই সম্ভব, অন্য কোথায়ও নয়। এইটুকু হইতে মুকুলের মা'য়ের ছুঁচিবাই সংক্রান্ত কাহিনীর পর কাহিনী কথিত হইতে লাগিল। মুকুলের বাবা রিটায়ার্ড ডিষ্ট্রিক্ট জজ, কত লোককে ফাঁসী, কত লোককে দ্বীপান্তর ও সারা জীবনের জেল দিয়াছেন, জেলায় জেলায় কড়া জজ বলিয়া তাঁহার নামে থরহরি কম্পমান ছিল যত লোক; কিন্তু বাড়ীতে তাঁহার অবস্থা, লোকে বলে—কাঁচপোকা ও তেলাপোকার মত। জীবনে একদিন তিনি গিরিশ ঘোষের "বলিদান" নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গল্প শুনা যায়, রাত্রি দু'টার সময় জামাজুতাসমেত চৌবাচ্চায় অবগাহন করিয়া শুদ্ধ হইতে হইয়াছিল। তদবধি তিনি থিয়েটারে পদার্পণ

করেন নাই। দশাশ্বমেধ ঘাট ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ত্রিসীমানায় নাকি অশুচির প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাই তাহাতেই তাঁহার তনুমনঃধন উৎসর্গ করিয়া কালাতিবাহন করিতে হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ

মঙ্গলবার বেনারস্ এক্সপ্রেস দেড় ঘণ্টা লেটে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিতে পদ্মিনী ও পুলকেশ ছুটাছুটি করিয়া একটা ইণ্টার ক্লাশ গাড়ীর মধ্যে আকণ্ঠবদ্ধাবস্থায় প্রাক্তন জজ ত্রিভুবনেশ্বর মুখার্জ্জি ও তাঁহার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিল। পুলকেশ হাসিয়া পদ্মিনীকে বলিল, ঐ ভিড়ে মানুষ বসতে পারে? পদ্মিনী বক্র কটাক্ষে কহিল, বাবা মা না হয় মানুষ ন'ন, দেবতা; কিন্তু অন্য লোকগুলোও কি তোমাদের বিচারে ছাগল ভেড়া? পুলকেশ স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, ওরা কেউ ডিষ্ট্রিক্ট জজ ছিল না, আমি বাজি ধরতে পারি। পদ্মিনী হাসিয়া পরাজয় স্বীকার করিল। সকলে নামিয়া গেলে, গাড়ী খালি হইলে অগ্রে জজ সাহেব নামিয়াই বলিলেন, মুকুলরা আসে নি?

কাল অপারেশন করবে কখন বললে?

না। কাল রাত্রে এসে আমাদের ব'লে গেলেন, হাওড়ায় আসতে।

অসুখ বিসুখ নয় ত?

না। ভালই ত দেখলুম। তাদের গাড়ী পাঠিয়ে গিয়েছেন।

জজ সাহেব বলিলেন, জরুরী কাজ কর্ম্ম পড়েছে বোধ হয়; তাই আসতে পারে নি।

জজ-পত্নী অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, মুকুলেরও কাজ পড়লো?

এ কথার উত্তর কেহ দিল না। জজপত্নী আবার বলিলেন, ভাল আছে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলকেশ কহিল।

হাওড়ার সেতু পার হইয়া গাড়ী উত্তর কলিকাতার রাস্তা ধরিতেই জজ সাহেব বলিলেন, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

পদ্মিনী বলিল, আমার ওখানে বাবা।

তোর যে ছোট্ট বাড়ী রে, পদ্ম!

ছোট ত বটেই, তবে, বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে তার ওপরের একখানা ঘর পাওয়ায় এখন আর অসুবিধে হয় না।

জজপত্নী বলিলেন, মুকুল ষ্টেশনে এলো না, তার বাড়ীতেও আমাদের ঠাঁই হোল না! এতই হতচ্ছেদ্দা!

পুলকেশ অপরাধীর মত বলিল, জমাইদা কাল বললেন বটে, বিশেষ অসুবিধা আছে।

জজপত্নী আগুন হইয়া উঠিয়া কহিলেন, অসুবিধে আছে! হ্যাঁ তা থাকবে বৈ কি, অসুবিধে থাকবে বৈ-কি! সাহেবি চালের মধ্যে গেঁয়ো শ্বশুর শাশুড়ী এলে অসুবিধে ত হবেই!—একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ভাল। ও মেয়ের আমি মুখদর্শন করি ত—

কর্ত্তা আহা-হা—আহা-হা—কর কি—কর কি—রবে থামাইয়া দিলেন। জয়দ্রথ জামাইয়ের ভরসাতেই তিনি স্বীয় চক্ষু চিকিৎসা করাইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। প্রথমেই তাহাদেরই মুখদর্শন বন্ধ হয় ইহা আদৌ অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাজেই বলিলেন, এক তরফা রায় দিতে নেই গিন্নি, দিতে নেই। আগে দেখা হোক্, তাদের কথা শোন, তার পর ডিগ্রি বা ডিসমিস্, যা খুশী করতে পারো।

কথা যুক্তিযুক্ত বটে। কাজেই জজপত্নী তখনকার মত ক্রোধ সম্বরণ করিলেন; কিন্তু সমস্ত দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হয়-হয় তবুও মুকুলের দেখা নাই, জজজায়া আবার দুর্ব্বার হইয়া উঠিতেছিলেন—ঠিক সেই সময় জয়দ্রথ আসিয়া পাদ বন্দনা করিল। "মুকুল এলো না?"

"না। একটা নেমন্তন্ন—"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গৃহিণী কহিলেন, ওঃ, নেমন্তন্ন!

পাছে আরও কিছু ব্যক্ত হইয়া পড়ে, জজ মহোদয় বলিয়া উঠিলেন, ওঁর চোখ দুটো ত যেতে বসেছে বাবা! তোমার ত অনেকের সঙ্গে ভাব সাব, ভাল চোখের ডাক্তার কে আছে বল ত?

জয়দ্রথ যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল; বলিল, কর্ণেল সেন! সেনই এখন দি বেষ্ট! কাল সকালেই মা'কে নিয়ে যাই, চলুন।

জজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ফি কত?

জয়দ্রথ বলিল, আমার কাছে ফি নেবে কি আবার! স্রেফ্ জিনিসের দাম নিয়ে বাড়ী ক'রে দিয়েছি না! বলিয়া জয়দ্রথ হাসিল।

তবে ত ভাল, বলিয়া জজ সাহেব উৎফুল্লভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জজ-গৃহিণী তখনও ভিতরে ভিতরে ফুঁসিতেছিলেন, তিনি স্বামীর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাশীর সিভিল সার্জ্জন যে খুব ভাল একজন 'আই-স্পেশ্যালিষ্টের' নাম করেছিলেন। তুমি ত পকেট বুকে নাম টুকে রেখেছিলে। সে নামটা কি দেখ না?

জজ মনে মনে বিচলিত হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, তাহ'লে পকেট বই আন, তোমার ওষুধের বাক্সের ভেতর

আছে।—গৃহিণী পকেট বই আনিতে উঠিতেছেন দেখিয়া জজ বাহাদুর পুনশ্চ কহিলেন, অমন চাখাচাখি না করাই ভাল। বিশেষ জয়দ্রথ যখন বলছে, উনিই সব চেয়ে ভাল।

গৃহিণী বলিলেন, দেখি না, নামটা!

নাম বাহির হইল, কর্ণেল হিরণ সেন।

জয়দ্রথ বলিল, আমি ত ওর কথাই বলছি।

গৃহিণীর আনন যে পরিমাণ শুষ্ক ও ক্ষুণ্ণ, জজ সাহেব সেই পরিমাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, তাহ'লে কাল সকালে কখন্ যাওয়া?

আটটায় তৈরী থাকবেন, বলিয়া জয়দ্রথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই পদ্মিনী বলিল, ছোট দি কি আসবেই না?

জয়দ্রথ চুপি চুপি বলিল, বাড়ীতে ওঁদের না তোলার একটা কৈফিয়ৎ খুঁজে পেলেই আসবে। এদিকে খুব রাগ ত?

পদ্মিনী মুকুলের ছোট বোন্।

পদ্মিনী সহাস্যে কহিল, হুঁ, খুব। মা সমস্ত দিন আপসাচ্ছেন। বাবা অবিশ্যি চুপ্ চাপ্। আচ্ছা জয়ী-দা, সত্যি কথাটা বলে ফেললে কেমন হয়?

দূর শালি! মুসলমানের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া, এক সঙ্গে থাকা শুনলে তোমার ছোট-দি-টির ত্যাজ্য-কন্যা হওয়া ছাড়া ত আর অন্য গতি দেখি নে। তোমার অবশ্য তা'তে দু'জনের ভাগ একা পাবার সম্ভাবনা হলেও হতে পারে।

আমি ত সেই আশায় হাত ধুয়ে বসে আছি কি-না! চলুন, চা খাবেন চলুন।

কফি খাওয়াস্ ত বল্, বসি।

কফির পাট নেই, জয়ি-দা। বল ত আনাই।

না, দরকার নেই, এক পেয়ালা চা'ই দে।

খানিক পরে জয়দ্রথ যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, জজ সাহেব তাহাকে একটু দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া গোপনে গুটিকতক সৎপরামর্শ দিয়া দিলেন। মোদ্দা কথাটা এই:

স্ত্রীলোকের স্বভাবই ঐ, বুঝলে না বাবা জয়! ওঁরা নিজের সুবিধে অসুবিধেটাই ভাল বোঝেন, পরেরও যে সুবিধে-অসুবিধে আছে সেটা ওঁরা ধর্ত্তব্যই করেন না। পাঁচ বছর পরে মা বাপ এসেছে, তবু যে মুকুল এসে দেখা করতে পারলে না, নিশ্চয়ই তার কারণ আছে —সঙ্গত কারণই আছে। কিন্তু ওঁরা? তুমি তাকে যেন রাগের কথা কিছু বলো টলো না বাবা। আচ্ছা, আর তাহ'লে ঠিক আটটায়? হ্যাঁ, টাকা কড়ি তাহ'লে সঙ্গে নোব না, কি বল?

আজ্ঞে না। আর আমি আটটায় সময় গাড়ী নিয়ে আসবো। বলিয়া জয়দ্রথ আর একবার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

হিরণ সেন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া জয়দ্রথকে বলিল, হাসপাতাল ছাড়া এ অপারেসন করা যাবে না। বল ত একটা বেডের খোঁজ করি।

তা ছাড়া আর উপায় কি!

ডাক্তার সেন তখনই গোটাকতক ফোন করিয়া সমস্ত ঠিক্ করিয়া দিয়া বলিলেন, ১৩৬ নম্বর বেড, আজই নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও গে, কাল দুপুর সাড়ে বারোটায় অপারেসন হবে।

জয়দ্রথ বলিল, তুমিই অপারেসন করবে ত?

নিশ্চয়।

জজসাহেবরা পরকে ধরিয়া ফাঁসীকাঠে লট্‌কাইতে খুবই পোক্ত, নিজেদের অঙ্গে কাঁটাটি ফুটিবার আশঙ্কা হইলে ভাবিয়াই সারা। প্রায় এক শত প্রশ্নোত্তরমালা সাজাইয়া তাঁহারা বাহিরে আসিলেন। জজসাহেব বলিলেন, হাসপাতাল যখন, তখন সবই ফ্রি বোধহয়।

কি জানি, সেটা ত জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আপনি মা'কে নিয়ে ওয়েটিংরুমে একটু বসুন, আমি জেনে আসছি, বলিয়া জয়দ্রথ ভিতরে চলিয়া গেল। কিয়ৎপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, চলুন।

জজসাহেব তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পান্ নাই, উৎকণ্ঠিত ছিলেন, প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করিলেন। জয়দ্রথ বলিল, না, ফ্রি নয়! তবে তার জন্যে ভাবতে হ'বে না।

জজসাহেব খুশী হইলেন এবং অখুশীও হইলেন। টাকার পরিমাণটা না জানিলে কখনও শান্তি পাওয়া যায়? পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, বেডের মূল্য দৈনিক পঞ্চাশ টাকা। জয়দ্রথ একখানা কাগজ বাহির করিয়া শ্বশুরের হাতে দিয়া বলিল, পনেরো দিনের জন্যে বেড নেওয়া হয়েছে।

কাগজটা আর কিছুই নয়, আই-হসপিটালের টাকার রসিদ। জজসাহেব রসিদে লিখিত অঙ্কটার উপর বার বার চক্ষু বুলাইয়া জামাতাকে বলিলেন, পনরো দিনের বেশী লাগবে না, কি বল?

না। ডাক্তার বললে, দিন দশেকের মধ্যেই মা ভাল হয়ে যাবেন। হ্যাঁ, সেন ব'লে দিলেন সন্ধ্যের আগেই যেন বেডে এসে মা শুয়ে পড়েন। বোধ করি ওষুধ টষুধ খাওয়াবে।

জজগিন্নি এতক্ষণ নীরব ছিলেন, এইবার একটি কথা কহিলেন। বলিলেন, বাড়ীতে বায়গা টায়গা থাকলে বাড়ীতেই অপারেসন হয় না?

জয়দ্রথ কথাটার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সে যেন খুবই বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল, জজসাহেব জামাতাকে বিপন্মুক্ত করিলেন; কহিলেন, অপারেশন বাড়ীতে কখণ্‌ন ভাল হয় না। এত আসবাব, এত যন্ত্রপাতি, এত নার্স, এত ওষুধপত্তর বাড়ীতে নেওয়া কি চাট্টিখানি কথা। বাড়ীতে সম্ভব নয় বলেই হাসপাতালে লোকে আসে।

গৃহিণী বলিলেন, যাদের বড় বাড়ী নেই—

জজ তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন—না, না, তা হয় না।

তৃতীয় ভাগ

বিকালে হাসপাতালে আসিয়া দেখা গেল, মুকুল সমস্ত সাজাইয়া বসিয়া আছে। জজসাহেব হাসিয়া বলিলেন, দূর থেকে ভাবলুম, নার্স টার্স বুঝি কেউ বসে আছে। তুই কতক্ষণ এলি মা?

গৃহিণী বলিলেন, কেমন, ভাল আছ ত?

মুকুল, জননীর এই শুষ্ক, স্নেহলেশশূন্য প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া (পাছে ধরা পড়িয়া যায়) বলিল, ভাল আছি মা ; কিন্তু এক বছর ধ'রে আমাদের যে দিন যাচ্ছে তা আমরাই জানি। কাজ কারবার সব লুটে পুটে নিয়ে গেছে, সে ত জানই , তার পর থেকেই পাড়ায় একটা না একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে। অতিথি সজ্জন, ঘর-পোড়া, বাপ-মা মরা, স্বামী-খাওয়া লোক মিলে বাড়ী যেন রথ দোল করে তুলেছে।

মুকুলের মা কথাগুলি শুনিলেন কি-না কে জানে—উচ্চবাচ্য আদৌ করিলেন না এবং মুকুলও যেন ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। কর্ণেল সেন তাহাকে যেমন যেমন উপদেশ দিয়াছেন সেই-ভাবে সে কেবিন টেবিন গুছাইয়া বারান্দায় গিয়া বাবার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। রাত্রে তাহার বাড়ী হইতে তিন জনের খাবারই আসিল—মা'র জন্য ডাক্তারের নির্দ্দেশানুযায়ী তরল খাদ্য, পিতার জন্য বহুবিধ এবং সেই সঙ্গে মুকুলেরও। মুকুল খাইতে বসিয়াছে, তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বাড়ী যাবে না ?

মুকুল হাসিয়া বলিল, বাড়ীতে এত লোক সমাগম, আমি দু' দশদিন না গেলেও কারও নজর পড়বে না।

সত্য সত্যই সে বাড়ী গেল না। পিতার শয্যাপার্শ্বে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। গভীর রাত্রে মুকুলকে নিদ্রিত বুঝিয়া জজ সাহেব স্বগতোক্তি করিতে লাগিলেন, মুকুল আমার মেয়ের মত মেয়ে,আমি জানি কি-না ! অতিথি অভ্যাগত কাউকে ত না বলতে পারে না ও, বাড়ীটি ভরে গেছে মানুষ-জনে ! তাই, তা নইলে কি মুকুল তার অমন ছবির মত বাড়ীতে বাপ মা'কে না তুলে—

গৃহিণী মাঝখান হইতে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, কাল অপারেসন করবে কখন্ বললে ?

জজ সাহেব বলিলেন, সে ত আমি জানিনে, জয়ন্ত্রথ জানে।

তোমার বুঝি কোন খবরই রাখতে নেই ! বলিয়া গৃহিণী ওপাশ ফিরিলেন। কিন্তু ও-পাশ ফিরিয়া থাকিতে পারিবেন কতক্ষণ ? পুনরায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিলেন, খরচ পত্তর ত সব অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছ, সে ত বুঝতেই পারছি, মুখে মুখে খবর রাখা, তাতে ত আর পয়সা খরচ নেই ; সেটুকুও পার না ?

জজ সাহেব কহিলেন, খরচপত্র আমি দিয়ে যাব না বুঝি ?

সে আর আমি জানি নে ; পঁয়ত্রিশ বছর ঘর করেও যদি না চিনে থাকি...

থামাইয়া দিয়া জজ বলিলেন, আচ্ছা, দেখো তখন।

ও আমার দেখা আছে ! বলিয়া জজগৃহিণী পুনশ্চ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন। জজ সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, মানুষ কত সহজেই না মানুষকে ভুল বুঝে ! ইহাতে যে তাহাদের নিজেদের মনই নীচু ও খাটো হইয়া যায় তাহাও তাহারা ভাবে না কেন ! অন্তে কেন ভাবে না, সেই দুর্ভাবনাতেই জজ সাহেব দারুণ চিন্তিত হইয়া বাকী রাতটুকু মনঃকষ্টে কাটাইয়া দিলেন। এই মনঃকষ্ট যে তাঁহার একার তাহা নহে ; দুনিয়ার জজকুলেরই এই দুশ্চিন্তা এবং তাহার অবসানও নাই।

মুকুল ভোরে উঠিয়াই হাসপাতালের লোকজনদের ডাকা ডাকি করিয়া মা'র জন্য বাথরুম সাজাইতে নির্দ্দেশ দিয়া পিতাকে কহিল,বাবা তুমি মুখটুখ ধোও, এখনি তোমার চা আসবে, আমি ততক্ষণ বাড়ীতে একটা, আর ডাক্তারকে একটা—দু'টো ফোন ক'রে আসি। আগামীবারে সমাপ্য

কৃষ্ণা

শ্রীনরেন্দ্র দেব ও শ্রীরাধারাণী দেবী

কৃষ্ণা তুমি নও তো 'কালো' বলে
    কৃষ্ণ তোমার কাজল দু'টি চোখ।
পাঞ্চালে তো নয়কো বাপের বাড়ী,
    তোমরা শুনি এই দেশেরই লোক।
এ-কটু বটে তোমার মাঝে দেখি
    নামের মোহে যাজ্ঞসেনীর রূপ,
আগুন আছে, থাক্‌সে অনির্বাণ ;
    হোমের আলো হোক্ সে প্রেমের ধূপ।
কিন্তু দিদি এমন নজির কৈ
    মহাভারত পর্বে কোথাও নেই,—
পতির গৃহে গেছ্‌লো বারাণসী
    কৃষ্ণা কভু...তাই তো হারাই খেই।

শহীদ্ ছিলেন তোমার শ্বশুর দেশে—
    মাতৃভূমির মুক্তিসাধক জানি।
পুত্রে হেরি সুদক্ষ রণজিৎ,
    লক্ষ্যভেদে কৃতিত্ব তাঁর মানি।
আজ যদিও 'একচক্রা'য় যাবে,
    ইন্দ্রপ্রস্থে হবেই হবে রাণী !
ময়দানবের মহান্ স্ফটিক পুরী
    তোমার তরেই তৈরী হবে জানি।
বীরের সেরা রণজিতেরই প্রাণে
    প্রেরণা দান করবে জীবন-রণে,
এই ভারতের শ্রেষ্ঠ নারীর মাঝে
    স্বাধীন ভারত রাখুক তোমায় মনে।

(ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে)

গান ও স্বরলিপি

পিলু। একতালা

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখে দুখে
ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চির-জীবননির্ভর॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী

[রজ্ঞপা মা জ্ঞমজ্ঞা
• • • ক রে • •

{ সা সরসা - ন্‌া II ন্‌সরা - জ্ঞা -া | -া জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -া | রা রজ্ঞমা - জ্ঞরা I
এ রা • • • প • • • • র্ কে আ প ন • ক রে• • • •

-রা -সা]

I -সা সা | সঋা সঋা সন্‌া | সা -া -া } | -া -া -া I -া -া গা |
• আ প • না • রে• প • র্ • • • • • বা

| গা গা গা | গা মা -া | গা মা -া I -া -া মা | পা মা - জ্ঞরা |
হি রে বাঁ শি র • র বে • • • ছে ড়ে যা • য়্

| রজ্ঞমা -জ্ঞরা জ্ঞা | রা সা -রসন্‌া II
ঘ • • • • র্ "এ রা" • • •

{ [সন্‌া প্‌া]
-া -া প্‌া II { ন্‌া ন্‌া ন্‌া | ন্‌া সা -ন্‌সরা | সন্‌া সা -া | -া -া সা |
• • ভা ন বা সে সু খে ••• দু• খে • • • ব্য

I রা সরা ন্‌া | সজ্ঞা জ্ঞা -া | রা রমজ্ঞা -া | (-া -া রা) } I
থা স• হে হা• সি • মু খে•• • • • ভা

I -া -া পা | পা পা পা | পা পা -া | পধণা ণধা -র্সণধা |
• • ম র পে য়ে ক য়ে • চি•• র• •••

| -পা পদা পদমা | মপা -মগা রগমা | মা -া -া | -গমপা -মজ্ঞরা -মজ্ঞা |
• জী• ব•• ন• •• নি•• র্ভ • • ••• ••• য়্

| রা সা -রসন্‌া II II
"এ রা" •••

রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার জন্য ঔৎসুক্য দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তদনুপাতিক সত্বরতার সহিত স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া, বিশ্বভারতী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক নিযুক্ত স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ পত্রিকায়ও ভবিষ্যতে এইরূপ স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক, ভারতবর্ষ

কতিপয় সরল আয়ুর্ব্বেদীয় চক্ষুষ্য যোগ

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ভিষগ্‌রত্ন

চক্ষুষ্য—চোখের হিতকর। যোগ কথাটি আয়ুর্ব্বেদে প্রেসক্রিপসন্ (prescription) এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শার্ঙ্গধর হইতে :—

(১) ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যদি দীয়তে।
জাতা রোগা বিনশ্যন্তি তিমিরাণি তথৈব চ।

অনুবাদ : ভোজনান্তর হস্ততল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে সঞ্জাত (নেত্র) রোগ বিনষ্ট হয়। তিমির রোগ (চক্ষুর সামনে অন্ধকার দেখা) রোগও নষ্ট হয়।

(টীকা) ভোজনের পর হস্তে কিছু স্নেহময় পদার্থ লাগিয়া থাকে। ঘৃত, দুগ্ধ, পত্রজাত স্নেহ এবং জান্তব যকৃৎ আদি হইতে জাত স্নেহে— ভিটামিন এ (Vitamin A) থাকে। উহা চক্ষুর হিতকারী। চক্ষের পাতায় হাত এমন রগড়াইতে হইবে যেন উহা অঞ্জনের মত পাতার কিঞ্চিৎ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

(২) শার্ঙ্গধর হইতে :—

শীতাম্বুপূরিত মুখ প্রতিবাসরং যঃ
কাল ত্রয়েন নয়ন দ্বিতয়ং মলেন।
আসিঞ্চতি ধ্রুবমসৌ ন কদাচিদক্ষি—
রোগব্যথা বিধুরতাং ভজতে মনুষ্যঃ।

অনুবাদ : যে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে এই তিন সময় মুখ জলপূর্ণ করিয়া নেত্রদ্বয়কে উত্তমরূপে জলে প্রক্ষালিত করে সে অক্ষিরোগ ব্যথার কষ্ট পায় না।

(টীকা) চক্রদত্ত এইরূপ একটি শ্লোক করিয়া বেশ জোর করিয়া চক্ষু মার্জন করিতে বলিয়াছেন (নির্দ্দয়মুক্ষয়ক্ষি)। চক্ষুর ইহার সদৃশ মর্দ্দন (massage) বেটস চক্ষুরোগ পদ্ধতিতে আছে। উদ্দেশ:—(১) Perfect Sight without Glasses—by Dr. W. D. Bate of New York. (২) Better Sight without Glass by Harry Benjamin, London। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এলডুস্ হাক্সলি এই প্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন। ভারতেও কয়েকজন এই প্রথায় সদোষ-চক্ষু আই-সি-এস পরীক্ষার্থীর চক্ষু কার্য্যক্ষম করেন।

(৩) চক্রদত্ত হইতে:—

ত্রিফলা ঘৃতং মধু যবাঃ পাদাভ্যঙ্গ শতাবরী মুদ্গাঃ।
চক্ষুষ্য সংক্ষেপাদ্বর্গঃ কথিতো ভিষগ্ ভিরয়ম্॥

অনুবাদ। ত্রিফলা, ঘৃত, মধু, যব, পাদাভ্যঙ্গ, শতমূলী, ও মুগ ভিষগগণ এইগুলিকে সংক্ষেপে চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতকর বর্গ বলেন।

(টীকা) ত্রিফলা—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া। বীজ বাদ দিয়া সমান মাত্রায় লইতে হইবে। অথবা হরীতকী ১টা, বহেড়া ২টা ও আমলকী ৫টা লওয়া যাইতে পারে। সমবেত মাত্রা প্রায় দুই তোলা হইবে। ত্রিফলার কল্ক (বাঁটা) কাথ (দু তোলা ত্রিফলা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া অবশেষ সিদ্ধ জল) অথবা চূর্ণ আধ তোলা মধু বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ব তিমির (অন্ধতা রোগ) বিনাশ হয়। এই যোগটি চক্রদত্তে আছে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রৈফল ঘৃত চক্ষু রোগের মহৌষধ।

পাদাভ্যঙ্গ:—পায়ে উত্তমরূপে তেল মালিস করা। পায়ের সহিত চক্ষুর নার্ভ যোগ আছে। উহার ফলে চক্ষু ও পায়ের বিবিধ প্রতিক্রিয়া (reflex action) ঘটে। Starling's Principles of Human Physiology গ্রন্থে এইরূপ reflex actionএর দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একটি সংক্ষেপ উদাহরণ—অন্যমনস্কভাবে চলিতেছি, সামনে একটা সাপের মত বস্তু দেখিয়া পা হঠাৎ থামিয়া গেল বা পশ্চাতে বা পার্শ্বে লম্ফ দিল। পায়ে উত্তমরূপে তেল মালিস করিলে কিঞ্চিৎ তৈল ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মর্দ্দনে রক্ত সঞ্চালনের সুবিধা হইয়া স্নায়ুশেষগুলি (nerve endings) তৃপ্ত ও পুষ্ট হয়। ভ্রমণকালে উহারা চক্ষুর আদেশ সহজে পালন করে বলিয়া চক্ষুর শ্রম (strain) কম হয়।

ঘৃত:—ঘৃতস্থ ভিটামিন এ চক্ষুর পরম হিতকর। মধু, যব, শতমূলী ও মুদ্গ সেবনে—যে চক্ষুর হিত হয় তাহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ অভিজ্ঞতার ফলে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাহির বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

গত সেপ্‌টেম্বর মাস হইতে নিউ-ইয়র্কে জাতি সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশন চলিতেছে। জাতি সঙ্ঘ এখন দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে সোভিয়েট রুশিয়া। প্রায় সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রই এই দুইটি শক্তির নেতৃত্বে দুইটি বিবদমান শিবিরে সমবেত হইয়াছে। যে দুই একটি রাষ্ট্রের শিবির স্বতন্ত্রভাবে সংস্থাপিত, তাহাদের মধ্যে ভারতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জাতি-সঙ্ঘের ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল ঔপনিবেশিক প্রথার উচ্ছেদকামী; কোন রাজ্যে বৈদেশিক সৈন্যের অবস্থিতির তাঁহারা বিরোধী। এই নীতি অনুসারে তাঁহারা জাতি-সঙ্ঘে ভোট দেন; কোনও দলের মুখ চাহিয়া নীতি স্থির করেন না।

নিরাপত্তা পরিষদ ও ভারত

জাতি-সঙ্ঘের গত সাধারণ অধিবেশনে ভারতবর্ষ সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের (কর্ম্ম পরিষদ) সভ্যপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু দলগত চক্রান্তের ফলে সে নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই। এবারও প্রধান দুইটি দলের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ভারতের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

জাতি-সঙ্ঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের মোট সভ্য-সংখ্যা এগার। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েট-রুশিয়া, চীন ও ফ্রান্স—পরিষদের স্থায়ী সদস্য। অবশিষ্ট ছয়টি অস্থায়ী সভ্য নির্ব্বাচনের পদ্ধতি এইরূপ—সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ প্রতি বৎসর তিনটি সভ্য নির্ব্বাচন করিবে; উহাদের সভ্য থাকিবার মেয়াদ দুই বৎসর। জাতি-সঙ্ঘের প্রথম সান্-ফ্রান্সিসকো অধিবেশনে সকলে এই ব্যবস্থা মানিয়া লয় যে, দক্ষিণ আমেরিকা হইতে দুইটি, পশ্চিম ইউরোপ হইতে একটি, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে একটি, আরব রাষ্ট্রগুলি হইতে একটি এবং বৃটিশ ডোমিনিয়ন অথবা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে একটি—এই মোট ছয়টি রাষ্ট্র অস্থায়িভাবে নিরাপত্তা পরিষদে নির্ব্বাচিত হইবে। এই বৎসর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, বৃটিশ ডোমিনিয়নের অষ্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব্ব ইউরোপের পোল্যাণ্ডের নিরাপত্তা পরিষদের সভ্য থাকিবার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষ হইতে আর্জ্জেন্টিনা মনোনীত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অন্য সকলে পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে ইউক্রেণ নির্ব্বাচিত হইবার পক্ষপাতী ছিল। মার্কিণ সমর্থিত প্রার্থী ছিল চেকোস্লোভাকিয়া। বৃটিশ ডোমিনিয়ন হইতে ভারত ও ক্যানাডার মধ্যে কে নির্ব্বাচিত হইবে, সেই প্রশ্ন ওঠে। মার্কিণ সমর্থন ছিল ক্যানাডার প্রতি। প্রথম ব্যালটে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাইয়া আর্জ্জেন্টিনা ও ক্যানাডা নির্ব্বাচিত

হইয়া যায়। মার্কিণ সমর্থিত চেকোশ্লোভাকিয়া অত্যন্ত কম ভোট পায়; তাহার সম্পর্কে দ্বিতীয় ব্যালটের আর প্রশ্নই থাকে না। তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ ভারত-বন্ধু হইয়া ওঠে এবং ইউক্রেণের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষের নির্ব্বাচন চায়। অর্থাৎ স্বীকৃত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া মধ্য-পূর্ব্ব-ইউরোপকে প্রতিনিধিবিহীন রাখা এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের দুইটী রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা পরিষদে বসানো তাহার চেষ্টা হয়। ইউক্রেণ সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থিত প্রার্থী। তাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পক্ষাবলম্বন করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে নামিয়াছিল। কানাডা ও ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু কানাডাই ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিক প্রিয়। চেকোশ্লোভাকিয়াকে দিয়া ইউক্রেণের দাবী ব্যর্থ করিবার চেষ্টা যখন সফল হইল না, তখন মার্কিণ প্রতিনিধিরা ভর করিলেন ভারতবর্ষের স্কন্ধে। যাহা হউক, ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া এই অপ্রীতিকর ব্যাপারের অবসান ঘটান।

দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রসঙ্গ

গত বৎসর জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্পর্কে দুইটি ডোমিনিয়নের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা হউক এবং সে আলোচনার ফলাফল জাতি-সঙ্ঘকে জানান হউক। এই প্রস্তাব অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকার করায় এই সম্পর্কে কোনও মীমাংসা হয় নাই। এবার পুনরায় জাতি-সঙ্ঘে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এবার আলোচনা-বৈঠক সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পাশ হইতে পারে নাই; প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের মাত্র তিনটি কম ছিল। ইহার ফলে জাতি-সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে এই প্রসঙ্গ আর উত্থাপিত হইতে পারিবে না। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল পরিবর্ত্তিত আকারে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-বন্ধু (?) মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্র জিদ্ ধরে যে, নূতন প্রস্তাব তুলিতে হইলে পরিষদের পরিচালন কমিটীর দ্বারা সে প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বে এবং এই সময়ও ভারতের প্রধান সমর্থক ছিল সোভিয়েট রুশিয়া।

ভেটো প্রসঙ্গ ও "ক্ষুদ্র পরিষদ"

জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কূটনৈতিক যুদ্ধ হইয়াছে "ভেটো" প্রসঙ্গ লইয়া। জাতি-সঙ্ঘের বিধান এই যে, নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক সকল সিদ্ধান্ত পাঁচটি বৃহৎ শক্তির সম্মতিক্রমে গ্রহণ করিতে হইবে—ভোটাধিক্যে গ্রহণ করিলে চলিবে না।

অসুবিধা এই যে, রুশিয়ার সম্মতি ব্যতীত "ভেটো" অর্থাৎ সর্ব্ব-সম্মতি সংক্রান্ত এই বিধান পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। সাধারণ পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সঙ্ঘের নিয়মতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে পারে বটে; কিন্তু এই দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে বৃহৎ পাঁচটি শক্তি থাকা চাই। অর্থাৎ "ভেটো" ব্যবস্থা রহিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সে প্রস্তাবও "ভেটো" করিবার অধিকার সোভিয়েট রুশিয়ার আছে। এই অসুবিধা এড়াইবার উদ্দেশ্যে মার্কিণ প্রতিনিধিরা এক নূতন প্যাঁচ খেলেন। তাহাদের নেতা মিঃ মার্শাল প্রস্তাব করেন যে, জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের সকল সভ্যরাষ্ট্রের এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া একটি স্থায়ী "ক্ষুদ্র পরিষদ" গঠিত হউক; নিরাপত্তা পরিষদের মত ইহা শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল কাজ করিবে। নিরাপত্তা পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন করিবার উদ্দেশ্যেই যে এই কূটনৈতিক প্যাঁচ, তাহা সুস্পষ্ট।

সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষ হইতে প্রবল আপত্তি ওঠে; সোভিয়েট প্রতিনিধি দেখান যে, সকলের সহযোগে এবং সকলের সম্মতিক্রমে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা জাতি-সঙ্ঘের আদর্শ; আমেরিকার প্রস্তাবে সেই মূল আদর্শই পরিত্যক্ত হইয়েছে। তখন ক্ষুদ্র পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয়—যে বিষয়গুলি নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহা আর ক্ষুদ্র পরিষদে আলোচিত হইবে না; জাতি-সঙ্ঘের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর উপর ও ক্ষুদ্র পরিষদের কর্তৃত্ব থাকিবে না; বিবাদ মিটাইবার ব্যাপারেও ক্ষুদ্র পরিষদ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র পরিষদের উপর কেবল বিরোধের বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রাথমিক তদন্তের এবং সাধারণ পরিষদে সুপারিশ করিবার ভার থাকিবে। মার্কিণ প্রতিনিধিরা এই ব্যবস্থায় সম্মত হওয়ার কারণ আছে। এই ব্যবস্থায় আপাততঃ ক্ষুদ্র পরিষদ ক্ষমতাহীন হইলেও উহাকে ভবিষ্যতে ক্ষমতাশালী করা অসম্ভব না হইতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য যদি উহার নিয়মাবলী পরিবর্তন করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে নিরাপত্তা পরিষদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয় ক্ষুদ্র পরিষদে স্থানান্তরিত হইতে পারিবে। বিভিন্ন সভ্য রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তাহাদের সেনাদলকে ক্ষুদ্র পরিষদের কর্তৃত্বাধীন করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারিবে। রুশিয়া সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করে যে, ভেটো অর্থাৎ সর্ব্বসম্মতি সংক্রান্ত ব্যবস্থা রহিত করিবার প্রাথমিক ব্যবস্থারূপে এই ক্ষুদ্র পরিষদ গঠিত হইল।

প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গ

কিছুকাল পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে একটি কমিটী নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটীর অধিকাংশ সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্রে বিভক্ত করাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। অল্প সংখ্যক সদস্য প্যালেষ্টাইনকে একটি যুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত করিবার সুপারিশ করেন। ভারতীয় প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সমর্থন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্যালেষ্টাইনের ইহুদী বা আরব কোন পক্ষই জাতি-সঙ্ঘ কমিটীর সংখ্যালঘিষ্ঠ রিপোর্ট মানিয়া লইয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী করেন নাই; তাঁহারা দুইটি রিপোর্টই অগ্রাহ্য করেন।

জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে এখন কমিটীর সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্ট অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জেরুজালেম স্বাধীন নগরী হইবে। সোভিয়েট রুশিয়াও প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। তবে, তাহার চেষ্টায় ব্যবস্থা হইয়াছে যে, এই

বিভক্ত করিবার কাজ জাতি-সঙ্ঘ সম্পাদিত করিবে ; অন্তর্বর্ত্তীকালে প্যালেষ্টাইনে কর্ত্তৃত্বও থাকিবে জাতি-সঙ্ঘের, বৃটেনের নহে। ইহুদী ও আরব রাষ্ট্র যাহাতে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়, সে জন্যও সোভিয়েট রুশিয়া সুস্পষ্ট দাবী করিয়াছে। বৃটেন প্যালেষ্টাইনে তাহার ম্যাণ্ডেট ত্যাগ করিবে ; অক্টোবর মাসের মধ্যে তাহার সমস্ত সৈন্য প্যালেষ্টাইন হইতে অপসারিত হইবে। প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করার এই ব্যবস্থায় আরব রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছে। তাহারা অস্ত্রবলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্যালেষ্টাইন সমস্যার প্রকৃত সমাধান কিছুই হইল না। এখানে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অসন্তোষ চলিবে ; ইহার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা চলিতে থাকিবে। জাতি-সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য আরবদের সমর-প্রচেষ্টা দমনের অজুহাতে জাতি-সঙ্ঘের নাম লইয়া বৈদেশিক শক্তি প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে অনির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে।

৩০।১১।৪৭

নীলগিরি

শ্রীজনরঞ্জন রায়

সাম্প্রতিক ঘটনা নীলগিরিকে লোকচক্ষের অত্যন্ত সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে। আজ আমরা একটু ঘনিষ্ঠভাবে তাহার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিতেছি।

নীলগিরি একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহার উৎকট স্বৈরাচারের কাহিনী উড়িষ্যার রাজন্যবর্গের ইতিহাসে কলঙ্কপাত করিল !

যে "পূর্ব্ব ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ইউনিয়ন" ১৯৩৫ সালে গঠিত হয়, ইহা তাহার তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেছিল। উক্ত ইউনিয়নের প্রথম শ্রেণীতে পড়িত—ময়ূরভঞ্জ, ত্রিপুরা ও কুচবিহার। দ্বিতীয়ে—ঢেঙ্কানল, আটগড়, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি। তৃতীয়ে—খাসমা, নরসিংহপুর, নীলগিরি প্রভৃতি।

দাক্ষিণাত্যভ্রমণকারী পশ্চিম বাঙ্গালার শ্যামল সমতল পার হইয়া, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে কঠিন প্রস্তরে লীলায়িত বালেশ্বরের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়েন। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার আকাশচুম্বী মহিমা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে। নীলগিরি এই পর্ব্বতমালারই অন্যতম। বালেশ্বরের ১১ মাইল দক্ষিণে তাহা অবস্থিত। এজন্য রেল লাইন হইতে তাহা ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় না। নীলগিরির একাংশের নাম 'স্বর্ণচূড়'। উজ্জ্বল সূর্য্যরশ্মি উদ্ভাসিত এই চূড়াটির শোভায় মুগ্ধ হইয়া কে কবে এই নামকরণ করিয়াছিলেন তাহা কালের অজ্ঞাত-ক্রোড়ে চিরদিন লুক্কায়িত থাকিবে। কিন্তু যিনিই ইহার নাম দিয়া থাকুন, আমাদের ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তরুগুল্মহীন এই নগ্ন পর্ব্বত চূড়ার প্রতি তাঁর অন্তরের কত দরদ ছিল এবং তাহার একমাত্র শোভা ঐ সূর্য্য কিরণের প্রতিফলনটিকে তিনি কি গৌরব দান করিয়াছেন !

রাজ্যের চতুঃসীমা সম্বন্ধে জনৈক উড়িয়া কবি এইরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"উত্তররে বালেশ্বর, পশ্চিমে ভূধর,
দক্ষিণে কটক, পূর্ব্বে অসীম সাগর,
মধ্যে 'জগন্নাথ-দাণ্ড' কটীরে মেখলা,
ইষ্টক কঙ্কর গেরুমাটি অঙ্গে বোলা।"

নীলগিরির অবস্থান এই কবিতাটি হইতে অনেকটা অনুমান করা যায়। কোন্ পথ দিয়া এখানকার 'আদিবাসী'রা আনাগোনা করিত তাহা জানা যায় না। নীলগিরিতে উড়িয়া অধিবাসীগণপরিচালিত 'প্রজা মহামণ্ডলের' বিরুদ্ধে আদিবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে এখনও গিরিপথে যাতায়াত করা যায়। তবে তাহা শুধু ঐসব পাহাড়িয়া আদিবাসীগণের পক্ষেই সম্ভব। এখন একমাত্র পথ বালেশ্বর দিয়া এবং সেখানে আসিয়া 'জগন্নাথ দাণ্ড' অর্থাৎ—পুরী যাইবার ট্রাঙ্ক-রোড (দাণ্ড অর্থে বড় রাস্তা) দিয়া বহির্জগতে যাতায়াত করা চলে। এখন বালেশ্বরে আসিয়া রেলে চড়িলেই হইল।

নীলগিরি রাজ্যের পরিধি ২৮৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৮০০০, আয় প্রায় ৩ লক্ষ টাকা (নীলগিরি সম্বন্ধে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত ১৪।১১।৪৭ তারিখে প্রকাশিত বিবরণী মতে)।

নীলগিরির প্রাচীন রাজবংশ রাজপুত, অথবা প্রাচীনকালের উড়িয়া ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের উপাধি ছিল মর্দ্দরাজ। এখন পোষ্যপুত্রে আসিয়া ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ এখানকার অধীশ্বর। ময়ূরভঞ্জের রাজ উপাধি ভঞ্জদেও। ভঞ্জদেওগণ নিজেদের সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের আদিপুরুষ জয়সিংহ নামক জনৈক ভাগ্যান্বেষী আকবর বাদশাহের সময় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের পার্ব্বত্য বন্যদেশে বসতি স্থাপন করেন। ভঞ্জ রাজবংশের একাংশ ময়ূরকে দেববাহন বলিয়া মনে করেন। এজন্য ময়ূরভঞ্জে ময়ূর শিকার নিষিদ্ধ। তাঁহারা ময়ূরধ্বজ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াও থাকেন। হয়তো পূর্ব্বকালে ভঞ্জ-রাজধ্বজা ময়ূরাঙ্কিত ছিল, এখন কিন্তু তাহা নাই। এইসব পার্ব্বত্য উপনিবেশকারীগণ ময়ূর, নাগ প্রভৃতি দিয়া নিজেদের বংশকে কেন আখ্যায়িত করিতেন তাহার কারণ জানা যায় না। ভঞ্জবংশের

ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার যেমন ময়ূরবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তদধীন কণ্ডিপদা রাজবংশ সেইরূপ নাগবংশীয় বলিয়া নিজেদের পরিচিত করেন।

আকবরের সময়ে ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবার স্থাপিত হইয়া থাকিলে উহা ১৬শ শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু নীলগিরি রাজবংশ কবে স্থাপিত হইয়াছে তাহা ভালভাবে জানা যায় না। তবে সমকালে হওয়াই সম্ভব।

ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীরামচন্দ্র কেশব সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচারু দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল শ্যামচন্দ্র। শ্যামচন্দ্র রক্ষণশীল ও কিছু অসহিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্রাহ্ম বিবাহের জন্য তিনি রাজ্য মধ্যে ঘোর প্রতিবাদ তুলেন। যাহার জন্য সুচারু দেবীর বিবাহিত জীবন অশান্তিপূর্ণ হয়। এই শ্যামচন্দ্রই ভবিষ্যতে নিঃসন্তান নীলগিরিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের পোষ্যপুত্ররূপে নীলগিরিতে আসেন। এখনকার নীলগিরির রাজা তাঁহার পুত্র শ্রীকিশোরচন্দ্র ভঞ্জদেও-মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর-রায় শ্রীচন্দন-মহাপাত্র। এত বড় নামের দ্বারা কোন্ পরিচয়

মহারাজার প্ররোচনায় আদিবাসীদের হাতে ভস্মীভূত প্রজামণ্ডল অফিস

পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বুঝা শক্ত। আমরা জানি কটকের কেন্দ্রাপাড়া মহকুমার প্রধান জমিদার বংশের জ্যেষ্ঠের উপাধি মর্দ্দরাজ। কনিষ্ঠ-দ্বয়ের উপাধি যথাক্রমে হরিচন্দন ও শ্রীচন্দন। নীলগিরির রাজার নামের সঙ্গে এইভাবে ময়ূরভঞ্জের রাজোপাধি, নীলগিরির রাজোপাধি প্রভৃতি অনেক পরিবারের উপাধি আছে, তার সঙ্গে 'মহাপাত্র' উপাধিও আছে। মহাপাত্রের অর্থ কিন্তু প্রধান-অমাত্য। কেন তিনি এই উপাধিও বহন করেন তাহা আমরা জানি না। তবে সম্প্রতি তিনি প্রধান অমাত্যের কোনো ধার ধারিতেন না তাহা আমরা জানি।

* সন ১৯২৫ সালে ২১ বৎসর বয়সে তিনি গদি পান।

তাঁহার এই ৪৩ বৎসরের জীবনেতিহাস বিশেষ বৈচিত্র্যময়। বারবার আঘাত পাইয়াও তাঁহার বিচার বুদ্ধির মোড় ঘুরে নাই। ফলে তাঁর পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল।

রাজা নিজে সুপুরুষ। তিনি রায়পুরের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। বিলাস, ব্যসন ও সংস্কৃতি বিরোধী শিক্ষা দিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নৃপতিবৃন্দকে কিরূপ অমিতব্যয়ী ও স্বেচ্ছাচারী করিয়া দেওয়া হয়, ইংরেজ চালিত এই রাজকুমার কলেজ তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। সেই শিক্ষাগুণে স্বাধীন ভারতের চক্ষে এই রাজকুমারগণ প্রায় সকলেই একান্ত হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন।

রাজা ভাল শিকারী এবং বিলিয়ার্ড খেলায় পারদর্শী। ভাল অভিনেতা ও সঙ্গীতানুরাগী। থিয়েটারের স্পৃহা তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, তিনি নিজে এখানে অতি আধুনিকভাবের একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইয়াছেন। গদি প্রাপ্তির পর তিনি একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। তদানীন্তন ইংরেজ রাজনৈতিক-প্রতিনিধি তাঁহাকে তখন একটি পরম পতনশীল পথের অনুবর্ত্তী করিয়া দিয়া গেল। যেন রাজকুমারের শিক্ষাকেন্দ্রে এইটুকুর পরিচয় দানই বাকী ছিল! যে পথের অভিযাত্রী হইয়া আজ তিনি সমস্ত রাজ-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন।

রাজা প্রথমে বিবাহ করেন ওক্কানীর (গুজরাটের) রাজ-কন্যাকে।

নীলগিরির একটি গ্রামে বিজয়ী মুক্তিসেনাগণ

তাঁহার একটি কন্যা সন্তান হওয়ার পর তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন রাঁচির এক জমিদার কন্যাকে। তিনি তাঁর মামাতো ভগ্নী। ইহা এই দেশে প্রচলিত অন্যতম তেলেগু প্রথা বলিয়া মনে হয়। তেলেগু সমাজে অবশ্য ভগ্নীকে বিবাহ করা শ্রেষ্ঠ বিধি। তাহারা মামাতো ভগ্নীকেও বিবাহ করে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রাজার একটি পুত্র হইয়াছে। এখন তাহার বয়স ১৭ বৎসর। রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক জুড়িয়া সংরক্ষিত শাল বন। এখানে ময়ূর মারার কোনও বাধা নাই, কিন্তু বাঘ মারা নিষিদ্ধ। কেবল রাজা নিজে ও ইংরেজ অতিথিগণ ব্যাঘ্র শিকার করিয়া থাকেন। এই সব জঙ্গলের সানুদেশে বাস করে সাঁওতাল, মাকড়িয়া ও কোল জাতীয় লোকেরা। তাহারাই আদিবাসী বলিয়া পরিচিত। রাজা ইহাদের অনেককে আগ্নেয়াস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। রাজ্যের উড়িয়া অধিবাসীদের

সঙ্গে সম্প্রতি ইহাদের বৃদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই আছে। উড়িয়া প্রজাবর্গ 'প্রজামণ্ডল' স্থাপন করিয়া রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে ইহারা প্রায় অর্দ্ধাংশ। সাঁওতালগণ এখনও বাঙ্গালা ভাষা ভাষী।

রাজার উড়িষ্যা প্রদেশে কতকগুলি জমিদারীও আছে। সেগুলি অবশ্য রাজার নিজস্ব হইলেও 'ঠাকুর মহাল' অথবা দেবোত্তর বলিয়া পরিচিত। নিজ রাজ্যের বাহিরে জমিদারী রাখা নৃপতিদের পক্ষে (ইংরেজী) আইন বিরুদ্ধ। তাই বোধ হয় ঐ সব সম্পত্তি দেবোত্তর করা হইয়া থাকিবে। কনকদূর্গা ব্যতীত অন্যান্য দেবসেবাও আছে। প্রত্যেক বিগ্রহের উৎসবাদি প্রতিপালিত হয়।

রাজকার্য্যে দেওয়ানেরই নামতঃ সব ক্ষমতা ছিল। কিন্তু রাজার আদেশমতই শাসন-শোষণযন্ত্র পরিচালিত হইত। রাজকর্ম্ম চারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দেওয়ান, তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩০০৲। তৎপরে বন বিভাগের কর্ত্তা, বেতন ছিল মাসিক ২০০৲। তৎপরে সহকারী দেওয়ান ও ডাক্তার—তাঁহাদের প্রত্যেকের ১৫০৲ করিয়া এবং পুলিশ

নীলগিরি রাজ্যের শাসনভার গ্রহণের পূর্বে ভারতীয় ইউনিয়নের সেনাগণের পুরোভাগে বক্তৃতারত উড়িষ্যার মন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী

বিভাগের কর্ত্তার মাসিক ১০০৲ করিয়া বেতন ছিল। রাজার খাস মুন্সির বেতন মাসিক ২০০৲ ছিল।

রাজার পিতা মৃত্যুকালে রাজকোষে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান। স্বর্ণচূড় পর্ব্বতের পাদদেশে রাজা বিজলীবাতি সংযুক্ত অত্যাধুনিকভাবে মর্ম্মর খচিত দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তাঁহার বাদশটি হস্তী ও ২৮ খানি মূল্যবান মোটর গাড়ি ছিল।

নীলগিরির প্রধান উৎসব ছৌনাচ। উড়িষ্যার একশ্রেণীর হিন্দুগণ সারা চৈত্র মাস বসন্তোৎসবে মত্ত থাকে। পার্ব্বত্যগণের মধ্যে সেই সময়ে ছৌনাচ অন্যতম। ভঞ্জরাজ গোষ্ঠীর মধ্যে নীলগিরি ও সরাইকিল্লাতে রাজ অনুগ্রহে এই নৃত্য সমধিক উন্নততর কলানৈপুণ্য প্রকাশে সমর্থ হয়। নীলগিরিরাজ সঙ্গীত বিশারদ হইলেও নিজে নৃত্য করিতেন না। কিন্তু সরাইকিল্লার চতুর্থ কুমার মৃত শুভেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নিজে ছৌনাচ দ্বারা ইটালী, ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের বিস্ময় উৎপাদন করেন। কবিগুরু স্বয়ং তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহা ভারতের যুদ্ধনৃত্যের রূপটি ফুটাইয়া তুলে। ছৌ অর্থে ছাউনি (camp)। এজন্য ছৌনাচকে আমরা যুদ্ধনৃত্য বলিতেছি। নৃত্যকারের মল্লবেশ, মালকোঁচা আঁটা বস্ত্র, গায়ে অঙ্গরাখা যেন কবচের কল্পনা আনে, মাথায় পাগ্‌ড়ি যেন শিরস্ত্রাণের অনুকৃতি বলিয়া মনে হয়। হাতে ঢাল ও তরবারি, কখনও বা ঢাল ও বর্শা। কোমরবন্ধে ঘুঙুর থাকে। পুরুষগণই নাচে। রবীন্দ্রনাথ এই নাচ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—"আমি এই নৃত্য দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আমাদের ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবার পথে চলিয়াছে। তাহার একটি বিশিষ্ট রূপকে এই রাজবংশ দীর্ঘকাল সুরক্ষিত করিয়া আসিতেছেন, ইহা তাঁহাদের গৌরবের বিষয় এবং তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার কামনা এই যে, আধুনিক কালের কোনও অনুকরণ যেন ইহাকে আবিল না করে—বর্ত্তমান রুচিবিকারের আক্রমণ হইতে ইহা যেন আত্মরক্ষা করিতে পারে" (বিশ্বভারতী হইতে ৬।২।৩২ সালে সরাইকিল্লাতে লিখিত বিশ্বকবির পত্রের একাংশ)।—ইহা হইতে প্রমাণ হইবে

নীলগিরি প্রজামণ্ডল আন্দোলনের নেতা শ্রীকৈলাস মণ্ডলীকে সম্বর্দ্ধনা

ছৌনাচের মৌলিকতা কি। এই ছৌনাচের সম্প্রদায়কে ইউরোপ প্রভৃতি স্থানের অভিজ্ঞ সমাজের নিকট সমুপস্থিত করিয়া প্রসিদ্ধ কলাবিৎ স্বর্গীয় হরেন ঘোষ মহাশয় ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন। আততায়ীর নির্ম্মম হস্ত আজ তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। স্বাধীন ভারত তাঁহার অভিজ্ঞতাঅর্জ্জিত সেবা হইতে বঞ্চিত হইল। ছৌনাচের কলা-নিপুণ যুবক শুভেন্দ্রের অকাল মৃত্যুতেও আমরা দুঃখ অনুভব করি। আরও একান্তভাবে দুঃখিত হই নীলগিরিরাজ কিশোরচন্দ্রের জন্য। তিনি এতবড় কলাবিৎ হইয়াও শেষে ছৌনাচকেই নিজ স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র স্বরূপে ব্যবহার করিলেন। বার্ষিক নৃত্যের পর পারিতোষিক বিতরণ কালে তাঁহার অনুগত দলকে নির্ব্বিচারে তিনি পুরস্কৃত করিতেছিলেন। যাহার ফলে প্রজাগণের মনে অসন্তোষের বীজ বপন করেন। যে অভি-

কথা তাহার নিরন্তর অত্যাচারের ইন্ধনযোগে আজ তাঁহারই ধ্বংসের জন্ত সহস্রজিহ্ব দাবানল সৃষ্টি করিয়াছে।

নীলগিরি রাজ্যে প্রথম প্রজাবিদ্রোহ হয় রাজপ্রবর্ত্তিত 'মাগন' (চাঁদা) আদায়ের প্রতিবাদে ১৯৩০ সালে। রাজাদেশে অতি নির্ম্মমভাবে তখন প্রজাদলন হইয়াছিল। এই অত্যাচারের ধূমায়িত অগ্নি 'প্রজামণ্ডল' আন্দোলনের জন্মদাতা। তাহার শক্তিসঞ্চয় করিতে বারো বৎসর লাগে। ১৯৪২ সালে প্রজামণ্ডল দৃঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নীলগিরির মুক্তিসংগ্রামের জন্ত এই প্রজামণ্ডল আজ দেশবাসীর কাছে জয়মাল্যে ভূষিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে কয়েক বৎসরে উড়িষ্যার বিশেষ-বিশেষ নৃপতিবর্গ প্রজাদলনে সব্যসাচী হইয়া উঠেন। এই সময়ে আটগড়ের রাজা ও ঢেঙ্কানলের রাজা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪০ সালে রণপুরের রাজা গদিচ্যুত হইয়াছেন। নীলগিরিতে নির্ব্বিচারে বহু প্রজাহত্যা হওয়ায় ১৯৪৩ সালে ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষ রাজার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া রাজ্য শাসনের জন্ত একজন দেওয়ানকে নিয়োগ করেন। শাসনকার্য্যে তথাপি রাজা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকিলে তাঁহাকে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ রাঁচিতে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৪৭ সালের প্রথমভাগে রাজা পুনর্ব্বার ক্ষমতা পান এবং নীলগিরিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আদিবাসীদের উত্তেজিত করিয়া প্রজামণ্ডলের সভ্যদের প্রতি অত্যাচার করিবার অপকৌশল যেন তিনি প্রবাসে বসিয়াই ঠিক করিয়া আসেন। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজকে লোকমতের প্রবলশক্তি দেশছাড়া করিল, ইহা দেখিয়াও এই ক্ষুদ্র নৃপতির চৈতন্যোদয় হয় নাই। এইরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের হাতে শাসনক্ষমতা থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ। কেন্দ্রে যদি শক্তিশালী ভারত-সরকার না থাকিতেন, তবে উড়িষ্যার প্রাদেশিক সরকার ইঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না।

নীলগিরির রাজার সম্মুখে আত্মসমর্পণের দলিল পাঠ

নীলগিরিতে কোন খনিজ সম্পদ আছে বলিয়া প্রকাশ নাই। সেখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য পাথরের বাসন। কিছু কিছু পাথরের দেবমূর্ত্তিও প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ ধোঁয়াটে রঙের 'মুগ্‌নি' পাথর দ্বারা এইসব প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। খণ্ডাপাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটে এই ধরণের দ্রব্য প্রস্তুতের বহু কারখানা আছে। খণ্ডাপাড়া হইতে চালান হইয়া ইহা দেশবিদেশে যায়। এই কুটীর শিল্প ক্রমে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। প্রধানভাবে প্রস্তরময় পাত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুর সংস্কার পরিবর্ত্তন ইহার কারণ। প্রাদেশিক সরকার সত্বর মনোযোগী না হইলে এই প্রাচীন প্রস্তরশিল্প-কেন্দ্র ধ্বংস হইয়া যাইবে। কাঁচনির্ম্মিত বহুদ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যসকল গঠিত করিয়া প্রচলনের চেষ্টা করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নয়।

সম্প্রতি ভারতসরকারের দেশীয় রাজ্যবিভাগ নীলগিরি রাজ্যের শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। নীলগিরি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলেই ভারতসরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গত ১৪ই নভেম্বর (২৭শে কার্ত্তিক) তারিখে উড়িষ্যা প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ দূত হিসাবে রাজস্ব বিভাগের কমিশনার নীলগিরির রাজাকে তাঁহার হস্তে রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিতে বলেন এবং রাজপ্রাসাদ ও রাজাকে রক্ষা করার আশ্বাস প্রদান করেন। এক্ষণে বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নীলগিরির শাসনকার্য্য চালাইতেছেন।

এইরূপে নীলগিরির স্বৈর-শাসনের অবসান হইল এবং তথাকার প্রজামণ্ডলের আন্দোলন জয়যুক্ত হইল। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই গণ আন্দোলনের কর্ম্মী ও নেতাগণকে অভিনন্দন করিতেছি। অচিরেই তাঁহারা অনগ্রসর আদিবাসীদের বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একযোগে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়া নিজেদের হস্তে শাসনভার গ্রহণে সমর্থ হইবেন আশা করা যায়।

উড়িষ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ১৬টি রাজ্য পূর্ব্ব ভারতীয় ছত্রিশগড় মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ১লা আগষ্ট হইতে যে মিত্র সংসদ গঠিত করিয়াছিল, ভারতসরকার তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং ঐসব রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে সেগুলিরও শাসনভার সরকার নিজেরা লইবেন। ইহাতে উড়িষ্যার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত হইবে। ইহাও নীলগিরির গণ-আন্দোলনের ফল স্বরূপ। এই প্রদেশের দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলনের অগ্রদূত নীলগিরি প্রজামণ্ডল ইহার জন্তও অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

বনফুল

১২

মাঠের মাঝখানে একটা বটগাছের ছায়ায় সদারঙ্গবিহারী-লাল তাঁর মোটরবাইক থেকে অবতরণ করলেন, রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে চারিদিকে চাইলেন একবার। রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, কোনটা ধরবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। মনে হল কাছাকাছি এসে গেছেন এইবার, এ সব সম্ভবত দিগ্বিজয়বাবুরই জমিদারি। তবু একটু খোঁজ করতে হবে। ঝুনু ভাবলে তার বিলম্বিত-হলেও অনিবার্য্য মৃত্যু এবার আসন্ন হয়ে এসেছে—হঠাৎ কোটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে সে একবার প্রাণপণে—পারলে না। সদারঙ্গবাবু দেখলেন —অদূরে আর একটি বটগাছের নাচে একটি গরুর গাড়ি রয়েছে এবং তাতে একটি বৃদ্ধ বসে আছেন। ভদ্রলোক বলেই মনে হল। এগিয়ে গেলেন সেদিকে। বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি তাদৃশ প্রখর নয়, সদারঙ্গবিহারী যে তাঁর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন বলে' মনে হল না। আপন মনেই কি যেন বলছিলেন তিনি এবং মাথা নাড়ছিলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি মুখ তুলে চাইলেন। প্রথমেই চোখে পড়ল ঝুনুর মুখটা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিলেন অন্যদিকে। দাড়ি-গোঁফওলা একটা জানোয়ার একজন ভদ্রলোকের কোটের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত এবং অস্বস্তিকর। এ আবার কি বিপদ জুটল এসে! নিজের জ্বালাতেই তিনি অস্থির হয়ে আছেন—এ আবার—

"নমস্কার। আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন—"

"খবর? একটিমাত্র খবরই এখন মস্ত হয়ে রয়েছে আমার কাছে, সেটা যদি শুনতে চান বলতে পারি"

সদারঙ্গবিহারীলালের পরোপকার-বিকীর্ষু অন্তঃকরণ কৌতূহলী হয়ে উঠল, মনে হল ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন হয়তো।

"নিশ্চয় শুনব, কি বলুন"

"ধানের চেষ্টায় বেরিয়েছিলাম, দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠেছে। খালি বোরাগুলি নিয়ে মানে মানে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা-ও যেতে পারছি না। জল খেয়ে আসি বলে' গাড়োয়ান ব্যাটা সেই যে কোথায় সরেছে এখনও তার পাত্তা নেই"

"ও। তাহলে তো মুস্কিলে পড়েছেন আপনি"

"সারাজীবনই একনাগাড়ে মুস্কিল চলেছে মশাই। এই করেই সত্তরটা বছর কাটিয়ে দিলাম, আরও যে ক'টা দিন কর্ম্মভোগ আছে করতে হবে। কিন্তু ধানের অবস্থা যদি এই দাঁড়ায়, তাহলে লোকে বাঁচবে কি করে' বলতে পারেন"

সদারঙ্গবিহারীলাল বুঝতে পারলেন—এ ব্যক্তির উপকার করা তাঁর সাধ্যাতীত। ধানের দর কমাতে তিনি পারবেন না।

"আচ্ছা, একটা খবর—"

"খবরই তো বলছি মশাই, শুনুন না। এই খবরই তো আসল খবর। আপনারা শহুরে বাবু, এ সব খবরের ধার ধারেন না হয়তো, কিন্তু ধানের খবরই আসল খবর। ধানের এই অবস্থা হলে জান বাঁচবে না কারও তা' বলে দিচ্ছি—বাইশ টাকা মণেও দিতে চাইলে না মশাই—"

"ও, তাই না কি। তাহলে চালের দর আরও চড়বে? বার্ম্মা-রাইস না আসাতেই এ রকম হচ্ছে—"

"ওই এক ধুয়ো তুলেছেন আপনারা। বার্ম্মা-রাইস নাই এল, বিনুমোড়লের গোলায় ধান ঠাসা রয়েছে দেখে এলাম, বদমাইসি করে' ছাড়ছে না। আমি দেখব কেমন খদ্দের জোটে ওর। লক্ষ্মণ ব্যাপারীকে চেনেন নি বাছাধন এখনও—"

আপন মনেই আর একবার মাথা নাড়লেন। সদারঙ্গ-বিহারীলালের হঠাৎ একবার মনে হল, বার্ম্মা-রাইসের সঙ্গে বিনু মোড়লের গোলার ধানের অর্থ নৈতিক যোগাযোগটা কোথায় তা চট করে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

"সেদিনকার ছোঁড়া বিনে—এখন বিনু মোড়ল হয়েছেন। তার বাপকে চরিয়েছি, ঠাকুরদাকে চরিয়েছি—সে ওপর-টপকা চাল মারবে আমার ওপর—"

সদারঙ্গবিহারীলালের উপস্থিতিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে' বৃদ্ধ নিজের মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে উল্লিখিত অর্দ্ধ-স্বগতোক্তি করাতে সদারঙ্গবাবু থমকে গেলেন একটু। তাঁর রসনায় যে অর্থ নৈতিক বক্তৃতাটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল তা বাধ্য হয়ে সংযত করে' ফেলতে হল তাঁকে!

"আচ্ছা, একটা খবর বলতে পারেন। মুচুকু—"

"এই বলে' দিলাম আপনাকে ওই বিনেকে গলবস্ত্র হয়ে পৌনে একুশ টাকায় ধান ছাড়তে হবে—না যদি হয় নাক কেটে ফেলব আমি—"

বলে' ভদ্রলোক নিজের নাকে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে চাইলেন। সদারঙ্গ-বিহারীলাল আড়চোখে একবার তাঁর নাকের দিয়ে চেয়ে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিলেন অন্য দিকে।

"তোর ধান তুলসী-মঞ্জরীও নয়, রূপশালীও নয়—"

"মুচুকুন্দ কুন্তলেশ্বরী এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন"

"পারি বই কি। সেখানে যাওয়া হচ্ছে কেন"

"এই কুকুরটাকে পৌঁছে দিতে হবে"

"ওটা কি কুকুর না কি"

"হ্যাঁ, কুকুর বই কি। বিলিতি-কুকুর"

"তাই বলুন বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-কুকুর কুকুর নয়, বিলিতি-কুকুর। বিলিতি-বেগুন যেমন বেগুন নয়, বিলিতি-বেগুন। মাল নিয়ে কেনা-বেচা করি আমি, আমার কাছে বেফাঁস কথা চলবে না"

সদারঙ্গবাবু অবাক হলেন। ভদ্রলোকের শুধু অর্থ-নৈতিক নয় প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান নেই। আশ্চর্য্য! এঁর মনে আলোকপাত করা কর্ত্তব্য। অন্তত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—নিশ্চয়ই!

"কুকুর বলতে আপনি কি বোঝেন"

"ওতে আবার বোঝাবুঝি কি আছে। আপনি যা বোঝেন আমিও তাই বুঝি"

"তবু শুনি না আপনার ধারণাটা কি রকম"

"আপনার ধারণা যে রকম"

"আমি যদি বলি আমার ধারণা এটাও কুকুর"

সদারঙ্গবাবু ঝুমুকে দেখিয়ে হাসলেন একটু।

"তাহলে আমি বলব আপনার ধারণা ভুল। ওটা বিলিতি কুকুর"

"বিলিতি কুকুর কি কুকুর নয়?"

"আপনিই আগে বলুন বিলিতি-আমড়া কি আমড়া? বিলিতি-দুধ কি দুধ? বিলিতি রুটি কি রুটি?"

সদারঙ্গবিহারীলাল উপলব্ধি করলেন—এ ব্যক্তির মনে আলোকপাত করতে হলে অনেক ধৈর্য্য এবং সময়ের প্রয়োজন। ধৈর্য্য তাঁর আছে, কিন্তু সময় আপাতত নেই। অন্য সময়ে চেষ্টা করা যাবে—করতেই হবে—ভদ্রলোকের বাড়িটা কোথা জেনে নেওয়া যাক।

"আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল। আপনার নিবাস কোথা?"

"কেন"

"সুবিধে পাই তো গিয়ে পড়ব একদিন"

সদারঙ্গবিহারীলালের চক্ষু প্রদীপ্ত এবং হাসি আকর্ণ হয়ে উঠল।

"আমার বাড়ি কাঁটকে"

"সে কোন দিকে"

"কাঁটকের নাম শোনেন নি! শালিকপুর কাঁটকে"

"এখান থেকে কতদূর"

"এখান থেকে বার ক্রোশ হবে। সোজা উত্তর দিকে গিয়ে ভগবানগঞ্জের কাছ বরাবর পশ্চিমে বেঁকতে হবে। মাঝে নদী আছে গোটা দুই। বৈতি আর চাকা—"

"মশায়ের নাম কি"

"লক্ষণচন্দ্র কুণ্ডু"

"আচ্ছা, যেতে চেষ্টা করব একদিন"

নোটবুক বার করে' সব টুকে নিলেন সদারঙ্গ-বিহারীলাল।

"আচ্ছা, মুচুকুন্দ কুণ্ডলেশ্বরী কতদূর এখান থেকে"

"গরুর গাড়িতে গেলে ঘণ্টা দুই লাগবে—তাও অবশ্য নির্ভর করবে গরু কেমন তার উপর, শুধু তাই নয় —গাড়োয়ান কেমন হাঁকায় তার উপরও। আমার ভাগ্যে যেমন জুটেছে এইরকম পক্ষীরাজ গরু আর সুমন্ত্র গাড়োয়ান যদি হয় তাহলে—"

"কোন দিকের রাস্তাটায় যাব"

"সোজা চলে যান না"

"বাঁ-দিকে, না ডান-দিকে"

"ডান-দিকের রাস্তাটা কি সোজা? বেঁকে গেছে দেখছেন না?"

সদারঙ্গবিহারীলাল আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে' বাইকে সওয়ার হলেন।

আর মিনিট পাঁচেক আগে যদি তিনি পৌঁছতে পারতেন তাহলে দিগ্বিজয়-দম্পতির সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুদের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' অবশেষে তাঁরা যে কজন এসে পৌঁচেছিলেন তাঁদের নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিলেন শিকার-অভিযানে। সুরেশ্বরী দেবী গিয়েছিলেন নানাবিধ আহারের সরঞ্জাম নিয়ে। তিনি তাঁবুতে থাকবেন।

সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুরা না আসতে দিগ্বিজয় ভাবছিলেন তিনিই বোধহয় গোলমাল করে' ফেলেছেন সব। কোনও কারণে না আসতে পারলে তারা একটা খবর দিত নিশ্চয়। দু জনে দু'জায়গা থেকে আসবে, দুজনেই যখন আসে নি এবং কোনও খবর দেয় নি, তখন তিনিই গোলমাল করে' ফেলেছেন নিশ্চয়।

"বুঝলে তারিখের গোলমাল করে' ফেলেছি সম্ভবত। দুজনকেই একসঙ্গে চিঠি লিখেছিলাম তো, দুজনকেই ভুল তারিখ জানিয়েছি, মানে দু'দুবার ভুল করেছি। তারা বেরোয় নি। হঠাৎ কবে এসে পড়বে কে জানে! তারা ভাববে আমরা তাদের প্রত্যাশায় আছি, আমি যে তারিখ ভুল করেছি তাতো জানবে না তারা—"

সুরেশ্বরী দেবীর কণ্ঠে হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠল। দিগ্বিজয় বললেন—"কিন্তু তাদের চিঠি এসেছিল তো। তাতে লেখাও ছিল কোন তারিখে কোন ট্রেণে আসছে তারা। চিঠি দু'খানা তোমাকেই দিলাম কি সেদিন?"

"হ্যাঁ, দিলে তো"

সুরেশ্বরী টেবিলে, তাকে এবং অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানে খুঁজলেন। পাওয়া গেল না।

"পেলে?"

"কই না। টেবিল থেকে মেজেতে পড়ে গিয়েছিল বোধহয়। চাকরটা হয়তো পাঁশ-গাদায় ফেলে দিয়েছে"

"কোথায়?"

"পাঁশ গাদায়—ওই যে বাগানের ওধারে ছেঁড়া কাগজপত্তর গুলো ফেলে দেয় যেখানে"

"ও, ছাই গাদায়"

"ছাই গাদাও বলতে পার। পাঁশগাদা বললেও ভুল হয় না বোধহয়। আমি তো বরাবর পাঁশ-গাদাই বলি। আমার বাপের বাড়িতেও পাঁশ-গাদাই বলে"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠে অভিমানের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠল। পত্নীর দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দিগ্বিজয় বললেন— "ও, তাই না কি"

"আমরা মুখ্যু মানুষ, যা শুনে এসেছি বরাবর, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে"

দিগ্বিজয় প্রমাদ গণলেন মনে মনে।

"তাতে আর হয়েছে কি। পাঁশ-গাদাও বলে তো অনেকে। ওইটেই সম্ভবত বেশী শুদ্ধ, পাংশু কথার অপভ্রংশ—"

"তা হোক, পাঁশ পাড়া-গেঁয়ে কথা। ছাইটাই শুদ্ধ বাংলা"

"যাক ও নিয়ে তর্কাতর্কি করে' আর কি হবে। অনর্থক সময় নষ্ট শুধু। তবে এটা আমি ঠিক জানি পাঁশ অশুদ্ধ নয়। সে যাক গে, এখন কি করা যায়—"

সুরেশ্বরী দেবী বললেন—"নিজে দাঁড়িয়ে পাঁশ-গাদাটা —মানে, ছাই-গাদাটা—একবার খোঁজাই না হয় ভাল করে'। যদি পাওয়া যায় চিঠি দুটো—"

"না, তার দরকার নেই। চিঠি পেলেও তারা তো আর আসছে না। আমি তারিখেরই গোলমাল করেছি ঠিক। কিন্তু কি করে' যে গোলমাল করলাম! ছকুবাবু আর গোবর্দ্ধনবাবু, এঁরা দু'জন তো ঠিক এসেছেন। এঁদেরও তো আমিই লিখেছিলাম—"

ছকুবাবু এবং গোবর্দ্ধনবাবু দু'জনেই সুরেশ্বরী দেবীর বাপের বাড়ির সম্পর্কিত লোক। অনেকদিন থেকে আসতে চেয়েছিলেন বলে' এঁদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সুরেশ্বরী বললেন, "কিন্তু তুমি তো সাধারণতঃ ভুল কর না এ রকম। আমারই বরং ভুলো মন—"

"না, না, কি যে বল সুরো। তোমার আবার ভুলো মন হল কবে থেকে। ভুলো মন আমার—"

"কেন বাড়িয়ে বলছ মিছিমিছি। কোথায় কোন পেরেকটি কুড়িয়ে রাখ তা মনে থাকে তোমার—তুমি ভুল করবে তারিখ"

সুরেশ্বরীর কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ঝাঁজের আমেজ পাওয়া গেল। বাইরের কোন লোক উপরোক্ত কথোপকথন শুনলে ভাববে যে ভুলো-মন হওয়াটা যেন একটা লোভনীয় গুণ এবং তা না হতে পেরে সুরেশ্বরী দেবী যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

দিগ্বিজয় বললেন—"আমার স্বভাবই গোলমাল করে' ফেলা। তুমি ঠিক মতো সামলে নাও বলেই গোলমাল হয় না"

"কি যে বাজে কথা বল! আমি আবার কখন সামলাতে যাই তোমাকে? তোমার কোন কাজটায় আমি হাত দিতে চাই? দেবার দরকারই হয় না, দিলেই বোধহয় গোলমাল হ'ত। এমনিতে তো কখনও কোন বিষয়ে গোলমাল হতে দেখিনি তোমার—"

দৃঢ়কণ্ঠে দিগ্বিজয় বললেন, "একটা কারণে মনে হচ্ছে যে চিঠিতে ভুল তারিখ দিই নি। চিঠি খামে ঢোকাবার আগে তোমাকে দেখিয়েছিলাম যে। ভুল থাকলে নিশ্চয় চোখে পড়ত তোমার"

"মোটেই না। তোমার চিঠি শোধরাবার দরকার হবে একথা ভাবতেই পারি না—"

"যাই বল, গোলমালটা আমিই করেছি। ট্রেণ ফেল করলে সান্ত্বনা অন্তত টেলিগ্রাম করত একটা। সুশোভন ছোকরার সঙ্গে তেমন আলাপ নেই অবশ্য, কিন্তু ওর বাপকে চিনতাম তো, ট্রেণ ফেল করে চুপচাপ থাকবে এ কথা তার সম্বন্ধেও ভাবা যায় না। তারিখেরই গোলমাল করে' ফেলেছি আমি—" (ক্রমশঃ)

পল্লী-গৃহে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

এই সেই গৃহ!—
প্রতি ধূলিকণা এর—তাও মোর প্রিয়!
এই শুভ্র কুন্দবনে আজি মোর হয় মনে
ফুল হ'য়ে ফোটে তব হাস্য রমণীয়!
মন্দ এ পবন
শ্রীঅঙ্গসুরভি তব করিছে বহন।
বহুদিন-ভুলে-যাওয়া তোমার চোখের চাওয়া
প্রতি বাতায়নে সখি, ভাসে অনুক্ষণ!
তব কণ্ঠস্বর
কপোত-কূজনে যেন শুদ্ধ দ্বিপ্রহর
আকুল উদাস করি, সঞ্চারিয়া ফিরে মরি,
স্মৃতির ব্যথায় ভরি' আমার অন্তর!
হেথা ভূমিতল—
ও কোমল পদাঘাত সোহাগ উতল—
বহিঃবুকে—ব্রীড়াভরে ফুটাইছে থরে থরে
আজো ঐ অপরূপ স্থলজ কমল!
হোথা তব মায়া
ললিত লতার লাস্যে ধরিয়াছে কায়া!
শ্যামল এ তরুতলে বিছায়েছ কুতূহলে
শ্রাবণ মেঘের মত চিকুরের ছায়া।
এ সরসী জল
তোমার কলস ঘায় আজিও উচ্ছল
উল্লাসে আসিয়া ছুটে পড়িতে কি চায় লুটে
ধৌত করিবারে তব রক্ত পদতল?
শুধু তুমি নাই—
এ নির্জ্জন পল্লীগেহে ভাবি ব'সে তাই!
পাখী ডাকে 'পিউ কাঁহা', হৃদয় করিছে হাহা,
যদি একবার আহা, কাছে তোমা পাই!

ভারত-হায়দরাবাদ চুক্তি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

১ কোটি ৬৩ লক্ষ লোকের বাসভূমি হায়দরাবাদ, আয়তনে ভারতের প্রায় ৬শত দেশীয় রাজ্যের মধ্যে যেমন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, শক্তি ও সম্পদের দিক হইতেও তেমনি ভারতের অন্যান্য বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলি অপেক্ষা কোন অংশেই কম নহে। এই রাজ্যের নিজাম উপাধিধারী স্বৈরাচারী শাসক দেশের শাসনতন্ত্রে কোনও গণতান্ত্রিকনীতির আমল না দিয়া, নিজের একান্ত অনুগত একটি শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা এতাবৎকাল রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। রাজ্যে জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ জন অমুসলমান হইলেও, শুধু মুসলমান নবাবের রাজ্য বলিয়া শাসনব্যবস্থায় অমুসলমানের কোনও উপযুক্ত স্থান ছিল না। বরং অমুসলমান-প্রজা-প্রধান রাজ্যকে কঠোরভাবে শাসন করিবার জন্যই নিজাম পুলিশ ও সেনাবিভাগে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান নিয়োগ করিয়া একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিয়া রাখেন। সম্প্রতি দেশের আভ্যন্তরীণ আন্দোলনের কারণে ও ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তির ফলে, নিজাম বাহাদুর নূতন করিয়া একটি সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য তাঁহার অনুগত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়ে বাধ্য হইয়াছেন।

নিজামের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ১০ বৎসর পূর্বে রাজ্যের জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রথম ষ্টেট কংগ্রেসের পত্তন করেন। ক্রমে এই কংগ্রেস জনসাধারণের সমর্থন পাইয়া একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। তখন নিজাম ষ্টেট কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং রাজ্যের মুসলমানপুষ্ট সেনাবাহিনীর সহায়তায় উহাকে নানা উপায়ে দমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ষ্টেট কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া উহার নেতাদের গ্রেপ্তার করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন আদৌ থামিল না, তখন নিজাম বাহাদুর বাধ্য হইয়া ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে এই কংগ্রেসের উপর হইতে সকল নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইলেন।

বর্তমান বৎসরের ৩রা জুন তারিখের ঘোষণায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, বৃটিশ-ভারতকে ভারত ও পাকিস্থান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিলে, হায়দরাবাদের নিজাম ১১ই জুন এক ফরমাণে ঘোষণা করিলেন—১৫ই আগষ্ট হইতে হায়দরাবাদের উপর হইতে বৃটিশের অধিরাজ ক্ষমতার লোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হায়দরাবাদও ঐ দিন হইতে স্বাধীনরাজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

হায়দরাবাদের শতকরা ৮৭ জন অমুসলমান প্রজা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র নিজামের এই স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করিল। প্রজারা জানাইল, ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ন্যায় হায়দরাবাদকেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টও মন্ত্রীমিশনের ১৯৪৬ সালের ১২ই মে তারিখের স্মারকলিপি—যাহাতে দেশীয় রাজ্যের নীতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কোনও দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণাকে মানিয়া লইবেন না বলিয়া জানাইয়া দিলেন। তবে একথাও তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, দুইটি ডোমিনিয়নের কোন একটিতে যোগদান লইয়া যেখানে কোনও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে গোলমাল রহিয়াছে, সেখানে প্রজা সাধারণের গণভোটের দ্বারাই তাহা স্থিরীকৃত হইবে।

এদিকে বৃটিশ-ভারতের শেষ বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ২৫শে জুলাই তারিখে নয়াদিল্লীতে সকল দেশীয় রাজ্যের শাসক ও মন্ত্রীদের এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে তিনি জানাইয়া দিলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান একটি ডোমিনিয়নে যোগদান করা কর্তব্য এবং মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশরক্ষা, বৈদেশিক ব্যাপার ও যোগাযোগের ব্যবস্থা সেই ডোমিনিয়নের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। বড়লাট ইহা বিবেচনা করিবার জন্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দকে আরও ৭ দিনের সময় দিলেন।

যে সকল দেশীয় রাজ্য ইতিপূর্বে কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করে নাই, এই সাতদিনের মধ্যেই তাহাদের অধিকাংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের কথা ঘোষণা করিল। কেবল অল্প কয়েকটি দেশীয় রাজ্য মাত্র কোনও মত প্রকাশ করিল না। এই অল্প কয়টির মধ্যে হায়দরাবাদও রহিল।

হায়দরাবাদ কোন ডোমিনিয়নে যোগদানের কথা বলিল না বটে, তবে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও হায়দরাবাদের ভৌগোলিক অবস্থার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে কোনরূপ না চটাইয়া তাহার সহিত একটা সম্মানজনক সর্ত করিবার জন্য আলোচনা চালাইতে থাকিল।

হায়দরাবাদের সহিত এই আলোচনা চলিতে থাকিলেও ১৫ই আগষ্টের পূর্বে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। তবে সমস্ত আলোচনা যাহাতে ফাঁসিয়া না যায়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজাম বাহাদুর আরও দুইমাস সময় চাহিলেন। নিজামের অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট আলোচনা চালাইবার জন্য তাঁহাকে আরও দুইমাস সময় দিলেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মন্ত্রিসভার সম্মতিক্রমে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদের প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনা চালাইতে থাকিলেন। ছত্রীর নবাব হায়দরাবাদ প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। কয়েক দফা আলোচনার পর অক্টোবরের শেষ দিকে উভয়ের মধ্যে একটা মতৈক্য দেখা দিল। তখন হায়দরাবাদের প্রতিনিধি দল নিজামের চূড়ান্ত অনুমোদন ও চুক্তিপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর আনিবার জন্য হায়দরাবাদ গেলেন। কিন্তু হায়দরাবাদের

মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ইত্তেহাদ-উল-মুসলমিনের আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে প্রতিনিধিদলের চেষ্টা সফল হইল না। নিজাম বিক্ষোভকারীদের চাপে পড়িয়া পুনরায় নূতন করিয়া একটি প্রতিনিধিদল গঠন করিলেন। এবার নবাব মইন নওয়াজ জঙ্গ এই প্রতিনিধি দলের নেতা হইলেন।

এই প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারত সরকারের সহিত আলোচনাকালে, প্রথম দিকে প্রস্তাব করিলেন যে হায়দরাবাদকে ভারতের তুল্য মর্যাদাসম্পন্ন দেশ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশসমূহে তাহার কূটনৈতিক দূত প্রেরণেরও অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের উভয় প্রস্তাবই অস্বীকার করিলেন এবং এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা দেখাইলেন। ফলে প্রতিনিধি-মণ্ডলী তাঁহাদের প্রস্তাব সংশোধন করাইবার জন্য হায়দরাবাদে নিজামের নিকটে ফিরিয়া গেলেন।

এবার নিজাম ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা দেখিয়া এবং চারিদিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বেষ্টিত নিজ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত একটা চুক্তি সম্ভবপর করিবার জন্য প্রতিনিধিমণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষমতা দান করিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তার জন্য হায়দরাবাদ প্রতিনিধিমণ্ডলীকে ক্রমশঃ তাহাদের অসঙ্গত দাবী হইতে নামিয়া আসিতে হইল। ফলে হায়দরাবাদের ছত্রীর নবাবের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি হইয়াছিল, সেই হায়দরাবাদের নূতন প্রতিনিধিদল ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তিই মানিয়া লইল।

হায়দরাবাদের সহিত আলোচনাকালে ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হায়দরাবাদ প্রতিনিধিদলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যাহা করিবার ২৫শে নভেম্বরের মধ্যেই তাহা স্থির করিতে হইবে; আলোচনার জন্য আর মোটেই সময় দেওয়া হইবে না। তাই প্রতিনিধিদল ২৫শে তারিখেই আলোচনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং নিজামের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর আনিবার জন্য পরদিন বিমানযোগে দিল্লী হইতে হায়দরাবাদ যান। ২৯শে তারিখে প্রতিনিধিদল নিজাম বাহাদুরের স্বাক্ষর লইয়া হায়দরাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন উক্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং ঐদিনই ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের স্থিতাবস্থা চুক্তির কথা সর্বত্র ঘোষণা করা হইল।

এইভাবে বহু সময় ব্যয় করিয়া সাময়িক ভাবে ভারত ও হায়দরা-বাদের মধ্যে এক বৎসরের জন্য একটি স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তি ১৯৪৭ সালের ২৯শে নভেম্বর হইতে পরবর্তী বৎসরের ঐ তারিখ পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে বলিয়া স্থির হইল।

চুক্তিতে বলা হইল—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে ভারতে বৃটিশরাজ ও হায়দরাবাদের মধ্যে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যানবাহন প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল চুক্তি ও বিধিব্যবস্থা বলবৎ ছিল, তাহাই বলবৎ থাকিবে; তবে নিজাম বংশের উপর বৃটিশের যে অধিকার বা প্রভুত্ব ছিল, ভারত সরকারের তাহা থাকিবে না অর্থাৎ নিজামের সার্বভৌম অধিকার থাকিবে। নিজাম বিদেশে কোথাও কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন না, শুধু মাত্র ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপারে এজেণ্ট জেনারেল নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু তাহাকেও আবার ভারত গবর্ণমেণ্টের বিদেশস্থ প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

চুক্তি পত্রে আরও বলা হইল যে, হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন না এবং যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হায়দরাবাদে ভারত গবর্ণমেণ্ট সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিবেন না। চুক্তি যথাযথ পালিত হয় কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য দিল্লীতে নিজামের এবং হায়দরাবাদে ভারত গবর্ণমেণ্টের একজন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দরাবাদের এই স্থিতাবস্থা চুক্তির ফলে হায়দরাবাদ পাকিস্থানে যোগদান করিল না বটে, তবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেও যোগ দিবে কিনা তাহাও পরিষ্কার হইল না। কোনও দেশীয় রাজ্যের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে বাধ্য করা ভারতের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের নীতি নহে। তাই সাময়িক হইলেও, মীমাংসা-আলোচনার মধ্য দিয়া হায়দরাবাদের সহিত চুক্তিটা ভারত গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতি এই যে, দেশীয় রাজ্যের ডোমিনিয়নে যোগদান লইয়া যদি কোন গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে রাজ্যের প্রজাসাধারণই গণভোটের দ্বারা তাহা স্থির করিবে। হায়দরাবাদের শতকরা ৮৭জন অমুসলমান প্রজা হায়দরাবাদকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাঁহারা গত ৭ই আগষ্ট সমগ্র হায়দরাবাদে "ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান কর দিবস" পালন করিয়া, তখন হইতে সত্যাগ্রহ চালাইয়া আসিতেছেন। নিজাম সরকার এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে রোধ করিবার জন্য গুলিবর্ষণ, লাঠিচালনা প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দতীর্থ ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ৭০০০ কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন।

এই আন্দোলনে সত্যাগ্রহীদের অনেকেই হতাহত হইলেন, কিন্তু তবুও সত্যাগ্রহ ত্যাগ করিলেন না। নিজাম তাই এবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত তাড়াতাড়ি একটা চুক্তি করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলেন। চুক্তির পরদিনই নিজাম গবর্ণমেণ্ট ষ্টেট কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মুক্তি দিলেন এবং পুরাতন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় রাজ্যে একটি সর্বদলীয়-মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কারণ নিজাম বাহাদুর এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে গুলি ও লাঠির দ্বারায় সত্যাগ্রহীদের দমন করা অসম্ভব, তাই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে জনগণের প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা ভিন্ন উপায় নাই।

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ—

জনৈক পত্রপ্রেরক পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলের উদ্দেশ্যে এই নিবেদন প্রচার করিতে জানাইয়া পত্র দিয়াছেন—"পচনশীল, পুতিগন্ধময় পাকিস্থানী পরিকল্পনার প্রতীক বেসামরিক সরবরাহ বিভাগটিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। উক্ত বিভাগের পাপ-পরিবেশের মধ্যে কোনরূপ রদবদল করিয়া ইহার আবর্জ্জনা অপসারিত করা সম্ভব হইবে না। খাদ্য-সামগ্রী ও বস্ত্র বণ্টনের জন্য যদি নিয়ন্ত্রণের যথার্থ প্রয়োজন এখনও বর্ত্তমান থাকে, তবে উহা বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল সম্পূর্ণ স্থান বিধিবিধানে নূতন নূতন ব্যক্তির দ্বারা যেন পুনরায় গঠিত করেন। বাস্তবিক এই বিভাগের অচিন্তনীয় অযোগ্যতা এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধের আবর্জ্জনা আজ দেশবাসীর সকল সহ্যসীমা অতিক্রম করিয়াছে। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে এই পাকিস্থানী পুতিগন্ধময় পর্য্যুসিত পদ্ধতির বিলোপ সাধন ঘটে নাই, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না।" দেশের সকল লোক এই অভিমত একবাক্যে সমর্থন করিবে।

চোরাকারবার দমন আইন—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট চোরা কারবার দমনের জন্য কঠোর বিধান সম্বলিত এক আইনের খসড়া অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই উপস্থিত করা হইবে। এই আইনে অপরাধীকে জামীন না দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিলটি আইনে পরিণত হইয়া তদনুসারে কাজ হইলে দেশ রক্ষার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া লোক বিশ্বাস করে।

যুক্তপ্রদেশের স্থায়ী গভর্ণর—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর পদ গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় বড়লাট ও তাঁহার মন্ত্রিসভা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে যুক্তপ্রদেশের স্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীমতী নাইডু মহিলা—তিনি সারা জীবন কংগ্রেসের মধ্য দিয়া দেশ-সেবা করিতেছেন—তিনি বাঙ্গালী—কাজেই বাঙ্গালার মহিলা সমাজ এই নিয়োগে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের সাম্প্রতিক কলিকাতা আগমনে কলিকাতাবাসী কর্ত্তৃক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

ফটো—জে-কে-সান্যাল

কাঁচড়াপাড়ায় ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা—

গত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার ভোর ৫টায় কলিকাতার ২৮ মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়ার নিকট একটি মালগাড়ীর সহিত ১৬নং ডাউন নর্থ বেঙ্গল একস্প্রেসের সংঘর্ষের ফলে ৭ ব্যক্তি নিহত ও ৪৫জন আহত হইয়াছে। এরূপ দুর্ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—এগুলি নিবারণের কোন ব্যবস্থাই হয় না।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা—

গত ৫ই ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলেম লীগ কাউন্সিলে স্থির হইয়াছে যে উর্দ্দু পূর্ব্ব পাকিস্থানের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে না। ঐ কথা ঘোষণা করায় তার লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁর উপর অর্পিত হইয়াছে।

সূতা ও বস্ত্রের উপর রপ্তানী শুল্ক—

ভারত গভর্ণমেণ্ট আয় বৃদ্ধির জন্ত কাপড়ের উপর প্রতি গজে ৪ আনা ও সূতার উপর প্রতি পাউণ্ডে ৬ আনা রপ্তানী শুল্ক ধার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ৬ই ডিসেম্বর অর্থসচিব সার সমুখম্ চেটী উহা ঘোষণা করিয়াছেন।

বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্মিলন—

গত ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজ গৃহে বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্মিলনের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্মেলনের
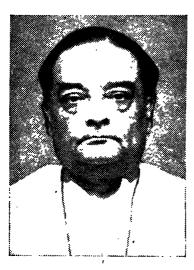
ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ

উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন—স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অর্থ নিয়োগ জাতির পক্ষে পরম মিতব্যয়িতার কাজ। যে যে কাজেই থাকুক না কেন, ভগ্নস্বাস্থ্য না হইলে সে তাহার শ্রেষ্ঠতম শক্তি নিয়োগ করিতে পারে। সম্মেলনের বিদায়ী সভাপতি অধ্যাপক বি-এন-ঘোষ বলেন—যেখানে শতকরা ৯০জন অশিক্ষিত, অধিকাংশ লোক অর্থাভাবে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটায়, সেখানে সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা ফলপ্রদ হইবে না। নূতন সভাপতি ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষ বলেন—বর্ত্তমান চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা-প্রণালীর এরূপ সংশোধন করা চাই—যাহাতে পুঁথিগত বিদ্যা অপেক্ষা ব্যবহারিক বিদ্যায়ই ব্যাপক শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্মিলনে কলিকাতা অঞ্চল ছাড়া উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলার ৩৫০জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ২৪পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডাক্তার অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বিধান পরিষদে বড়লাট শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী

ভারত-হায়দ্রাবাদ চুক্তি—

২৯শে নভেম্বর দিল্লীতে সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ও নিজামের মধ্যে স্থিতাবস্থা চুক্তি ঐ দিন সকালে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের সহিত ভারতের রাজপ্রতিনিধির যে সব চুক্তি ও শাসন ব্যবস্থা এতদিন চলিয়া আসিতেছিল বর্ত্তমানে এক বৎসর কাল তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না। ইহার পর ৫ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে এক জনসভায় হায়দ্রাবাদ ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থ ঘোষণা করিয়াছেন—হায়দ্রাবাদবাসীরা হায়দ্রাবাদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান ও তথায় লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠা চাহে। ইহা ভিন্ন কিছুতেই হায়দ্রাবাদবাসীরা সন্তুষ্ট

হইবে না। সেজন্য কংগ্রেস তাহার আরব্ধ সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

সিঁথিতে ব্যায়াম প্রদর্শনী—

সম্প্রতি উত্তর কলিকাতা সিঁথিতে যে শরীর চর্চ্চা বক্সিং, কুস্তি ও ব্যায়াম প্রদর্শনী হয় তাহাতে বরাহনগর ব্যায়াম সমিতি, হাওড়া ওয়েষ্ট এণ্ড ক্লাব, উত্তর কলিকাতা ব্রতচারী সমিতি, নেতাজী ব্যায়াম মন্দির, বেঙ্গল বক্সিং এ্যাসোসিয়েশন, এমারেল্ড ক্লাব, হেমচন্দ্র পল্লী মঙ্গল সমিতি, কাশীপুর ব্যায়াম সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান-বৃন্দের সভ্য ও সভ্যাগণ বিশেষভাবে যোগদান করেন। ডাঃ জে-সি-মুখার্জ্জীর দলের সহিত ২৪পরগণার শ্রীপঙ্কজ গাঙ্গুলীর দলের কুস্তি ও বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী শ্রীসুকুমার সেনের দলেরসহিত পুলিস কমিশনার মিষ্টার এস্-এন্-চ্যাটার্জ্জীর দলের বক্সিং প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন দলের কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী নৃত্য, ভারতের শ্রেষ্ঠ পেশী-সঞ্চালক শ্রীবিজয় মল্লিকের পেশী সংকোচন ও সম্প্রসারণ, কণ্টক শয্যায় শায়িত শ্রীদেবেন বিশ্বাসের বুকের উপর দিয়া শ্রীঅজিত ঘোষের মোটর বাইক চালান প্রভৃতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত সভানেত্রীর ও মেজর জেনারেল শ্রীঅনিলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীবিজয়সিং নাহার পারিতোষিক বিতরণ করেন।

সিঁথির ব্যায়াম প্রদর্শনীতে সমাগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ — ফটো—শ্রীনীরেন ভাদুড়ী

শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—

কলিকাতা ৯৯ ল্যান্সডাউন রোডস্থ রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের নামে শুধু কলিকাতাবাসীদের নিকট নহে, বাঙ্গালা মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমানে তথায় একশত প্রসূতিকে স্থান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রত্যহ বহু প্রসূতিকে স্থানাভাবে ফেরত যাইতে হয়। সেজন্য সম্প্রতি ১লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ২ বিঘা সাড়ে ৩ কাঠা জমি বর্ত্তমান গৃহের পার্শ্বে ক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ গৃহের উপর কর্মীদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ও বর্ত্তমান গৃহের চতুর্থ ও পঞ্চম তলা নির্ম্মাণ করিতে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা—বর্ত্তমানে মোট ৫ লক্ষ টাকা এখনই

প্রয়োজন। সম্পাদক স্বামী দয়ানন্দের এ বিষয়ে অক্লান্ত চেষ্টার অভাব নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন দিন অর্থের অভাব হইবে না।

জব্বলপুর সাহিত্য পরিষদ—

বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা ও প্রচারার্থে গত আষাঢ় মাসে জব্বলপুরে "সাহিত্য পরিষদ" নামে একটী সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য পরিষদ জব্বলপুর দেবেন্দ্র বেঙ্গলী ক্লাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই পরিষদের পাক্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ ও পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাহিত্য পরিষদের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীদের সংস্কৃতি প্রচার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

আসামের পাটের উপর শুল্ক—

পাকিস্থান সরকার আসামের পাটের উপর শুল্ক ধার্য্য করার প্রস্তাব করায় সে বিষয়ে গত ৬ই ডিসেম্বর ভারতের অর্থসচিব সার সম্মুখম্ চেটি বলিয়াছেন—পাকিস্থান সরকারের ঐ কার্য্য আন্তর্জাতিক বিধি বহির্ভূত হইবে। সে ক্ষেত্রে ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায়ের সকল চেষ্টা ত করিবেনই, প্রয়োজন হইলে অন্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করিবেন।

সুভাষচন্দ্রের মর্ম্মর

কলিকাতা কর্পোরেশন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করিতে ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে—আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান অধিনায়করূপে সামরিক বেশের মর্ম্মর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হইবে।

গোরক্ষা ও স্বামী করপাত্রীজি—

অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম যে মথুরাতে গোবধ নিবারণ করিতে হইবে এইরূপ আন্দোলন করার দরুণ স্বামী করপাত্রীজি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। বিচারে তাঁহার ছয় মাসের কারাদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু দুই মাস কারাবাসের পর তাঁহাকে আগ্রা জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার যে সকল সমর্থক মথুরাতে গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মথুরা মিউনিসিপ্যালিটি এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে ঐ মিউনিসিপ্যালিটিতে গোবধ হইবে না। মথুরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন। কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি যুক্তপ্রদেশের ৮।১০ স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এইরূপ নিয়ম করিয়াছেন।

ব্যায়াম বীরের বিলাত গমন—

কলিকাতা বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর শ্রীযুত উমেশ মল্লিক সম্প্রতি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি

শ্রীউমেশ মল্লিক

তথায় শরীরচর্চ্চা প্রদর্শন ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা তাহার বই বিলাতের বাজারে যাহাতে চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত হয়, সেজন্য চেষ্টা করিবেন। তিনি শিক্ষিত যুবক—দেশ-প্রেমিক, তাঁহার বিদেশলব্ধ জ্ঞান যেন দেশের কল্যাণে নিয়োজিত হয়, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বায়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে। তথায় শ্রীযুক্ত শিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি, শ্রীজগদীশ মিত্র, ডাঃ সুধীর বসু, গণেশ মিত্র ও বিভূতি সেনগুপ্তকে সহ-সভাপতি, শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্যকে সাধারণ

সম্পাদক, শ্রীসত্যপ্রিয় গুহ ও শ্রীপ্রফুল্ল বাগচীকে সহকারী সম্পাদক, শ্রীসঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ করিয়া ও ১৬জন সদস্যকে লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য সকল স্থান হইতে বাঙ্গালীদের এই অধিবেশনে অধিক সংখ্যায় যোগদান করিয়া প্রবাসী সমস্যার সমাধানে তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে বোম্বায়ে পোষ্ট বকস্ নং ২৯৮এ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে।

পরলোকে গৌরীহর মিত্র—

বীরভূম সিউড়ীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পুরাতত্ত্ববিদ স্বর্গত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের পুত্র গৌরীহর মিত্র গত ৭ই

গৌরীহর মিত্র

অক্টোবর মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বীরভূমের ইতিহাস ও অন্যান্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং পিতার সংগৃহীত বিরাট গ্রন্থাগার ও কয়েক সহস্র পুঁথি সযত্নে রক্ষা ও ব্যবহার করিতেন। সিউড়ীর 'রতন লাইব্রেরী' বাঙ্গালার গবেষক পণ্ডিত মণ্ডলীর দর্শনীয় বস্তু।

পশ্চিম বঙ্গে চাউলের অবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গে সরবরাহ মন্ত্রী গ্রামাঞ্চল হইতে ধান্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া সহরাঞ্চলের জনগণের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করায় গ্রামাঞ্চলের লোক তাহাদের ধান ৬ টাকা ৪ আনা দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখন সেই সকল স্থানে সকলকে ১৫ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হইতেছে। অথচ গ্রামের লোক আদৌ কাপড় ও কেরোসিন তৈল পাইতেছে না, তাহাদিগকে সে সকল জিনিস সরবরাহের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

ডাকঘরের অসুবিধা—

বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে প্রেরিত মণি অর্ডারের টাকা বা পশ্চিম বঙ্গ হইতে প্রেরিত ভি-পি'র টাকা প্রায়ই আসিয়া পৌছিতেছে না। সে জন্য সকল ব্যবসায়ীকেই কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। এই কারণে পূর্ব্ববঙ্গবাসী 'ভারতবর্ষে'র গ্রাহকগণের নিকট অতঃপর আর আমরা ভি-পি ডাকে ভারতবর্ষ প্রেরণ করিব না। তাঁহারা যেন—যে কোন উপায়ে—ভারতবর্ষের চাঁদা এখানে পাঠাইয়া দেন। চাঁদা পৌছিলেই আমরা ঠিকভাবে ভারতবর্ষ প্রেরণের ব্যবস্থা করিব। পুস্তক-ক্রেতাগণকেও আমরা এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি। পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে প্রেরিত পাকিস্থানী ডাক টিকিট এখানে ব্যবহার করা চলে না—কাজেই কেহ পাকিস্থানী ডাকটিকিট পাঠাইয়া আমাদের বিব্রত না করেন—ইহাই আমাদের নিবেদন।

আগ্রায় বাঙ্গালী ডাক্তার সম্মানিত—

আগ্রা প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার টি-সি-বসু চৌধুরী তাঁহার গবেষণা ও চিকিৎসা-বিষয়ে নৈপুণ্যের জন্য যুক্তপ্রদেশের ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকালটীর 'ফেলো' হইয়াছেন। এল-এম-এফ্-দের মধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রথম এই সম্মান পাইয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ঐ অঞ্চলে সকলের দ্বারা সম্মানিত। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি এই সম্মান প্রথম লাভ করায় তাহা বাঙ্গালীদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

পণ্ডিত জহরলালের জন্মোৎসব—

গত ১৪ই নভেম্বর স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উনষাট বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল ভারতের জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তাঁহার মত চিন্তাশীল পণ্ডিত, সুলেখক ও বক্তা ভারতে কেন, পৃথিবীতেই অল্পসংখ্যক। আমরা এই শুভদিনে তাঁহার সুদীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত জীবন কামনা করি।

নির্ব্বাচন সাফল্য—

পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বীরভূম জেলা কেন্দ্র হইতে পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ২২হাজার ৪ শত ৮০ ভোট ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু মহাসভা-দলের প্রার্থী শ্রীশিবকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ১০ হাজার ৯ শত ৪২ ভোট পাইয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাচন সাফল্যে তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হইলেই বাঙ্গালা দেশের পক্ষে তাহা শোভন হইত।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী—

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের 'গ্রামে পুনর্ব্বসতি বোর্ডের' সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। গ্রামে যাইয়া লোক যাহাতে পুনরায় সুখে বাস করিতে

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি ফটো—শ্রীপান্না সেন

মকদুমপুর—মালদহে রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়

পারে ও কুটীরশিল্পের যাহাতে পুনপ্রতিষ্ঠা হয়, এই বোর্ড হইতে সে বিষয়ে স্থায়ী ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইবে। শ্রীযুক্তা সুচেতা নোয়াখালির দাঙ্গা দুর্গতদের সাহায্য করিতে যাইয়া

এ বিষয়ে যে আগ্রহ ও দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দ্বারা এই কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনাই দেখা যায়।

সমাবর্ত্তন উৎসবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোর পরিদর্শনরত চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী

ফটো—শ্রীপান্না সেন

সমাবর্ত্তন উৎসবে উপাধিপ্রাপ্ত মহিলাবৃন্দ ফটো—শ্রীপান্না সেন

দুই বঙ্গে স্বতন্ত্র কংগ্রেস গঠন—

গত ১৪ই ও ১৫ই অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার তমলুক সহরে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সম্মিলনে দুই স্বতন্ত্র বঙ্গে দুইটি স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটী গঠনের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ঐ সম্মিলনের প্রস্তাবানুসারে গত ৯ই নভেম্বর কলিকাতা অপার সার্কুলার রোডস্থ রামমোহন লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পশ্চিম বঙ্গের সদস্য-গণের এক সম্মিলনেও অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়-কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্মেলন আহ্বান করিয়া-ছিলেন ও তথায় ১৩৩ জন সদস্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী উভয় বাঙ্গালায় দুইটি আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটী গঠনের প্রস্তাব করেন এবং উহার কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেন যে, উভয় প্রদেশের সমস্যাসমূহ বিভিন্ন এবং সে জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পশ্চিম বঙ্গের সহিত সংযুক্ত রাখিতে পারা যায় না।

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কমিটী—

পশ্চিম বাঙ্গালার গভর্ণ-মেণ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া সে বিষয়ে আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে নির্দ্দেশ দানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—সভাপতি (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার (৪) অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (৫) শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় (৬) মিঃ হুমাউন কবীর (৭) রাণী ভবানী স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (৮) পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী (৯) পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের ডিরেকটার (১০) অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষা—

পূর্ব্ব পাকিস্থানের আক্রমণ হইতে পশ্চিম বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস ভট্টাচার্য্য আই-পি, জে-পি বিশেষ ডেপুটী-ইন্সপেক্টার-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। বারাকপুরে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র হইবে। তিনি বীরভূমের এস-পি ছিলেন।

ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন প্রধান মন্ত্রী—

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করায় মহারাণী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রেস এডভাইজার শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এসকে নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

নূতন পদ প্রাপ্তি—

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ও যুক্তপ্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ অমরনাথ ঝা ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ তারাচাঁদ কাবুলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। খ্যাতনামা সাংবাদিক ডাক্তার সৈয়দ হোসেন ২৫ বৎসর আমেরিকা বাসের পর সম্প্রতি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—তিনি মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি—

গত ৪টা ডিসেম্বর ভারতীয় আইন সভায় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ঘোষণা করিয়া বলেন—ভারত পারতপক্ষে কোন যুদ্ধে যোগদান করিবে না। যদি একান্তই যুদ্ধে যোগদান করিতে হয়, তাহা হইলে ভারত ভারতের স্বার্থরক্ষাকারী দলেই যোগদান
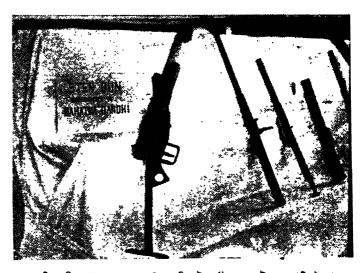
মহাত্মাজীর কলিকাতায় অনশনকালে তাঁহার নিকটে সমর্পিত কয়েকটি বেসরকারী ষ্টেনগান

ফটো—শ্রীপান্না সেন

করিবে। ভারত আমেরিকার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়ের সহিতই ভারত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে এবং বিশ্বশক্তি-চক্রের বাহিরে থাকিবে।

কলিকাতার নূতন সেরিফ—

বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৪৮ সালের জন্ত কলিকাতার সেরিফ নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান জেলার আলমপুরের সেন বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও বাঙ্গালা দেশে বহু ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

রাজগীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

রাজগীর বিহারের পাটনা জেলার একটি স্বাস্থ্যনিবাস—তথায় প্রায়ই বহু বাঙ্গালী পরিবার গমন করেন। তাঁহাদের সকল প্রকার সাহায্য দানের জন্ত স্বামী কৃপানন্দ তথায় 'রাজগীর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' নামক একটি প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণ

করিতেছেন। সেবাশ্রমের চারিদিকে ও বহু বাঙ্গালা জমি ক্রয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন—এখনও তথায় জমি পাওয়া যায়। স্বামীজির পরিকল্পনা অনুসারে সেবাশ্রম সম্পূর্ণ করিতে এখনও ৭৫ হাজার টাকা প্রয়োজন। সেবাশ্রম সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালী স্বাস্থ্যান্বেষীদের বাসস্থান ও আহারের কোন অসুবিধা থাকিবে না।

মালব্য-সেতু—

পবিত্র তীর্থ কাশীধামের প্রবেশ মুখে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথী বক্ষে রেলের যে সেতু আছে, যে সেতুর উপরে ট্রেণ উঠিবামাত্র শতসহস্র মন্দির গৃহসৌধ অট্টালিকা-পরিশোভিত, অর্দ্ধচন্দ্রাকারগ্রথিত অনন্ত ঘাটশ্রেণী নয়নগোচর হইবামাত্র হিন্দু রেল যাত্রী "জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়," "জয় জননী অন্নপূর্ণার জয়" রবে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠেন, তাহা ১৮৮৫ সালে তখনকার আউধ-এণ্ড-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া বৃটিশ প্রধান পুরুষ লর্ড ডাফরিণের নামানুসারে ডাফরিণ ব্রীজ নামে খ্যাত ছিল। ভারতবাসী জানিয়া আনন্দিত হইয়াছেন যে সম্প্রতি ঐ ব্রীজটির আয়তন ও পরিসর বৃদ্ধি হইয়াছে, এক লাইনের পরিবর্ত্তে দুইটি লাইন সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং নামকরণ হইয়াছে, মালব্য সেতু। পণ্ডিতবর মদনমোহন মালব্য কাশীধামে বাস করিতেন, কাশীতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং গত বৎসর নোয়াখালির নারকীয় কাণ্ডের বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর পুণ্য বারাণসীতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। গত ১৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ যুক্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সংস্কৃত ও সম্প্রসারিত সেতু উন্মোচন ও নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এইবার বেনারস্ ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনটির নামের পঙ্কমোচন হইলেই আমরা সুখী হইতে পারি।

কাশীতে গঙ্গার উপর মালব্য-সেতু

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন—

গত ৮ই ডিসেম্বর সোমবার হইতে কলিকাতায় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। রাজা শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন ও সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষ দশম অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশ করেন। কয়েকদিন ধরিয়া সম্মিলনের অধিবেশন হয় ও তাহাতে ভারতের বহু সঙ্গীতজ্ঞ যোগদান করেন।

ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ—

৪ঠা ডিসেম্বর দিল্লীতে ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য তিনটি কারখানা প্রস্তুত হইবে—২টি বোম্বায়ে ও একটি কলিকাতায়। তিনটি কারখানার বৎসরে ২০

হাজার মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে। সরকার এই সকল কারখানা নির্ম্মাণে সাহায্য করিতেছেন। আরও দুইটি অনুরূপ কারখানা নির্ম্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য দান করা হইবে স্থির হইয়াছে।

কাশীধামে নিখিল ভারত পি-ই-এন সম্মেলন

[কা]শী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইকোয়াড় লাইব্রেরী হলে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কর্তৃক পি-ই-এন (লেখক) সম্মেলনের উদ্বোধন

ডেনমার্কের প্রতিনিধি মিঃ পি-মানকোর্ড হাসেন

ফ্রান্সের প্রতিনিধি ডাঃ মনদ হার্সেন

শ্রীমতী নাইডুর সম্বর্দ্ধনায় জলযোগ—শ্রীমতী নাইডুর সহিত খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুত মুলুকরাজ আনন্দের আলোচনা।

ছবি—শ্রীজলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব পাকিস্থানে ডাক বিভ্রাট—

গত ৫ই ডিসেম্বর ঢাকার পলাসী ব্যারাকের সম্মুখস্থ ময়দানে ডাক ও তার বিভাগের ইউনিয়নের এক সাধারণ সভা হয়। লোকাভাবে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ডাকবিলি প্রায় বন্ধ হইয়াছে। শুধু ঢাকা অফিসে ৭৫ হাজার মণিঅর্ডার ও লক্ষ লক্ষ পত্র জমা হইয়া আছে। হাজার হাজার রেজিষ্টার্ড ও ইনসিওর পর্য্যন্ত বিলি হয় নাই। ডাক-বিভাগের কর্ত্তারা এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করেন না। কর্ম্মচারীদের বাসস্থান, বেতনদান প্রভৃতির ব্যবস্থা না হওয়ায় কাজও বন্ধ আছে।

এসিয়ার একতা প্রয়োজন—

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী থাকিন নু ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইউ-টিন-টুট কলিকাতায় আসিলে ৮ই ডিসেম্বর মহাবোধী সোসাইটীতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী সভায় বলেন—এসিয়ার সকল স্বাধীন দেশকে এখন একতাবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করিতে হইবে। সে জন্য তিনি এসিয়ার স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে অধ্যাপক, ছাত্র, শিল্পী প্রভৃতির বিনিময়ের প্রস্তাব করেন। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতীয়গণকে তাড়াইবার চেষ্টার কথা মিথ্যা, বরং ব্রহ্মদেশে যাহাতে ভারতীয়গণ ভাল ভাবেই বাস করিতে পারে, অতঃপর তাহার চেষ্টা করা হইবে।

পরলোকে ভাই পরমানন্দ—

হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ভাই পরমানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে গত ৮ই ডিসেম্বর পঞ্জাব জলন্ধরে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এম-এ পাশের পর ১২ বৎসর অধ্যাপকের কাজ করেন ও তাহার পর রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া ১৯০৯ ও ১৯১৩ সালে দণ্ডিত হন। দণ্ডিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর আন্দামানে দ্বীপান্তরবাসও করিয়াছিলেন। ১৯১০ সাল হইতে কংগ্রেসের সহিত ও পরে হিন্দু মহাসভায় তিনি কার্য্য করেন ও ১০ বৎসর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় বনিয়াদী শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গে বনিয়াদী শিক্ষা পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি বোর্ড গঠন করিয়াছেন—(১) প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (সভাপতি) (২) শ্রীযুক্তা আশা আর্য্যনায়কম (৩) শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ (৪) শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানী (৫) ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু (৬) শ্রীযুক্তা যমুনা ঘোষ (৭) শ্রীযুত পঞ্চানন বসু (৮) শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন (৯) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী (১০) শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার (১১) বনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ কর্ম্মচারী (সম্পাদক)। বোর্ডে আরও ৪জন সদস্য গ্রহণ করা হইবে। বোর্ডে শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরই লওয়া হইয়াছে। যাহারা শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত, সেরূপ কয়েকজনকে বোর্ডে গ্রহণ করা হইলে কার্য্যকরী প্রস্তাব গ্রহণের সুবিধা হইবে।

ছুটীর দিন ঘোষণা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮ সালের ছুটীর দিন ঘোষণায় মহাত্মার জন্মদিন ২রা অক্টোবর, নববর্ষ ১লা বৈশাখ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ দিবস ১৫ই আগষ্ট সাধারণ ছুটীর দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আগামী বৎসর ১৫ই আগষ্ট রবিবার পড়িয়াছে। অন্যান্য ছুটী প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে। খৃষ্টীয় পর্ব্ব খৃষ্টমাস-ডে, গুডফ্রাইডে, ইষ্টার মণ্ডের ছুটি এবং মুসলমান পর্ব্ব ফতেয়াদোয়াজদাহাম, ঈদঅলফেতর, ইদুজ্জোহা (২দিন) ও মহরমের ছুটী পূর্ব্বের মতই থাকিবে। ১লা জানুয়ারী নববর্ষের ছুটী না বলিয়া ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশের দিন বলিয়া ছুটী দেওয়া হইবে।

লীলা-লেকচার—

কিসলয়ের কবি লীলা দেবীর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার পিতা শ্রীরণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়কে কয়েক সহস্র টাকা দিয়াছেন। এই টাকার উপস্বত্ব হইতে লীলা-লেকচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম লেকচারার ছিলেন শ্রীঅনুরূপা দেবী। এ বৎসরের লেকচারার ছিলেন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। লীলা দেবীর মৃত্যু দিবস হইতে তিন দিন (৩,৪,৫ ডিসেম্বর) কবিশেখর মহাশয় বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ববিচার ও রস-বিশ্লেষণ নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে ঐ লেকচার দিয়াছেন। ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বক্তৃতা সভার উদ্বোধন করেন। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সভাপতি। এই বক্তৃতামালা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে। আমরা একজন বাঙ্গালী কবির বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এই সম্মানে আনন্দিত হইয়াছি। কবিশেখর একাধারে গদ্যনিবন্ধ রচনায়, কবিতা রচনায়, শিক্ষকতায় এবং সৎশিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনার দ্বারা কৃতী হইয়াছেন।

চাংড়ীপোতায় প্রসূতি-সদন—

গত ১৬ই নভেম্বর ২৪ পরগণা চাংড়িপোতা গ্রামে "রাজলক্ষ্মী প্রসূতি ও শিশুসদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মেজর-জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে

সভাপতিত্ব করেন ও অন্যতম মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ভিত্তি স্থাপন করেন। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু তাঁহার মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ ভবন নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় ভার বহন করিবেন। ঐ দিনই তথায় ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের সভাপতিত্বে এক সভায় ডাক্তার কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর বয়স ৭৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

বাঙ্গালার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মহাশয় গত ১২ই নভেম্বর এবং মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার

ফটো—শঙ্করী দত্ত

গত ১৪ই ডিসেম্বর আরিয়াদহ (২৪ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডার পরিদর্শন করায় উভয় দিনই জনসভায় তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম দিনে কংগ্রেস সেবক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিনে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

জন-নিরাপত্তা আইন—

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা যে বিশেষ ক্ষমতা বিলের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা জন-নিরাপত্তা বিলে রূপান্তরিত হইয়াছে ও তাহার কয়েকটি আপত্তিকর ধারায় যথেষ্ট পরিমাণ সংশোধন করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবিত আইন কি কি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইবে, তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ্যে ও সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে এই আইন বলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি লইয়া কোন দলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবেন না এবং কাহারও ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা আন্দোলনও বন্ধ করা হইবে না। কোন বামপন্থী আন্দোলন কিম্বা আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলন দমনও ইহার উদ্দেশ্য নহে। গুণ্ডামী, বেআইনী কার্য্য, দস্যুতা, চোরাই অস্ত্রের কারবার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গুপ্তচরবৃত্তি, পঞ্চমবাহিনীর কার্য্যকলাপ —এক কথায় যাহা জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের মঙ্গল এবং নিরাপত্তার বিরোধী, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই এই আইন প্রয়োগ করা হইবে এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলিও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার

ফটো—শঙ্করী দত্ত

আইনের স্বরূপ—

পশ্চিম বাঙ্গালায় যে জন নিরাপত্তা আইনের প্রস্তাব হইয়াছে, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে ইতিমধ্যেই সেরূপ আইন করা হইয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ অবশ্যই অবহিত হইবেন। আইনের আপত্তিকর ধারাগুলির বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে

কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অবৈধ আন্দোলন হইলেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি হয় ও তাহার ফল বর্ত্তমান ক্ষেত্রের মত শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

কলিকাতায় প্রতিবাদ—

এই বিল আইনে পরিণত হওয়ার সুযোগ লাভের পূর্ব্বেই কলিকাতায় ইহার প্রতিবাদের নাম করিয়া জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী সকল শক্তি ও উপাদান একত্র হইয়া বিপ্লবী, প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিহিংসাপরায়ণ সাম্প্রদায়িক-পন্থীরা মিলিয়া গণতন্ত্রের নামে গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই ডিসেম্বর উচ্ছৃঙ্খল জনতারাজ সৃষ্টি করিয়াছিল। উহাতে কলিকাতার ছাত্রসমাজের এক অংশের মাথা ঘোলাইয়া দিয়াছে। তাহারই ফলে গত ১০ই তারিখে শিশিরকুমার মণ্ডল নামক এক নিরীহ যুবক পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারাইয়াছে ও বহু ছাত্র আহত হইয়াছে। সেজন্য সকলের মত আমরাও অতীব মর্ম্মাহত ও সকলের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। পুলিশ সেদিন যদি অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, সেজন্য প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তিবিধান ঘোষ-মন্ত্রিসভার অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে। এই ঘটনার পর ছাত্র-কংগ্রেসের পরিচালকগণও জানাইয়াছেন যে ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও কোন অভিযোগ নাই। কাজেই আমরাও সকলে ঘোষ মন্ত্রিসভার সুবিবেচনার উপর নির্ভর করিতে অনুরোধ করি। যাহারা তিন দিন সহরে শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছে, সকল বিবেচক ব্যক্তিই তাহা স্বীকার করিতেছেন—কাজেই ছাত্রদের মনোভাব পরিবর্ত্তনে সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

নতুন প্রভাত লাগি—

শ্রীপ্রফুল্ল সেনগুপ্ত এম-এ

নতুন প্রভাত লাগি শুধু দিন গুণি,—
আগন্তুক জীবনের পদধ্বনি শুনি।
স্তব্ধ হোক, হোক শেষ, হোক অবসান—
বীভৎস দিনের সব গান।
নিষ্পেষিত বেদনার ভারে,
ভিক্ষার তণ্ডুল তৃপ্ত জীবনের পারে—
সূর্য্যের নতুন স্পর্শে মিলাক আঁধার,
চূর্ণ হোক জীবনের ঘৃণিত সম্ভার !
অনাহার, অনাচারে, ক্লিষ্ট দেহ প্রাণ—
জীবনের ইতিহাসে শুধু অপমান :
পরমায়ু ভিক্ষা মাগি,'
তবু যেন বাঁচিবার সাধ,—
সহস্র বেদনা বহি,
আমাদেরি শুধু অপরাধ।
প্রতিপদে ব্যথা যার বিদ্বেষ যন্ত্রণা,—
কুৎসিৎ গ্রহের মোহে
কুচক্রির কেবলি মন্ত্রণা !
শেষ হোক—কলুষিত ইতিহাসখানি,—
নতুন সূর্য্যের দেশে
ডুবে যাক বিদ্বেষের বাণী।

শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি

শ্রীনীলিমা মজুমদার

বর্ত্তমান যুগে ভারতে যে কয়জন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ লোকালয়ে আছেন শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা দেশে অতি অল্প লোকই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও তাঁহার অনেক ভক্তবৃন্দ আছেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি কেবল সুপরিচিত নহেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে বহুস্থানে স্তব ও পূজা হইয়া থাকে। এই অঞ্চলে তিনি 'অচল অরুণাচলেশ্বর' রূপে পূজিত হইতেছেন।

মাদ্রাজএর মাহরার নিকট এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭৯ খৃঃ ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা আইনজীবী ছিলেন। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম বেঙ্কটরমণ ছিল। সপ্তদশ বৎসর বয়সে স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায় তিনি ভগবৎ প্রেরণায় গৃহত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ তিরুবন্নমালাই সহরের অরুণাচল শৈলের পাদমূলে অবস্থিত জ্যোতির্লিঙ্গ অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে প্রথমে ধ্যানস্থ হন। লোকালয়ে ধ্যান ধারণায় বিঘ্ন ঘটে বলিয়া অরুণাচল পর্ব্বতে
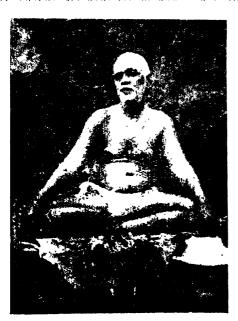
অরুণাচলের ঋষি

পরে তিনি চলিয়া যান। তথায় বিভিন্ন গুহায় ভগবৎ আরাধনায় নিমগ্ন থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি অরুণাচল শৈলের পাদমূলে তাঁহার অন্য ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত আশ্রমে বাস করিতেছেন। এই আশ্রম 'শ্রীরমণাশ্রম' বলিয়া পরিচিত।

বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষিকে দেখিবার সৌভাগ্য এইবার ঘটিয়াছিল। এই তপোজ্জ্বল কৌপীনধারী মুণ্ডিতমস্তক অরুণাচলের ঋষিকে চক্ষে না দেখিলে তাঁহার শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি কল্পনা করা যায় না। দেশদেশান্তর হইতে আগত হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরাজ, পার্শী একাসনে বসিয়া ধ্যাননিবিষ্ট চিত্তে প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গসুখ লাভ করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান। মাঝে মাঝে আত্মসমাহিত অবস্থা হইতে জাগিয়া স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তিনি ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই দৃষ্টিপাতেই যাহার যা কিছু বক্তব্য বা জ্ঞাতব্য তাহা পূর্ণ হইয়া যায়। প্রাণে অভূতপূর্ব্ব শান্তি আসে। দীক্ষা বা মৌখিক কোন উপদেশ সাধারণতঃ তিনি দেন না। তবে কাহারও কোন বিশেষ জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। যদিও তামিল ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল ভাষাতেই তিনি সুপণ্ডিত। অধিকন্তু সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন।

অধিকাংশ সময় মহর্ষি ভক্তদের সহিত অতিবাহিত করেন। নিজস্ব কোন সময় তাঁহার নাই বলিলেই চলে। প্রত্যহ প্রাতে সকলের সহিত একই ঘরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং চিঠিপত্র সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। মাঝে মাঝে দেবদুর্লভ সুমধুর হাসি হাসিয়া কথাবার্ত্তাও বলেন। এই সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ শিশুসুলভ হাসি ভুলিবার নহে। প্রতিদিন সকলের সহিত তিনি একসঙ্গে আহারে বসেন, সকলের আহার শেষ হইলে, সবাই উঠিয়া গেলে তিনি আসন ত্যাগ করেন। এই বৃদ্ধ বয়সে দৈনন্দিন নিয়মের কোন ব্যতিক্রম তাঁহার নাই। প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার সম্মুখে বেদপাঠ হয়, স্বাধ্যায়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে—আশ্রমের ময়ূর কাঠবিড়ালীগুলি ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মনে হয় সেই বুঝি আমাদের রামায়ণ মহাভারত-বর্ণিত মুনি ঋষিদের আশ্রম। মনপ্রাণ অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে পূর্ণ হইয়া যায়। জীবজন্তুর প্রতি মহর্ষির অসীম মমতা। স্বহস্তে তাহাদের খাবার দিয়া থাকেন।

কোন গুরু শ্রীশ্রীরমণ মহর্ষির জীবনমুক্তি লাভের জন্য আবশ্যক হয় নাই। স্বতঃই তাঁহার মন তরঙ্গশূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার উপদেশ সহজ সরল। "আমি কে" এই আত্মানুসন্ধান হইতেই আত্মোপলব্ধি হয়, ইহাই এক কথায় মহর্ষির আত্মোপদেশ।

দাক্ষিণাত্য বাস্তবিকই ধন্য। ভেলুপুরম রেলওয়ে ষ্টেশনের দুই বিপরীত দিকে প্রায় সমদূরে, পণ্ডিচেরীতে বোমার যুগের অগ্নিঋষি শ্রীঅরবিন্দ, অন্যদিকে তিরুবন্নমালাইএ অরুণাচলের ঋষি শ্রীরমণ মহর্ষি। উপনিষদ বর্ণিত এই দুই আদিত্যবরণ মহাপুরুষদ্বয়কে দেখিবার সৌভাগ্য বিগত আগষ্ট মাসে হইয়াছে বলিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।

রাজা রামমোহন

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ সায়াহ্নে বহু বর্ষ পরে
স্বাধীন রাষ্ট্রের কবি নতশিরে শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে
তোমারে স্মরণ করে
হে পুরুষোত্তম কর্ম্মবীর
সত্যদ্রষ্টা সাধক প্রধান !
দূর অতীতের প্রাচ্য ইতিহাস দিতেছে প্রমাণ
এ-কথাই অক্ষরে অক্ষরে
স্বদেশের অমা রজনীর ঘন দুর্য্যোগ তিমির
করে গেছ দূর ;
জ্ঞানের হিমাদ্রি তুমি, করিয়াছ ভাবে সুমধুর
এ-বঙ্গের চিত্তক্ষেত্র হে বিদ্রোহী তেজস্বী ব্রাহ্মণ
আপনার বীর্য্যবলে ; স্বজাতির কল্যাণ সাধন
আজীবন আত্মব্রত তব
নির্ব্বীর্য্য পৌরুষহীন সমাজের প্রাণে অভিনব
দিয়েছ স্পন্দন।
সহমরণের বুকে পশ্বাচার নিরুদ্ধ ক্রন্দন
ধর্ম্মের বিকৃত ভাস্ত মুখরিত শাস্ত্রের বন্ধন
পথহারা আঁধারের নির্জ্জীব স্থাবর যাত্রীদলে
ব্যথিত করেছে যাহা, তব তপস্যার শক্তি বলে
সে ক্রন্দন অবলুপ্ত দূরে ;
সভ্যতার চির অন্তঃপুরে
রাজরাজেশ্বর তুমি দৈব-লব্ধ জীবন্ত বিগ্রহ,
অমিতায়ু মৃত্যুঞ্জয় আলোকের চির বার্ত্তাবহ।
এনেছিলে চিন্তারাজ্যে অনাগত যুগের পাথেয়,
সভ্যতা সঙ্কট দিনে যাহা কিছু আপনার দেয়
দিয়ে গেলে নব সংগঠনে
লোকোত্তর প্রতিভার পুণ্যরশ্মি পূর্ণতার সনে।
অধ্যাত্ম পথের যাত্রা মঙ্গলের মহামন্ত্র ধ্বনি
উদয় দিগন্তে অনুরণি
স্বদেশের গৈরিক মৃত্তিকা—চৈতন্যের দিলে সাড়া
মানবিকতার প্রাণবন্ত প্রেরণার ভাবধারা
বহায়েছে বিশ্বমাঝে জ্যোতির্ম্ময় জীবন তোমার
সুন্দর উদার।
জীবনের উর্দ্ধতন সত্তার সংবাদ দিলে আনি
তর্ক দ্বন্দ্ব যুক্তি যত হানি
অসত্যের পুঞ্জীভূত ওজস্বিতা পরাজিত করি
মহত্তম আদর্শেরে বরি
তপঃশুদ্ধ প্রাণে শুনায়েছ উপনিষদের বাণী
শুচি করি যত কদাচার।
রাজতপস্বীর সম দীপ্তি তব হেরি অনিবার।
বিজাতির সত্ত পদানত
মূঢ় ভাগ্যহত
সেদিনের ক্রম-অবনত বিপন্ন ঐতিহ্য দ্বারে
এসেছিলে আজিকার দিন ফিরাইয়া আনিবারে
পথ প্রদর্শক !
শুধু নহ ধর্ম্মপ্রচারক নবযুগ প্রবর্ত্তক।
অহংমত্ত আত্ম-প্রচারের করো নাই অভিনয়,
প্রকৃতির মহাগ্রন্থে চিরদিন তুমি যে বিস্ময়
হে সূর্য্য সারথী !
স্বদেশেরে করিতে আরতি
প্রাচ্য প্রতীচ্যের ধারা সমন্বয়ে উদার অগ্রণী
পাশ্চাত্য শিক্ষার তরী পূর্ব্বঘাটে করি শঙ্খধ্বনি
ভিড়ায়ে দিয়েছ অনুরাগে
দূর শতাব্দীর উর্দ্ধভাগে।

বঙ্গভারতীর সাহিত্যেরে তুমি নব জন্মদিনে
মর্ত্ত্যপ্রীতি দেখালে নিখিলে
দিনগুলি করি বর্ণময়
ধ্বনিয়া উঠিল তব জয়।
প্রতিভার তুমি অধীশ্বর,
পাষাণের বক্ষ ভেদি উৎসারিয়া অমৃত নির্ঝর
এ জাতির সর্ব্বক্ষেত্রে সমাজের সর্ব্ব স্তরে স্রোত
এনে দিলে, পারে নাই কেহ তারে করিবারে রোধ।
শিখায়েছ স্বদেশেরে সহ্য করি অশেষ দুর্গতি
সঙ্ঘশক্তি উপাসনা সার্ব্বভৌম প্রথম পদ্ধতি
হে রামমোহন !
শ্মশান-সাধন রাত্রে করে গেছ শক্তি উদ্বোধন।

মন্বন্তর মহামারী লয়ে
বুভুক্ষার তীব্র জ্বালা সয়ে
এ জাতির অর্দ্ধভগ্ন সমাজের বিপর্য্যয় মাঝে
অগ্নিহোত্রী ! তোমারে যে কাছে
পেতে চাই, আজ কোনো কাজে
লাগেনাক মন, লক্ষ জীর্ণ কুটীর প্রচ্ছায়
বহিতেছে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বায়
হে বিদগ্ধ তোমারে প্রণাম
তোমার উদ্দেশে মোর চিত্ত অর্ঘ্য আজি রাখিলাম।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলাঃ

৭ই নভেম্বর—১১ই নভেম্বর

নিউ সাউথ ওয়েলস : ৫৬১ (৮ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতীয় ক্রিকেট দল : ২৯৮ ও ২১৫

সিডনিতে নিউসাউথ ওয়েলস দলের সঙ্গে খেলে ভারতীয় দল এক ইনিংসে পরাজিত হয়। অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের পরাজয় এই খেলা থেকে প্রথম আরম্ভ। নিউ সাউথ ওয়েলস দল প্রথম ব্যাটিং ক'রে ৮ উইকেটে ৫৬১ রান তুলে প্রথম ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করে। মরিস ১৬২ এবং মোরোনে ৯৬ রান করেন। মানকাদ এবং অধিকারী যথাক্রমে ১৫৬ ও ১৭৬ রানে ৩টি ক'রে উইকেট পান। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের খেলা ১০ই নভেম্বর তারিখে শেষ হয় ২৯৮ রানে। হাজারী ১৪২ রান করেন। মানকাদের ৬৭ রান উল্লেখযোগ্য। টসাক ৫২ রানে ৪টে উইকেট পান। অসুস্থতার জন্য খেলায় অমরনাথের যোগদান সম্ভব হয়নি। প্রথম ইনিংস ৩২০ মিনিটে শেষ হয়। ২৬৩ রান পিছনে পড়ে ভারতীয় দল 'ফলো-অন' ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে দিনের শেষে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৫ রানে শেষ হয় ৯ উইকেটে। অমরনাথ মাঠে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু খেলতে পারেন নি। অধিকারী দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৫ রান করেন। অমরনাথ উভয় ইনিংসেই খেলতে নামেন নি, নতুবা 'ফলো-অনে'র হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভারতীয় দল দলের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়ত পারতো। টসাক এবারও মারাত্মক বল দিয়ে ৬৫ রানে ৪ এবং জনস্টোন ৮৭ রানে ৩টে উইকেট পান।

১৪ই নভেম্বর—১৮ই নভেম্বর

ভারতীয় দল : ৩২৬ ও ৩০৪ (৯ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)

অষ্ট্রেলিয়া একাদশ : ৩৮০ ও ২০৩

বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে এবং একাধিক অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ খেলোয়াড় পরিপুষ্ট শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়া একাদশকে ৪৭ রানে ভারতীয় দল পরাজিত ক'রে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। শেষ পর্য্যন্ত ব্র্যাডম্যান এ পরাজয় থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা করেন।

প্রথম দিনের খেলায় ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে ২৯২ রান উঠে।

দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩২৬ রানে শেষ হয়। গুলমহম্মদ দলের সর্ব্বোচ্চ ৮০ রান করেন। তারপরই কিষেণচাঁদের নট আউট ৭০ রান উল্লেখযোগ্য। লক্সটোন ৭০ রানে ৩টে উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের খেলায় শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৪ উইকেটে ৩৪২ রান উঠে।

তৃতীয় দিনে পূর্ব্বদিনের রান সংখ্যায় আর মাত্র ৩৮ রান যোগ হ'লে পর অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতীয় দলের সোহনীর বোলিং মারাত্মক হয়েছিল, ৮৯ রানে তিনি ৪টে উইকেট পান। ডন ব্র্যাডম্যান ১৭২ রান করেন। মিলার করেন ৮৬ রান; মোট ৩৮০ রান উঠতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে তৃতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৭২ রান করে।

খেলার শেষ দিনে ভারতীয় দলের ৯ উইকেটে ৩০৪ রান উঠলে পর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করা হয়। দলের উল্লেখযোগ্য রান—কিষেণচাঁদ নট আউট ৭৩, সারভাতে ৫৮, অধিকারী ৪৬।

অষ্ট্রেলিয়া দল হাতে আড়াই ঘণ্টা সময় নিয়ে এবং ২৫০ রান পিছনে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং এই অল্প সময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান তুলবার জন্তে প্রথম থেকেই পিটিয়ে খেলতে থাকে। সে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু ভারতীয় দলের পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত শ্রেণীর ফিল্ডিং এবং মানকাদের মারাত্মক বোলিংয়ের সামনে শেষ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া একাদশ দলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ২০৩ রানে অষ্ট্রেলিয়া দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়। মানকাদ ৮৪ রানে ৮টা উইকেট নিয়ে মারাত্মক বোলিংয়ের পরিচয় দেন। ভারতীয় দলের এ জয়লাভ খুবই কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল।

২১শে নভেম্বর—২৫শে নভেম্বর

কুইন্সল্যাণ্ড: ৩৪১ ও ২৬৯ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতীয় দল: ৩৬৯ ও ২১৭

কুইন্সল্যাণ্ড ক্রিকেট দল বনাম ভারতীয় দলের খেলাটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে শেষ হয়েছিল—ভারতীয় দল মাত্র ২৪ রানে পরাজিত হয়।

কুইন্সল্যাণ্ড খেলার প্রথম দিন সারাদিন ধরে ব্যাট ক'রে এবং দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের কিছু পূর্ব্বে ৩৪১ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করে। দলের রান—মরিস ১১৫, রেমার ৮২, ম্যাক্কুল ৪৫। মানকাদ বিপক্ষকে ৭৬ রান দিয়ে ৬টি উইকেট পান।

খেলার দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ২৪৯ রান উঠে। অমরনাথ ১০১ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার তৃতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৬৯ রানে শেষ হয়। অমরনাথ নট আউট ১৭২ রান করেন। মানকাদ করেন ৬৫ রান। কুইন্সল্যাণ্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে কুইন্সল্যাণ্ড ৩ উইকেটে ১১৭ রান করে।

খেলার শেষ দিনে কুইন্সল্যাণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৬৯ রান উঠলে পর ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড

আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনাল বিজয়ী মোহনবাগান দল এবং মধ্যভাগে সস্ত্রীক পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর ফটো—জে কে সান্যাল

করা হয়। ম্যাকুল নট আউট ১০১ রান করেন। হাতে ১৫৫ মিনিট সময় এবং জয়লাভের প্রয়োজনীয় ২৪২ রান করার দুর্জ্জয় সংকল্প নিয়ে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে; কিন্তু নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য শেষ পর্য্যন্ত তাদের সংকল্প রক্ষা হয় নি। জয়লাভের প্রয়োজনায় রান দ্রুত তুলতে গিয়ে ভারতীয় দলের দারুণ ভাঙ্গন দেখা দেয়। শেষ উইকেটে পি সেন যখন কিষেণচাঁদের জুটী হ'লেন তখন খেলা শেষ হ'তে আর মাত্র ১৫ মিনিট সময় বাকি এবং ভারতীয় দল ৩১ রানের ব্যবধানে ছিল।

কুইন্সল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা উইকেটের সন্নিকটে ব্যাটসম্যানদ্বয়কে বেষ্টিত ক'রে মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে লাগলেন। শেষ ওভার বলে তিনটে বল করার পর সকলেই ভাবলেন খেলা অমীমাংসিতভাবেই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষ ওভারের চতুর্থ বলে কিষেণচাঁদ বোল্ড আউট হয়ে গেলে খেলা শেষ হয়ে গেল। ফলে কুইন্সল্যাণ্ড মাত্র ২৪ রানে খেলায় বিজয়ী হ'ল। ম্যাক্কুল ৩৮ রানে ৫টা উইকেট পান।

আই-এফ-এ শীল্ড ফাইনালে সস্ত্রীক পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর স্যার বি-এল মিত্র ফটো—জে কে সান্যাল

ভিনু মানকাদ প্রশংসীত ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব টেষ্টম্যাচ ক্যাপটেন ভিক্টর রিচার্ডসন কুইন্সল্যাণ্ড বনাম ভারতীয় খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে এরূপ মন্তব্য করেন যে, ভিনু মানকাদ বর্ত্তমানে পৃথিবীর ক্রিকেট জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড়। তাঁর মতে ইংলণ্ডের বিখ্যাত টেষ্ট বোলার ভেরিটি অপেক্ষা মানকাদ উচ্চাঙ্গের বল করেন। ক্রিকেট খেলার দেশ অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় মানকাদ সম্পর্কে যে প্রশংসা সেই দেশের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে তা আমাদের গর্ব্বের বস্তু সন্দেহ নেই।

প্রথম ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া দল ঃ ৩৮২ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতীয় দল ঃ ৫৮ ও ৯৮

ভারতীয় দল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের সরকারী টেষ্ট ম্যাচের প্রথম খেলায় ভারতীয় দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস এবং ২২৬ রানে পরাজিত হয়েছে। খেলায় দলের যোগ্যতা যে জয়লাভের একমাত্র মাপকাঠি নয় তা ক্রিকেট খেলা সম্পর্কেই বেশী বলা চলে; কারণ ক্রিকেট খেলায় যোগ্যতার মাপকাঠি ছাড়া প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর যথেষ্ট নির্ভর করতে হয় এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুবিধা নিয়ে অনায়াসে একদল অপর দলকে বিপর্য্যস্ত ক'রে শেষে খেলায় যে জয়ী হয় এরূপ ঘটনা ক্রিকেট খেলায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় ভাগ্যবান দলই প্রাধান্য লাভ করে, দক্ষতার প্রভাব খুব কার্য্যকরী হয় না। অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের প্রথম টেষ্ট ম্যাচেও ইন্দ্রদেব অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ অবলম্বন করায় ভারতীয় দলকে যে এই শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তা খেলার বিবরণ এবং মাঠের অবস্থাই তার সাক্ষ্য দেয়। 'Winning of toss an important factor' ক্রিকেট খেলায় এই মূল্যবান উক্তি এক্ষেত্রে জয়যুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে হয়েছে।

২৮শে নভেম্বর ভারতীয় দল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয় ব্রিসবেনে। ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করলে অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ব্যাটিং আরম্ভ করে। প্রথম দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৩ উইকেটে ২৭৩ রান উঠে। ব্র্যাডম্যান ১৬০ রান ক'রে নট আউট থাকেন। প্রথম দিনের খেলার পূর্ব্ব রাত্রে এবং খেলার দিনের চা পানের সময় বৃষ্টি হয় কিন্তু পিচের অবস্থা ভালই ছিল। খেলার দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য মাত্র এক ঘণ্টা খেলা হয়েছিল এবং তাও চারটার পূর্ব্বে সম্ভব হয়নি। খেলার প্রথম দিনের রাত্রে দু' ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। প্রবল বারিপাতে মাঠের জায়গায় জায়গায় কাদা দেখা যায় এবং পিচের অবস্থাও ভাল ছিল না। ব্রিসবেন মাঠের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ভারতীয় দল মধ্যাহ্ন ভোজের পর প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। খেলার ফল যে শুভ হবে না তা সূচনাতেই আভাস পাওয়া গেল। মানকাদ ও গুলমহম্মদ দলের কোন রান হবার আগেই আউট হলেন। ১০ মিনিট খেলার পর ৭ উইকেটে ভারতীয় দলের মাত্র ৫০ রান উঠলো। বাকি তিনজন হাজারে, অমরনাথ এবং ইরাণী আর ৮ রানের মধ্যে আউট হয়ে যান। এ বিপর্যয় ঘটালেন অষ্ট্রেলিয়ার বোলার টসাক। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ৫৮ রানে শেষ হ'ল। পূর্ব্বদিন রাত্রে এক ইঞ্চি বৃষ্টির জন্য এই দিন নির্দ্ধারিত সময়ের ৩৯ মিনিট পর খেলা আরম্ভ হয়। পিচের অবস্থা ভাল ছিল না। খেলোয়াড়দের ব্যাটে কাদা উঠতে দেখা যায়; বলও অত্যাধিক বাম্প করতে থাকে।

স্যার বি-এল মিত্র মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন

ফটো—জে কে সান্যাল

অষ্ট্রেলিয়া দলের থেকে ৩২৫ রানে পিছনে থাকায় ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা 'ফলো-অন' হিসাবে আরম্ভ করলো চা পানের পর। এবারও ভারতীয় দলের ভাগ্যে কোন শুভ পরিবর্ত্তন হ'ল না। দিনের শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪১ রান উঠলো। দ্বিতীয় ইনিংসেও টসাকের বল মারাত্মক হ'ল। তিনি ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের শেষদিকে মাত্র ২ রানে ভারতীয় দলের ৫জনকে আউট করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসের মাত্র ১২ রানে তিনটে উইকেট পান। কোন টেষ্ট ম্যাচেই এ পর্য্যন্ত কোন বোলারই তাঁর মত কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

অপরাহ্ণ চারটায় পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটসম্যান ব্র্যাডম্যান এবং মিলার খেলা আরম্ভ করেন। তাঁরা খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এই দিন কোন উইকেট না খুইয়ে ৩ উইকেটে ৩০৯ রান উঠে। ব্র্যাডম্যান ১৭৯ এবং মিলার ১৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। খেলার তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১লা ডিসেম্বর অষ্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেটে ৩৮২ রান উঠলে পর তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হ'ল। উল্লেখযোগ্য রান করেন ব্র্যাডম্যান ১৮৫, মিলার ৫৮, হাসেট ৪৮, মরিস ৪৭। গত রাত্রেও

খেলার চতুর্থ দিনের পূর্ব্ব রাত্রেও বৃষ্টি হওয়ায় ঐদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্ব্বে ভারতীয় দল পূর্ব্ব দিনের পরিত্যক্ত

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে পারে নি। চতুর্থ দিনেও খেলার মধ্যে বারিপাত হ'তে থাকে এবং খেলার উপযুক্ত আলোকাভাব হওয়ায় বেশীক্ষণ খেলা হয়নি। অপরাহ্ণ ৪-৩৫ মিনিটে ভারতীয় দলের আবেদনক্রমে খেলার উপযুক্ত আলোকাভাব হেতু দু'জন আম্পায়ারই খেলা বন্ধ করেন। ঐ দিনের কোন উইকেট না হারিয়ে ভারতীয় দলের ৪ উইকেটে ৭০ রান উঠলো।

খেলার পঞ্চম দিনে প্রবল বারিপাত এবং মাঠের খারাপ অবস্থার জন্য টেষ্ট ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়।

খেলার ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ শেষদিনের পূর্ব্ব রাত্রে বৃষ্টি না হওয়ায় নির্ম্মল আবহাওয়ার মধ্যে ভারতীয় দলের পরিত্যক্ত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হয়। সূচনা ভাল হ'ল না। সূচনাতেই হাজারে নিজস্ব ১৮ রান করে আউট হলেন। মোট ৭০ মিনিট খেলায় ভারতীয় দলের ৯৮ রান উঠলে পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি হয়। ভিজা মাঠের সম্পূর্ণ সুবিধা অষ্ট্রেলিয়ান স্লাটা স্পিন বোলার টসাক হাত ছাড়া করলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রান করতে দিয়ে ৬টা উইকেট পেলেন। ভারতীয় দল এক ইনিংস ও ২২৬ রানে অষ্ট্রেলিয়া দলের কাছে প্রথম টেষ্ট ম্যাচে পরাজয় স্বীকার করলো; প্রসঙ্গত ভাগ্যের বিড়ম্বনায় প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের কাছে আত্মসমর্পণ বলা চলে।

অষ্ট্রেলিয়া: ডি ব্রাডম্যান (অধিনায়ক) ডবলউ এ ব্রাউন, মরিস, এল হ্যাসেট, কে মিলার, সি ম্যাক্‌কুল, আর লিণ্ডওয়েল, টি ট্যালন, আই জনসন, ই টসাক।

ভারতীয় দল: এল অমরনাথ (অধিনায়ক), ভি এস হাজারা, ভি মানকাদ, জে কে ইরাণী, জি কিষেণচাঁদ, এইচ আর অধিকারী, গুলমহম্মদ, সি এস নাইডু, সি টি সারভাতে, কে এম রঙ্গনেকার, এস ডবলউ সোহনী।

জো লুই ঃ

নিউ ইয়র্কস্থ ম্যাডিসন স্কোয়ারে পৃথিবীর বিখ্যাত হেভিওয়েট মুষ্টি যুদ্ধ চ্যাম্পিয়ান জো লুই তাঁর এই 'খেতাব' অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী জার্সি জো ওয়ালকট নামে অপর এক নিগ্রো মুষ্টি যোদ্ধার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে কোনক্রমে জয়ী হয়ে নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। জো লুই সর্ব্বক্ষণই নৈরাশ্যজনকভাবে লড়েছিলেন এবং তাঁর এ লড়াই সম্পর্কে রেফারী এবং বেশীর ভাগ ক্রীড়ামোদীদের মতে জো লুই প্রকৃতপক্ষে পরাজয় স্বীকারই করেছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে নিউইয়র্ক ষ্টেট এ্যাথলেটিক কমিশনে বিচারকদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জো লুইয়ের বর্ত্তমান বয়স ৩৩ বছর। এই নিয়ে পৃথিবীর হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ান অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁকে ২৪বার লড়তে হয়েছে। প্রতিযোগিতায় দর্শনী হিসাবে ২৫০,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছে; এই বাবদ জো লুই শতকরা ৪৫ এবং ওয়ালকট শতকরা ১৫ হিসাবে লভ্যাংশ পাবেন।

জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নয়ন পরিষদ—

(সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত)

গত ২৩শে কার্ত্তিক ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'দি জিমনাসিয়ামের' ক্রীড়া প্রাঙ্গণে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষের সভাপতিত্বে জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নয়ন পরিষদের সম্মানপত্র বিতরণ ও ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৪৬ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে ব্যায়াম শিবিরে প্রবেশ করেন এবং সম্মানের সঙ্গে শিক্ষা শেষ করেন। ডাঃ অমর মুখার্জ্জি এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন।

এই উৎসব উপলক্ষে যে সব ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়, তার মধ্যে বলাই চাটুয্যের বাংলা ভাষায় আদেশ দ্বারা কুচকাওয়াজ, বিষ্ণু ঘোষের আসন ব্যায়াম শিক্ষা, রবান সরকারের ডাম্বল ড্রিল শিক্ষা ও মৃগব্যাধ নৃত্য ও অপরাপর ব্যায়াম বীরদের ব্যায়াম কৌশল বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, স্বাধীন ভারতে স্বাস্থ্যহীন দেহ থাকা মোটেই সুলক্ষণ নয়। প্রত্যেকে যাতে নিয়মানুযায়ী ব্যায়াম শিখতে পারে তজ্জন্য এইরূপ শিক্ষা শিবিরের প্রয়োজন আছে। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে ব্যায়াম করা হয় না—এই উক্তি যাঁরা করেন তাঁরা শিক্ষা শিবিরে যোগদান ক'রে জাতির উন্নতিসাধন করতে পারেন।

অনুষ্ঠানের শেষে মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি শিক্ষার্থীদিগকে সম্মানপত্র প্রদান করেন এবং মনোরম বক্তৃতা দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

হে গান্ধীজী তোমায় প্রণাম

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে অনেক সূর্য্য, এক সূর্য্য পরিদৃশ্যমান,
এদেশে অনেক লোক, একা তুমি শাশ্বত মানুষ,
হে গান্ধীজী তোমায় প্রণাম।
তোমায় প্রণাম করি হে প্রবীণ বেদের ব্রাহ্মণ,
তোমায় প্রণাম করি, চক্ষুষ্মান তুমি নরোত্তম।

পাপ যতো, যতো লজ্জা, সুন্দরের বিকৃতি বিলাস,
দেহের দীনতা যতো, আত্মার যা কিছু পরাজয়,
হে আত্মবিস্মৃত ঋষি সকলের উর্দ্ধে তুমি, তাই
আবর্জ্জনাপুঞ্জ মাঝে তোমার আসন হ'ল পাতা।
অতীত প্রত্যুষ কথা তোমায় দেখিলে মনে পড়ে,
—মনে পড়ে সর্ব্বহারা সম্রাটের কাঁটার মুকুট।

গৃহকোণে বদ্ধদৃষ্টি, যে দৃষ্টি মাটিরে নাহি চায়,
যে দৃষ্টি আকাশপটে দেখে না মেঘের মণিমেলা,
স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি, ছোট ছোট বিচিত্র সংঘাত
পৃথিবী ভরিয়া আছে এ নগণ্য জনতার ভিড়ে।
এই বন্দী ভগবান, এদেরই মুক্তির মহাব্রত
তোমার জীবন স্বপ্ন। তব কীর্ত্তি হ'তে তুমি বড়,
তাই তুমি কাছে এলে দানবেরা মাটিতে মিশায়।
তোমায় ঘিরিয়া যারা দিনরাত করে কলরব,
তাদের মহত্ব আর তাদের হীনতা অতিক্রমি
হে সূর্য্য তোমার আলো সঞ্চারিত সারা পৃথিবীতে।

স্রষ্টা তুমি, স্রষ্টা তুমি, আলোক বর্ত্তিকা জগতের ;
সে বর্ত্তিকা পানে চাহি মুমূর্ষু ধরণী রাত্রি জাগে,
রাত্রি জাগে আর দেখে সুখ-স্বপ্ন নব জীবনের।

* * * *

অনেক পাঁকের নীচে রুদ্ধকণ্ঠে যে প্রাণকোরক,
সূর্য্য তপস্যার জ্যোতি তারও মাঝে সঞ্চারিত হোক্।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী— শ্রীযুক্ত নীরেন্ ঘোষ | মা ও ছেলে | ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মাঘ—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

পদ্মিনী

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস্

রূপের পূজারী আমি দিবাযামী রূপমুগ্ধ কবি,
হে রাণী পদ্মিনী,
ভুলে যাও রণভেরী মহাবৈরী ডঙ্কার ভৈরবী
সমর রঙ্গিণী,
ভুলো পাঠানের হিংসা জয়লিপ্সা স্পর্দ্ধা কামুকের
দানব কাহিনী ;
তোমার আঁখির রোষে বজ্র ঘোষে জানো কার্ম্মুকের
অগ্নিবাণ মানি।

২

সৃষ্টির পরম পুষ্প, তিলোত্তম রূপের প্রকাশ,
নহ তুমি নারী ;
সুকুমার শিল্প তুমি, স্বপনের গোপন বিকাশ
সমুখে বিসারি'
নয়নে আনন্দ দাও, অধরে মধুর প্রেমগীতি
হিয়া মাঝে আশা
অম্বরে অনন্ত জ্যোতি ইন্দ্রধনুবর্ণময়স্মৃতি
ভূমার পিপাসা।

৩

সে তুমি ত নহ নারী, মৃত্তিকারি মর্ত্ত্যের মানবী,
চিতোর মহিষী।
বিশ্বের বন্দিতা রাণী ; অনিন্দিতা কল্পনায় কবি
চির দিবানিশি
তোমারে সৃজন করে। অন্ধরাত্রি লভিতে তোমারে
দিগ্বিজয়ে চলে
রশ্মিতে রূপের পদ্মে দিনমণি কিরণ বিস্তারে
ডুবে অস্তাচলে।

৪

সে তুমি অরূপ সাজে ধরামাঝে রাজো নিশিদিন,
অনন্ত রূপসী,

তোমারে সন্ধানে কবি বিশ্বে ছবি বিরাম বিহীন
দেশে দেশে পশি
সেই তুমি চিত্ত ভরে চিরতরে নগরে প্রান্তরে
বাজাও কিঙ্কিনী
তব পরাজয় হবে এই ভবে পাঠানের ভয়ে
বিশ্ব-বিজয়িনী ?

৫

মানস পদ্মের রাণী প্রেমবাণী শ্রেষ্ঠ উপহার
কবিতার ডালি
স'পিনু অনিন্দ্যকান্তি স্নিগ্ধশান্তি সৌন্দর্য্যসম্ভার,
রাজার দুলালী,
এত বিভা মনোলোভা এক সাথে জোছনাতে শোভে
পূর্ণিমা বারতা,
জ্বালাও অনল জ্বালা, দহি "আলা" বিজয় গৌরবে
কামনার ব্যথা।

৬

চাও দেবী আঁখি মেলে অগ্নি ঢেলে জ্রুভঙ্গ বিকাশে
দহ মদনেরে,
স্বচ্ছ প্রতিবিম্বে যেন কম্বুগ্রীবা রণরঙ্গে হাসে,
খোলো বদনেরে,
গুরু গুণ্ঠনের তলে যেথা জ্বলে গৌরানল শিখা
দেখাও তাহারে ;
তব পুণ্যপ্রভা বলে দুর্গতলে শত্রু বিভীষিকা
নত হয়ে হারে।

৭

তার পরে ক্ষমা ভরে বাসনার ভস্মরাজি ধূলি
সাথে ধরণীতে
মিশায়ে বিলোপ কর, ধনুর্দ্ধর রণসাজ খুলি'
এসো বর নিতে,
মন্দির অন্দরে দেবী, যেথা কবি প্রার্থনায় বসি
রূপে "যোগমায়া"—
বিশ্বের হিংসার পরে জিনে যেন অসীম রূপসী,
চিত্ত জিনে কায়া।

৮

প্রকৃতির বৈতালিক মাঙ্গলিক গেয়ে ওঠে সাথে,
গাহে তব জয়,
পুরনারী ভরি' ঝারি শান্তিবারি তুলে নেয় মাথে
নিশ্চিন্ত নির্ভয়,
মুক্ত কোষে অসি হাসে চমকিয়া সৌরকর তলে,
বাজে জয় ভেরী ;
মধুরে ভাসিয়া যায় শান্ত বায় নাচাইয়া জলে
তটিনী "গাম্ভেরী"।

৯

চিরকাল ধূম্রজাল ছড়াইয়া রাত্রির তিমির
আলোর কমলে
ঢাকিয়া ডাকিয়া যায় ঝিল্লীস্বনে নিশির শিশির
ঝরে অশ্রুজলে
তবু আমি তব কবি রূপচ্ছবি রচে রচে যাই
বাজাই বাঁশরী,
দেহের দেউল প্রান্তে একান্তে অদেহী গাথা গাই
বেদনা পাশরি'।

১০

রূপের পূজারী হয়ে স্মৃতি লয়ে রূপমুগ্ধ কবি
রচি তব গাথা
বাসনা বিনাশ করি চিত্তে ভরি তব রূপচ্ছবি
সম্ভোগ-অতীতা
সৃষ্টির মানস-পদ্মে সরস অমৃত তুমি নারী
প্রেমাশ্রুতে ভিজে
যে রূপ দহন করে তার 'পরে ঢালো শান্তিবারি,
দহিয়ো না নিজে।

ইংরেজ ভারত ছাড়িল কেন?

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ্-ডি

১৯৪৭ সনের ১৫ই অগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াছে। ছয়মাস পূর্ব্বেও কেহ কল্পনা করে নাই যে এত শীঘ্রই ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান হইবে এবং আমরা দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইব। ঘটনাপরম্পরা যে অনেকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং মনে স্বতই প্রশ্ন ওঠে—কি কারণে ইহা সম্ভবপর হইল।

কেহ কেহ মনে করেন যে ইংরেজ জাতি স্বীয় ঔদার্য্য-গুণে এবং স্বাধীনতার প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি ও অনুরাগ-বশত স্বেচ্ছায় ভারতবর্ষের উপর স্বীয় অধিকার ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। বিগত শতাব্দীর ইংরেজের ইতিহাস এই ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইংরেজ রাজনীতিবিদগণ মুক্তকণ্ঠে এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং অদূর ভবিষ্যতেও যে এই দেশ স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা লাভ করিবে সে সম্ভাবনাও তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। ইহা কোন রাজনৈতিক দল বিশেষের মতামত নহে। উদার ও রক্ষণশীল উভয় দলের লোকই এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রমিকদলের প্রধান ব্যক্তিগণও যে কেবল এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাহা নহে, কার্য্য দ্বারাও তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টবাদী, তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে জগতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য ও প্রভুশক্তির এত হ্রাস হইবে যে ইহা প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। চার্চ্চিল কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে প্রতি পাঁচজন ইংরেজের মধ্যে একজনের জীবিকানির্ব্বাহ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিতেছে। কথাটা খুবই খাঁটি। আর মুখে সব সময়ে স্বীকার না করিলেও ইংরেজ রাজপুরুষেরা যে প্রধানত এই কারণেই ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরেজদের যে আর্থিক অবস্থা ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক হীন হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সম্পদ আগের চেয়ে এখন তাদের আরও বেশী প্রয়োজনীয়। এখন জগতে প্রাধান্য বজায় রাখা তো দূরের কথা, কেবলমাত্র জীবনধারণ করার জন্যই ইংলণ্ড পরমুখাপেক্ষী। সুতরাং এই বিষম সঙ্কটের কালে স্বেচ্ছায় ইংরেজরাজ ভারতবর্ষের বিপুল সম্পদভোগের লোভ ত্যাগ করিবে ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

অতএব ইহাই অধিকতর সম্ভব যে ইংরেজ বুঝিয়াছে—ভারতবর্ষে তাহাদের আধিপত্য করা আর সম্ভব নহে—এবং ইহা বুঝিয়াই সময় থাকিতে ঔদার্য্যের ভাণ করিয়া তাহারা ভারতবাসীর সহিত যথাসম্ভব সদ্ভাব বজায় রাখিবার জন্য তাহাদিগকে তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা দিতে মনস্থ করিয়াছে। ভারতবর্ষে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস" অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজের আগ্রহও এই ধারণাই সমর্থন করে। ইহার মূলে হয়ত এই অভিসন্ধি আছে যে আপাতত এটুকু দিয়া যদি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখা যায় তবে তাহাও মন্দের ভাল—কারণ অন্যথায় হয়ত এই দেশ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়া সাম্রাজ্যের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করিবে।

এইরূপ কোন মত গ্রহণ করিলে প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে সম্প্রতি এমন কি ঘটনা ঘটিয়াছে বা অবস্থার এমন কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে যাহাতে আর অধিককাল ভারতবর্ষ স্বীয় অধীনে রাখা ইংরেজ অসম্ভব মনে করিতে পারে। যখন বিগত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখনও যে ইংরেজের মনের ভাব এইরূপ ছিল না—ক্রিপস সাহেবের দৌত্যের নিষ্ফলতাই তাহার প্রমাণ। আজ ইংরেজ বিজয়ী, ফ্রান্স হতবল, পরমশত্রু জার্ম্মাণী ও জাপান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, এক রাশিয়া ভিন্ন আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই—ইউরোপের ইতিহাসে ইংরেজের পক্ষে এরূপ সুবিধাজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতির আর কোন দৃষ্টান্ত বড় একটা পাওয়া যায় না। আমেরিকা প্রবল হইলেও মিত্রশক্তি—সেদিকে কোন ভয় বা উদ্বেগের কারণ নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ যে সিদ্ধান্ত

করিয়াছে তাহার সহিত জগতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার কোন সম্বন্ধ আছে এরূপ বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নাই।

অতএব আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ইংলণ্ডের ধারণা জন্মিয়াছে যে তাহার নিজের সামরিক শক্তি এত হ্রাস পাইয়াছে যে ভারতবর্ষকে দাবাইয়া রাখা তাহার সাধ্যের অতীত। যদি ইহাই সত্য হয় তবে কি কারণে ইংরেজের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল তাহাই আমাদের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। বিগত যুদ্ধের ফলে ইংরেজের মোট সামরিক শক্তি হ্রাস পাইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কোন সামরিক শক্তিই নাই। সমুদয় সৈন্যই ইংরাজের অধীন। সুতরাং ভারতবর্ষের দিক দিয়া দেখিলে ইংরেজ পূর্ব্বাপেক্ষা নিজেকে হীনবল মনে করিবে এরূপ কোন কারণ নাই। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ নীতিই এই দুর্ব্বলতার কারণ। কিন্তু ১৯৪২ সনের কংগ্রেস আন্দোলনের পরিণাম আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যতদিন ইংরেজ সামরিক শক্তি দ্বারা ভারতবর্ষ দমন করিতে সমর্থ বলিয়া নিজেকে মনে করে ততদিন এই সত্যাগ্রহের বা অন্য কোন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট পরাভব স্বীকার করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। বিশেষত যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বিরোধ উত্তরোত্তর যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা যে ইংরেজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার যথেষ্ট অনুকূল এবং সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় একথাটা ইংরেজ খুব ভালরূপেই জানিত। সুতরাং নিজের সামরিক শক্তি ভারতবর্ষ দমন রাখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত মনে করিলে ইংরেজ কেবলমাত্র কংগ্রেসের আন্দোলনের ভয়ে নিজের অধিকার ছাড়িয়া দিবে—এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজের সামরিক শক্তি আপাত-দৃষ্টিতে অক্ষুণ্ণ থাকিলেও কি কারণে ইংরেজ তাহা ভারত রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট মনে করে নাই—অতঃপর আমাদিগকে তাহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। কারণ জড়-জগতের ন্যায় মনুষ্য সমাজের ঘটনাপ্রবাহ কোন সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা নিরূপিত হয় না, হইলেও ইহার মূল সূত্রগুলি পদার্থবিদ্যার ন্যায় আমাদের অবিগত নহে। সুতরাং পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্যক পর্য্যালোচনা করিয়া কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। এই জন্যই এ বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা থাকে এবং ভবিষ্যতে নূতন কোন তথ্য বা ঘটনার কথা জানিতে পারিলে অনেক সময় পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ইতিহাসের এই মূল সূত্রটি মনে রাখিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত সমস্যার সমাধান করিতে অগ্রসর হইব।

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে যে সমুদায় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে ইংরেজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে—ভারতীয় সেনাদলের উপর আর নির্ভর করা চলে না। প্রথমত তাহাদের মধ্যেও স্বাধীনতামূলক মনোবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধভাবে ইংরেজ প্রভুর আদেশ মানিয়া তাহারা ভারতবর্ষ দমন রাখিতে বদ্ধপরিকর হইবে এরূপ আশা পোষণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত জাপানের সহিত যুদ্ধে ইংরেজের যে নিদারুণ পরাজয় ঘটে তাহাতে এদেশে ইংরেজের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে যে একটা উচ্চ ধারণা ছিল তাহা প্রায় সমূলে নাশ হয়। ইংরেজ সংখ্যায় অল্প হইলেও এই সর্ব্ববাদীসম্মত প্রতিপত্তির জোরে এবং এদেশীয় সৈন্যের সাহায্যেই বিশাল ভারতবর্ষ শাসন করিত। যে মুহূর্ত্তে সে জানিতে পারিল যে সাম্রাজ্যের এই দুই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না—ভারতে বৃটিশ শক্তির অবসানের আর বিলম্ব নাই। অবসান হইবে কি না এ প্রশ্নের আর অবসর নাই—এখন একমাত্র প্রশ্ন—কবে অবসান হইবে। ব্রিটিশ জাতি রাজনীতি বিষয়ে বিচক্ষণ। তাই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী জানিয়াই বিশ্বের দরবারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য তাহারা ঔদার্য্যের ও মৈত্রীর মুখোস পরিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহা হইলে বঙ্গগৌরব সুভাষচন্দ্রের নিকট সমগ্র ভারত স্বাধীনতালাভের জন্য বিশেষভাবে ঋণী। কারণ সুভাষচন্দ্র যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন তাহাই ভারতে ইংরেজ সামরিক শক্তির মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করে। সুভাষচন্দ্রের অদ্ভুত

অধ্যবসায় ও কর্ম্মশক্তি দ্বারা গঠিত এই সৈন্যদল মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য দৃঢ় পণ করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধে যে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহাতেই ইংরেজ সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারিল যে ভারতীয় সৈন্য দ্বারা ভারতবর্ষ দমন রাখিবার দিন অতীত হইয়াছে। আর দিল্লীর লাল কিল্লার বিচার প্রহসনের ফলে মুগ্ধ বিস্মিত ভারতবাসী যেদিন এই ফৌজের বিশদ বিবরণ জানিতে পারিল সেই দিনই ইংরেজের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি ধ্বংসের সূচনা হইল। একটি জনরব প্রচলিত আছে যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের "বিদ্রোহী" সৈন্যদিগের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে ভারতের প্রধান সেনাপতি এ দেশীয় সামরিক কর্ম্মচারীগণের মতামত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতীয় সৈন্যদল একবাক্যে বিদ্রোহীদের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানায়—এবং এই প্রকার মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াই ইংরেজরাজ আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে উদারনীতি অবলম্বন করে। এই জনরব সত্য না হইলেও একথা ঠিক—আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচারের ফলে ইংরেজ একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে যে এ দেশীয় জনসাধারণ ও সৈন্যদল মনে মনে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের বিরুদ্ধভাব পোষণ করে এবং যাহারা প্রকাশ্যে ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীই তাহাদের কার্য্য অনুমোদন করে এবং প্রশংসার চক্ষে দেখে।

শীঘ্রই ইহার সমর্থনে আর একটিপ্রমাণও পাওয়া গেল। ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই, করাচী ও মাদ্রাজে ভারতীয় নাবিকগণ প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা ও নিষেধ সত্ত্বেও জনসাধারণ ইহার প্রতি সহানুভূতি জানায়। এই বিদ্রোহের কাহিনী সুপরিচিত, সুতরাং ইহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। কিন্তু এই ঘটনায় ভারতীয় নৌসৈন্যের যে মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইংরেজের সন্দেহমাত্র থাকে না যে তাহার বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের ভিত্তি খসিয়া পড়িতেছে—সম্পূর্ণ ধ্বংসের আর বিলম্ব নাই। এই প্রসঙ্গে একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারী এই নৌবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ঠিক পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে ভারতের রাজনীতি সমাধানের জন্য ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে যাইতেছে।

কি কারণে ইংরেজ ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ব্যক্ত করিলাম। ইহা যে একেবারে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত অথবা অবিসংবাদিত সত্য আমরা এমন কথা বলি না। তবে যে সমুদয় ঘটনা এ- পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। আমাদের স্বাধীনতা লাভে সুভাষচন্দ্রের কৃতিত্ব যে কতখানি ভারতবাসী তাহা যথাযথ উপলব্ধি করে নাই এবং তাহার ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব তাহাকে দান করে নাই। নিতান্ত দুঃখের সহিতই এ কথার উল্লেখ করিতে হয় যে দিল্লীতে ভারতীয় গণসভায় স্বাধীনতা উদ্বোধনের জন্য ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে যে বিরাট অনুষ্ঠান হয় তাহাতে প্রধান প্রধান নেতাগণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষণের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই।

যদি কোনদিন দাসত্ব হইতে মুক্তির স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতে কোন মন্দির স্থাপিত হয় এবং তাহার মধ্যে এই স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষ যাহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঋণী তাহাদের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে যে তিনজনের মূর্ত্তি প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য আমাদের মতে তাহাদের নাম—

১। মহাত্মা গান্ধী
২। অ্যাডলফ হিটলার
৩। সুভাষচন্দ্র বসু

হিটলারের সহিত যুদ্ধে অন্তঃসারশূন্য না হইলে ইংরেজ ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য ছাড়িবার কল্পনাও করিত না। সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন না করিলে ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হইত না। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব না হইলে আজ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ক্ষেত্রই প্রস্তুত হইত না। হিটলার পরোক্ষভাবে যে মহদুপকার করিয়াছেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ভগবানের নিকট সুভাষচন্দ্রের আত্মার কল্যাণ এবং মহাত্মা গান্ধীর ৭৯তম জন্মদিনে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।

গুরুদেব

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকেই হৈ হৈ, রৈ রৈ উৎসব আয়োজন লেগেছে রাজবাড়ীতে।

কতদিন পরে শ্যামসুন্দরের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গুরুদেব আসছেন তাঁর আশ্রম ছেড়ে। গত সাত বছরের মধ্যে তিনি তাঁর জপতপ ভজনপূজন শাস্ত্রাধ্যয়ন সেবাব্রত ফেলে কোন শিষ্যবাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে আসেন নি। রায়রাণীর কোন পুণ্যে বা কি গূঢ় কারণে আবার তিনি রাজবাড়ীতে আসতে রাজী হলেন তা কেউ জানে না। শুধু বুড়ো শিবু গোমস্তা মাথায় জোড়হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বলেছিল—সাক্ষাৎ মহাপুরুষ, একটা অঘটন না ঘটিয়ে যাবেন না, সেই যে সেবার এসেছিলেন রাণীমার কান্নাকাটিতে।

প্রাচীন বনিয়াদী জমিদার বংশ, যেমন মর্য্যাদাগৌরব তেমনি কুলকীর্ত্তি, ধনখ্যাতি। শাহন্ শাহ আকবর যে বাদশাহী পাঞ্জা দিয়ে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ রামনারায়ণ রায়কে মহারাজা করেছিলেন, তা তাঁর ছবির সঙ্গে ঝুলছে বড় হলের সিঁড়িতে ওঠবার দেওয়ালে—আশেপাশে অন্য কীর্ত্তিমান পূর্ব্ব-পুরুষদের পুরাণো তসবীর, সনদ সার্টিফিকেটের ছড়াছড়ি; শাহ আলমের কড়চার সঙ্গে ক্লেমেন্সি ক্যানিংএর ধন্যবাদের চিঠিটাও আছে। দুশো বচ্ছর হেসে খেলে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইয়ে কেটে গেল, চঞ্চলার ধৈর্য্যচ্যুতি হবার উপক্রম। যাবার জন্য তাঁর রক্তঅলক্তকরাগ-রঞ্জিত পা দুখানা বাড়াতেই সূর্য্যনারায়ণের জমিদারী লাটের পর লাট কিস্তীর খেলাপে সূর্য্যাস্ত আইনের ধূসর আভায় নিলেমে ওঠে আর কি; কিন্তু শক্ত হাল ধরে তাঁর ছেলে কীর্ত্তিনারায়ণ নৌকো বানচাল হতে দিলেন না। কুঠিয়ালদের ভাগা-ভাগির ব্যবসা ও কোম্পানীর হৌসের বেনীয়ানী করে মা-লক্ষ্মীকে আর একবার তিনি সিন্দুকে পুরে চাবি দিলেন। এমনি তালাবন্ধ যে আরো একশো বছরের মধ্যে তিনি উস্‌খুস্ করেও বেরুতে পারলেন না। হঠাৎ একদিন শঙ্করনারায়ণ মদের ঝোঁকে সিন্দুকের ঢাকা খুলতেই সুযোগ বুঝে দেবী হলেন উধাও। কিন্তু পালাতে পারলেন না তিনি, চুপি চুপি ঘাটে গিয়ে দেখেন, নৌকো সব আটক, দূরদিগন্তে কোথায় লেগেছে রাম-রাবণের যুদ্ধ। এই সুযোগে শঙ্করনারায়ণের মদের প্যাকিং কেসগুলো কাজে লেগে গেল, সময় বুঝে কায়দা করে নৌকো বানিয়ে আবার তিনি মাঝদরিয়ায় পাড়ি জমিয়ে ফেল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে চাষী-প্রজাদের বাড়তি ধানগুলো গিয়ে জমল জমিদারের বিস্তীর্ণ গোলায়, দালাল ফোড়েদের হাত গিয়ে ধরে উঠল কলকাতার বড় আড়তে। যানাভাবে মা-লক্ষ্মীকে ফিরে আসতে হোল শঙ্করনারায়ণের সেফ্ ডিপসিট্ ভল্টে।

সাতমহলা বাড়ী, সেকেলের পঙ্কের, মার্বেলের পাঁচমহলার পাশে হাতি বাঁধা সিংদরজা, তারই পাশে উঠেছে একালের দুমহলা ষ্টীল্ কংক্রিট্, রং বেরংএর মোসেইক্ মরশুমী ফুলের মত রঙে রঙীণ্।

ও রামী, ও শ্যামা, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নে মা তোরা।

যাই রাণীমা।

ষ্টেশনে মোটর গেছে?

হ্যাঁ, মা, দাদাবাবুকে নিয়ে মহারাজ নিজে গেলেন এইমাত্র, ফুলের মালাগুলো নিয়ে।

আঃ, দাদাবাবু গেছে—বলে তিনি শ্যামসুন্দরের মন্দিরের উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ করযোড়ে প্রণাম করলেন—আজ-কালকার বিলেত-ফেরত ছেলেরা গুরুটুরু মানে না—ঠাকুর দেবতাতেও বিশ্বাস নেই, বলে—বোগাস্ রাবিশ! যদি গুরুদেবের অসম্মান হয়?

সতের বছর আগের কথা মনে পড়ে, তাঁর নারীজীবনের এক দুঃখজাগ্রত রাতে গুরুদেব এনেছিলেন এক অমৃত সান্ত্বনা।

ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল—লোকজন, আদবকায়দা বাজি বাজনা, কত রকমের সমারোহ—স্বয়ং মহারাজা স্যার শঙ্করনারায়ণ অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবেন গুরুদেবকে। কলকাতায় ম্যানেজারের উপর হুকুম গেছে—ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করে সঙ্গে নিয়ে আসতে। কোথায়

কী—জনকোলাহল হতে দূরে ভিড়েঠাসা থার্ডক্লাশের একটি ছোট্ট কামরা থেকে ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে নামলেন এক সাদাসিদে বৃদ্ধ—হাতে বাঁশের লাঠি, পরণে কটিবস্ত্র, মোটা বর্হিবাস গায়ে, শিষ্যদের প্রসাদে ক্ষীর সর দুধ খাওয়া নবনীততুল্য তপ্তকাঞ্চন বর্ণ নয়, অসাধারণত্বের মধ্যে মুখে শুধু একটু নির্বাক্ প্রশান্ত হাসি, আর চোখের স্নিগ্ধ দীপ্তিতে অনির্বাণ করুণার ঝরণা। অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন শঙ্করনারায়ণ ও তাঁর ছেলে, মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণও হলেন। গুরুদেবের এসব কি কাণ্ডকারখানা। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে সে প্রণাম গ্রহণ করলেন না মোটেই—শুধু সেই অপার্থিব হাসি হেসে বল্লেন—কাকে প্রণাম করছো শঙ্কর—সত্যিকারের প্রণাম পাবার যোগ্য কে—গতানুগতিক ভাবে আশীর্ভাষণও করলেন না যে—ধনে পুত্রে আরো লক্ষ্মী লাভ হোক্। শুধু অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে বল্লেন—আশীর্বাদ করি, তোমাদের কল্যাণ তোমরা নিজেই বোঝো।

ইন্দ্রনারায়ণ এযুগের ছেলে—আমেরিকা-রাশ্যা ফেরত—ছুটো বিশ্বতাণ্ডবের মাঝে মানুষ—কত ইজমের বুকনী দিতে জানে, ভাবলে—এও আর এক রকমের ভণ্ডামী।

চক্চকে ঝক্ঝকে পুষ্পমাল্য শোভিত বড় গাড়া দেখে গুরু হেসে বল্লেন—কতটুকুই বা পথ, হেঁটেই যাই। রাস্তায় নেমে চমকে ওঠেন—কোথায় সেই উন্মুক্ত দিগন্তপ্রসারিত হেমন্ত লক্ষ্মীর পাদপীঠ, ধানের সোনায় ঝলমল! মনে হোল, ধুলোয়, ধোঁয়ায়, কুয়াশায় সকালবেলার মহিমা যেন এক অজানা মলিনতায় আচ্ছন্ন।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করেন—ওগুলো কি শঙ্কর?

বাপ্ উত্তর দেবার আগেই ছেলে ইন্দ্রনারায়ণ একটু বিজ্ঞ ভঙ্গীতেই উত্তর দেয়—ঐগুলিই ত আমাদের নতুন মিল।

আর এগুলো।

অবজ্ঞার হাসি হেসে ইন্দ্র উত্তর দেয়—ওগুলো ছোট-লোকের বস্তী, মেথর ডোমপাড়া।

গুরুদেবের মুখে একটু ম্লান করুণ হাসি ফুটে ওঠে, দৃষ্টি হয় উদাস গম্ভীর।

তাড়াতাড়ি শঙ্করনারায়ণ বলেন—ঐ যে বড়ো দিঘীর ধারে নতুন বাড়ীটা, ঐটেই হাসপাতাল মায়ের নামে, দশলাখ টাকা খরচ পড়েছে।

গুরুদেব চুপ করে গেলেন—মাতৃঋণ শোধ? হবেও বা—ছেলে পাণ্টা জবাব দিয়ে যায়—পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমাদের লঙ্গরখানায় দিন খেতো পাঁচ হাজারের ওপর।

সারাদিন রাজবাড়ীতে উৎসবের উন্মত্ত স্রোত বয়ে গেল। যাকে নিয়ে এত কলরব সেই ছোট্ট মানুষটি কিন্তু এসেই চুপচাপ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর মহারাণী পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে এলে গুরু তাঁকে বল্লেন—তোমার আশীর্ব্বাদ করি মা, সতীকুলরাণী তুমি—কিন্তু মনটা বড়ই বিচলিত হয়ে আছে, শ্যামসুন্দরের মন্দিরেই আজ সারাদিনটা কাটাব স্থির করেছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস্ করতে চাই—সত্যিই কি তুমি দরিদ্রের নারায়ণ?

খাওয়া-দাওয়া, বাবা?

সন্ধ্যের পর নিবেদন করে প্রসাদ পাব—স্বপাক্ হবিষ্যান্নের ছুটি আয়োজন করো—এক ব্যঞ্জন ও ভাত।

সে কী গুরুদেব?

যে দেশে ত্রিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে, সে দেশে বিনাশ্রমে অর্জ্জন না করে অন্ন মুখে তুলব কোন্ লজ্জায় মা? শুধু প্রাণধারণ শরীরের ধর্ম্ম, তাই যতটুকু না করলে অপরাধ হয় ততটুকু—

এত আড়ম্বর, এত আয়োজন, এত রন্ধন, ফল মিষ্টান্ন সবই কি বৃথায় যাবে! মহারাণীর কান্না আসে।

সন্ধ্যের পর সুবিস্তৃত আলোকোজ্জ্বল নাটমন্দিরে বসল শ্রোতাদের আসর, খয়ের রংএর জাজিমের ওপর ঘননীল মির্জাপুরী গালচে পাতা—গুরুদেব স্বয়ং আজ কথকতা করবেন। সেকেলের হাজার বাতি ঝাড়ের সঙ্গে একালের বিজলী বাতির রোশনাই গম্গম্ করছে। কাতারে কাতারে পঞ্চগ্রাম থেকে লোক এসেছে, কত ছেলে, কত মেয়ে—সিদ্ধপুরুষ পরম বৈষ্ণবের কথা শুনবে। অভিজাত অতিথি অভ্যাগত নিমন্ত্রিতেরা ত আছেনই। স্বয়ং মহারাজ শঙ্করনারায়ণ যোড়হস্তে আপ্যায়ন্ করছেন—বহুমূল্য ক্ষৌম্য কাষায় বস্ত্র পরিধানে—গলায় ঝুলছে বড় মতির মালা—সেকালের নবাবী আমলের প্রসাদ। ছেলে ইন্দ্রনারায়ণও সপারিষদ বসেছে অনেকটা মজা দেখতে।

শ্যামসুন্দরের সান্ধ্য আরতি করলেন্ গুরুদেব নিজে।

সমাহিত বিভোর হয়ে। সুললিত স্তোত্র পাঠের মাঝে পঞ্চ-প্রদীপ ভাস্বর হয়ে উঠল সুঠাম অঙ্গচালনায়। কী অপূর্ব্ব দীপ্ত ভঙ্গী, কী অপরূপ রসরচনা। বাইরে ছায়া নটে বাজছে "ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে"। চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ মূর্ত্ত হয়ে উঠলেন চিরকালের প্রেমের ঠাকুর, মহাভাবের আবির্ভাবে। চতুর্দ্দিকে ধূপ ধুনো ধোঁয়ার মধ্যে প্রাণময় বাঙ্ময় হোল এক যজ্ঞ-সম্ভব মূর্ত্তি—রামনাম মণিদীপ জ্বালিয়ে এক অননুভূত উন্মাদনার বিবশ।

তারপর আরম্ভ হোল আলাপ—মহাপুরুষ আরম্ভ করলেন—কবে কোন শারদোৎফুল্ল রজনীতে যোগমায়া উপাশ্রিত হয়ে চির রাসরসিকের অনুভবে এসেছিল প্রেম-বৃন্দাবনে—সে আসার বিরাম নেই—অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়। প্রতি মুহূর্ত্তেই তিনি আসছেন, প্রতি ক্ষণে, প্রতিটি অণুতে, স্পন্দনে কম্পনে তাঁরি বাঁশি বাজছে। জড়চেতন জগজীবন সকলই রাসময়—কোথায় সে নব-দুর্ব্বাদল শ্যাম, রঘুপতি রাঘব রাজারাম। অহল্যা কেন পাষাণী হোল—জয়ন্তী শবরী আজও কার প্রতীক্ষায়—কোথায় সে ধ্রুব, কোথায় উত্তানপাদ—কি স্নেহ নিয়েই মহারাজ ভরত পালন করেছিলেন মৃগ শিশুকে। গুরু শোনালেন হরিশ্চন্দ্রের কথা, দধীচি শিবের কথা, মহাবীর কর্ণের প্রাণারাম উক্তি—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্—কোন বংশে, কোন বাপের ঔরসে কোন মায়ের কোলে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করে,সেটা দৈবাধীন; কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব, বীর্য্যপৌরুষ নিজের আয়ত্তে—অর্জ্জন করতে হয় নিজেকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতে লাগল সবাই, কি আবেগ, কি শ্রদ্ধা, কি দরদ নিয়েই এই সত্যসন্ধী মানুষটি নিত্যকালের শাশ্বত কথাগুলি শোনাচ্ছেন—যেন মধু ঢেলে দিচ্ছে কানে।

সব শেষে তিনি আরম্ভ করলেন রন্তিদেবের কাহিনী—কোথায় সে প্রাণচঞ্চল মহারাজ—সমদুঃখসুখক্ষমী—কুবেরের ভাণ্ডার বিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন তিনি। এত ঐশ্বর্য্য, এত ধন—অথচ অন্ন নেই, আহার্য্য নেই, আশ্রয় নেই, সংস্থান নেই—আটচল্লিশ দিন নিরম্বু উপবাস। সামান্য কিছু আহার্য্য জোগাড় করে বসবেন তিনি আহারে—এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ। অতিথিদেবো ভব—স্মরণ করে তিনি হাসিমুখে দিয়ে দিলেন তাঁর খাবারের প্রায় সবটুকু জোর করে। যেটুকু খুঁদকুড়ো অবশিষ্ট রইল তাই দিয়েই পারণ শেষ করবেন ভাবছেন, এমন সময় সামনে এলো এক দীনহীন শূদ্র অন্ন ভিখারী—ক্ষুধার্ত্ত আমি মহারাজ। প্রসন্ন মনে শ্রদ্ধার সহিত তিনি দিলেন তাকে বাকী আহার্য্যের অংশ। তারপর এলো এক দুর্দ্দান্ত চণ্ডাল, সঙ্গে কুকুরের দল—তারাও বাদ গেল না—পরিতুষ্ট হয়ে চলে গেল। প্রাণ যায়—তালু শুষ্ক, একটু জল মুখে দিয়ে কোন রকমে প্রাণধারণ করবেন মনে করছেন—এমন সময় এলো এক আত অন্ত্যজ চণ্ডালেতর ব্যক্তি—তৃষ্ণার্ত্ত আমি মহারাজ। নাও বন্ধু বলে কোষ-সম্বল তৃষ্ণার জলটুকুও সাদরে তিনি দিলেন সমাদর করে। স্বর্গ তিনি চাননি, মুক্তি তিনি চাননি, ঐশ্বর্য্য নয়, সিদ্ধি নয়, শুধু এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে, অভাব অনশনের দিনে চেয়েছিলেন দুঃস্থের মুখে একটু ক্ষুধার অন্ন, এক গণ্ডূষ তৃষ্ণার জল দেবার অধিকার, চেয়েছিলেন জন্মজন্মান্তরে বারে বারে এই শ্যামলা মাটিতে আসতে—দুস্থ ভগবানের, দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য। কোথায় সে রাজাধিরাজ, আবার তুমি এসো এই দুর্গত দেশে, সেবার স্নিগ্ধ আত্মীয় পরশ নিয়ে।

চঞ্চল হয়ে উঠল জনমণ্ডলী, শঙ্করনারায়ণ উসখুস করতে লাগলেন—চালের কারবারে চোরাগলির ছায়াগুলো চোখের সামনে অস্বস্তির কালো পর্দ্দার মত ভেসে বেড়াতে লাগল। ইন্দ্রনারায়ণেরও রক্ত তপ্ত—কি সব রাবিশ প্রোলেট্যারিয়েট তোলাবার বেশ মজাদার আফিংএর মৌতাই বের করেছিল ফ্যাসিষ্ট ব্রাহ্মণরা।

আপনভোলা নিরভিমান তপস্বীর কণ্ঠবীণায় করুণ সুর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে লাগল সেই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে। সার্থক হয়নি দিনের বেলার আলো, ব্যর্থ হয়েছে সন্ধ্যাসাঁঝের প্রদীপ দেওয়া, রাত্রের স্তব্ধতাও বুঝি ব্যর্থ হয়। হে ঠাকুর, দিনে রাতে মায়ার পেছনে ঘুরছে, ছায়াকে পেয়েছে, কোথায় তুমি শ্যামল সুন্দর। 'পথ জানিনে, আলো নেই, ভিতর বাহির কালোয় কালো, শুধু তোমার চরণ শব্দ বরণ করে চলেছে। তুমি এসো প্রেমময়, যেমন করে ধরা দিয়েছিলে মীরার কাছে—মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, চরণকমল বলিহার রে—হে পীতম্ প্রিয়। প্রিয়তম তোমার

চরণকমল বুকের মাঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাক্—শঙ্কর তুমি ভয়ঙ্করের বেশেই এসো, তাও সহ্য হবে।

ঝরঝর করে জল গড়িয়ে গেল দুচোখ বেয়ে। গম্‌গম্‌ করতে লাগল আসর—নিস্তব্ধ নাটমন্দির।

অনেক দূরে ছোঁওয়া বাঁচিয়ে—শীতের হিমেল হাওয়ায় গুটিসুটি মেরে বসেছিল একদল মেয়ে আর ছেলে, ঠাকুর দেখতে আর ঠাকুর মশায়ের কথা শুনতে, অনাথা হরিজনের দল—ডোম মেথর চাঁড়াল গঙ্গাপুত্ররা। তাদেরই ভিতর একজন বিগতযৌবনা মেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। সময় কালপাত্র ভুলে চেঁচিয়ে বল্লে—সত্যি বলছ ঠাকুর—সত্যি।

প্রকাণ্ড এক ধমক্ দিলেন শঙ্করনারায়ণ—নিকালো হিঁয়াসে, এই সব ছোটলোকেদের এখানে আসতে দিলে কে? অশুচিদের নিয়ে কোন শুভ কাজ হয়? যত সব অলুক্ষণে কাণ্ড।

দরোয়ান নায়েব মোসাহেব ছুটে গেল হুঙ্কার করে লাঠি নিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে সেই মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল তার দলবল। হীরু বাগ্দীর মেয়ে রঙ্গী ও—লোকে বলে স্বভাব চরিত্তির ভালো নয়।

গুরুদেব নির্বাক্, উঠে দাঁড়ালেন, সরে গেল ত্রস্ত জনতা, কথার মোহ গেছে ভেঙে, কেটে গেছে তাল—তিনি গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে। এত বড় জনতার মধ্যে একটি হীন হরিজন মেয়ের বুকে গিয়ে লেগেছে তাঁর কথা—এত বড় সম্মান—এই করেছো ভালো ঠাকুর। সমাজ, আচার, বিচার তাঁকে রেখেছে নীচে।

সারারাত অশান্ত মন নিয়ে সকাল বেলা গুরু চলেচেন স্নানে। আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে কালোর রেখা—সপ্তাশ্ব বাহিত সবিতার নবোজ্জ্বল দীপ্তি আকাশের দিগ্‌বলয়ে দোদুল। জবাকুসুমসংকাশ সূর্য্যোদেবের দিকে চেয়ে গুরু মনে মনে বলেন—স্নানে যে গ্লানি গেলনা প্রভু, অন্তরে বাহিরে অশুচি—নিয়ে এসো তোমার বিশ্বপাবনধারা, হে সবিতা তোমার কল্যাণতমরূপ।

শ্মশানের ধারে গঙ্গার কোলে তিনি বসে পড়লেন হতাশ হয়ে, সামনে জ্বলছে চিতা—জলৎপাবক জ্বাল জালাতিভাস্বৎ। হঠাৎ চোখে পড়ল পাশে দাঁড়িয়ে একটি নীচ জাতের মেয়ে—দরবিগলিত ধারা চোখে, তার কোলের ছেলেকে তুলে দিয়েছে আগুনের রাঙা কোলে। অকাল অনশন মৃত্যুর দুয়ারে—ক্ষুৎক্ষীণা কোটরাক্ষা, মসামলিনমুখা মুক্তকেশী রুদ্ধ। চমকে উঠলেন গুরুদেব—সন্দেহ মিটে গেল তাঁর।

শান্ত পদক্ষেপে তিনি এগুলেন, সকাল বেলার আলোয় হিরণ্ময়। পেছনে পড়ে রইল উৎসবমুখরিত রাজবাড়ী, দূরে নহবতের ইমন্ ভূপালীর তান্। সোজা ডোমপাড়ার ভিতর দিয়ে ঢুকলেন অপাংক্তেয়দের বস্তীতে—শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালি বকুল বিছানো পথ সে নয়, আঁস্তাকুড় দুর্গন্ধ জঞ্জালের নরকের মধ্য দিয়ে।

রঙ্গী তখন তাদের কুঁড়ের আঙিনাটা ঝাঁট দিচ্ছিল—সামনে ধুলোয় বসে একটা হৃষ্টপুষ্ট কালোকোলো ছেলে, তৃপ্ত মনে খেলা করছে একটা ছাগলের সঙ্গে—সামনে ঘোঁত ঘোঁত করছে এক পাল শুয়োর। গাঁয়ে সেবার যখন কলেরার অনুগ্রহ লেগেছিল তখন বাপ মা দুজনেই ছুটি পেলে বৈতরণীর ধারে, রুগ্ন ছেলেটাকে এনে সুস্থ করে তুলেছিল রঙ্গী, কারুর কথা না শুনে।

সদ্যস্নাত শুচিশুভ্র গুরুদেবকে দেখে সে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। আরো অবাক্ তাঁর অদ্ভুত কথা শুনে—হোল কি?—তোমার কুঁড়েতে থাকতে দেবে মা কয়েকদিন? এই দাওয়ায় একটা চাটাই আর চারপাই হলেই চলে যাবে—ছেলেটাকে তিনি কোলে তুলে নেন্—আদর করেন।

কি হয়েছে রে রঙ্গী—বলে হীরু বেরিয়ে আসে, রাতের জমাটী নেশাটা সবে কেটেছে।

তারপর হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি লেগে যায়—ডোমপাড়া মেথরপাড়া সরগরম হয়ে ওঠে।

খবর পৌছয় মহারাজের কাছে। উত্তেজিত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি হুকুম দেন্ বরকন্দাজদের—সমস্ত ডোমপাড়া ভেঙে চুরমার করে গুরুদেবকে ধরে নিয়ে এসে রেলে তুলে দিতে—মাথা হেঁট হয়ে গেল তাঁর, তাঁর গুরুদেব কিনা ছোটলোক চাঁড়ালের ঘরে, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে!

ছেলে ইন্দ্রনারায়ণ বল্লে—রাবিশ, বোগাস্।

মহারাণী শুনে অশুভ আশঙ্কায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন।

শান্ত সংযত মহাপুরুষ, মুখে সেই মন-মাতানো হাসি, অশুচি খাটিয়ার বসে ভাঙ্গীদের শোনাচ্ছেন তুলসীদাসের সোজা কথা—

"বন্দ উ সন্ত সমানচিত হিত অনহিত নহি কোই
অঞ্জলিগত শুভ সুমন জিমি সম সুগন্ধ কর দোই।"

মোঘল রাজকুমারী *

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

"বহুমূল্য চন্দ্রাতপ আমার সমাধির আস্তরণ ক'রো না,
এই সবুজ তৃণগুচ্ছই অবনমিতার সমাধির আবরণ হোক।"
ইতি, সুফী কিসৃতি শিষ্যা, সাহজাহান দুহিতা জাহানারা,
ক্ষণভঙ্গুর জাহানারা, বিনীতা জাহানারা,
জিলকাদা ১০৯২ হিজ্‌রী (১৬৮০ খৃঃ অব্দ, জুলাই)

ওগো মরণ! তুমি মানুষের রূপ পরিগ্রহ ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার প্রাণহীন আঁখি নিয়ে আমার সম্মুখে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রছ! তোমার শীতল নিঃশ্বাস আমার মুখমণ্ডলকে শীতলতর ক'রে দিচ্ছে,—সঙ্গে সঙ্গে আমার শেষ আশা বিলীন হ'য়ে আসছে, দারার ছিন্ন শির ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছে। পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড পিতা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়েছে। তারপর কারাগারে সেই মুণ্ড আমার নিকট এসেছে। দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থান, তোমার নাম বাঁশীর সুরে করতালের কলরোলে একদিন পৃথিবীতে ধ্বনিত হয়েছিল। যে রক্তধারায় তোমার পুণ্যভূমি পরিধৌত হয়েছিল—তা' তোমাকে খণ্ডিত দেহ করেছে, তোমাকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করতে পারে নি। কেন পারে নি বলত? আমার সুকোমল কেশদাম আমি ছিন্ন ক'রে ফেলেছি; আমার কণ্ঠ থেকে মণিমালা ছিন্ন করে দিলাম—কিন্তু কই? উত্তর ত পেলাম না।

আমার নয়নের সম্মুখে অন্ধকার নেমে আসছে, আমি আমার অন্তরকে প্রশ্ন করেছি—আমি অতীতের দিকে চেয়ে দেখেছি। আমি কোন উত্তর পাই নি।

আমি দেখছি সৈন্যের স্রোত একটার পর একটা ঝঞ্ঝার বুকে উর্ম্মিমালার মত ভারতের প্রস্তর পর্ব্বত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই ঝঞ্ঝা সমস্ত দেশকে ক্ষত বিক্ষত করে দিচ্ছে, দেশের যুগ যুগ সঞ্চিত ধনরত্ন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তারপর একদিন শান্তি এসেছিল। দেবতার আবাসের মত প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল ভারতের পুণ্যভূমিতে। তারপর আবার ঝঞ্ঝা এসেছে—সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যের অবিশ্রান্ত পদধ্বনি আর অবিরাম রক্তস্রোত।

যমুনা বয়ে চলেছে আগ্রাদুর্গের শিলাতল পরিধৌত করে সেই জলস্রোত পরিণত হ'ল রক্তস্রোতে। যুগ যুগ সঞ্চিত রক্তস্রোত বয়ে চলেছে সমুদ্রের পানে—সমুদ্র-জলরাশি রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। রক্তরাগরঞ্জিত উর্ম্মিমালা ঊর্দ্ধে আকাশে তারার বিরুদ্ধে আস্ফালন ক'রছে। নীলমেঘপুঞ্জ আমার মাথার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সেই মেঘ বসুন্ধরা আর জলধারায় সমস্ত লালিমা নিঃশেষ করে নিয়েছে। বর্ষণমুখর মেঘ রক্ত মোক্ষণ ক'রছে।

এখনো এক বৎসর অতীত হয়নি আমরা আগ্রার দুর্গে বন্দি হয়েছি। সে দিন যুবরাজ দারা আওরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হল। আমি আজও দেখতে পাচ্ছি—এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সুবর্ণমণ্ডিত প্রকাণ্ড এক সরীসৃপের মত ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত অতিক্রম ক'রে চলেছে দিক্‌চক্রবালের দিকে। আমি সহস্র সহস্র গজ উষ্ট্র অশ্বের পদধ্বনি আজও শুনতে পাচ্ছি। রাজপুতের উজ্জ্বল বর্ধাবাহিনী পরিবৃত হয়ে যুবরাজ দারা তার প্রিয় হস্তী ফতেজঙ্গের (১) উপরে সমাসীন—আলোকস্তম্ভের মত সৈন্যরাজির মধ্যস্থলে যুবরাজ দারা সুকো সমস্ত মানবের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

উঃ! যুবরাজ দারার পরাজয়ের দুঃসংবাদ আগ্রার দুর্গে প্রচারিত হ'ল, আমি আকুল ক্রন্দন ক'রলাম, কেবল ক্রন্দন। কি ভীষণ দুর্ভাগ্য আমার ভ্রাতার। আমি তার নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে পারিনি। যুবরাজ দারা! তোমার প্রাণে ছিল অপূর্ব্ব মহিমা, তোমার অন্তরে ধ্বনিত হ'ত সম্রাট আকবরের মিলন যাত্রার পদধ্বনি, একই ভগবান যেমন জগতের ভাগ্যবিধাতা, তেমনি একই বিধান সমগ্র সাম্রাজ্যের নিয়ন্তা। যুবরাজ দারা! তোমার ছিল দুর্ব্বলতা, তোমার ছিল অহংকার। তারাই রচনা ক'রল তোমার পতন! তোমার বিরুদ্ধ দলের ছিল শক্তি, আওরংজেবের ছিল কৌশল।

তোমাকে আমি ঘৃণা করি, হে খলরাজ আওরংজেব! তোমাকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। তোমার প্রতিভা যেমন তীব্র, তোমার হৃদয় তেমনি কঠিন। তোমার একমাত্র চিন্তা তুমি হ'বে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট, তুমি হ'বে মানুষের দেহমন দুইয়েরই অধীশ্বর! তোমার নয়নে ভাসছে অপূর্ব্ব সস্মিত হাসি, আর তোমার পদতলে দলিত হ'চ্ছে—

---

* এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আগ্রাপ্রাসাদের—জেসমিন প্রাসাদের (সামান বুরুজ) ভগ্নমর্ম্মর শিলাতলে আবিষ্কৃত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিখানি অসম্পূর্ণ। খণ্ডিত অংশগুলিকে একত্রিত করে ন্যূনাধিক পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীতে পরিবর্ত্তিত করা হয়েছে। সেই কৃতিত্ব জার্ম্মাণ মহিলা আন্‌ড্রিয়া বুডেনশনের। জাহানারা অসহায়া রাজকুমারী—ভ্রাতার মৃত্যু, পিতার কারাজীবন ও মোঘলসন্তানদের নৃশংস মৃত্যুর সাক্ষী জাহানারার করুণকাহিনী মোঘল-যুগের অপূর্ব্ব-সম্পদ। এই কাহিনীতে আছে সৌন্দর্য্য বিভীষিকার অপরূপ সমন্বয়।

(১) মোঘল সম্রাটগণের হস্তী ও অশ্ব প্রীতি অসীম, প্রত্যেকটী রাজকীয় হস্তীর নামকরণ করা হত। "হস্তী যুদ্ধ" সম্রাট পরিবারের একাধিকার ছিল, হস্তী রাজোপহারের অন্যতম প্রধান অংশ ছিল। পরাজিত শত্রুর সম্পদের মধ্যে হস্তী অবশ্য সম্রাটের প্রাপ্য ছিল। আকবরের হস্তীর নাম ছিল ফিল্‌-ই-ইলাহি। জাহাঙ্গীরের হস্তীর নাম নুর-ই-ফিল্, দারাসুকোর হস্তী ছিল ফতেজঙ্গ—"যুদ্ধ বিজয়ী।"

তোমার বিরুদ্ধাচারী শত্রু। মনে পড়ে তোমার? শৈশবে সেই পরিব্রাজকের ভবিষ্যৎ বাণী? (২)

আবার শুনছি—অশ্ব রাজের পদধ্বনি, কিন্তু এবার সৈন্যদল অতি ক্ষুদ্র। তারা প্রত্যাবর্ত্তন করছে দিল্লীর পথে—প্রতারিত, পরাজিত বিপর্য্যস্ত দারা। উন্মুক্ত তরবারি হস্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুগণ দারাকে পরাস্ত করে নি, শত্রুর অস্ত্র ছিল সুচতুর কৌশল। যে যুবরাজ দারা এক বৎসর পূর্ব্বেও পিতার পার্শ্বে স্বর্ণ সিংহাসন অলংকৃত ক'রত, সে চলেছে দিল্লীর রাজ পথে আভরণহীন অনাবৃত রুগ্ন হস্তী পৃষ্ঠে নিরাভরণ দারা, ছিন্নবস্ত্রপরিহিত দারা, "দাসাদপি হীনতম" শৃঙ্খলাবদ্ধ দারা। প্রজাকুল এই দৃশ্যে বিচলিত, পুরবাসী আওরংজেবকে অন্তরে অভিশাপ দিচ্ছে, পুরমহিলারা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে অশ্রুসিক্ত; কিন্তু সাহস নেই যে স্পষ্ট প্রতিবাদ করে। আমি আগ্রার দুর্গে এক বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে মৃদু আলোক শিখার পার্শ্বে বসে কম্পিত হস্তে লিখছি আমার এই আত্মকাহিনী, কিন্তু আমার অন্তরের গোপন কথা আমি গোপনই রাখছি। যদি তাই না করি, তবে আমি জীবনধারণ করব কি করে? আমি যে নারীমাত্র। কিন্তু এইখানে এই নির্জ্জন রাত্রিতে আমি আমার দুঃখের সঙ্গীত বিস্মৃতিকে দিয়ে যাব, আমি বিস্মৃতির কাছে গচ্ছিত রেখে যাব আমার জীবনের দুঃখ আর গাথা।

আমার প্রিয় ছিল আমার সহোদর দারা, আমি তার অনুরক্ত ভগ্নি ছিলাম। দারার অভিপ্রায় ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট আকবরের স্বপ্ন সম্ভব ক'রে তুলবে, শাশ্বত হয়ে থাকুক সেই শাশ্বত পুরুষের শাশ্বত প্রয়াস! অন্ধকার গহ্বরে সুগুপ্ত ভারতের ধন রত্ন সম্রাট আকবরকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি অযুত যুগ ধরে মানুষ যে চিন্তা করেছিল, যে সত্য উপলব্ধি করেছিল, সম্রাট আকবর সেই প্রনষ্ট ধন উদ্ধারের প্রয়াস করেছিলেন। সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন—ভারত তার অতীত আত্মার সন্ধানে ফিরে যাচ্ছে, ভারত যেন কোন বিদেশীর ক্রীতদাসী না হয়ে—ভারত তার আত্মার সৌন্দর্য্যগৌরবে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে উঠবে—সৌন্দর্য্য একদিন ভারতকে ভগবানের সন্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিল।

যমুনার অপর তীরে ফুটে উঠেছে তাজমহল—পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে তাজ ফুটে উঠেছে যেন শুভ্র হীরক খণ্ড—মৃত্যু-পরীর পাখার মতন শুভ্র সমুজ্জল। সমাধি পরিবৃতা মাতা তাজবিবির কানে কানে মৃত্যুগুঞ্জনে ধ্বনিত হ'ত কোরাণের পুণ্যবাণী (৩)। আজ আর তাজবিবির কর্ণে প্রবেশ করে না সেই সঙ্গীত। মাতার সমাধি পার্শ্বে প্রোথিত রয়েছে দারার রক্তপ্লুত ছিন্ন মুণ্ড। আজ মায়ের অস্থি খণ্ডে লাগছে এক শীতের কম্পন—তাজ কি আজ তার চির নিদ্রার মাঝে ভাবছে—আমার পুত্রের মুণ্ড যে দিন স্কন্ধচ্যুত হয়েছিল, সেই দিনই পৃথিবীতে একটা বিরাট আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল?

ঐ দেখ সূর্য্য উঠছে তাজমহলের শুভ্র মিনারের অপর পার্শ্বে—তাজ আর শুভ্র হীরক খণ্ড নয়, এক বিরাট রক্তবিন্দু মাত্র।

আওরংজেব! তোমাকে অভিসম্পাত করি, ভাগ্যহীন দারাকে তুমি পদ দলিত ক'রছে, তুমি তাকে নিরীশ্বর অপবাদ দিয়ে হত্যা করেছ (৪)।

আওরংজেব! তুমি তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের গোয়ালিয়র দুর্গে পপীর (আফিঙের) বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছ (৫)—আমাকে সে বিষ দিলে না কেন? তা হ'লে আমার, অনুভূতি লুপ্ত হ'য়ে যেত, আমার চিন্তা নৈরাশ্যের গভীরতা অনুভব করতে পা'রত না, আমি যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতাম।

আজ রজনীতেও আমি বেঁচে আছি—আমি চিন্তা ক'রতে পারছি, আমি নীরবে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তোমাকে আমার বার্ত্তা প্রেরণ করছি, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম ক'রে আমার বার্ত্তা তোমার নিকট পৌঁছবে। আজ নিশীথে এক গুপ্ত শক্তি আমার ইন্দ্রিয় গ্রামকে আচ্ছন্ন করেছে......

ঘনকৃষ্ণ ছায়ারাশি মাটির উপরে ভেসে আসছে, তুমি বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ না, আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ঐ যে কালো ছায়া মূর্ত্তি কুব্জ পৃষ্ঠ নুব্জ দেহ—হঠাৎ সেই ছায়া মূর্ত্তিগুলি এক সঙ্গে আকাশে উঠছে, ঐ যে তারা মেঘে রূপান্তরিত হচ্ছে। তারপর ঝঞ্ঝা, ঐ দেখ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, অগ্নির লেলিহমান শিখা উঠ্‌ছে, সমস্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাবে। কুব্জ পৃষ্ঠ থেকে তোমার শৃঙ্খল খসে পড়বে। ভীষণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সম্রাট আকবরের স্বপ্ন—তৈমুর বংশের ছত্রাধীনে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন-বিলীন হ'য়ে যাবে।

---

(২) কথিত আছে যে একজন পরিব্রাজক মোঘলরাজবংশধরদের হস্ত পরীক্ষা করে সমস্ত রাজকুমারদের ভবিষ্যৎ বলেছিলেন, আওরংজেবকে বলেছিলেন—তুমি হবে তিমুরবংশের বিনাশকর্ত্তা। মোঘল রাজগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র ও সামুদ্রিক বিচার বিশ্বাস করতেন। এমন কি যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে নক্ষত্রের গতির উপর সৈন্যচালনা নির্ভর করতেন। রাজবংশের সমস্ত সন্তানের জন্মকুণ্ডলী ও কোষ্ঠী তৈরী করা হ'ত।

(৩) অভিজাত মুসলিম পরিবারে সমাধির পার্শ্বে কোরাণ আবৃত্তি করার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। সুর-লয় সমন্বিত কোরাণের আবৃত্তি শুনলে দূর থেকে সঙ্গীত মনে হয়।

(৪) পরাজিত দারা-স্থকোর "নিরীশ্বরবাদী" অপবাদে বিচার করা হয়, মুসলিম রীতি অনুসারে নিরীশ্বরবাদীর মৃত্যু দণ্ডের বহু নিদর্শন আছে, কিন্তু সে দণ্ডের বৈধতা সম্বন্ধে মত ভেদ আছে, দারা যথার্থ ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(৫) মোঘল যুগে রাজবংশের সন্তানদের রাজদ্রোহিতার অপরাধে প্রায়ই গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করা হ'ত। গোয়ালিয়র দুর্গ অনেকটা ইংলণ্ডের টাওয়ার অব লণ্ডন অথবা ফরাসীদেশের বেস্‌টিল দুর্গের মত। মোঘল রাজবংশের সন্তানদের অনেক সময়ে হত্যা না ক'রে স্বল্প মাত্রায় আফিঙের জল পান কর্ত্তে দেওয়া হ'ত। ক্রমশঃ পপীর বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তার বুদ্ধি ভ্রংশ ক'রে দিত, অনুভূতি অস্পষ্ট হ'য়ে যেত। পপীর বিষে জর্জ্জরিত মানুষের জীবন মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টদায়ক। তুর্ক জাতির মধ্যেও এই পপীর বিষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তুরস্কে ওসমানালী বংশে প্রবাদ প্রচলিত ছিল—রাজকুলের কোন আত্মীয় নেই, একাধিক ভ্রাতার জন্ম রাজকুলে অমঙ্গল বলে বিবেচিত হ'ত।

আওরংজেব! আমি ভবিষ্যৎ বাণী করছি—হে শক্তিমান, তুমি ভগবানকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস না। তোমাকেও মানুষ ভয় ক'রবে, ভালবাসবে না; যখন সম্রাট আকবর একখণ্ড তাম্রমুদ্রা দান ক'রতেন, সে মুদ্রা স্বর্ণ-খণ্ডে পরিণত হ'য়ে যেত, কিন্তু তুমি যা' দান কর, তা' কণ্টকে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠে। সম্রাট আকবর মিলনের প্রয়াস করেছিলেন—আর তুমি ধ্বংসের অভিযান ক'রে চলেছ, আমি তোমাকে অভিসম্পাত ক'রছি—আওরংজেব! তুমি তোমার পিতার প্রতি যে ব্যবহার করেছ তা' তুমি সমস্ত জীবনে ভুলতে পারবে না, তুমি যে পথে চ'লবে, সমস্ত জীবন ধ'রে সে পথে তোমার ছায়া তোমাকে অতিক্রম ক'রে যাবে, তোমাকে বিপথে চালিত ক'রবে। পবিত্র কোরাণের কোন বাণী তোমাকে তোমার ছায়ার মোহ থেকে মুক্তি দিতে পা'রবে না।

হিন্দুস্থান আজ বিজেতার ক্রীতদাসী, কখনো লোভে, কখনো ঘৃণায় হিন্দুস্থান লুণ্ঠিত হ'য়েছে, যদি কোন বিরাটের প্রেরণা নিয়ে ভারতের রাষ্ট্র পরিচালনা করা হ'ত তবে ভারতবর্ষ নিশ্চয় তার সমস্ত সন্তানের জননী হতে পারত। আজও হয়ত দিল্লীর প্রাসাদে ময়ূরসিংহাসন তার উজ্জ্বলতায় শোভা পাচ্ছে, কিন্তু সিংহাসনের মণিমাণিক্য দূর থেকে আহ্বান ক'রছে বিপদ—যেমন চুম্বক আহ্বান করে লৌহকে।

পশ্চিম থেকে আসছে এক শীতল প্রভঞ্জন, আমি শিউরে উঠ্‌ছি, সে হ'চ্ছে ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত, রক্ত সমুদ্রের দূত। শক্তিশালী সম্রাটের পদতলে লুণ্ঠিত হয় রাজ্যের বিধান, রক্তপ্রবাহ মুছে নিয়ে যায় সে পদচিহ্ন। রাত্রিতে শুনতে পাচ্ছি সমস্ত দিল্লীব্যাপী এক বিরাট ক্রন্দন রোল—যেমন উঠেছিল আর একবার তৈমুরের দিল্লী অভিযানের দিনে। আর একবার উঠ্‌ছে পাণিপথের প্রবল ঝড়।

মৃত মানবই একমাত্র শান্তির অধিকারী—না না, তারাও নয়। ধনরত্ন লোভে কি মৃতের সমাধি অবমানিত হয়নি? আমি কিন্তু মূল্যবান্ প্রস্তর অথবা মর্ম্মরবেদীর নিম্নে সমাধিস্থ হ'ব না, একমাত্র তৃণই হবে আমার সমাধির আবরণ। যদি কোনদিন চরণাঘাতে দলিত হয়, তবু তৃণখণ্ড আবার নতুন হয়ে জন্মাবে।

ভগবান পদদলিতকে কোলে তুলে নেন।

বাংলার মাছ ও মাছধরা

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস-সি, ডি-ফিল

পূর্ব প্রবন্ধে খাদ্য হিসাবে মাছের স্থান ও মাছধরার দুই একটি প্রণালীর আলোচনা করা হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই বাংলাদেশে মাছের যে প্রভূত প্রচলন ছিল—ভারতচন্দ্র, বিজয় গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী কবির কাব্য হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের 'রন্ধন' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা হইল। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত মৎস্য রন্ধনের বিবিধ প্রণালীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"কাতলা ভেকুট রুই ঝাল ভাজা ঝোল
শিকপোড়া ঝুরা কাঁঠালের বীজে ঝোল।
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই।
মায়া সোনা খড়কির ঝোল ভাজা সার
চিংড়ির ঝাল বাগা অমৃতের তার।
কঠারান্ধি রান্ধে রুই কাতলার মুড়া—
তিতা দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া।
আম দিয়া শোলমাছে ঝোল চড়চড়ি
আর রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ি।
বাটার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা।
সুমাছ বাছের বাছ আর মাছ যত
ঝাল ঝোল চড়চড়ি ভাজা কৈলা কত।
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক।

মাছ যে অতিশয় সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর খাদ্য অতিশয় উচ্চস্তরের ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, কারণ অপর্য্যাপ্ত সুলভ মাছের সঙ্গে সঙ্গে পর্য্যাপ্ত খাঁটি দুধ ও টাটকা শাকসবজির সমন্বয় ও ছিল যথেষ্ট। তাই সেকালের বাঙালী সন্তানও ছিলেন ব্যাঘ্রপদবাচ্য—শৌর্য্য বীর্য্যের জীবন্ত প্রতীক। যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য এবং উত্তরবঙ্গের তথা ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ দীব্য ও ভীমের বীরত্বকাহিনী ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

এখন মাছধরা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে:—

মাটির পাত্র সাহায্যে মাছধরার একটি উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে। তলায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়ি বা ঝাঁঝরের সাহায্যে মাছধরার কথা বেশী লোকের জানা নাই। আশ্বিন কার্তিক মাসে বড় বৃষ্টির পরে রৌদ্র উঠিলে মধ্য বাংলার যে সব আমন ধানের ক্ষেত বিলের উঁচু অংশে—ডাঙ্গা জমির নিকটে—সেই সব ধান ক্ষেতের ভিতর হইতে সরু অগভীর নালি কাটিয়া শুকনো আলের নিকট আনিয়া

একটি গর্ত করিয়া নালির মুখে ঝাঁঝর পাতা হয়। ঝাঁঝরের পশ্চাৎ দিকে ২ হাত গভীর ও ২।৩ হাত লম্বা গর্ত খোঁড়া হয় এবং ধানের ক্ষেতের জল নালি বাহিয়া ঝাঁঝরের ভিতর দিয়া আসিয়া গর্তে পড়িলে উহার পাশে বসিয়া ধীরে ধীরে যথাসম্ভব নিঃশব্দে গর্তের জল অপর দিকে ফেলিয়া নালিতে একটি স্রোতের সৃষ্টি করা হয়। ঐ স্রোতের সঙ্গে পুঁটি, টাকি, শিঙ্গি, বেলে, বাইন প্রভৃতি মাছ আসিয়া ঝাঁঝরের মধ্যে পড়িয়া জমিতে থাকে। অনেকগুলি মাছ পড়িলে মাছসমেত ঝাঁঝরটি সরাইয়া তাহার স্থলে তাড়াতাড়ি আর একটি ঝাঁঝর পাতিয়া দেওয়া হয়।

শুধু হাতে মাছধরা। পদ্মার ঢালু উর্বর চরে যে সব স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসে নূতন জল আসার সঙ্গে সঙ্গে জলিধান কাটা হয় সেই সব ক্ষেতে সাধারণতঃ সন্ধ্যার পূর্বে গ্রামের লোকেরা হাতড়াইয়া চিংড়ি, বেলে, আড়কাঁটা প্রভৃতি মাছ ধরিয়া থাকে। নদীতে জল বেশী হইলে উহার পাড়ের সহিত গাংশালিকেরা শীত ও গ্রীষ্মকালে যে গর্ত করে সাহসী লোকেরা জলের মধ্যে নামিয়া ঐ গর্তের ভিতর হাত ঢুকাইয়া বড় বড় বেলে মাছ ধরে। বর্ষায় গ্রামের বড় বট বা আমগাছ ভাঙিয়া কূলের কাছে জলের ভিতর থাকিলে বর্ষান্তে ঐ সব গাছের শিকড়ের নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত আড় প্রভৃতি মাছও অনেকে ডুব দিয়া ধরিয়া থাকে। শীতকালে মৎস্যবহুল কোলে 'বাউতেরা' মাছ ধরিবার সময় জল ঘোলা হইলে অনেকে ৫।৬ জন একসারিতে দাঁড়াইয়া জল টানিয়া কৃত্রিম স্রোত সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত বাহিত পুঁটি, মৃগেলপোনা, টাকি প্রভৃতি মাছ ধরিয়া থাকে। রেল লাইনের খাদের বা গ্রামের নালির জল বর্ষান্তে যখন কমিতে থাকে তখন স্রোতহীন স্থলে নালার এপার ওপার পর্য্যন্ত ৪।৫ হাত দূরে দূরে ২টি কাদার শক্ত দেওয়াল দিয়া মাঝখানের জল সেঁচিয়া ঐ স্থানটি শুকাইয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ রাত্রিকালে টাকি, পোনা, শোল মাছ প্রভৃতি দুধারেই কাদার বাঁধ পর্য্যন্ত আসিয়া লাফাইয়া ঐ শুকনো জায়গায় পড়িতে থাকে। প্রাতে উহা ধরিয়া লওয়া হয়। বলা বাহুল্য, মাছ বেশী পড়িতে থাকিলে উহা উদ্‌বিড়ালে না খায় বা কেহ চুরি না করে এজন্য রাত্রে পাহারা দেওয়া হইয়া থাকে। হৈমন্তিক ধান কাটার প্রাক্কালে অগভীর বিলের নিম্নতম স্থানে ৪।৫ হাত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া গোলাকার জায়গা কাদা ও ঘাসের শক্ত বাঁধ দিয়া ২টি বা ৪টি ১ হাত প্রশস্ত মুখ রাখা হয়। ঐ স্থানকে 'আপা' বলে। আপার মধ্যে রামতুলসী, লেবু ও স্থাওড়ার পাতাসহ ডাল ফেলিয়া ৪।৫ বা ৭।৮ দিন পর পর আপার মুখ কাদা দিয়া বন্ধ করিয়া উহার জল সেঁচিয়া টাকি, পুঁটি, বেলে, বাইন, পোনা, ফলি, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছধরা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য আপার জল বাঁশের চটার তৈরী হোঁচার ভিতর দিয়া ফেলা হয় সুতরাং সে জলের সহিত বাহিত পুঁটি, খলসে প্রভৃতিও পলাইতে পারে না। বিলের জল প্রায় শুকাইয়া গেলে বিলের নিম্নতম স্থানে কখনও কখনও শিঙ্গি মাছের ঝাঁক মাটির নীচে 'গোর' করিয়া থাকে। লোকে মাঠের মধ্যে হঠাৎ 'থলবল' শব্দ শুনিয়া অনুসন্ধান করিয়া ঐ 'গোরের' মাছ ধরিয়া থাকে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে প্রথম বড় 'ঢলের' পরে পুরাতন পানাপুকুর বা বড় বিলের ধারে মাঠে কই প্রভৃতি মাছ ওঠা ও ধরার কথা অনেকে জানেন।

বাঁশের ফাঁদে মাছধরা। যে সব বিল-বাওড়ে শিঙ্গী বাইন মাছ বেশী সেখানকার লোকেরা জলের মধ্যে বাঁশের বড় বড় চোঙা ডুবাইয়া রাখে ও ২।৩ দিন পর পর উহা সন্তর্পণে তুলিয়া উহার ভিতরের বাইন বা শিঙ্গি মাছ পায়।

বাঁশের চটা দিয়া পাতলা বুনানি ছোট দরমার যদি দুটি কোণ একত্র করিয়া গাঁথা হয় এবং সম্মিলিত কোণও অপর বাহুর মধ্যখানে একটি বাঁশের দণ্ড সংযুক্ত হয় তবে তাহাই হইতেছে হোঁচা। হোঁচার নীচের ২ কোণের সহিত একগাছি শক্ত দড়ির দুই প্রান্ত বাঁধা থাকে। ধানকাটার পর হোঁচার দড়ি ডান হাতে ও বাঁ হাতে দণ্ডটি ধরিয়া অল্প জলে ঘাসে ঝোপের নিকট হোঁচা পাতিয়া সামনের জল ও ঘাস পা দিয়া নাড়াচাড়া দিলে টাকি পুঁটি প্রভৃতি মাছ হোঁচার ভিতর ঢোকে ও হোঁচা উঁচু করিয়া ঐ মাছ ধরা হয়। নদীর জল কমিবার বা বাড়িবার সময় কোলপাড়ির নিকট অল্প জলের মধ্যেও উহার সাহায্যে মাছধরা হয়। ঠিক হোঁচার আকারে প্রকাণ্ড খাঁচাকে সাগড়া বলে। বর্ষার প্রথমে বা শরৎকালে নদীকূলের লোকেরা লম্বা কঞ্চি বা শক্ত দড়ি বাঁধিয়া সাগড়া জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। মাঝে মাঝে কঞ্চি বা দড়ি ধরিয়া তুলিলে তাহার মধ্যে চিংড়ি বেলে আড়কাঁটা প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। কাঁচা শক্ত বাঁশের আধ ইঞ্চি চওড়া চটা মোটা দড়ি দিয়া বুনিয়া চিকের মত যে জিনিষ হয় তাহাকে বানা বলে। বিল বা বাওড়ের জল বর্ষান্তে যখন নালা দিয়া বাহির হইয়া নদী বা বড় খালে পড়িতে থাকে তখন ঐ নালার অপ্রশস্ত অংশে এপারে ওপারে উঁচু বানা দিয়া ঘেরিয়া মাঝখানে জলের কয়েক ইঞ্চি নীচু পর্য্যন্ত বানা বা শক্ত বেড়া দিয়া তাহার উপর দিয়া জলের স্রোত যাইতে দেওয়া হয়। এই তীব্র স্রোতের মুখে জাল বা বাঁশের খিলের তৈরী হোঁচার আকারের জিনিষ পাতিয়া রাখা হয়। স্রোতের সঙ্গে আগত পোনা শোল প্রভৃতি মাছ লাফ দিয়া ঐ জালের বা হোঁচার মধ্যে পড়িতে থাকে। ইহাকে স্থান বিশেষে 'চাঁচি পেতে' মাছধরা বলে।

বাঁশের খিলে প্রস্তুত বিবিধ আকার ও প্রকারের খাঁচার সাহায্যে মাছধরা মধ্য বাংলায় যত প্রচলিত, এত বোধ করি বাংলা দেশের কোথাও নাই। এই সব খাঁচার নির্মাণ-কৌশল ও পারিপাট্য অতীব মনোহর। ঘোড়ার পিঠের মত ছোট বড় নানা আকারের দুপ্রস্থ 'পার' ও সম্মুখে 'জিভ' সংযুক্ত দুয়াড়িগুলিতে মাছ 'পার' অতিক্রম করিয়া ভিতরে যাইতে পারে কিন্তু বাহির হইবার উপায় নাই। সাধারণতঃ নদীর কূল হইতে বানা পাতিয়া তাহার শেষপ্রান্তের সহিত জিভসংলগ্ন করিয়া শক্ত মোটা লগির সাহায্যে দুয়াড়ি পাতিয়া পরদিন প্রাতে খুলিয়া ডাঙ্গায় আনিয়া মাছ বাহির করা হয়। বাক্সের মত আকারের চতুষ্কোণ ফাঁদের একদিকে 'পার' লাগান থাকে এগুলি চারো বলে। ইহারই রাক্ষুসে সাইজের গুলিকে রাবানি বা ঝাঁঝরা বলা হয়। এগুলিতে বড় বড় রুই কাতলাও পড়িয়া থাকে। ক্যাম্বিশের ব্যাগের মত পটলাকারে ফাঁদের দুই পাশেই মুখ—সেগুলিকে বলে ধিয়েল। এগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প জলে

স্রোতের মুখে পাতা হয়। কোনও বিষয় তলাইয়া বুঝাকে অনেক স্থলে গ্রাম্য ভাষায় 'থিয়েল তুলে দেখ' বলে। চারোর মত অথচ ছোট ও শক্ত খিলে তৈরী 'থাদুন' 'বানার' সাহায্য না লইয়াই ধানক্ষেতের মধ্যে কাশঝোপ প্রভৃতির সহিত বাঁধিয়া পাবনা জেলার বিল অঞ্চলে কই মাছ ধরা হইয়া থাকে। বাঁশের মোটা খিলে তৈরী 'পলো'তে মাছধরা প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। উল্লিখিত ফাঁদগুলির খিল বোনা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারিকেলের দড়ি, বেত বা একপ্রকার দড়ির মত লতার সাহায্যে। পাটের দড়ি জলে টেকে না। পদ্মা বা অপর নদীর অগভীর অংশে যেখানে খরশোলা, পিয়েলি প্রভৃতি মাছ বেশী সেখানে আশ্বিন কার্তিক মাসে নলখাগড়ার তৈরী চাটাইএর মত জিনিষ জলের উপর ভাসাইয়া তাহার মাঝে মাঝে কলার সাদা খোলা রাখিয়া টানিয়া লওয়া হয়। মাছগুলি লাফাইয়া ঐ চাটাইএর উপর পড়িলে উহা ধরিয়া লওয়া হয়।

বাঁশের দণ্ডের অগ্রভাগে সরু বা মোটা অনেকগুলি লৌহফলক সংযুক্ত করিয়া থুকুচি, টেঁটা ও জুতি প্রস্তুত হয়। বর্ষার জল সবেগে খাল বা কোলে প্রবেশের কালে আষাঢ় শ্রাবণে জুতির সাহায্যে বড় বড় বোয়াল ধরা হইয়া থাকে। গ্রামের প্রাচীন লোকদের মুখে শুনিয়াছি, সেকালে যখন দেশে মাছ বেশী ছিল তখন নূতন বর্ষায় বড় বড় বোয়ালের 'পীড়' লাগিত। অর্থাৎ বোয়ালেরা পরস্পর কামড়াকামড়ি করিত তখন জুতি দ্বারা সেগুলি যথেষ্ট ধরা হইত। জানিনা প্রাণীতত্ত্বে এই 'পীড়' ধরার কোনও গূঢ় অর্থ আছে কি না! বড় বড় বিলে আমন ক্ষেতের মধ্যে ডিঙি নৌকায় চড়িয়া ধানগাছ নড়িতে দেখিয়া জুতি দ্বারা বড় বড় মাছ ধরার কথা শুনা যায়। এই সময় জুতি হস্তে লোক এত অনন্যমনা হয় যে নৌকার কেহ ঘুমের ঘোরে জলে পড়িয়া গেলে জুতি নিক্ষেপে তাহার প্রাণান্ত হওয়ার প্রবাদও চলতি আছে।

জালের সাহায্যে মাছধরা—জাল দিয়া মাছধরা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। (১) কাপড়ের দুইপ্রান্ত দুইজনে ধরিয়া ছেলেরা যে ভাবে পুকুরে মাছধরার চেষ্টা করে অনেক প্রকার জালের মূল কৌশল উহাই। দাঁড়াজাল, মইজাল, খোঁয়াড় ঘেরাজাল ও বেড়জাল ইহার উদাহরণ। (২) ময়রার দোকানের ফুটন্ত তেলের কড়া হইতে জিলিপি যে ভাবে ছাঁকিয়া তোলা হয় অনেক প্রকার জালে ঐ কৌশল অবলম্বিত হয় যেমন—হাত ছাকনা ও ছাকনা জাল, ভেশাল, খরা ও বাউলি জাল। (৩) কয়েকপ্রকার জালের পাশ এরূপ দাঁড়াল ভাবে প্রস্তুত যে জাল পাতা থাকিলে মাছ চলিবার সময় পাশের মধ্যে তাহার মাথা আটকাইয়া যায়। যেমন—নাগিনী জাল, কই জাল ও ছাঁদি জাল। (৪) অপেক্ষাকৃত জটিল কৌশল সংযুক্ত—ক্ষেপলা জাল, সাংলে ও কোণা জাল। অবশ্য ১ হইতে ৩ পর্য্যন্ত শ্রেণীর জালগুলির মূলসূত্র সহজ হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ সাফল্যের সহিত তাহাদের বিরাট রূপ দেওয়া যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখন বিভিন্ন প্রকার জালের মোটামুটি গঠন ও পরিচালনার কথা বলা যাইতেছে। দোঁড়া জাল—১৬ হাত লম্বা ৭ হাত টোন ১৪।১৫ গুণ সূতা পাকাইয়া সেই মোটা সূতায় তৈরী। পাশ ফাঁদাল। যুদ্ধের পূর্বে ১খানি জাল তৈরীতে ৪।৫ টাকা খরচ পড়িত। জালের প্রস্থের দিকে দুইপ্রান্তে ২টি বংশদণ্ড সংযুক্ত থাকে; উহা ধরিয়া দুইজন লোকে জলের মধ্যে টানিতে থাকে, মাছ পড়িলে গুটাইয়া লয়।

মইজাল—নদীর স্বল্পস্রোত অগভীর অংশে বা ডামসের মধ্যে চালানো হয়—ইহাতে চিংড়ি বেলে প্রভৃতি সাধারণতঃ পড়ে। ইহা ঘন বুনানি। দৈর্ঘ্যে ১৫ ও প্রস্থে ৭ হাত ৫ গুণ সূতায় তৈরী। যুদ্ধের আগে ৮।১০ টাকায় এই জাল প্রস্তুত হইত।

খোঁয়াড় ঘেরা জাল—পদ্মার অগভীর চরে অল্প মাটি থাকিলে তাহার মধ্যে আড় মাছ আসে। দূর হইতে জাল দিয়া ঘিরিয়া ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে জাল গুটাইয়া আনা হয়; মাছগুলিও ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে সরিতে থাকে তাহাই পরে জাল দিয়া জড়াইয়া ধরা হয়। বলা বাহুল্য রুই কাতলা এভাবে ধরা সম্ভব নয়। সেগুলি মানুষের আভাস পাইলেই দূরে পলাইয়া যায়।

ভেসাল জাল—ত্রিভুজাকৃতি জাল। দুই বাহুর সঙ্গে ২খানি শক্ত বংশাগ্র সংযুক্ত থাকে। কোণের দিকে থলি। চালক কোণের নিকটে দুটি বংশদণ্ড যেখানে মিশিয়াছে সেস্থান ধরিয়া আস্তে আস্তে সামনে চালায়। মাছ পড়িলে সামনের অংশ জল হইতে উঁচু করিলে জালের মাছ থলের মধ্যে প্রবেশ করে। থলের সম্মুখের দিকটা চালক এক হাতে ধরিয়া থাকে। ১৪ হাত লম্বা মুখে ১৮ হাত ৭ হাত থলে (সাধারণতঃ পাতলা কাপড়ের) পাঁচ গুণ সূতায় তৈরী ১খানি জাল করিতে পূর্বে ৪।৫ টাকা পড়িত এখন ১৬।১৭ টাকা পড়ে।

খরা জাল—ভেসাল জালের মতই গঠন, তবে নদী বা বিলের যে পথে মাছ চলাচল করে সেই পথে অনেকগুলি শক্ত বড় বড় বাঁশ পুঁতিয়া ঢেঁকি কলের সাহায্যে চালান হয়। পাশে ছোট ডিঙি নৌকা থাকে। কিছুক্ষণ জাল জলের মধ্যে রাখিবার পর চালক জালের কোণের বাঁশের উপর ভর দিয়া জাল উঁচু করিয়া তোলে এবং ডিঙির মধ্যে যে লোক থাকে সে মাছ ঝাড়িয়া উহাতে রাখে।

পদ্মার বা অপর স্রোতস্বতী নদীতে ফাঁদাল পাশযুক্ত ভেসাল জাল ধরিয়া স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাটিয়া যায় ও সাধারণতঃ ইলিশ মাছ পড়িলে জাল উঁচু করিয়া মাছ নৌকার মধ্যে রাখে। এই জালকে বাউলি জাল বলে।

টেনিস র‍্যাকেটের মত আকারের ৪।৫ হাত লম্বা বাঁশের ফ্রেমের সহিত সংযুক্ত ৩।৪ হাত টোন বিশিষ্ট জাল স্রোতের মুখে ধরিয়া খয়রা, বাঁশপাতা, আড়কাঁটা এমন কি সময় সময় ইলিশও ধরা হয়, ইহাকে হাত ছাকনা জাল বলে।

ঠিক ঐরূপ দেখিতে অথচ দুটি গোটা বাঁশে ফ্রেম তৈরী এবং স্রোতের মুখে পাড়ের নিকট শক্ত বাঁশ পুঁতিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত ঢেঁকিকলের জাল চালান হয়—তাহাকে বলে ছাকনা জাল। ইহাতে সাধারণতঃ ইলিশ মাছ ধরা হয়।

নাগিনী জাল—৪০।৫০ হাত লম্বা ও ৫ হাত প্রস্থ টেনিস জালের মত, বাঁশগুলি আধ ইঞ্চি হইতে ১ ইঞ্চি ফাঁদাল। কোল বা ডামসের মধ্যে

দুই প্রান্তে দুটি শক্ত বাঁশের লগির সঙ্গে বাঁধিয়া জাল পাতা হয় ও উহাতে আবদ্ধ ফ্যাসা, বাঁশপাতা, খয়রা প্রভৃতি মাছ মাঝে মাঝে খুলিয়া লওয়া হয়। কই জালও নাগিনা জালের মতই, তবে অপেক্ষাকৃত শক্ত সূতায় তৈরী এবং দৈর্ঘ্য প্রস্থেও নাগিনী জালের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। বিল অঞ্চলে ধান ক্ষেত্রের আলের পাশে সন্ধ্যার সময় পাতিয়া—সাধারণতঃ পরদিন ভোরে ঐ জালে আবদ্ধ মাছ সংগ্রহ করা হয়।

ছাঁদি জালের পাশ ১½ ইঞ্চি হইতে ২½ ইঞ্চি; জাল দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ মাইল প্রস্থেও ১৫।২০ হাত। উহার উপরের কাছির সহিত বাঁশের বড় বড় চোঙা ও নীচের কাছির মাঝে মাঝে মাটির টালীর মত ভারী বাঁধা থাকে—ফলে উহা নদীর মধ্যে ফেলিলে টেনিসের জালের মত খাড়া হইয়া ভাসিতে ভাসিতে ভাটেনের দিকে যাইতে থাকে। মাঝারি সাইজের নৌকায় ৪।৫জন লোক থাকে। তাহারা পদ্মার যে অংশে ঐ জাল চলিবে বুঝিতে পারে সেখানে মাঝ নদীতে গিয়া জালের একপ্রান্ত জলে ফেলিয়া দেয় ও অবশিষ্ট জাল ক্রমাগত ফেলিতে ফেলিতে নৌকা বাহিয়া কুলের দিকে আসিতে থাকে। জাল সম্পূর্ণ ফেলা হইলে স্রোতের সহিত ১½ বা ২ মাইল ঐ নৌকা ভাটাইয়া যায় তারপর জাল তুলিতে তুলিতে ও তাহার পাশে আবদ্ধ ইলিশ মাছ ধরিতে ধরিতে মাঝ নদী পর্য্যন্ত যায় এবং সব জাল নৌকায় তোলা হইলে নৌকায় পাল তুলিয়া—উজাইয়া পূর্বস্থানে আসিয়া নৌকা বাঁধিয়া মাছ ব্যাপারিদের কাছে বিক্রয় করে। বলা বাহুল্য, অনেকগুলি নৌকা পালা করিয়া এইরূপ জাল ফেলে; সুতরাং এক নৌকায় জাল তুলিতেছে দেখিলে অপর নৌকার লোকেরা উজানে জাল ফেলিতে শুরু করে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ হইতেই এই জালে মাছ ধরা আরম্ভ হয়। ৪।৫টি হইতে ২০।২৫টি বা সময় সময় আরও বেশী ছোট ও মাঝারি সাইজের ইলিশ প্রতিবারে ধরা হইয়া থাকে। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে পদ্মা প্রভৃতি স্রোতস্বতী নদীতে ইলিশ মাছ সর্বদাই স্রোতের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উজানের দিকে এবং বিশেষ করিয়া তীব্র স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়ার পক্ষপাতী।

খেপলা বা ক্ষেও জাল বাংলা দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। সাধারণ একখানি জাল প্রায় ৯ হাত লম্বা ৫গুণ সূতায় তৈরী; জালের মুখে মাদুলির আকারের দুই মুখ খোলা লৌহ খণ্ড লাগান থাকে। একখানি জালে প্রায় ৫সের লোহা প্রয়োজন। যুদ্ধের পূর্বে এইরূপ একগাছি জাল তৈরী করিতে ৮।১০ টাকা খরচ পড়িত। ক্ষেপণ করা বা ছুঁড়িয়া ফেলা হয় বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম ক্ষেপলা জাল হইয়াছে। এই জাল ফেলা অভ্যাস সাপেক্ষ। জাল ফেলিবার কৌশল এবং জালের মুখে ভারী লোহা থাকার দরুণ উহা সত্বর মাটি সংলগ্ন হয় ও পরে আস্তে আস্তে টানিলে মাছগুলি একটি ফাঁদের মত স্থানে আটকাইয়া জালের সহিত উপরে উঠিয়া আসে।

সাংলে জালে ইলিশ মাছ ধরা গঙ্গাতেও দেখা যায়—পদ্মা প্রভৃতিতে তো আছেই। এই জালেও কৌশলে মাছকে ফাঁদে ফেলা হয়। সাধারণতঃ একখানি ডিঙ্গি নৌকায় তিনজন লোক থাকে—একজন মাঝি ও দুইজন নৌকার দুই প্রান্তে জাল ফেলিয়া বসিয়া থাকে। এ জালও বাউলি জালের মতই গঠিত। টেনিসের জাল লম্বালম্বি ২ ভাঁজ করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ, তবে লম্বালম্বি দুই প্রান্তে শক্ত বাঁশের বাঁখারি সংযুক্ত। উপর ও নীচের বাঁখারির মধ্যবিন্দুর সহিত শক্ত সরু দড়ি সংযুক্ত থাকে চালকের হাতে দড়ির অপরপ্রান্ত থাকে। নীচের বাখারির সাথে ৮।১০ সের ওজনের একটি পাথর জালকে নীচে ইচ্ছামত জলের ভিতর ঠিকভাবে রাখিতে সাহায্য করে। উপরের দড়িগাছি একটু বেশী টানিয়া উভয় বাখারির মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক রাখা হয় যাহাতে মাছ সেই পথে জালের মধ্যে ঢুকিতে পারে। মাছ জালে ঢুকিলে দড়িতে ঝাঁকুনি পড়ে এবং চালক তখন তাড়াতাড়ি নীচের দাড়গাছি টানিয়া উপরের দড়ির সমান করায় বাখারি দুইটী জালসহ মুখে মুখে লাগিয়া যায়, ফলে মাছটি ফাঁদে আটকাইয়া পড়ে। তখন জাল তুলিয়া মাছ বাহির করিয়া নৌকায় রাখা হয়। সাধারণতঃ ইলিশ মাছ এই জালে বেশী পড়ে। জাল উপরের দিকে ফেলিয়া স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাটেনের দিকে নির্দিষ্ট জায়গা পর্য্যন্ত গিয়া আবার পাল তুলিয়া বা গুণ টানিয়া পূর্বস্থানে নৌকা আনিয়া পুনরায় জাল ফেলা হয়।

কোণা জাল। অবিকল ছাঁদি জালের মতই চালান হয়; তবে ইহার শেষ প্রান্তে দুয়াড়ির 'পারের' মত জালের তৈরী একটি ফাঁদ ভাসমান বড় বাঁশের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়! এই জাল ছাঁদি জালের চেয়ে আকারে বড়, চালাইতেও ৮।১০ জন লোক লাগে। ইহারও উপরের অংশ কাছি সংলগ্ন বড় বড় বাঁশের চোঙার সাহায্যে জাগাইয়া রাখা হয় ও নীচের অংশ পোড়ামাটির টালির দ্বারা জলের মধ্যে টান রাখা হয়। মাছেরা কতক ছাঁদি জালের মত পাশে আটকায়, কিন্তু বড় বড় ইলিশ জালে বাধা পাইয়া সরিতে সরিতে ফাঁদের মধ্যে গিয়া পড়ে। সুতরাং জাল তুলিতে তুলিতে কয়েকটি ছোট মাছ ও ফাঁদ তুলিলে প্রচুর বড় ইলিশ পাওয়া যায়। একেবারে ২৫।৩০ হইতে শতাধিক বড় ইলিশ এই জালে পড়িয়া থাকে। বলা বাহুল্য কোণা জাল ও সাংলে জালেই সাধারণতঃ বড় ইলিশ পাওয়া যায়। ছাঁদি জালে ছোট এবং যে বেড় জালের কথা আগে বলা হইয়াছে তাহাতে ছোট বড় মাঝারি কেউ বাদ পড়ে না। কোণা জাল তৈরীতে যুদ্ধের পূর্বেই প্রায় হাজার টাকার উপর খরচ পড়িত।

পদ্মার জালের রাজা বেড়-জালের কথা বলিতেছি। ইহার কৌশল সোজা হইলেও ইহার বিরাটত্ব বিস্ময় উৎপাদক। এক একটি জাল লম্বায় ২ মাইলের বেশী ছাড়া কম নয়, প্রস্থেও ১৫।২০ হাত। বরাবর লম্বার দিকে সেই অনুপাতে মোটা কাছি এবং জাল জলের মধ্যে খাড়া রাখিবার জন্য কোণা জালের মতই এর বাঁশের চোঙা ও নীচে পোড়া মাটির ভার বাঁধা। বেড়াজালের জন্য এমন জায়গা চাই যেখানে নদীর এক পারে ঢালু শক্ত বালির চর ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত আছে। কারণ জাল সমস্ত নদীটি বেড় দিয়া ২।১ মাইল যাওয়ার পর জালের ২ প্রান্তের কাছি ধরিয়া টানিয়া ঐ চরে জাল গুটান ও মাছ সংগ্রহ করা হয়। জাল ফেলা অনেকটা কোণা জালেরই মত, তবে কোণা জালের বা ছাঁদি

জালের শেষ প্রান্ত মধ্য নদী দিয়া ভাসিতে ভাসিতে যায় বেড় জালের শেষ প্রান্ত কিন্তু অপর বড় নৌকাতে কাছির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। সে নৌকা ২।১ মাইল ভাটিয়া গিয়া চরের পারের দিকে আসে ও তখন উভয় নৌকার লোক চরে নামিয়া কাছি ধরিয়া জাল টানিয়া ক্রমশঃ গুটাইতে থাকে। বড় দুই নৌকা কূলের নিকটে জালের কাছাকাছি থাকে। ছোট ২।৩ খানি ডিঙ্গিতে কয়েকজন জালের ধারে ধারে ঘোরে এবং কোনও বড় চাঁই, রুই বা কাতলা মাছ পালাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিলে টেঁটা বিদ্ধ করিয়া ধরে। বড় রুই সাধারণতঃ প্রকাণ্ড লাফ দিয়া পলাইয়া যায়। তারপর জালের উভয় প্রান্ত যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই জল মুখরিত হইয়া ওঠে। জীবন্ত ইলিশের স্বর্ণাভ রজতশুভ্র কান্তি পদ্মার রজতশুভ্র বালির উপরে এক অভিনব দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করে। শত শত মাছ একত্রে স্বচ্ছ জলের মধ্যে কি ভাবে ছুটাছুটি করে তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না। এই সময় ক্ষিপ্র হস্তে মাছ ধরিয়া নৌকায় রাখা হয়। ফলতঃ এক ক্ষেপে ৪।৫ শত হইতে হাজার ইলিশ মাছ পড়িয়া থাকে ; তাহা ছাড়া বহু পাঙাস, চাঁই ও দুই একটি রুই কাতলা প্রায় ক্ষেপেই ওঠে। মাছ সংগ্রহ করা হইলেই মুসলমান ব্যাপারি (নিকারীগণ) ও অন্যান্য গ্রাহকের কাছে উহা বিক্রয় করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরাও গিয়া কিনিয়া আনে। বেড় জালের বিশেষত্ব উহার দলপতির দক্ষতা সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবলের উপর। বাংলার শিল্পক্ষেত্রে যৌথ কারবার প্রচলিত হইবার কতকাল পূর্বে এই যৌথ মৎস্য শিকার চলিয়া আসিতেছে, কে জানে ? ৫০।৬০ হইতে ১০০ জন পর্য্যন্ত দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় লোক যখন ২ দলে বিভক্ত হইয়া কাছি ধরিয়া জাল গুটাইতে থাকে তাহা দর্শনীয় বটে ! জালফেলা প্রভৃতি কাজ, বিশেষতঃ ঢেউএর মধ্যে, যুদ্ধরত সৈনিকের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাকেও হার মানায় ; ফলতঃ এই জাল তৈয়ারীতে বহু হাজার টাকা ব্যয় হয়—এদিকে আষাঢ়ের পরে চর ডুবিয়া গেলে আর এ জাল চালান হয় না। এই সব নিরক্ষর দলপতির দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠা সাধারণতঃ এত উচ্চস্তরের যে এত টাকার ভাগ বাঁটোয়ারা প্রভৃতিতেও কোনও দিন গোলমাল বা মামলামোকদ্দমা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

অনেকেই হয়ত জানেন এতাবৎকাল পদ্মা নদীতে বিক্রয়ের জন্য নৌকার সাহায্যে মাছধরা হিন্দু মৎস্যজীবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান নিকারী শ্রেণী এঁদের নিকট মাছ কিনিয়া বিক্রয় বা চালানী কারবার করিতেন মাত্র। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভূমিহীন এমন কি চাষী গৃহস্থ মুসলমানগণও চাষের অবসরে মাছ ধরিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্বে পূর্বে ইঁহারা ছাকনা জালে বা সাংলে জালে ইলিশ মাছ ধরিলেও তাহা নিজেদের ব্যবহারের জন্যই করিতেন। ইহাতে হিন্দু মৎস্যজীবীগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। মুসলমান নিকারীগণও প্রমাদ গণিতেছেন। বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে পূর্ববঙ্গের অনন্যোপায় হিন্দু মৎস্যজীবীগণের জীবিকার্জনের পথ যাহাতে সহসা রুদ্ধ না হয় সেদিকে রাজনীতিকগণের সজাগ দৃষ্টি এখন হইতেই নিবদ্ধ হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার মৎস্যজীবীগণ সমাজে অতিশয় হেয় হইয়া আছেন। প্রচণ্ড ঝড় তুফান ও প্রলয়ঙ্করী নদীর খেয়ালের সহিত যাঁহারা পুরুষানুক্রমে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক শিক্ষা পাইয়া নৌ-বিভাগে উচ্চপদ লাভ করা এমন কি বিদেশ হইতে সমুদ্রে মৎস্যধরা শিখিয়া বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করা উচিত ছিল। জৈব রসায়নশাস্ত্রকে যিনি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং বায়োকেমিষ্ট্রির যিনি জন্মদাতা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সেই এমিল ফিশারের পূর্বপুরুষগণের বৃত্তি উপাধিতেই প্রকাশ। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে অনেক ফিশারই জ্ঞান-বিজ্ঞানে মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কেহই এ যাবৎ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হন নাই। অতীতে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, এখন দেশের এই সব শ্রেণীর লোকেও যাহাতে নিজেদের জাতীয় ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানেও উন্নতিলাভ করিতে পারেন এবং আর্থিক ও চারিত্রিক বলে বলীয়ান হইয়া মানুষের অধিকার অর্জন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে দেশবাসী সকলেরই সমবেত সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

টুক্‌রা কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

ভালবাসা সেত মায়ার কুসুম
হৃদয় বৃন্তে ফোটে
না পাওয়ার ব্যথা বহিতে নারে সে
ক্ষণিক আঘাতে টোটে।

প্রেমের দেউলে যে ধ্বনি জাগিয়া
বিশ্বে ছড়ায়ে যায়
সীমা মাঝে থাকি অসীমে সে ধ্বনি
ধ্যানের মুরতি পায়।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—সাত—

পরিমল এল তার দিন দুই পরে।

এর ভেতরেই বই দুখানা পড়ে ফেলেছে রঞ্জু, গিলেছে গোগ্রাসে। একখানার নাম 'ফাঁসির ডাক', আর একখানা 'শহীদ সত্যেন'। একখানার ওপরে একটা ফাঁসির দড়ির ছবি—একটি ছেলে হাসিমুখে সে দড়ি গলায় জড়িয়ে নিচ্ছে; আর একখানার মলাটে একটা রিভলভার আঁকা—তার মুখ থেকে লাল আগুন আর কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। বই দুটোর মলাটের দিকে তাকালেই যেন গা শির শির করে ওঠে।

কিন্তু শুধুই কি মলাট? ভেতরের প্রতিটি পাতায় আশ্চর্য সব লেখা, তার প্রতিটি পংক্তিতে যেন বজ্রের গর্জন, তার প্রতিটি হরফ থেকে যেন রক্তের বিন্দু আর আগুনের কণা পড়ছে ঠিকরে ঠিকরে। রঞ্জুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, টগবগ করে ফুটতে লাগল তার বুকের ভেতরে।

এই তো এতদিন পরে পাওয়া গেল তার সত্যিকারের পথ, উত্তর মিলল মনের ভেতরে সঞ্চিত এতদিনের পুঞ্জ পুঞ্জ জিজ্ঞাসার। উনিশ শো তিরিশ সালের লবণ-সত্যাগ্রহ, আইন-অমান্য, বিলাতী-বর্জন—এই চরকা-লাঞ্ছিত অহিংস-পথ—এ আমাদের জন্যে নয়। এ স্থবিরের ধর্ম, কাপুরুষের মনোবিলাস। পলাশীর মাঠে যে সূর্য ডুবেছিল—তা রক্ত মাখা, রক্তের মধ্য দিয়েই ইংরেজ কোম্পানি সেদিন পথ করে গিয়েছিল সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর থেকে দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন পর্যন্ত, কাশ্মীরের তুষার-শুভ্রতা থেকে কুমারিকা-অন্তরীপের নীলিমা-বিস্তার পর্যন্ত। আজ সেই অধিকার থেকে তাকে তাড়াতে হলে সেই রক্তের পথ ছাড়া আর কোনো পথই নেই—উত্তরের শুভ্র তুষার থেকে সুরু করে দক্ষিণের নীল সমুদ্র পর্যন্ত রক্তে আজ রাঙা করে দিতে হবে। দেশমাতার যে রূপ আজ আমরা 'বন্দে-মাতরম্' মন্ত্রে বন্দনা করি তা ষড়ৈশ্বর্যময়ী কমলদলবিহারিণী কমলার রাজরাজেশ্বরী মূর্তি নয়; সমস্ত ভারতবর্ষের কালো আকাশে তাঁর খেটক-খর্পর প্রসারিত করে দিয়ে দাঁড়িয়েছেন ভয়ঙ্করী চামুণ্ডা, মহামেঘের মতো বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে তাঁর উত্তাল কেশমালা, রুধিরস্রুতি হচ্ছে তাঁর কণ্ঠ-বিলম্বী নরমুণ্ডের হারে, রক্তলোলুপার অট্ট হাসি ধ্বনিত হচ্ছে দিকে দিকে—'ম্যায় ভুখা হুঁ'—

বইয়ের পাতায় পাতায় সেই চামুণ্ডার আবাহন, ছত্রে ছত্রে সেই ভয়ঙ্করীর বন্দনা। রুদ্ধশ্বাসে রঞ্জু পড়ে যেতে লাগল: 'চক্রান্ত, শঠতা এবং প্রচণ্ড দমন-নীতির সাহায্যে পৌনে দুইশো বছর ধরিয়া ইংরেজ আমাদের শাসন করিতেছে। কিন্তু ইহা শাসন নয়, শোষণ। রক্তলোভী শয়তানের মতো সে প্রতিমুহূর্তে আমাদের বুকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে, কাড়িয়া লইয়াছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি। দেশ-জোড়া একটা গোলামখানা বানাইয়া ইংরেজ আর তার পোষা কুকুরের দল, তার ঘৃণ্য টিকটিকিবাহিনী অবাধে রাজত্ব করিতেছে; তাহাদের চাবুকের ঘায়ে যখন পিঠের চামড়া রক্তাক্ত হয়, তাহাদের বুটের লাথি খাইয়া যখন প্লীহা ফাটে, তখনো এই গোলামেরা দাঁত বাহির করিয়া হাসে, সরকারকে সেলাম বাজাইয়া এবং রায়বাহাদুরী খেতাব পাইয়া ধন্য হয়!"

পড়তে পড়তে রঞ্জুর যেন দম আটকে আসতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাতার পর পাতা উল্টে চলল সে:

"কিন্তু সে গোলামের দলে আমরা নই। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা স্বাধীন মানুষ হইয়া দাঁড়াইব। ভারতবর্ষের এক ইঞ্চি জমিতে একজন ইংরেজেরও জায়গা হইবে না। নীল চাষের নামে যারা বাংলার কৃষককে নির্মমভাবে নির্যাতন করিয়াছে; বাংলার তাঁতীদের আঙুল কাটিয়া যারা আমাদের বুকের ওপর ফাঁপিয়াছে ম্যাঞ্চেষ্টারী শোষণ যন্ত্রের বনিয়াদ; সিপাহী বিদ্রোহ দমনের নামে যারা শত শত নিরপরাধ মানুষের গায়ের চামড়া উপড়াইয়া হিন্দুর

গায়ে গোরুর—আর মুসলমানের গায়ে শুয়োরের ছাল বসাইয়া চর্বি মাখাইয়া জ্যান্তে আগুনে পোড়াইয়া মারিয়াছে, কামানে গোলার বদলে যারা মানুষকে ব্যবহার করিয়াছে; জালিয়ানওয়ালার শত শত নিরস্ত্র অহিংস-নরনারীকে মেসিন গান চালাইয়া হত্যা করিতে যাদের বাধে নাই; যাদের ফাঁসিকাঠ আমাদের শত-শহীদের মৃত্যু দিয়া চিহ্নিত, যাদের কারাগারে শত শত দেশসেবক তিলে তিলে আত্মদান করিয়াছে—সেই শয়তানদের জন্ত কোনো ক্ষমা আমাদের অভিধানে নাই। ইহার প্রতিটির জন্ত আমরা বিচার করিব, এই অত্যাচারের প্রত্যেকটির প্রতিশোধ আমরা লইব। অহিংসার ভাঁওতায় ভুলিয়া দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া রিফর্মের অথবা স্বায়ত্ত-শাসনের কাঁচ-কলা হজম করিতে আমরা রাজী নই। বাঘের মুখের শাসনে ছাগলের অহিংস-নৃত্য জাতির অপমান, মনুষ্যত্বের অপমান। দেশমাতার পূজা-মণ্ডপে আজ ইংলণ্ডের শাদা-পাটাদের বলি দিয়াই আমরা স্বাধীনতার বোধন করিব।"

এ শুধু লেখা নয়—লেখার মধ্য দিয়ে যেন সেই বলির বাজনা বাজছে। রক্ত চাই—অত্যাচারীর রক্ত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতাকে শোধন করে নিতে হবে। ভারতবর্ষের মাটিতে যতদিন একজন ইংরেজ থাকবে ততদিন জানব আমাদের শৃঙ্খল মোচন হয়নি। আর তার উপায় হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লব, রক্তাক্ত ভয়ঙ্করের পথে অভিযাত্রা।

এই ভয়ঙ্কর অভিযানের কাহিনী আছে দ্বিতীয় বইটিতে। আছে ক্ষুদিরামের কথা! রঞ্জুর স্বপ্নে দেখা ক্ষুদিরাম, খেড়ে ছেলে অশ্বিনীর মুখে শোনা 'নিখিলিস্ট' ক্ষুদিরাম বৈরাগীর গানের ক্ষুদিরাম। বালক রঞ্জুর অপরিণত ভাব-বিলাসী মন মাত্র কয়েকটি পাতার মধ্য দিয়ে যেন হাজার হাজার বছরের নিষ্ঠুর কঠিন বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ পার হয়ে গেল। আশ্চর্য, কোথায় লুকিয়েছিল এসব, কোথায় প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল এই অপরূপ জগতের কাহিনী। এই সামান্ত কয়েকটি পাতার মধ্য দিয়ে যেন অনেকগুলো কালো পর্দা তার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে গেল, আবিষ্কৃত হয়ে গেল রহস্তের এক বিশাল রত্নভাণ্ডার।

মা এসে বাইরে থেকে ডাকলেন, ছেলের আজ হল কি?

রঞ্জু চমকে উঠল, ধ্বক্ করে দুলে উঠল হৃৎপিণ্ড। নক্ষত্রবেগে বইখানা চালান হয়ে গেল 'সরল জ্যামিতি'র তলায়। মা টের পাননি তো!

মা আবার বললেন, গল্পের বই জুটিয়েছ বুঝি? তাই মনসাতলার দিকে মন নেই?

আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে রইল রঞ্জু—মা যদি বই দেখতে চান তা হলেই সর্বনাশ। কিন্তু হেঁসেলে হাঁড়ি চাপিয়ে এসে তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না, মা চলে গেলেন।

রঞ্জু আবার বই খুলল। এক অজ্ঞাত অদ্ভুত জগতের বিচিত্র ইতিহাস। এ ইতিহাস মেলে না ক্লাসে-পড়া তোগলক-বংশ আর লর্ড বেণ্টিঙ্কের সুশাসনের মধ্যে, এ ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না অ্যালফ্রেড্ দি নোব্‌লের মহত্বের বিবরণীতে। মাটির তলায় ক্ষুদিরামের গোপন কারখানার মতো একটা অদৃশ্য পাতালপুরী থেকে কাল-নাগিণীর ফণার মতো এ উদ্যত হয়ে উঠল, এর প্রতিটি পাতায় পাতায় সাপের বিষের তীব্র জ্বালা!

রঞ্জু পড়ে যেতে লাগল:

"কিন্তু মীরজাফর-আমিরচাঁদ-জগৎশেঠের বংশধরদের মৃত্যু নেই। তারই প্রমাণ পাওয়া গেল মাণিকতলা বোমার মামলায়। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামী হল রাজসাক্ষী। বিভিন্ন বন্দীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে ভেতরের খবর বের করবার চেষ্টা করতে লাগল। সত্যেন বসু আর কানাইলাল দত্ত এই বিশ্বাসঘাতককে শাস্তি দেবার সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ঘটনার দিন হাসপাতালে অসুস্থ সত্যেন নরেন গোস্বামীকে ডেকে পাঠালেন তার কাছে জবানবন্দী দেবার জন্ত। নতুন শিকারের আশায়, নতুন তথ্য জানবার লোভে বিশ্বাসঘাতক নিশ্চিন্ত মনে দেখা করতে গেল। দু চারটে কথার পরই সত্যেন রিভলভার বের করে গুলি করলেন, আহত দেশদ্রোহী আর্তনাদ করে ছুটে বেরুল।'

কিন্তু মাঝপথে মৃত্যুদূতের মতো আবির্ভূত হলেন কানাইলাল। রিভলভার হাতে তিনি অনুসরণ করলেন পলাতক বিশ্বাসহন্তাকে। জেলারের আফিসে পৌঁছুবার আগেই জাতির কলঙ্ক নরেন গোস্বামীর রক্তাক্ত মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ইংরেজের কাছ থেকে ইনাম

পাওয়ার আগেই ঘরশত্রু বিভীষণ দলের বিপ্লবী বীরদের কাছ থেকে পেল তার দেশদ্রোহিতার চরম পুরস্কার।'

ঠিক হয়েছে। অসহ্য আক্রোশে গর্জন করে রঞ্জুর মন বললে, ঠিক হয়েছে। আজ এমনি করেই একটার পর একটা দেশের শত্রুদের নিপাত করা দরকার। দেশ জুড়ে নরেন গোস্বামীর রক্তবীজেরা টিকটিকি রূপে ছড়িয়ে আছে, তারা নিজেদের শত্রু—তারা জাতির আবর্জনা। এই আবর্জনাগুলো পরিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ একটা অসম্ভব কল্পনা, একটা অবাস্তব ব্যাপার।

রক্তের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল। সেও যদি এই মুহূর্তে একটা রিভলভার হাতে পায় তা হলে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। ক্ষুদিরাম, সত্যেন, বীরেন গুপ্ত, গোপীনাথ সাহা কিংবা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর মতো সেও বেরিয়ে পড়তে পারে হত্যার অভিযানে। একটা রিভলভারে কটা গুলি থাকে—পাঁচটা, ছ'টা? যদি ছ'টা গুলি থাকে তা হলে তার পাঁচটা দিয়ে সে পাঁচজন বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করবে, আর বাকীটা—বাকী বুলেটটা সে খরচ করবে নিজের বুকে, হাসতে হাসতে প্রাণ দেবে বীর প্রফুল্ল চাকীর মতো।

দেশের জন্যে মরা! সে কি আশ্চর্য গৌরব—সে কি অপূর্ব সার্থকতা! ফাঁসির দড়ি হোক গলার মণিহার, পিস্তলের গুলি হোক দেশমায়ের আশীর্বাদ! নতুন দিনে স্বাধীন ভারতবর্ষে যে ইতিহাস লেখা হবে অক্ষয় অক্ষরে, সে ইতিহাসের পাতায় জল জল করতে থাকবে আরো অগণিত শহীদের সঙ্গে তারও নাম। সেদিন দেশের ছেলেরা তারও উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাবে, 'ফাঁসির সত্যেনে'র সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নামও লেখা হয়ে যাবে: 'ফাঁসির রঞ্জন।'

রঞ্জু উঠে দাঁড়ালো। পায়চারী করতে লাগল ঘরময়। মনটা একটু অন্তর্মুখী হলেই তার পুরোণো পাগলামি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করে যেতে ইচ্ছে করে। পায়চারী করতে করতে রঞ্জু আউড়ে চলল:

"সুমুখে যে আসে মরে যায় কেহ,
পড়ে যায় কেহ ভূমে,
দ্বিধা হয়ে বাধা হতেছে ভিন্ন
পিছে পড়ে থাকে চরণ চিহ্ন
আকাশের আঁখি করিছে খিন্ন
প্রলয় বহ্নি ধূমে—"

আচমকা থেমে গেল রঞ্জু। বেছে বেছে এই লাইন-গুলোই তার মনে পড়ল কেন, মাত্র দু তিনবার পড়া 'গুরু-গোবিন্দ' কবিতার পংক্তি তার মনের ভেতরে এমন ভাবে বাঁধাই বা পড়ে গেল কী করে? স্মৃতি-শক্তির গর্ব অবশ্য রঞ্জু করতে পারে, বাড়ির 'চয়নিকা'-খানা প্রায় তার কণ্ঠস্থ, কিন্তু নিতান্তই পরের বাড়িতে বসে পড়া এই কবিতাটা এমনভাবে তার স্মৃতির ভেতরে এত সহজে বাসা বেঁধে নিলে কেমন করে?

মনের আকাশে থম থম করছিল ঝোড়ো মেঘ, তার ফাঁক দিয়ে যেন এক টুকরো জ্যোৎস্না গলে পড়ল। অদ্ভুতভাবে একটা মোড় ঘুরে গেল চিন্তাটা। চোখের সামনে ছবির মতো দেখা দিল একখানা সাজানো বাড়ি, ফুলে ফুলে ভরা তার বাগান, সে বাগানের মাঝখানে হেনার কুঞ্জে ঘেরা একটা শ্বেত-পাথরের ফোয়ারা। একটুখানি জমিতে ঝলমল করছে শিশিরে ধোয়া উজ্জ্বল ঘন-ঘাসের আনন্দ, চেনে বাঁধা ছোট একটি চিতি-হরিণ, তার দুটি গভীর নীল চোখে অফুরন্ত স্নেহ। সেই ফুল, সেই হেনার লতার আড়ালে শাদা পাথরের ফোয়ারা, বাতাসে টাটকা ফোটা গোলাপ আর ধূপের গন্ধ, ফুলে ফুলে ছোট বড় প্রজাপতি, আর সব কিছুর ভেতরে ফুলের মতো, প্রজাপতির মতো, গোলাপ আর ধূপের সৌরভে জড়ানো একটি মেয়ে—যার ভালো নাম সংঘমিত্রা, ডাক নাম মিতা!

অন্যমনস্ক রঞ্জু ভাবতে লাগল, সংঘমিত্রা নয়, মিতাই ভালো। চেনে-বাঁধা হরিণের মতো শান্ত নীল চোখ, আনন্দ আর কৌতুকে উজ্জ্বল তার ঢলঢলে মুখ। দুটি হাত জড়ো করে নমস্কার জানিয়েছিল, আশ্চর্য, নমস্কার জানিয়েছিল ছোট আর ছেলেমানুষ রঞ্জুকে।

আচ্ছা, মিতা কি পড়েছে এই সব বই, এমনি করে ভেবেছে তারও মতো? তাই সম্ভব, নিশ্চয়ই তাই। পরিমলের বোন সে, পরিমলের মতো একই চিন্তায়, একই সুরে তারও মন বাঁধা। রঞ্জুর ভাবতে ইচ্ছে করে এই বইগুলো পড়ে মিতারও কি তার মতো উত্তেজনা জাগে রিভলভার হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে, 'অত্যাচারের বক্ষে

পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি?' ছোট মেয়ে মিতা, পোষা হরিণের সঙ্গে যে মিতার মিতালি, সেও কি—

কিন্তু কল্পনাটা কেমন ভালো লাগল না। ফাঁসির দড়িতে মিতাকে ভাবতে কষ্ট হয়। রঞ্জুর কিশোর মন, কঙ্কাবতী মালঞ্চ-মালার স্বপ্ন-বিভোর মন বলল, না, না, ভারী সুন্দর মিতা। দিনের পর দিন ও আরো সুন্দর হয়ে উঠুক, মিতা বেঁচে থাকুক—এ আগুনের হলকা যেন কোনোদিন ওকে ছুঁয়ে না যায়।

—রঞ্জু, রঞ্জন?

বাইরে থেকে কে চেঁচিয়ে ডাকল।

রক্ত চমকে উঠল সর্বাঙ্গে। পরিমল? দরজা খুলে রঞ্জু বেরিয়ে এল বাইরের বারান্দায়: কে?

কিন্তু পরিমল নয়। পাকামি-ভরা গালের পাশ দিয়ে ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে আধখানা জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছে ভোনা। সঙ্গে সঙ্গে দলটিও ঠিক আছে তার—কালী, খাঁদু, পূর্ণ। ভবেন মজুমদারের সেই কেলেঙ্কারীটা কবে চুকে-বুকে গেছে, দলবলের মধ্যে ভোনা আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আবার হয়ে উঠেছে মনসাতলা মার্বেল পার্টির একমাত্র নেতা।

বিরক্তিতে রঞ্জুর মুখ কুঞ্চিত হয়ে গেল: ডাকছিস কেন?

ভোনা জিভের ডগাটায় একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে সেই পুরোনো কবিতার লাইন দুটো শুনিয়ে দিলে:

"Jim is a good dog,
Is he catching a frog?"

হ্যালো গুড্ ডগ জিম, কী করছিস?

রঞ্জু বললে, সকালবেলা কী ইয়ার্কী এ সব?

—এ সব ইয়ার্কী নয়? ওরে বাবা, ভালো ছেলে এখন ধম্মো কথা শুনতে চায়। শুনবি ধম্মো কথা? সংস্কৃত?—ভোনা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে শুরু করলে, ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্না শমন সন্তুনূপ্যা, শন্নো সমুদ্রিয়া আপঃ শমন সন্তকুপ্যা—

কিছুদিন আগে পৈতে হয়েছে ভোনার, তারই খানিকটা মন্ত্র গড়গড় করে আউড়ে গেল সে।

খাঁদু বাধা দিয়ে বললে, থাম্‌না, কেন বাজে কথা বলছিস। শোন্ রঞ্জু, আজ সন্ধ্যের পর বেরুতে হবে।

—কেন?

—বাঃ, তুই আছিস কোথায় রে? আজ যে নষ্টচন্দ্র। অতুল ঘোষের লিচু বাগানে আজ—হুঁ-হুঁ!

মনটা কালো হয়ে গেল রঞ্জুর। দিনের পর দিন এই দলটা সম্পর্কে তার অশ্রদ্ধা বেড়েই চলেছে সমান ভাবে। সেই কুৎসিত কদর্য কথাগুলোকে সে ভোলেনি, ভোলেনি গোষ্ঠের খেলার সে অতি তিক্ত অভিজ্ঞতাটা। তবুও সে বিরক্তিটা চাপা পড়ে গিয়ে একটা নতুন শ্রদ্ধা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—দেখা দিয়েছিল একটা অপ্রত্যাশিত বিস্ময়। 'ঝাণ্ডা উচে রহে হামারা'। ছাব্বিশে জানুয়ারীর স্বাধীনতার সংকল্প। পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছে ভোনা। তারও পরে—

ভবেন মজুমদার। পেছনে পেছনে ক্যানেস্তারার শোভাযাত্রা। তার পরে আবার যেমন ছিল ঠিক সেই রকম। বান ডেকেছিল, এসেছিল নতুন আত্রাইয়ের কূলপ্লাবী নতুন বন্যা—একাকার হয়ে গিয়েছিল গ্রাম-প্রান্তর, নদী-নালা, দিগ্‌দিগন্ত। যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ নেমে গেল সে জল। পড়ে রইল সেই পচা ডোবা, সেই দুর্গন্ধ জল, কচুরিপানা, আর ব্যাঙাচির ঝাঁক। মনসাতলা থেকে সেই মার্বেল ফাটানোর শব্দ: 'হাত ইস্টেট্—উড্ডু কিপ্'—, আজ আবার সেই পুরোণোর পুনরাবৃত্তি—অতুল ঘোষের লিচু বাগানে নষ্টচন্দ্র।

রঞ্জু বললে, না।

—না কেন? চমৎকার লিচু, ভালো মজঃফরপুরী লিচু। একটা খেলে আর ভুলতে পারবি না। আর ভালো ছেলেগিরি করতে হবেনা, সন্ধ্যেবেলা ডেকে নিয়ে যাবো, কেমন?

রঞ্জু ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। না। একটা বিস্বাদ-বিরক্ত-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এদের দিকে। শুধু এরা খারাপ ছেলে বলেই নয়, আজ একটা নতুন ধাক্কায়, নতুন একটা আশ্চর্য পথের সংকেতে এদের সঙ্গে তার ব্যবধানটা আরো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই মনসাতলা নয়, রহস্যময় কাঞ্চননদীর বালিডাঙ্গা নয়, এই শহর মুকুন্দ-পুরের খোয়াওঠা রাস্তা, নড়বড়ে ল্যাম্প্ পোষ্ট্, বাজারের নোংরা মাড়োয়াড়ীপট্টি কিংবা ইঁট বার করা একতলা দোতলা জীর্ণ বাড়ীগুলোও নয়। অন্ধকার রাত্রে নক্ষত্রভরা আকাশে প্রসারিত আকাশগঙ্গার মতো আজ তার মনের যাত্রা

শুরু হয়েছে একটা সুদূর অপরিচয়ের ছায়াপথে। আলো আঁধারের অচেনালোকে সেখানে বিকট শব্দে বোমা ফেটে পড়ছে ফুলঝুরির মতো, ছুরির নীল উজ্জ্বল ফলার মতো রিভলভারের ছুটন্ত আগুন ; ফাঁসিকাঠ রঞ্জু দেখেনি—তবুও সে চিনতে পারছে ফাঁসির দড়িতে দুলছে উজ্জ্বল কয়েকটি জ্যোতির্ময় মূর্তি—ওরা কারা ? ক্ষুদিরাম ? সত্যেন বসু ? কানাইলাল ? বীরেন গুপ্ত ?

এই ভোনা, এই কালী, খাঁদু আর পূর্ণ—এরা সে অপূর্ব ছায়ালোকের কল্পনাও করতে পারে না। নিতান্ত নীচুতলার জীব এরা, এরা করুণার পাত্র। রঞ্জু বললে, মাপ করতে হবে ভাই, ও সবের মধ্যে আমি নেই।

—অঃ ?—গালের পাশ দিয়ে জিভ বের করে ভেংচে দিলে ভোনা, পিট্‌পিট্ করে উঠল শয়তানী-ভরা চোখদুটো। চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, থাকো বাবা, ঘরে বসে গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাও। চলে আয় খাঁদু, ওই গঙ্গা-ফড়িংটাকে দিয়ে কাজ হবে না।

দলটা চলে গেল। যেতে যেতে উচ্চৈস্বরে গান ধরলে ভোনা :

> 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
> সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।
> আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে—

খাঁদু চীৎকার করে উঠল, এন্‌কোর, এন্‌কোর !

ইস্কুল ছুটি। দুপুরে নিঃসাড় পায়ে রঞ্জু বেরিয়ে এল খিড়্‌কি দরজা দিয়ে, এসে বসল ঠাণ্ডা ছায়ায় ঘেরা পাখিডাকা নির্জন ছাইগাদাটার পাশে। বই দুটো সঙ্গে করে এনেছে, আর এনেছে খাতা পেনসিল। খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল রেললাইনের কালো রেখা দুটোর দিকে, মোটা মোটা পাতার আড়ালে গাঢ় সবুজ উজ্জ্বল কচি বাতাবীগুলোর দিকে, যেখানে আমগাছে মোটা একটা লতার সঙ্গে পাকা একটা লাল টুকটুকে বন-কাকুড় দুলছে, তার দিকে। তার পর পেন্‌সিলের পেছনটাকে কামড়ালো খানিকক্ষণ, গোটা কয়েক দাঁতের দাগ ফেলল, খাতার মলাটে এলোমেলোভাবে একটা পাখি আঁকল, সেটা হাঁস আর ময়ূরের মাঝামাঝি একটা প্রাণী, নিজের নামটা জড়ানো ইংরেজিতে সই করবার চেষ্টা করলে বারকতক, তারও পরে লিখতে শুরু করল।

কতক্ষণ লিখেছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ পেছনে শুনল হাসির শব্দ। কেমন ভয় করল, থর থর করে কেঁপে উঠল হাতটা, পেন্‌সিল গড়িয়ে পড়ল নীচে।

আর কে ? পরিমল। এমনি করে চমক লাগিয়ে দিতেই ভালোবাসে।

সেই পরিচিত উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত পরিমলের মুখ। বললে, ধরে ফেলেছি।

খাতাটা রঞ্জু লুকোবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু এর মধ্যেই সেটাকে ঝাঁ করে ছিনিয়ে নিয়েছে পরিমল। তার পর দু পা দূরে সরে গিয়ে, যাতে রঞ্জু কেড়ে নিতে না পারে, পরিমল পদ্য পড়ার বিশ্রী ঢংয়ে পড়তে আরম্ভ করল : 'কানাইলাল'।

—'কানাইলাল ?'—বিস্মিত দৃষ্টি রঞ্জুর মুখের ওপরে ফেলল পরিমল : কানাইলালকে নিয়ে তুই কবিতা লিখছিস কেন রে ?

—যদি লিখি তো তোমার কী। খাতাটা ফেরত দাও।

—দাঁড়া, দাঁড়া, ভারী ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।—পরিমল আরম্ভ করল :

> মৃত্যুর রূপ এত সুন্দর এ কথা জানিনি আগে,
> চিরচঞ্চল প্রাণের লীলায় মত্ত-পিনাকি জাগে।
>
> বেদনা-বিহত কাজল নয়নে
> বিদ্যুৎশিখা হেরি ক্ষণে ক্ষণে
>
> একটি মানবে যুগমানবের মূর্ত প্রতীক হেরি,
> মৃত্যুর মাঝে বাজায়ে গেলে সে সত্যের জয় ভেরী।

আরে, আরে!—পরিমলের কৌতুকভরা সরসকণ্ঠ হঠাৎ শ্রদ্ধা আর মুগ্ধতায় নিবিড় হয়ে উঠল : এ যে সত্যিকারের একজন নারব কবিকে আবিষ্কার করা গেল। এত ভালো তুই লিখতে পারিস তা তো জানতুম না। বলতুম টুক্‌লি করেছিস, কিন্তু তাও তো বলতে পারি না। কারণ কানাইলালকে নিয়ে কেউ আজ পর্যন্ত কবিতা লেখেনি, এ ব্যাপারে তুই-ই বাংলার প্রথম কবি।

রঞ্জু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, থাক, রেখে দে।

—রেখে দেব কি রে! এ যে আবিষ্কার!

> শস্য শ্যামলা বাংলা মায়ের স্নেহ-অঞ্চলতলে,
> রুদ্র বিষাণ উঠেছে বাজিয়া, খড়্গ উঠেছে জ্বলে !

এই সব কচি কিশোরের প্রাণে
আছিল সুপ্ত কোথা কোন্‌খানে
ধ্বংসের হেন উগ্র পিপাসা বহ্নির এই জ্বালা,
রচিল কেমনে বুকের রক্তে মায়ের বরণ-মালা !

না, এ কবিতা জোরে পড়া যাবে না।—পরিমল নীরবে লেখাটার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেল। পড়া যখন শেষ হল, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে চুপ করে রইল সে, কোনো কথা বললে না, ভালো মন্দ কোনো মন্তব্যও করলে না। মাটি থেকে একটা চোরকাঁটার শিষ তুলে নিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তুই যা লিখেছিস তা কি তুই বিশ্বাস করিস্ রঞ্জু ?

—কেন করব না ?

পরিমল ছোট্ট করে হাসল : ঠিক তা নয়। বই দুটো তুই পড়েছিস তা বুঝতে পারছি। কিন্তু হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খানিকটা লিখে যাওয়া এক জিনিস, আর তাকে মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা একেবারে আলাদা ব্যাপার। এ সব উচ্ছ্বাসের কোনো দাম নেই, কাজের বেলায় দেখা যায় সবটাই ফাঁকি।

পরিমলের বলার ধরণের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যাতে অপমানিত বোধ করলে রঞ্জু, তেতে উঠল মন। হঠাৎ শিরদাঁড়াটা সোজা করে বললে, তোকে কে বললে এর সবটাই উচ্ছ্বাস ?

—না, এম্‌নি।—পরিমল কথাটাকে ঘুরিয়ে নিলে, থাক ও-সব। কেমন লাগল বই দুটো ?

ক্ষুণ্ণ স্বরে রঞ্জু বললে, চমৎকার। আর বই নেই এ রকম ? সেই 'পথের দাবী !'

—আছে, সবই আছে। দেব আস্তে আস্তে। কিন্তু পরিমল আবার ঘুরিয়ে নিলে কথাটাকে : আজ বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবি রঞ্জু ?

—কোথায় ?

—পুব পাড়ার আমাদের একটা জিম্‌নাষ্টিক ক্লাব আছে, লাইব্রেরীও আছে। নাম 'তরুণ সমিতি।'

ক্ষুদিরাম কানাইলালের সঙ্গে যে মন আকাশ গঙ্গার মায়াস্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তার 'তরুণ সমিতি'র পরিণতি রঞ্জুর ভালো লাগল না। নিরুৎসাহিত গলায় বললে, কী হয় সেখানে ?

—এক্‌সারসাইজ হয়, বক্সিং হয়, লাঠি আর ছোরা খেলা শেখানো হয়। তা ছাড়া লাইব্রেরীতে অনেক ভালো ভালো বই আছে, তুই তো পড়তে ভালোবাসিস।

রঞ্জুর আগ্রহ আবার সজাগ হয়ে উঠল : এ সব বই পাওয়া যাবে ? এই ফাঁসির ডাক, এই শহীদ সত্যেন ?

—পাগল নাকি রে ? কী ছেলেমানুষ তুই !—পরিমল হাসল : এ সব যে বাজেয়াপ্ত বই। এ সমস্ত বই রাখলে পুলিশে ধরবে না ?

—বাজেয়াপ্ত বই !—বইগুলো যে সাধারণ নয়, তা তো পড়েই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু 'বাজেয়াপ্ত' কথাটা—আর তার সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগের উল্লেখ শুনে যেন সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করে উঠল তার।

পরিমল মিটিমিটি হাসল : হ্যাঁ বাজেয়াপ্ত বই।

—তবে এ সব বই তুমিই বা পেলে কোথায় ? তুমিও কি পুলিশকে ভয় করো না ?

—চুক্—জিভে আর তালুতে মিলিয়ে হতাশভরা একটা শব্দ করলে পরিমল : তুই একেবারে হোপ্‌লেস। বড্ড বেশি তোর কৌতূহল। এত সহজেই কি সব কথা জানা যায়—না জানতে দেওয়া যায় ? ধৈর্য ধরতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়, তৈরী করে নিতে হয় মনকে। সে সব হবে পরে। কিন্তু একটা কথা তোকে বলি রঞ্জু। এ সব কবিতা যদি লিখতে হয় তা হলে সামলে চলিস। এ সব বই পড়া যতটা অন্যায়, এ রকম কবিতা লেখাও তার চাইতে কম অন্যায় নয়।

মুখ গোঁজ করে রঞ্জু বললে, আমি কাউকে ভয় করি না।

পরিমল বললে, বোকার মতো কথা হল যে। এ তোর অহিংস খদ্দর-মার্কা ব্যাপার নয় যে হৈ চৈ করতে করতে জেলে যাবি আর কাশীর ষাঁড়ের মতো ফুলের মালা চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে আসবি। সি-ই-ডির ঘা কতক হাণ্টার, আর হাতের নোখে গোটা কয়েক পিন্ ফুটলেই বুঝতে পারবি কত ধানে কত চাল বেরোয়।

রঞ্জু চুপ করে রইল। কল্পনার ছায়াপথের আশে পাশে আরো কতগুলো নতুন জিনিসের আভাস পাচ্ছে মন। কিছু একটা প্রায় বুঝতে পারছে, অথচ ধরতে পারছে না। মনের এ অবস্থাটা সব চেয়ে অসহ্য।

পরিমল উঠে পড়ল।

—বই দুটো তো পড়া হয়ে গেছে, আমি নিয়ে চললাম।

—নতুন বই ?

—পরে দেব। আর ভালো কথা, যাবি তুই আজকে আমাদের ক্লাবে ? ঘণ্টা দেড়েক পরে ডাকতে আসব ?

—আসিস।

পরিমল চলে গেল। পেন্‌সিল মুখে দিয়ে রঞ্জু ভ্রূকুটি-ভরা চোখে নিরীক্ষণ করতে লাগল সন্তরচিত কবিতাকে ? এ কি সত্যিই একটা সাময়িক আবেগ, না রক্তে রক্তে শিকড় মেলে দেওয়া দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ একটা প্রতীতি ? (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-টি

ফরাসী পণ্ডিত যখন রাজা হবুচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, তাঁর "হিং টিং ছট্‌" এর স্বপ্নটা 'শুধু স্বপ্নমাত্র', তার অর্থ বিশেষ কিছু নাই, তখন সভাজন তাঁহাকে ধিক্ ধিক্ করিয়া উঠিল ; তাহারা বলিল—

> "স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন মাত্র মস্তিষ্ক বিকার,
> এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার ?
> জগৎ বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ" জাতি
> স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে ! দুপুরে ডাকাতি !

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গ শুনিয়া আমরা হাসি বটে, কিন্তু স্বপ্নটাকে আমরাই কি সহজে "মস্তিষ্ক বিকার" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি ?

তাই যদি হইবে তাহা হইলে আত্মীয়ের রোগ-মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন দেখিলে আমরা অত বিচলিত হইয়া পড়ি কেন ? তিথি-বিশেষের সু-স্বপ্ন দেখিলে উল্লসিত হই কেন ? স্বপ্নাদ্য মাদুলী, স্বপ্নাদ্য ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই কেন ? স্বপ্নাদেশ পাইয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেই কেন ?

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ইহা হয় মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বশতঃ। যাহারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যের দম্ভ লইয়া সব জিনিষকেই যাহা হউক একটা ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহাদের কথা বাদ দিয়া দেখি বহু প্রাচীনকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ছোট বড় অনেকেই এই জিনিষটি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং এ জিনিষটার গুরুত্ব যে একেবারেই নাই, তাহা বলিতে পারি না এবং স্বপ্ন সম্বন্ধে পাঁচ জনে কি বলে তাহাও জানিয়া রাখা মন্দ নয়।

কেহ কেহ বলেন, স্বপ্নে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরীক্ষান্তে হয়ত স্বপ্ন দেখিলাম পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছি। কিছু দিন পরে যখন ফল বাহির হইল তখন দেখা গেল কথাটা মিথ্যা নয়—। এ ক্ষেত্রে স্বপ্ন সত্যের নির্দ্দেশ দেয় বটে, কিন্তু এ জাতীয় স্বপ্ন হইতে কোনও সত্যের বা তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না ; কারণ স্বপ্ন যে শুধু ভবিষ্যতের কথাই বলে তাহা নহে, ইহাতে অতীতের কথাও মাঝে মাঝে থাকে এবং অসম্ভব ও অসঙ্গত কথাও থাকে। আমি যদি স্বপ্নে দেখি যে আমি পাখী হইয়া উড়িতেছি, তাহা হইলে এই বুঝিব না যে এই উড়িবার ব্যাপারটা আমার একটা ভাবী ক্ষমতার নির্দ্দেশ দিতেছে।

এই জন্য এক জাতীয় পণ্ডিত শরীরতত্ত্ব ও অনুষঙ্গ (association) দ্বারা সমস্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন—ভিজা জামা বা কাপড় পরিয়া নিদ্রা যাইলে হয়ত জলে ডুবিয়া যাইবার স্বপ্ন দেখিব, শুইবার সময় হাত পা খাটের বাহিরে ঝুলিয়া থাকিলে হয়ত স্বপ্ন দেখিব ছাদ হইতে পড়িয়া যাইতেছি, বুকে সর্দ্দি বসিলে হয়ত স্বপ্ন দেখিব কেহ আমাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি।

আমাদের অনেক স্বপ্নকেই এই জাতীয় একটা ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝান যাইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা রাজা হবুচন্দ্রের হিং টিং ছট্ এর স্বপ্নের কথাটি ধরিতে পারি। হবুচন্দ্র স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—তাঁহার শিয়রে বসিয়া তিনটি বাঁদরে 'পরম আদরে' উকুন বাছিতেছিল এবং একটু নড়িলে চড়িলেই তাহারা তাঁহার গালে চড় মারিতেছিল, এমন সময় কোথা হইতে এক বেদে তাঁহাকে তাহার পোষা পালান-পাখী মনে করিয়া দাঁড়ে বসাইয়া দিল এবং কোথা হইতে এক থুড়থুড়ি বুড়ি আসিয়া তাঁর পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে লাগিল। রাজা মুসকিলে পড়িলেন ; পায়ে সুড়সুড়ি লাগে, পা দুটি তুলিতে চাহেন, তাও পারেন না ! এ জাতীয় স্বপ্নও আমরা কম দেখি না—ইহাদের সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দিব ?

অনুষঙ্গবাদী পণ্ডিতেরা অনেক কথাই বলিবেন। তাঁহারা বলিবেন হবুচন্দ্রের স্বপ্নে যে বাঁদর হইতে বেদে এবং বেদে হইতে বুড়ির দিকে তাঁহার চিন্তা-স্রোত মোড় ফিরিয়া চলিয়া গেল তাহার একটা সঙ্গত কারণ আছে। একজন সংবিষ্ট (hypnotised) লোককে যদি বলা হয় "তুমি ইঁদুর হইয়া গিয়াছ" তাহা হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে লোকটি সত্য সত্যই ইঁদুরের মত ঘরের কোন ধরিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। কেন এমন হয় ? তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, সুস্থ জাগ্রত অবস্থায় আমাদের

মূল মস্তিষ্কের (cerebrum) কাজ ঠিক থাকে বলিয়া আমরা সাবধান থাকি। কাজেই তখন যদি আমাকে বলে আমি ইঁদুর হইয়া গিয়াছি, তৎক্ষণাৎ বিচার বুদ্ধি দিয়া আমি বুঝিতে পারিব যে আমি ইঁদুর নই, সুতরাং "তুমি ইঁদুর হইয়া গিয়াছ" এই জাতীয় নির্দেশ (suggestion) আমি মানিয়া লইব না। কিন্তু সংবিষ্ট অবস্থায় আমাদের মূল-মস্তিষ্কের ক্রিয়া ঠিক থাকে না বলিয়া এই জাতীয় নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া আসে না, ফলে আমাকে কেহ ইঁদুর বলিলে আমি সত্যই নিজেকে ইঁদুর বলিয়াই মনে করি ও তদনুরূপ আচরণ করিতে চেষ্টা করি।

স্বপ্নের সময় এই জাতীয় একটা ব্যাপার হয়। তখন মূল মস্তিষ্কের কার্য্য খানিকটা বন্ধ থাকে, ফলে অনুষঙ্গ (association) আমাদের চিন্তাগুলিকে যেভাবে ইচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং আমরা তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার না করিয়া, সম্ভাব্যতা বিচার না করিয়াই তাহাতে সায় দিই।

জিনিষটা এইভাবে হয়—

হয়ত আমি একদিন নৌকা করিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছিলাম তখন আমার নৌকায় একটি ছাগ শিশু এবং তাহারই অনতিদূরে একটি সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিল। এই ছাগ শিশুর সহিত সুন্দরীর অনুসঙ্গ আমার মনের মধ্যে গাঁথিয়া গেল। পরে একদিন হঠাৎ একটি বৃহৎ কুৎসিৎ রামছাগল দেখিয়া আমার হয়ত একটি সুন্দরীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। ছাগলের সহিত সুন্দরীর কি সম্পর্ক তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবে না ; কিন্তু এই দুটির মধ্যে আমার মনে হয় যে, একটু অনুষঙ্গের বন্ধন তৈয়ারি হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য্য।

এই অনুষঙ্গ-প্রচেষ্টা নিয়তই একটা জিনিষের সঙ্গে আর একটা জিনিষকে জোড়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু জাগ্রত বুদ্ধি তাহাদের সবগুলিই মানিয়া লয় না। স্বপ্নের সময় এ সতর্কতা থাকে না, ফলে স্বপ্নে যদি কেহ দেখে লর্ড ওয়াভেল্ ছেঁড়া লুঙ্গি পরিয়া তাহার বাড়ীতে ঘরামির কাজ করিতেছে তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহাকে পাগল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এমন কোনও কারণ নাই। কারণ লর্ড ওয়াভেলের সহিত যে ছেঁড়া লুঙ্গি অথবা ঘরামিগিরির কোনও সম্পর্ক নাই, এটুকু বিচার করিবার মত পাকা অফিসারটি নিদ্রার সময় তাহার মাথার হেড্ কোয়ার্টারে কর্ম্ম নিরত ছিল না।

এই জাতীয় ব্যাখ্যায় বুঝান যাইতে পারে—হবুচন্দ্রের স্বপ্নটির মধ্যেও এই অনুষঙ্গের অবাধ জোড়া-তালির ব্যাপার আছে।

কিন্তু অনুষঙ্গ কি নিতান্ত অকারণেই এই সমস্ত জোড়া তালির ব্যবস্থা করে ? একটা জিনিষকে ছাড়িয়া যে আর একটাকে বাছিয়া লয়, ইহার মধ্যে কি ইচ্ছা-শক্তির লীলা নাই ?—নিতান্ত অকস্মাৎ ত কোন জিনিষ ঘটে না—তাহা হইলে স্বপ্নের মধ্যেই বা তাহা হইল কেন ?

সেইজন্য ফ্রয়েড্ বলেন সমস্ত স্বপ্নের মধ্যেই ইচ্ছার ইঙ্গিত আছে। যখন আমরা কোনও জিনিষ পাইতে চাই অথচ পাই না তখন স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহাকে পাইতে চেষ্টা করি। সেইজন্যই পূজার সময় ছেলেরা স্বপ্ন দেখে নূতন জামা কাপড়ে ঘর বোঝাই হইয়া গিয়াছে, দরিদ্র লেখক দেখেন কাগজ ওয়ালা, সম্পাদক অযাচিতভাবে তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন লেখার জন্য টাকা পাঠাইয়া দিতেছেন—আর কেরাণী দেখে "বোনাস্" বা "ইন্‌ক্রিমেন্ট্"এর স্বপ্ন।

একটি ছাত্র কয়েক মাস বাড়ীতে পড়িয়া পরীক্ষান্তে টিউসনির টাকাটা না দিয়া পলাইয়া গেল। দরিদ্র মাষ্টারির জীবনে এই হিসাবের টাকাটা না পাওয়াতে পারিবারিক বাজেটে ঘাটতি পড়িল। এমন সময় মাষ্টার-গৃহিণী স্বপ্ন দেখিলেন—ছেলেটি বাড়ীতে আসিয়া টাকা কয়টি দিয়া গেল। বলা বাহুল্য—এটি ভোরের স্বপ্ন হওয়া সত্ত্বেও সফল হয় নাই।

এ জাতীয় স্বপ্নের সহিত আমাদের শরীর তত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নাই। এগুলি আমাদের অসম্পূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করে মাত্র।

ফ্রয়েড্ বলেন—স্বপ্ন মাত্রেরই এই গুণ আছে। সমস্ত স্বপ্নই ইচ্ছা-পরিপূরক। তবে ঠিক যেটি বা যেমনটি আমরা করি ঠিক সেটি হয়ত স্বপ্নে পূর্ণ হয় না।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটে—

ফ্রয়েড্ বলেন মানুষের মনের মধ্যে তিনটি শক্তির লীলা চলিতেছে। প্রথম শক্তিটি হইতেছে ইদ্ (Id)। ইহা হইতেছে জীবনের মূল প্রেরণা, যাহা দিয়া জাতক কামাদি ভোগের দ্বারা নিজের তৃপ্তির চেষ্টা করে। ইহা নীতি-জ্ঞানের ধার ধারে না, সমাজ, আদর্শ, পরিবেশ প্রভৃতিকেও স্বীকার করে না। দ্বিতীয় শক্তিটি হইতেছে অহম্ (Ego) যাহা পরিবেশ, আদর্শ প্রভৃতির সহিত ইদ্ এর দাবীর একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করে। আর তৃতীয় শক্তিটি হইতেছে অধিশাস্তা (Super-ego)। ইহা অভিভাবক স্থানীয় হইয়া নীতির শাসনে মানুষের 'ইদ্'এর দাবীগুলিকে শাসিত করে। ইহার কাজ 'ইদ্'এর ঠিক বিপরীত।

এখন ইদ্এর অন্যায় কামনা যদি মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া প্রতিনিয়ত তাহার দাবী জানাইতে থাকে তাহা হইলে অধিশাস্তা সেই কামনাকে অবদমিত করিয়া মনের নির্জ্জন স্তরে তাহাকে নির্ব্বাসিত করে।

কামনা ও নীতির বিরোধে মন যখন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠে এবং কামনার উত্তাপে মনের মধ্যে একটা জট (Complex) সৃষ্টি হইয়া যখন মানুষকে পাগল করিবার চেষ্টা করে, তখন "অহম্" এই দুইটি বিরোধী শক্তির মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা করে। সে তখন স্বপ্নের মধ্য দিয়া এই অপূর্ণ-কামনাকে খানিকটা তৃপ্তি দেয়।

হয়ত একটি যুবক এমন একটি নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিয়াছে—যাহার সহিত মিলন নীতির দিক দিয়া অনুমোদিত হইল না। এ অবস্থায় অধিশাস্তা মন নিশ্চয়ই সেই কামনাটিকে নির্জ্জন স্তরে দাবাইয়া দিবে। কামনাটি তখন অবদমিত হইল বটে, কিন্তু মরিল না এবং তাহার দাবীও গেল না। বাস্তবজীবনে যে আশা পূর্ণ হইবার নয়, স্বপ্ন দিয়াও যাহাতে তাহা পূর্ণ হয় সে চেষ্টা তখন "অহম্" করিতে লাগিল। কিন্তু স্বপ্নের দ্বারদেশেও অধিশাস্তার (Super-ego)

প্রহরী (Censor) বসিয়া আছে। যুবকটি যখন স্বপ্নে তাহার বাঞ্ছিত নারীর সহিত মিলনের ছবি দেখিতে চাহিল, প্রহরী মহাশয় তখন তাহা অনুমোদন করিলেন না। শেষ পর্য্যন্ত যুবকটি স্বপ্ন দেখিল, একটি সুন্দর কুকুরকে সে বুকে জড়াইয়া আদর করিতেছে। প্রহরীর (Censor) চ'খে ধূলা দিয়া 'অহম' এইভাবে প্রিয়াকে রূপান্তরিত করিয়া তাহার অপূর্ণ কামনাটিকে পূর্ণ করিল।

ফ্রয়েড্ বলেন, স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাপূরক। অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূর্ণ করিয়া, অনেক সময় দুখের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া মনের জট্ ও অন্তর্বিরোধ নিবারণ করিয়া স্বপ্ন আমাদের মনের সুস্থতা আনয়ন করে।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? স্বপ্ন যদি ইচ্ছা-পূরকই হইল তাহা হইলে আমরা এমন স্বপ্ন দেখি কেন যাহা কোনও দিনই আমরা ইচ্ছা করিতে পারি না! প্রিয়তম আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যু, আকস্মিক বিপদ্ প্রভৃতির দুঃস্বপ্নও ত আমরা দেখি। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে আমাদের প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু প্রভৃতিই আমরা কামনা করিয়া থাকি?

ফ্রয়েড্ বলেন—না। প্রিয়তম আত্মীয়ের মৃত্যু হয়ত কামনা করি না। তবে স্বপ্নে যাঁহার মৃত্যু দেখিলাম তিনি হয়ত ছদ্মরূপে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন;—হয়ত অফিসের বড়বাবু, হয়ত ক্লাশের শ্রেষ্ঠ ছাত্র,—যে সরিয়া গাইলে আমাদের উন্নতির পথ অধিক প্রশস্ত হইবে। স্বার্থপর মন দিয়া হয়ত আমরা ইহাদের মৃত্যু কামনাই করি—আর নীতি-নিষ্ঠ অধিশাস্তা মন তাহাতে বাধা দেয়। তখন স্বপ্ন আসিয়া আমাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দেয়। পাপ করিলে বা অন্যায় কার্য্য করিলে অধিশাস্তা মন যেমন অনুতাপ দিয়া, অনুশোচনা দিয়া আমাদের শাস্তি দেয় তেমনই এই জাতীয় দুঃস্বপ্ন দিয়া ইদ্ এর স্বার্থপর দাবীর জন্য আমাদের শাস্তি দেয়।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যার জন্য কতকগুলি প্রতীকের সাহায্য লওয়া হয়। যথা রাজা হইতেছে পিতার প্রতীক, রাণী মাতার প্রতীক,—সাপ কলম প্রভৃতি পুং জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক,—বাক্স দোয়াত প্রভৃতি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই প্রতীকগুলি সার্ব্বজনীন হইতে পারে না; দেশ, কাল, পাত্র এবং পরিবেশ বিশেষে প্রতীকগুলির বিভিন্ন অর্থ হওয়াই সম্ভব।

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব স্বপ্নতত্ত্বের উপর অনেকখানি নূতন আলোকপাত করিয়াছে সত্য; স্বপ্নের দ্বারদেশে প্রহরীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটি অন্য একটি জিনিষের ছদ্মরূপ হইতে পারে তাহা স্বীকার করিয়া ফ্রয়েড্ আমাদের মনের অনেক গোপন কথার আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তবু আমাদের মনে হয় এই সমস্ত আধিভৌতিক ব্যাখ্যা ছাড়া ইহার একটা আধিদৈবিক ব্যাখ্যাও থাকিতে পারে। এমন অনেক স্বপ্ন আমরা কখনও কখনও দেখি যাহা জড়বিজ্ঞান দিয়া ঠিক বুঝান যায় না। ভক্তেরা স্বপ্নের মধ্যে যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির পরিচয় পায় জড়বিজ্ঞান তাহার সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দিবে? মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবনে অবস্থান কালে দেখিলেন, শ্যামবর্ণের একটি কিশোর গোপাল বালক এক ভাঁড় দুধ দিতে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া মাধবেন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল ব্রজের গোপাল শ্রীকৃষ্ণের কথা। রাত্রে মাধবেন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন—সেই গোপাল বালক বলিতেছেন—"আমি অন্নকূট পর্ব্বতে গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রোথিত আছি, যবনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণ আমাকে এই স্থানেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল; আমি এতদিন তোমার জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছি, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা কর।" মাধবেন্দ্র তখন স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে গমন করিয়া সত্যসত্যই গোপালের মূর্ত্তিটিকে আবিষ্কার করিলেন এবং বৃন্দাবনে নূতন করিয়া গোপালজীকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনেক ভক্ত সাধু লোক এই জাতীয় স্বপ্ন দেখেন এবং তাহাতে প্রতীক্ষাতীত অতীন্দ্রিয় জিনিষের সন্ধান পান। তাঁহাদের এই সমস্ত স্বপ্নের গল্পগুচ্ছগুলি যে মিথ্যা, তাহা ভাবিতেও সাহস হয় না; সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা কোন স্বার্থের জন্য মিথ্যা গল্প প্রচার করিবেন?

জড়বিজ্ঞান এ জাতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা এখনও দিতে পারে নাই।

কথা নয় কথা নয়

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ওগো কথা নয় কথা নয়
আঁখিতে আঁখিতে অলস-বিভল
ভাষাহীন পরিচয়।

আঁখি তুলি' শুধু মোর পানে চাও
আন কথা আজ সব ভুলে যাও;
মরম নিঙাড়ি' দাও ঢেলে দাও
সঙ্গীত প্রাণময়!
কথা নয়, কথা নয়।

নব অনুরাগে অন্তরলোকে
পিয়াসী মনের আশা
চকিত চমকে উঠিল ফুটিয়া
বুকভরা ভালবাসা!
জেগে ওঠে তবু কোন্ মরমিয়া
কেঁদে মরে তাই বিরহীর হিয়া;
প্রাণে প্রাণে আর চোখে চোখে আজি
হৃদয়ের বিনিময়—!
কথা নয় কথা নয়।

পরবর্ত্তী রাজাদের কথা বলে কোনও লাভ নেই। ১৮৭৩ অব্দ থেকে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পর পর যে চারজন ব্রিটীশের একান্ত বশম্বদ নৃপতি ছিলেন। যাকে বলে তাশের গোলাম। আমরা যাঁর অতিথি হবার সৌভাগ্য
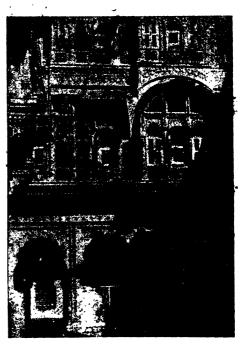
জেনানা মহল—(বহির্ভাগ)

জেনানা মহল—(ভিতর দিক)

রাজা যোধপুরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছেন তাঁরা সকলেই প্রায়—কম বেশ ইংরাজের অনুগত ও বিলিতী সভ্যতামুগ্ধ লাভ করেছিলুম তাঁর মধ্যে ইদানিং বেশ একটা পরিবর্ত্তন আসছিল এবং তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিছুটা ভারতীয়

তাব অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা এখানে চলে আসবার কয়েক মাস পরেই তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে।

তদানীন্তন যুবরাজ শ্রীহানোয়াৎ সিং সাহেব—বর্ত্তমানে যিনি যোধপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তাঁর যতটুকু পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম তাতে আশা হয় যে ভারতের প্রতি এঁর অনুরাগ কারুর চেয়ে কম নয় এবং

যোধপুরের পথে (উষ্ট্র পৃষ্ঠে নবনীতা)

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মকে ইনি অস্বীকার করেন না এবং কালের হাওয়ার প্রতি ইনি অন্ধ হয়ে বা মুখ ফিরিয়ে বসে নেই। যে কোনও মুহূর্তে তাঁর রাজবেশ ফেলে দিয়ে তিনি জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়াবার মতো মনোবল ও সহজ বুদ্ধি রাখেন।

এঁদের সঙ্গে নিম্নলিখিত রাজা মহারাজাদের আত্মীয়তাও বিবাহসূত্রে কুটুম্বিতা আছে—উদয়পুর, জয়পুর, যশলমীর, রেওয়া, বুন্দি, সিরোহী, নর্সিংগড় ও জামনগর। রাঠোর বংশের ছেলেরাই রাজত্ব করছে বীকানির, কিষেণগড়, ইদার, রাতলাম, সীতামাও, শৈলানা ও ঝাবুয়ায়।

এঁরা নিজেদের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলে প্রচার করেন। এঁদের কোন পূর্ব্বপুরুষ নাকি অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়ে এখানে এসে বাস করেছিলেন। এসব কিম্বদন্তিকে অবশ্য ইতিহাসের মর্য্যাদা দিতে বলি না,

অস্ত্রাগারের সম্মুখে (অস্ত্রাগারের প্রহরীর হাতে যে প্রচণ্ড তরবারিখানি দেখা যাচ্ছে আমরা দুহাতে এখানি ধরে তুলতে পারিনি—এত ভার। কিন্তু যোধপুর নৃপতি মল্লদেব নাকি এখানি একহাতে তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতেন।)

তবে যা শুনে এসেছি তাই জানাচ্ছি। 'মেবার' বা 'মাড়ওয়ার' শব্দের উৎপত্তি 'মরুবর' অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ মরুভূমি' কথাটা থেকে কিনা ভাষাতত্ত্ববিদেরা সেটা বলতে পারবেন। রামায়ণের নজীর দেখিয়ে এঁরা বলেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করেন, তখন রামেশ্বরে এসে তিনি সমুদ্রের কাছে বাধা

পান। তখন সমুদ্র শাসনের জন্ত তিনি ধনুতে এক প্রচণ্ড অগ্নিবাণ সংযোগ করেন। সেই অগ্নিবাণের শক্তিতে সপ্ত সাগরের জল নিঃশেষে শুকিয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল, তাই সিন্ধুপতি বরুণদেব আবির্ভূত হয়ে বহু স্তব-স্তুতির দ্বারা
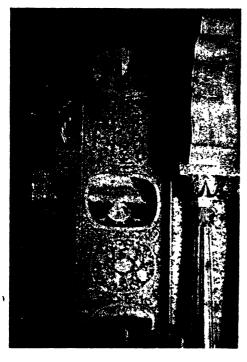
প্রমোদ ভবনের ভিত্তি গাত্রের ও স্তম্ভের কারুকার্য্য

প্রমোদ ভবনের স্বর্ণালঙ্কৃত চন্দ্রাতপ—(ধারে ধারে রাজা রাণীদের মিনা-করা রঙীণ ছবি)

রামচন্দ্রকে শান্ত করেন। কিন্তু লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট শর তাঁর পক্ষে সম্বরণ করা অসম্ভব, কারণ নিক্রান্ত শর ফিরিয়ে নিয়ে আর তূণে তোলা নাকি বীরের ধর্ম্ম নয়। দাক্ষিণাত্যের উত্তর পশ্চিম কোণে রামচন্দ্র সেই শর ত্যাগ করেন। ফলে বিরাট জলশূন্য 'থর' বা 'থার' মরুভূমির সৃষ্টি হয়। হয়ত 'পাথার' শব্দেরই অপভ্রংশ 'থার'—ভাষাবিজ্ঞানবিদ্ বন্ধুবর সুনীতিবাবু সেটা বলতে পারবেন। আমার বিদ্যায় কুলোবে না।

যোধপুরে লোকসংখ্যা ২২ লক্ষের মধ্যে। পরিধি কিঞ্চিদধিক ৩৬০০০ বর্গ মাইল। শতকরা ৮৬জন অধিবাসী হিন্দু, আটজন মুসলমান, জৈন জন পাঁচ ছয়ের বেশী নয়।

যোধপুর দুর্গের ভিতর প্রাসাদের কারুকার্য্য—(বহির্ভাগ)

কাজেই, যোধপুরের সামরিক শক্তি অহিংসার অমৃত সেবনে পঙ্গু হ'য়ে পড়েনি। রাজপুতানার মধ্যে যোধপুর রাজ্যই নাকি সবচেয়ে বিশাল! এর উত্তরে বিকানীর, উত্তর পশ্চিমে যয়শলমীর, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যথাক্রমে সিরোহী ও পালপুর রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকে উদয়পুর ও আজমীর, মাড়ওয়ার ও কিষণগড় এবং উত্তর পূর্ব্বে জয়পুর রাজ্য।

জমী ভাল নয়। বিশেষতঃ পশ্চিম দিকটা বালি ভরা। পুবের মাটি অনেকটা উন্নত। উর্ব্বরাও বলা যায়। আব-হাওয়া, শুষ্ক ও উত্তপ্ত। বারিপাত সামান্য। শস্যের মধ্যে বাজ্‌রাই প্রধান

পাঠানবীর শেরশাহ' একবার মাড়োয়ার জয় করতে এসে কোনও মতে প্রাণ নিয়ে পালান। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন—"আরে তোবা! ও আবার একটা দেশ? এক মুঠো বাজরার জন্য আমার হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্য হারাতে বসেছিলুম আর একটু হলে!"

কিন্তু কালের গুণে, সুশাসনের ফলে, শিক্ষার বিস্তারে, আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই একমুঠো বাজ্‌রার দেশ যোধপুরের মরুভূমিতে আজ সোনা ফলছে। যোধপুরের বার্ষিক আয় এখন প্রায় দেড় কোটি টাকার কাছাকাছি। কৃষি ছাড়া যোধপুরের শিল্পও উল্লেখযোগ্য। মাকরানার মার্বেল পাথরের কাজ, বাগরির গালার রং করা কাঠের কাজ, মার্তার হাতী-দাঁতের কাজ, বোরাবারের তাঁতে বোনা সূক্ষ্ম বস্ত্র, আর খাস্ যোধপুরের সুন্দর রং করা রেশমী আর সুতির কাপড় এবং পাইপারের ছাপা বাওী শাড়ী ভারতে বিখ্যাত। আমাদের হাতে বেশী টাকা ছিল না, তবু আত্মীয় বন্ধুদের জন্য যোধপুর শিল্পের—যৎসামান্য নমুনা যা এনেছিলুম তা' দেখে সবাইকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হয়েছে।
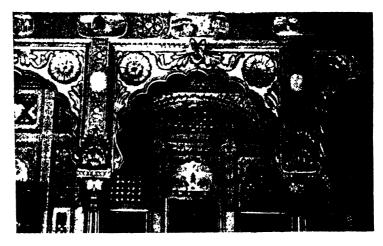
যোধপুর দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রাসাদের কারুকার্য্য—(ভিতর দিক)

প্রমোদ ভবন—(দুর্গাভ্যন্তরে)

ধর্ম্মাচরণে যাঁদের মতিগতি বেশী তাঁরাও যোধপুরে

বেড়াতে এসে একেবারে হতাশ হবেন না। এটা হিন্দুর রাজ্য সুতরাং দেবদেবীর মন্দিরের অভাব নেই। বালকিষণজীর মন্দির, ঘনশ্যামজীর মন্দির, কুঞ্জবিহারীজীর মন্দির, একেবারে বৃন্দাবন বললেই হয়! এ ছাড়া, তিজা মাঈজীর মন্দির ও দেবনাথজীর মন্দির অবৈষ্ণবদেরও ধর্ম্ম পিপাসা মেটাতে পারবে।

যোধপুরের আশে পাশে চারটি বেশ বড় বড় হ্রদ বা জলাশয় আছে—পদ্মসাগর, বাঈজী তালাও, ফতে সাগর-আর গোলাপ সাগর। নগরে পানীয় জল সরবরাহের ভাণ্ডার ছিল এরা এক সময়। অধুনা সহায়ক মাত্র।

যোধপুর দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা কিছুই বলা হয়নি এখনো। (ক্রমশঃ)

সঞ্চয়

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

বেঁচে থাকতে গেলেই বিপদ আছে এ কথা জানি, কিন্তু সেদিনের বিপদটা ভুলবার নয়। নানা কারণে তা স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

গ্রামে গ্রামে ঘোরাটা আমার চাকুরীর অঙ্গ। সেদিন সাইকেলে ফিরছিলাম—একটা মাঠের মাঝে পড়িতেই দেখি বায়ুকোণে মেঘ সঞ্চিত হ'য়েছে—ঘন কালো। দক্ষিণা বাতাস নাই—বুঝ্তে বিলম্ব হ'ল না ঝড় আসন্ন। মাঠটা পাড়ি দিতে পারলেই গৃহে ফেরা যায়।

দ্রুত সাইকেল চালাচ্ছিলাম, কিন্তু মাঠের মাঝামাঝি আস্তেই ঝড় এসে প'ড়লো—সামনে সাইকেল চালানো চলেনা, তবে দক্ষিণ-পূব কোণের রাস্তাটা ধরলে বাতাসেই নিয়ে যাবে। একটা গ্রামও দেখা যায়—অতএব তাই করলাম। সন্ধ্যারও দেরী নেই।

গ্রামের ভিতরে জনমানব বা বাড়ী নেই, অন্ততঃ চোখে পড়লো না। কয়েকটী রাখাল ছেলে আম কুড়োচ্ছে। জিজ্ঞাসা করতে বললে—পাগল ঠাকুরের শিবমন্দির আছে—ওই রাস্তা দিয়ে যাও—

কিছুদূর যেতেই বৃষ্টি এসে পড়লো—ছায়াঘন পথে, মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় অদূরে একটা মন্দিরের আভাস পেলাম। সেখানেই উঠে পড়লাম—বহুপুরাতন জীর্ণ মন্দির—জীর্ণ বাড়ী, বট-পাকুড় গাছে সমাচ্ছন্ন। একটী ঘরে মানুষ বাস করে মনে হ'ল।

বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক খড়ি তুলছিলেন। প্রশ্ন করলাম—একটু আশ্রয় পাব?

—বিলক্ষণ! পাবেন বৈকি? আসুন আসুন—সাইকেলটা বারান্দায় রাখুন। খড়ি ভিজলে ত আর উনুন জলবে না, তুলেনি—

বারান্দায় আমি সবাহন উঠে দাঁড়াতেই আকাশের বুক চিরে জল ঝাঁপিয়ে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বায়ু গাছ পালাকে ওলট-পালট করে দিতে লাগলো।

গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বারান্দায় উঠলেন, বললেন—আসুন ভিতরে। আলো আনি। বাহনটী বাইরেই থাক, ভিজতেও পারে—আবার নাও পারে—

বহুপুরাতন একটা লণ্ঠন জেলে, একখানা ছোট চৌকি এগিয়ে দিয়ে বস্তে বল্লেন। তারপর তামাক সেজে, হুঁকা টান্তে সুরু করলেন—

আমি লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে দেখছিলাম ঘরখানা—একটি লোকের যা কিছু প্রয়োজন সবই আছে ঘরে। পিছনের ভাঙাঘরে রান্না চলে—দুই একটা জিনিষ অতীত সম্পদ ও আভিজাত্যের সাক্ষ্য দেয়। খাটখানা মূল্যবান—একটী সেকালের মূল্যবান বেতের প্যাটরা—

একাকী এই বনে, একটিমাত্র লোক, বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য, কেমন ক'রে বাস করে, কেন বাস করে, ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছিল—লোকটা হয়ত রহস্যময়। হয়ত এর পিছনে ইতিহাস আছে—

বৃদ্ধ বল্লেন—ইচ্ছে করেন কি? আপনি?

—ব্রাহ্মণ। আমি তামাক খাই না।

—বেশ, তা হলে একটু চা করি, গরম হওয়া যাক্, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। খানিক হেসে বললেন—আশ্চর্য্য হচ্ছেন? চা আমি খাই—আমি যাকে বলে আপ্-টু-ডেট্ বুড়ো।

একটা তোলা উনুনে ঘটিতে চা'র জল তুলে দিয়ে বৃদ্ধ বললেন—রাত্রে খিচুড়ীই র াঁধবো। কেমন?

—কিন্তু?

—তেবে লাভ নেই। ঝড়বৃষ্টি থামবে অনেকরাত্রে, তখন সাইকেলে যাওয়া যাবে না। অতএব থাকতেই হবে, —আর এ গ্রামে এখানে ছাড়া থাকবারও জায়গা নেই। বসুন—একটু আল দেবেন। আমি ঠাকুর-বৈকালী দিয়ে আসি—

বৃদ্ধ গামছা মুড়ি দিয়ে লণ্ঠন নিয়ে চলে গেলেন মন্দিরে। আমি উনুনের আলোয় দেখলাম—সামনের দেয়াল চুয়িয়ে জল পড়ছে—কেমন যেন ভয় ভয় ক'রতে লাগলো। জীবনে যত ভূতের গল্প শুনেছি, সব মনের মাঝে কিলবিল করে আমাকে আরও ভীত ক'রে তুললো। ঘরের মেঝের মাঝে মাঝে গর্ত্ত—হয়ত সাপ আছে—ভাঙা দালানে হয়ত আরও কত কি……বাহিরে কেবল অন্ধকার—আর ঝড়ের স্বন্ স্বন্ শব্দ—কদাচিৎ বিদ্যুতের আলোয় মথিত বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা দেখা যায়—

সংশয় হ'ল—বৃদ্ধ মানুষ ত! না অশরীরী কোন…

বৃদ্ধ লণ্ঠন হাতে ফিরে এলেন। উনুনে জালটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ভয় করে নি ত?

—না।

—ভয় করবার স্থান বটে কিন্তু করে না। আমি শুদ্ধি ক'রেছি, কারও সাধ্যি নেই এদিক মাড়ায়।

মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম বৃদ্ধ সুপুরুষ—সুন্দরকান্তি, মুখে পাকা দাড়ি প্রায় নাভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বয়স অনুপাতে শরীরটা শক্ত। মেদাধিক্য নেই, কিন্তু মাংসপেশীর স্ফীতি আছে। প্রশ্ন করলাম—আপনার বয়স?

—প্রায় সত্তর হ'ল।

—একাই থাকেন?

—হ্যাঁ। সাধন ভজন করি, আর সাথীর মধ্যে বাবা বিশ্বেশ্বর।

চা প্রস্তুত হল। কলাই করা একটা কাপে চা খেলাম। বৃদ্ধ বললেন—বাবা ভোলানাথের প্রসাদ হয় কি?

ছোট কলকে আর আনুসঙ্গিক আসবাব পত্র বের করে বললেন—হ'বে?

—আজ্ঞে না!

বৃদ্ধ অকারণ খানিক হেসে নিয়ে বললেন—আমার এতে লজ্জা নেই, এটা প্রসাদ কিনা! প্রসাদ পেয়ে তারপর খিচুড়ী চাপিয়ে দেওয়া যাবে—'

বৃদ্ধের কারকর্ম্মে ক্রমশঃ ভীত হয়ে উঠছিলাম। চারপাশে তাকিয়ে আরও ভীত হ'লাম, বাহিরে ঘনীভূত কালির মত অন্ধকার, ঝড়ের একটানা শব্দ।

বৃদ্ধ যথাসময়ে রান্না চাপিয়ে এসে ব'সলেন। আমি প্রশ্ন করলাম—আপনি একা থাকেন? এ গ্রামে কি কেউ নেই আর?

—গ্রাম? গ্রাম কোথায়? এ সব ত জঙ্গল—ঐ মাঠের পারে গ্রাম আছে।

—একাই থাকেন?

—একাই—তবে এ গ্রাম ছিল—এখানে আড়াই শ' ঘর লোকের বাস ছিল। শহরের মত জম্‌জম্ করতো।

আমার কৌতূহল হ'ল—এত বড় গ্রাম নিঃশেষে এমনি জনহীন হ'ল কি ক'রে? প্রশ্ন করলাম—কিন্তু এ দশা কেন?

—হাওয়া মশাই—হাওয়া। আমাদের ছোটকালে দেখেছি, একটা ফতুয়া আর চাদর গায়ে দিয়ে ভদ্রলোক হওয়া যেত। মাঠের ধান, বিলের মাছ খাওয়া, আর নানা আমোদ-প্রমোদ করাই ছিল কাজ। কত ইতিহাস আছে গ্রামের, সে সব আজও চোখে ভাস্‌ছে—

বলতে বলতে বৃদ্ধের চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছিল, মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন অতীত তার সামনে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে।

—গ্রামের জমিদার চক্কোত্তিরা ছিল—তাদের বাড়ী ওপাড়ায়। বিজবন জঙ্গল, বাঘ ডাকে দিনে এখন। শোনা যায় পূর্ব্বপুরুষ তাদের ডাকাত ছিল, রংপুরের ওদিকে কোথায় নায়েবী করতেন বিষ্ণু চক্কোত্তি, আর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নিয়ে আসতেন বাড়ীতে। এমন প্রতাপ ছিল তাদের যে এই রাস্তাটা একরাত্তিরে বেঁধে দিয়েছিলেন। তাদের পুত্রবধূ নাকি পাল্কীর ঝাঁকিতে অসুখ হয়ে পড়েছিলেন

তাই। সাতটা ঢেঁকি ছিল বাড়ীতে। আমরা দেখেছি একবার এক বিয়ের দল ঝড় বৃষ্টিতে পড়ে তাদের বাড়ীতে আসে। এক ঘণ্টার মধ্যে মাছ মাংস পোলাও সমেত ২৭ রকম পিঠে দিয়ে তাদের খাওয়ানো হয়। সেই থেকে তাদের নাম ছিল সাতাশ পিঠের চক্কোত্তি।

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—ছেলেরা লেখাপড়া শিখ্‌লে, তারপর বিদেশে চলে গেল, বাড়ী করলে কিন্তু দেশে আর এল না। আর গ্রামের লোক তাদের বাড়ীতে পাতা পাতলে না—

—গ্রামের হরে খুড়ো ছিলেন একটু পাগলা। পাগল হ'য়ে ছিল তার নাম, কিন্তু খুব দুষ্টু বুদ্ধি ছিল তার ঘটে। যাত্রা গান হচ্ছে পূজার সময়, নাটমন্দির বোঝাই লোক—খুড়ো আমার কোথা থেকে বাঘের চামড়া পরে হালুম করে এসে পড়লেন আসরের মাঝে। সে কি হট্টগোল—কে যেন লাঠি দিয়ে দিলে একঘা—তখন চীৎকার—ওরে আমি হরে খুড়ো।

বৃদ্ধ আপন মনে খানিক হেসে পুনরায় তামাক সেজে নিয়ে ব'ল্‌লেন—তার কত কাণ্ড আছে। তরণী বাড়ুয্যে বাজার থেকে দু'টো ইলিস্‌ ও এক ভাড় দুধ কিনে নিয়ে আস্‌ছে হরে খুড়োর বাড়ীর উঠোন দিয়ে। হরে খুড়ো বললে—একটা মাছ দিয়ে যাও—তোমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে একটা মাছেই হবে। তরণী দিলে না। কিন্তু খালে এসে দেখে পার হওয়ার উপায় নেই। প্রথম বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। বললেন—হরে, পার ক'রে দিবি? হরে খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে তালের ডোঙ্গা নিয়ে হাজির। তরণী মাছ পিছে রেখে দুধের ভাঁড় ধরে আগে ব'সলেন—হ'রে খুড়ো পেছনে দাঁড়িয়ে এক লগির খোঁচায় ডোঙ্গা ডুবিয়ে দিয়ে মাছ হাতে সাঁতরাতে সাঁতরাতে গিয়ে গাছে ডিঙি বাধলেন, আর মাছ দুটোকে বাঁধলেন ডালে। তরণী ভাঁড় ছাড়েন নি, কিন্তু দুধ ডুবে জল হ'য়েছে। তরণী বাড়ী ফিরলেন শূন্য হাতে, হ'রে খুড়ো একবাটি ইলিশ মাছের ঝোল নিয়ে তরণীর বৌকে দিয়ে এল—বল্‌লে আমাদের পুকুরে মাছ ধরেছিল, তাই দিয়ে গেলাম—

বৃদ্ধ আপনমনে আবার হেসে উঠলেন। তারপর তামাক টান্‌তে টান্‌তে ব'ললেন—তরণী সেকথা ভুল্‌তে পারেন নি। কত চেষ্টা হরে খুড়োকে জব্দ করবার, কিন্তু কিছুতেই না। অবশেষে হরে খুড়ো বিয়ে পাগলা হ'য়ে উঠ্‌লেন—শ্রোত্রীয় বলে তার বিয়ে হয়নি। তরণী বিয়ে ঠিক ক'রলেন—তার ভাগনার সঙ্গে। কিন্তু পাড়ার নটবর পরামাণিকের ছেলেকে বৌ সাজিয়ে বিয়ে দেওয়া হ'ল—বাসর ঘরে নবোঢ়া বধূ আর হরে খুড়োর মারামারি—

বৃদ্ধ হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। হুকাটা হাতে ক'রে খিঁচুড়ী ঘুটে দিয়ে এসে ব'ললেন—একটু দেরী আছে।

আমি ব'ললাম—বলুন না—এসব গল্প শুন্‌তে বেশ লাগে—

—কত শুন্‌বেন। গ্রামের সব কথা লিখ্‌লে মহাভারতেও ধ'রবে না। নিত্য নিয়মিত তিন পাড়ায় তিনটী পাশার আড্ডা হ'ত, তার মাঝে মুখুজ্জেদের মণ্ডপের আড্ডাটাই জ'মত। সেখানে আদাড়ী মল্লিক আসতেন—লম্বা পাতলা চেহারা—পাশার একটী ভাল আড়ি মারলেই কাপড় মাথায় বেঁধে এক পাক নেচে নিতেন। আমরা আদাড়ী মল্লিকের নাচ দেখবো বলে লুকিয়ে থাক্‌তাম। কদিন পর পর তিনদান জিতে তিনি কাপড় ফেলে দিয়ে নাচ্‌তে সুরু ক'রলেন। মুখুজ্জে কাপড় নিয়ে এই অনুরোধ, ভাই কাপড় পর। মল্লিক ব'ললে—তিনদিন কাপড়ই পরব না, বলে সেই অবস্থায় বাড়ী চলে গেল—

আমিও হাস্‌ছিলাম। বৃদ্ধ ব'ললেন—কত রঙ্গ, কত স্ফূর্তি ছিল গ্রামে। তিনপাড়া নিমন্ত্রণ ক'রতেই কেউ সাহস পেত না। তিন পাড়ার প্রায় হাজার লোক—চক্কোত্তিদের বড় বৌ মাঠের ওই বট-পাকুড় উৎসর্গ ক'রলেন—হুকুম এল সাতদিন গ্রামে হাঁড়ি কেউ চড়াতে পারবে না। তাই হল, হাজার লোক সাতদিন বসে খেল।

—এ বাড়ীটা কা'দের?

—আমাদের; আমরা চাটুয্যে—এই যে শিব মন্দির এর বয়স জানেন? দু'শ বছর—সাক্ষাৎ জাগ্রত আমার ঠাকুর। চক্কোত্তিদের বাড়ীতে তখন প্রায় ৩০০ লোক খেত। আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তারা যুক্তি ক'রলে বেকুব ক'রবে—সব পায়েস খেয়ে ফুরিয়ে দেবে। কিন্তু ভোলানাথ সহায়—কড়াই খালি করে নিয়ে পরিবেশন করে এসে দেখে কড়াই পূর্ণ। লোকলজ্জা থেকে বাঁচালেন

—তাইত ঠাকুরকে ছাড়িনি আমি—বলি, ঠাকুর তুমি আর আমি। ঠাকুরের কৃপায় আজ ৩২ বছর কোন অসুখ নেই আমার।

খিঁচুড়ী হ'ল। দুইজনে আহারাদি সমাপ্ত করে শোবার জোগাড় ক'রলাম। অতিথির বন্দোবস্ত তাঁর ছিল—মাঝে মাঝে দু'একজন বিপন্ন ব্যক্তি আমার মতই আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

বাহিরে তখনও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চ'লেছে—ঝড়ের শন্ শন্ শব্দ। ভাঙা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ঝাট্ আসে। দেয়াল দিয়ে জল চুঁয়িয়ে পড়ছে—চারি পাশে নিবিড় অন্ধকার।

বৃদ্ধ ব'ল্লেন—এখন ঘুমোবেন না, দ্বিপ্রহর না হ'লে ঘুমোনো ঠিক হবে না।

—কেন?

—বাবার আদেশ। বাবার সঙ্গে ত অপদেবতারা চলাফেরা করেন, তারা আবার আসতে পারেন।

—তার মানে?

বৃদ্ধ হেসে ব'ল্লেন—বুঝলেন না? ভূত-পেত্নী এরা সব এমনি রাত্রেই বেরোয় কিনা। আপনি ছেলেমানুষ—একজন নাকে কাঁদলেই ভয় পাবেন শেষে।

বৃদ্ধের কথায় এবং এই নিবিড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে সত্যিই ভয় হচ্ছিল। এই সামান্য আলোক শিখাটা যদি নিভে যায় তবে এই নিবিড় জঙ্গলে আমি একান্তই নিরুপায়। ভূত থাক্ বা না থাক্—সাপ-খোপেও ত জীবনটাকে শেষ ক'রতে পারে।

—হ্যাঁ, দেখুন। আমি পরী সাধনা ক'রেছিলাম—একটা পরী আসতো এ ঘরে—রাত্রিবাস ক'রে চলে যেত। তাকে ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সে মাঝে মাঝে আসে, ভয় পাবেন না। কিছু ক'রতে পারে না ওরা—তবে আপনি ভয় পেতে পারেন।

আমি চারিপাশে একবার চেয়ে দেখলাম। গায়ের মাঝে কেঁপে উঠ্লো—লোমগুলো খাড়া হ'য়ে উঠ্লো। বৃদ্ধ তা বুঝেছিলেন—বললেন—ভয় নেই। আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না? আমার কিছু আছে—আমার কথা ওদের মান্তেই হবে। আচ্ছা আপনার সাহস যাতে হয়—বৃদ্ধ লণ্ঠন নিয়ে উঠ্লেন।

—কি ক'রবেন? কোথায় যাবেন?

—একটু বাগান থেকে আসি।

—না না, আপনি যাবেন না। আমার ভয় ক'রছে।

বৃদ্ধ হেসে বললেন—জানি। কিন্তু দেখবেন বাবার দয়া—আমি থাক্তে আপনার কোন ভয় নেই। দেখবেন?

— কি?

—আমারও কিছু ক্ষমতা আছে। দেখুন—

বৃদ্ধ একটা বাঁশী নিয়ে বাজাতে সুরু ক'রলেন। কিছুক্ষণ বাদে শুনলাম হিস্ হিস্ শব্দ—বাইরের দিকে তাকিয়ে কোনও অশরীরী ছায়া দেখবো ভেবেছিলাম। তাই ঘন ঘন তাকাচ্ছিলাম—বৃদ্ধ বল্লেন—আয় কেলো, আয় ভুলো—

বাহিরে দেখি দু'টি গোখরো সাপ তার সামনে এসে ফণা মেলে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধ সস্নেহে বললেন—কিছু নেই রে আজ। একটু দুধ আছে—

একটা দুধের বাটি সাম্‌নে রাখতেই তারা দুটিতে দুধটুকু খেয়ে ফেল্লে। তিনি ব'ল্লেন—যা, আজ। কাল আবার ভাল ক'রে দেব।

সাপ দু'টি চলে গেল! আজ সন্দেহ হয়, হয়ত ভুল দেখেছিলাম।

খাটিয়ার উপর বসে কাঁপছিলাম—মনে হচ্ছিল ছুটে পালাই; কিন্তু এ নিবিড় অন্ধকারে কোথায় যাবো?

বৃদ্ধ হেসে ব'ললেন—কেমন? আর ভয় ক'রবে না ত? চান্ ত তাদেরও দেখাতে পারি।

—না না—যা দেখেছি তাতেই ত ভয় আরও বেড়ে গেছে। আপনি একা কি ক'রে থাকেন?

—আমি? বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। তার বিকট হাসির শব্দ বাহিরের জমাট অন্ধকারে প্রতিহত হ'য়ে যেন ফিরে এল। আবার কেঁপে উঠ্লাম—কোলের উপর হাতটা ভয়ে কাঁপছে—তাকে থামানো যায় না। কেমন ক'রে এই লোকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব! আর পাব কিনা, তাই বা কে জানে?

বৃদ্ধ বল্লেন—মনে করেন আমি একা—না? তা নয়। আমার কত সাথী। বাবা বিশ্বম্ভর আমার দুঃখ বোঝেন তাই সাথী দিয়েছেন। আমি একা একা গিয়ে বনের ধারে দাঁড়াই। বাবার আদেশে বন উজোয়, আবার ফিরে আসে গ্রামের তারা, যারা চলে গেছে। গ্রাম

আবার জম জম করে—তরণী, হয়ে খুড়ো, আদাড়ী, সব ফিরে আসে আমার সঙ্গে কথা কয়—সেই তেমনি করে নাচে। আমি আর তরণী যেমন মাছ ধরতে যেতাম তেমনি যাই—বিলে গিয়ে কই মাছ ধরি।…

—কতজনে বলেছে আমাকে যেতে কিন্তু আমি যাই না। কোথায় যাবো? তারা যদি না আসে, তবে কোথায় যাবো? সেখানে আমার সাথী কে? সব ত নতুন লোক, তারা আমার কে? এখনও মনে পড়ে ভট্‌চাযদের কথা, —যখন ঘর বিক্রি করে চলে যায় তারা তখন বাড়ীর চেহারা কি! ঘর ভেঙ্গে ফেলেছে—বাড়ীটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে হয়েছে শ্মশান—কত আনন্দ হ'য়েছে তাদের বৈঠকখানায়। যাবার সময় চোখের জল ফেলে তারা উঠ্‌লো নৌকোয়—সে কথা মনে হ'লে বুক ফেটে যায়…বাবার পূজো করি, বাবা আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন—আমি জানি তারা ফিরে আসবে, গ্রাম আবার তেমনি হবে, আবার কীর্ত্তন হবে, যাত্রা হবে—তাই না?

চেয়ে দেখি—বৃদ্ধের ভেজাচোখ দু'টো আনন্দের আলোয় ঝক্ ঝক্ ক'রছে—ঘরের ক্ষীণ আলোয় শ্বাপদ চক্ষুর মত জ্বলছে।

হঠাৎ আমার অত্যন্ত নিকটে এসে হাত ধ'রে বললেন, —আপনি কি বলেন? আসবে না? বাবার দেওয়া স্বপ্ন মিথ্যে হবে? দেখলেন ত, সাপ বাঘ ভূত পেত্নী সব আমার বশ, তবুও কি পারবো না তাদের আন্‌তে—তারা চলে যাবে, আর আসবে না? বলুন,—আপনারা শিক্ষিত—তারা আসবে—না?

এমনি ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে কেমন করে বলি—তারা আসবে না, তারা গেছে এই জঙ্গলকে পিছনে ফেলে—আর আসবে না। তাই ব'ললাম—আসবে বই কি? বাবার স্বপ্ন মিথ্যে হবে না—

—আসবে আসবে—ওরে তারা আসবে, বলে বৃদ্ধ নাচতে আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর পায়ের ধাক্কা লেগে লণ্ঠনটী পড়ে নিভে গেল। বৃদ্ধ তবুও নাচ্‌তে লাগ্‌লেন—

ভয়ে কাঠ হ'য়ে বিছানায় বসে ছিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধ নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে অত্যন্ত কাতরস্বরে ব'লে উঠ্‌লেন—বাবা, বাবা ভোলানাথ—যদি তারা না আসে তোমার পায়ে মাথা খুড়ে ম'রবো। বাবা—বাবা গো—বৃদ্ধ যেন কাঁদছেন ব'লে মনে হল—

বাহিরে ঝড় তখন শান্ত হ'য়ে এসেছে—হাওয়া ধরিত্রীর শীতল দীর্ঘশ্বাসের মত গায়ে এসে লাগ্‌ছে—নিবিড় বনের অন্ধকারের মাঝে টুপটাপ্ বৃষ্টির শব্দ—আর পাশের খাটে বৃদ্ধ বোধ হয় উৎসারিত অশ্রুধারা ভোলানাথের পায়ে সমর্পণ ক'রছেন।

রাখলে ছেলেটি ব'লেছিল—পাগলা ঠাকুর। বৃদ্ধ উন্মাদ সন্দেহ নেই—তবুও কি পরম আগ্রহভরেই না আর একবার জীবনের অতীতকে ভোগ ক'রবার বাসনা নিয়ে এই জনহীন অরণ্যে বসে আছে। যৌবনকে, জীবনকে ফিরে পাবার কি অশান্ত আগ্রহ এঁর অন্তরে!

অন্ধকার ঘরের মাঝে কাঠের মত বসে রাত্রিবাস ক'রলাম। কিন্তু সেকথা ভাবলে আজও মনে হয়, পাগলদেরও কি এমনি এক একটা বাসনা আছে, যা নিয়ে তারা আপনার খেয়ালে চলে—আপনার জগত আমাদেরই মত হাসি-কান্নায় ভরে তোলে?

'বিরাজ-বৌ'-এর নাটকীয়তা

শ্রীকানাই বসু

যাহা হইবার নয় তাহাই হইয়া গেল, যে দুঃখের আশঙ্কা মাত্র করি নাই সেই দুঃখ পাইতে হইল, যে সুখ প্রত্যাশার অতীত তাহাই লাভ হইল, রাজাধিরাজের সিংহাসনে ছিল সে দীন ভিখারীর ধূলিশয়নে নামিয়া আসিল, অতি মানী যে ছিল কলঙ্কভারে তাহার মাথা নীচু হইল, যে পাষাণ-হৃদয় বলিয়া বিদিত তাহার হৃদয়-পাষাণ ভেদ করিয়া অকস্মাৎ স্নেহ নির্ঝর বহিল—ইত্যাদি প্রবল পরিবর্তন যদি নাটকের উপাদান হয়—তবে "বিরাজ-বৌ"-কাহিনীতে উপন্যাসাকারে শরৎচন্দ্র নাটকই লিখিয়া গিয়াছেন।

দ্বন্দ্ব—ভালোয় মন্দয় বিরোধ, প্রবল ইচ্ছা ও দুর্বল শক্তির অসামঞ্জস্য, মনের ভাবে ও মুখের কথায় অনৈক্য—এ সকল নাট্যবস্তুর প্রাচুর্য্য আছে 'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসে।

আরও একটি নাটকীয় সদ্‌গুণ ইহাতে শরৎচন্দ্র অকৃপণ হস্তে দান

করিয়াছেন, তাহা আয়রণি (Irony—Dramatic Irony and Irony of Fate.)

বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। সেই বিরাজ সকল সৌন্দর্য্য, তাহার মুখের শ্রী ও দেহের সৌষ্ঠব, সব হারাইয়া অতি কুৎসিত হইয়াছে। "অতীত হইতে ছিঁড়িয়া ভগবান তাহাকে একেবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন।" "অথচ এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স।"

তারপর, বিরাজ সাধ্বী স্ত্রী। যেমন সাধ্বী বাংলা দেশের সকল ঘরেই বিদ্যমান। কিন্তু বিরাজকেই বা এই নিদারুণ দুর্ভাগ্য ভুগিতে হইল কেন? বিরাজের স্বামীপ্রেম সাধারণ, কিন্তু তাহার স্বামীপ্রেমের গর্ব্ব অসাধারণ। তাহার সতীত্ব নির্য্যাতিত হইল তাহার সতীত্বের অহংকারের কাছে। সংসারে বিরাজ সবার উপরে স্থান দিয়াছে নিজেকে। তাই তাহাকে নামিতে হইল সবার নীচে। অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বিরাজের দুরদৃষ্ট অ-দৃষ্ট নয়। সে যে সুন্দরী, সে যে সতী, সে যে ভাগ্যবতী, সে যে কর্ত্রী, নিজের সম্বন্ধে এসকল কথা সে নিজে তো ভোলে না বটেই, কাহাকেও ভুলিতে দেয় না।

অসতী মেয়ে মানুষের সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত কৌতূহল ও প্রশ্ন এই না ভোলারই পরিচয়। তারপর, সতীত্বের শক্তির প্রসঙ্গ তুলিয়া যে আলোচনা সে করিয়াছে তাহা কোনও রমণী কখনও করে নাই। সতী, সীতা, সাবিত্রীগণও নয়, সাধারণ ঘরের মা বোন বধূ কন্যা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ সতী সাধ্বীরাও নয়!

"সতীত্বে আমিই বা কম কিসে?" ইত্যাদি গর্বোক্তির পরিণাম, অপ্রত্যাশিত শোচনীয় পরিণাম, না থাকিলে এমন কথা মিছামিছি বিধাতা কেন বলাইবেন? মানুষের বিধাতাও যেমন ভাগ্যবিপর্য্যয় করেন, গ্রন্থের বিধাতাও তেমনি নাটক রচনা করাইবার জন্যই এমন সব কথা বলাইয়াছেন।

নিজের সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধেও তাহার গর্ব আছে। 'আচ্ছা, আমি কালো কুচ্ছিত নই তো?' এবং তারপর তাহার মুখের এই কথা—"তাহলেও (অর্থাৎ কালো কুৎসিত হইলেও) তুমি আমাকে এমনি ভালবাসতে" ভবিষ্যৎ নাটকীয় পরিণতিই সূচিত করে। এমন কি সে এই কথাও বলিয়াছে—"তাই আমি জানি, যদি আমি কাণা খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদর পেতুম।" অতি অল্পদিন পরেই, তাহার ভরা যৌবনের বয়সেই, তাহাকে কাণা ও বিকলাঙ্গ করিয়া এই স্বামীপ্রেম গর্বের সত্য যিনি মর্মান্তিক রূপে প্রকট করিয়াছেন, তিনি ঔপন্যাসিক নন, তিনিই নাট্যকার।

দর্পিতা বিরাজ অনেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে, অনেক অত্যুক্তি করিয়াছে। সে সকলের অপ্রত্যাশিত পরিণতি না থাকিলে লেখকের বুদ্ধির উপর অশ্রদ্ধা আসিত। "নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে, আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি?" এমন অর্থহীন অহঙ্কার কেহ শুনিয়াছেন? যত বড় প্রেমিক পুরুষই হোন এবং যত বড় প্রেমময়ী স্ত্রীর স্বামীই হোন, মানুষ নিজের গায়ে হাত দিয়া কেমন করিয়া অনুভব করিতে পারে যে তাহার দেহের সহিত তাহার প্রণয়িনীও মিশিয়া আছে? ইহা গর্বিতা নারীর অবিবেচনা ভাবিতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র এমন অত্যুক্তি বৃথাই করান নাই। যে স্বামীর অঙ্গের সহিত সে মিশিয়া আছে, তাহাকেই ত্যাগ করিয়া বিরাজ একদিন নিজে গিয়া উঠিল লম্পট পরপুরুষের বজরায়।

সংসারে বিরাজ তাহার স্বামীর স্ত্রী নয়, নীলাম্বর তাহার স্ত্রীর স্বামী। বিরাজ বলে—"আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান করে যাবে, কাণে শুনে আমি সহ্য করে যাব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না।" বলিতে পারিল না—"তোমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তোমাকে অপমান করে যাবে।" এই আমার জ্ঞান তাহার অত্যধিক, তাই এমন দিন আসিল যেদিন কিছুই তাহার আর 'আমার' রহিল না।

"শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন।" "তোমার কষ্ট বুঝবেন" একথা বিরাজের মুখে আসিল না। অথচ শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া শপথ সে করে নাই, নীলাম্বরই করিয়াছে।

সরল নীলাম্বর বিরাজের অনেক বাক্যজ্বালা সহিয়াও সহজ ভাবে বলিল—"চেয়ে দেখ বিরাজ, নিজের কপাল স্পর্শ করিয়া এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে, আমি ত অতি তুচ্ছ।"

মুখরা বিরাজ এমন শান্ত কথাটিতেও শান্ত হইল না, বলিল—'তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি তো পারি না! মেয়েমানুষের লজ্জা সরম আছে,—আমাকে খোসামোদ করে হোক, দাসীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করতেই হবে।' হা রে হতভাগিনী! সেই গাছতলায় বাসই তুমি করিতে পারিলে তো! কোথায় রহিল তোমার 'মেয়েমানুষের লজ্জা সরম?' দাসীবৃত্তিও করিলে, কিন্তু আশ্রয়ের মধ্যে বাস করা তবু হইল না। এমন Irony শরৎচন্দ্র প্রচুর পরিবেশন করিয়াছেন।

এই অহঙ্কার, এই জিদ্ বিরাজের পরম শত্রু। আর এক শত্রু তাহার নিজের উপর অটল বিশ্বাস এবং স্বামীর বুদ্ধির প্রতি একান্ত অবিশ্বাস। এ অবিশ্বাস সে জ্ঞানতঃ করে না, বলিলে স্বীকারও করিত না, কিন্তু নীলাম্বরের বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করিলে হয়তো শেষ রক্ষা হইত। নীলাম্বর বুঝিয়াছিল, জমিজমা হারাইয়া ভাঙ্গা ঘরের মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহাদের নিশ্চিত মরণ। তাই সে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু নিজের ভালবাসার ছলনায় ভুলিয়া বিরাজ তাহাকে নড়িতে দিল না! সুবুদ্ধি স্বচ্ছদৃষ্টি ছোট বৌ বলিল—দুদিন ঘুরে এস মামার বাড়ী। 'যাও দিদি, ওঁকে পুরুষ মানুষের মত উপার্জন করতে দাও, ওঁকে বদ্ধ করে রেখ না দিদি…।"

কিন্তু বিরাজ সে হিতকথা শুনিবে কেন? সে বলিল—'ঘুম ভেঙে উঠে ওর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারবো না। যা পারবো না ছোট বৌ, সে কাজ আমাকে বল না।'

কিন্তু সে-ই পারিতে হইল। স্বামীর মুখ দেখা দূরে থাক, স্বামীর গৃহ, স্বামীর গ্রাম, স্বামীর কুল পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তাহাকে বহুদিন কাটাইতে হইল। ঘুম হইতে উঠিয়া উপবাসী স্বামীর মুখ দেখায় নিশ্চয় আনন্দ

নাই, সুতরাং বিরাজের কথা তাহার ভালবাসার তত পরিচয় নয়, যত তাহার ভালবাসার অহঙ্কারের পরিচয়।

বিরাজের পরপুরুষ সহায়তায় গৃহত্যাগ এবং তার পরের অসহনীয় দুঃখদুর্দশা নাট্যরসিকের মনে আনন্দ দান করে। নাটক সরল পথে পূর্বনির্দিষ্ট গতিতে চলে না। পরিবর্তনই জগতের ধর্ম, কিন্তু পরিবর্তন নাটকের প্রাণ বলিলেও হয়। পরিবর্তন এক রকমের নয়, নানাবিধ, —গতি পরিবর্তন, রূপ পরিবর্তন ও ভাব পরিবর্তন।

নীলাম্বর নায়ক বটে, কিন্তু কৃতী নায়ক নহে সে। বলিবার মত কাজ সে একটি মাত্র করিয়াছে, ডিবা ছুঁড়িয়া বিরাজকে আঘাত করিয়া। বাকী সবক্ষণ সে কথা কহিয়াছে, প্রেম করিয়াছে এবং কাঁদিয়াছে। সে কাঁদিতে ভাল পারে, তাই তাহাকে তাহার সৃষ্টিকর্তা প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার সুযোগ দিলেন। হ্যামলেট নাটকের হ্যামলেট একটি অকৃতী-ক্রন্দনপরায়ণ-নায়ক। বিশেষ কিছু কর্মতৎপরতা না থাকিলেও নায়কত্ব করা যায়, কারণ তাহারই সুখদুঃখের চতুর্দিকে কাহিনী আবর্তিত হয়। কিন্তু অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত মোড় ফিরাইলে যে নাট্যরস ঘনীভূত হয় তাহারও অভাব নাই নীলাম্বর চরিত্রে।

একদিন কঠিন দুর্বাক্য দ্বারা স্বামীর মর্ম ভেদ করিয়া বিরাজ ঘরে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর গভীর পত্নীপ্রেমের প্ররোচনায় সেই রুদ্ধদ্বারে ঘা দিয়া আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিল—বিরাজ! বিরাজ ভয় পাইয়া দরজা খুলিতে পারে নাই। বারবার বলাতে সে "কাঁদ-কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—তুমি মারবে না বল?"

"মারব! কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল। বেদনায় লজ্জায় অভিমানে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা চৌকাট আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ইত্যাদি।"

তারপর অনুতপ্ত বিরাজের সহিত নীলাম্বরের বোঝাপড়া হইতে দেরি হইল না বটে, কিন্তু সেই তীক্ষ্ণছুরীর ফলাটা বহুক্ষণ হৃৎপিণ্ডে যন্ত্রণা দিয়াছিল। "তবুও ভাবিতেছিল—একথা বিরাজ মুখে আনিল কী করিয়া? সে তাহাকে মারধর করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন?"

অথচ এমন যে নীলাম্বর, যাহার কাণে প্রবেশ করিয়াই কথাটা তীক্ষ্ণ ছুরীর আকার ধারণ করিয়া হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল, সেই নীলাম্বরকে দিয়া তাহার বিধাতা শুধু উপবাসিনীকে পত্নীকে প্রহারই করাইলেন না, কপাল (ভাগ্য?) ফাটাইয়া চরিত্রে অকথ্য কলঙ্ক আরোপ করিয়া স্ত্রীকে গৃহত্যাগ করাইলেন।

নানারকম বিপরীত ভাবের সংমিশ্রণ ঘটে একটা মানুষের চরিত্রে ও মনে। নাটকীয় চরিত্রেরও মূলধন এই সকল বিপরীতমুখী মনোভাব। নীলাম্বর দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, একলা ঘরে ঠাকুর দেবতার ছবির সামনে মাথা কোটে। কিন্তু সেই নীলাম্বর যখন শুনিল বিরাজ প্রাণত্যাগ করে নাই, কুল ও সতীধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, তখন সে-সংবাদ যত মর্মান্তিক হোক না কেন, সেই অসতী বিরাজকে ক্ষমা করিবার মতো চিত্তবলের তাহার একটুও অভাব হইল না এবং সত্যই যখন বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত, কলঙ্কিনী পত্নীর দেখা পাইল তখন তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে আনিতে সে একমুহূর্ত বিলম্ব করিল না। দুর্বলচিত্ত নীলাম্বর সর্বথা দুর্বল নহে।

"ছোটভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক।" ভিন্ন প্রকৃতির লোকরাই নাটকের উপাদান, তাহা বলা বাহুল্য। পীতাম্বর দাদার মত বোকা নয়, সে পয়সা চিনে, সে প্রয়োজনমত মিথ্যাকথা কহিতে পারে, ভগ্নীস্নেহে, অথবা কোনও স্নেহেই, গলিয়া গিয়া সে নিজের আখের নষ্ট করে না। এ সকল প্রভেদ ছাড়াও একটা বড় প্রভেদ আছে দুই ভাইয়ের প্রকৃতিতে। পীতাম্বর স্ত্রীকে যখন তখন প্রহার করিতে কাতর নয় এবং স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধ করে না। (সুতরাং তাঁহার স্ত্রী যে কুলত্যাগ করিল না ইহা বিচিত্র নয়।)

সহোদর হইয়াও দুই ব্যক্তি ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া যেমন নাটকীয় প্রয়োজন, তেমনই একই ব্যক্তির প্রকৃতি পূর্বে এক রকম, পরে অন্য রকম হওয়া আরও প্রয়োজন—তাহা শরৎচন্দ্র অবশ্যই জানিতেন।

বিরাজের গৃহত্যাগের পর পীতাম্বর "যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।" "বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল।" পীতাম্বরই বিষয় বাড়ী ভাগ করিয়া লইয়া পৃথগন্ন হইয়াছিল, এবং উঠানের মধ্যে বেড়া বাঁধাটা অবশ্য তাহারই কাজ হইবে। কিন্তু এই পীতাম্বরই বলিল—"যদুকে দিয়ে উঠোনের বেড়াটা ভাঙিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না।" মাত্র তিন দিন আগে পর্য্যন্ত পীতাম্বরের কোন কষ্ট হয় নাই দুঃখী দাদার মুখের পানে চাহিতে। তবে তখন অবশ্য সে দাদার মুখের পানে চাহে নাই কোন দিন।

এই ধূর্ত্ত শঠ স্বার্থপর স্নেহদয়ামায়াহীন লোকটি, যে একদিন তাহার সাধুপ্রকৃতির স্নেহময় অগ্রজের অপেক্ষা ছোট বোনের শ্বশুরকে বড় গুরুজন বলিয়া জ্ঞান করিবার ভান করিয়াছিল, এই লোকটিই যখন আচম্বিতে নিশ্চিত মৃত্যুর দংশনের মধ্যে পড়িল, তখন "দাদার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার কোন ওসুধপত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি তো আর বাঁচতেও চাইনে।" মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া সে মিথ্যাকথা বলে নাই, সে "সর্বপ্রকার ঝাড়ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার (দাদার) পায়ের নিচে মাথা ঘসিতেছিল।"

বিরাজ বৌ আখ্যায়িকাতে বিরাজ প্রধান চরিত্র বটে, কিন্তু মোহিনী প্রিয়তম চরিত্র। মোহিনী স্বল্পভাষিণী, শান্ত, সহনশীলা এবং স্থিরবুদ্ধি। সে স্বামীর নিকট দুর্বাক্য ও প্রহার পাইয়াও স্বামীকে ভালবাসে, তাহার কল্যাণকামনায় আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। সে অন্যের সুখদুঃখের দিকে চক্ষু কর্ণ সজাগ রাখে, কিন্তু নিজের চরমদুঃখেও আপনাকে হারাইয়া অস্থির হয় না। তাহাকে কেহ আঘাত করিলে সে ফিরাইয়া আঘাত করে না। "পুঁটির নিদারুণ

উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল, তাহা অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না।···চিরদিনই সে নিস্তব্ধ প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল, কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না।"

বিরাজের প্রতি মোহিনীর অপরিমেয় শ্রদ্ধা বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, বিরাজের খর জিহ্বা, অধীর প্রকৃতি, অবুঝ জিদ্‌, দুরন্ত অভিমান ইত্যাদির ফলে দুঃখের সংসারে যত অশান্তিই আসুক, মোহিনী তাহার দিদির দোষ দেখিতে পায় না। এমন কি যাহার বড় দোষ স্ত্রীলোকের আর নাই, বিরাজকে সেই দোষে দোষী বলিয়া জানিয়াও মোহিনী তাহা বিশ্বাস করিবে না। পল্লীগ্রামের সমাজে থাকিয়া সে জানে, যে-পথে বিরাজ গিয়াছে সে-পথ হইতে হিন্দু রমণীর আর ফিরিবার দরজা নাই। তথাপি সে মানিবে না। তাহার কাছে তখনও বিরাজ "সতীলক্ষ্মী দিদি আমার" এবং "নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাকব।" বিরাজ যে একদিন সত্যই ফিরিয়াছিল, তাহা একমাত্র মোহিনীর বিশ্বাসের জোরেই।

বিরাজের যত কিছু দোষ, ত্রুটী, ভুল, ভ্রান্তি সব শোধন করিয়া দেয় মোহিনীর সুবুদ্ধি, ধৈর্য্য, সেবা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলী।

বিরাজচরিত্রের পরিপূরক মোহিনী চরিত্র।

চিত্র অঙ্কনে যেমন বিজ্ঞ চিত্র-শিল্পী চিত্রের ভারসমতা (balance)র দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বস্তু ও বর্ণ-বিন্যাস করেন, তেমনি নাট্যরসজ্ঞ কথাশিল্পী বিরাজের সংসারে মোহিনীকে স্থাপনা করিয়া উপাখ্যানের ব্যালান্স রক্ষা করিয়াছেন।

প্রধান প্রধান চরিত্রের কথাই উল্লেখযোগ্য, তাহাই করিলাম। এই সঙ্গে একটি বিশেষত্বর কথাও বলা দরকার। সেটি আখ্যায়িকার ঘটনা বর্ণনে শরৎচন্দ্রের মনোরম কৌশল। নাটকে বিশেষভাবে রসসঞ্চার করে অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বা আবিষ্কার। ইহা চমক লাগায়, বিস্ময় আনে ও প্রভূত আনন্দ দান করে। যে লোকটিকে নিবিড় অরণ্যে নিশ্ছিদ্র ষড়যন্ত্রের জালে নিশ্চিত মৃত্যু গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, চরমমুহূর্ত্তে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য 'মাভৈঃ' বলিয়া এমন লোকের আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক, যাহাকে দর্শক বা পাঠক একেবারেই আশা করিতে পারে নাই। যে সংসার সম্পদে ও সৌহার্দ্যে, সুখে ও শান্তিতে ভাগ্যলক্ষ্মীর লীলাভূমি রূপে প্রকাশ হইল, সেই সংসারেই তো পরক্ষণে ব্যাঙ্ক ফেল্ হওয়ার এবং ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের চক্রান্তের আয়োজন দরকার। হিতধী ব্যক্তির জন্যই তো মদের বোতল প্রয়োজন। এই চমক (Dramatic Surprise) নাট্যরসের একটি মূল্যবান উপাদান। উপন্যাস হইলেও এই উপাদান শরৎচন্দ্র বিরাজ-বৌ গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন—বিরাজের অন্তর্ধানের আসল অবস্থাটি প্রকাশ করিবার সময়।

বিরাজ যে আত্মহত্যাই করিয়াছে এই ধারণা সকলেরই হইয়াছিল। এই ধারণা সৃষ্টি করিতে শরৎচন্দ্র চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। বিরাজ বাহির হইবার পর তিনি দুইকূল ভাসানো সরস্বতীর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনর্থক নহে। স্থান কাল যতদূর ভয়ঙ্কর ও কালো করিতে পারা যায় তাহা করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে বসিয়া বুকের ভিতর আরও কালো আত্মহত্যা-প্রবৃত্তি লইয়া বিরাজ "নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া নিজের হাত-পা বাঁধিতে লাগিল।" তারপর একটা পরিচ্ছেদ চলিয়া গেল, অনেকগুলি দিন চলিয়া গেল। নিঃশেষে বিরাজের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখিয়া, পনের মাস পরে হঠাৎ নীলাম্বরের মুখ হইতে পাঠক শুনিল "আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান নিতেন তো আর আমার সুখের দিন। পুঁটি এখন বড় হয়েছে, তার মায়ের মতন বৌদির এ কলঙ্ক শুনলে তার বুকের ভিতর কী করতে থাকবে।"

এ সকল কথা উপন্যাস পাঠকের জন্য নহে, নাট্যাভিনয় দর্শকের জন্য। বিরাজের কপালকাটার ঝপাট কাটাইয়া যে-দর্শকের মন নিরুপদ্রব আরামে গল্প শুনিতেছিল, সে অকস্মাৎ যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া পিঠ সোজা করিয়া বসিবে এবং চোখ বড় করিয়া কাণ খাড়া করিয়া অপেক্ষা করিবে। বলিবে—সে কী ?

এই চমক পাইয়া নাট্যামোদী মন পুলকিত হইয়া উঠিবে। নূতন আগ্রহে নূতন আনন্দে নাটকে মনোনিবেশ করিবে। তারপর আসিল—সাবিত্রী-গৌরব-প্রতিদ্বন্দ্বিনী পরমাসতী, বিরাজের আত্মহত্যার সঙ্কল্পের শোচনীয় পরিবর্ত্তনের বিবরণ। নদীর কূলে বসিয়া হাত পা বাঁধার পর বিরাজের মতিভ্রমের কাহিনী শরৎচন্দ্র যদি আগেই, অর্থাৎ যখন ঘটিল তখনই বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে পাঠকের মন আত্মঘাতিনী বিরাজের জন্য শোক ও সহানুভূতির অশ্রুতে অমন ভরিয়া উঠিত না এবং সেই আর্দ্র মন পরে এমন নির্মম বিস্ময়ে চমকিত হইয়া উঠিত না।

এই চমক (Surprise) নাটকীয় বটে, কিন্তু ইহার সবটাই নাটকে স্থান পাইবার যোগ্য নয়। অর্থাৎ চমকটুকুই স্থান পাইবে, ঘটনাটা নহে। কারণ উপন্যাসে একটা সুবিধা আছে ঘটনার পারম্পর্য্য, কার্যক্রম বজায় রাখিবার আবশ্যকতা নাই। দিনান্তকালে নায়িকার অবস্থা বর্ণনা করিবার পর উপন্যাস-পাঠককে এ আহ্বান করার প্রথা আছে :—পাঠক একবার দেখিয়া আসিবে চল গজেন্দ্র সিংহ প্রভাতে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া কোথায় গেল এবং প্রভাতকালে ফিরিয়া গিয়া গজেন্দ্র সিংহের অনুসরণ করিয়া পুনরায় সন্ধ্যায় আসা বেশ চলে।

কিন্তু নাটক অগ্রগতির ক্ষেত্র, সেখানে পশ্চাৎপদ হইবার রাস্তা নাই। নাটকের ঘড়ির কাঁটা একদিকেই ঘুরিতে পারে, দুইদিকে নয়। সুতরাং বজরা হইতে কেমন করিয়া বিরাজ ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িল সে দৃশ্য যথাসময়ে প্রত্যক্ষ করাইলে, তারপর আর বিরাজের সম্বন্ধে কোনও Surpriseএর অবকাশ থাকে না। উপন্যাসকার ঘটনার কার্য্যক্রম মানিতে বাধ্য নহেন। তিনি চমকটুকুও দিলেন, আবার [illegible] মাস পূর্বের ঘটনা,—কেমন করিয়া বিরাজ আত্মহত্যার পথ ধরিল, কুল ছাড়িয়া বজরায় উঠিয়াও কুলত্যাগ করিল না, সে ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যেও সেই নাটকীয় চমক পরিবেশন করিয়া 'বিরাজ-বৌ'কে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ সমাদরের বস্তু করিয়াছেন।

পরিশেষে নীলাম্বরের বিরাজকে ফিরিয়া পাওয়া, অথবা বিরাজের নীলাম্বরকে ফিরিয়া পাওয়া (উভয়েই উভয়কে পাইবার জন্য পথে পথে ঘুরিতেছে) সম্পূর্ণ নাটকোচিত (Dramatic meeting) তাহা বলা বাহুল্য। এমন কি অতি নাটকীয় বলিয়াও মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা ভিন্ন উপায়ও ছিল না। আর সংসারে,—উপন্যাসে বা নাটকেই শুধু নয়, সংসারেও নাটকীয় পরিস্থিতি ঘটে বই কি।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

পিতা স্নেহস্বরে কহিলেন, তুমি চা খাবে না মা ?

ও বাবা, চা না খেলে বাঁচবো কেন ! ফোনটা ক'রে এসে খাবো। আর নার্স কেন এলো না এখনও, সেটাও ত দেখতে হয়।

সে চলিয়া যাইতেই দাম্পত্যলীলা আর একবার প্রকট হইয়া উঠিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, নার্স কেন ? কর্ত্তা কিছুই জানিতেন না, তাহাই বলিলেন ; কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনা, গৃহিণী সদর্পে কহিলেন, তোমার গাঁট থেকে যখন পয়সা খরচ হচ্ছে না, তখন আসুক না দশটা নার্স। কেমন, তাই না ? জজ প্রবল প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে মুকুলের বেহারা হরিচরণ চায়ের সরঞ্জাম লইয়া উপস্থিত হইতে, উপস্থিত তাঁহাকে অপবাদ খণ্ডনে-বিরত থাকিতে হইল। গৃহিণীও বোধ করি চাকর-বাকরগুলাকে মনুষ্যমধ্যে গণ্য করেন না ; তাঁহার মুখবন্ধ হইবে কেন ?

"চিরটা কাল কি ছাই পিঁপড়ের—টিপে মধু বার করেই কাট্‌লো ? ঘেন্নায় মরি, মা, ঘেন্নায় মরি।"

"মধু—মধুটা কি হোল" বলিয়া ভীষণ ক্রোধান্ধ হইয়া জজ সাহেব চায়ের ট্রে টানিতে গিয়া টুলটাই উল্টাইয়া ফেলিলেন। ঝন্-ঝন্ ঝনাৎ শব্দ থামিতে না থামিতে মুকুল ঘরে আসিয়া ভৃত্য হরিচরণকেই বকিয়া দিল। হাসপাতালের বাঁকা-চোরা টুলগুলাও নিন্দার অংশভোগে বঞ্চিত রহিল না ! হরিচরণ বলিল, গাড়ী হাজির আছে মা, আমি এখনই আবার চা-খাবার তৈরী ক'রে আনছি।

জজগৃহিণী উচ্ছ্বসিত ব্যঙ্গ-হাস্য গোপন করিতে করিতে বলিলেন, সেট্‌টা দামী সেট্ ছিল। আজকাল কিনতে গেলে পঞ্চাশ ষাট টাকার কম নয়।

জজ বলিলেন, হাসপাতালের জিনিষ ত, আমি একটা কিনে দিয়ে যাব।

গৃহিণী কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মুকুল বলিল, না বাবা, হাসপাতালের নয় ; আমার !

তবে আর কি ! তোমার পয়সা বেঁচে গেল !—গৃহিণী কহিলেন।

কর্ত্তা হাত পা নাড়িতে সুরু করিয়াছিলেন, ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, কিন্তু শুভকার্য্যে বাধার বিরাম নাই ; জয়দ্রথ আসিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে নার্স। নার্সে গৃহিণীর ভীষণ আপত্তি। নার্স নার্সকে তিনি ছুঁইতে দিবেন না। জয়দ্রথ বুঝাইল, নার্স না থাকিলে ডাক্তাররা অপারেশনই করে না। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, ঐ ধাগরা আঁটা ছুঁড়িগুলো ডাক্তারদের পোষা-মানুষ বুঝি। ওদের না দেখলে হাতের ছুরি নড়ে না ? মরণদশা আর কি !

যাহাই হোক, অজ্ঞান করিয়া অপারেসন হইল এবং সকলেই বলিল, অপারেসন খুবই সাকসেস্‌ফুল ! তবে রোগিণী বাঁচিয়া রহিলেন। সাকসেস্‌ফুল অপারেসনে রোগী মরে, ইহা শাস্ত্রের বচন।

কয়েকদিন মধ্যে নার্স সম্বন্ধে গৃহিণীর মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল ; বলিলেন, না, ছুঁড়ি দু'টোই ভাল। তা দেখ, ওদের টাকা তুমি দেবে না, সে আমি জানি, বখ্‌শিশটা কিন্তু তুমিই দিও। আর, একটা একটা টাকা দিও না যেন, হাতটা একটু দরাজ ক'রে দু'টো দু'টো চারটে টাকা দিও, বুঝলে। কর্ত্তা শশব্যস্তে কহিলেন, বেশ, তুমিই না-হয় নিজের হাতে দিও।

কিন্তু, যেদিন চোখের ঠুলি খোলা হইল, সেইদিনই রাত্রের নার্সটিকে রাখিয়া, দিনের নার্সকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। গৃহিণী কর্ত্তার মুখের পানে চাহিয়া পুরাতন কথাটা মনে করাইয়া দিবার প্রয়াস করিতেছেন, মুকুল তাহার হাত-ব্যাগ খুলিয়া একশ' টাকার একখানি নোট নার্সকে দিয়া কহিল, তোমার বিলের টাকা পেয়েছ ত ? মেয়েটি হাসিয়া, গলিয়া, ঢলিয়া কহিল,—সে ত রোজ রোজই নিয়ে যাই। আজকের টাকাটাও পেয়েছি একটু আগে। তারপর, তিনজনকে নমস্কার করিয়া কৃতজ্ঞকণ্ঠে মুকুলকে বলিল, "ধন্য।" গৃহিণীকে বলিল, মা আর দু'চার দিন পরেই বাড়ী যেতে পারবেন। আর হাসপাতালে থাকবার দরকার হবে না। গৃহিণী গুরুগম্ভীর চালে বলিলেন, হ্যাঁ, কাশী যাব।

মুকুল বলিল, কাশী সিকরৌলে আমাদের একটা বাড়ী কেনা হয়েছে।

পরবর্ত্তী সংবাদ শুনিবার জন্য জননীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু অসাধারণ সংযম সহকারে আত্মসম্বরণ করিলেন ; কর্ত্তা তাহা পারিলেন না। সোৎসুক্যে প্রশ্ন করিলেন, বেশ, বেশ। তা কোন্‌খানটায় কার বাড়ী, কিছু জানিস ?

জানি বৈ কি ! লালা চুন্নিচাঁদের বাগান ব'লে। নাম হচ্ছে—

জজ আগে-ভাগেই বলিলেন, প্যারাডাইস্, মা, প্যারাডাইস্।

হ্যাঁ।—তুমি জানলে কি ক'রে বাবা ?

সিকরৌলে ক্যাসানেবল বাগান বলতে ঐ একটাই আছে। কতবার

আমরা অর্কিড শো দেখতে গেছি যে! চমৎকার বাগান, চমৎকার বাড়ী, পুকুরটিও সুন্দর। তা ভাল; শুনে বড়ই আনন্দ হোল।

জজ-গৃহিণী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, ভাল ত বটেই। জামাইয়ের বাড়ী এমনি খালি পড়ে থাক্‌বে, তার চাইতে শ্বশুরকে যদি থাকতে দেয়, বাড়ীতে সন্ধ্যেও পড়ে, আর—

এই 'আরটা' যে কি হইতে পারে তাহা মা ও মেয়ে দু'জনেই অনুমানে বুঝিতেছিল। তবে সেটা অনুমানের ভিতরেই থাকে এই বাসনা করিয়া মেয়ে বলিয়া উঠিল, জামাই নিজেই সেই কথা বলেছিলেন যে—মা বাবা কেন সেই এঁদো পড়া কেদারঘাটে পড়ে থাকেন—

ত্রিশ টাকা ভাড়ায় এঁদো পড়া বাড়ী হবে না ত কি হবে! গৃহিণী ঝঙ্কার দিলেন। জজ এবারে ঝঙ্কারের উপর ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত করিয়া কহিলেন, ত্রিশ টাকা ভাড়াটাই দেখছো। কাশীতে বাড়ী পাওয়া যে কি দুর্ঘট, সেটা বুঝি কিছুই নয়?

গৃহিণী বলিলেন, ভাগ্যিবানের বোঝা ভগবানে বয়! জামাই ত আর কসাই হয়ে শ্বশুরের কাছ থেকে ভাড়া নিতে পারবে না; ভালই হোল তোমার। আমি কিন্তু দশাশ্বমেধ ছেড়ে, বিশ্বনাথ ছেড়ে, সিকরৌলে যাচ্ছি না, সেটা ভাল ক'রে মনে রেখো।

স্ত্রীজাতির ঘটে কবে বুদ্ধি জন্মিবে এবং কবে তাহা সুবুদ্ধি পর্য্যায়ভুক্ত হইবে তাহা ভাবিয়া জজসাহেব যখন কুলকিনারা পাইতেছিলেন না, তখন কন্যা কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান করে কহিল, যুদ্ধের সময়, পেট্রোলের কষ্টের দিনে যে ব্রুহাম গাড়ী ও ঘোড়া কেনা হয়েছিল, সেগুলো এখন কাশী পাঠাবার কথা হচ্ছে।

জজসাহেব মনে মনে উৎফুল্ল হইলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ হইতে দিলেন না; অতি সন্তর্পণে নীরবে রহিলেন; কিন্তু জজগৃহিণী এই নীরবতার যে কদর্থ করিলেন, ছিঃ ছিঃ ভদ্রসমাজে কি তাহা করিতে আছে? তিনি যেন কর্ত্তাকেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন, জামাই কি আর গাড়ী ঘোড়া-সহিস-কোচম্যানের খরচ না পাঠাবে, কি বল গো? তবে ভুলভ্রান্তির কথা বলা ত যায় না, মনে ভাবতেও পারে যে, শ্বশুর গাড়ী চড়ছেন, ঘোড়ার ঘাস জলটা শ্বশুরই দেবেন—এ রকম ভুল করতে পারে বৈ কি! উঁহু, যাতে ভুল না হয়, অন্ততঃ যাবার সময়ে সেটা চুপি চুপি বলে দিয়ে যেতে হবে।

পাছে পিতা কথার জবাব দেন এবং কথার পৃষ্ঠে কথা বৃদ্ধি হয়, মুকুল বলিল, আমরা তোমাদের সঙ্গে একদিনেই গাড়ী রিজার্ভ ক'রে যাব বাবা, কাল বারান্দায় ব'সে আমাকে তাই বলছিলেন।

বহুক্ষণ হইতেই কর্ত্তা ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য ধারণ করিতেছিলেন; কিন্তু গায়ে গা ও পায়ে পা লাগাইয়া কলহ করা যাহাদের জন্মগত অভ্যাস, তাহাদের থামাইবে কে? জজগৃহিণী কহিলেন, ঐ দেখ, একেই বলে, বরাত। ফেরবার গাড়ীভাড়াটাও বেঁচে গেল। জামাই নিশ্চয় গাড়ী রিজার্ভ করবে—করবেই; সে কি আর শ্বশুরের কাছে টিকিটের টাকা নিতে পারবে হাত পেতে!

কথার পিঠে কথা যোগান দেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন। দোয়াত ভর্ত্তি কালী ও জীল পেন্ পাইলে দিস্তা দিস্তা-কাগজে রায় লিখিতে কষ্টও হয় না, ভাবিতেও হয় না; কিন্তু যাহারা যুক্তি মানে না, আইন জানে না, সওয়াল বুঝে না, হায়, হায়, তাহাদের সঙ্গে কে আঁটিয়া উঠিবে! জজ সাহেব নীরব। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্য বসুমতীর ধৈর্য্য নহে। জজগৃহিণীর সে খেয়াল হয় ত ছিল না, কিন্তু কন্যার ছিল। মুকুল কৌতুকস্বরে কহিল, অনেকদিন বাড়ী যাই নি মা, আজ যদি একবার অনুমতি কর—

গৃহিণী কণ্ঠস্বরকে যতখানি সম্ভব সূক্ষ্ম ও বঙ্কিম করিয়া কহিলেন, কেন যাও নি বাছা! জামাইয়ের কত কষ্টই না জানি—

মুকুল কহিল, "বাবা-মাকে একলা হাসপাতালে রেখে এলে কি ব'লে" ক'রে রাত্রেই আবার না আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় ত বাঁচি।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তা-না-হয়, রাত্রেই আবার এসো।

কিন্তু জজপত্নী যেন খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—রাত্রে ত খরচ টরচের ভয় নেই, আঁৎকে নাই বা উঠ্‌লে।

মুকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, গেলে ভারী রাগ করবে, কিন্তু কি করবো—কালকে ইনসিওরগুলোর টাকা দেবার শেষদিন, নোটিশ টোটিশ সব আমার বাক্সে কিনা, তাই একবার যেতেই হবে। কাল আবার সকালেই আসবো।

একসঙ্গে কাশী যাওয়ার 'প্ল্যান'টা মুকুলের নিজস্ব এবং মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পরিকল্পনাটি তাহার মাথায় গজাইয়াছে। কেন গজাইয়াছে তাহাও কি আমার বুদ্ধিমতী সুধীরা পাঠিকা দেবীদের বুঝাইয়া বলিতে হইবে? তবে, হ্যাঁ, পাঠক মহাশয় অবশ্যই বলিতে পারেন, গল্প পড়িতে গিয়া প্রোবলেম সলভ করিয়া মরিব কেন হে বাপু? কথাটা খুলিয়া বলই না কেন শুনি। ইহার পরে আর না বলিয়া থাকি কেমন করিয়া?

মুকুলের প্রধান চিন্তা জননীর চোখের ঠুলি খোলা হইয়াছে; মলম লেপনের সংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে, অতঃপর হাসপাতাল হইতে বিদায় লইতেই হইবে। পদ্মিনী আসন্নপ্রসবা, কয়েকদিন হইতে মা'কে দেখিতেও আসিতেছে না,এমতাবস্থায় বাবা মাকে আবার তাহাদের খাঁচায় পাঠাইতে মন সরে না, অপিচ, নিজের বাড়ীতে আনিবার পথে যে বিঘ্ন তাহাও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুতরাং সেবা যত্ন করিতে করিতে কাশীর নতুন বাগান বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলে সব দিকেই বেশ মানান্ হয়। জয়দ্রথ 'না' করিবে না, মুকুল তাহা ভালই জানে; কিন্তু তাহাকে অগ্রিম তালিম দিয়া না রাখিলে সে যদি ইঁহাদের সামনে আকাশ হইতে পড়ে, তাই আজ একবার বাড়ী যাওয়া বিশেষ দরকার। আর মন কেমনের কথা, সে কথাও কি আবার বলিতে হইবে? মানুষ যে যতই বড় হোক্ আর ছোট হোক, নিজস্ব ভূমিটুকুর উপর মানুষের কি মর্ম্মভরা মমতা। পুরীতে পুরুষোত্তম দেবের মন্দিরাভ্যন্তরে দাঁড়াইয়াও কোথাকার কোন্ জমিতে একখণ্ড পুঁইলতা দেখিবার জন্য মানুষ মাথা খুঁড়িয়া মরিতে চাহে, মূলে সেই একটুকরা নিজস্ব ভূমি।

মনোরমা মুকুলকে বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া আর ছাড়ে না। মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কিন্তু কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেয়। অবিনাশ বলিল, বৌদি এইক'দিনেই কি রকম রোগা হয়ে গেছেন!

বৌদি একদিনেই কিরকম রোগা হ'য়ে গেছে

মনোরমা আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না: দু'টি চোখে অজস্র ধারা লইয়া মুকুলের পদনিম্নে বসিয়া পড়িয়া পদ্মের উপর পদ্ম রাখিয়া বলিতে লাগিল, রাজ-রাণী দিদি আমার, এই অভাগীর জন্যে পনেরো দিন আজ বাড়ী ছাড়া। রাজার মত বাড়ী, রাজার মত স্বামী, রাজার ঐশ্বর্য্য ছেড়ে হাসপাতালের কেবিনে মাটীতে মাদুর পেতে, দিদি আমার রাত্রে শুয়ে থাকেন। দাদা যখন এসে বললেন, আমি কেঁদে আর বাঁচি নে। কি কাল সাপই আমি তোমার ঘরে ঢুকেছিলুম দিদি। ইচ্ছে করে গুণ্ডায় ধরে ধরুক, যা হয় হোক্, যেখানে হোক্ চলে যাই। তুমি যে ভেসে ভেসে বেড়াও সে আর আমি চোখে দেখতে পারি নে, দিদি।

মুকুল এক গাল হাসিয়া মনোরমার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া, অবিনাশ ও জয়দ্রথকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মনোরমা নাকি আবার কথা জানে না! কেমন ইনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কথার চন্দ্রহার গাঁথছে দেখ ত!—তারপর তাহার মুখখানাকে নিজের মুখের উপরে চাপিয়া বলিল, ওরে বোকা মেয়ে, বাপ মা হাসপাতালে থাকলে ছেলে মেয়েকেও কাছে থাকতে হয়; নইলে কর্ত্তব্যের হানি হয়।

মনোরমা বলিল, কিন্তু অপারেশন কি তোমার রাজবাড়ীতে হতে পারতো না? দিদি আমি কি কচি খুকি, আমি কি কিছুই বুঝি নে। ক্যাপ্টেন সেনকে ফোন্ ক'রে হাসপাতালের জন্যে মাথার দিব্বি দিতে আমি শুনি নি বুঝি?

হাসপাতালে চিকিৎসা ভাল হয় রে, জংজলি, চিকিৎসা ভাল হয়। পাড়াগেঁয়ে ভূত, তুই এ সব জানবি কোত্থেকে বল্?

অবিনাশ বলিল, এ কথাটি বৌদি ঠিক বলেছেন। ভূত হয়েই আমরা আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসেছি বটে!

মুকুল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, তোমাকেও কি মনোরমার রোগে ধরলো নাকি? ও সব বাজে কথা ছেড়ে দাও; কাজের কথা আছে, বলি শোন। কৈ রে হরিচরণ, চা-টা একটু কিছু দে না বাবা, গলা শুকিয়ে যে কাঠ হয়ে গেল!

হরিচরণ অন্তরাল হইতে সাড়া দিল; বলিল, কাফি বসিয়েছি মা!

বেঁচে থাক্ বাবা!—তারপর জয়দ্রথকে বলিল, গাড়ী রিজার্ভ করো, অন্ততঃ পনরো দিন কাশীবাস করতেই হবে।

কাশীর বাড়ী রি-বিল্ড হচ্ছে, কমপ্লিট্ হতে এখনও যে অনেক দেরী।

টেলিগ্রাম করো; চাই কি, কাল মাষ্টার মশাইকে পাঠিয়ে দাও, উপর তালাটা দু'চারদিনের মধ্যে শেষ করতেই হবে। সিকরৌলের প্যারাডাইসেই কনভেলাসেন্সী হোক্।

জয়দ্রথ খুসী হইয়া পরমোৎসাহে কহিল, এটা ত ভালই মতলব করেছ। ধুলো পায়ে বিদায়।

"দূর্! মা যে। ও কথা কি বলতে আছে?"—মুকুল হাসিয়া বলিল। জয়দ্রথ বলিল, বলতে নেই; করতে আছে; কেমন? তা উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমি না গেলে চলে না?

মুকুল শশব্যস্তে কহিল, উঁহুঁ, বোনা-ফাইডি প্রমাণ করতে হবে ত!

রাইট্-ও; "ওকে! ওকে!"

চতুর্থ ভাগ

কিন্তু ধর্ম্মের নাকি একটা কল আছে এবং সেটা বাতাসে নড়ে। কি রকম চেহারা এই কলের, তাহা জানি না; তবে বোধ হয়, বিলাতে উইণ্ড মিলের যে ছবি দেখিতাম, সেই রকম একটা কিছু হইলেও হইতে পারে। সেদিনটা ছিল, রবিবার। কলিকাতা সহরে, রবিবারের মত মর্য্যাদা! কেরাণীর জাতি আর অলস ঘোড়া, অবসরের আনন্দ, উত্তম ও পরমানন্দ। বাড়ীর কর্ত্তা গৃহিণী হইতে খানসামা হরিচরণ ও ক্লীনার নিত্যানন্দ বেলা আট-টা পর্য্যন্ত অঘোরে রবিবাসরীয় নিদ্রায় মগ্ন, হাসপাতালে চা যায় নাই, অন্ততঃ অসম্ভব বিলম্ব হইয়াছে, অতএব, জজ সাহেবের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। হোটেলে, রেস্তোঁরায়, চা-ঘরে জজ সাহেবের বিষম বিরুচি। কিয়ৎকাল হাসপাতালের বারান্দায় পায়চারি করিয়া, মানুষের নয়নযুগলকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে রূপান্তরিত করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ট্রে-করধৃত হরিচরণ-আয়ধের বীজাণুর তথ্যানুসন্ধানে বিফলমনোরথ হইয়া রাজা সীতারাম বর্ম্মের দিকে চরণযুগল পরিচালিত করিয়া দিয়াছিলেন। "উদয়ন" উদ্যানে, ও কে, দলনী বেগম না কি? রঞ্জিত ফুলবনে, প্রভাত সমীরণে দলনীর বীণা ধ্বনি দলনীকেও বিমোহিত করিয়াছিল কি-না আমি জানি-না, দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ শুভ্র শ্মশ্রু সন্ন্যাসী (চন্দ্রশেখর কি?) সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নবাব পত্নী তাহা দেখিতেও পাইল না। মীরকাশেম কি বেদগ্রাম হইতে জ্যোতির্ব্বিদ চন্দ্রশেখরকে আমন্ত্রণ দিয়াছে, গণনা

করিতে বলিবে "এখন দলনী কোথায় থাকিবে?" বীণা-বাদন শেষ করিয়া চক্ষু তুলিতেই "দলনী" সভয়ে দেখিল, "দীর্ঘাকার পুরুষ গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয় বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল।" "দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া ভয় জন্মিয়াছিল।" কি জানি কেন, দলনীর পা দু'টা কুরঙ্গ চরণের প্রেরণা লাভ করিয়া তাহাকে লইয়া পলায়ন করিতেই উদ্যত হইল। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর' গুরু গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, দাঁড়াও। "কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ।" কুলসম বলিয়া কোন লোক সেখানে ছিল না, তাই "আপনি কে?" এ প্রশ্ন কে করিবে?

দীর্ঘাকার পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গা বাছা, তুমি কি মরিয়ম নও? আমার সেরেস্তাদার মহম্মদ জলিলের মেয়ে—মরিয়ম কি তুমি নও?

এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে 'দলনী বেগম' বেতস পত্রের মত কাঁপিতেছিল; "দাঁড়াও" শুনিবামাত্র তাহার হাত-পায়ের শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল; নহিলে ব্যাধবাণবিদ্ধ হইবার পূর্ণাশঙ্কা সত্বেও কি সেখানে সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত? হায় কুরঙ্গিণি, লতাগুল্মে আপাদমস্তক বদ্ধ, পলায়নেরও সাধ্য নাই, আত্মরক্ষারও সম্ভাবনা নাই! বিপদকালে বিপরীত বুদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবান সুপ্রসন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব মরিয়মকে আশ্বস্ত করিল।

মরিয়ম যেন স্থান কালপাত্র ভুলিয়া অকস্মাৎ সোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া কহিয়া ফেলিল, জ্যাঠামশাই! আপনি! আপনি এখানে?

সে বলছি; কিন্তু মা জননী আমার, আমায় তুমি চিনতে পারলে না কেন?

আপনার ত তখন দাড়ি ছিল না জ্যাঠামশাই? আদাব, জ্যাঠামশাই, আদাব। আপনি বুঝি ঐ রাস্তা থেকেই আমায় চিন্তে পেরেছিলেন তাই বুঝি—

দীর্ঘাকার পুরুষ কহিলেন, না মা, চোখের অত জোর নেই। ভেতরে এসে চিনলুম; তুমি একমনে বাজাচ্ছিলে, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাই শুনলুম। কি মা-লক্ষ্মী, হরিচরণ কোথা গেল বলতে পার? সে সাতটার ভেতর রোজ চা নিয়ে যায়, আজ কেন গেল না, তারই খোঁজে এতদূর আসতে হোল মা!

মরিয়ম মুহূর্ত্তে মনোরমা হইয়া পড়িল; মুহূর্ত্তে প্রফুল্লচম্পকসদৃশ মুখখানি বাসি শুষ্ক টগর হইয়া গেল। জজ সাহেব বলিলেন, তোমার বাবা রিটায়ার ক'রে কলকাতায় বিলিতি ওষুধ আমদানীর কারবার করেছিলেন; না মা? জলিল এখন কোথায়, তোমার ভাই দুটিই বা কোথায়?

মাটীতে বসিয়া পড়িয়া মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তাঁরা কেউ নেই, জ্যাঠামশাই!

জজ সাহেব তাহার মাথায় হাত দিয়া, আদর করিয়া উঠাইয়া স্নেহস্বরে কহিলেন, বাড়ীর ভেতর চল মা, সব শুনবো। তুমি জান না বোধ হয়, এটি আমার জামাই বাড়ী; মুকুল আমার বড় মেয়ে! এই যে হরিচরণ, এত বেলা করলে কেন বাপ্?

হরিচরণ চা-সজ্জা লইয়া বাহির হইতেছিল, আচম্বিতে যেন ভূত দেখিয়া রাম রাম হরে রাম করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল; জজ

জ্যাঠামশাই আপনি!

সাহেব থ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তারপর মনোরমাকে বলিলেন, চল মা, ভেতরে চল। মরিয়ম, ছেলেবেলায় তোকে আমরা কি বলে ডাকতুম, বল্ দেখি।

মরিয়ম শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আপনি বলতেন, ছবি; জ্যাঠাইমা বলতেন, হাবি। ছুঁয়ে টুঁয়ে ফেললে জ্যাঠাইমা বড্ড রাগ করতেন।

মনে আছে, দেখছি!—বৃদ্ধ মরিয়মের বাহুধারণ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু মরিয়মের পা চলেনা। 'দলনী'ও সে রাত্রে চলচ্ছক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিল—যেদিন গুরগন্ খাঁনের আদেশে দুর্গদ্বারসমূহ 'দলনী'র মুখের উপরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মরিয়মও দেখিল, এই গৃহের দ্বারও তাহার চোখের সামনে রুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। বৃদ্ধ কি বুঝিলেন অথবা কি ভাবিলেন কে জানে, স্বীয় দুহিতার গুণ গানে মুক্তকণ্ঠ হইয়া বলিতে বলিতে চলিলেন, মুকুল আমার বড় ভাল মেয়ে। মুকুলের মত বুদ্ধিমতী, দয়াবতী মেয়ে আমি আর দেখি নি। মুকুলের মত মেয়ে হাজারে একটি—উঁহু, লাখে একটি—না বোধ হয়, কোটীতেও একটি হয় কিনা সন্দেহ। না বাছা, আমি ত এমনটি আর কখনও দেখি নি।

পঞ্চম ভাগ

অনেক বেলায় হাসপাতালে ফিরিবার সময় জজ সাহেব মুকুলকে বারম্বার আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, মুকুল, তুই মা আমার ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মানুষকে অন্ন দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। তাই পরাধীন, পরপদাশ্রিত ভারতবর্ষকেও পৃথিবী ভক্তি করেছে, শ্রদ্ধা জানিয়েছে। তুই মা আমার সেই মহান্ ভারতের মহৎ মেয়ে!—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন; আবার বলিলেন, হ্যাঁরে মহৎ মেয়ে হবে, না মহতী মেয়ে হবে, তুই ত বাঙ্গলায় বি-এ পাশ করেছিলি, বল্ দেখি, ভুল হোল নাকি?

তুমি ভুল করবারই লোক বটে! কিন্তু বাবা, মা—

জজ সাহেব জিভ্ কাটিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বাস্‌রে! খবর্দার, খবর্দার! তাঁর কাছে কোন কথা নয়। কিন্তু মা, তুই আমার ভারতবর্ষ। তুই আমার ভারতবর্ষ! নিজের মেয়ে ব'লে বলছি তা নয় মা, তোর মুখের পানে চেয়ে,সত্যি বলছি মুকুল, আমি যেন ভারতবর্ষকে দেখতে পাচ্ছি। মা, তুই আমার ভারতবর্ষ—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখে জল আসিয়া পড়িল, ছাতার কাপড়ে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন।

মুকুল পিতার পাদস্পর্শ করিয়া কহিল, চল বাবা, ওখানে মা আবার ব্যস্ত হচ্ছেন হয় ত!

জজসাহেব আস্তে আস্তে কহিলেন, চল মা ভারতবর্ষ।

এইতো জীবন

শ্রীমতী বেলারাণী দাস

সন্ধ্যার আব্‌ছা অন্ধকার তখনও ভাল করে পড়ে নাই। সুমায়া সমস্ত দিনের পরে কর্মক্লান্ত দেহ নিয়ে ফিরে আসে তার ছোট্ট ঘরটীতে। এ সময়টুকুতে সে ফিরে পায় নিজেকে। জানালার কাছে এসে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয়—এই মুহূর্ত্তটুকুই সে সমস্ত কাজ থেকে মুক্ত, সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে—নিঃসংগ। নিবিড় রহস্যভরা অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে নিজের জীবনের কতকগুলি দিনের কথাই মনে পড়্‌ছে। যে দিনগুলি চলে গিয়েছে। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। মনে পড়ে গেল অতীতের একটি কাহিনী:

মাত্র ক'বছর আগের কথা। বিয়ে ঠিক হোলো। সুমায়া ভবিষ্যত জীবনের কতকগুলি সুন্দর ছবি স্বপ্নের মত জাল বুনে চলেছিল। মনে মনে ঠিক করলে, পড়াশুনা ছাড়বে না কিছুতেই। তারপর? হ্যাঁ তারপর নতুন জীবনের মোহ কেটে গেল কিছুদিনের মধ্যে। দেড় বছর পর এলো একটী ছেলে। পড়াশুনা কোথায় গেল—জীবনে এলো বাস্তব—রূঢ় সত্যের সংঘাতে সব কিছু কল্পনা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল—অন্ধকার রাত্রির পরিব্যাপ্তির মাঝে। একঘেয়ে—একটানা—বৈচিত্র্যহীনভাবে চলেছে দৈনন্দিন জীবন।

সুমায়া হাসে মনে মনে। কত কথাই আজ মনে পড়্‌ছে। সেবার "জীবনের উদ্দেশ্য" নাম দিয়ে একটী বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়েছিল। সুমায়া পেয়েছিল প্রথম পুরস্কার। আজ সেদিনের সেই বক্তৃতার প্রতিটী কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। "সাধারণতঃ নারীরা যাহা লইয়া সুখে থাকে—আমি কেবল তাহা লইয়াই সুখী হইব না। স্বামী-পুত্রবেষ্টিত একটী সুখের নীড়—তারপর মৃত্যুর কোলে শান্তি শয়ান—ইহাই নারীদের সারা জীবনের একান্ত কাম্য। কিন্তু তাহারা অজ্ঞাত, অখ্যাতভাবে পৃথিবী হইতে বিদায় নিল, পরন্তু জগতের কোন উপকারই যদি না করিল, তবে এমন জীবন ধারণ করিয়া লাভ কি? প্রথমতঃ চাই শিক্ষা, শিক্ষা নারীদের একান্ত দরকারী। অশিক্ষিতা কন্যা, অশিক্ষিতা স্ত্রী, অশিক্ষিতা মাতা সংসারে দুর্বহ বলিয়া মনে হয়। সেই শিক্ষাই আমি লাভ করিব, সেই শিক্ষা দ্বারা জগতের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিব। সমাজের এবং সংসারের অন্ধ সংস্কার মানিয়া আমি চলিব না। যাহা খাঁটি সত্য, যাহা ধ্রুব, তাহার সন্ধানই হইবে আমার জীবনের জয়যাত্রা……। আমি হইতে চাই একজন আদর্শ নারী। সতীত্বে সাবিত্রীর মত, বীরত্বে দুর্গাবতীর মত, ত্যাগে মীরাবাঈয়ের মত।……

মাঝখানের অনেক কথাই মনে পড়্‌ছে না। সেই দিনের সেই উত্তেজনা, সেই কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে সুমায়ার কানে। সুমায়া সব ভুলে যায়, ভুলে যায় তার বর্ত্তমান জীবন, চোখের সামনে যেন দেখ্‌তে পায় সে ফিরে এসেছে এক নতুন জীবনের মাঝে। ত্যাগে মীরাবাঈয়ের মত, বীরত্বে দুর্গাবতীর মত, দেশের জন্য সে জীবন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কোথায় ভেসে গেছে তার সাজান সংসার, তার স্বামী, তার দুটী ছেলে।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? বৃষ্টিতে সমস্ত ঘর যে ভিজে গেল। জানালাগুলো বন্ধ করবার সময় হয়নি বুঝি?"

সব কল্পনা, সব স্বপ্ন মিলিয়ে যায়—বাস্তব-জগতের স্বামীর কণ্ঠস্বরে। সুমায়া চম্‌কে ওঠে। ভাবে—কখন আবার বৃষ্টি হোলো? জানালার কাছ থেকে স'রে আসে। অকারণে চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে—ঝাপসা হ'য়ে আসে অশ্রুভারে।

(২)
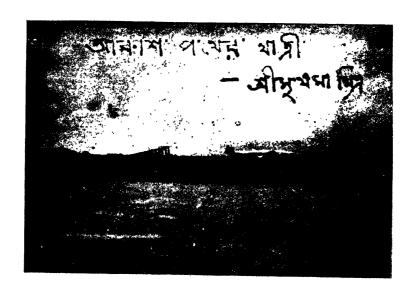
কলিকাতার সময় হ'তে ২½ ঘণ্টা বাদ দিলে তুরস্কের সময় হয়। আমরা ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চলেছি। বিমানঘাঁটী হ'তে কোচে করে ৪।৫ মাইল দূরে একটি হোটেলের রেসটুরেন্টে খেতে গেলাম। রাস্তার দু'ধারে তুরস্কের ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট দেখতে দেখতে চলেছি। সবুজ ঘাসে ঢাকা পতিত জমিগুলি বেশ উর্ব্বর বলেই মনে হল। ওয়েটাররা আধা-ইংরেজী ও আধা-তুরস্ক ভাষায় কথা বলে আমাদের বেশ যত্ন

লণ্ডনের রাজপথ
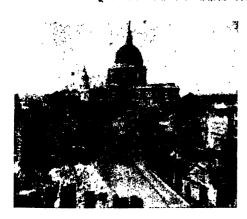
আপ্যায়িত করে খাওয়ালে। খাওয়া সেরে আমরা বাইরের বারাণ্ডায় কিছুক্ষণ বসে রইলাম। চোখে পড়লো সামনের একটি বাড়ীতে একপাটি পুরাণো জুতা জানলায় ঝুলছে। স্থানীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে এখানে গৃহস্থেরা শুভ ও মঙ্গলের জন্য ঐ একপাটি পুরাণো জুতা বাড়ীতে ঝোলায়—এটা এদেশের সংস্কার।

যা হোক্, আমরা জানি কামালপাশার দেশসেবায় ও সাধনায় তুরস্কের জাতীয় জীবনে এক নব জাগরণের সাড়া এসেছে—আজ তারা সর্ব্ব বিষয় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

যথাসময়ে আমরা ফিরে গেলাম, বিমান আকাশে উঠলো। খুকু আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমালো, যাত্রীরাও একে একে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো, এর মধ্যে আবার নাক ডাকাও শোনা যেতে

নেলসন স্মৃতিস্তম্ভের পাদমূলে

লাগলো। আমি চুপচাপ বসে আছি; ভীষণ ভাবনা হচ্ছে কি করে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমানো যাবে, সারারাত হয় তো জেগেই কাটবে। রাত তখন ৩টে, লণ্ডন সহরের রাস্তার আলো দু'ধারে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেল্ট বাঁধার আলো জ্বললো। ষ্টুয়ার্ডেস্ এসে সকলকে জাগিয়ে দিলে। এরোপ্লেনের বাঁশী বেজে উঠলো, আমরা ধীরে ধীরে লণ্ডনের হিটরো বিমানঘাঁটিতে নামলাম। বিমানের দরজার সামনে

আসতেই ঝড়, বৃষ্টি ও শীতে কেঁপে উঠলাম, শীতে কাঁপতে কাঁপতে দৌড়ে বিমানঘাঁটির বসবার ঘরে ঢুকলাম। ঘর গরম করা রয়েছে—কি আরামই না হ'ল। পরক্ষণেই আবার হাঙ্গামা সুরু হল—মালপত্তর পরীক্ষা, পাসপোর্ট দেখানো ও কাগজপত্রে সই করা। সব কিছু সারা হলে ফিরে গেলাম বসবার ঘরে। Thos Cookএর লোকের

লণ্ডনের আফিস অঞ্চল

সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরছি, আমাদের হোটেলের ঘর রিজার্ভ করার ভার তাদেরই উপর। কিন্তু কোথায় তারা! তাদের একটি লোকেরও দর্শন মিললো না।

এই অন্ধকার রাতে কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় একজন পোর্টার একখানি টেলিগ্রাম আমাদের দিল। আমাদের জনৈক

চার্লস ডিকেন্সের ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ্‌

লণ্ডনবাসী বন্ধু—Mr. and Mrs. Jacob লিখে জানিয়েছেন যে একটি হোটেলে আমাদের জন্ম ঘর রিজার্ভ করা হয়েছে। বুঝলাম ডাঃ মিত্র Thos Cookএর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে এঁদেরও ঘরের জন্ম লিখেছিলেন। যা হোক্, খুব খুশী হয়ে আমরা মালপত্তর নিয়ে কোচে গিয়ে বসলাম। চারিদিক অন্ধকার, জনমানবহীন রাস্তার দুধারে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথে আমাদের একখানি মাত্র গাড়ী চলেছে। ১৮ মাইল পথ অতিক্রম করে বাকিংহাম প্যালেস্ রোডে এয়ারওয়ে টারমিনাসে এলাম। তখনও আকাশ অন্ধকার, নিস্তব্ধ সহর নিঝুমপুরীর মত ঘুমিয়ে আছে। আমরা টারমিনাসের বসবার ঘরে বসেছি। এক একবার রাস্তায় বেরিয়ে দেখছি গাড়ী চলাচল সুরু হল কিনা। লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছি—ক্রমে আকাশ আলো হয়ে উঠলো, রাস্তায় ২।১টি পথিকের চলাফেরাও সুরু হল; ভীষণ ঠাণ্ডায় আর দাঁড়ানো গেল না, আমরা ঘরের ভিতর গিয়ে একজন এয়ার-অফিসারকে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি আনিয়ে দিতে বললাম। তিনি তখনই Phone করলেন—গাড়ী এসে গেল; আমরা Hotel Mapletonএর দিকে রওনা হলাম। পথের দুধারে
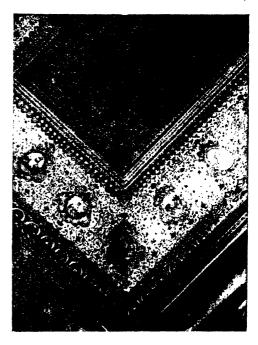
ওল্ড বেলী

কালো পোড়া ভাঙ্গাবাড়ীর সারি দেখতে দেখতে চলেছি। বাকিংহাম প্যালেস্ পেরিয়ে পার্লামেন্টের জোড়াবাড়ীর সামনে দিয়ে এসে চৌমাথায় একটি বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়ালো। আমরা Mapleton Hotelএর ভিতর প্রবেশ করলাম, এত ভোরে হোটেলের সবটাই নিস্তব্ধ; কেবলমাত্র একটি লোক নীচের Reception অফিসে রয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে ঘর আমাদের রিজার্ভ হয়েছে। তবে বেলা ১২টার আগে মিলবে না। কি করা যায়। লোকটি পরামর্শ দিল, উপরে বসবার ঘরে খানিকটা বিশ্রাম করে নিতে এবং নিজেই আমাদের মালপত্তর সঙ্গে নিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। তখনকার আস্তানা যখন ঠিক হল, তখন আমরা অনুভব করতে লাগলাম

যে 'বিলেতে' এসেছি। এই সেই বিশ্ববিশ্রুত বিলেত, যা ছাত্র সমাজের তীর্থস্থান, বিজ্ঞান সমাজের আদর্শপীঠ, ব্যবসায়ীর কর্ম্মস্থল—এক কথায় আধুনিক পৃথিবীর আকর্ষণ কেন্দ্র।

বসবার ঘরের পাশেই ছিল স্নানের ঘর, আমরা সেখানে হাতমুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নিলাম। বসবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখি—রাস্তায় সবেমাত্র ২।১টি গাড়ী চলাচল সুরু হয়েছে, মাল বোঝাই করে ঘোড়ার গাড়ী ধীরে ধীরে চলেছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের রাস্তা সরগরম হয়ে উঠলো, যানবাহনও পথচারীতে রাস্তা ভরে গেল, ভীড় ঠেলে রাস্তায় হাঁটা দায়। আমরা একটু বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তিনতলার দু'খানি ঘরে বাক্স গুছিয়ে রেখে প্রাতরাশ হোটেলেই সারলাম, তারপর জ্যোকব পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লণ্ডনের Underground tube Stationগুলিতে যাত্রীদের যাতায়াতের অতি উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত রয়েছে। মাটির তলায় ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণগুলি যাত্রী নিয়ে অনবরত সহরের দূর দূরান্তে ছুটে চলেছে, প্রতি ষ্টেশনে প্রায় ১ মিনিট অন্তর ট্রেণ আসছে, যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয় না। আমরা ৩ মিনিটের মধ্যেই বন্ধুর বাড়ীর কাছে গেলাম। সেখানে গল্প করে বেলা ১টায় Rotary clubএ উপস্থিত হলাম। বিদেশী রোটারিয়ানরা খুবই আলাপ আপ্যায়িত করলেন, স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট তাঁর পাশে আমাদের স্থান করে দিলেন। লাঞ্চ খাওয়া আরম্ভ হল; সেদিনের বক্তব্য বিষয় ছিল 'World Peace'; বক্তার পাঠ শেষ হলে আলোচনা চললো।

উনি উঠে দাঁড়িয়ে নিজের একটু মতামত প্রকাশ করে বল্লেন—"শান্তির একমাত্র পথ হল পরার্থে আত্মদান। এ ছাড়া নিজের জাতির বা জগতের শান্তি আসা অসম্ভব। আমি ভারতবর্ষ থেকে আসছি—যে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষদের আত্ম-ত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে লেখা রয়েছে। তাঁরা নিজের জীবনে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন শান্তি ত্যাগেই মেলে। সেই বুদ্ধের যুগ হ'তে আজ এই গান্ধীর যুগ অবধি সেই একই বাণী আমরা শুনে আসছি। এটোমবোমার শক্তি যে অসীম তাতে সন্দেহ নেই, তা দিয়ে জগৎকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা হতে পারে না।"
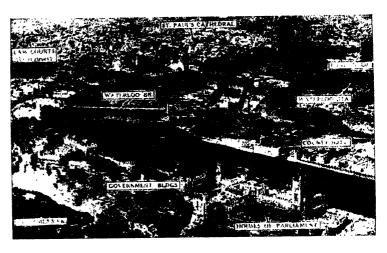
বিমান থেকে লণ্ডনের দৃশ্য

সেণ্টপল্‌স্ ক্যেথিড্রালের চূড়া

রোটারিয়ানরা পরস্পর একটু মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। যাহোক, মুখে প্রশংসা ও খুশীর ভাব প্রকাশ করলেন; সভা ভঙ্গ হল।

আমরা হোটেলে ফিরলাম। বিকেল বেলা চা খেয়ে আবার রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি। লণ্ডনের রাস্তার দু'ধারে আধভাঙ্গা পোড়া বাড়ীর

সারি দেখতে দেখতে চলেছি, লাইনের পর লাইন, রাস্তার পর রাস্তা বাড়ীগুলি জ্বলে পুড়ে ঐ একই অবস্থায় আছে। এই সকল ধ্বংস স্তূপের মাঝে কোথাও বা বড় বড় গর্ত্ত হয়ে রয়েছে। সন্ধ্যা হ'তে একটি রেষ্টুরেণ্টে খেয়ে সেদিনের মত বেড়ানো শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন ১লা মে, আমরা সকালেই মালপত্তর গুছিয়ে বাক্সে তুলে ফেললাম। হোটেলের হিসাব চুকিয়ে বেলা ১২টার সময় ঘর ছেড়ে দিলাম। বাইরে গেলাম লাঞ্চ খেতে। বেলা ৩টার সময় ফিরে এসে মালপত্তর নিয়ে এয়ারওয়েটারমিনাসে উপস্থিত হলাম; ষ্টকহলমের লাইনের একটি বড় বিমানে উঠ্‌লাম। দু'জন সুইডিশ মহিলা ষ্টুয়ার্ড আমাদের জিনিষগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়েই রইল, শেষে একটু ফিক্ করে হেসে একট্রে চুইংগাম নিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোন দেশ থেকে আসছি। হাসতে হাসতে বল্লে "কি সুন্দর তোমাদের পোষাক" (costume)।

বিমান আকাশে উঠে পড়লো। আমরা মোট ১৬ জন যাত্রী চলেছি, অর্দ্ধেকেরও বেশী চেয়ার খালি পড়ে আছে। ষ্টুয়ার্ডেশরা অনবরত কেক্, বিস্কুট, চা, কফি, দিয়ে যাচ্ছে। খুকু আর উমি মনের সাধ মিটিয়ে অনবরত মিষ্টি খেয়ে চলেছেন। খুব খুশী হয়ে শেষে মন্তব্য করলেন যে সুইডিশ এয়ার লাইনের বিমানই সব চেয়ে ভালো।

আমরা ৮ হাজার ফিট উপরে উড়ে চলেছি। উপরে গাঢ় নীল আকাশ, নীচে ছেঁড়া মেঘের টুকরো চারিদিকে ছড়ানো, ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারছে পৃথিবীর ঘর বাড়ী মাঠ ঘাট।—মনে হচ্ছে কে যেন তুলো ধুনে পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। দলে দলে সাদা ধবধবে স্তবক ভেসে আস্‌ছে, স্তবকের পর স্তবক স্তরে স্তরে জমে উঠ্‌লো—পৃথিবীর সব ফাঁক ঢেকে দিয়ে অসংখ্য স্তবকমালা আকাশ জুড়ে ভেসে রয়েছে—এ যেন এক মেঘসাগর—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমি অনিমিষে চেয়ে আছি। নীরব নিস্তব্ধ সন্ধ্যা। আমরা যেন কোন অজানার যাত্রী, মেঘরাজ্যের যাত্রীর দল থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে—ভাবছে এ রাজ্যে আবার কারা এল! বিশ্ব যেন মৌন মুনি।

ঘরের ভিতর ফিরে দেখি সামনের কাঁটা দশ হাজার ফিট অবধি উঠেছে। আমি ওদের সকলকে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে বললাম। (ক্রমশঃ)

কাশ্মীরের যুদ্ধ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্থান ও আফ্‌গানিস্থান এই কয়টি রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত হইয়া, পর্বত, হ্রদ, নদী ও কুসুম মালায় পরিশোভিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রম্য নিকেতন ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য অবস্থিত। ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের আমল হইতে এতদিন পর্যন্ত এই ভূস্বর্গের নৃপতিবৃন্দ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বৎসরে দুইটি কাশ্মীরী শাল ও তিনখানি রুমাল মাত্র কররূপে প্রদান করিয়া, নিরুপদ্রব নির্বিঘ্নে বৃটিশের ছত্রছায়ায় অবস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হওয়ায় কাশ্মীর হইতেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিরাজ ক্ষমতার লোপ হইল। তখন কাশ্মীরের মহারাণা স্যার হরিসিং ইন্দ্র মহীন্দ্র বাহাদুর বিভক্ত ভারতের দুইটি ডোমিনিয়নের কোনটিতেও যোগ না দিয়া, নিজ রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলেন। তবে অর্থনৈতিক কারণে ১৫ই আগষ্টের অব্যবহিত পরেই পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত তিনি স্থিতাবস্থা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন।

ভারত বিভক্ত হইলে ভারতের অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। যে সকল দেশীয় রাজ্য বিভক্ত ভারতের কোন অংশে যোগদান না করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে বা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার মনস্থ করে; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের এই স্বাধীনতার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করিবার কথা জানাইয়া দেয়। ঠিক এই সময়ে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ জিন্না কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্বীকার করিয়া লইলেন। এ সম্পর্কে তিনি এক বিবৃতিতে বলিলেন—আমার মতে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছা করিলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারে, কারণ তাহাদের সে অধিকার রহিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিঃ জিন্নার এই বিবৃতির পর কিছু দিন যাইতে না যাইতেই, পাকিস্থানের সহিত কাশ্মীরের স্থিতাবস্থা চুক্তি সত্ত্বেও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরকে খাদ্য, লবণ, পেট্রোল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি দিতে অস্বীকার করিলেন। এই ভাবে অর্থনৈতিক দিক্ হইতে জব্দ করিয়া পাকিস্থানে যোগ দিবার জন্য তাহার উপর চাপ দেওয়া আরম্ভ হইল। ইহাতেও যখন দ্রুত কাজ হাসিল হইল না, তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট উপজাতি পাঠানদের দ্বারায় কাশ্মীর আক্রমণ করাইয়া দিলেন। এই আক্রমণের অন্তরালেই শুধু পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট থাকিলেন না। প্রকাশ্যভাবে নিজেদের সৈন্য অফিসার, অস্ত্র, ট্রাক, রসদ প্রভৃতি দিয়া আক্রমণকারীদের সাহায্য করিলেন। এই আক্রমণের পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য রহিল—কাশ্মীরে ব্যাপকভাবে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীহরণ প্রভৃতি আক্রমণাত্মক

ধ্বংসের ভিতর দিয়া একটা প্রবল ভীতির সৃষ্টি করিয়া কাশ্মীরকে পাকিস্থানে যোগদান করিতে বাধ্য করা।

একটি সুপরিকল্পিত সামরিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া এই আক্রমণ আরম্ভ করা হইল। প্রথমতঃ অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে পক্ষকাল ধরিয়া পশ্চিমপাঞ্জাবের সীমান্তে কাশ্মীর রাজ্যে ছোটখাট লুঠপাঠ ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা হইল। তাহাতে কাশ্মীরের মহারাজা গণ্ডগোল থামাইবার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া জম্মুতে পাঠাইয়া দিলেন। এই সেনাবাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া যখন জম্মুতে দাঙ্গা নিবারণে ব্যস্ত ছিল, তখন প্রবল সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারায় কাশ্মীর আক্রমণ সুরু হইল। ২২শে অক্টোবর তারিখে দুইটি বিরাট সশস্ত্র পাঠান বাহিনী—একটি রাওলপিণ্ডির দিক হইতে, অপরটি এবটাবাদের দিক হইতে আসিয়া ডোমেলের নিকটে একত্র হইল, তারপর পাকিস্থান জিন্দাবাদ প্রভৃতি ধ্বনি করিতে করিতে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিল। কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে মজঃফরাবাদ দখল ও ভস্মীভূত করিল এবং উরি সহর ঘেরিয়া ফেলিল। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ ও নারীহরণ করিতে করিতে হানাদাররা কাশ্মীরের ভিতর আগাইয়া চলিল। ২৪শে তারিখে উহারা বরমুলা সহর দখল করিয়া, সেখানে একটি শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করিল এবং সেখান হইতে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অভিমুখে রওনা হইল।

এই আক্রমণকারীরা সৈন্য, লুণ্ঠনকারী ও অনুগামী এই তিনটি দলে বিভক্ত হইল। সৈন্যরা বন্দুক রাইফেল, ব্রেণগান, মর্টার প্রভৃতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মুসলমান অফিসারদের দ্বারায় পরিচালিত হইয়া নির্বিবাদে ধ্বংস চালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। লুণ্ঠনকারীদল সৈন্যদলের ঠিক পরে পরে থাকিয়া যাহা পায় সমস্তই লুটিয়া লইতে থাকিল। আর পশ্চাতের অনুগামী দল উক্ত দুই দলের খাদ্য সরবারহ ও অন্যান্য ব্যবস্থায় রত রহিল।

সীমান্তের প্রধানমন্ত্রী খান আবদুল কোয়ায়ুম হাজারায় তাঁহার হেডকোয়ার্টার স্থাপন করিয়া, সেখান হইতে কাশ্মীর আক্রমণকারীদের পরিচালিত করিতে থাকিলেন এবং সীমান্ত সরকার আক্রমণকারীদের জন্য সমস্ত শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে সীমান্তের খোদাই খিদমদগার কর্মীরা সীমান্তের জনগণ ও উপজাতিদের কাশ্মীর আক্রমণ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, সীমান্ত গবর্ণমেণ্ট খোদাই খিদমদগার কর্মীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে লাগিলেন।

কাশ্মীরের এই আকস্মিক বিপদ দেখিয়া কাশ্মীরের মহারাজা ২৬শে তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের সামরিক সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ঐ দিন তিনি ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট এক জরুরী পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজনকে নয়াদিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কাশ্মীরের যোগদানের কথাও জানাইয়া চুক্তিপত্র পাঠাইলেন। কারণ মহারাজা বুঝিয়াছিলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান না করিলে তাঁহাকে সাহায্য করা ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

মহারাজা তাঁহার পত্রে লিখিলেন—পাকিস্থানের সহিত আমার গবর্ণমেণ্টের স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্বেও পাকিস্থান গবর্ণমেণ্ট আমার রাজ্যে খাদ্য, লবণ, পেট্রোল প্রভৃতি সরবরাহ অত্যধিক পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। উন্মত্ত মানবরূপী যে পশুদল আমার রাজ্যে আসিয়া হত্যা ও ধ্বংস সুরু করিয়া দিয়াছে, তাহাদের বাধা দিবার জন্য আমার গবর্ণমেণ্ট পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টকে উপরি উপরি অনুরোধ করা সত্বেও তাহারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। এই অরাজক অবস্থা দূরীকরণের জন্য অগোণেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন। আমি আপনাকে আরও জানাইতেছি যে, শীঘ্রই আমি রাজ্যে একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিব। এই জরুরী অবস্থায় কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লাকেই প্রধান মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিব।

ঠিক এই সময়ে কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লাও কাশ্মীরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে নয়াদিল্লীতে আসিয়া নিষ্ঠুর আক্রমণকারীদের হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

কাশ্মীরের মহারাজা ও শেখ আবদুল্লার আবেদনে ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরকে দ্রুত সাহায্য করার কথা ২৬শে তারিখেই স্থির করিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ২৭শে তারিখে কাশ্মীরের মহারাজার পত্রের উত্তরে জানাইলেন—আপনার ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রস্তাব আমার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছে। তবে আমার গবর্ণমেণ্টের নীতি এই যে, কোন রাজ্যের কোন ডোমিনিয়নে যোগদান লইয়া বিরোধ দেখা দিলে, সেখানের জনসাধারণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। অতএব কাশ্মীর হইতে দুর্বৃত্তদল বিতাড়িত হইলে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে, তখন জনসাধারণের ভোটের দ্বারাই কাশ্মীর কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে তাহা চূড়ান্তভাবে স্থির হইবে। তবে আপনার রাজ্য ও আপনার প্রজা সাধারণের ধন, মান, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য আজই ভারতীয় সামরিক বাহিনী আপনার সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠান হইতেছে।

২৬শে অপরাহ্ণে ভারতগবর্ণমেণ্ট কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণের কথা সিদ্ধান্ত করিলে, ঐদিন সমস্ত রাত্রি ধরিয়াই সৈন্যরা প্রস্তুত হইল। পরদিন ২৭শে অক্টোবর অতি প্রত্যূষেই লেঃ কঃ ডি, আর, রায়ের পরিচালনাধীনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রথম বিমানযোগে কাশ্মীর রওনা হইল। এই ভারতীয় সেনাবাহিনী শ্রীনগরের বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করিয়াই আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিবার জন্য বরমুলা অভিমুখে যাত্রা করিল। আক্রমণকারীরা এই সময়ে বরমুলা অধিকার করিয়া সেখানে লুঠতরাজ করিতেছিল। লেঃ কঃ রায় ২৮শে তারিখ প্রাতে বরমুলার উপর আক্রমণ চালাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন, শত্রুপক্ষ কামান, মেসিনগান, মর্টার প্রভৃতি

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তাই প্রতিপক্ষ শক্তিশালী বুঝিয়া এবং পার্শ্বপরিবেষ্টনের আশঙ্কা করিয়া তিনি ঘাটি স্থান গ্রহণ করিবার জন্ম সেনাবাহিনীকে পশ্চাৎ অপসরণ করিতে আদেশ দিলেন। এই পশ্চাৎ অপসরণকালেই লেঃ কঃ রায় শত্রুপক্ষের গুলিতে নিহত হইলেন। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘাঁটি গ্রহণ করিয়া ও ঘাঁটি আগলাইয়া ২৯শে তারিখ হইতে শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের উপরে সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন।

২৭শে হইতে আরম্ভ করিয়া উপরি উপরি কয়েকদিনই কেবল সৈন্য ও সমরোপকরণ দ্রব্যাদি ভারত হইতে বিমানযোগে কাশ্মীরে প্রেরিত হইতে থাকিল। নভেম্বরের প্রথমদিকে ভারত গবর্ণমেন্ট পাঠানকোটের মধ্য দিয়া প্রথম স্থলপথে সাঁজোয়া গাড়ী ও কামানের বহর কাশ্মীরে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে নেপালের মহারাজা কাশ্মীরের জন্ম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ২৫ হাজার গুর্খা সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার কথা জানাইলেন।

কাশ্মীরে ঘোরতরভাবেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কাশ্মীরের আক্রমণকারী উপজাতিদল যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহিত সম্মুখযুদ্ধে পারিয়া উঠিল না, সেখানে গরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিল। তাহারা পাহাড়ের আড়াল হইতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপরে চোরা আক্রমণ চালাইতে থাকিল। আক্রমণকারীরা সহর ছাড়িয়া গ্রামাঞ্চলেও দলে দলে গিয়া প্রবেশ করিল এবং সেখানেও হত্যা, লুণ্ঠন সুরু করিল। ৩রা নভেম্বর বাদগামের গ্রামাঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর এক টহলদারী সেনাদলের সহিত হানাদারদের এক ভীষণ সংঘর্ষ হইল। ঐস্থানে হানাদাররা টহলদারী সেনাদের তুলনায় সংখ্যায় প্রায় দশগুণ ছিল। এই টহলদারী সেনাদলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন ৪র্থ ব্যাটেলিয়ন কুমায়ুন রেজিমেন্টের মেজর সোমনাথ শর্মা। এই ক্ষুদ্র সেনাদল অতুল বীরত্বের সহিত আক্রমণকারীদের সহিত সংগ্রাম চালাইল। প্রায় তিনঘণ্টা ধরিয়া সম্মুখযুদ্ধ হইল, যুদ্ধে হানাদারদের বহুলোক হতাহত হইল, কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর মেজর সোমনাথ শর্মা এই যুদ্ধে অশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়া শেষ পর্যন্ত নিহত হইলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে পৌঁছিবার পূর্বেই ২৪শে অক্টোবর হানাদাররা বরমুলা সহর অধিকার করিয়া সেখানে যে শক্ত ঘাঁটি করে, তাহাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও মোটরযানই শুধু তাহাদের ছিল না, সেখানে বিমান বিধ্বংসী কামান পর্যন্তও ছিল।

৮ই নভেম্বর ভারতীয় মোটর সজ্জিতবাহিনী ভারতীয় বিমানবাহিনীর সহায়তায় এই বরমুলা সহর আক্রমণ করিল এবং শত্রুপক্ষের উপর প্রবলভাবে চাপ দিল। ফলে ঐদিন অপরাহ্ণেই ভারতীয়বাহিনী বরমুলা উদ্ধার করিতে সক্ষম হইল। এই সৈন্যবাহিনী ব্রিগেডিয়ার এল, পি, সেনের অধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হানাদাররা বরমুলা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, ভারতীয়বাহিনী শত্রুদের অস্ত্র, গোলাবারুদ, মোটর, লরী প্রভৃতি হস্তগত করে এবং শত্রুদের পশ্চাৎধাবন করিয়া বহুদূর পর্যন্ত আগাইয়া যায়। তবে শত্রুরা পলায়ন করিবার কালে পথের সেতুগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, ভারতীয়বাহিনীকে অনেক সময়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

বরমুলা শত্রুকবলমুক্ত করা হইলে, কাশ্মীর গবর্ণমেন্ট বরমুলার পূর্বের ডেপুটি কমিশনার এবং আরও কয়েকজন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিলেন। কারণ বরমুলা আক্রমণে উঁহারা হানাদের সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কাশ্মীর যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করিবার জন্ম শ্রীনগরে গমন করিলেন। সেখান হইতে তিনি কাশ্মীর জরুরী গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী সেখ আবদুল্লাকে সঙ্গে লইয়া বরমুলা পরিদর্শন করিলেন।

বরমুলায় হানাদাররা স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। হত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ ব্যাপকভাবেই চলে। বরমুলার একটি তরুণী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে জানান যে, কাশ্মীর-হানাদাররা বরমুলার হিন্দু ও শিখ তরুণীদের ধরিয়া তাহাদের ক্যাম্পে লইয়া যায়। সেখানে প্রথমে তাহাদিগকে লুঠের দামী শাড়ীতে সজ্জিত করিয়া, পরে নরপশুদের কবলে নিক্ষিপ্ত করা হয়। ইহাতে মুসলমান তরুণীরাও বাদ যায় নাই।

প্রায় ১৫ হাজার নরনারীর দ্বারায় অধ্যুষিত বরমুলা সহরের ৪ হাজার নরনারীকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

বরমুলায় হানাদাররা ইউরোপীয়দের উপরও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। বরমুলার সেন্ট জন কনভেন্ট তাহারা লুঠ করে। কনভেন্টের হাসপাতাল ও লাইব্রেরী ভস্মীভূত করে। চ্যাপেলের জানালা কপাট ভাঙ্গিয়া দেয়। শেষে মঠের ৫ জন সন্ন্যাসিনীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে।

কাশ্মীরে শ্বেতাঙ্গদের উপরেও এইরূপে অত্যাচার আরম্ভ হইলে কাশ্মীরে অবস্থিত ইউরোপীয়গণ ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া বিমানযোগে ভারতে চলিয়া আসে। অনেকে বানিহাল হইয়া স্থলপথেও কাশ্মীর ত্যাগ করে। ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক কাশ্মীরের অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আসিলে, তখন অল্প কয়েকজন ইংরাজ স্বেচ্ছায় কাশ্মীরে অবস্থান করিতে সম্মত হয়।

১২ই নভেম্বর ভারতের দেশরক্ষা দপ্তর হইতে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়, তাহাতে বলা হয়—কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী শত্রুর হাত হইতে মোহরা উদ্ধার করিয়াছে এবং শত্রুর পশ্চাৎধাবন করিয়া অনেকটা দূর পর্যন্ত তাহাদের তাড়াইয়া দিয়াছে।

এই মোহরা শ্রীনগরসহ কাশ্মীর উপত্যকার বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। হানাদাররা মোহরা অধিকার করার পর হইতে শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুরা যখন মোহরা ত্যাগ করিল, তখন যাইবার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ও গৃহগুলির কিছু কিছু ক্ষতি করিয়া গেল।

১৩ই নভেম্বর আক্রমণকারী উপজাতিদল ভারতীয় বাহিনীর চাপে গুলমার্গ সহর ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় টহলদারী সেনারা সহরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, শত্রুরা পলাইবার কালে কতকগুলি দোকান ও গৃহ ভস্মীভূত করিয়া দিয়া গিয়াছে।

১৪ই নভেম্বর অপরাহ্নে ভারতীয় বাহিনী শ্রীনগরের ৬৩ মাইল দূরে অবস্থিত বরমূলা-ডোমেল প্রধান সড়কের উপর অবস্থিত উরি সহর শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার করিল। এই উরি সহর তিন সপ্তাহ যাবৎ শত্রুদের অধিকারে ছিল। ভারতীয় সৈন্যরা উরি সহরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, হানাদাররা সহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। উরি সহর দখল করিবার পর ভারতীয় সৈন্যরা বরমূলা-ডোমেল সড়কে তাহাদের ঘাঁটি দৃঢ় করে। এই স্থানে টহলদারী সৈন্যরা বহু আশ্রয়হীন ব্যক্তিকে তাহাদের পূর্ববাসস্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়।

উরি সহর অধিকৃত হওয়ার পর কাশ্মীর উপত্যকা একপ্রকার নিরাপদ হইয়া যায়। কেবল গ্রামাঞ্চলে হানাদারদের ছোটখাট দলগুলিকে বিতাড়নের কাজটা বাকি থাকে। কিন্তু এই সময়ে জম্মু প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চল—মজঃফরাবাদ প্রভৃতির অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। এই অঞ্চলগুলি পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার সংলগ্ন হওয়ায় হানাদাররা পাকিস্থান হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করিতে থাকে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য সরবরাহ অতি সহজেই পাইতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত কাশ্মীরী সেনাবাহিনী শত্রুদের চাপে পড়িয়া বহু স্থান হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয় এবং কোথাও কোথাও তাহারা শত্রু সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে।

ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকা অনেকটা আয়ত্তে আনিয়া, এইবার জম্মু প্রদেশের এই সব অঞ্চলে কাশ্মীর সেনা বাহিনীর সাহায্যে আগাইয়া আসিল। ভারতীয় বিমানবহর উপর হইতে হানাদারদের আক্রমণ করিয়া পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতির পথ সহজ করিতে লাগিল। এই-ভাবে আগাইতে আগাইতে ভারতীয় বাহিনী বেরিপাট্টান প্রভৃতি শত্রু-কবল মুক্ত করিল। পরে মীরপুর এলাকায় কাশ্মীর সেনাদল পরিখা খনন করিয়া নিজেদের ঘাঁটি দৃঢ় করে। মজফরাবাদ শ্রীনগর হইতে ১৫০ মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত। হানাদাররা এই সহরের অধিকাংশই ভস্মীভূত করে। ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির ফলে হানাদাররা যে সকল স্থান দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহা ছাড়িয়া সীমান্ত প্রদেশে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হয়। তবে তাহারা স্থান ত্যাগ করিবার সময় সেগুলি পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া দিয়া যায়।

এইভাবে ভারতীয় সেনা বাহিনী কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মু প্রদেশে প্রধান প্রধান সহরগুলি হইতে হানাদারদের হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়, তবে আক্রমণকারীদের যে সব দল গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতেই বাকি রহিল। কারণ কাশ্মীরে বহু পর্বত ও জঙ্গল থাকায় হানাদাররা পল্লী অঞ্চলে অনেকস্থলে সহজেই আত্ম-গোপন করিবার সুযোগ পায় এবং সেখান হইতে গেরিলা পন্থায় যুদ্ধ করে। তবে কাশ্মীরের জন সাধারণের সহায়তায় তাহাদিগকেও তাড়াইতে ভারতীয় বাহিনীকে বিশেষ-বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় না। হানাদাররাও অবশ্য নূতন করিয়া আবার শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এসম্পর্কে দেশীয় রাজ্য বিভাগের মন্ত্রী সর্দার প্যাটেল বলিয়াছেন—কাশ্মীরে দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চলিলেও আমরা কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া আসিব না।

কাশ্মীরের এই যুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়ায় ভারতীয় বাহিনী এত সহজে এতটা অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। কাশ্মীরের মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় সেনা বাহিনীর সহিত এই যে সহযোগিতা, ইহার জন্য কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনের সভাপতি শেখ আবদুল্লারই কৃতিত্ব সমধিক।

ভারতীয় সেনা বাহিনী কাশ্মীর হইতে হানাদারদের হটাইয়া দিবার সময় —একদিকে যেমন তাহাদের অনেককে হতাহত করিয়া অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে, তেমনি বহু হানাদারকেও তাহারা বন্দী করে। এই বন্দী শত্রুদের অনেককেই বিমানযোগে দিল্লীতে চালান দেওয়া হয়। এই সব বন্দীদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বহু কাগজপত্র পাওয়া যায়। কয়েকজন বন্দীকে কাশ্মীর আক্রমণের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে, তাহারা আক্রমণ পরিকল্পনার অনেক চাঞ্চল্যকর কথা প্রকাশ করে। বরমূলা-রামপুর রোডে ধৃত পাকিস্থানসেনার সিপাহী কুদরত শাহ বলে—কাশ্মীর দখল করিয়া অন্যান্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

আবদুল হক নামে অপর একজন বন্দী বলে যে, সে আগে পাঞ্জাবের পুলিশ বাহিনীতে ছিল। পরে সে কাশ্মীর আক্রমণে যোগ দেয়। কাশ্মীর আক্রমণের জন্য পাকিস্থান এলাকার অন্তর্গত রাওয়ালা ক্যাম্পে ৬ হাজার লোক সংগ্রহ করা হয়। সে আরও বলে যে, বরমূলা যুদ্ধ পরিকল্পনায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূতপূর্ব ক্যাপ্টেন আবদুর রসিদ আমেদ, ক্যাপ্টেন আজম, মেজর কুরসেদ আনওয়ার, মেজর আসনামও ছিল।

কাশ্মীর আক্রমণকারী হানাদাররা কাশ্মীরের মুসলমানদিগকে হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেও প্রবল চেষ্টা করিয়াছিল। যে সকল মুসলমান তাহাদের আক্রমণে সহায়তা না করে, তাহাদিগের উপর হিন্দু ও শিখদের ন্যায় অত্যাচার চলে। হত্যা ও লুণ্ঠনের সহিত নারী-হরণ ও নারী ধর্ষণ ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। শত্রুর লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেকে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করে।

কাশ্মীরের এই সকল অত্যাচারে মর্মাহত হইয়া কাশ্মীরের জরুরী গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বিশ্বের সকল দেশকে—বিশেষ করিয়া মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে কাশ্মীর পরিদর্শনের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানাইয়া ১৬ই নভেম্বর যে বিবৃতি প্রকাশ করেন,তাহাতে তিনি বলেন—ইসলামের নাম লইয়া হানাদাররা দেশকে মুক্ত করিবার যে ভান করিয়াছিল, তাহাতে কাশ্মীরবাসীদের গৃহাদি ধ্বংস করিয়া কি করিয়াছে তাহা একবার দেখিয়া যান। যাহারা এই হানাদারদের কাশ্মীরের অধিবাসীদের মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল, ইতিহাসের চক্ষে তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়াই আমি মনে করি। হানাদাররা বন্দুক দেখাইয়া কাশ্মীরকে পাকিস্থানের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া দাসত্ব কায়েম করিবার জন্য আমাদের দেশ আক্রমণ করিয়াছিল। এই আক্রমণে আমাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কাশ্মীরের নয়নাভিরাম শত শত গ্রাম ও সহস্র সহস্র মণ ধান্য ভস্মীভূত হইয়াছে।

পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের প্ররোচনা ও সহায়তায় কাশ্মীর আক্রমণ

হইয়াছে এবং তাহাতে কাশ্মীরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অপরিমেয় ; কিন্তু তবুও একথা সত্য যে, এই আক্রমণের ফলে কাশ্মীরের অধিবাসীদের উপকারও হইয়াছে নিতান্ত কম নহে। শুধু এই আক্রমণের ফলেই এত দ্রুত কাশ্মীরের বহুদিনের স্বৈরতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে এবং কাশ্মীরের জনগণের প্রতিষ্ঠান জাতীয়-সম্মেলন সহর ও গ্রামসমূহের শাসনভার গ্রহণ করে। বৃটিশশক্তির আওতায় থাকিয়া কাশ্মীরের স্বৈরাচারী শাসক জাতীয়-সম্মেলনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়া জাতীয়-সম্মেলনের আন্দোলনকে দমন করিতে কম চেষ্টা করে নাই। এমন কি কাশ্মীর গবর্ণমেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকেও নিষেধ ভঙ্গের জন্য একবার গ্রেপ্তার করিতে ছাড়েন নাই ; কাশ্মীরের মহারাজার এই স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তন ব্যতীত, হানাদারদের আক্রমণের ফলে কাশ্মীরে আর একটি উপকার এই হইয়াছে যে, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পথ আরও প্রশস্ততর হইয়াছে এবং মুসলমান ও অমুসলমান পরস্পর সম্প্রীতি স্থাপনে আরও সহায়ক হইয়াছে। আর কাশ্মীরে মুসলমান সম্মেলনের সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

কাশ্মীর হইতে দুর্বৃত্তরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইলে এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে, তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভার কোন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বাধীনে কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র না পাকিস্থান—কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে তাহা স্থির করিবার জন্য গণভোট গৃহীত হইবে। ইহাই ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি। এই গণভোটে কাশ্মীর তখন কোন ডোমিনিয়নে যোগদান করিবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই এবং কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ রাজনীতি কোনপথে চলিবে তাহাও অনিশ্চিত। তবুও ভবিষ্যতের কথা বাদ দিয়া এই সময়কার কাশ্মীরের সম্বন্ধে বলিতে গেলে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কথায় বলিতে হয়, "ভবিষ্যৎ যাহাই হউক কাশ্মীরের ইতিহাসের এই অধ্যায় চিরদিনই গৌরবের সহিত পঠিত হইবে।"

২৫।১২।৪৭

গতি ও প্রগতি

অ-কু-রা

১

ঘ-র্-র-র্…ঘ-র্-র্-র্…ঘ-র্-র্-র্…

তিন ঝাঁক বিমানের নেতৃত্ব লইয়া চলিয়াছি।

রেঙ্গুন আমাদের লক্ষ্য।

গুপ্ত সংবাদ আসিয়াছে, রেঙ্গুনের সমরঘাটিতে শত্রু নাকি গড়িয়া তুলিতেছে নূতন আক্রমণের আয়োজন। গুঁড়াইয়া দিয়া আসিতে হইবে তাহার এই আক্রমণোদ্যম। অন্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত না মিত্রপক্ষের প্রস্তুতি শেষ হইতেছে ততদিন যেন তাহার প্রসারিত বাহু পঙ্গু হইয়া রহে।…

তিনটি ঝাঁকে আমরা চলিয়াছি—বঙ্গোপসাগরে প্রভাত সূর্য্যকে নমস্কার করিয়া।

একশ…দুইশ…তিনশ…স্পীডোমিটারে থর থর করিয়া গতিবেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। তিনশ'র ঘরে আসিয়া কাঁটার কম্পন স্থির হইল!…

তিন ঝাঁক লৌহপক্ষী ছুটিয়া চলিয়াছে ঘণ্টায় তিনশ মাইল বেগে। গর্ভে উহাদের সহস্র পাউণ্ড তীব্র বিস্ফোরণ—যাহা ভূপতিত হইয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল ধূলিসাৎ করিয়া দিবে।

পাইকারী মড়ক ছড়াইবার কাজ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বম্বিং মিশন! সভ্য সামরিক নাম ইহার।

দুম্ দুম্ দুম্।

নিমেষের মধ্যে কতটা স্থান ধূলিসাৎ করিলাম চোখে তাহা দেখিতে পাইলাম না। শুধু বুঝিলাম, অগ্নি ও ধূম্র-কুণ্ডলীর অন্তরালে নিচের পৃথিবীতে মানুষের গড়া মূর্ত্ত অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া আসিয়াছি!

ছয় ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসি বিমানক্ষেত্রে—যেথান হইতে বোমা বহনের অভিসারে বাহির হইয়াছিলাম।…

বসিয়া বসিয়া ভাবিতে থাকি তাজ্জব এই সভ্যতা! তাজ্জব মানুষের বিজ্ঞান সাধনা। মাত্র ছয় ঘণ্টার মধ্যে সহস্র সহস্র মাইল ব্যবধানের কোন এক অজানা দেশে আমায় পৌছিয়া দিবার ব্যবস্থা করিল শুধু ধ্বংসলীলা বিস্তার করিতে! এ অভিযানে কত লোক মারিয়া আসিলাম কে জানে?…

নির্ব্বিকারচিত্তে টী-রুমে বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকি।

২

আবার আমাকে আর একটি মিশন লইয়া ছুটিতে হইয়াছে।

পিসিমার জরুরী চিঠি আসিয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র খ্যাঁদার সঙ্কটাপন্ন পীড়া। অনেক বাড়তি পড়তির পর পিসিমার কোলে একমাত্র খ্যাঁদাই শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। খ্যাঁদাই এই দুখিনী বিধবার ভবিষ্যতের অবলম্বন!

পিসিমা একটা ফর্দ্দ পাঠাইয়াছেন। ঔষধ ও ইনজেকসনের। এই অজ পাড়াগাঁয়ে যুদ্ধের বাজারে এসব এখন মেলা দুঃসাধ্য। তুমি মিলিটারীতে চাকরী কর বাবা, তোমার অনেক হাত আছে। এইগুলি যদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দাও ত এ যাত্রা তোমাদের খ্যাঁদা রক্ষা পায়।

হাত অবশ্য নাই। কিন্তু হাতিয়ার ছিল—টাকা। মুক্তহস্তে চোরা-বাজারের দক্ষিণা মিটাইয়া ঔষধগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

অতএব আবার চলিয়াছি আর একটি মিশন লইয়া।

এবারকার মিশন মানুষ বাঁচানোর মিশন। সঙ্গে আমার খ্যাঁদার মৃতসঞ্জীবনী তুল্য ঔষধ ও ইনজেকসনসমূহ।

কিন্তু আশ্চর্য্য। এবার আর সভ্যতা আমার বাহককে সে তীব্র গতি বেগ দিতে পারে নাই।

চলিয়াছি ঘণ্টায় এগারো মাইল বেগে। মার্টিনের লাইনে।

পঞ্চাশ মাইল পথ যাইতে লাগিবে নাকি পাঁচ ঘণ্টা সময়। কেহ কেহ বলিল, রাস্তায় অষ্টাদশ শতাব্দীর আদি ইঞ্জিন অসুস্থ হইয়া পড়িলে নাকি পাঁচদিনও লাগিতে পারে।

ডিকির ডিকির করিয়া মার্টিনের রেল চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য ইহার শ্লথ গতি!

হায় এখন যদি সেই তিনশ মাইল বেগের প্লেনখানা পাইতাম।

৩

ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

সহসা চাহিয়া দেখি সৌম্যমূর্ত্তি এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: কি ভাবিতেছ?

বলিলাম: খ্যাঁদাকে বাঁচানোর ঔষধ ইনজেকসন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছি। এই সময় সেই তিনশ মাইল বেগের বোমা-বাহী প্লেনখানা যদি পাওয়া যাইত। নহিলে ঔষধ পৌঁছিতে পৌঁছিতে খ্যাঁদাই যে কৃতান্ত সদনে পৌঁছিয়া যাইবে। পাওয়া যায় না উহা?

গম্ভীর মূর্ত্তিতে ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন: আপাততঃ নয়।

তাহা হইলে কবে পাওয়া যাইবে? আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি।

সহসা তিনি শূন্যাকাশে অঙ্গুলি হেলনে একটি বৃত্ত আঁকিলেন।

বলিলেন: চাহিয়া দেখ।

দেখিলাম: ধীরে ধীরে বৃত্তের মধ্যে যেন একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে। ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

একটি টেবিলের ধারে তিন ব্যক্তি পাঞ্জা কষিতেছে। বৃহৎ গুম্ফ, বিশাল বপু, পাইপমুখো একব্যক্তি এক দিকে, আর দুই দিকে দীর্ঘ কপোল, কুটমূর্ত্তি দুই ব্যক্তি। বিশ্বের তিন প্রধান।

তিনি বলিলেন: দেখিতেছ ত ইহারা পাঞ্জা কষিতেছে। ফলাফলের উপরই তোমার প্লেন পাওয়া নির্ভর করিতেছে।

ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলাম: কবে ইহাদের পাঞ্জা-কষা শেষ হইবে প্রভু। এদিকে খ্যাঁদাদের দশা যে শেষ হইতে চলিল!

স্বাগত স্বরে তিনি বলিলেন: তাহা কে জানে রে বাপু—অতসব ফ্যাকড়া কোশ্চেন করিও না। আপাততঃ চলিতেছে ইহাই জানিয়া রাখ।

বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

৪

লোকটা কে তাহা চিনিতে পারি নাই।

স্বপ্নবৃত্তান্ত আমার এক বন্ধুকে বলিলাম।

আমার দিকে বিজাতীয় দৃষ্টি হানিয়া তিনি বলিলেন: লোকটা কে তাহা চিনিয়াছি। ও কোন লাল কাগজের মৃত সম্পাদকের ভূত। দেখিও উহার পাল্লায় পড়িয়া তুমিও লাল বনিয়া যাইও না। চাকুরী যাইবে।

লাল অবশ্য আমি হই নাই। লাল সাদার পার্থক্যও বুঝি না!

তবে লাল হইয়াছিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া পিসিমার চোখ।

খ্যাঁদাকে বাঁচানো গেল না।

মার্টিনের রেল বরাদ্দের উপর আরও পাঁচ ঘণ্টা দেরী করিয়া ফেলিয়াছি!

পিসিমার কান্নার রেশ এখনও আমার কানে আসিতেছে:

ওরে খ্যাঁদা, খ্যাঁদা রে—

বিজ্ঞানের কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রম্, প্রবাদটী একটী সুপ্রাচীন সত্য—কিন্তু তাই বলিয়া বসিয়া থাকিলেও ভাগ্য কি তাহার বরমাল্য নিয়ে সোজা এসে হাজির হয়! ঘুমন্ত সিংহের মুখে খাদ্য কি পায়ে হেঁটে এসে পৌছে? পাস্তুর বলিতেন, দৃশ্যমান্ এই দুনিয়ায় ভাগ্য তাঁহাদের গলায় মালা দিয়া বসেন যাঁহারা ইহার জন্য বহু আগে থেকেই সাধনা করিয়া আসিতেছেন। ডারুইন বড় চমৎকার একটি কথা লিখিয়াছিলেন, দুনিয়ায় চালাক লোকের সংখ্যাই বেশী, আবিষ্কারকদের চেয়েও অনেকেই বেশী চালাক, কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা জগতের কোনও উপকারই হয় না। তাঁহার মতে পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে নূতন কোন ঐশ্বর্য্য যাঁহারা দান করেন তাঁহারা স্বভাবতই খুব অনুসন্ধানী, তাঁহাদের সামনে যখন যে ঘটনা ঘটে তাহার কারণ ও অর্থ অনুসন্ধানে অহরহ নিযুক্ত বলিয়াই ফিকির ও সন্ধান তাঁহারাই বলিতে পারেন। যে বিষয় অনুসন্ধানে, তাঁহারা ব্যাপৃত তাহা সম্যক অবগত না হইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন না। অজানা তথ্যটুকু জানিবার জন্য তাঁহাদের মনোনিবেশ ও মনঃসমীক্ষণ কত তীক্ষ্ণ এবং কত সামগ্রীক। সাধারণলোকে যে চোখে দেখে, তাহার চেয়ে কত সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও যত্নশীল প্রচেষ্টার সহিত তাঁহারা দেখেন। হাঁ তাঁহারা কৌশলী নিশ্চয়ই, কিন্তু তীক্ষ্ণ ও নিখুঁত দৃষ্টিশক্তিই তাঁহাদের কৌশল। যাঁহাদের জীবন নূতন কিছু আবিষ্কারে ধন্য হইয়াছে তাঁহাদের কাজ আগাগোড়া আলোচনা করিলে এই কৌশলের ধারাটী অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হয়। পরীক্ষণীয় বিষয়ে প্রত্যেক ধাপের ফলাফলে তাঁহাদের কত প্রখর যত্ন। প্রত্যেক খুঁটিনাটি রূপান্তর তলাইয়া, খুঁজিয়া দেখিবার মনোবৃত্তির জন্য তাঁহাদের নজরে ক্ষুদ্র পার্থক্যও এড়াইতে পারে না। প্রত্যাশা করেন নাই এমন নূতন ফলাফল যদি কিছু তাঁহারা দেখেন, বুঝিতে পারিতেছেন না এমন অঘটন যদি ঘটিয়া বসে তবু তাঁহারা হাল ছাড়েন না, অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও শেষ সমাধানে পৌছিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন; প্রশ্নের উত্তর যতক্ষণ না সহজ সরলভাবে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হয় ততক্ষণ তাঁহাদের শান্তি নাই। অথচ এই একগুঁয়েমি প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন স্বভাব বলিয়াই বিজ্ঞানীর নিকটে হঠাৎ কিছু হাজির হইলে তাহা ফিরিয়া যায় না। সাধারণ লোকে এই 'হঠাৎ' কিছু ঘটিয়া যাওয়াকে অঘটন পটীয়সী ভাগ্যের খেলা বলিয়া প্রবোধ দেয় ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

পাস্তুরের কোন চিকিৎসাজ্ঞান ছিল না। তাঁহার ভেষজ বিদ্যাও জানা ছিল না, কিন্তু তাঁহার ছিল নিখুঁত দৃষ্টিশক্তি, প্রত্যেক ঘটনার কারণ জানিবার জন্য বিপুল ছিল তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা; এই জন্যই তিনি "আন্থ্রাক্স" ও "জলাতঙ্ক" রোগের ঔষধ আবিষ্কারে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে আলো বাতাসে জীব জীবনধারণ করে, বীজাণুভরা সেই আলো বাতাসের বিরুদ্ধে, ভিতরে বাহিরে, অহরহ লড়াই করিয়া মানুষকে যে সুস্থ জীবন টেনে নিয়ে চলিতে হয় পাস্তুরই তাহা প্রথম আমাদিগকে শোনান্।

পরীক্ষণীয় বিষয়ের সাফল্য কিম্বা পরাজয় বৈজ্ঞানিকের নিকটে একটী বড় ঘটনা নহে। ফলাফলের কারণ নির্ণয় বিজ্ঞানীর সাধনা ও সাধ্য হওয়া উচিৎ। এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া বসে বিজ্ঞানী যাহার জন্য মোটেই সচেষ্ট কিম্বা প্রত্যাশী ছিলেন না। সাধারণ লোকে সেই অনাকাঙ্খিত ফলাফলকে আকস্মিক উপস্থিত হইতে দেখিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া পড়েন এবং বিজ্ঞানাগার পরিত্যাগ করিয়া বসেন; কিন্তু বিজ্ঞানীমন সেখানেই না থামিয়া সদ্য লব্ধ ফলাফলের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু আবিষ্কার এইভাবেই আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছে। চিরকাল ধরিয়াই পাকা আপেলফল বৃন্তচ্যুত হইয়া ধরণীর শ্যামল কোলে বিশ্রামলাভ করিতেছে, কিন্তু একদিন এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ভাবুক নিউটনের চোখে এই ঘটনায় হঠাৎ এক চিন্তার রাজ্য উদ্ঘাটিত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এইরূপ 'হঠাৎ' মানবজাতির কি কল্যাণ সাধনই না করিয়া চলিয়াছে। ইতিহাস তাহার কয়টী হদিশ রাখিতে সক্ষম হইতে পারে। তার্কিক নিমাই গয়ায় বিষ্ণুপাদ-পদ্ম দেখিয়া হঠাৎ প্রেমিক গৌরাঙ্গে পরিণত হইলেন। সচকিত পিতার রাজঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরে লালিতপালিত গৌতমের সামনে মরণশীল মানুষের চতুর্থদশার ছবি এমন কি বৈরাগ্য আনিল যে ভোগজীবন তাঁহার বিতৃষ্ণায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল! নির্ব্বাণের পথে তিনি ঘরের বাহিরে বেরিয়ে এলেন।

বিজ্ঞানের ঝরাপাতা হইতে 'হঠাৎ' ঘটিয়া যাওয়া এই রকম কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হইতেছে। বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ভবিতব্যের অস্পষ্টতা দূরীভূত করিয়া মানবকল্যাণের রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে।

জল যখন বাষ্পে পরিণত হয় তখন অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসে। তখন তাহাকে বলপ্রয়োগে কম স্থানে ভরিয়া দিলে সেও বাহির হইতে চাহিবে। এই স্থিতিস্থাপকতাগুণের সুবিধা লইয়া মানুষে ইঞ্জিন তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু ইঞ্জিন তৈয়ারী কল্পনায় আসিবার পূর্ব্বে অনেকেই জলকে বাষ্পে পরিণত হইতে দেখিয়াছেন, চা'য়ের কেটলীর নল হইতে যে "ভাপ" নির্গত হয় তাহাও একরকম বাষ্প। কেটলীর ভিতরে এই বাষ্পের পরিমাণ কিছু বেশী হইলেই উপরের ঢাকনী নড়িয়া গিয়া খানিকটা বাড়তি বাষ্প বাহির হইয়া যায়। জল ফুটাইবার সময় বহুকাল হইতেই এইরকম ঘটনা ঘটিতেছে কিন্তু কাহারও খেয়াল জাগে নাই। হঠাৎ একদিন বালক "ওয়াটের"

(James Watt) সামনের কেটলীর ঢাক্‌না উঠাপড়া করিতে দেখিয়া কল্পনার একরাজ্য খুলিয়া দেয়। কেন? তরলমতি বালকের মনে এই প্রশ্ন জাগে? পরিশ্রমী ও তীক্ষ্ণধী এই বালকই বাষ্পীয় ইঞ্জিনের জনক।

"আর্গনের" ব্যবসায়িক ও ব্যবহারিক মূল্য সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিজলী বাতিতে (electric bulb) পূর্ব্বে "নাইট্রোজেন" গ্যাস ভরা হইত। এখন ইহা "আর্গন" গ্যাসে পূর্ণ করা হয়। বাতাসে আর্গনের উপস্থিতি মাত্র শতকরা ১ ভাগ। ১৮৯৩ সাল পর্য্যন্ত বাতাসে ইহার অস্তিত্ব কেহই জানিত না। লর্ড র‍্যালেই সর্ব্বপ্রথম বাতাসে 'নাইট্রোজেনের' চেয়েও ভারী এই গ্যাসের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। এখানেও "হাঠৎ" এই ব্যাপার ঘটাইয়া বসে। ১৮৯২ সালে "র‍্যালে" বাতাসের গুরুত্ব পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দুই ভাবে 'নাইট্রোজেন' গ্যাস তৈয়ার করেন। প্রথমতঃ বাতাস হইতে "অক্সিজেন" 'অঙ্গার গ্যাস', জলীয় বাষ্প দূরীভূত করিয়া, দ্বিতীয় "এমোনিয়াম" "নাইট্রাইট" কিম্বা অপর কোন নাইট্রোজেন ঘটিত রসায়ন দ্রব্য উত্তপ্ত করিয়া। তিনি বাতাস হইতে প্রস্তুত "নাইট্রোজেন" গ্যাস-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী পাইলেন, কারণ না বুঝিয়া আরও কাজ করিতে লাগিলেন, দুই বৎসরের পরিশ্রমের পরে বাতাস হইতে "আর্গন" প্রস্তুত করিয়া তিনি সন্দেহ নিরসন করিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথেই "র‍্যামজে" "হিলিয়ম" "নিয়ন" প্রভৃতি গ্যাস আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়াই "উড়োজাহাজ" ও বিজ্ঞাপনীর কদর বাড়াইতে ইহার কত আদর।

১৮৫০ সালে "ম্যাগ্‌ডীবার্গ" নামক স্থানে জল ফুটাইয়া বাষ্প তৈয়ারীর যন্ত্র স্থাপিত হয়, এখানে একই উত্তাপকে দুইবার ব্যবহার করা হইত। এই বৎসর অষ্ট্রীয়ার "সেফলো উইজ" নামক স্থানে কোন চিনি তৈয়ারীর কলে ঐরূপ একটা যন্ত্র সরবরাহ করা হয়, যাতায়াতে যন্ত্রের অনেকগুলি অংশ, বিশেষতঃ জল ফুটাবার কয়েকটী নল হারাইয়া যায়। কোম্পানীর মালিক যে কোনও উপায়ে যন্ত্রটীকে কার্য্যোপযোগী করিবার প্রয়াসী হন, নলের সংখ্যা কম ছিল বলিয়া তিনি সেগুলিকে আড়াআড়ি না লাগাইয়া খাড়া করিয়া লাগাইলেন এবং এমনভাবে সংযুক্ত করিলেন, যাহাতে বাষ্পের উত্তাপ ক্রমাগতঃ তিনবার ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কিন্তু এইভাবে জল বাষ্পীকরণ এত বেশী হইল যে খাড়াভাবে সাজান পদ্ধতি-যুক্ত জল তাপাইবার যন্ত্রের খুব প্রচার হইল, এই ঘটনা হইতে "triple effect" তিনবার ফলপ্রসূ উত্তরীযন্ত্রের সূচনা হইল।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপে পশম রঙ্গীণ করিতে হইলে পশম ও রঙ্গীণ জল কড়াইতে সিদ্ধ করিতে হইত এই পদ্ধতিতে এক দফা পশম রং করিতে ৩।৪ ঘণ্টা সময় লাগিত। তখন ধারণা ছিল—সিদ্ধ করিবার মধ্যেই পশমে রং ধরিবার কোন রাসায়নিক কারণ আছে, এখন এই কথায় ছেলেরাও হাসিয়া উঠে, কিন্তু তখন সত্যই ধারণা ছিল রাসায়নিক কারণেই, ফুটাইলে রঙ্গীণ জলের বুদ্‌বুদ্‌ পশমের পরদায় লাগিয়া যায়। এই পদ্ধতিতে যেমন সময় অপব্যয় বেশী হইত, তেমনি এক দফা মালের সহিত দ্বিতীয় দফার রং-এও পার্থক্য হইত, এই সাধারণ জ্ঞান ধরা পড়িল "ব্রিটিশ ডাই ষ্টাফ কর্পোরেশনের" অনুসন্ধান সময়ে একজন কর্ম্মচারীর ভুলের ফলে। এখন জানা গেল—কারণ আর রাসায়নিক নহে বরঞ্চ যান্ত্রিক। তারপর থেকে উক্ত রঙ্গীণ জলের মধ্যে পশমী মাল রাখিয়া বাতাসের চাপ দেওয়া আরম্ভ হইল, বাতাসের দ্রুতচাপে রঙ্গীণ জলের বুদ্‌বুদ কাপড়ের প্রতি রন্ধ্রে আক্রমণ সুরু করিল। ইহাতে পূর্ব্বের প্রয়োজনীয় ১/৩ ভাগ সময়ে কাপড়ে রং ধরান কাজ সমাধা হইল; পরন্তু কাপড়ের উজ্জলতা ও টেকসহী অনেক বাড়িয়া গেল, আজকাল কম্বল কিম্বা ফেল্ট জাতীয় মোটা বস্ত্র ও রঙ্গীণ করিবার কোন অসুবিধা নাই।

রণ্টজেন অথবা রঞ্জন রশ্মির উপরে আধুনিক পদার্থ কিম্বা রসায়নী বিদ্যা বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভুট্‌জবুর্গ (Wurtzurg) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক W. K. Rontgen রন্ধ্রহীন শূন্য (Vacuum) নলের মধ্যে বিদ্যুতের তরঙ্গলীলার পরিবহন (conductivity) পরীক্ষা করিতেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেখানে নিকটেই 'বেরিয়াম্‌ প্লাটিনো-সায়ানাইড্‌' মাখান কাগজের একটা পরদা টাঙ্গান ছিল। বৈদ্যুতিক শক্তি কাল কাগজের বাক্সে রক্ষিত একটী নলের মধ্যে প্রবাহিত হইবার সময় তিনি লক্ষ্য করিলেন—পরদাখানা নলের দিকে উড়িয়া যাইতেই উজ্জল হইয়া উঠিতেছে। এই অদৃশ্য আলোকে প্রথমতঃ তিনি অবাক হইয়া গেলেন; কিন্তু সেখানেই সমাপ্তি না টানিয়া ক্রমাগতঃ অনুসন্ধানের পরে ঐ আলোর বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিলেন। তিনি এই নূতন অজানা রশ্মির নামকরণ করিলেন X' Ray, 'এক্স'রে। তাঁহার মৃত্যুর পরে গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের অন্তরল কৃতজ্ঞতায় এই অজানা রশ্মির নাম রণ্টজেন রশ্মি দেওয়া হইয়াছে।

১৮৫৯ সালে ডাঃ হেনরিখ্‌ ক্যারো নামক জার্ম্মাণ দেশীয় 'ক্যালিকো-প্রিণ্টার' মানচেষ্টার সহরে 'রবার্ট ডেল' নামক প্রতিষ্ঠানে 'এনিলিন' রং তৈয়ারীর কাজে সহকারী কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হন। ঘটনাক্রমে তিনি দুই দুইটী আবিষ্কারের কারণ হন। প্রথম ঘটনা ঘটে ১৮৬২ সালে, এই সময় ক্যারো নাইট্রিক এসিডের মধ্যে কয়লা গ্যাস অনুপ্রবেশ করাইয়া ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি কাজ করিতেছেন, এমন সময় অধ্যাপক উইট তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাঁহার গবেষণা গৃহে প্রবেশ করিলেন। ক্যারো অনেকটা দুষ্ট বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া তাঁহার গবেষণার বিষয় বস্তু লুকাইবার জন্য হাতের কাছে অপর কিছু না পাইয়া জানালার পরদা দিয়া গবেষণাবস্তু ঢাকিয়া রাখিয়া কথা বলিবার অছিলাতে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। পরে মাঞ্চেষ্টারের পথে তিনি 'নাইট্রিক এসিড্‌' ও গ্যাসের কথা একদম্‌ ভুলিয়া গেলেন। পরদিবস গবেষণা গৃহে আসিয়া পূর্ব্বদিনের কাজ তাঁহার স্মরণে আসিল। তাড়াতাড়ি পরদা সরাইয়া পাত্রের ডালা খুলিয়া ভিতরে "নাইট্রিক এসিডের" উপরে তৈলাক্ত পদার্থ দেখিয়া গভীর অনুসন্ধানে 'নাইট্রো-বেন্‌জিন' ও 'বেন্‌জিন' বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ১৮৫৯ সালের গবেষণার ফলে কয়লা গ্যাস হইতে "বেন্‌জিন" তৈয়ারীর পথ আবিষ্কৃত হইল।

ইহার পরে "ক্যারো" জার্ম্মানীতে ফিরিয়া আসিয়া "বাদিশে

এনিলিন উ সোডা ফেব্রিক" প্রতিষ্ঠানে "এন্থ্রাকুইনোন" (anthraquinone) সম্পর্কে কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন। একদিন তিনি "অক্স্যালিক এসিড্" (oxalic acid) এবং গন্ধক দ্রাবক (Sulphuric Acid) একত্রে ফুটাইতেছিলেন। নানারকম কাজের ভিতরে ও অন্যমনস্কতায় পূর্ব্বোক্ত কাজ ভুলে ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে খেয়াল হইলে ফিরিয়া আসিয়া গবেষণাঘর ধূম্রাচ্ছাদিত দেখিতে পাইলেন এবং যে পোর্সিলেন পাত্রে মিক্শ্চারটা ফুটাইতেছিলেন তাহার তলায় কয়েকটা গোলাপী রেখা দেখিতে পাইলেন। এই পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হইয়া লাইবারম্যানের সহযোগিতায় 'এলিজারীণ' তৈয়ারীর সহজপন্থা আবিষ্কৃত হয়। ঠিক একই সময়ে ইংলণ্ডে পার্কিন সাহেব এই বিষয়ে কাজ করিতেছিলেন এবং তাঁহার পেটেন্ট মাত্র "ক্যারোর" একদিন পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। মাত্র একদিনের জন্য "ক্যারো" প্রথম হওয়ার গৌরব হইতে বঞ্চিত হন। কিন্তু "ক্যারো"র এই দুই আবিষ্কার জৈব রসায়নের জয়যাত্রায় কত গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকই তাহা অবগত।

'স্যাকারিণ' আবিষ্কারের কাহিনীও কম অভিনব নহে। এখানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ভাগ্য দুই প্রবল।

রাসায়নিক গবেষণাগারে বিজ্ঞানী তাঁহার কাজে আত্মভোলা হইয়া যাইতেন। আহারে আসিতে অনেক দেরী হওয়ায় স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে সোজা খাওয়ার ঘরে হাজির হইলেন, আহারে বসিয়া যে আহার্য্যেই হাত দেন তাহাই অত্যন্ত মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; বৈজ্ঞানিক বিরক্তির সহিত খাবার ফেলিয়া উঠিতে যাইবেন, সহধর্ম্মিণী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পাত্রের একখণ্ড রুটী স্বামীর মুখে পুরিয়া দিলে সমস্যা পরিষ্কার হইল। সকল খাদ্যই সুমিষ্ট হইয়াছে বৈজ্ঞানিকের হস্তস্পর্শে। বৈজ্ঞানিক পুনরায় নিজ পাত্রের স্পৃষ্ট খাদ্য আস্বাদ করিয়া তীব্র মিষ্টত্বে খাবার ফেলিয়া গবেষণা গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে ধৌত কাচের পাত্রের জল জিহ্বাস্পর্শে তীব্র মিষ্টত্ব অনুভব করিয়া সেইদিনকার গবেষণা পুনরায় পুর্ব্বানুবৃত্তি করিলেন। এবারের ফলাফলে তাঁহার মন সুস্থির হইল। তিনি "স্যাকারিণ" নামক ইক্ষু চিনির ৫০০ গুণ মিষ্ট রসায়ন চিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

রং প্রস্তুত করিতে এখন 'এন্থ্রাসিন' তেল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। আলকাতরা পাতন (distillations) করিবার সময় শেষের গাঢ়তর তেলের নামই 'এন্থ্রাসিন'। রং প্রস্তুতকারকদের প্রথমে ঐ তেল হইতে 'থ্যালিক আনহাইড্রাইড্' নামক এক মধ্যবর্ত্তী উপাদান তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। ১৮৯৩ সালে জার্ম্মানীর 'বাদিশে' কোম্পানী উক্ত মধ্যবর্ত্তী উপাদান তৈয়ার করিতে গিয়া আংশিক সাফল্য লাভ করে। কিন্তু বিস্তর কাঁচামাল নষ্ট হইত বলিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ছিল নেহাৎ কম, আর এইজন্য দামও ছিল আগুন, 'বাদিশে' কোম্পানীর রাসায়নিক "হের স্যাপার" এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। একদা তিনি গন্ধক দ্রাবকের সহিত 'ন্যাপথলিন' উত্তপ্ত করিতেছিলেন এবং তাপ দেখিবার জন্য কাচের সাধারণ পারদ নির্ম্মিত তাপমান ব্যবহার করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে তাপমান পড়িয়া যায় এবং কাচ ভাঙ্গিয়া উত্তপ্ত দ্রাবকের ভিতরে পারদ পড়িয়া যায়। পরিশ্রান্ত 'হের স্যাপার' দুঃখিত হইয়াছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখিতে গিয়া দুঃখ তাঁহার নৃত্যে পরিণত হইল। যে রূপান্তর তাঁহার কল্পনায় বিরাজিত ছিল তাহা এত সহজে নিষ্পন্ন হওয়ায় "ইউরেকা, ইউরেকা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সমস্ত 'ন্যাপথিলিন' "ন্যাপথিলিন অ্যানহাইড্রাইডে" পরিণত হইয়াছে। দীর্ঘ সময়ের পরিশ্রমে যাহা হয় নাই, পারদের "ঘটকালীতে" "ন্যাপথলিনের" সেই রূপান্তর হইয়াছে।

প্রচুর না হইলেও আমাদের দেশেও উদাহরণের অভাব নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পারদঘটিত আবিষ্কারের মধ্যেও এইরূপ ঘটনা ছিল বলিয়া জানা যায়। আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনী আরও অদ্ভুত। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তাঁহার জীবনধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে লইয়া যায়। তড়িতাহত "গ্যালেনা" (Galena)র আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তি দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানুষ এবং অন্যান্য জীবকূলের ন্যায় ধাতবপদার্থ এমন কি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। বেতারবার্ত্তার প্রথম উদ্ভাবক হওয়া সত্ত্বেও, বিশ্ববিজয়িনীপ্রতিভা উদ্ভিদের মর্ম্মবাণী ও তত্ত্বনির্ণয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ঔষধ ও ভেষজবিজ্ঞানেও হঠাৎ এইরূপ ঘটনায় মানবের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং প্রতিদিন হইতেছে। 'প্রণ্টোসিল' 'সালফানামাইড,' "সালভার্সান ৬০৬" প্রভৃতি ঔষধের পশ্চাতে কত মনীষীর অনুসন্ধিৎসা ও প্রাণপাত পরিশ্রম রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, 'সালভার্সান ৬০৬' এই নামেই ইহার পরিচয়। ৬০৬বার চেষ্টার পরে এই ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিদ্যা ও জ্ঞান, ধৈর্য্য ও লোকসেবা এই চতুর্বর্গের সম্মিলিত চেষ্টা ব্যতিরেকে এই সকল ঔষধ ধরণীর আলো দেখিতে পারিত কিনা সন্দেহ। উদাহরণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। সভ্যতার গতিপথে মানুষ যেমন নিত্য উন্নতির পথে, বাধাও তাহার তেমনই বাড়িয়া যাইতেছে, প্রতিষেধক সাথে সাথে আবিষ্কৃত হইতেছে। মানুষের দেহ যেন এক প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র। "ভ্যাকসিন," "সিরম" প্রভৃতি তাহার আয়ুধ।

বিজ্ঞানীর কৌশল ও জ্ঞানের উদাহরণ দিতে গিয়া ফ্লেমিংএর অবদান না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না। মানবপ্রেমিক ফ্লেমিং সেণ্টমেরী হাঁসপাতালে মানবদেহে চর্ম্মরোগ ও ফোঁড়া কেন হয় এবং কেমন করিয়া তাহা নিরাময় করা যায় সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, একটা ফোঁড়া হইতে কিছু পুঁজ লইয়া 'ফ্লেমিং' একটা কাচের পাত্রের উপর রাখিয়া দিলেন। জীবাণুদের পুষ্টির জন্য "আগারের" জেলীর উপরে উহা বিস্তৃত রহিল। জীবাণুরা সংখ্যায় বাড়িতে লাগিল। ফ্লেমিং মাঝে মাঝে তাহাদের বাড়্তি কেমন হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি দেখিলেন—পাত্রের নানাস্থানে বীজাণুদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু একস্থানে সবুজবর্ণের ছত্রকের মতন দেখিতে পাইলেন। কয়েকদিন পরে দেখিলেন সবুজ ছত্রকের চারিধারের বীজাণু নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। 'ফ্লেমিং

দুশ্চিন্তায় পড়িলেন, কোন ময়লা কিম্বা বাহিরের দূষিত পদার্থ ঢোকে নাই ত? গবেষণা ফেলিয়া না দিয়া তিনি আরও পরীক্ষা চালাইতে থাকিলেন, দেখিলেন ছত্রক বৃদ্ধির সহিত পারিপার্শ্বিক বীজাণু ধ্বংশ হইতে চলিয়াছে। তাঁহার ধারণা হইল—ছত্রক হইতে হয়তো কোন জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে যাহার সংস্পর্শে আসিয়া বীজাণুগুলি ধ্বংশ হইয়া চলিতেছে। পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চলিতে থাকিল, 'ফ্লেমিং' নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন। দেখা গেল এই ছত্রক সকল বীজাণু নষ্ট করে না কিন্তু কয়েক প্রকার বিশেষতঃ ককাসজাতীয় বীজাণু ধ্বংশ করে।

তার পরের কাহিনী, দীর্ঘদিন ধরিয়া এই ছত্রক নির্গত পদার্থকে বিশুদ্ধ আকারে পাওয়ার চেষ্টা। 'ফেমিং' ঐ লব্ধ পদার্থের নামকরণ করিলেন "পেনিসিলিন", ঐ নামকরণের কারণ ছত্রক "পেনিসিলিয়ম্ নটেটম" গোত্রীয় বলিয়া। ১৯২৮ সালে সেণ্টমেরী হাসপাতালে মানুষের অচিন্তনীয় পরমমিত্র এই যুগান্তকারী আবিষ্ক্রিয়া সংসাধিত হইল। অর্থাভাবে বহুদিন আর ইহার খোঁজ পড়ে নাই; তারপরে গত মহাযুদ্ধে আমেরিকার অর্থে পেনিসেলিন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া যুদ্ধের বিভীষিকায় যাহারা চিরদিনের মতন পঙ্গু, খঞ্জ, হইয়া থাকিত, মেনিনজাইটিস ও নিউমোনিয়ায় বিদেশে, বিভুঁয়ে প্রাণ হারাইত তাহারা বাঁচিয়া গেল, যুদ্ধের সহিত জড়িত বহুবিধ অকল্যাণ ও সামাজিক ব্যাধিতে যাহাদের অকেজো হইবার সম্ভাবনা ছিল, পেনিসিলিন তাহাদের পক্ষে অব্যর্থ ধন্বন্তরী হইল। 'ফ্লেমিং'এর পথ অনুসরণ করিয়া আমরা যক্ষ্মারোগের মহৌষধ, জীবাণুধ্বংসকারী ষ্ট্রেপ্টো ম্যাসিডিন, পলিপরিণ প্রভৃতি ঔষধ পাইয়াছি। শেষোক্ত ঔষধ আমাদেরই ডাঃ সহায়রাম বসুর গবেষণার ফল। পচা কাঠও বাঁশের ছত্রক হইতে তিনি 'পলিপরিণ' তৈয়ারী করিয়াছেন। পলিপরিণ পেনিসিলিনের চেয়ে কোন কোন ও গুণে উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ পাকস্থলীর রসের ক্রিয়া না থাকায় ফোঁড়াফুড়ি দরকার হয় না, মুখেই খাওয়া চলে। গরমেও নষ্ট হয় না। কিন্তু প্রচুর টাকার অভাবে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়ায় এই ঔষধ এখনও সাধারণ্যে প্রচলিত হয় নাই।

পৃথিবী আজ আগাইয়া চলিয়াছে। উত্থান ও পতনের মধ্যেও লীলাময় তাঁহার রথের বল্গা সবল হস্তে ধরিয়া রহিয়াছেন। মানুষ মানুষকে হত্যা করিবার জন্য বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই একদল আপনভোলা পাগল বিজ্ঞানকেই মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী করিয়া সকল বিপদ আপদকে সবলহস্তে দূরীভূত করিতেছে। ধ্বংস ও সৃষ্টি প্রাকৃতিক খেয়ালে একসাথেই পাশাপাশি চলিয়াছে। আক্রমণের তীব্রতার সহিত জ্ঞানের পরিধিও বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। এই যুদ্ধে বিশ্রাম নাই, সন্ধি নাই, এক হাতে 'এটম' বোমা, অপর হাতে জাগতিক্ রশ্মির বরাভয় মূর্ত্তি। ধীরে অথচ সবল গতিতে সভ্যতার রাজশকট আপন শক্তিতেই রাজপথক প্রশস্ততর করিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞান আজ মানুষের জীবন যাত্রার সহিত ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে। সেতু মুখ বিস্তৃত হইবার সাথে সাথে ঘাটে, মাঠে ও পথে দৈনন্দিন লোক যাত্রার সহিত গবেষণাগারের গভীর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হউক।

রাত্রি

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

শিয়রের কাছে লণ্ঠনের উস্কানো আলোটাতে মোটা ডায়েরীখানা পড়ছে রাত্রি—তার নিজের ডায়েরী।···"আমাদের দেশের লোকগুলো কেন এত মূর্খ? শুধু কয়েকটা টাকার জন্য, নয়তো একধাপ উঁচু আসনের জন্য কেন তাদের মনের মধ্যে এমন জঘন্য বৃত্তি দানা বাঁধে—যার প্ররোচনায় ভাই ভাইকে ধরিয়ে দেয়ে, একদেশবাসী হয়ে দেশবাসীর জীবনের সাধনাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় কয়েদখানার ভেতর ঠেলে দিয়ে লোহার শিকে আঘাত করাতে করাতে?"

রাত্রির মনের মধ্যে শুধু এই চিন্তাই বারে বারে এসে তাকেও তার বিদ্রোহী স্বামীর পদরেখা অনুসরণ করতে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রাত্রির দুঃখ হয়—দেশের বিশেষ কাজে নিযুক্ত লোকগুলোর জন্য। ভগবান কেন ওদের সুমতি ফিরিয়ে দিচ্ছে না!

কালো, নিকষ ঘন-কালো রেশমের মত কোমল চুলগুলো বেণীতে বন্দী হ'য়ে রাত্রির পিঠের উপর সাপের মত খেলে বেড়াত। সে রাত্রি এখন আর নেই, সে রাত্রির হ'য়েছে মৃত্যু—কাঞ্চনের নামে ওয়ারেণ্ট বের হবার সাথে সাথে। স্বামী যার নিরুদ্দেশ—তার আবার কিসের সাজ পোষাক, তার আবার কিসের চুলে চিরুনী দেওয়া?—

চুলগুলো তার হ'য়েছে সন্ন্যাসিনীর মত বড় বড় জটার জটলা পাকানো। স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পর থেকে এক একটী বছর যেন ওর শরীরের ওপর দিয়ে যুগের ঝঞ্ঝা বইয়ে চলে গেছে—মৃত্যু যেন ওকে ছোঁয় ছোঁয়!

তথাপি এই ভগ্ন মনে,দুঃখের আঘাতে চৌচির-করা মন নিয়ে সে তার লক্ষ্য পথ ছেড়ে একটুও অন্যপথে চলছে না।

কাঞ্চনের সাথে যখন রাত্রির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়, ওদের আত্মীয়স্বজনের অনেকেই আপত্তি জানিয়েছিল—বিপ্লবী নেতা কাঞ্চনের হাতে রাত্রিকে তুলে দিতে। কিন্তু রাত্রি তখন নিজের লজ্জাকে দূরে রেখে নিজের ইচ্ছে মাকে বিনীতভাবে জানালো—"জীবন যদি একঘেয়ে হয় সে জীবন জীবনই নয়। আমাদের সমাজ যেন হ'য়ে গেছে একটা বদ্ধ পুকুরের সামিল—না আস্‌ছে জোয়ার, না যাচ্ছে জড়করা আবিলতা দূর হ'য়ে। সবাই কেরাণীর স্ত্রী: দশটার সময় রান্না করে স্বামীকে আপিসে পাঠিয়ে দিয়ে আবার পাঁচটার আশায় হাঁ করে ঘড়িকে বিরক্ত করা কিছুতেই আমার ভাল লাগবে না। আমি চাই নূতনের সন্ধান, আমি চাই নূতন! বিগত দিনের ধারাবাহিক জীবন যাপনের চেয়ে না হয় অন্ধকারময় ভবিষ্যতের দিকেই ছুটে চলে দেখি—আমার ভাগ্যে কি আছে, ভবিষ্যতের বুক চিরে দেখি নূতন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা? ভবিষ্যতের পথে আমাদের দুয়ার তো রুদ্ধ নয়?…

কাঞ্চনের নামে যেদিন ওয়ারেণ্ট বের হবার সংবাদ দশদিকে ছড়িয়ে পড়ল, এই দুঃসংবাদের নির্ম্মম চাপে রাত্রি পূর্ণতার পূর্ব্বেই তার জঠর অভ্যন্তরের সন্তান অলককে পৃথিবীতে প্রথম আলোবাতাস দেখালো। ছেলের মুখ দেখে যে সংসারে একটানা আনন্দের ঢেউ খেলে যাবে সেখানে দেখা দিল বিষাদ। আনন্দ করে কে?

অলক বড় হ'য়েছে, সমস্ত কথাই গুছিয়ে বলতে পারে; বোঝে। পাড়ার ছেলেদের সাথে বাড়ীর সংলগ্ন মাঠে খেলতে যায় সে।

খেলতে খেলতে খেলা রেখে একদিন অলক বাড়ীতে ছুটে এসে ডাকে—"মা, মা?"

—কি রে খোকা, কি হ'য়েছে? অমন করে ছুটে এলি যে?

—একজন ভদ্রলোক মাঠে এসে আমায় জিজ্ঞেস করেছে, আমার বাবার নাম কি? আমার বাবা কি করেন? বাবা কোথায় থাকেন—এই সব?

—তুই তাঁকে কি বল্লি?

—আমি তো কিছুই জানিনে, তা বলবো কি?

—বল গিয়ে…তোর বাবার নাম তো তোকে বলে দিতে হবে না?

—না।

—আচ্ছা। তিনি একজন বিপ্লবী নেতা। আজ এগার বৎসর এগার মাস কয়েকদিন হ'ল তিনি নিরুদ্দেশ। সরকার তার বিরুদ্ধে সমন বের করেছেন—মেয়াদ তার ১২ বৎসর। তিনি কোথায় আছেন আমাদের জানা নেই।

ঠিক এই কথাগুলো—পিতার এতটা পরিচয় রাত্রি কোনদিনই তার নাবালক ছেলে অলকের কানে দেয় নি, অথচ শিক্ষা-দীক্ষায় ছেলেকে পিতার আদর্শে গড়ে তোলবার জন্য যে প্রয়াস তাতে এতটুকু শিথিলতা নেই।

গত কয়েক বছরের মধ্যে কাঞ্চনের সম্বন্ধে কত রকমারী খবর রাত্রির কানে এসেছে—যা' এসেছে নিশ্চয়ই তার চেয়েও অনেক বেশী রাত্রির কাছে গোপন রাখা হ'য়েছে। কোনটা জাহাজডুবিতে কাঞ্চনের মৃত্যু, কোনটায় প্লেনক্রাশ, কোনটায় পুলিশের গুলিতে নিহত ইত্যাদি। এ সমস্তই রাত্রি অবিশ্বাস করেছে। অবশ্য সংবাদটী শোনা মাত্র প্রথম প্রথম তার কেমন একটু লেগেছে একথা রাত্রি তার মহাভারতের মত মোটা ডায়েরীতে স্বীকার করেছে; কিন্তু তার স্বামী শেষ পর্য্যন্ত তার কাছে ফিরে আসবেই—অলককে না দেখে কিছুতেই তাঁর মৃত্যু হ'তে পারে না, এ দৃঢ় মনের বল তার সেই ক্ষণিকের মূর্চ্ছনাকে সতেজ করে দিয়েছে—মনকে তার রাঙিয়ে দিয়েছে।

অলক মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে হাসিমুখে। মাঠের সেই ভদ্রলোক তাকে আদর করে কোলের কাছে নিয়ে বলেছে—"বা: উপযুক্ত বাপের ছেলে তুমি। বাপের মতই উপযুক্ত হওয়া চাই। আজ যেমন তুমি এই খেলার মাঠের Captain, ভবিষ্যতে তোমাকে এই সারা দেশের Captain হ'তে হবে মনে থাকে যেন।"

অন্যদিন ঠিক রাত ১০টায় অলককে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রি তার বিগত ব্যথাতুর দিনের নীরব সাক্ষী ডায়েরীখানা খুলে

পড়তে থাকে—রোজকার ডায়েরী লেখে। কিন্তু আজ আর অলকের চোখে ঘুম নেমে আসছে না। শুধু এলোমেলো প্রশ্নে অলক রাত্রিকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুল্লে—যে প্রশ্ন কোনদিনই সে করে নি। অলক প্রশ্ন করে, "বিপ্লবী কাকে বলে? দমন কি? সরকার কে?" রাত্রি আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়, হ'য়ে যায় আনন্দে আত্মহারা। যেরূপ বীজ বপন করবার জন্য রাত্রি অলকের দেহমনকে, চিত্তকোরককে একান্তভাবে তৈয়ারী করছিল, আজ অলকই নিজের থেকে রাত্রিকে সেই প্রশ্ন করায় রাত্রির ব্যথিত বুকখানিতে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, মুখে তার ফুটে উঠলো এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ—কৃতকার্য্যতার আনন্দে। কাঞ্চন ফিরে আসবেই, তাঁর কোলে অলককে তুলে দিতে এতটুকু লজ্জা থাকবে না তার, বরং বলতে পারবে তোমারই ছেলে।

রাত্রি বিনিয়ে বিনিয়ে অলকের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে। রাত তখন প্রায় ১২টা বেজে গেছে। রাত্রির চোখেও তখন তন্দ্রা।

হঠাৎ দরজার কড়া চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই—"কে কে" বলে উঠল রাত্রির বৃদ্ধ শ্বশুর। পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে রাত ১২টায় কড়া-নাড়ার শব্দ বিশেষ ভয়ের লক্ষণ। বৃদ্ধ ভয় পেয়েছেন।

রাত্রির ঘুম ছিল পাৎলা। এমনটী ঠিক যে ওর বরাবরই অভ্যেস ছিল তা' নয়। কাঞ্চনের নামে ওয়ারেণ্ট বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রির চোখে আর তেমন গাঢ় ঘুম ছিল না। কি জানি কখন, কোন রাতে এসে কাঞ্চন ফিরে যায়……।

পাশের ঘরে শায়িতা রাত্রি বলে উঠলো—"ও কিছু নয়, বাতাস নয়তো বেড়াল, আপনি ঘুমোন।"

কিন্তু সন্দিগ্ধ মন রাত্রির, বাতাস বা বিড়াল তার বৃদ্ধ শ্বশুরের মনকে বোঝানোর জন্য—তার নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য নয়। এক যুগ হ'তে চলেছে—রাত্রে যে কোন শব্দে রাত্রির কাণ জেগে ওঠে, কার পদক্ষেপের জন্য তার লোভাতুর শ্রবণ পিপাসার্ত্ত হ'য়ে আছে—ক্ষণিকের অলসতায় সে পথিক এসে দাঁড়িয়ে থেকে বাতাসের চোখেও না পড়ে এই তার ভয়।

রাত্রি চট্ করে উঠে বসল বিছানার উপর—ঘুমানো খোকাকে কোলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে। চুপি চুপি আলো জেলে দরজা খুলেই রাত্রি দেখে বড় বড় জটা মাথায় নিয়ে গেরুয়া-বসন-পরা একজন মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে।

রাত্রির ভয় শ্বশুর ম'শায় কিছু টের না পান। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল, "কে আপনি?"

—ভয় নেই রাত্রি, আমি কাঞ্চন।

—তুমি!

পা' থেকে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎগতিতে দেখতে লাগল রাত্রি। আগের চেহারার সঙ্গে কাঞ্চনের এখনকার চেহারার কোথাও সাদৃশ্য আছে কি না?

কাঞ্চন হেসে উঠল। তুমি আমাকে চিনতে পারছো না রাত্রি? যার পেছনে এত দীর্ঘ দিন সরকারের দমন হাওয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ নাগাল পায়নি, তার চেহারাকে তুমি আগের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাও? এতদিন দেশের অনেক কাজ করেছি দমনের অন্তরালে থেকে, আজও আছি—এখনও আছি, কাল সকালে আর থাকবো না—যদি নাকি সরকার আবার দয়াকরে আমার উপর কৃপা দৃষ্টি না দেন।

অনির্ব্বচনীয় আনন্দে রাত্রির চিত্ত ভরপুর হ'য়ে উঠল। যার অদর্শনে ও অসাহচর্য্যে ২৭ বৎসর বয়সে রাত্রির যৌবন অস্তাচলগামী হ'য়েছিল তারই অপ্রত্যাশিত আগমনে রাত্রির অন্তরে যেন নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল, নূতন করে যেন বসন্ত ফিরে এলো—রাত্রিকে তার হৃত যৌবন ফিরিয়ে দিতে। অদর্শনে ও দর্শনে একি পার্থক্য! রাত্রির ইচ্ছে হ'ল ক্ষণিকের জন্য ছুটে গিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিমূর্ত্তি দেখে আসে—দেখে আসে, সত্যিই তার বিগত ব্যথাতুর দিনের সাক্ষীরূপে যে কয়েকখানি হাড় তার বুকের পিঞ্জরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সত্যি সত্যিই তাদের উপর মাংসপেশী উঠেছে কিনা?

তোমাকে কিছু খেতে দি? কতদূর থেকে না জানি তুমি এসেছ, কত পথচলার ক্লান্তিতে নিশ্চয়ই তোমার ক্ষিধে আছে?

এখন আর খাব কি? রাত আর কতটুকুই বা আছে? তার চেয়ে এসো চুপি চুপি গল্প করি। আমার এই পলাতক জীবনের গল্প নিশ্চয়ই তোমার ভাল লাগবে। জীবনে তুমি বৈচিত্র্য চেয়েছিলে—কত বিচিত্র সে

কাহিনী, আবার তোমাকে শোনাব বলে মনে মনে মালা গেঁথে রেখেছি।

স্বাতন্ত্র্য জীবনই আমার লাগ্‌ছে ভাল। এই তো জীবনের আলো ছায়া। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী দম্পতির মত নিরিবিলি ভাবে জীবনতরী বেয়ে পরপারের ঘাটে পৌছানো—এ সাধাসিধে জীবন কি ভাল? আমি চাই আমাদের জীবন-তরণীকে মহাসমুদ্রে তার উর্ম্মিমালার ঘাত-প্রতিঘাতে সর্ব্বদাই দোদুল্যমান রাখ্‌তে। যাক্‌গে এখন সে কথা—আমি ভাব্‌ছি কাল্‌কে সূর্য্য ওঠার সাথে সাথে তোমার উপর থেকে সমনখানি নেবে যাবে সেই কথা। ক'টা বাজে?—একটা মিনিট যেন কত বড় বলে মনে হয়।

ঘড়ি ঠিকই চল্‌ছে রাত্রি। ওটা একটা যন্ত্র, লোহার তৈয়ারী। মানুষের কোমল মন বুঝবার ওর অবসর নেই, মন নেই।

—আমার এখন কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

—কি?

—ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে গিয়ে পূব আকাশের কোল হ'তে টেনে তুলি সূর্য্যদেবকে—অনুরোধ জানাই তাঁকে একটু সকাল সকাল পূব আকাশে তাঁর লাল মুখ নিয়ে দেখা দিতে।

রবীন্দ্রনাথের বনানী-প্রীতি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলায় যে অসংখ্য মাধুরী কবির চিত্তে আনন্দের লহর তুলতো, তার মধ্যে ছিল ফাগুনে আমের বনের পাগল-করা ঘ্রাণ, অঘ্রাণের ভরা ক্ষেতের মধুর হাসি, নদীর কূলে কূলে বটের মূলের বিছানো আঁচল। সবকালের সকল দেশের কবির প্রাণে তরুলতা, ফুল, পাতা আর তাদের বিচ্ছুরিত বর্ণের লীলা-হিল্লোল আনন্দের লহর তোলে। রবীন্দ্রনাথ পসারিণীকে দেখেছিলেন হাট, ঘাট, ঘর, বাট, মুখর দিনের কলকথা সব ভুলে গাছের ছায়াতলে বসতে। তার লাভের জমানো কড়ি, ডালায় পড়ে রহিল। তার ভাবনা কোথায়ধেয়ে চল্‌লো?

অন্য কবি হ'লে হয়তো পসারিণীর সে বিলাস-বিশ্রামের আনন্দ-পরশে মাত্র হৃষ্ট হ'তেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পসারিণীর মনের গভীরে ডুব দিলেন। অতুল-রতন পাবার তরে রূপ-সাগরে ডুব দেওয়া তাঁর অভ্যাস। কবি বুঝলেন পসারিণীর প্রাণে

অনন্তের বাণী আনে
সর্ব্বাঙ্গে সকল প্রাণে
বৈরাগ্যের স্তব্ধ ব্যাকুলতা।

নিরক্ষর গ্রাম্য নারী সকল বণিক আহ্বান, কালের অগ্রগতি ও কর্ম্মের আভাস ভুলে, কেন গাছতলায় আনমনে বসেছিল? যখন

শব্দহীনতার স্বরে
খর রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে
শূন্যতার উঠে দীর্ঘশ্বাস।

কবি বুঝেছিলেন, এই অসাধারণ আচরণের ইঙ্গিত। বুঝেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্ব-কবি। তিনি জানতেন, বিশ্বের কোনো ব্যাপার, কোনো পদার্থ, কোনো প্রাণ সারা বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন নয়। সকল রূপ, সকল বর্ণ, সকল গন্ধ সব ছন্দ, একজোটে মিলে অসীমকে সীমাবদ্ধ করেছে। বিশ্বের সকল অংশ অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। তাদের চরম চেতনার সাড়া মেলে মানুষের মনে। তার স্মৃতির ভাণ্ডারে লুকানো আছে সে বার্ত্তা। কবি তাকে খুঁজে পায়। সাধারণ নরনারীর চেতনায় অজ্ঞাত, অস্পষ্ট ছন্দে সে আদিম কথা জাগে। বিশ্ব-বাণী বাণাখানি হাতে লয়ে, নিঝুম রাতে গভীর রাগিণী বাজিয়ে যায়। চিত্তের ঘুম ভাঙে না, তাই সে বাজনার স্পষ্ট সঙ্কেত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তবু অতীতের স্মৃতির স্পন্দন অনুভূত হয় আনমনার প্রাণে। পসারিণীর সংসার ভোলার ইহাই ছিল কারণ। তাই কবি বুঝেছিলেন—

সৃষ্টির প্রথম স্মৃতি হোতে
সহসা আদিম স্পন্দ সঞ্চরিল তোর রক্ত স্রোতে
তাই এ তরুতে তৃণে
প্রাণ আপনারে চিনে
হেমন্তের মধ্যাহ্নের বেলা,—
মৃত্তিকার খেলা ঘরে
কত যুগ-যুগান্তরে
হিরণে হরিতে তোর খেলা।

অন্য দেশের কবির কল্পনা গাছপালায় প্রাণ-সঞ্চার করেছে। সে সঞ্চার রূপক। রবীন্দ্রনাথ তাদের মাঝে প্রাণ দেখেছেন—যে প্রাণ অভিব্যক্ত হয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে মানবতায়। জীবনের প্রথম যুগে যাত্রা একত্র আরম্ভ করেছিল জীবজন্তু গাছপালা এমন কি মানুষ। তখন তারা কেহ আজকের রূপ পায়নি।

১৯২৬ সালে ভিয়েনা হ'তে কবি এক পত্রে তাঁর বনানী-প্রীতির নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের মুক্তিতত্বের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে কবির কল্পনায় বোধিদ্রুমের বাণী যেন মিশে আছে। "আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী—বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেবঃ। শুনেছিলেন—'যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতিনিঃসৃতং'। তাঁরা গাছে গাছে চির যুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন—'কেনঃ প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরণা অহরহ ঝরতে লাগলো, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা।"

প্রাণ-সৃষ্টির রহস্য, তার আবর্ত্তন, অভিব্যক্তি, স্ফুরণ এবং নব নব রূপে উন্মেষণ সকল চিন্তকে চিন্তার অবকাশ দেয়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান-বিদ্ পরীক্ষা এবং অনুশীলনের ফলে সিদ্ধান্ত করেছে যে আদি-প্রাণ এক-কোষ বৃক্ষ-রূপেই পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'য়েছিল। তারপর অভিব্যক্তি এবং অগ্র-গতির কল্যাণে এই আদি-প্রাণেরই একশাখা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বট প্রভৃতি মহীরুহ রূপে আজ বিদ্যমান। এই আদি-তরু হ'তে আদি-জন্তু অভিব্যক্ত। সেই শাখার চরম পরিণতি মানুষ জীব। বৃক্ষ ও জান্তব প্রাণের মোটামুটি পার্থক্য এই যে—বৃক্ষ নিজের প্রাণ-ধারণ ও পরিপুষ্টির জন্য তথা-কথিত জড় প্রকৃতি হ'তে উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। এর দেহে অম্লজান, অঙ্গারজান প্রত্যক্ষ প্রবিষ্ট হয়, জলজান, অঙ্গার মিশে উদজারের সৃষ্টি হয়। তাতে তার পরিপুষ্টি। জন্তুর প্রতিপালন হয় কোনো বৃক্ষ কিম্বা বৃক্ষ-ভোজী জন্তু-ভোজনে। মোট কথা বৃক্ষ এবং জন্তু সৃষ্টির আদিতে একত্র যাত্রা সুরু করেছিল।

কবি বিজ্ঞানের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। আরণ্যক ঋষিকেও সেই প্রথম প্রাণ প্রৈতির নবনবোন্মেষণ-শালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহ অভিভূত করেছিল। তিনি—কেন চিন্তার উপকরণ পেয়েছিলেন সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে এবং সৃষ্টি-রহস্যে—অরণ্যাণীর গভীরে বোসে মনের গভীরে চিরন্তন প্রশ্নের-উত্তর পেয়েছিলেন—রসো বৈ সঃ। সেই ভীতি-সঙ্কুল নির্জ্জনতার মাঝেই বুঝেছিলেন—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান মা বিভেতি কদাচনঃ। কারণ সর্ব্বংখল্বিদম্ ব্রহ্মঃ।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের গভীর চিত্ত তাঁর কাছে সদাই আনন্দের বাণী গুঞ্জরিত। তাঁর কাছে "ঐ গাছগুলা বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একটানা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে শান্তম শিবম অদ্বৈতম।" এই উক্তিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য বোঝবার হু'টা সূত্র পাওয়া যায়—তাঁর বিশ্ব-প্রেমের অন্তর্ভূক্ত কেন বৃক্ষ-প্রীতি ও বিশ্ব-প্রেম এবং বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি কেন তাঁর নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ লভিবার সাধনা তাঁর। ভগবানের আনন্দ বিরাজে বৃক্ষে গন্ধে গানে।

বন্ধু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের প্রিয় কর-কমলে বন-বাণী উৎসর্গ করতে কবি বলেছেন—

"মূক-জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃ-বক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে-পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকা-বাঁকা
জন্ম মরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর-রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।"

বিলাতী কবিদের মধ্যে টেনিসন তাঁর জীবিতকাল অবধি আবিষ্কৃত বিজ্ঞানের সত্যকে ছন্দে গেঁথে পাঠককে

উপহার দিয়েছেন। ডাফোডিল সারির নৃত্য ওয়ার্ডস-ও-য়ার্থের প্রাণে নির্জনতার আনন্দের চমক বিচ্ছুরণ করেছিল। ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞান-গ্রন্থ লিখেছিলেন পদ্যে। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পদ্যে লেখা। বিজ্ঞানের পুস্তক রোগের নিদান ছন্দে বর্ণিত। অস্ত্রোপচারের এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা গদ্যে লিখিত নয়। এ সবের মধ্যে কিন্তু কবিতা বল্লে যা' বোঝায়—চিত্তের উদাত্ত বাণী—তা' নাই। কেবল ছন্দ আছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে বনের বাণী শুনিয়েছেন, দার্শনিক হিসাবে বিশ্বকে সংশ্লিষ্টভাবে বোঝবার পক্ষে সে বাণীর কী মূল্য, তা' উপলব্ধি করেছেন, অথচ তরু-লতা বা গ্রহ-নক্ষত্রের রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা উপেক্ষা ক'রে, দৃঢ় ভূমির পরিবর্ত্তে কল্পনার আশ্রয় নেননি। এ শ্রেণীর কোনো কবিতা বিশ্লেষণ করলে সে কথা বোঝা যাবে। অথচ সমস্ত কবিতাটি পাঠ করলে, যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য অজ্ঞাত তাকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে পথ ভুলতে হবে না। সত্যকে কল্পনা ভাবলেও তার মনোহারিত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না। সে পাঠককে নিজের উদারতায় উচ্চ ভূমিতে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর শব্দের ঐন্দ্রজালিক রবীন্দ্রনাথ, ভাষায় ও ছন্দে বুঝিয়ে দেবে মাতৃ-ভাষার মাধুরী।

ধরুন বৃক্ষ-বন্দনা। কজনের মনে সন্দেহ হবে যে এমন মধুর চিত্র, এত ললিত বর্ণনা, এর মন-ভোলানো ছন্দ বস্তুতন্ত্রতার-ভিত্তিতে রচিত। খণ্ড খণ্ড করে দেখলে মনে হবে—এ কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থে স্থান পেলে অসমীচীন বা অশোভন হবেনা। তার সঙ্গে জড়ানো যে আবেগ, সে সরল ও সহজ। উৎকট অবাস্তব কবি-কল্পনা নয়। কবি দর্শক। গাছের জীবনতত্ত্ব আলোচনা ক'রে মনের মধ্যে দেখেছেন আবেগের উৎস। সে উৎস মুখ হতে সু-ললিত শব্দ-ঝরণার উচ্ছ্বসিত মাধুরী বিকীর্ণ করেছেন বাংলার গৌরবময় সাহিত্যে।

জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলে, জ্যোতির আকর সূর্য্যের আবর্ত্তমান অগ্নিময় বাষ্পদেহ একদা অন্য এক বৃহৎ তারকার আকর্ষণের প্রভাবের মধ্যে এসেছিল। রবি দেহের সামান্য অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাব্যোমে ঘুরেছিল। ভানু-কলেবরের সে বাষ্পময় ছিন্ন অংশ আবর্ত্তন ও আকর্ষণের ফলে আবার খণ্ড খণ্ড হয়। এক এক খণ্ড জমাট বেঁধে এক একটি প্ল্যানেট সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী তেমনি একটি প্ল্যানেট।

আমাদের ধরিত্রীর পৃথক জীবনযাত্রা ঐ জ্যোতিঃ-স্বর্গ-সূর্য্যের দেহ ছেড়ে। সে তখন ছিল ম্লান ধূসর বরণে আবর্ত্তিত-ব্যোম-বিহারিণী। ক্রমে আধুনিকরূপ ধারণ করেছে—উপরের আবরণ জল এবং দৃঢ় ভূমি, অন্তরে সূর্য্যের সেই অগ্নিময় জ্যোতি। সে অগ্নি ফুটন্ত ধাতু ও পৃথিবীর দেহোপকরণের বিভিন্ন অণু পরমাণু। প্রাণের প্রথম বিকাশ জলে। তার পর ভূমি-বন্দীশালা হ'তে মুক্ত হ'য়ে বৃক্ষের আবির্ভাব। সূর্য্যের কিরণই তরুর প্রাণ-শক্তির উপাদান। বৃক্ষই রবির সহায়তায় আকাশে জল বিলায়। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার চক্র জগতের ধারা।

পৃথিবীর জন্ম-বৃত্তান্ত কবি, বৃক্ষ-বন্দনায় অতি সংক্ষেপে বলেছেন। ধরিত্রী—

—দেবকন্যা দুঃসাহসী

কবে যাত্রা করেছিলো জ্যোতিঃ-স্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে—
পাংশুম্লান গৈরিক-বসন-পরা।

সেই ভূমি-গর্ভে বৃক্ষ, আদি-প্রাণ, প্রাণের প্রথম জাগরণে সূর্য্যের আহ্বান শুনেছিল। জাগরণ—সৃষ্টি নয়। এখানে কবি নিজের প্রাচীন কৃষ্টি সমর্থন করেছেন, কারণ যাকে মেটিরিয়ালিষ্ট জড়বাদী জড় বলে, হিন্দু তাকেও বলে সুপ্ত-চেতন।

প্রাণের উপাধি যেমন সুখ, তেমনি বেদনা। তারা জগতে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাই সেদিন সূর্য্যের আহ্বানে বৃক্ষ—

ঊর্দ্ধশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে আনিলে বেদনা
নিঃসার নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সত্যই তো সেদিন পৃথিবী ছিল ছন্দোহীন, মাত্র মরু। প্রাণই উপলব্ধি করে বেদনা। তাই উদ্ভিদ্-রূপ প্রাণের আবির্ভাবে জগতের হ'ল বেদনায় অভিযান।

শব্দের আধার যে ব্যোম, সে ব্যাপে বায়ুর হিল্লোল গাছের পাতায় মাঝে খেলেই তো মর্ম্মরিয়া ওঠে, গুঞ্জরিয়া ওঠে। ঋতুর উৎসব তো বনে। নটরাজের ছয় রাগ যে ছয় ঋতু ঘিরে। গ্রীষ্মে প্রকৃতি—

জীর্ণ পর্ণ শয্যাপরে একা রহে জাগি,—
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পরশ্পার্শ মাগি।

"নটরাজে" কবি ফুটিয়ে তুলেছেন ঋতুর খেলা, আর তার হর্ষের তরঙ্গ। আনন্দও সৃষ্টির চির-সাথী। তাই এই ঋতু-রঙ্গশালে সকল দিনেই কবি আনন্দ উপভোগ করেছেন।

সূর্য্য-রশ্মিপায়ী বৃক্ষ দিনের পর দিন ভানু-কিরণের সাহচর্য্যে প্রাণের পুষ্টি-উপাদান আহরণ করছে। সূর্য্যের আলোকে পাতার সবুজ কোষ জলের পরমাণুদের বিশ্লিষ্ট করে। মুক্ত জলযান অঙ্গারের সঙ্গে মিশে উদজার সৃষ্টি করে। ঐ পদার্থ তরু শরীরের প্রধান উপাদান।

সূর্য্যের বক্ষে জলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধ রূপ।

সেই তেজ মানবের প্রতিপালক।

যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
ক'রেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান,
হ'য়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্দ্ধী।

তাই শেষে কবি বলেছেন—

অর্পিলাম তোমার প্রণাম।

এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের বহুদিকস্পর্শী মৌলিক প্রতিভার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। রবীন্দ্র সাহিত্যের যত গভীরে ডুব দেওয়া যায়, তত বেশী রত্ন আহরণ করা সম্ভব। মাত্র দ্রুত পাঠ করলে রবীন্দ্রের ছন্দ এবং ভাষার ইন্দ্রজাল, চেতনাকে তুষ্ট করে। কিন্তু রচনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করলে প্রজ্ঞা প্রফুল্ল হয়। সকল দিক থেকে সব কথার অবতারণা অসম্ভব। তাই কবির উদ্ভিদ্-প্রীতির মূল হেতুর মাত্র উল্লেখ করছি।

তিনি দেবদারু কবিতায় অতি-সরস উচ্ছ্বাস প্রকট করেছেন। বলেছি পৃথিবীর পাষাণ এবং সাগর তথা রত্ন ও হলাহল সূর্য্যের দান। কারণ তার দেহের এক টুকরা এই ধরণী। এর পালনও রবির নিত্য-কর্ম্ম। গিরি-শৃঙ্গের দেবদারুকে তাই কবি বলেছেন—

তপোময় হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।

তাই হিমালয়,

ঊর্দ্ধ হ'তে পেয়েছিল ঋণ—
ঊর্দ্ধ পানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।

"আম্র-বন" কবির প্রাণে উদাত্ত-স্বর উঠিয়েছিল। আম্রবনের সঙ্গে নিমেষে নিমেষে যখন কিশলয়রাজি সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে, তখন—

"আমিও তো আপনার কল্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ আবেশে
অমনি নূতন।

কবির প্রাণেও, অদৃষ্টের নিঃশ্বসিত ধ্বনি দোলা দেয়। সে পুষ্প শোভা কবির চিত্তে বিকশিত হয় নূতন চেতনে, কেবল বাণীর ভূষায়, সুরের গাঁথনীতে, গীত ঝঙ্কারের আবরণে।

"বন-বাণী"তে কবির তরু-লতার প্রীতি রূপায়িত হয়েছে।

একদা হঠাৎ কবির চক্ষে এক কুরচি গাছ পড়েছিল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত। কিন্তু এমন তরুকে কোনো কবি তো কবিতার আসরে পাংক্তেয় করেনি। তাই তাকে আদর ক'রে কবি লিখেছেন—

তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরব হারা ; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করেনি অভ্যর্থনা অলঙ্কার-ঝঙ্কারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা স্থান অবারিত।

ভারতীর বর-পুত্রর তাই অবারিত চেতনায় অবজ্ঞাত কুরচি স্থান পেয়েছে। বেদের মেয়ে স্বর্গ হতে চুরি-করে-আনা কুরচীকে কুটীরের কানাচে লুকিয়ে রেখেছে, পণ্যের কর্কশ-ধ্বনি কটুনামের আবরণে। কিন্তু তাতে তার শুচিতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারণ—

সূর্য্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুরচি প'ড়েছো ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

এ কবিতার মধুর রস, বাংলার গাছ পালার নাম-করণে অন্তর্নিহিত স্নেহ, আর এর প্রচ্ছন্ন প্রফুল্লতা, উৎফুল্ল করে পাঠকের মন। বাঙলার গাছ-পালা জন্তু ও পাখী এমন কি পুত্র-কন্যার ডাক নাম আমাকে মর্ম্মাহত করে। কুরচির অবহেলা কবির অমনোনীত হবে, সে বেশী কথা নয়।

কবির বন্ধু পিয়ার্সন সাহেব একটি বিলাতী লতা রোপণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে তাঁর বাসায়

অঙ্গনে। সে লতা যখন ফুল ধরলে, কবি তার নাম দিলেন নীলমণিলতা। সেই নবীনের সঙ্গ কবির প্রাণে যে একটী ভাবের লহর তুলেছিল-মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান ও দর্শনে তার মূল্য প্রচুর। এ কবিতার মাধুরীও প্রতুল।

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধূলা ওড়ে। আঁখির বিস্ময় রস ঘোচে।

সে অবস্থায় নবীনের কথায়, ঔদাস্যের ধূলার অপসরণ হয়, মন আবার কার্য্যকরী হয়। অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত হয়।

নারিকেলের অন্তরে সে আশ্বাস রাত্রিদিন চলেছে
"প্রাণ-তীর্থে চলো, মৃত্যু কর জয়, শ্রান্তি ক্লান্তিহান।"

কবি সে বাণী শুনেছিলেন।

'বন-বাণী'র কবিতাগুলিতে আমরা এমনি সব সুর শুনি।

প্রাচীন কবিরা নায়িকা এবং ফুলের মধ্যে বহু আলাপ আলোচনা শুনেছেন। সে ভাষণে নানা সুকুমার সুষ্ঠু আবেগ উচ্ছ্বসিত। নারীর অপেক্ষায় পল্লবচ্ছায়ায় এক পুষ্প ছিল। নারীর নিশ্বাসে তার অন্তর জেগে উঠেছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ সেই জাগা অন্তরের মুখরতা লিপিবদ্ধ করেছেন "পুষ্প" কবিতায়।

আদিম প্রভাতে, প্রথম আলোকে নারী ও পুষ্প এক ছন্দে বাঁধা দু'টি রাখী পরেছিল হাতে। তার পর তারা দু'জনে দু'পথে যাত্রা করলে। অভিব্যক্তিবাদের সে কথা পূর্ব্বে আলোচনা করেছি। সৃষ্টির ধারা রক্ষা হয়েছে ফুলের এবং নারীর মনের এক সুরে। কিন্তু নারীত্বের অভিব্যক্তির সঙ্গে চিত্তের বিকাশ হয়েছে। বিকসিত চিত্তে যে সব সুন্দর ও রুদ্রভাব জেগেছে, ফুল মাত্র তাদের একটির উৎকর্ষ দেখেছে। কারণ সেও সৃষ্টির সহায়ক, সে সুন্দর। ফুল: নারীকে বলেছে—

বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।

সেই চরমের বাণী কি? ফুল তা' বুঝেছিল।

আজ সখি বুঝিলাম আমি,
সুন্দর আমাতে আছে থামি
তোমাতে সে হোলো ভালবাসা।

বলা বাহুল্য, এর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানের বাণী, দার্শনিক অনুভূতি এবং কবিতা একত্র মিলে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেছে, বিশ্বসাহিত্যে তা বিরল।

এখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রীক সাহিত্যের এক শ্রেণীর কবিতাকে ডাইডাকটিক বলা হ'ত। কথাটার ইংরাজি সাহিত্যে প্রচার আছে। ডাইডাকটিক কবিতা কোন বিষয় শিক্ষার জন্য রচিত হত। গ্রীক দিদস্‌কিন মানে শিক্ষা। চরক বা শুশ্রুত সংহিতা অথবা আর্য্য ভট্টের জ্যোতিষ গ্রন্থকে সে শ্রেণীতে ফেলা যায়। অনেকের মতে মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট বা গেটের ফাউষ্ট সেই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। কারণ গাছ বা ফুলের আদিম বিকাশ বা পরিণতির তিনি আভাষ দিয়েছেন নিজের কবিতার ভিত্তি বস্তুতান্ত্রিক করবার জন্য। সে সত্য তাঁর মনে যে ভাবের লহর তুলেছে, তা গীতি-কবিতা। বৃক্ষ-বন্দনা, পুষ্প বা নীলমণিলতার উদ্দেশ্য নয় উদ্ভিদতত্ত্ব শেখানো। তাদের প্রাণের বিভিন্ন বিকাশ, কবি-প্রাণে বহু উচ্চ-ভাবের লহর তুলেছে, তাঁর বীণার ঝঙ্কারে কবি আমাদের শুনিয়েছেন সে বাণী।

আর এক কথা মনে হয়, যে রবীন্দ্রনাথ যা কিছু রচেছেন তা দেশের মালমসলা নিয়ে। সুর উপরে উঠে নব নব বর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু যত জীব-জন্তু, ষটপদ, পক্ষী, গাছ-পালা, নর-নারী, নিয়ে ব্যাসাত করেছেন, তারা নিতান্ত আমাদের আপনার। আপনার জনের বাহিরের রূপ আপাতঃদর্শন সৌন্দর্য্য তাঁকে উদাত্তের পথে উঠতে বাধা দেয়নি। যে সাধারণ সে মরমে প্রবেশ করে সত্য। তাই বিজ্ঞান বা দর্শন সাধারণকে পদ্যে বোঝাতে গেলে ডায়-ডাকটিক হয়, কাব্য-রস তার উবে যায়। দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ, পৃথিবীর গাছ-পালা তৃণ ও শস্য লুণ্ঠনের রূপক ভাবলে বুদ্ধি প্রসন্ন হয়, চিত্ত কাঁদে না। কবিতার কাজ মন কাঁদানো, জাগানো, স্পন্দিত করা। পৃথিবীর উদ্ভিদরূপ বস্ত্র আমরা যত টানি, সে বিবসনা হয় না। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের এ ব্যাখ্যা শুনে বলতে হয়—বেশ বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যা! কিন্তু বস্ত্র হরণের কথার সরল অর্থ নিয়ে, তার মধ্যে মহিমার নিগ্রহ এবং লজ্জাশীলতার হানি দেখলে মর্মবেদনা অনিবার্য্য। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কল্পনা এবং

উচ্ছ্বাসের উদাহরণ দিয়েছি, তা থেকে বোঝা নিশ্চয় সহজ যে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের দৃষ্টান্তে সাহিত্যের আদর্শ-গণ্ডীর তিনি বাহিরে যাননি। উৎকট কল্পনা তাঁর অপ্রিয়।

তাঁর আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করব, বাঙ্‌লা জাতীয়-সাহিত্য সম্বন্ধে।

"গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তিগম্য, যেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্ন-সাহিত্য এবং উচ্চ-সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুলফল গাছপালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রীতির শিকড়ও তাঁর পবিত্র, নির্ম্মলসূর্য্য-করোজ্জ্বল-ধারিণী, সোনার বাংলার সঙ্গে জড়িত। তার অগ্রভাগ আকাশের যে আলোর দিকে ছুটেছে, জ্ঞানের যে শুভ্র দীপ্ত জ্যোতির তিনি নিজেই আবাহন করেছেন, তাঁর জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা ভারতের ঋষিদের মন্ত্রে—আবিরাবীর্ম এধিঃ।

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

জগতের দুইটি বিবদমান শিবিরে সীমান্ত সংহত করার আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজন সম্প্রতি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে এশিয়ার পশ্চিম সীমান্তের নিকটে গ্রীসে এবং পূর্ব্ব সীমারেখার পার্শ্বে মাঞ্চুরিয়ায়। গ্রীস ও চীন—দুইটি দেশেই আমেরিকার সমর্থনপুষ্ট আধা ফ্যাসিস্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত; দুইটি দেশেই তাহারা গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করিবার অসাধ্য ব্রত লইয়াছে। জগতের গণতান্ত্রিক শিবির এখন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া প্রতিক্রিয়া শক্তির সহিত বৃহত্তর সজ্বর্ষে প্রবৃত্ত হইতে চায়। তাই, গ্রীসে পাল্টা গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা; মাঞ্চুরিয়ায় কমুনিষ্ট প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রবল প্রচেষ্টা।

গ্রীসে পাল্টা গভর্ণমেন্ট

গত ২৪শে ডিসেম্বর গ্রীসের জেনারল মার্কসের নেতৃত্বে উত্তর গ্রীসে পাল্টা গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীসের সম্মিলিত প্রতিরোধ সঙ্ঘ "ইয়েমের" সাধারণ সম্পাদক, এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং কমুনিষ্ট দলের নেতা এই গভর্ণমেন্টে যোগ দিয়াছেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রীসে কমুনিষ্ট দলের সভ্য-সংখ্যা ৪ লক্ষ; গ্রীসের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ।

গ্রীসের রাজতান্ত্রিক গভর্ণমেন্ট এখন সম্পূর্ণরূপে আমেরিকার প্রভাবাধীন। ১৯৪৪ সালের শেষভাগে জার্ম্মানীর কবলমুক্ত হইবার পর গ্রাস কিছু কাল বৃটিশ প্রভুত্বাধীন ছিল। গত মার্চ্চ মাসে গ্রীসে মার্কিণ প্রভুত্ব কায়েম হইয়াছে। এখানকার অর্থনৈতিক বিভাগ, সামরিক বিভাগ, এমন কি শাসন বিভাগেও কর্তৃত্ব করিবার জন্য "উপদেষ্টা" নাম দিয়া একজন মার্কিণ কর্ম্মচারী বসানো হইয়াছে। গ্রীসের প্রধান বন্দর পিরাম, ম্যাসোনিকা এবং ভোলম-মার্কিণ নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে; সমগ্র গ্রাসে মার্কিণ বিমান ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মঃ সালদারিজ জার্ম্মানীর গুপ্তচর ছিলেন বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি আছে; গ্রীসের দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মঃ জেরভাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ—প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় তিনি নাৎসীদের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিতেন।

আমেরিকার সাহায্যে সালদারিজ গভর্ণমেন্ট গ্রীসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য বর্ব্বরোচিত অত্যাচার চালাইয়াছেন; এমন কি আন্দোলনকারীদের ছিন্নমুণ্ড লইয়া রাস্তায় রাস্তায় প্যারেড্ও করা হইয়াছে। তবুও আন্দোলন দমিত হয় নাই; এই আন্দোলনকারীরা এখন উত্তর গ্রাসে পাল্টা গভর্ণমেন্ট স্থাপন করিল। আমেরিকার সোভিয়েট-বিরোধী শিবিরের যে সীমান্ত গ্রীস পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিকে সংহত করিবার জন্যই এই আয়োজন। বলা বাহুল্য, অবস্থার আরও অবনতি হইবামাত্র যুগোশ্লেভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি এই পাল্টা গভর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইবে; আমেরিকার নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াপন্থী শিবিরে এবং সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শিবিরে চূড়ান্ত সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে।

চীনে কমুনিষ্ট তৎপরতা

মাঞ্চুরিয়ায় কমুনিষ্টদের সামরিক তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে মাঞ্চুরিয়ার পুরাতন রাজধানী মুকডেন্ এখন বিপন্ন। মার্শাল চিয়াং স্বয়ং এই অঞ্চলে সৈন্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তবুও কমুনিষ্টদের প্রবল আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইতেছে না। চীনে সামরিক অবস্থা সরকার পক্ষের বিশেষ প্রতিকূল হইলে সে সংবাদ প্রায়ই গোপন করা হয়। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার বর্ত্তমান সামরিক অবস্থা গোপন রাখা হইতেছে না; কমুনিষ্টদের অপ্রতিরোধ আক্রমণের কথা প্রকাশ করিয়া মার্কিণ মুরুব্বিদের কৃপা ভিক্ষা করা হইতেছে।

মাঞ্চুরিয়া জাপানের অধিকারভুক্ত থাকিবার সময় এই অঞ্চলে শ্রমশিল্প গড়িয়া ওঠে। গত মহাযুদ্ধে মাঞ্চুরিয়াই ছিল এশিয়াখণ্ডে জাপানী অস্ত্রাগার। সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় কমুনিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কমুনিষ্ট এলেকা শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র হইবার উপযুক্ত হইবে। মার্কিণ তাঁবেদার চিয়াং ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের হাতে চীনের অবশিষ্টাংশ ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র উত্তর চীন ব্যাপিয়া প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবে। ভবিষ্যৎ সোভিয়েট মার্কিণ সামরিক দ্বন্দ্বে চীনের দুইটি রাষ্ট্র দুইটি শিবিরে যাইবে। মাঞ্চুরিয়ায় কমুনিষ্টদের বর্ত্তমান তৎপরতার গতি এইদিকে।

ব্যর্থ লণ্ডন সম্মিলেন

গত ২৫শে নভেম্বর লণ্ডনে প্রধান ৪টি শক্তির পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলন আরম্ভ হয়; ১৬ই ডিসেম্বর এই সম্মেলন অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। সম্মেলনে জার্ম্মানী সম্পর্কে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। গত মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে মস্কোয় সুদীর্ঘ দেড় মাস কাল আলোচনা করিয়াও পররাষ্ট্র সচিবরা জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তখন সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে লণ্ডনে পরবর্ত্তী সম্মেলন হইবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। এবার লণ্ডনে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত সম্মেলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ৪টি শক্তির মধ্যে মীমাংসার আশা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

লণ্ডন বৈঠক ফলপ্রসূ না হইবার আশু কারণ—পশ্চিম জার্ম্মানীর চলতি উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতি পূরণ দিতে আপত্তি। এই প্রসঙ্গ লইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ প্রচার-ঢাকগুলি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে

যে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্ম্মানীর রক্ত শুষিয়া সোভিয়েট রুশিয়া তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে চায়। ১৯৪৫ সালে পোট্সড্যাম্ সম্মেলনে স্থির হয় যে, জার্ম্মানীর সমরশক্তি চূর্ণ করা হইবে, নাৎসী প্রভাব হইতে জার্ম্মাণ জাতিকে মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ করা হইবে এবং জার্ম্মানীর সমর-শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বন্ধ করিয়া তাহার শান্তিকালীন অর্থনীতি উন্নত করিবার চেষ্টা হইবে। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পোট্সড্যামে স্থির হয় যে, নাৎসী নেতাদের আক্রমণাত্মক নীতি সমর্থন করিবার দায়িত্ব জার্ম্মান জাতিকে কতক পরিমাণে গ্রহণ করিতে হইবে; ক্ষতিগ্রস্ত জাতিগুলির আংশিক ক্ষতিপূরণের জন্ম সে তাহার উৎপাদনের কতকাংশ প্রদান করিবে। এই পোট্সড্যামেই স্থির হয় যে, জার্ম্মানীর দ্বারা সোভিয়েট রুশিয়ার যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার এক-দশমাংশ জার্ম্মানী পূরণ করিবে; এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এক হাজার কোটী ডলার।

পূর্ব্ব জার্ম্মানীতে সোভিয়েট রুশিয়া পোট্সড্যাম্ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াছে। সেখানে নাৎসীদের সহযোগী জমিদারদের সম্পত্তি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, নাৎসীদের সমর্থক ধনিকদের শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, সমরোপকরণের কারখানা ভাঙ্গিয়া দিয়া শান্তিকালীন অর্থনীতি উন্নত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। রুশিয়া তাহার অনুসৃত নীতির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, জার্ম্মানীকে রক্তশূন্য না করিয়াও তাহার উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ লওয়া সম্ভব। এই অঞ্চলে উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যে যুদ্ধের পূর্ব্বের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী হইয়াছে। পক্ষান্তরে, পশ্চিম জার্ম্মানীতে নাৎসী আমলের জমিদার, একচেটিয়া ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সমর-নায়ক—সকলকে সযত্নে পোষা হইতেছে। এখানে বর্ত্তমানে উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩৮ সালের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ। ধনিকদিগকে স্বাধীনভাবে পূর্ব্বের মত উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইতেছে না; রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ জার্ম্মানীর সুলভ পণ্যের প্রতিযোগিতা ইঙ্গ-মার্কিণ বণিকদের পক্ষে আশঙ্কার বিষয়। আবার পুরাতন প্রতিক্রিয়াশীলদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের ব্যবস্থাও পশ্চিম জার্ম্মানীতে হয় নাই; কারণ জার্ম্মান প্রতিক্রিয়াশীলদের সহযোগে পশ্চিম জার্ম্মানীকে প্রগতিবিরোধী ইঙ্গ-মার্কিণ ঘাঁটিতে পরিণত করাই উদ্দেশ্য। পোট্সড্যাম্ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিয়া পশ্চিম জার্ম্মানীর প্রায় সব অস্ত্রের কারখানা অটুট আছে। গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পশ্চিম জার্ম্মানীর মাত্র ৭টি অস্ত্রের কারখানা (plant) ভাঙ্গা হইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব জার্ম্মানীর ৭৩৩টি কারখানার মধ্যে ৬৭৬টি ভাঙ্গা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন—রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর কারখানা ভাজিয়া লইবার যে অভিযোগ, সে এই অস্ত্রের কারখানা সম্পর্কেই। পোট্সড্যাম্ সিদ্ধান্তের অধিকারবলে ক্ষতিপূরণ বাবদ সে অস্ত্রের কারখানা ভাজিয়া লইয়াছে; কোনও শান্তিকালীন উৎপাদনযন্ত্র সে স্পর্শ করে নাই।

ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধিরা লণ্ডন সম্মেলনে জার্ম্মানীর প্রচলিত উৎপাদন হইতে সোভিয়েট রুশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রবল আপত্তি জানান। বলা বাহুল্য, চলতি উৎপাদন বাদ দিলে অন্য কোনভাবে সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতির এক দশমাংস পূরণ হইবার আর উপায় নাই। বৃটেন্ ও আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার ক্ষতিপূরণের সময় জার্ম্মানীর দরদী সাজিয়াছে। অথচ, ইহারা নিজেদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের অনেক বেশী জার্ম্মানীর নিকট হইতে আদায় করিয়াছে। ইহারা জার্ম্মানীর বিদেশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে; বহু যন্ত্রপাতি নিজ নিজ দেশে চালান দিয়াছে; জার্ম্মানীর স্বর্ণ হস্তগত করিয়াছে, জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত পেটেন্ট বে-দখল করিয়াছে। বৃটেন্ ও আমেরিকা জার্ম্মানীর নিকট হইতে যাহা পাইয়াছে, তাহার মূল্য এক হাজার কোটি ডলারের বেশী।

ফ্রান্সে শ্রমিক বিক্ষোভ

গত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সমগ্র ফ্রান্সে শ্রমিক-বিক্ষোভের প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শ্রমিক-বিক্ষোভ মিটিবার সংবাদ আসে; কি সর্ত্তে মিটিল এবং তাহার ফলে ফরাসী রাজনীতির কোনও পরিবর্ত্তন হইল কিনা, তাহা জানা যায় না।

ফ্রান্সের শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে এই ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। এই দাবীকে কেহ অসঙ্গত বলিতে পারে নাই; কারণ গত ছয় মাসে ফ্রান্সে পণ্যমূল্য শতকরা ১৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গত অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে ধর্ম্মঘট হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট। এই প্রসঙ্গে ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ফ্রান্সে জাতীয় পরিষদে অন্যান্য দল অপেক্ষা কমুনিষ্টরা সংখ্যায় বেশী। অথচ গত মে মাসে ইহারা মন্ত্রিমণ্ডল হইতে বিতাড়িত হয়; কারণ তৎকালীন রামাদিয়ের-মন্ত্রিমণ্ডল এই সর্ত্তে ২০ কোটি ডলার মার্কিণ ঋণ গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা কমুনিজম্ দমন করিবেন। ইতিমধ্যে জেনারল দ গল্ রাজনৈতিক আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কমুনিষ্ট আতঙ্কের বিরুদ্ধে তিনি ফরাসী জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবেন বলিয়া বাহ্বাস্ফোট করেন; তাঁহার অনুরক্তদের লইয়া তিনি নূতন রাজনৈতিক দল করেন "ফরাসী জনসঙ্ঘ"—Rally of the French people. তিনি স্পষ্ট বলেন যে, তাঁহার ডিক্টেটারী ক্ষমতা চাই; ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সুপ্রতিষ্ঠা চাই। তখন, ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নরমপন্থী সোস্যালিষ্ট নেতারা দ গলের এই চরম দক্ষিণপন্থী দল এবং চরম বামপন্থী কমুনিষ্টদের হাত হইতে ফ্রান্সকে বাঁচাইবার জন্য "তৃতীয় শক্তি" সংহত করিবার জীগির তোলেন। ইহার ফলে রামাদিয়ের মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে এবং এম-আর-পি দলের মঃ স্যুম্যানের নেতৃত্বে নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যুম্যান্ সোস্যালিজম্-বিরোধী—পুঁজিপতি স্বৈরাচারের একনিষ্ঠ সমর্থক। তাহার মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পায় দক্ষিণপন্থী এম্-আর-পি দলের ৯ জন, রেডিক্যাল্ সোস্যালিষ্ট দলের ৬ জন এবং স্বতন্ত্র রক্ষণশীল ১ জন। এই মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চরম দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে "তৃতীয় শক্তি" সংহত হয় না; ফরাসী রাজনীতির গতি দক্ষিণ দিকে বেশী ঝোঁকে। জাতীয় পরিষদে কমুনিষ্টরা দল হিসাবে অন্যান্য দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহাদের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফরাসী রাজনীতির এই প্রতিক্রিয়ামুখী গতি রোধ করা অসম্ভব হয়। সাম্প্রতিক মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কমুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে সোস্যালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই; আইন প্রণয়ন করিয়া নির্ব্বাচন-ব্যবস্থারও সংশোধন করিয়াছিলেন। তবুও, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির আসনের শতকরা ৩১টি কমুনিষ্টরা অধিকার করিয়াছে। দ গলের দল মিউনিসিপ্যাল আসনের শতকরা ২৯টি, সোস্যালিষ্ট দল ২১টি এবং এম্-আর-পি দল ১২টি অধিকার করে। মিউনিসিপ্যাল্ নির্ব্বাচনে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ফরাসী জনসাধারণ কমুনিষ্টদের প্রতি আস্থা হারায় নাই। তবুও, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ফরাসী রাজনীতি প্রভাবিত করা কমুনিষ্টদের পক্ষে অসাধ্য; প্রতিক্রিয়াশীলরা সেখানে এক জোট। নিয়মতান্ত্রিক পথ এইভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় কমুনিষ্টরা ব্যাপক ধর্ম্মঘটের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলদিগকে আঘাত হানিতে চেষ্টা করে। সঙ্গত অর্থনৈতিক দাবীর ভিত্তিতে ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সচেষ্ট হয়।

লোক-বিনিময় সমস্যা ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

কোন বিশেষ কারণে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্বেষভাব যখন তীব্র হইয়া উঠে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই বিদ্বেষ দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না, তখন এক রাষ্ট্রের সন্তানের পক্ষে আইনসঙ্গত নাগরিক অধিকার থাকা সত্ত্বেও অপর রাষ্ট্রে বসবাস করিতে আতঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ অবস্থায় যুদ্ধ বাধিলে এই ধরণের লোকের কারারুদ্ধ হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপজনিত বিপদের কথা বাদ দিলেও দেশের জাতীয়তাবাদী জনসাধারণের দ্বারা এই শ্রেণীর লোকের নিগৃহীত হইবার আশঙ্কাও কম নয়। পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি না ঘটিলে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু দুই রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থগত বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিলে মৌলিক অধিবাসী ও এই শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে সংঘাত সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। কোন কোন সময় ধর্ম্মমতের ঐক্যও শ্রেণী বিশেষের সৃষ্টি করিয়া সেই শ্রেণীকে রাষ্ট্রবিশেষের মৌলিক প্রজারূপে প্রতিষ্ঠা দেয়।

এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে বিবদমান রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে লোক বিনিময় হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়, অনেক সময় এই 'স্বদেশ' সম্পর্কে তাহাদের স্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না। ধর্ম্মমতের ঐক্যের জন্য শ্রেণীবিশেষের পূর্ণ প্রজাসত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে-তো কথাই নাই, দীর্ঘকাল, এমন কি জন্মাবধি বিশেষ কোন রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া যাহারা জন্মভূমিকেই মাতৃভূমি হিসাবে অন্তরে স্থান দিয়াছে, রাষ্ট্রগত গোলমালের চাপে তাহারা একান্ত নিরুপায় ও দিশাহারা হইয়া পড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘদিনের ধারণা বিসর্জ্জন দিয়া এই হতভাগ্যের দল অপরিচিত বা বিস্মৃতপ্রায় 'স্বদেশ' অভিমুখে যাত্রা করে। ইতিহাসে এইভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে লোকবিনিময় বহুবার হইয়াছে, তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই আতঙ্কিত জনসাধারণ নিজেদের দায়িত্বে বাসভূমির পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিলেও রাষ্ট্র তাহাদের পুনর্বসতির পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। এইভাবে লোকবিনিময়ে রাষ্ট্রের পূর্ণদায়িত্ব গ্রহণের প্রথম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। এই সময় অনুষ্ঠিত এক চুক্তির (Lausane Convention of 1923) ফলে গ্রীসের সমস্ত মুসলমান নাগরিক তুরস্কে চলিয়া যায় এবং গ্রীসের গোঁড়া (orthodox) ধর্ম্মমতের সমর্থক খ্রীষ্টানগণ তুরস্কের নাগরিক অধিকার পরিত্যাগ করিয়া গ্রীসে চলিয়া আসে। এইভাবে যাহারা তুরস্ক হইতে গ্রীসে চলিয়া যায়, তাহাদের সংখ্যা গ্রীসের স্থায়ী জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম নয়।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ায় এই দুই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সম্প্রীতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে লোকবিনিময় সুরু হইয়াছে। বিভক্ত পাঞ্জাবেই সমস্যা সবচেয়ে জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়া পূর্ব্বপাঞ্জাব হইতে মুসলমানেরা এবং পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে হিন্দু ও শিখেরা দলে দলে পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পলায়ন করিয়াছে। হাঙ্গামা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পলায়নপর মনোভাবের ফলে অবস্থা এত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনঃসংযোগ না করিয়া পারেন না এবং উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আন্ত-ডোমিনিয়ন সম্মেলনে পশ্চিমপাঞ্জাব হইতে অমুসলমান অপসারণ এবং পূর্ব্বপাঞ্জাব হইতে মুসলমান অপসারণ উভয় গভর্ণমেণ্টের নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলায় হতাশ হইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রথমে অমৃতসরে এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিতে হয় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রজাকে ভারতসীমানার মধ্যে সরাইয়া আনায় এবং পূর্ব্বপাঞ্জাবের যত বেশী সম্ভব মুসলমানকে পাকিস্তানে প্রেরণ করায় মধ্যে ভারতের স্বার্থ নিহিত আছে। নানাসূত্রে প্রাপ্ত হিসাব দেখিয়া মনে হয়, হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ২১শে নভেম্বর পর্য্যন্ত পশ্চিমপাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান হইতে প্রায় ৪২ লক্ষ অমুসলমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বপাঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রায় ৪০ লক্ষ মুসলমান চলিয়া গিয়াছে পাকিস্তানে। এ ছাড়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলায় যে সব হিন্দু ও মুসলমান আতঙ্কিত হইয়া নিজদায়িত্বে বাসভূমির পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও কম নয়। বিহার, কাশ্মীর, হায়দারাবাদ প্রভৃতি হইতেও কিছু কিছু মুসলমান এবং অমুসলমান আতঙ্কিত হইয়া বাস্তুত্যাগ করিয়াছে।

রাষ্ট্র যে ক্ষেত্রে লোকবিনিময়ের দায়িত্বগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে শরণাগত (Refugee) সমস্যা সমাধানের সব ব্যবস্থা রাষ্ট্রকেই করিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে লোকেরা নিজদায়িত্বে বাসভূমির পরিবর্ত্তন করে, সেক্ষেত্রেও আশ্রিতদের জীবিকা-সংস্থানের উপায় নির্দ্ধারণে রাষ্ট্রের

নৈতিক দায়িত্ব যথেষ্ট। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইসব দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রকে বহু নির্দ্ধারিত কর্তব্যে অবহেলা করিতে হয় এবং আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করিতে হয় যথেষ্ট পরিমাণে। পাঞ্জাব-সমস্যা যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রেলপথসমূহের সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক হইতে যাহারা আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে গ্রীসে চলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদের পুনর্বসতির জন্য গ্রীক-সরকারকে এক কোটি কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইতে হয়। যাহারা গ্রীস হইতে তুরস্কে চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের পরিত্যক্ত বাড়ীঘর ও স্থির-সম্পত্তি শরণাগতদের মধ্যে বণ্টিত হয় এবং উপরিউক্ত ব্যয়ভারের হিসাবে এইসব সম্পত্তির মূল্য ধরা হয় নাই। গ্রীসের জনসংখ্যা কম, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উচ্চ, গ্রীকসরকারের অর্থস্বাচ্ছল্যও কম নয়, এছাড়া সময়মত চুক্তি হওয়ায় অনেকে কিছু কিছু অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে লইয়া চলিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল, তবু শরণাগত সমস্যা সমগ্র গ্রীসের, বিশেষ করিয়া গ্রীসের সহরগুলির অর্থনীতিতে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং সরকারী অর্থব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। এই হিসাবে ভারতের দারিদ্র্য সম্পর্কে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শরণাগত সমস্যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধার-দিগকেই নিদারুণ উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে দাবী করিতেছেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অত্যাচারের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ দাবী করা হউক। বলা বাহুল্য, এই ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন ধরিলে আশ্রয়-প্রার্থী-সমস্যাজনিত রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যার জটিলতা একক্ষেত্রে কমিলেও অন্যক্ষেত্রে অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং বিবাদ বিসংবাদ ও মতান্তর অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে বলিয়া সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

শরণাগতগণ গ্রাম ও সহর উভয় অঞ্চল হইতেই আসিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থী যে ৪২ লক্ষ লোকের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ ৩২ লক্ষ আসিয়াছে গ্রামাঞ্চল হইতে। অসহায়ভাবে এই আশ্রয়প্রার্থীদল সহরগুলিতে ও সরকারী আশ্রয়-শিবিরগুলিতে বাস করিতে বাধ্য হইলেও ইহাদের গ্রামাঞ্চলেই পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সেখানেই তাহাদিগকে জীবিকাসংস্থানের সুযোগ দিতে হইবে। সহর অঞ্চল হইতে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত লোক অনেক আছে এবং টাকা পয়সাও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে অনেকে। ইহাদের পুনর্বসতির সমস্যা অবশ্যই গুরুতর, কিন্তু ইহাদের তুলনায় গ্রামাঞ্চল হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ব্বপাঞ্জাব সরকার কৃষক আশ্রয়প্রার্থীদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বাস্তুত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমিতে ও পতিত জমিতে তাহাদের বসবাসের এবং টাকাভি ঋণের সাহায্যে তাহাদের কৃষি সরঞ্জামসংগ্রহের সুযোগ দিতেছেন। পূর্ব্ব পাঞ্জাবে পলায়িত মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমির পরিমাণ ৪৫ লক্ষ একর (ইহার মধ্যে ৩৩ লক্ষ একর জমি চাষের উপযোগী।)

আশ্রয় শিবিরগুলি পরিচালনা সম্পর্কেও পূর্ব্ব পাঞ্জাব সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ সহানুভূতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি ব্যবস্থা সহজ করিবার জন্য প্রচণ্ড ডলার সমস্যা সত্ত্বেও পূর্ব্বপাঞ্জাব সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহু পরিমাণ কৃষি সরঞ্জাম ও গমের বীজ আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ১৫ই আগষ্ট হইতে আগামী ৩১শে মার্চ, স্বাধীন ভারতের এই সাড়ে সাত মাসের বাজেটে মোট ১৯৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে, তন্মধ্যে আশ্রয়প্রার্থী (Refugee) খাতে ধরা হইয়াছে ২২ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় পরিষদে বাজেট পেশকালে এই প্রসঙ্গে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত সন্মুখম চেট্টি অত্যন্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন যে, অসহায় শরণাগত-দের রক্ষার্থে আর্থিক দায়িত্বগ্রহণে ভারতসরকারের টাকার টানাটানির প্রশ্ন বড় করিয়া দেখা হইবে না।*

উপরি উক্ত ব্যবস্থা সমূহের জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দিত করিয়াও একথা বলা যায় যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে শরণাগতদের সাহায্য ও পুনর্বসতি সমস্যার জটিলতা বা গুরুত্বের হিসাবে এগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়। ইহা দ্বারা হয়তো শরণাগতদের সাময়িকভাবে বাঁচাইয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের রক্ষা করিতে হইলে স্থায়ীভাবে তাহাদের জীবিকাসংস্থানের বা পুনর্বসতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য দেশের কৃষি নীতির আমূল সংস্কারের সহিত শিল্পনীতির প্রকৃত উন্নতিসাধন দরকার। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত এই প্রস্তাব পাকিস্তান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, কৃষক, শিল্পশ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্নশ্রেণীর লোক আছে, ইহাদের পৃথক পৃথকভাবে কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে সার্ব্বজনীন কর্ম্ম সংস্থান এমনিই অত্যন্ত জটিল সমস্যা, ইহার উপর শরণাগতদের পুনর্বসতির দায়িত্ব আসিয়া পড়ায় সরকারী কর্তৃপক্ষের অসুবিধা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতে পতিত জমির পরিমাণ এগারো কোটি একরের বেশী, ইহা দেশের মোট কর্ষিত জমির প্রায় অর্দ্ধেক। কর্ষণযোগ্য পতিত জমিগুলিতে চাষের ও অকর্ষণীয় পতিত জমিগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া এবং যথাসম্ভব শিল্প-সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়া গভর্ণমেণ্ট অল্পদিনের মধ্যে অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে আনিতে পারেন বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্বপাঞ্জাব সরকার এ পর্য্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে পুনঃসংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এ ছাড়া যাহারা এখনও পথে ও আশ্রয়শিবিরে দিন কাটাইতেছে সংখ্যায় তাহারা অগণ্য। পূর্ব্ব বাঙ্গলা হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে আইনগত দায়িত্ব গ্রহণ না করিলেও সরকারের ইহাদের সম্পর্কেও নৈতিক দায়িত্ব আছে। কাজেই ব্যাপকভাবে দেশে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার এবং অপেক্ষাকৃত জনবিরল দেশীয় রাজ্য-গুলিতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর বসবাসের ব্যবস্থা ছাড়া এই বিরাট ও জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব। ভারতে কাঁচামাল, শ্রমশক্তি প্রভৃতির অভাব নাই, শক্তি সম্পদও (Power resources) এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, সুতরাং শিল্প প্রসারের চেষ্টা চলিলে সরকারের আশু সাফল্যলাভের যথেষ্ট আশা আছে এবং এইভাবে আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত দেশের বেকার জনসাধারণেরও জীবিকা সংস্থানের অনেকটা ব্যবস্থা হইতে পারে। শরণাগতদের কাজ দেওয়ার মত শিল্প বা কৃষি সংগঠনের মূলধন হিসাবে সরকার ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করিলেও আপত্তির কোন কারণ নাই, কারণ এদেশে এইরূপ অর্থবিনিয়োগের ফলে উপকার ও মুনাফা হিসাবে আশাতীত প্রতিদান পাওয়া যাইবে। কৃষিশিল্প সংস্কারের অনুপূরক হিসাবে ভারতে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ইত্যাদি কাজে কিছুদিনের জন্য বহু বেকারের কর্ম্ম সংস্থান হইতে পারে। দামোদর পরিকল্পনা, কোশী পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার সহিত অসংখ্য লোকের জীবিকার ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্ন বিজড়িত। স্বাধীনতালাভের পর এদেশে এই ধরণের ছোট বড় নানা নূতন পরিকল্পনা রচনার ও কার্য্যকরী করিবার প্রয়োজনও কম নয়।

---

* **Financial considerations should not stand in the way of affording relief to these unfortunate people (refugees) and in alleviating their sufferings in one of the most poignant human tragedies that could take place outside a war.**

ভীমপলশ্রী

বনফুল

১৪

রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায় লোকটি ক্ষীণকায় খর্বাকৃতি। গায়ের রং ঘোর কালো, এত কালো যে তাঁর পাকা গোঁফ ও ভুরুকে অস্বাভাবিক দেখায়, মনে হয় তুলো দিয়ে তৈরি করে' জুড়ে দেওয়া হয়েছে বুঝি। মাথায় টাক, পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো চকচকে। ঘাড়ের ধারে ধারে এবং কানের পাশে পাশেও অল্প-স্বল্প তুলোর সারি আছে। ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। নিজের রং কালো বলেই সাদা জিনিসের দিকে সম্ভবত বেশী ঝোঁক। পায়ের চটিটা পর্য্যন্ত সাদা চামড়ার এবং সমস্তই নিখুঁত রকম নির্ম্মল। সুরেশ্বরী দেবী যৌবনে সুন্দরী ছিলেন। এখন বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও গাল দুটি টুকটুক করছে। এখনও একটু সাজগোজ করতে ভালবাসেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায় বরাবর মফঃস্বলেই বাস করছেন। নিজের ক্ষুদ্র জমিদারির গণ্ডী ছেড়ে কদাচিৎ বাইরে এসেছেন তিনি। সেই যে বহুকাল আগে কোলকাতায় একবার ট্যাক্সি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর শহরমুখো হননি। ট্যাক্সি অবশ্য চাপা দেয় নি তাঁকে, তিনি যে পড়ে' গিয়েছিলেন তা-ও নয়। কোন রকম অঙ্গচ্যুতি বা পদচ্যুতি না ঘটলেও আর একটা অভূতপূর্ব্ব দুর্ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর তেষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও ঘটেনি। তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হয়েছিলেন।

দিগ্বিজয় সিংহরায়ের একটা সন্দেহ কিন্তু মাঝে মাঝে জাগে এবং জাগলেই আকুল হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর সন্দেহ পত্নী সুরেশ্বরীকে। সুরেশ্বরী বরাবর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে' আসছেন যে তাঁরও না কি শহরের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা। কিন্তু ওই মোটর দুর্ঘটনা হওয়ার ফলে শহরের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে মুচুকুন্দ-কুন্তলেশ্বরীতে এসে বসবাস করতে আসার আগে যখন তিনি কোলকাতার ছিলেন তখনকার সুরেশ্বরীর মুখচ্ছবিটা মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে দিগ্বিজয়ের মানসপটে। তখনকার সেই উদ্ভাসিত চোখমুখ, উচ্ছ্বসিত কথাবার্ত্তা থেকে অনুমান করা শক্ত যে সুরেশ্বরী সত্যিসত্যিই উচ্ছৃঙ্খল নাগরিক-জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। দিগ্বিজয়ের সন্দেহ যে সুরেশ্বরীর বিতৃষ্ণা আসলে বোধহয় আত্মত্যাগমূলক স্বামী-ভক্তির নিদর্শন। তা' যদি হয়, তাহলে বড় ভয়ানক ব্যাপার। ছোটবড় অনেক ব্যাপারেই দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হয় যে সুরেশ্বরীর আচরণ সব সময়ে অকৃত্রিম নয়। উদাহরণ-স্বরূপ সিমের ব্যাপারটাই ধরা যেতে পারে। সিম জিনিসটা দিগ্বিজয় দু'চক্ষে দেখতে পারেন না এবং কোনও এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বহুকাল আগে বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরেই কথাটা তিনি সুরেশ্বরীকে বলে' ফেলেছিলেন। ফলে, সুরেশ্বরীও সিম বর্জ্জন করলেন, শুধু তাই নয়—বলে' বেড়াতে লাগলেন কোনও তরকারিতে সামান্য একটু সিম থাকলেও তাঁর গা গুলিয়ে ওঠে। দশ বৎসর এইভাবে কাটল। তারপর একদিন কোনও কারণে দিগ্বিজয়কে একবার দু'দিনের জন্য বাইরে যেতে হয়েছিল। ফেরবার সময় খবর দিতে পারেন নি। হঠাৎ দুপুরে বাড়ি ফিরে অবাক হয়ে গেলেন। সুরেশ্বরী ভাত খেতে বসেছেন—পাতে থরে থরে সাজানো সিম-ভাতে, সিম-ভাজা, সিমের চচ্চড়ি, সিমের ঝোল। সিম সীমা

অতিক্রম করেছে। সীমন্তিনীর এবংবিধ ব্যবহারে ‘থ’ হয়ে গেলেন দিগ্বিজয়। সেইদিন থেকে সুরেশ্বরীকে আর বিশ্বাস করেন না তিনি। যে স্ত্রীলোক সামান্য একটা সিঁদের ব্যাপারে এতটা করতে পারে তার অসাধ্য কিছু নেই। হয়তো তার মনে কত বাসনা গোপনে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে, তিনি কিছুই জানতে পারছেন না, জানবার উপায় নেই মোটে। শহরের থিয়েটার, সিনেমা, পাড়া-বেড়ানো প্রভৃতি সম্বন্ধে সুরেশ্বরীর আসল মনোভাব যে কি তা কে বলতে পারে? ফলে এই হয়েছে—সুরেশ্বরী কোনও বিষয়ে বিতৃষ্ণা প্রকাশ করলেই দিগ্বিজয় তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা দেখতে পান। সুতরাং সুরেশ্বরী যখন একদিন বললেন যে তিনি তাঁদের পুরোনো কম্পাস গাড়ি বাতিল করে’ দিয়ে কিছুতে মোটর কিনবেন না, তখন দিগ্বিজয় বুঝলেন সুরেশ্বরী মনে মনে মোটর কেনবার জন্যে লোলুপ। নিজের আন্তরিক মোটর-বিতৃষ্ণাকে দমন করে’ তাই তাঁকে প্রকাশ্যে মোটরের জন্য লালায়িত হয়ে উঠতে হল। এ ছাড়া সুরেশ্বরীর শখ মেটাবার আর অন্য উপায় ছিল না। বহু অর্থব্যয় করে’ মোটর কিনলেন একখানা। সুরেশ্বরীর চোখে জল এসে পড়েছিল। দিগ্বিজয়ের মনে হল এ আনন্দাশ্রু। কিন্তু সুরেশ্বরী বাইরে প্রকাশ করলেন রাগ। কেন, কি দরকার ছিল মোটর কেনবার? কম্পাস গাড়িই ভাল লাগে তাঁর। তাঁদের অনাবিল দাম্পত্য-কৌমুদী মেঘাবৃত হয়ে উঠেছিল ক্ষণিকের জন্য। অবশ্য তা ক্ষণিকের জন্যই এবং একবার মাত্র। তখন থেকেই এঁরা পরস্পরের নিঃস্বার্থপরতার প্রকোপ থেকে পরস্পর বাঁচবার চেষ্টা করছেন সুকৌশলে। নেপথ্যে দু’জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা দ্বন্দ্ব চলছে নিরন্তর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই আটত্রিশ বৎসরব্যাপী দাম্পত্য-জীবনে নিঃস্বার্থপরতার এই অনমনীয় দ্বন্দ্বে একটি দিনের জন্য মনোমালিন্য হয় নি দু’জনের মধ্যে। একটি রূঢ় কথা কেউ কাউকে বলেন নি। কোনও নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আশু মীমাংসা করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়লে—যেমন কোনও দুঃস্থ প্রতিবেশী বা বন্ধুকে সাহায্য করা সম্পর্কে উপায় নির্দ্ধারণ বা ওই জাতীয় কিছু—তখন জটিলতা না বাড়িয়ে দিগ্বিজয় সটান সুরেশ্বরীর মত সমর্থন করেন। এ ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এ-ও খুব সহজে হ’ত না। সুরেশ্বরী চাইতেন দিগ্বিজয়ের কথায় সায় দিতে। এমন ভাব প্রকাশ করতেন যে দিগ্বিজয় যদি সুরেশ্বরীকে তাঁর মতে (দিগ্বিজয়ের মতে) সায় দিতে দেন, তাহলে সুরেশ্বরী যেন চরিতার্থ হয়ে যাবেন। কিন্তু দিগ্বিজয় আত্মত্যাগের দুর্গে অবিচলিত থেকে সুরেশ্বরীর মতটাকেই সমর্থন করতেন, সুরেশ্বরীকে শেষ পর্য্যন্ত আত্মমত-বিসর্জ্জনের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হত। ব্যাপারটা সহজে মিটে যেত।

বন্ধুবান্ধবদের তাঁরা খুব যে একটা নিমন্ত্রণ করতেন, তা’ নয়। সুরেশ্বরী তাঁর দু’চারজন অন্তরঙ্গকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করতে পেলে খুশী হতেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ হত হয়তো তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা দিগ্বিজয়ের বিরক্তির কারণ হবে। তিনি এ-ও জানতেন দিগ্বিজয় কিছুতেই সে কথা স্বীকার করবেন না। নিজের মনের টুঁটি চেপে ধরে’ মেরে ফেলবেন তবু স্বীকার করবেন না। দিগ্বিজয়ও শিকার-পার্টি আহ্বান করতে ইতস্তত করতেন, কারণ তাঁর ধারণা সুরেশ্বরী জীবহত্যা-ব্যাপারে কষ্ট পান মনে মনে। বলা বাহুল্য সুরেশ্বরী কখনও বলেন নি একথা। বলেন নি—তার কারণ সুরেশ্বরীর ধারণা দিগ্বিজয় শিকারে আনন্দ পান, যদিও দিগ্বিজয় তাঁকে লক্ষবার বলেছেন, শিকার টিকার মোটেই ভাল লাগে না তাঁর। উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম কণ্ঠে বলেছেন। সুরেশ্বরী বিশ্বাস করেন নি। পতি-পরায়ণা আত্মত্যাগশীলা রমণীর স্বামী হওয়া যে কি দুর্ভোগ তা’ দিগ্বিজয়কে হাড়ে হাড়ে বুঝতে হয়েছে। সুখের বিষয়, দিগ্বিজয় সুরেশ্বরীকে বেশী ভালবাসেন, না সুরেশ্বরী দিগ্বিজয়কে বেশী ভালবাসেন এ প্রশ্ন একদিনও ওঠে নি। উঠলে জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি হত।

...সেদিনকার শিকার পার্টিতে তিনজন শিকারী যোগদান করেন নি। সুশোভন এবং ব্রজেশ্বরবাবুর যোগ না দেবার কারণ অজ্ঞাত থাকলেও ছকুবাবুর যোগ না দেবার কারণটা জেনে ফেলেছিলেন সবাই। ছকুবাবু সুরেশ্বরীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যৌবনকালে তিনি ইন্‌কিলাবপুরের স্বনামধন্য বিহারী জমিদার গোধমন সিংয়ের অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন সেখানকার স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক হিসেবে, কিন্তু হয়ে পড়েছিলেন পারিষদ। তাঁর বক্তৃত, পায়ের গাঁটগুলি এবং তাঁর

এখনও সে অন্তরঙ্গতার পরিচয় বহন করছে। তাঁবার মধ্যে ঢুকেছে অদ্ভুত ধরণের বিহারী বুক্নি, লিভারে প্রায়ই ব্যথা হয়, হাঁটুটা ফুলে ওঠে মাঝে মাঝে। সেদিন সকালেই তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন বাতটা আবার 'উথড়েছে'। শিকারে যেতে পারবেন না। আসলে হয়েছিল লিভারে ব্যথা—এ কথাটা সকলকে সব সময়ে জানাতে চাইতেন না তিনি।

তিন তিনজন শিকারী অনুপস্থিত হওয়াতে 'পার্টি' জমল না মোটেই। দিগ্বিজয় দমলেন না। গ্রাম থেকে আরও দু'জন জোগাড় করলেন। গোবর্দ্ধনবাবু সম্বন্ধে কিন্তু খুব আশা পোষণ করতে পারছিলেন না তিনি। বড্ড বেশী গোবর-গণেশ গোছের লোকটা। ও কি শিকারে সুবিধে করতে পারবে?

সুরেশ্বরী দেবীও খাবার টাবার নিয়ে সঙ্গে যাবেন। সহধর্ম্মিণীত্ব রক্ষা করা হবে, তাছাড়া আর একটা গোপন উদ্দেশ্যও ছিল তাঁর। ওঁরা যে অঞ্চলে শিকার করতে যাচ্ছেন সেখানে মাধব গোমস্তার বাড়ি। মাধবের একটি ছেলে হয়েছে ক'দিন হল। সুরেশ্বরী ঠিক করেছিলেন ওঁরা যখন হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকবেন তখন তিনি গিয়ে মাধবের ছেলেটিকে দেখে আসবেন।

যারা আসেনি তারা যে খবর না দিয়েও এসে পড়তে পারে, এ কথা মনেই হল না সুরেশ্বরীর।...

বাইরে গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দিগ্বিজয় এবং গোবর্দ্ধন গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছেন সুরেশ্বরী দেবীর জন্য। অসুস্থ ছকুবাবুর যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়। আর একবার সব নিজে তদারক করছিলেন।

ছকুবাবু লোকটিকে দেখলেই শুকনো বাসী তেলে-ভাজা খাবারের কথা মনে পড়ে যায়। শীর্ণ চেহারা। চোখের শাদা অংশে হলদে রঙের ছোপ। গালের হাড়-গুলি উঁচু। চোখের দৃষ্টি সূক্ষ্ম। সমস্ত মুখে কেমন যেন একটা মার্জ্জার-ভাব। গোঁফগুলি ঈষৎ কটা এবং অনেকটা বিড়ালের গোঁফের মতই। ছকুবাবু লাঠি ধরে' ধরে' সুরেশ্বরীর পিছু পিছু দ্বার পর্য্যন্ত এলেন। শিকার-প্রসঙ্গে দিগ্বিজয়ের মুখে এতক্ষণ তুবড়ি ছুটছিল। আসন্ন শিকারের কাল্পনিক উল্লাসে নিজেকে এবং গোবর্দ্ধনকে এতক্ষণ চাঙ্গা করে' তোলবার চেষ্টা করছিলেন তিনি বক্তৃতার চোটে। হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে বলে' উঠলেন—"শিকার জিনিসটাই কিন্তু ভালো লাগে না আমার মোটেই!" গোবর্দ্ধন বিস্মিত হয়ে আড়চোখে চাইলেন একবার তাঁর দিকে। সুরেশ্বরী দ্বারপ্রান্তে এসে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুকে বললেন, "বাড়ি নিয়ে আপনি থাকুন তাহলে, আমরা ঘুরে আসি। খাবার খাবেন কিন্তু, রেখে গেলুম সব"

"খাবার! না, ও বাত আর বোলো না, দোহাই মহাবীরজির! খেতে আর পারব না"

"না, না, চেষ্টা করবেন তবু। আপনার জন্যেই বিশেষ করে' কম মশলার তরকারি করলাম। দেখবেন একটু চেখে। তিনটে নাগাদ নিশ্চয় খিদে পেয়ে যাবে। সকালে তো খাননি তেমন কিছু"

"খিদে এখনই পেয়েছে। ভূকের কিছু কমি নেই, কিন্তু ডর লাগছে। এর পর যদি পেটের বাইও উথড়ে যায় খতম হয়ে যাব"

"না, না, কি যে বলেন—কিচ্ছু হবে না। পায়ের উপর হট্ ব্যাগটা চাপিয়ে একটু ঘুমুন দেখি। এখানে কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে। সেক দিয়ে একটু যদি ঘুমুতে পারেন ব্যথাটা কমে যাবে, ভাল লাগবে তখন"

"সেটা মুস্কিন্ বটে। দেখি, কিন্তু তোমার যে মেজমানরা আসে নি, তারা হুড়মুড় করে এসে অগর পৌঁছে যায়"

"তা সম্ভব নয়। এখন ট্রেণ নেই তো। এলে কালই আসত"

"হল তোমার"—দিগ্বিজয় তাগাদা দিলেন—"শিকারে যদি যেতেই হয় একটু তাড়াতাড়ি করাই ভাল"

"এই যে"

খাবারের ঝুড়ি, টিফিন-কেরিয়র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে গাড়ির কাছে এগিয়ে এলেন সুরেশ্বরী।

"চল যাওয়া যাক এইবার। ছকুদা ভয় পাচ্ছেন যে ওরা যদি আবার সব এসে পড়ে কি করবেন উনি। আমার মনে হয় না কেউ আসবে। বড় জোর একটা টেলিগ্রাফ আসতে পারে। যদি আসে রেখে দেবেন, জবাব দেবার থাকে যদি কিছু জবাবও দিয়ে দেবেন যা হয় একটা—"

শিকক ছকুবাবুর জ্রযুগল উৎক্ষিপ্ত হল।

"টেলিগ্রাফ আবার কি ? টেলিগ্রাম মীন করছ নিশ্চয়। টেলিগ্রাফ গলৎ হ্যায়—"

"তাই যদি বলতে চান বলুন"—সুরেশ্বরী দেবী গাড়িতে উঠে কম্বলের বিচিত্র আবেষ্টনার মধ্যে নিজেকে স্থাপিত করে' বললেন—"আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, আমরা টেলিগ্রাফই বলি। ওতে খুব বেশী দোষ হয় না বোধহয়"

"কিছু দোষ হয় না"—বলে' উঠলো দিগ্বিজয়। তিনি আর ধৈর্য্য ধরতে পারছিলেন না। এই নূতন ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্তে ছকুবাবুর দিকে একটা রোষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি বললেন—"আমার তো মনে হয় টেলিগ্রাফটাই বেশী শুদ্ধ। টেলিগ্রামটা হচ্ছে—ওই যে সংস্কৃতে কি বলে যেন —নামধাতু—না না—প্রক্ষিপ্ত ? উহুঁ কথাটা ঠিক মনে পড়ছে না, যোগরূঢ়ও নয়—যাক গে—সোজায় এই দেখুন না আমরা খাতায় যা সই করি তার নাম অটোগ্রাফ, অটোগ্রাম নয়"

"রাম কহো, রাম কহো, রাম কহো"—খ্যাক খ্যাক করে' হেসে ফেললেন ছকুবাবু—"মহাবীরজিকি ভালা হো। আরে মশাই, টেলিগ্রাফ হল যন্ত্রটার নাম। বিশেষণরূপেও ওর ব্যবহার হতে পারে—যেমন টেলিগ্রাফ লাইন"

"মরুক গে"—ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন দিগ্বিজয়—"আমরা অভিধানও লিখছি না, পরীক্ষাও দিচ্ছি না। চিরকাল টেলিগ্রাফ করে' এসেছি, চিরকাল টেলিগ্রাফ করবও, কি বলেন গোবর্দ্ধনবাবু—অ্যাঁ ?"

গোবর্দ্ধনবাবু গাড়িতে চড়বার জন্তে কসরৎ করছিলেন। দিগ্বিজয়ের ঘোড়ার গাড়িটি একটু অসাধারণ গোছের। পা-দানিটা বেশ একটু উঁচুতে। দিগ্বিজয়ের কথা শুনে নিরীহ গোবর্দ্ধন বললেন—"তা বই কি। ওসব হল কথার মার প্যাঁচ—ওতে কি আসে যায়—"

"আগে বাঁ পাটা দিন তারপর হাতলটা ধরুন। হ্যাঁ—" ছকুবাবুর পীতাভ চক্ষু দুটি ব্যঙ্গ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, "অত হাঙ্গামা না করে' 'তার' বললেই মিটে যায়। তার যদি আসে তাহলে খুলব সেটা। কিন্তু কি জবাব দিতে হবে তাতো মালুম নেই"

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুরেশ্বরী বললেন—"দেবেন না তাহলে। আমরা এসে যা হয় করব। তোমরা সব বলেছ তো ঠিক করে' ? চল আর দেরি করা নয়—উঃ শিকারের কথা ভেবে যা আনন্দ হচ্ছে"

"থাম, থাম, এক লহমা। শোন—"

ছকুবাবু গাড়ি থামালেন আবার।

"আপনার যে মেহমানদের আসবার কথা, তাদের মধ্যে যেটি বলিয়া জেলায় গিয়েছিলেন তাঁর নামটি কি"

"বলেছি তো আপনাকে। ব্রজেশ্বর—স্বর্ণার স্বামী"

"ব্রজেশ্বর। আচ্ছা, আর রুকব না তোমাদের। দিগ্বিজয়—দিগ্বিজয় করে' এস তাহলে। রাম রাম"

"শিকার টিকার ভালই লাগে না আমার"—দিগ্বিজয় আর একবার বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে।

গাড়ি বেরিয়ে গেল। ছকুবাবুর বাতও সেরে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দিগ্বিজয় যে হুইস্কির বোতলটি দিয়েছিলেন তাঁকে এবং যার প্রায় সবটাই শেষ হয়ে এসেছিল সেইটি বার করে' লিভারের চিকিৎসা সুরু করলেন তিনি। একটু পরেই কিন্তু চমকে উঠতে হল তাঁকে। এ কি, গেটের সামনে 'মেশিন গান' দাগছে কে! অস্ফুটকণ্ঠে একটা অশ্লীল বিহারী গাল উচ্চারণ করে' উঠলেন তিনি, জানলা দিয়ে উঁকি দিলেন। দেখেই চেয়ারে এসে বসলেন আবার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ভৃত্য পরেশ এসে দেখলে, ছকুবাবু যুগপৎ ভীত এবং কুপিত হয়ে বসে আছেন। পরেশ বাঙালী চাকর, বেশ কায়দা-দুরস্ত।

"বাইরে একজন বাবু একটা কুকুর নিয়ে এসেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করবেন কি ? নিয়ে আসব এখানে ?"

"আমি ? ওয়াস্তে ?"

'ওয়াস্তে' কথার তাৎপর্য্য পরেশ ঠিক বুঝতে পারলে না। 'ওয়াস্তে' কথার অর্থ 'হেতু'।

"তিনি বললেন খুঁজে পেয়েছেন"

"কি খুঁজে পেয়েছেন ?"

"কুকুরটা"

"বুঝলাম। কিন্তু আমি তার সঙ্গে মোলাকাৎ করি, এ তুমি চাইছ কেন"

"উনিই চাইছেন। উনি ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন বললেন, কিন্তু তিনি এখানে—"

"কার স্ত্রীর খোঁজে? ব্রজেশ্বরবাবুর? ও, হ্যাঁ ব্রজেশ্বরবাবু। তাঁর স্ত্রীর খোঁজে এসেছেন? তারপর?"

"ব্রজেশ্বরবাবুর স্ত্রী এখানে নেই শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর আমি যখন বললাম মা বাবু দুজনেই বেরিয়ে গেছেন, তখন তিনি জিগ্যেস করলেন যে বাড়িতে আর কেউ আছে কি না। আমি আপনার নাম করাতে উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন"

"যিনি এক্ষুণি ঝড়ঝড়ে মোটরবাইকে চড়ে এলেন তিনি? চেন তুমি ওঁকে?"

ছকুবাবু অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে দক্ষিণ নাসারন্ধ্রটি চেপে রেখে বাম রন্ধ্র দিয়ে ভীষণ জোরে নাক ঝাড়লেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সদারঙ্গবাবু"

"আচ্ছা, ডাক। কুত্তা এনেছে একটা? হে ভগবান"

একটু পরেই দ্বারপ্রান্তে সদারঙ্গবিহারীলাল আবির্ভূত হলেন। আপাদমস্তক ধূলোয় ঢাকা, বগলে কুকুর, চোখেমুখে আনন্দ এবং উৎসাহ ঝলমল করছে। চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে তিনি ছকুবাবুর দিকে চাইলেন।

"ধকুবাবু?"

"ছকু"

"ও, ছকু, মাপ করবেন, ঠিক ধরতে পারিনি তাহলে। আমার নাম সদারঙ্গবিহারীলাল"

"আসুন, বসুন। ওটা আপনার 'চাইনীজ-পুড্‌ল্' দেখছি"

"বাঃ, আপনি তো কুকুর চেনেন! হ্যাঁ, 'চাইনীজ-'পুড্‌ল্‌ই'"

"চিনি বই কি। পোখমনবাবুর ছিল যে একটা—"

"পোখমনবাবু কোথায় থাকেন"

"বিহারে"

"ও, বিহারে। পোখমন? ও বিহারী, স্যাচরালি! বিহারী ভদ্রলোকের নাম পোখমন তো হবেই। ঠিক। পোখমন—"

ছকুবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল হঠাৎ।

"মনে হচ্ছে এরপর বলবেন রামায়ণের নায়কের নাম তো রামচন্দ্র হবেই, ন্যাচরালি"

ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। চশমার আলোক-রশ্মি বিকীরণ করে' আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন একটা।

ছকুবাবু বললেন—"মাপ করবেন, মেজাজটা ভাল নেই। লিভার—মানে—যাতে বড় কষ্ট পাচ্ছি। আপনি বিহারে কখনও যাননি মনে হচ্ছে"

"না, যাইনি। তবে যাবার ইচ্ছে আছে। খুব। শুনেছি চমৎকার জায়গা"

"মোটেই চমৎকার জায়গা নয়, ভয়ানক গরম! চমৎকার জায়গায় একবার জীবনে গিয়েছিলাম, ওই পোখমনবাবুর সঙ্গেই"

"দার্জিলিং কিম্বা কাশ্মীর নিশ্চয়"

"না, সিঙ্গাপুর। গেছেন কখনও?"

"না, তবে যাবার ইচ্ছে আছে। ক্লাইমেটটা খারাপ শুনেছি"

"মোটেই খারাপ নয়"

"ও, নয়?"

"চমৎকার ক্লাইমেট। এসব দেশের ক্লাইমেট কি ক্লাইমেট? মাতাহারির কি জানেন আপনি?"

"আজ্ঞে?"

"বলছি, মাতাহারির বিষয় কিছু জানেন?"

"মাতাহারি? একজন বিখ্যাত স্পাই শুনেছি। একটা ফিল্মেরও ওই নাম আছে—ওই স্পাইয়ের গল্প নিয়েই লেখা সম্ভবত। দেখিনি, আন্দাজ করছি"

"মাতাহারি মানে সূর্য্য। মালয় ভাষা"

"ও, তাই না কি। বাঃ!"

"হুবহু অনুবাদ করলে হয় 'দিনের চোখ'। মাতা—চোখ, হারি—দিন। মাতাহারি—দিনের চোখ—সূর্য্য"

"বাঃ! দিনের চোখ! চমৎকার—পোয়েটিক্—"

"তাই বলছি এ হতভাগা দেশে সূর্য্যের কতটুকু পরিচয় পান আপনারা"

"ও, হ্যাঁ—তা বটে। হা—হা—হা। তবে এখানেও গরম খুব"

"একে গরম বলেন? আপনার সিঙ্গাপুরে যাওয়া উচিত"

"যাবার ইচ্ছে আছে"

"যাবেন একবার। এখন আপনার দরকারটা কি বলুন। 'স্টিংগাহ্' চলবে একটা?"

"আজ্ঞে?"

"এক 'পেগ' দেব? সিঙ্গাপুরে ড্রিঙ্ককে স্টিংগাহ্ বলে। এই যে—"

নিজের গ্লাসটা দেখালেন।

"ও! না, ধন্যবাদ—"

"পোখমনবাবুর স্মৃতি এটি"—এই বলে' ছকুবাবু গ্লাসটি তুলে আর এক ঢোঁক খেলেন।

"এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এ ছাড়া একটি দিন চলবার উপায় নেই"

"ঠিক। বিহারে যেতে হবে একবার। সিঙ্গাপুরেও। এখন এই কুকুরটাকে এনেছি। রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম এটাকে"

"পুষুন। আমার দরকার নেই। আমি নিজের জ্বালাতেই অস্থির, আমি ও নিয়ে কি করব"

"না—না—ঠিকই তো। তা নয়—মানে এ কুকুরটা আমার চেনা কুকুর—হঠাৎ রাস্তায় দেখতে পেলাম। অদ্ভুত ঠেকছে, নয়? কি হয়েছে তাহলে শুনুন সব" (ক্রমশঃ)

আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি—

প্রায় ৬ মাস হইতে চলিল, ভারতবর্ষ বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই কয়মাসে দেশের অবস্থা উন্নতি লাভ না করিয়া ক্রমে ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র এই উভয় ভাগে ভাগ হইয়াছে। পাকিস্থানের অর্দ্ধেক পশ্চিম দিকে—সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাব লইয়া গঠিত এবং অপরার্দ্ধ পূর্ব্ব বাঙ্গালায়। এক অংশের সহিত অপর অংশের যোগাযোগের ব্যবস্থা হওয়া প্রায় অসম্ভব। সে জন্য পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টকে নানাভাবে বিব্রত হইতে হইতেছে।

—

কলিকাতা লাটপ্রাসাদে গভর্ণর রাজাজী

অন্য দিকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথম হইতেই এমন সব গণ্ডগোলে বিব্রত হইতে হইতেছে যে, রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে দেশবাসী জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করার সময় নাই—জনগণের কল্যাণজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার মত অর্থেরও ক্রমে অভাব দেখা দিতেছে। জুনাগড়েই প্রথমে যে বিরোধ উপস্থিত হয়, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে বহু অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিয়া তাহার সমাধান করিতে হইয়াছে। তাহার পর কাশ্মীরে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ক্রমেই ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে। সে যুদ্ধে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যহ ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্ট আক্রমণকারীদের সাহায্য করায় ঐ যুদ্ধ সহজে মিটিবে বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য ঐ ব্যাপারটি জগতের সর্ব্বজাতিক মিলন প্রতিষ্ঠান—ইউ-এন-ও'কে জানান হইয়াছে। হায়দ্রাবাদের নিজামের সহিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক বৎসরের জন্য স্থিতাবস্থা চুক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু পাকিস্থান হইতে গোপনে তথায় অস্ত্রাদি প্রেরণ করার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং হায়দ্রাবাদ লইয়াও অচিরে যে আবার বিরোধ উপস্থিত হইবে না, এমন মনে করা যায় না।

কলিকাতায় 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' স্মৃতি-সম্মেলনে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ

তাহার পর আশ্রয়প্রার্থীর সমস্যা—ভারত বিভাগের পর প্রথমে পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশে ও পরে ক্রমে ক্রমে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তপ্রদেশে অমুসলমানদের উপর এরূপ অনাচার আরম্ভ হইয়াছিল যে ঐ সকল অঞ্চলের অমুসলমানগণ

আর তথায় বাস করা নিরাপদ মনে না করিয়া ক্রমে ক্রমে সকলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করিতেছেন। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পূর্ব্ব পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি বহু স্থানের মুসলমানগণও পাকিস্থানে চলিয়া যাইতেছেন। এই ভাবে ২।৩ কোটি লোক নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রয়প্রার্থীরূপে অন্য স্থানে গমন করায় তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রকেই বিপন্ন হইতে হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়কে এই কার্য্যের জন্য বিশেষ মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশ হইতে আগত হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সকল প্রদেশে ছড়াইয়া দিয়াও এখন পর্য্যন্ত এই সমস্যার কোন সুসমাধান হয় নাই। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার ফলে গঠনমূলক কার্য্যসমূহের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলিকে সাহায্য দান করা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতের খাদ্যাবস্থাও ক্রমে জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

দিল্লীতে অস্থায়ী বড়লাট রাজাজী সম্বর্দ্ধনা—(বাম হইতে) শ্রীমতী নামগিরি (রাজাজীর কন্যা) ডাক্তার সারিয়ার (ইন্দোনেশিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী) শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম, সার টেরেন্স সোন (বৃটেনের হাইকমিশনার) কুমারী প্রেমিজয়রামদাস, শ্রীরাজাগোপালাচারী ও লেডী সোন

এই সমস্যা সমাধানে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বিষয়টি এমনই জটিল যে অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও সমস্যার সুসমাধান করা যাইতেছে না। পাকিস্থান গভর্ণমেন্ট প্রথম দিকে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কাশ্মীরের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে তাঁহারা এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ফলে পশ্চিম পাঞ্জাব ও সীমান্তপ্রদেশের পথে ঘাটে বহু লক্ষ মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী আহার ও আশ্রয়ের অভাবে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যুদ্ধের সময় নানা স্থানে কারখানা প্রস্তুত হওয়ায় সাধারণ কৃষকের দল অধিক অর্থার্জ্জনের আশায় কারখানায় কাজ লইয়া সমরোপকরণ প্রস্তুত করিয়াছিল। কারখানাগুলি একে একে সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—বেকার কৃষকগণের পক্ষে আর দেশে ফিরিয়া গিয়া কৃষিকার্য্যে মন দেওয়া সম্ভব হয় নাই—তাহার ফলে গত ৩।৪ বৎসর দেশে কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ খুবই কমিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় খাদ্যবিভাগ বাহির হইতে উচ্চ মূল্যে চাউল ও আটা কিনিয়া আনিয়া তাহা দেশে তদপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা

করিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ ভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। সে জন্য দেশে খাদ্যাভাব না কমিয়া দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। দেশের অবস্থা মহাযুদ্ধের পরও শান্তিপূর্ণ না হওয়ায় কৃষির প্রসার সম্ভব হইতেছে না। বিশেষ করিয়া দেশবাসী কৃষিবিমুখ হওয়ায় অধিক ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য সরকারী প্রচার কার্য্যও সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এ জন্য দেশে খাদ্যাভাব চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন না দেশবাসী কৃষির প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইবে, ততদিন দেশের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের সকল সরকারী চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে। ভারতবর্ষ সত্যই সুজলা, সুফলা দেশ—কিন্তু গত দুই শত বৎসরের ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে দেশবাসী কৃষি-কার্য্যকে ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতে শিখিয়াছে বলিয়া আজ ভারতের খাদ্যসমস্যা এত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে।

এ দেশে শ্রমিক-মালিক বিরোধও দিন দিন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের ও অন্যান্য সকল জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপ-করণের মূল্য সর্ব্বত্র ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইলেও শ্রমিকদের বেতন কোথাও ২ গুণের অধিক করা হয় নাই। ফলে মালিকের প্রতি শ্রমিকের অসন্তোষের ভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ও তাহার ফলে কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় কেহই পূর্ব্বের ন্যায় পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, প্রয়োজন মত বস্ত্রাদিও পায় না, তাহার ফলে সকলে অন্ন বস্ত্রের অভাবের অজুহাতে মন দিয়া কাজও করে না। এ অবস্থার আশু পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। বহু কারণে দেশের মধ্যে যে ধন-অসাম্য আসিয়া পড়িয়াছে, সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা তাহা দূরীকরণের ব্যবস্থা না করিলে দেশ বিপন্ন হইবে ও দেশবাসী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের সম্বর্দ্ধনা

আমাদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস একদিন ধরিয়া আমাদের রাজনীতিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করিয়া আজ তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কংগ্রেস জনগণের প্রতি কর্ত্তব্য উপযুক্তভাবে পালন করে নাই। সেজন্য বহু বামপন্থী রাজনীতিক দলের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে ও সে সকল দলের কর্ম্মীরা শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে আন্দোলন চালাইয়া দেশে অশান্তিজনক পরিস্থিতি আনয়ন করিতেছে। কংগ্রেস কৃষাণ-মজুর-রাজের আদর্শ প্রচার করিলেও আজ কৃষাণ ও মজুর সম্প্রদায়ের বিপদের দিনে উপযুক্তভাবে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর হয় নাই। এ বিষয়ে কংগ্রেস যদি অবহিত না হয়, তবে জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব কমিয়া যাইবে ও কংগ্রেস ক্রমে তাহার শক্তি হারাইবে।

উপরে যে সকল সমস্যার কথা বলিয়াছি, সেগুলি সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। বাঙ্গালার সমস্যা আরও ভীষণ। বাঙ্গালা বিভাগের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার ভাগে বাঙ্গালার মাত্র এক তৃতীয়াংশ স্থান পড়িয়াছে। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ উত্তর বাঙ্গালার ভাল করিয়া সীমা নির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত করিয়া দেয় নাই। তাহার ফলে একদিকে যেমন সমগ্র খুলনা এবং ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার হিন্দু-

প্রধান অংশগুলি পাকিস্থানে পড়িয়াছে,অন্ত দিকে মুসলমান-প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা পাকিস্থানে না যাওয়ায় নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে। পাকিস্থান গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা না থাকায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের লোকগণও কি ভাবে কাজ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। পাকিস্থানের লোক মুর্শিদাবাদ জেলা'র কয়েকটি চর বলপূর্ব্বক দখল করিয়া বসিয়াছিল, পশ্চিম বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষ তথায় আক্রমণের জন্ত সৈন্ত প্রেরণ করায় তাহারা সেখানে মিটমাটে সম্মত হইয়াছে।

কলিকাতায় কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক সম্বর্দ্ধনা

পূর্ব্ব-পাকিস্থান অর্থাৎ পূর্ব্ব বাঙ্গালার হিন্দুদের এমন-ভাবে নির্য্যাতন করা হইতেছে, এমন ভাবে তাহাদের অসুবিধার মধ্যে রাখা হইতেছে যে তাহাদের পক্ষে আর পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বাস করা সম্ভব নহে। অথচ ১ কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দুর পক্ষে সহসা সে দেশ ত্যাগ করিয়া আসাও সঙ্গত বা সম্ভব নহে। পাঞ্জাবে লোক-বিনিময় ব্যবস্থার ফলে যে কত লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার হিসাব করা সুকঠিন। একটা বড় যুদ্ধ হইলেও হয়ত এত অধিক লোককে প্রাণ হারাইতে হইত না। পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ডাক চলাচল প্রায় বন্ধ, রেল চলাচল ঠিকমত হইতেছে না—কাজেই সেখানে যে সকল হিন্দু বাস করেন, তাঁহারা ক্রমে পশ্চিম বাঙ্গালার হিন্দুদের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এ অবস্থা অধিক দিন চলিলে পূর্ব্ব-পাকিস্থান-বাসী হিন্দুদের অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সীমান্ত ৭ শত মাইল। পশ্চিম বাঙ্গালাকে এই সুদীর্ঘ সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে; সে কাজ সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদে পাকিস্থানী সৈন্তরা যে ভাবে দুইটি চর দখল করিয়াছিল, সেই ভাবে তাহারা যদি যে কোন পথে পশ্চিম বাঙ্গালাকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পশ্চিম বাঙ্গালা হইতেও প্রতি-আক্রমণ করা ছাড়া অন্ত উপায় থাকিবে না। ইতিমধ্যে পাকিস্থানী সৈন্ত কর্ত্তৃক সীমান্তের নানা স্থানে অনাচার অনুষ্ঠানের সংবাদ জানা গিয়াছে। সে জন্ত পশ্চিম বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট শঙ্কিত হইয়াছেন। সম্প্রতি দেশরক্ষাসচিব সর্দ্দার বলদেব সিং ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভার ডেপুটী নেতা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল উভয়েই কলিকাতায় আসিয়া সীমান্তরক্ষা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি দিয়া গিয়াছেন। পাকিস্থানী সৈন্তরা শুধু পশ্চিম বাঙ্গালায় অনাচার করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই—আসামের সীমান্তেও কয়টি স্থান বলপূর্ব্বক দখল করার চেষ্টা করিয়াছিল। সে জন্ত সর্দ্দার প্যাটেল আসামে যাইয়া আসাম-সরকারকেও উপযুক্ত নির্দ্দেশ দিয়া আসিয়াছেন।

বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলকে দেশবাসী ধীরভাবে কার্য্যে অগ্রসর হইবার সুযোগ দিতেছেন না। বর্ত্তমান অবস্থায়, পরিবর্ত্তনের যুগে মন্ত্রিমণ্ডলকেও যেমন সকল দিক সামলাইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া তাহাদের দোষ ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক, জনগণও যদি সহিষ্ণুতার সহিত এ বিষয়ে বিবেচনা করেন, তবে তাহার ফল কখনই মন্দ হইবে না। বঙ্গীয় নিরাপত্তা বিল লইয়া যে ভাবে বিক্ষোভ প্রভৃতি করা হইয়াছে, বুদ্ধিমান ও বিবেচক জনগণ কখনই তাহা সমর্থন করেন নাই। একদল আন্দোলনকারী নিরীহ জনগণকে অযথা উত্তেজিত করিয়া দেশে যে অশান্তির আবহাওয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দূর করিতে না পারিলে বর্ত্তমান মন্ত্রি-মণ্ডলের পক্ষে দেশের গঠনমূলক ও উন্নতিজনক কাজ করা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। দেশ নানা দিক হইতে বিপন্ন, এ অবস্থায় যদি মন্ত্রিমণ্ডলকে শান্তিতে কাজ করিতে না দেওয়া হয়, তবে দেশে অশান্তিই অধিক বাড়িয়া যাইবে ও তাহার ফলে দেশবাসীকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। মন্ত্রি-

মণ্ডলের শাসন কার্য্যে অভিজ্ঞতা নাই সত্য এবং এ কথাও সত্য যে এতদিন ধরিয়া যে আই-সি-এস সম্প্রদায় দেশ-শাসন করিতেছিলেন, তাঁহাদের উপর এখনও শাসন কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নাই —তাঁহারা যে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনোভাব একেবারে পরিবর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন, এমন আশা করাও সঙ্গত হইবে না—কাজেই এ অবস্থায় জনগণের পক্ষে শান্ত হইয়া সকলকে কাজ করিতে দিয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা না করিয়া সহসা বড় পরিবর্ত্তনের আশা করা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

২৪ পরগণা রাষ্ট্রীয় সম্মিলন—

গত ২২, ২৩ ও ২৪শে নভেম্বর গোবরডাঙ্গায় ২৪ পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় জমীদার শ্রীযুত গৌরীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও সমিতির সাধারণ

গোবরডাঙ্গায় ২৪পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে ব্রহ্মচারী ভোলানাথ ও অভ্যর্থনা-সম্পাদক শ্রীপ্রবোধ মিত্র

সম্পাদক খ্যাতিমান কর্ম্মী শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র মিত্রের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্রথম দিনে মন্ত্রী শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উন্মোচন করিলে নির্ব্বাচিত সভাপতি সৈয়দ নৌসের আলি সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। সেদিন মন্ত্রী চৌধুরী মহাশয় ও মন্ত্রী শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ রায় সম্মিলনে সরকারী কার্য্যপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনে প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও মন্ত্রী শ্রীযুত কালীপদ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন ও তৃতীয় দিনে মন্ত্রী হেমচন্দ্র নস্কর সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তৃতীয়

২৪পরগণা জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীগৌরীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

দিনে স্থানীয় যমুনা নদীর সংস্কার ও কঙ্কনা হ্রদের দুরবস্থা দূর করার কথাও আলোচিত হইয়াছিল। তিন দিনই সভায় বাঙ্গালার বহু খ্যাতনামা নেতা যোগদান করিয়াছিলেন। জেলায় এই সম্মিলনের ফলে জেলার, বিশেষতঃ গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের অভাব অভিযোগ আলোচিত হইয়াছে ও সেগুলি সম্বন্ধে সকলে অবহিত হইয়াছেন।

বিহারে নূতন গভর্ণর—

আচার্য্য কৃপালানীর পদত্যাগের ফলে ডক্টর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে বিহারের গভর্ণর শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন ও শ্রীযুক্ত মাধব শ্রীহরি আনে বিহার প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান

করিতে যাইবার পথে গত ২রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়া এই প্রথম কলিকাতায় আসায় তাঁহাকে দমদম বিমান ঘাটিতে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—

'জীবনীকোষ' গ্রন্থের সম্পাদক ও রেঙ্গুনস্থ বেঙ্গল একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যালঙ্কার গত ১৩ই অক্টোবর কলিকাতায় ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোক-

পণ্ডিত ৺শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার

গমন করিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী সিটি কলেজের অধ্যাপক। তিনি সারাজীবন শিক্ষা ও সাহিত্য আলোচনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কলিকাতায় সর্দ্দার পেটেল—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রধান-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল আসাম পরিদর্শন করিয়া গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন ও গড়ের মাঠে দশ লক্ষ লোকের এক সভায় দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি ৪ দিন কলিকাতায় থাকিয়া পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সর্দ্দার বলদেব সিং কলিকাতায় আসিয়া কয়েকদিন বাস করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব-পাকিস্থান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ও আসাম আক্রান্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বিশেষ চিন্তিত হইয়াছেন ও আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থায় বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন।

ভারতচন্দ্র রায় স্মৃতি উৎসব—

গত ৪ঠা জানুয়ারী বিকালে ২৪পরগণা শ্যামনগরের অন্তর্গত মূলাজোড় গ্রামে স্থানীয় সংস্কৃত কলেজ ভবনে কবি-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সভার উদ্বোধন করেন এবং বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। কলিকাতার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবন মূলাজোড়ে তাঁহার যে গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি সাধারণের পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া তথায় একটি পাঠাগার ও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সম্মিলন—

৪ঠা জানুয়ারী রবিবার সকালে ২৪পরগণা শ্যামনগরে স্থানীয় ভারতচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তথায় সভাপতিত্ব করেন, চন্দননগরের শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ সভার উদ্বোধন করেন ও খ্যাতনামা পাঠগার-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত সভায় পাঠাগার আন্দোলনের ইতিহাস ও কার্য্যকারিতা বিবৃত করেন। আমাদের দেশে পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও পাঠাগারসমূহের মধ্যে মিলন প্রতিষ্ঠা করিয়া সেগুলিকে প্রকৃত উন্নতির পথে লইয়া যাওয়াই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য ছিল।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে হিন্দুদের অবস্থা—

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ হিন্দু বাস করে, তাহাদের তথায় বাস করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। লুঠতরাজ লাগিয়া গিয়াছে—জমীদার খাজনা আদায় করিতে পারেন না, ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসা চালান

কষ্টকর—জিনিষ লইয়া লোক দাম দেয় না। স্কুল পাঠশালা ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাম আদান-প্রদানও প্রায় বন্ধ। ঐ অঞ্চল হইতে জিনিষপত্র লইয়া হিন্দুদের পশ্চিম বাঙ্গালায় আসিতে দেওয়া হয় না। আদালতে যাইলে সুবিচার পাওয়া যায় না—থানার পুলিশ কোন অভিযোগ শুনে না—অধিকাংশ স্থলে আদালতের কাজও বন্ধ। গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকেরা এই সুযোগে অবাধে অনাচার চালাইতেছে। মাঠ হইতে জোর করিয়া ফসল কাটিয়া লইয়া যাওয়া হয়, বাধা দিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় হিন্দুরা কি ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দীন মুখে যাহাই বলুন না কেন, কিন্তু জনসাধারণ কেহ তাহার কথা শুনে না—এমন কি সরকারী আদেশ পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী ধনী জমীদার ও ব্যবসায়ী হিন্দুসম্প্রদায়ের সকলেই ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় চলিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে শীঘ্রই বাঙ্গালার এই বিষম বিপদের সম্মুখীন হইয়া ইহা হইতে হিন্দু সাধারণকে রক্ষা করিতে হইবে—নচেৎ পূর্ব্ব-পাকিস্থানবাসী হিন্দুরা ক্রমে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

হরতাল চেষ্টা বিফল—

পশ্চিম বাঙ্গালার নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কম্যুনিষ্টদল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সোসালিষ্ট রিপাবলিকান দল প্রভৃতি গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতায় হরতাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস ঐ ব্যবস্থা সমর্থন না করায় জনগণ সেদিন কেহই হরতালে যোগদান করে নাই। সকল দলই নিরাপত্তা আইন সমর্থন করায় সহরে হরতাল হয় নাই।

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও গত ১লা জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে ঠাকুর

চাংড়ীপোতার রাজলক্ষ্মী প্রসূতি ও শিশুসদনের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসবে স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বার্ষিক কল্পতরু উৎসব 'রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবার বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী উৎসবে উপস্থিত হইয়া সমবেত লক্ষাধিক লোকের সভায় বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন—উক্ত কালীবাড়ীটি পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া প্রয়োজন। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের স্বামী পুণ্যানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। মহামণ্ডলের সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা পুলিসের ডেপুটী কমিশনার) উৎসবের সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শ্রীসত্যেন্দ্র-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র, বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন।

বোম্বায়ের নূতন গভর্ণর—

বোম্বায়ের গভর্ণর সার জন কলভিল বিলাত যাত্রা করায় সার মহারাজ সিং বোম্বায়ের নূতন গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছে। তিনি ইংরাজ শাসনকালেও ভারতে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা লাভ উৎসব—

গত ৪ঠা জানুয়ারী রেঙ্গুনে ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস পরেই ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ৬১ বৎসর ১মাস ১দিন পরে ব্রহ্মে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঐ উৎসবে যোগদান করিবার জন্য রেঙ্গুনে গিয়াছিলেন।

পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা—

পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটি নূতন সেনাবাহিনী গঠন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উহাতে প্রথমে ১৫ হাজার সৈন্য গ্রহণ করা হইবে। পরে অনুরূপ আর একটি সীমান্ত সেনাবাহিনীও গঠন করা হইবে।

শ্রীরামপুর মহকুমা সাহিত্য-সম্মিলন—

গত ৩১শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের টাউন হলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে শ্রীরামপুর মহকুমা সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মিলনের সহিত অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রেরিত দ্বিতীয় চিকিৎসকদল (যাত্রার পূর্ব্বে দমদম বিমান ঘাঁটিতে) ফটো—শ্রীতারক দাস

দেশীয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ মত গত ১লা জানুয়ারী উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রদেশের ২৫টি দেশীয় রাজ্যের ও মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট সে প্রদেশের ১৪টি দেশীয় রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের

মোট ১৪টি রাজ্যের আয়তন ৩১ হাজার বর্গ মাইল ও লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। উড়িষ্যার ২৫টি রাজ্যকে ৬টি জেলায় পরিণত করা হইয়াছে।

গড়ের মাঠের সভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ফটো—শ্রীতারক দাস

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানী—

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে আচার্য্য জে-বি-কৃপালানীর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানী বিনা বাধায় নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। সুচেতা বাঙ্গালা মহিলা—কাজেই তাঁহার নির্ব্বাচনে যুক্তপ্রদেশপ্রবাসী বাঙ্গালীরা উপকৃত হইবে।

কুমিল্লায় ত্রিপুরা ছাত্র ও সংস্কৃতি সম্মেলনে সমবেত সুধীবৃন্দ

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী হত্যার মামলা—

রেঙ্গুনে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী আউঙসান ও মন্ত্রিসভার অপর সদস্যদের হত্যা সম্পর্কে ধৃত ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উ-স ও অপর ৮জন আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য ৭ দিন সময় দেওয়া হইয়াছে। উ-স ব্রহ্মের দেশ-প্রেমিক দলের ৪৬ বৎসর বয়স্ক নেতা। জাপানীদের সহিত মিতালী করায় অভিযোগে তাহাকে ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় আটক রাখা হইয়াছিল।

সর্ব্ব এশিয়া সব-পেয়েছির আসর—

গত ২৪শে ডিসেম্বর বুধবার পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সর্ব এশিয়া সব পেয়েছির আসরের উদ্বোধন করেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন। সপ্তাহব্যাপী এই বিরাট অনুষ্ঠানে বাংলা দেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও গায়ক গায়িকার এক বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। বাংলার ছোট ছোট

ছেলেমেয়েদের দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধন করিবার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে আমরা সানন্দে অভিনন্দন জানাইতেছি। এই আসরের 'রাজপথে শোভাযাত্রা' আর 'নৃত্য প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠান দুইটির চলচ্চিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্ব্বাচিত সদস্য ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের জনকল্যাণকল্পে গঠনমূলক কার্য্যে বিধানবাবুর বিরাট ব্যক্তিত্ব বহু অসাধ্য সাধন করিয়াছে। যাদবপুর ও কার্সিয়ঙের যক্ষ্মা হাসপাতাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ও চিত্তরঞ্জন সেবা সদন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কল্পে ডাক্তার রায়ের দান অসামান্য। বিধান বাবুর চিরদিনের কার্য্যকলাপ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন চিকিৎসা-জগতে তাঁহার সাফল্য তাঁহাকে জনসমাজে বরণীয় করে নাই, গঠনমূলক কার্য্যে তাঁহার দানই তাঁহাকে মহনীয় করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসচিব ও পরে ভাইস-চ্যান্সলার রূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রচিত ভোর কমিটির রিপোর্টও বিধান বাবুর বিদ্যাবত্তা ও প্রতিভার পরিচায়ক।

প্রবর্ত্তক সংঘ সম্মেলন—

গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা ভারতসভা হলে নিখিল বঙ্গ প্রবর্ত্তক সংঘ সম্মিলনের চতুর্দ্দশ অধিবেশন হয়। পশ্চিম বাঙ্গালার গভর্ণর রাজাজী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন, শ্রীমতিলাল রায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সংঘের পতাকা উত্তোলন করেন ও কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত

সুধীরকুমার রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সম্মিলনে উত্তর বঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষার জন্ত বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও প্রস্তাবগুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত করা যায়, সে জন্ত প্রবর্ত্তক সংঘ হইতে কার্য্য ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র দাশ—

সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ হইতে আসাম গভর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়া শিলংয়ে কার্য্যভার গ্রহণ

আসামের চিফ সেক্রেটারী—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে সুলেখক ও উৎসাহী কর্ম্মী। এত অল্প বয়সে কেহ তাঁহার মত দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন নাই। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পরলোকে জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—

বঙ্গবাসী কলেজের সহকারী প্রিন্সিপাল অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গত ২রা ডিসেম্বর মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে ইংরাজিতে এম-এ পাশ করিয়া তিনি বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। অধ্যাপনার সহিত তিনি রাজনীতি ও সমাজ সেবা করিতেন। তাঁহার মত সজ্জন ছাত্রবন্ধু ও পরোপকারী ব্যক্তি খুব কম দেখা যায়।

অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য—

খ্যাতনামা পণ্ডিত স্বর্গত মতিলাল ভট্টাচার্য্যের পৌত্রী শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য এম-বি, ডি-টি-এম সম্প্রতি ভারত

শ্রীমতী বিমলা ভট্টাচার্য্য

গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিলাভ করিয়া মাতৃমঙ্গল ও শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্ত বিলাত গিয়াছেন ও লণ্ডনে সোহো হাসপাতালে কাজ করিতেছেন। তিনি শিম কানপুর ও আগ্রার নারী হাসপাতালে ইতিপূর্ব্বে কা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ—

হুগলী চন্দননগর নিবাসী খ্যাতনামা সাহিত্যিক, বদান্যবর শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় সম্প্রতি স্বাধীন চন্দননগরের শাসন পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা এই সঙ্গে হরিহরবাবুর এবং স্বাধীন চন্দননগরের শাসন পরিষদ ও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্যগণের চিত্র প্রকাশ করিলাম। হরিহরবাবু সহরতলী অঞ্চলে সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি সুপণ্ডিত, কাজেই তাঁহার এই সম্মানলাভে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

স্বাধীন চন্দননগরের শাসন পরিষদের সভাপতি—শ্রীহরিহর শেঠ

শ্রীযুত কমলচন্দ্র চন্দ্র—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কিত তদন্ত কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হওয়ায় শ্রীকমলচন্দ্র চন্দ্র আই-সি-এস তাঁহার স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রবাসী উড়িয়া সম্মিলন—

গত ২৮শে ডিসেম্বর ২৪ পরগণা কামারহাটীতে সাগর দত্তের স্কুলের মাঠে উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাবের সভাপতিত্বে প্রবাসী উড়িয়া সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার নানা স্থান হইতে প্রায় ১০ সহস্র উড়িয়া তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ দাস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া উড়িয়া ও বাঙ্গালীদের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করেন।

স্বাধীন চন্দননগর শাসন পরিষদ ও মিউনিসিপাল পরিষদের সদস্যগণ—
বাম দিক হইতে—১ম শ্রেণী—শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্র পাল, মঃ ব্যাজা (এডমিনিষ্ট্রেটার), শ্রীহরিহর শেঠ (সভাপতি), মঃ ব্যার (ফরাসী ভারতের গভর্ণর)
২য় শ্রেণী—শ্রীদাশরথী কুণ্ডু, শ্রীগৌর নন্দী, মঃ যোন বার্ণার্ড (ফরাসী কনসাল), শ্রীআশুতোষ দাস, শ্রীঅরুণ দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্র দাস ও শ্রীসতীশ দাস

ব্যারাকপুরে সাংস্কৃতিক সম্মিলন—

গত ১লা হইতে ৪ঠা জানুয়ারী ৪ দিন ২৪ পরগণা ব্যারাকপুরস্থ হিন্দীস্কুলে সাংস্কৃতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা নানা-কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীতে ব্যারাকপুরের ইতিহাস চিত্রে

প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্মিলনের বিভিন্ন দিনে শিক্ষামূলক বক্তৃতা, ব্যায়াম প্রদর্শনী, সাহিত্যালোচনা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল।

পরলোকে অনন্তবালা চৌধুরাণী—

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী অনন্তবালা দেবী চৌধুরাণী গত ৯ই অগ্রহায়ণ প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল। অনন্তবালা দেবী রাজসাহী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পত্নী অনন্তবালা দেবীচৌধুরাণী

জেলার হরিরামপুর নিবাসী কালীপ্রসাদ সান্যালের কন্যা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধীর স্থির ও অত্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ছিলেন। রাজতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর গৃহে আসিয়াও তিনি সাধারণের মত ভোগবিলাসে মাতিয়া উঠেন নাই। তাঁহার স্বামীভক্তি, দরিদ্রের প্রতি দয়া, অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি ও ত্যাগের ভাব প্রত্যেকেরই শিক্ষণীয়। মধ্যবয়সেই তিনি স্বামীর অনুমতি লইয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থবাস করিতে চলিয়া যান, আর সংসারাশ্রমে ফিরিয়া আসেন নাই।

শ্রীমতী কল্যাণী গুহ—

ই, আই রেলের ডেপুটি চীফ্ কমার্সিয়াল ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী গুহ এবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে অনার্স পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ লাভ করিয়া উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী কল্যাণী গুহ

ইনি উপস্থিত ঢাকার ইংরাজী সাপ্তাহিক "ইষ্ট বেঙ্গল টাইমস্" কাগজের সম্পাদনার কার্য্য করিতেছেন।
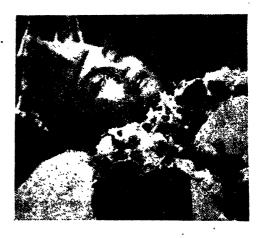
কলিকাতায় ব্যবস্থা পরিষদের সম্মুখে নিহত আর-ডবলিউ এ-পি'র ক্যাডেট শিশিরকুমার মণ্ডল ফটো—পান্না সেন

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ

ভারতীয়দল : ১৮৮ ও ৬১ (৭ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া : ১০৭

বৃষ্টির জন্য ভারতীয় ক্রিকেটদল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় টেষ্টম্যাচ শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংশিতভাবে শেষ হয়েছে।

১২ ডিসেম্বর সিডনীতে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতীয় বনাম অষ্ট্রেলিয়াদলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক লালা অমর নাথ টসে জয়লাভ করে নিজ দলকে প্রথমেই ব্যাট করার সুযোগ দেন। খেলার সূচনা খুব শুভ হল না। দলের ২ রাণে প্রথম এবং ১৬ রাণে ২য় উইকেট পড়ে গেল। মোট ৫৫ মিনিট খেলার পর বৃষ্টি নামে এবং ষোল মিনিট খেলা স্থগিত থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ভারতীয় দলের ২ উইকেটে ৩৮ রাণ উঠে। বৃষ্টির জন্য মধ্যাহ্নভোজের পর আর খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি। রাত্রে বৃষ্টির জন্য খেলার দ্বিতীয় দিনে (১৩ই ডিসেম্বর) মাঠের অবস্থা মোটেই সুবিধার ছিল না সেই জন্য যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয় নি। বেলা ১টায় খেলা আরম্ভ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় চার উইকেটে ভারতীয় দলের মাত্র ৬০ রাণ উঠে। তিন ঘণ্টা খেলার পর শতরাণ পূর্ণ হয়। চা-পানের সময় ৬ উইকেটে ভারতীয় দল ১৩৬ রাণ করে; চার ঘণ্টা ২০ মনিট খেলার পর ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ১৮৮ রাণে শেষ হয়। কাদকার এবং কিষেণচাদ সপ্তম উইকেটের জুটিতে ৭০ রাণ করেন। এই দুজনের কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিংয়ের জন্যই ভারতীয়দল কোনক্রমে শোচনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা পায়। উইকেট পান—ম্যাককুল ৩, জনষ্টন ২, জনসন ২ এবং লিণ্ডওয়েল ১।

দ্বিতীয় দিনের খেলার ৩৮ মিনিট সময় হাতে নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক উইকেটে ২৮ রাণ উঠলে পর খেলা স্থগিত থাকে। সরকারী ভাবে জানা যায় মাঠে ২০০২৭ জন দর্শকের সমাগম হয়েছিল। এই বাবদ ১৯৮৮ পাউণ্ডের টিকিট বিক্রী হয়।

১৪ই রবিবার, খেলার চিরাচরিত প্রথা হিসাবে রবিবারে খেলা বন্ধ ছিল। ১৫ই ১৬ই বৃষ্টির জন্য খেলা হয় নি। ১৭ ডিসেম্বর বুধবার খেলার পঞ্চম দিনেও যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে না হয়ে একটু দেরীতেই খেলা আরম্ভ হয়। অষ্ট্রেলিয়াদলের নট আউট খেলোয়াড়দ্বয় ব্র্যাডম্যানও মরিস অসমাপ্ত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। নরম উইকেটে প্রতিপদেই বিপদের সম্ভাবনা থাকায় উভয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে উইকেট রক্ষা করে খেলতে থাকেন। কিন্তু নরম ও ভিজা মাঠ খেলোয়াড়দের সমস্ত সতর্কতা এবং ক্রীড়ানৈপুণ্য ব্যর্থ ক'রে দিল। ১০৭ রাণে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হল। অমন দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যান ১৩ রাণে আউট হন। দলের সর্ব্বোচ্চ ২১ রাণ করলেন হেসেন্দ।

অষ্ট্রেলিয়া দলের এই অপ্রত্যাশিত পতনের চাক্ষুস অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংসের রাণ সংখ্যায় অষ্ট্রেলিয়া দলের থেকে ৮১ রাণে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা অতি সন্তর্পণে এবং দ্বিধা-যুক্ত ভাবে আরম্ভ করলেন। ভিজা মাঠের নরম উই-কেটে সুবিধা পেয়ে বোলারগণ কি ভাবে ব্যাটসম্যানদের প্রতারণা করতে পারেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা তার সাক্ষ্য দিলেন। ভারতীয় দলের ৭ উইকেটে

৬১ রাণ উঠলো। স্বাভাবিক অবস্থায় খেলা হলে এই রাণের পূর্ব্বে 'মাত্র' কথা জুড়ে দিয়ে রাণ সংখ্যার মর্য্যাদা দেওয়া হ'ত না। ঐ দিনে সিডনী মাঠে অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতীয় দলের মিলিয়ে ১৬টি উইকেট পড়ে যায়। ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানদের সর্ব্বোচ্চ রাণ সংখ্যা এবং ক্রীড়া চাতুর্য্য যতটা দর্শকদের মুগ্ধ করে ততটা বোলারদের দক্ষতা মুগ্ধ করতে পারে না। এই অবস্থায় তাদের জয় পরাজয় স্বীকার করতেও দর্শকেরা অনুদার। এ বিপর্য্যয়ের কারণ ভিজা মাঠ এবং এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত হিসাবে অভিহিত ক'রে বোলারদের সাফল্যকে খর্ব্ব করা হয়।

১৭ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের শেষ দিনেও বৃষ্টির জন্য খেলা সম্ভব হয় নি। ঐ দিন খেলা আরম্ভ করার জন্য অনেক চেষ্টা চলে। বৃষ্টি একটু ধরে গেলেই আম্পায়ার এবং উভয় দলের অধিনায়কদ্বয় মাঠে নেমে পিচ পরীক্ষা করতে থাকেন এবং পিচের অবস্থা একটু ভাল হলেই খেলা আরম্ভ হবে স্থির করেন। কিন্তু বার বার বৃষ্টি এবং পিচ পরীক্ষার মধ্যে খেলার সময়ই হাত ছাড়া হতে লাগল। একবার ঠিক হ'ল ৩-৪৫ মিনিটের সময় পিচ পরীক্ষা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু ৩-৪০ মিনিটে জোর বৃষ্টি নেমে গেল। ৪-২৫ মিনিটে ঘোষণা করা হ'ল—খেলা হবে না। শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত ভাবেই দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচটি পরিত্যক্ত হল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিডনী মাঠে কখনও টেষ্ট ম্যাচের ফলাফল অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়নি, এই প্রথম। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলায় ৮১ রাণে অগ্রগামী ছিল এবং দ্বিতীয় ইনিংসের রাণ নিয়ে মোট ১৪২ রাণ এবং হাতে উইকেটে অগ্রগামী ছিল।

ভারতীয় দল : অমরনাথ (অধিনায়ক), মানকাদ, সারভাতে, গুলমহম্মদ, হাজারে, কিষেণচাঁদ অধিকারী, কারদার, নাইডু, আমীর ইলাহী ও ইরাণী।

অষ্ট্রেলিয়া দল : ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক), ব্রাউন, মরিস, হ্যাসেট, মিলার, হেমেন্স, জনসন, ম্যাককুল, লিণ্ডওয়াল, ট্যালন ও জনষ্টন।

তৃতীয় টেষ্টম্যাচ

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৯৪ ও ২৫৫ (৪ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতীয়দল : ২৯১ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) ও ১২৫।

ভারতীয়দল বনাম অষ্ট্রেলিয়াদলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলায় অষ্ট্রেলিয়াদল ২৩৩ রাণে বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় ভারতীয় দলের ২য় পরাজয়।

১লা জানুয়ারী ইংরাজী শুভ নতুন বছরের প্রথমদিনে সুন্দর আবহাওয়ার মধ্যে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা বিখ্যাত মেলবোর্ণ মাঠে আরম্ভ হ'ল। ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনে অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ব্র্যাডম্যানের প্রতি ভারতীয় দল নববর্ষের যে শুভেচ্ছা এবং সৌভাগ্য কামনা করেছিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, এ কামনা ব্যর্থ হয়নি। ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত খেলাতেও জয়ী হলেন। বিশ হাজার দর্শক খেলার মাঠে উপস্থিত হয়ে ব্র্যাডম্যানকে অভিনন্দন জানালো। খেলার উপযুক্ত উইকেট এবং সম্বর্দ্ধনা সূচক বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াদল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন বার্ণস এবং মরিস। ২৯ রাণে প্রথম উইকেট পড়লো। স্বয়ং ব্র্যাডম্যান মরিসের জুটী হলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দলের ৯১ রাণ উঠলো। মধ্যাহ্ন ভোজের পর মরিস ৪৫ রাণে আউট হলেন তাঁর শূন্য উইকেটে হ্যাসেট এসে ব্র্যাডম্যানের জুটী হলেন। চা' পানের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের রাণ ২ উইকেটে ২০৪ রাণ উঠলো। চা-পানের পর হ্যাসেট নিজস্ব ৮০ রাণে আউট হলেন। তাঁর ৯টি বাউণ্ডারী ছিল। ব্র্যাডম্যান ১৯১ মিনিট খেলে ১৩২ রাণ ক'রে কারদারের বলে এল-বি-ডবলউ হয়ে আউট হন। অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৩৫৫ রাণ উঠলে পর ঐ দিনের মত খেলা শেষ হয়। উইকেট পান অমর নর্থ ৪ এবং মানকাদ ৩। ভারতীয় দলের উইকেট রক্ষক পি-সেন উইকেট রক্ষক হিসাবে প্রশংসা লাভ করেন; তিনি কোন অতিরিক্ত রাণ দেন নি।

২রা জানুয়ারী খেলার দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের খেলা ৩৯৪ রান উঠলে পর শেষ হয়। এই প্রথম ইনিংস ৫ ঘণ্টা ৪১ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সূচনায় খেলতে নামলেন মানকাদ এবং সারভাতে। ভারতীয় দলের প্রথম উইকেট পড়লো ১২৪ রানে। সারভাতে ৩৬ রানে

আউট হলেন। গুল মহম্মদ মানকাদের জুটী হলেন কিন্তু ১২ রান করে বিদায় নিলেন। চা পানের সময়ে দলের রান ১৮৫ উঠলো। তখন মানকাদ ৯১ এবং হাজারে ১৫ রান করে নট আউট আছেন। মানকাদ ১১৩ মিনিট খেলে নিজস্ব শতরান পূর্ণ করলেন। এদিকে হাজারে এবং পরে অমরনাথ আউট হয়ে গেলে ফাদকার মানকাদের জুটী হলেন। মানকাদ নিজস্ব ১৩২ রান ক'রে জনষ্টোনের বলে ক্যাচ তুলে ট্যালনের হাতে ধরা পড়ে আউট হলেন। ট্যালন ইতিপূর্ব্বে মানকাদের একটি ক্যাচ ধরতে পারেন নি। মানকাদ তিন ঘণ্টা উইকেটে খেলে মোট ১৩২ রান করেন তার মধ্যে ১৩টা বাউণ্ডারী এবং একটি ওভার বাউণ্ডারী ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভারতীয় দলের ৬ উইকেটে ২৬২ রান উঠলে পর দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়।

উইকেটের শোচনীয় অবস্থা দেখে অমরনাথ ৩রা জানুয়ারী খেলার তৃতীয় দিনে ৯ উইকেটে ২৯১ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করেন। ঐদিন ফাদকারের নট আউট ৫৫ রান উল্লেখযোগ্য। এদিকে উইকেটের শোচনীয় অবস্থার জন্য যেমন অমরনাথ ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলেন অন্যদিকে আত্মরক্ষা হিসাবে ব্র্যাডম্যান অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা করলেন বোলারদের দিয়ে। দলের ১ রানে ১ম, ১৮ রানে ২য় উইকেট পড়লো। আরান, ডুগ্যাণ্ড জনষ্টোন, বার্ণস আউট হলে পর মরিস ও ব্র্যাডম্যানের পঞ্চম উইকেটের জুটি খেলায় এই পতন রোধ করলেন এবং খেলার গতিও ঘুরিয়ে দিলেন। চা পানের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ১০২ রান উঠল; ব্র্যাডম্যান ও মরিস যথাক্রমে ৪০ ও ৩৫ রান করে নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে নির্দ্ধারিত সময়ে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ২৫৫ রান উঠে। ব্র্যাডম্যান ১২৭ এবং মরিস ১০০ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

৪ঠা জানুয়ারী রবিবার খেলা বন্ধ ছিল। রবিবার রাত্রে বেশ বৃষ্টি হয়। তার ফলে সোমবারে উইকেটের অবস্থা ভাল ছিল না। ভিজা উইকেটে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অসুবিধার কথা সম্যক উপলব্ধি করেই ব্র্যাডম্যান শনিবারের ৪ উইকেটের ২৫৫ রানের উপর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা ডিক্লেয়ার্ড করলেন। ফলে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের ১২৫ রান উঠে। দ্বিতীয় ইনিংস দুঘণ্টা কাল স্থায়ী ছিল। ভারতীয় দল ২৩৩ রানে পরাজিত হয়। এই খেলায় ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের অনেকগুলি ত্রুটি দেখা গিয়েছিল। শনিবার অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসে একাধিক ক্যাচ তারা নষ্ট না করলে এবং শনিবার সকাল দিকেই উইকেটের শোচনীয় অবস্থা দেখে ভারতীয় দল তাদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলে খেলায় সমতা রক্ষা করা যেত। এসব ত্রুটি ছাড়া ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্য যে তাদের তিনটি টেষ্ট ম্যাচেই নরম উইকেট এবং অনভ্যস্ত আবহাওয়ার মধ্যে খেলতে হয়েছে, ফলে তারা স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্যে প্রদর্শনের সুযোগ পায় নি। অপরদিকে নরম উইকেট এবং অভ্যস্ত আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দল তাদের স্পিন বোলার দিয়ে ভারতীয় দলের বিপর্য্যয় ঘটাতে পেরেছে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৩য় খণ্ড)—৪৲

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "থামাও রক্তপাত"—২৲

শ্রীবরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "জীবনের বসন্ত"—২৸৹

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "পথ নির্দ্দেশ"—১৷৹

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সামনে চড়াই"—৩৲

শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "হেথা নয়"—২৷৹

শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "উত্তর পুরুষ"—৩৲

নিশিকান্ত বসু প্রণীত "ত্রিরাহিম"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়," শুধাইল নারী,
সন্ন্যাসী কয়, "আজি রজনীতে হয়নি সময়, এসেছি বাসবদত্তা।"

ফাল্গুন—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

আধুনিক বিশ্ব ও মনুষ্য

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

আধুনিক বিশ্বও অসুস্থ, মনুষ্যও অসুস্থ। সম্প্রতি, পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ ক'রে এবং অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে, আজকের এই পৃথিবী ও মনে মনুষ্যজাতি উভয়েই অত্যন্ত অসুস্থ। আমি বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্ম মন নিয়ে পৃথিবীর অবস্থা বিচার করেছি এবং চিকিৎসকের চক্ষু দিয়ে মানুষকেও পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। কি আমাদের স্বদেশ ভারতবর্ষ, আর কি সেই বিশাল বিশ্ব, উভয়কেই আমি চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সূক্ষ্মতম অনুভূতি দিয়ে বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেয়েছি ব'লেই আমি অকুতোভয়ে ঐ কথা বলতে পেরেছি যে, আধুনিক বিশ্ব ও মনুষ্য উভয়েই অত্যন্ত অসুস্থ। কিছুদিন পূর্ব্বে নিউ-ইয়র্কের এক বিদ্বজ্জন সভায় এই কথা আমি বলেছিলুম।

মানুষের দেহের ভিতরকার কল কব্জা, উপাদান, রস, সাম্য ও অসাম্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমতা রক্ষা করতে পারে অর্থাৎ উপযুক্ত উপাদানগুলির সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের শরীর সুস্থ ও নিরোগ থাকে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সাম্যের অভাব ঘটে, রসের মাত্রাধিক্য অথবা মন্দা হয়, তখনই মানুষ রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানুষের দেহের সম্বন্ধে যে কথা, পৃথিবীর সম্বন্ধেও সেই কথা। সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের অভাব, অবনতি ও পতনের ফলে পৃথিবীর আজ এই দুরবস্থা। মানুষের সম্মুখে সমাজের উচ্চ আদর্শ আজ নেই; নীতির মহান অনুপ্রেরণাও দেখিনে। তবে মানুষ কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে? কোন্ মহৎ প্রেরণা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে?

অসুস্থ মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৈকল্য যেমন

স্বাভাবিক কারণেই ঘটেছে, পৃথিবীর বিপর্য্যয়ও তেমনই স্বাভাবিক কারণেই হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই চায় সুখী হতে; সন্তুষ্ট থাকতে; মানুষ মনের আনন্দে জীবন উপভোগ করতে চায়। তারই জন্ম জ্ঞানের প্রসার ও সেইজন্যই বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি। একথা স্বীকার করতে হয় যে, জ্ঞান যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানেরও অপরিসীম উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিজয় অভিযান, সেই উদ্দেশ্য কি সিদ্ধ হয়েছে? মানুষ কি সুখী হয়েছে? মানুষ কি পরিতোষ লাভ করেছে? আনন্দময় জীবন সম্ভোগ কি তার হয়েছে? এর উত্তরে 'না' বললে কি কিছুমাত্র অন্যায় হবে? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভিযানের সার্থকতার সাথে সাথে মানুষটির—ব্যক্তিটির উন্নতির—তার সামাজিক ও নৈতিক ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা কি করা হয়েছিল? জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভাবে মানুষের সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের স্পৃহাকে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা কি হয়েছিল? এ সকলের উত্তরেও যদি পুনরায় আমি 'না' বলি, তাহ'লে কি অন্যায় হবে? আমি ত দেখছি সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি ও ঔৎকর্ষের কথা বিশ্বের মানুষ সম্পূর্ণরূপেই বিস্মৃত হয়েছে। সামাজিক ও নৈতিক আদর্শচ্যুতি ঘটেছে বলেই বিশ্বময় আজ হিংসার তাণ্ডব দেখতে হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে "যে নদী মরুপথে হারাল ধারা"। গানের এই কলিটি থেকে কবি-কল্পিত দৃশ্যটি আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারি। কুলু কুলু ধ্বনি করতে করতে, তর তর বেগে ব'য়ে যেতে যেতে নদীটি মরুভূমির বালুরাশির মধ্যে হারিয়ে গেলো; ধারা শুকিয়ে গেলো—নদীটি নিশ্চিহ্ন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারাপ্রগতিরও আদর্শবিহীন বিশ্বের হিংসার অনলকুণ্ডের মধ্যে পড়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়েছে; অথবা হারিয়ে ফেলেছে। তারই ফলে যে-মানুষকে সুখী করা, যে-মানুষের পরিতোষ বিধান করা ও যে মানুষকে অনাবিল ও অবিরল আনন্দ দান করা ছিল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য, তা ভুলে গিয়ে, কত সহজে, কত অল্প আয়াসে ও কত অল্প সময়ে সেই মানুষের নিধন সম্ভব হতে পারে পৃথিবীময় তারই গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। এ্যাটম বম্বের তুলনা দেওয়া অসঙ্গত হবে না। প্রকৃতির অসীম ও দুর্দ্ধার শক্তি সূক্ষ্মতম অণুতে নিহিত ছিল, বৈজ্ঞানিকের সাধনায় তার ব্যবহার-বিধি আয়ত্ত হোল বটে, কিন্তু সেই প্রবল মহাশক্তি বিশ্বের কল্যাণে প্রযুক্ত না হয়ে হিরোশিমা নাগাসাকিতে নিমেষমধ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিধনে নিয়োজিত হোল সেই আণবিক আত্মাশক্তি!

নিরোগ দেহ ও সুস্থচিত্ত মানুষ অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে না। মানুষ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, ধীর, সংযত ও শান্ত। কিন্তু মানুষের সম্মুখে সামাজিক এবং নৈতিক উচ্চাদর্শের আলেখ্য ও মহৎ প্রেরণার আহ্বান না থাকায় এই অসুস্থ বিশ্বের মাঝে মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মানুষ তার পূর্ণায়তন ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের অবয়ব অক্ষুণ্ণ কিন্তু মানুষ নেই। পৃথিবীতে আজ গোষ্ঠি, দল ও প্রতিষ্ঠানই সব—এরাই বড়, এরাই সক্রিয়, এরাই মুখর—এদেরই প্রাধান্য—ব্যক্তিটি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে; অদৃশ্য হয়ে গেছে। ব্যক্তিটির ইচ্ছা অনিচ্ছা, রুচি অরুচি ও প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির কোন মূল্যই আজ নেই; ব্যক্তিটির অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বও যেন কোথাও নেই। অথচ বিশ্বময় কলরব, পৃথিবীময় কোলাহল—মানুষটির মঙ্গল বিধানই কাম্য—মানুষটিকে সুখী করবার জন্যেই সকলে ব্যস্ত এবং সর্ব্বত্রই বিপুল আয়োজন। যেখানে গণতন্ত্রের (democracy) প্রচলন সেখানেও এই কথা; যেখানে একনায়কত্ব (dictatorship) প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও এই কথা—মানুষটির কল্যাণ সাধনই লক্ষ্য। পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে যে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেলো, মানুষকে সুখী, সুস্থ, উন্নত ও স্বাধীন করাই ছিল নাকি উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য কতখানি সাধিত হয়েছে, তা বোধ করি বলবার আর দরকার নেই।

মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত মানুষের উন্নতির সহজ ব্যাখ্যা করেছেন। গান্ধীজী বলেছেন, মানুষের অন্তর পরিতৃপ্ত হলেই বুঝতে হবে, উন্নতি সাধিত হয়েছে; আপনার মধ্যে যে সম্পূর্ণ, সেই স্বাধীন। যে দেশের মানুষ সেই সাধনায় সিদ্ধ হতে পেরেছে সেই দেশই স্বাধীন। এই কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করলে আমরা কি দেখি? মহাত্মার ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, মানুষ তার সন্ধানী আঁলোটি অন্তরের দিকে ফেলে দেখুক। আত্ম বিশ্লেষণ করুক।

বিশ্বময় আজ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। মানুষটির সামাজিক উন্নতির কথা কোথাও শুনি না; মানুষটির নৈতিক পূর্ণ

বিকাশের কোন আয়োজনই কোথাও হচ্ছে বলে শুনি না ; কিন্তু মানুষকে বাদ দিয়ে, "মানুষটিকে" সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির কি সমারোহই না হচ্ছে। মানুষটি নিজে "কি," তা জানবার চেষ্টা কি কোথাও আছে ? না। আমার মনে হয়, মানুষের কি "আছে", সকলে সেই চিন্তায়ই বিভোর। "মহাত্মা গান্ধী কি," সে কথা ক'জন লোক চিন্তা করেন ? গান্ধীর কি প্রতাপ! এই ভেবেই মানুষ তন্ময়। এ কি সুস্থতার লক্ষণ ?

হিংসাকে প্রবলতর হিংসার দ্বারা পরাভব করবার প্রচণ্ড আগ্রহই আজ বিশ্বকে গ্রাস করেছে, কিন্তু তার পরিণাম কি এবং কোথায় তার শেষ পরিণতি, পাশ্চাত্যের প্রতিভা ও মনীষা সে চিন্তা আদৌ করছেন কি-না, সার্দ্ধবিশ্ব ভ্রমণ ক'রে, শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ও প্রতিভাবান মনীষীদের সঙ্গে আলাপ করেও দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করছি, আমি তা বুঝতে পারি নি। আমেরিকায় অনুষ্ঠিত "বিশ্ববিধান-ভবন" ইংরাজীতে যার নাম 'উনো' অথবা 'ইউনাইটেড নেসন্স অর্গ্যানাইজেসন', তার আলোচনার গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন ক'রেও আমি ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। পৃথিবীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করবার জন্যই যার সৃষ্টি, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের বিলোপ ঘটাতে যার জন্ম, বিশ্বের সকল জাতিকে সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে বদ্ধ করবার জন্যই যার প্রতিষ্ঠা, সেই "শান্তি সদন" থেকেই ঘন ঘন রণ-হুঙ্কার ঝঙ্কৃত হতে শোনা যাচ্ছে। জাতি বিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ, পরস্পরে সন্দেহ ও অবিশ্বাস 'উনো'কে সর্ব্বগ্রাস ক'রে ফেলেছে বললেও বোধ হয় অন্যায় হবে না। এ্যাটমের অধিকার ও ব্যবহার সম্পর্কে যে রেষারেষি পৃথিবীতে চলেছে, তাই থেকেই কি আমার উক্তি সমর্থন পাচ্ছে না ? সুখের কথাও বটে—দুঃখের বিষয়ও বটে, এই পঙ্কিল আবর্ত্তে, হিংসার ঝঞ্ঝাবর্ত্তে মানুষটির—যাকে আমি individual man বলেছি, তার কোন হাত নেই ; বুঝি এ সবে তার চিহ্ন টুকুও নেই। গোষ্ঠি, দল ও প্রতিষ্ঠানেরই প্রাদুর্ভাব ; অসুখের সৃষ্টি তাঁদের দ্বারাই হয়েছে। মানুষটি উপেক্ষিত ; মানুষটির থাকা ও না থাকা যেন সমান!

প্রাচ্যে এর প্রতিকারের উপায় আছে। মুক্তির পথ প্রাচ্যই দেখাতে পারে। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, ভারতবর্ষীয় বুদ্ধদেব জরামরণশীল জগতে মানুষটির সুখ, সন্তুষ্টি ও আনন্দের পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন। মিথ্যার দ্বারা মিথ্যার উচ্ছেদ হয় না ; পাপের দ্বারা পাপের বিনাশ সম্ভব নয়, যুগে যুগে ভারতই সে কথা বলেছে। এই ভারত বলেছে, পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নয়। এই ভারত শতাব্দীতে শতাব্দীতে এই শিক্ষাই দিয়েছে, সত্যের সন্ধান করবার অধিকার মহাপাপীরও আছে। পাপের ক্ষতে লবণ প্রয়োগ ও পাপীর কঠোর শাস্তি বিধানই শ্রেষ্ঠ অনুশাসন নয়। মানুষের আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ করাকেই মহাত্মা গান্ধী ব্যাধি নিরাময়ের প্রকৃষ্ট পন্থা ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। মানুষ যে মুহূর্ত্তে আত্মোপলব্ধি করবে, গোষ্ঠি, দল বা প্রতিষ্ঠান যত শক্তিশালীই হোক্ না কেন, হিতাহিত, শুভাশুভ, ন্যায়ান্যায় নির্ব্বিচারে মানুষ আর তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। মহাত্মা গান্ধী তাঁর দেশের সম্মুখে সামাজিক ও নৈতিক উচ্চাদর্শ ও মহৎ প্রেরণা উঁচু ক'রে ধরেছিলেন। অহিংসা ও সত্যের সাহায্যেই তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। বিশ্বজগত বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে সেই অভিনব যুদ্ধ লক্ষ্য করেছিলো। মহাত্মাজী সেই অদ্ভুত সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন ; পৃথিবী তা'ও লক্ষ্য করে নি কি ? তথাপি মহাত্মাজীর কর্ম্মসূচীর বৈশিষ্ট্য এই ছিল, তিনি মানুষটিকেই তাঁর অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। মানুষটিকেই সত্য ও অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে শুধু যে অভিনব যুদ্ধই পরিচালিত করেছিলেন তাই নয়, মানুষটির সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের এই পার্থক্য আরও কতকাল পৃথিবীর অজ্ঞাত থাকবে ?

আমাদের মাতৃভূমি, জন্মভূমি ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত ; পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন এবং আমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশও দ্বিধা বিভক্ত। এতে সকলেই দুঃখিত ; সকলেই একে ভীষণ দুর্দ্দৈব ব'লে মনে করছেন। কিন্তু এই বিভাগ যত বড় দুঃখজনক ঘটনাই হোক না কেন, আমি অন্ততঃ এর জন্য দুঃখ না করতেই পরামর্শ দোব। আমার নিজ প্রদেশ বাঙলা বিভাগের মূল কারণ বিশ্লেষণ ক'রেই আমি বলবো, দুঃখিত ও হতাশ হবার কোন কারণ নেই। মিথ্যা মোহের ঘোরে যার সৃষ্টি, মিথ্যা মোহের অবসানে তার ধ্বংসও অনিবার্য্য। ঐতিহাসিক কারণেই দেশ ভাগ

হয়েছে; আবার একদিন ইতিহাসের প্রয়োজনেই বিভাগের প্রাচীর ভেঙে যাবে। আমার তাতে কণামাত্র সংশয়ও নেই।

মুসলমান একদিন রাজা ছিলেন এবং এ দেশের ওপর প্রভুত্ব করতেন, এটা ইতিহাস। ইংরেজের আগমনে সেই প্রভুত্ব লোপ পেয়েছিল, এও ইতিহাস। ইংরেজের প্রথম আমলে হিন্দুরাই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক সুখ সম্ভোগ করায়ত্ত করেছিল; অনগ্রসর মুসলমান সকল রকমে পিছনে পড়ে গিয়েছিল। হিন্দুর ক্রমোন্নতিতে, রাজদ্বারে মান মর্য্যাদায় ও প্রতিপত্তিতে মুসলমানের চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। কালক্রমে মুসলমানের মনে ক্ষোভ জন্মেছিল যে হিন্দু তার অগ্রগতি ও উন্নতির পথে বিষম বাধা, গুরুতর অন্তরায়। ১৯৩৭ সালের পর আইন সভায় সংখ্যাতত্ত্বের সুবিধা পাওয়ার পর থেকে মুসলমান তার পথের 'কণ্টক' দূর করবার জন্যে সকল উপায় অবলম্বনে প্রাণপণ যত্ন সুরু করে দিয়েছিলো। যে যে প্রদেশে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মুসলমানের হাতে এসেছিল, সেখানে যেন তেন প্রকারেণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় তারা সজ্ঘবদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো। মুসলমান শাসক জাতি, সুতরাং শাসন করবার, প্রাধান্য করবার, প্রভুত্ব করবার একমাত্র অধিকার তারই, এই মিথ্যা মোহ মুসলমানকে দুর্ব্বার ক'রে তুললো।

হিন্দুর পক্ষে এটা মেনে নেওয়া খুব সহজ ছিল না। শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল বিষয়েই উন্নত হওয়া সত্ত্বেও শাসক শক্তির চাপে ক্রমশঃই তাকে স্থানচ্যুত হ'তে হয়েছিল। শাসন ক্ষমতা মুস্লিম লীগের কবলিত। লীগের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্ব্বতোভাবে মুসলমানের প্রভাব বিস্তারের ফলে,হিন্দুর উন্নতির সমস্ত পথ রুদ্ধ হ'তে দেখে হিন্দুও অন্তরে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। মুসলমানের প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপ, হিন্দু সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। বাধা দেবার শক্তি হিন্দুর হাতে নেই, কারণ বঙ্গদেশের রাষ্ট্রশক্তি লীগের হাতে। অসহায় বোধে হিন্দু নিঃশব্দ আর্ত্তনাদ করতে লাগলো। এই নীরব আর্ত্তনাদও মুসলমান প্রীতির চক্ষুতে সুনজরে বা ভাল মনে নিতে পারে নি। তারও সন্দেহ, তার উন্নতিতে হিন্দুর গাত্রদাহ। হিন্দুর প্রতি কার্য্যে মুসলমানের সন্দেহ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। উভয়পক্ষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস, হিংসা প্রবল বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত মহামারীর বীভৎস আকার ধারণ করেছিল।

একদিকে শাসক-সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমান প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে, অন্যদিকে হিন্দু তার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে প্রাণপণ আগ্রহে মুসলিম লীগকে বাধা দিতে চেষ্টা ক'রে হতাশ হচ্ছে—হতাশার পর হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্‌ছে—এ রকম অবস্থার মধ্যে দেশ বিভাগ হওয়া ছাড়া অন্য কি উপায়ই বা ছিল? দেশব্যাপী অশুভের মধ্যে ঐটুকুই বোধ হয় শুভ ব'লে মেনে নিতে পারা যায়। প্রলয় ও ধ্বংসের কবল থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পন্থা ব'লে স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না।

তবে তা'ও বলি, এই বিভাগকে আমি সাময়িক ও অস্থায়ী বিভাগ বলেই মনে করি। একটি দেশের মধ্যে এই যে অস্বাভাবিক ভাগ, প্রকৃতি যাদের মধ্যে কোন ভেদ রেখা টানেন নি, একটা পাহাড় নেই, একটা বড় নদনদীও নেই, যাদের ভাষা এক, খাদ্য এক, অসন-বসন অভ্যাস স্বভাব সমস্তই এক, তাদের মধ্যে এই বিভাগ, দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। মুসলমান তার নিজ স্বাধীন রাষ্ট্রে স্বেচ্ছামত, নিরঙ্কুশ আত্ম সম্প্রসারণ করুক, আত্মোন্নতি হোক্, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিপূর্ণতা লাভ করুক এবং প্রত্যেকটি মুসলমানের আত্মোপলব্ধি হোক্, পুনর্মিলনের প্রেরণা তার আত্মা—সেই ব্যক্তিগত মানুষটিকেই উদ্বুদ্ধ করবে, এতে আমার একটুও সংশয় নেই। একে আমি অবধারিত ব'লে মনে করি।

এ কথা হিন্দুর সম্বন্ধেও বলতে পারা যায়। হিন্দু তার নিজস্ব রাষ্ট্রে, মুসলমানের প্রভাবমুক্ত হ'য়ে, বাধাহীন বিঘ্নবিহীন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশের যে সুযোগ পেয়েছে, তাতে তার সীমারেখায় উপস্থিত হ'য়ে হিন্দুও যে পুনর্মিলনে আগ্রহান্বিত হবে, এতেও আমার সন্দেহ নেই। আত্মোপলব্ধি ঘটবামাত্র এই মিলন অনিবার্য্য।

যখন একের প্রতি অন্যের সন্দেহের অবসর থাকবে না, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত বা আচ্ছন্ন হবারও আর আশঙ্কা থাকবে না, একে অপরের উন্নতির হন্তারক নয় এই বোধ প্রত্যেকটি মানুষের, সেই ব্যক্তিটির অন্তরে যেদিন জাগ্রত হবে, সেদিন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে, সম্মান করতে পারবে এবং সেদিন মিলনও অবশ্যম্ভাবী হবে। পৃথিবীর সম্বন্ধেও

এই কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়। আত্মোপলব্ধির ফলে, আজকের এই অবহেলিত অবজ্ঞাত অথবা সুপ্ত মানুষটি যেদিন জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে পারবে, সেইদিনই পৃথিবী থেকে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনা দূর হ'বে এবং বহুধা বিস্তারিত বিপুল বিশ্বও এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক সংসারের রূপ ধারণ করবে। আধুনিক বিশ্বে মানুষই আগ্রহভরে বিশ্ব-সংসার রচনা করবে।

মহাত্মা গান্ধী আদর্শহীন আধুনিক ও বিপর্য্যস্ত বিশ্বে বিভ্রান্ত মানুষের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ব্যক্তিগত মানুষটির উন্নতি ও বিকাশের পথকেই তিনি বিশ্বের উন্নতি ও চিরস্থায়ী শান্তির পথ ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। তাই, ভারতের প্রাচীন কবির মত মহাত্মার কণ্ঠেও বিশ্ব অবিরত শুনছে—

"শুনহে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

শুধু একটী শাড়ির আঁচল

শ্রীনরেন্দ্র দে

দুপুরের আগেই সব গোছগাছ হয়ে গেল। কুলিটাকে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢোকার সময় সুধীরের চোখে পড়লো একফালি অপস্রিয়মান শাড়ি। মেয়েটা এতক্ষণ কৌতূহলে নবাগতদের দিকে লক্ষ্য করছিল, সুধীরকে আসতে দেখে ছুটে পালিয়ে গেল ওপাশে।

ছোট দুখানি ঘর, অল্প বারান্দা, এতটুকু রান্নাঘর—দুটী প্রাণীর পক্ষে পর্যাপ্ত। অন্তত পূর্বের চেয়ে ঢের ভালো। নোতুন ভাড়াটা বাদ দিলে মাইনেটা অল্পই দাঁড়ায়, তবু আগের সেই অন্ধকার ছাদ-নীচু পায়রার খোপের চাইতে এ যেন স্বর্গ। লাবণ্য এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

আগের বাড়ীটায় ছিল অসংখ্য ভাড়াটে এবং অসহ্য কলরব। জলের জায়গাটী নিয়ে প্রত্যহ গোলমাল করা লোকগুলির অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লাবণ্য কোনো দিনই তাদের সংগে পেরে উঠতো না এবং সকালের সেই ছোট্ট তুচ্ছ কলহ সমস্ত দিনের মত তার মনটাকে বিরস করে রাখতো। নোতুন এ বাড়াটায় ওদের নিয়ে মাত্র দুঘর ভাড়াটে, লাবণ্য এরি মধ্যে দেখে নিয়েছে ওদিককার ভাড়াটেরা সম্ভ্রান্তই, সুতরাং নিরিবিলি বাস করা চলতে পারে।

বাড়ীর সামনেই পার্ক। বিকালে সুধীর পার্কে বেড়ানোর বিলাসিতা দমন করতে পারলো না। দুপুর থেকেই পার্কটা তাকে বিস্ময়করভাবে আকর্ষণ করছিল, সুধীরের অদ্ভুত বোধ হয়। এর আগে কত সে পার্কে বেড়িয়েছে, চিনেবাদাম চিবুতে চিবুতে সংগীদের সাথে কত গল্প করেছে, কিন্তু আজকের পার্ক তার কাছে একটা রোমান্স, একটা মুক্তির আনন্দ, অসহ্য অন্ধকার থেকে যেন প্রশান্ত সূর্যের আলো। বারে বারে তার মনে পড়ছিল ছুটে পালিয়ে যাওয়া শাড়ির একটুকরো আঁচল।

সন্ধ্যের পর এসে ঘরে ঢুকলো সে। লাবণ্য চা করে ফেলেছে স্টোভে। ওকে দিয়ে সেও এক পেয়ালা নিল। চা খেতে খেতে লাবণ্য বল্ল, ওদের সাথে আলাপ হোলো!

কথাটা শুনে সুধীর কি বলে জানবার আগ্রহে চুপ করে রইলো সে। সুধীর শুধু বল্ল, সুখবর। তোমার দিন কাটবে ভালো।

লাবণ্য বল্ল, ভালো লোক বলেই মনে হোলো ওদের। কর্তা-গিন্নী, ছেলে-বউ, আর আইবুড়ো মেয়ে অনুরাধা। মেয়েটা নাকি আই-এ পর্যন্ত পড়েছে। ছাখো, আমি বলেছি ওকে তোমার একটী বই দেবো, দিও একটা—

সুধীর জবাব দিল, বই কিনে পড়ে নিতে বলো। বিলোবার জন্তে বই লেখা হয় না।

—তা হোক, লাবণ্য ঝংকার দিয়ে উঠলো, কত বই তোমার বন্ধুরা নিয়ে যায়, আমি একটা চেয়েছি বলে খুব গায়ে লাগছে, ভারী স্বার্থপর তুমি!

পরের দিন লাবণ্য একখানি বই অনুরাধাকে উপহার দেয়। সুধীরের সম্মতির অপেক্ষা না করেই। সুধীর জানতে পেরে কিছু বলে না, কিন্তু বোঝা যায় সে অখুসি হয় নি। পরিচয়টা অন্তত প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ওদের কাছে।

এই নিয়েই ওবাড়ীর কর্তার সংগে তার আলাপ। ভদ্রলোক বার্ধক্যে এসে পৌচেছেন, বসে বসে পেন্সন ভোগ করছেন। ছেলে চাকরী করে—তার উপার্জনটাই প্রধান ভরসা। সকাল বেলা বাজারটা কর্তাই করে আনেন, যে বাতিকটা অনেক বুড়োরই থাকে। দরজার কাছে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুধীরের সংগে। দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, অসুবিধে কিছু হচ্ছে না তো?

নিছক আলাপ জমাবার প্রচেষ্টা। লোকটার তরফ থেকে প্রথম জিজ্ঞাসা পেয়ে সুধীর অবাক হোলো একটু, খুশিও হোলো। বল্ল, না, মন্দ কি?

—মন্দ কিছুই নয়, আমরা আছি আজ বিশ বচ্ছর এখানে এই বাড়ীতে। কত লোক এলো গ্যালো—আমরাও চাইছিলুম তোমাদের মত নির্ঝঞ্ঝাট লোক আসুক, তা ভালোই হোলো, কি বলো?

সুধীর বল্ল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আর কি বলবে ভেবে পেলো না সে।

—তুমি বুঝি বই লিখেছো, দেখছিলাম, বেশ বেশ—

সুধীরের অস্বস্তি দেখে তিনি আর আটক রাখলেন না ওকে। এগিয়ে গেলেন ভেতরের দিকে।

খাবার সময় লাবণ্য ওদের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনা খুঁজে পেল না। তোমার বই দেখে ওরা সুখ্যাতি করছিল, জানো? বই পড়ার চর্চাটা ওদের আছে, লাইব্রেরী থেকে কর্তার জন্যে বই আসে। অনুরাধাও নাকি খুব বই পড়ে।

সুধীর জিজ্ঞাসা করলো, অনুরাধার সংগে বুঝি তোমার খুব ভাব হয়েছে?

লাবণ্য বল্ল, হ্যাঁ,' বেশ মেয়েটা, খুব মিশুক। ওর বউদিটার একটু গুমোর যেন, রংটা কটা কিনা—

সুধীর বল্লে, বউদির কথা থাক, আমার বই সম্বন্ধে কি বল্লে ওরা?

—এমনি নাড়াচাড়া করতে করতে ভালো বলছিল, কর্তা আজ পড়বে।

কর্তা! সুধীর চুপ করে রইলো, অনুরাধা বইটা দেখে কি বলেছে জানবার উদগ্র কামনাকে কিছুতেই সে প্রকাশ করতে পারলো না, লাবণ্য হয় তো অন্যভাবে নেবে।

লাবণ্য নিজেই বল্ল সেকথা। অনুরাধা বলছিলো—গল্পটা নাকি সেই পুরোণো চিরন্তনী।

সুধীরের মুখটা নিমেষে ম্লান হয়ে এলো। সে ভাবছিল অনুরাধা হয়তো তার উপন্যাসের গল্পের প্রশংসা করবে, তার ভাষা ওকে মুগ্ধ করবে, তার বলার ভংগীতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে আই-এ পড়া অনুরাধার মতামতের মূল্য তার কাছে অনেকখানি হয়ে উঠেছে সুধীর তা বুঝতে পারে না। অনুরাধার অভিমত শুনে সুধীর অত্যন্ত আহত বোধ করতে লাগলো, সকালে বুড়ো কর্তা তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা কয়েছিলেন, সুধীরের মনে হতে লাগলো সেগুলি মূল্যহীন, শূন্যগর্ভ।

অনুরাধাকে সে চোখে দেখে নি, তবু সেই শাড়ির চঞ্চল টুকরোর মধ্যে সুধীরের কাছে সে উচ্চারিত হয়ে আছে। লাবণ্যর কথা থেকে অনুরাধাকে সে নিজে রচনা করে নিয়েছে, অনুরাধা যেন প্রথম বসন্ত দিনের উৎফুল্ল হাওয়া, এই বাড়ীটার সবটুকু আয়তনে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই প্রথম পদার্পণের পর থেকে তার চেতনার মর্মমূলে যে দোলা তাকে সমস্তক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আজ সারাদিন অনুরাধার ওই একটা অভিমত তাকে তেমনি আহত করতে লাগলো। সুধীরের মনে হতে লাগলো—তার সবটুকু সাফল্য যেন ওরই ওপর নির্ভর করছে।

বিকালে চুপ করে বসেছিল সুধীর। লাবণ্য অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে বেড়াতে গেছে। একটু পরেই সে এলো, হাতে তার একটা মাসিক পত্রিকা। লাবণ্য বল্ল, অনুরাধার পদ্য বেরিয়েছে এখানে, এই ছাখো।

সুধীরের হাতে পত্রিকাটা দিল লাবণ্য। সুধীর দেখলো—অনুরাধার নামে একটা কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সুধীর দেখলো অনুরাধা শুধু শিক্ষিতা নয়, রসিকাও। সুধীরের মনের কোণে অনুরাধার কবিতা সাড়া জাগালো। কিন্তু তা ক্ষণেকের জন্যই। তার কেবলি মনে হতে লাগলো, অনুরাধা তার উপন্যাসের প্রশংসা করে নি।

লাবণ্য বল্লে, তোমাকে পড়তে দিয়েছে, মতামত চায়

সুধীর নিস্পৃহ স্বরে বল্লে, এমন কি ভালো, আধুনিকদের অনুকরণটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

—তাই হবে, লাবণ্য উৎসাহভরে বল্ল—তোমার বই সম্বন্ধে কি বলেছে জানো?

সুধীরের উৎসুক দৃষ্টির জবাব দিয়ে লাবণ্য বলতে লাগলো, বইটা সব পড়েছে ও। বল্লে, প্লটটা খুব উচু, আদর্শটা মহান, আরো কি ইংরাজীতে বল্লে বুঝতে পারলাম না বাপু। হ্যাঁগা, অনুরাধার পত্র ভালো হয় নি?

সুধীর ঢোঁক গিলে জবাব দিল, মন্দ নয়, কয়েক জায়গায় বেশ চমৎকারই।

সুধীরের হাত থেকে পত্রিকাটী নিয়ে লাবণ্য চলে গেল। সময় অনেকটা এগিয়ে গেছে। পশ্চিম দিকের আকাশ দিয়ে গোধূলির রং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, ওই রং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো আকাশের বুকে, মুহূর্তের মনে, আর সুধীরের ছোট্ট ফ্ল্যাটের কোণে কোণে। ওই রং-এর নেশা তাকে পাগল করে তুল্লো, খাতা-কলম নিয়ে লিখতে বসলো সে। তার দ্বিতীয় উপন্যাসের শেষের অধ্যায়গুলো আজ শেষ করে ফেলতে হবে।

লাবণ্য সুইচ টিপে আলো জ্বালালো। রাঁধতে শুরু করলো, রান্নার শেষে ডাকলো, খাবে না?

আরো কিছুক্ষণ লেখার পর সুধীর খেয়ে নিল। আহারের পর আর সে লেখে না—তখন তার অধ্যয়নের অবকাশ। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে পড়ে। লাবণ্য পাঠরত সুধীরের মুখের পানে বহুক্ষণ ক্লান্তভাবে চেয়ে থাকার পর ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ অনুরাধাদের ওদিক থেকে একটা অস্পষ্ট গোলমাল ভেসে এলো। সুধীর শুনতে পেলো—কে যেন স্খলিত কণ্ঠে চেঁচাচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই পাওয়া গেল চাপা কান্নার শব্দ। তাড়াতাড়ি সে লাবণ্যকে জাগিয়ে দিল। লাবণ্য বল্লে, কর্তার ছেলে মদ খেয়ে বৌকে মারছে।

লাবণ্য আজই বিকালে অনুরাধার কাছে শুনেছিল তার দাদা মত্তপ। অনুরাধা কথাটা ওকে জানিয়ে দিয়েছিল, কারণ সে জানতো ওটা গোপন থাকবে না। একদিন না একদিন—যেদিন দাদা মাতাল হয়ে বাড়ী ঢুকবে সেদিন ওরা জানতে পারবে। কথাটা লাবণ্য সুধীরকে জানায় নি তখন। সুধীরের ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হতে থাকলো, মন্থর একটানা কান্নাটা রাত্রির নিঃশব্দ প্রহরে তাকে অত্যন্ত জ্বালা দিতে লাগলো। এক সময় সে অধীর হয়ে বল্ল, যাই ওদের ওখানে।

গমনোদ্যত সুধীরকে বাধা দিয়ে বিরক্ত লাবণ্য বল্লে, তুমি যাবে কি করতে? ওসব ওদের গা-সহা—কর্তা গিন্নী এখন ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে।

কিন্তু ব্যাপারটা ওদের অভ্যাসমত ওখানেই শেষ হোলো না, শোনা গেল অনুরাধার দাদার চাকরীটা গেছে। সমস্ত সপ্তাহ ধরে দিনরাত চেঁচামেচি চলতেই থাকলো অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে। তার দাদার মাতলামি ও বউ ঠ্যাঙানোর পুনরাবৃত্তি, তার চাকরীহীন জীবনের চূড়ান্ত অসভ্যতা, ভবিষ্যৎ দিনগুলির সম্পর্কে দুঃসহ শূন্যতা, কর্তা-গিন্নীর অসহায় ভাব—সব মিলিয়ে অনুরাধাদের পরিবারের জীবনেতিহাসের এক জটিল পরিক্রমা শুরু হয়ে গেল। অনুরাধাদের ফ্ল্যাটে এ কদিন খুব কমই গেল লাবণ্য, কারণ বর্তমানে ওখানে যাওয়ার মানে ওদের দুঃখজনক পালা-অভিনয়ের নির্বাক দর্শকের অংশ গ্রহণ করা, যেটা কিছুদিনের সৌহার্দ্য-সম্পর্কের ফলেই দু পক্ষেরই অসহনীয়।

দুপুরে যে সময়টাতে তারা একদিন এ বাড়ীতে এসেছিল, কোনো একদিন ঠিক সেই সময়ে বিগত-মর্যাদা স্বল্প-পুঁজি পেন্সন-সম্বল ঘোষাল পরিবার দুর্মূল্য ফ্ল্যাট খালি করে দিয়ে চলে গেল। লাবণ্য নীচে নেমে এসেছিল শেষ দেখা করতে, সুধীর একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়েছিল ওদের দিকে। অনেকক্ষণ অবধি, যখন ওদের গাড়ী দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তার মনের মধ্যে অনুরাধার শাড়ির অপ-স্রিয়মান আঁচলটী ঝলমল করতে লাগলো মধ্যগগনের সূর্য্য-লোকের মত।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৮

প্রদোষে প্রজ্ঞা ও আমি সংঘারামে উপনীত হইলাম। তখন আরত্রিক অনুষ্ঠান শেষ হইয়া ধর্ম্মকথন আরম্ভ হইয়াছে। অর্হতপাদ আর্য্য মহাস্থবির তখন সমবেত শ্রমণ, ভিক্ষু, গহপতি(১), উপাসক ও উপাসিকা-গণকে ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের উচ্চারিত অরিয় সচ্চা(২) ও উদান(৩) ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা একান্তে বসিয়া অর্হতপাদের মুখনিসৃত ধর্ম্মোপদেশ বা বৌদ্ধধর্ম্মের সারমর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিতে লাগিলাম। দান, শীল, চর্য্যা ও বিনয় সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম ; আর পরিশেষে, ধর্ম্মকথনের উপসংহার শুনিলাম, ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের করুণার কথা। যে করুণা নির্ঝরের বিগলিত ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া তাহার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও তন্‌হা(৪)র কঠিনোপল তটভূমি ভঙ্গ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়াছে—সেই করুণার কথা ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমার তখন প্রাণের মধ্যে একটা বিক্ষোভ উপস্থিত হইল।—আমাদের ত্রাণসংঘের উদ্দেশ্য যতই মহৎ বলিয়া আমরা জ্ঞান করিনা কেন, ক্ষমা ও করুণা তাহা হইতে অনেক উচ্চে।—আমাদের কর্ম্মপন্থা হিংসামূলক ও তন্‌হা নির্দ্দিষ্ট এবং নিব্বানের(৫) পথ হইতে বহুদূর বিসর্পিত। একটা ক্ষণিক চাঞ্চল্য আমাকে অভিভূত করিল। আমাদের কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্যের হীনতার উপলব্ধি যেন নিমেষের জন্য আমার প্রাণের গাঢ় অন্ধকারে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের উপলব্ধিমাত্র। তখন একবার মনে হইল যে, সব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পীতবাস ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিয়া পবজ্জা(৬) অবলম্বন পরম শ্রেয়ঃ।—মনে হইল, আমিও এই সকল মিথ্যা ও বৃথা অনুষ্ঠান হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের অঙ্গুলী নির্দ্দেশের দিকে অগ্রসর হই! জীবনের ক্ষুদ্র ও হীন ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পাবক নির্ব্বাপিত হউক! সকল বেদনার অবসানের সঙ্গে তন্‌হার দাহ জ্বালা জুড়াইয়া যাউক! নিমেষের জন্য বর্ত্তমান জগতের অনুভূতি আমার মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইল—সংঘনির্দ্দিষ্ট আমাদের কর্ত্তব্য ক্ষণকালের জন্য ভুলিলাম। একটা অবসাদের ছায়া নিদাঘ গগনে ভাসমান বায়ুবিতাড়িত মেঘের মত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। আপনাকে ও জগৎকে, স্থান ও কাল বিস্মৃত হইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই সমবেত শ্রমণ, ভিক্ষু ও অপর উপাসক ও উপাসিকা মণ্ডলীর সহিত বলিয়া উঠিলাম "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি"।

ধর্ম্মশ্রবণান্তে যখন শ্রোতৃমণ্ডলী একে একে সকলে অর্হতপাদ মহাস্থবিরের পাদ বন্দনা পূর্ব্বক মণ্ডপ পরিত্যাগ করিল, আমি তখন ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদিগের এই বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা যে একটা অবদান, আপনার নির্ব্বাণ-মুক্তিকে দূর পরিহার করিয়া আর্ত্তের ত্রাণ সংসাধন যে মহান্ ও অনন্যসাধারণ ত্যাগধর্ম্ম, এবং তাহা যে মানবের ক্ষুদ্রত্বকে লুপ্ত করিয়া দিয়া তাহাকে একটা বিরাট মহত্বের দিকে নীত করে—সেই উপলব্ধি, যাহা ক্ষণিকের জন্য আমার প্রাণের মধ্যে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা পুনরায় সচেতন হইল।—হৃদয় মেঘমুক্ত হইল,—নিমেষের অবসাদ অপহৃত হইল,—আমার স্বনির্ব্বাচিত কর্ম্মপন্থা যে প্রকৃষ্ট,—আমার গৃহীত ব্রত পালন যে আমার জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম—সে বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহ রহিল না।

আর্য মহাস্থবির আমাদিগকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন। আমরা তাঁহার পাদবন্দনা করিলাম। এমন সময়ে শেখর, কীর্ত্তি-বর্দ্ধন্, সুকৃতি বর্দ্ধন্ ও পুষ্টপাল আসিল। আমরা মহাস্থবিরের সহিত চৈত্য গৃহের গর্ভাগারে গমন করিলাম। আমরা সকলে সেখানে উপবেশন করিলে আমি বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকল বিষয় বিশদভাবে সংঘের সম্মেলনে উপস্থাপিত করিলাম। মহাস্থবির স্থিরচিত্তে আমার সকল কথা শুনিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"আমাদের কার্য্য সাগ্রহে ও তৎপরতার সহিত আরম্ভ হইবার সময় যে আসিয়াছে তাহা আমিও উপলব্ধি করিতেছি। এখন কোন পথে এবং কি উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইব তাহার একটা

---

(১) গৃহপতি বা বৌদ্ধ গৃহস্থ—গহপতি। সংস্কৃত "গৃহপতি"র পালি প্রতিশব্দ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে বহুল-ব্যবহৃত।

(২) আর্য্য সত্যাঃ, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার বা মূল সত্য।

(৩) বুদ্ধের কথিত উপদেশ।

(৪) সংস্কৃত তৃষ্ণা অর্থাৎ কামনার।

(৫) বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী নির্ব্বাণ মোক্ষ। নির্ব্বাণের পালি প্রতিশব্দ নিব্বান।

(৬) বৌদ্ধ মতানুযায়ী সন্ন্যাস।

নির্দ্দেশ আবশ্যক। আমাদের কর্ম্মসূচনা কিরূপ হইবে তাহা তোমরা বিবেচনা কর।"

আমি বলিলাম, "এই সুদূর গন্ধারে থাকিয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতির সম্যক্ জ্ঞান হওয়া ও সর্ব্ববিষয়ে সংবাদ রাখা এবং তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান একপ্রকার অসম্ভব। এখন আমাদের মধ্যে সমধিক কর্ম্মকুশল কাহারও বাহ্লিকে কিংবা কপিষায় অবস্থানপূর্ব্বক আমাদের কার্য্য পদ্ধতির সকল দিক বিচার করিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।"

মহাস্থবির বলিলেন, "ত্রাণসংঘের কোনও কর্ম্মকুশল অধিনায়ক এই সময়ে বাহ্লিক অবস্থান পূর্ব্বক আমাদের গৃহীত ব্রত অনুষ্ঠানের পথে অনেকটা অগ্রসারিত করিতে পারিত।"

শেখর বলিল, "আমরা সেইরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি এবং এই সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়াছে।"

মহাস্থবির বলিলেন, "সে ত একপ্রকার স্থিরই হইয়া আছে, তাহার জন্য নূতন করিয়া পরামর্শ করিবার আবশ্যক আছে কি?—আমার ত তাহা মনে হয় না।—আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ব্বে তোমাদের কাহারও পুরুষপুর ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না, এইরূপ ত আমার মনে হয়।"

প্রজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিল, "আরও একটু সত্বর হইলে ভাল হয় না কি? ইতিমধ্যে আমাদের সংঘের কার্য্য কি কতকটা অগ্রসর হইতে পারিত না?"

মহাস্থবির বলিলেন, "হয়ত পারিত, কিন্তু আমার বিলম্ব করিতে বলার কারণ আছে। পুরুষপুর নগরে ক্ষত্রপপ্রমুখ সকল যাবনিক শাসক কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে সকলেই অযবন গন্ধারবাসীদিগকে অত্যন্ত সন্দেহের সহিত ও সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিতেছে। গন্ধারবাসীগণের কোনও কার্য্যই যাহাতে তাহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে তাহার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহা ত আমরা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি—পূর্ব্বেও তাহারা এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিল—এখন সে ব্যবস্থা একটু প্রাবল্যলাভ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু আমাদের সংঘও তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।"

মহাস্থবির বলিলেন, "যবনের চারগণ সমগ্র গন্ধার ছাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের আরও সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয় অনেকে যবনের চাররূপে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছে—বিপদ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে।"

সুকৃতি বর্দ্ধন ইহাতে বলিল, "ইহাত নূতন বিপৎপাত নহে, আর তজ্জন্য আমরাও ত যথেষ্ট সতর্কতার সহিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। একটা অনাগত ত্রাসের জন্য একটা ভবিষ্যৎ আতঙ্কের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ত্তমান সুযোগ উপেক্ষা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে।"

তদুত্তরে আর্য্য মহাস্থবির বলিলেন, "সুযোগ আসিয়াছে, সত্য,—এবং এ সুযোগ ক্ষণিক নহে। ইহা এখনও অনেকদিন থাকিবে। আমাদের বর্ত্তমান সতর্কতা যবনের কার্য্যতৎপরতার অনুপাতে যথেষ্ট কিনা তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর আমার সে সন্দেহের কারণও হয় ত নিতান্ত অমূলক নহে।"

আমি বলিলাম, "হয়ত, এ সুযোগ কিছুদিন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা যে অবস্থান্তরে ও ঘটনার সমাবেশে শীঘ্রই নষ্ট হইতে না পারে, তাহাও ত আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।—আমার মনে হয় যে আমরা কাল্পনিক আতঙ্ক ও সন্দেহের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিতেছি।"

মহাস্থবির বলিলেন, "না, ইহা কাল্পনিক আতঙ্ক নহে। অযবন গন্ধারবাসীর বিশেষতঃ পুরুষপুরবাসীদিগের—গতিবিধি ও কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক চারগণ নিযুক্ত হইয়াছে এবং নিযুক্ত চারগণ কেবল যবন নহে, তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের স্বদেশবাসীও আছে এবং আমাদের স্বদেশবাসী এই চারগণই সর্ব্বাপেক্ষা মন্ত্রভেদকুশল ও কর্ম্মতৎপর। তাহারা যে আমাদের দেশের অবস্থা ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং আমাদিগের বর্ত্তমান চিন্তাধারা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নহে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে—এবং সে কারণ একেবারে আনুমানিক বলা চলে না। হয় ত আমাদের সংঘের কর্ম্মানুষ্ঠান এই হীন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদিগের মধ্যে কাহারও শ্যেনদৃষ্টি ইতিপূর্ব্বেই আকর্ষণ করিয়া থাকিবে—কে জানে?"

পুষ্টপাল বলিল, "এতদিন ত্রাণসংঘ সাবধানে আপনার কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, বিশেষ বিপদে ত এপর্য্যন্ত পড়ে নাই—সেইরূপ সতর্কতার সহিত এখনও তাহার কার্য্যনির্ব্বাহ করা যাইতে পারে না কি?"

মহাস্থবির বলিলেন, "কিন্তু, এখন—হয়ত, ইতিমধ্যেই, আমাদের ত্রাণসংঘের ন্যায় একটা কোনও সংঘ সংগঠনের অনুমান কেহ কেহ করিয়াছে—এবং সেই অনুমানের ফল দুইজন চারের যবন-মধ্যে আবির্ভাব ও আমাদের বাহিনীর নায়কের অনুসরণ।"

শেখর বলিল, "তাহারাই কেবল আমাদের সংগঠন সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছিল এবং আমাদের দুই-একটা অসতর্ক ও অসম্বৃত কার্য্যে তাহাদের সন্দেহ প্রবুদ্ধ হইয়াছিল;—তাহাদের জীবনের সহিত তাহাদের তৈজসপত্র ও চিন্তাধারার চিহ্ন পর্য্যন্তও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—অন্ততঃ সে দিক হইতে আমরা আপাততঃ, একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারি না কি?"

মহাস্থবির বলিলেন, "কতকটা বটে,—সম্পূর্ণ নহে।—কে বলিতে পারে যে তাহাদের অভিযানে বাহির হইবার পূর্ব্বে তাহারা তাহাদের অনুমান ও অনুসন্ধানের বিষয় অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার অবসর পায় নাই?—কে জানে যে কোনও উপযুক্তত্র চার তাহাদের দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের উত্তরসাধকরূপে হত্যিত চারদ্বয়ের পন্থা অনুসরণ করিতেছে না?—কে জানে যে এখন—যে সময়ে

আমরা আপনাদিগকে সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত মনে করিতেছি—ঠিক এই সময়েই যে কেহ আমাদিগের উপর তাহার সুতীক্ষ দৃষ্টি রাখে নাই ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি কোনও অনির্দ্দিষ্ট সুদীর্ঘ কালের জন্ম আমাদের সংঘের কার্য্য স্থগিত রাখা সঙ্গত বলিয়া আপনার মনে হয় ?"

মহাস্থবির বলিলেন, "না আমি তাহা মনে করি না। তবে এত সন্দেহ ও বিপদের সম্ভাবনার মধ্যে এরূপ চিন্তাহীনভাবে তৎপর হইয়া কাজ নাই—আমি এইরূপ মনে করি। ইতি পূর্ব্বেই আমরা স্থির করিয়াছি যে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় আমাদের অভিযান আরম্ভ হইবে—তাহা পরিবর্ত্তন করিবার কোনও অভিনব কারণের উদ্ভব এ পর্য্যন্ত হয় নাই ত।"

আমরা সকলে মহাস্থবিরের কথা প্রণিধানপূর্ব্বক ক্ষণকাল মৌন রহিলাম।

মহাস্থবির আরও বলিলেন, "আমাদের অভিযান আরম্ভের সহিত আবশ্যক ও সুযোগ বুঝিয়া বিভিন্ন স্থানে আমাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপনে সচেষ্ট হইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে আমাদিগকে এখন হইতেই আয়োজন করিতে ও তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে না কি ? পথের আলেখ্য এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। কোন পথে যাইতে হইবে, কোথায় অবস্থান করিতে হইবে, সেই সকল স্থানীয় কোন কোন লোকের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে, আমাদিগকে প্রভাবিত করিয়া আমাদের ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপনের পথে অগ্রসারিত করিতে হইবে এবং তথায় আমাদের নায়কগণ কিরূপে মন্ত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার একটা আনুমানিক নির্দ্দেশেরও ত প্রয়োজন ? আমার মনে হয় এই সকল ব্যাপার আমরা যত সত্বর সম্পাদনে সক্ষম হইব, ততই আমরা আমাদের সঙ্কল্প ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে কতকটা আশান্বিত হইতে পারিব। এই সম্বন্ধে অন্ততঃ কয়েকটা সুনির্দ্দিষ্ট উপদেশের আদান-প্রদানের যে আবশ্যক তাহা আমরা অদ্য অনুভব করিতেছি।"

মহাস্থবির আমার সহিত একমত হইলেন ও এই সকল বিষয়ের একটা বিশদ ও বিস্তারিত সূচী প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, এই কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

মহাস্থবির ত্রাণসংঘের প্রচার ও প্রসারকল্পে যে সকল পথের আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন বা করিতেছেন সে সকল তিনি অদ্য সন্ধ্যার পরামর্শ সভায় উপস্থাপিত করিলেন। আর্য্যমহাস্থবির যে আমাদের সংঘের প্রাণ এবং সংঘের সাফল্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই সম্যক্ প্রণিধান করিলাম।

তিনি বলিলেন "এখনও পর্ব্বতের তুষাররাশি গলে নাই, স্থানে স্থানে তুহিন প্রপাতে সানুদেশ অবরুদ্ধ, গিরিপথ সমূহ এখনও অত্যন্ত দুর্গম ও কোনও কোনও স্থল মানবের অগম্য। সার্থবাহ-দিগের এখনও অভিযান আরম্ভ হয় নাই—তাহা আরম্ভ হইতে অনেক বিলম্ব আছে। বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহগণ বৈশাখী পূর্ণিমাই পবিত্র ও প্রশস্ত দিবস বলিয়া ঐদিন বাণিজ্যে বাহির হইবার জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া গমন করিলে পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইবে এবং তাহারা সুগম গিরিপথ ও পার্ব্বত্য সানুদেশ দিয়াই গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার পর বৈশাখী পূর্ণিমায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করিলে কেহ বিশেষ সন্দেহ করিবে না। তোমরা বৌদ্ধ শ্রেষ্ঠী—পুরুষানুক্রমে পণ্য সম্ভার লইয়া বিদেশে যাতায়াত করিতেছ।—গতবৎসর আর্য্য ধ্বজদত্ত ও আর্যপালক আসুর বাবিরুষে গিয়াছিলেন—প্রজ্ঞা, তুমিও তোমার পিতার সহিত ছিলে।—বোধ হয় চারগণ তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আর এখন তত কৌতূহলী হইবার কারণ পাইবে না।"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে, অদ্য এই সান্ধ্য সভায় যাত্রার সকল বিষয় স্থির হইয়া যাউক। অন্ততঃ বৈশাখী পূর্ণিমায় যাহারা বাহির হইবে তাহাদের যাত্রার সম্বন্ধে সকল বিষয় অদ্য স্থির হইয়া যাওয়া প্রয়োজন।"

"—তাহার ত অনেক বিলম্ব আছে। এখন অত ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। ইহার মধ্যে অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে যাহাতে আমাদের নির্দ্ধারিত ও নির্দ্দিষ্ট সাধনার পথে কোনও অভিনব বিঘ্নের উদ্ভবে হয়ত আমাদের বর্ত্তমান নির্দ্দেশের সমগ্র পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইবে। হয়ত সকল বাধাবিপত্তি নিরাকরণের জন্য আমাদিগকে কোনও এক নূতন পথ ধরিয়া চলিতে হইবে।—কে জানে ?"

অদ্য সন্ধ্যার পরামর্শ সভায় স্থির হইয়া গেল যে সর্ব্বপ্রথম প্রজ্ঞা ও আমি উভয়ে কপিশা হইয়া বাহ্লিকাভিমুখে অগ্রসর হইব। আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ মূল্যবান্ পণ্যসম্ভারও থাকিবে। পথে, কিংবা বাহ্লিকের পণ্যবীথিতে, ঐসকল পণ্যের বিক্রয় বা বিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা আর অগ্রসর না হইয়া বাহ্লিক নগরীতেই অবস্থান করিব এবং তথায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আমরা বাহ্লিক যবন নামগ্রহণ করিব ও যবন নামে পরিচিত থাকিব।

আমি বলিলাম, "আমরা পুরুষপুরবাসী। পুরুষপুরে যদি অনুসন্ধান হয় তাহা হইলে আমরা যে যবন নহি এবং আমাদের গৃহীত নাম যে সত্য নহে তাহা ত অনায়াসেই প্রমাণিত হইবে।"

মহাস্থবির বলিলেন, "অনুসন্ধান যাহাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করিয়া দিব। বাহ্লিক গন্ধার সাম্রাজ্যের মহামাত্য ষ্ট্রাটেগস গ্রীক্ বা যাবনিক শব্দ, ইহার অর্থ সেনাপতি বা রণনায়ক ; কিলোষ্ট্রাটস্ যবন হইলেও বৌদ্ধ ও আমার অত্যন্ত পরিচিত এবং আমাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। তাঁহার সহিত আমার সতত পত্র ব্যবহার হইয়া থাকে ; গতকল্য তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার বার্ত্তাবহ একখানি পত্র লইয়া আমার নিকট আসিয়াছে। ঐ পত্রের উত্তর লইয়া আগামীকল্য প্রেরিত ব্যক্তি বাহ্লিক প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে পুরুষপুর ত্যাগ করিবে। সে রাষ্ট্রের কোনও বিশেষ সংবাদ লইয়া কশ্রপের নিকট আসিয়াছে। কশ্রপের সহিত তাহার কার্য্যসমাধা করিয়া বাহিরের সংবাদাদে আমার সহিত

দেখা করিবে ও মহামাত্যের প্রেরিত পত্রের উত্তর লইয়া যাইবে। আমার পত্রে তোমাদের নূতন যাবনিক পরিচয় প্রদান করিব এবং লিখিব যে তোমরা পুরুষপুরবাসী বৌদ্ধ যবন এবং পুরুষানুক্রমে ঘনিষ্ট-ভাবে আমার পরিচিত।—তোমাদের সম্বন্ধে এখানে আর কোনও অনুসন্ধান হইবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পণ্যবিক্রয় লব্ধ অর্থ লইয়া কি করিব? সংঘের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কি পুরুষপুরে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব?"

—না, উহা তোমার নিকট রাখিয়া দিবে এবং আবশ্যক হইলে উহা ব্যয় করিতে পারিবে। সেখানে থাকিয়া অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবে না বা অযথা কৃপণতা করিবে না। ব্যয় বাহুল্য হয় তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু মনে রাখিবে যে বাহ্লিকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট সম্মান অর্জ্জন এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন তোমাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে।

—আমাদের সহিত জনকয়েক অনুচর ও ভৃত্য লইয়াও যাইতে হইবে।

—তাহাত লইয়া যাইবেই।—তবে যাহাদিগকে লইয়া যাইবে তাহারা যেন বিশ্বস্ত হয়। আমি মনে করি যে যাহাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার এরূপ একজনকে লইয়া যাওয়া উচিত, অধিক অনুচর বা ভৃত্য সঙ্গে লইও না।

—অভিযানের ও বাহ্লিকে অবস্থানের ব্যয় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে?

—তোমাদের অভিযানের ও বাহ্লিক অবস্থানের জন্য তোমাদের উভয়কে পঞ্চবিংশতি সহস্র করিয়া সুবর্ণ দিনার এবং ভৃত্য ও অনুচর-গণের ভরণ পোষণ ও অপরাপর আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার বহনের জন্য আরও পঞ্চসহস্র করিয়া দশসহস্র সুবর্ণ দিনার তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে। সংঘের সঞ্চিত কোষ হইতে এই অর্থ ব্যয়িত হইবে। যাত্রার নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বাহ্নে তোমাদের হস্তে উহা অর্পিত হইবে।

—আপনার উপদেশ ও সংঘের নির্দ্দেশ আমরা প্রাণপাত করিয়াও বর্ণে বর্ণে পালন করিব। অপর অভিযানের ব্যবস্থাও কি অদ্য স্থির হইয়া যাইবে?

—না—অন্য অভিযানের বিষয় বিচারের সময় এখনও আসে নাই, সময় আসিলেই অন্য অভিযানের বিষয় বিবেচিত হইবে। এখনও সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগৃহীত হয় নাই। তোমরাও ত তাহা জান?

—সংঘের কার্য্যাদি পরিচালিত হইবার জন্য নূতন ব্যবস্থারও আবশ্যক। তাহাও এই পরামর্শ সভায় নির্দ্দিষ্ট ভাবে স্থির হইয়া যাওয়া ভাল নয় কি?

—তোমার বাহ্লিকে অবস্থানকালে এখানে সর্ব্বাধিনায়কের কার্য্য শেখর পরিচালন করিবে এবং সুকৃতি বর্দ্ধন অধিনায়ক হইবে ও দুই-জন সাধারণ সদস্যকে নায়কের পদে উন্নীত করিতে হইবে। সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন তাহাদের দুইজনকে নায়কের পদে উন্নীত করা হইবে। কেমন, তোমরা সকলেই আমার সহিত একমত ত? যদি কাহারও অন্যমত থাকে ত বল, তাহা অদ্যকার সভায় বিবেচিত হউক।

আমরা সকলেই আর্য্যমহাস্থবিরের এই সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিলাম এবং অদ্য এই সান্ধ্য পরামর্শ সভায় তাঁহার প্রস্তাবসমূহ আমাদের বর্ত্তমান সকল সমস্যার সমীচীন সমাধান বলিয়া গৃহীত হইল।

আমাদের সভারকার্য্য আজকার মত শেষ হইল। আমরা আর্য্য মহাস্থবিরের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সংঘারাম হইতে নির্গত হইলাম।

(ক্রমশঃ)

রসিকমোহন

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন

আমরা বাঙ্গালী নানাকারণে স্বল্পায়ুঃ। আমরা যখন শুনি যে আমাদের মাঝে এমন লোক রয়েছেন যিনি সুস্থ শরীরে ও সুস্থ মনে একশ' বছর কাটিয়ে দিলেন তখন তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হয়। কিন্তু এমন দীর্ঘজীবী পুরুষ যদি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হ'ন, শতাধিক বর্ষ পার হবার পরেও যদি তাঁর স্মৃতি ও মেধা অক্ষুণ্ণ থাকে, জরা যিনি নির্জ্জিত করেছেন আপনার দুর্জ্জয় সাধনবলে এমন যদি শুনি এবং চাক্ষুষ দেখি, তা হ'লে বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

এমনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ। কর্ম্মচঞ্চল কলিকাতা সহরের বুকের ওপর ২৫, বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ তাঁর নিজভবনে বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৭৷৹টার সময়ে সজ্ঞানে হরিনাম করতে করতে ১০৯ বছর বয়সে তিনি স্বধামপ্রাপ্ত হলেন। মর্ত্ত্যলীলার শেষদিনেও তিনি বেলা দুটো থেকে চারটা পর্য্যন্ত সহরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বসুর সঙ্গে দুরূহ বৈষ্ণব-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং জিজ্ঞাসু ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করেন। ভাগবত শুনতে শুনতে এবং গৌরগোবিন্দ নাম করতে করতে আচার্য্যদেব হাসতে হাসতে চলে গেলেন!

শতাব্দীর দুর্লভ অভিজ্ঞতায় এই ডাক্তারের জীবনকথাও অসাধারণ। নয়নাভিরাম সৌম্যমূর্ত্তি দ্বিতধী এই মহামানব ছিলেন

একাধারে পাণ্ডিত্যের খনি, সিদ্ধসাধক ও আদর্শ বৈষ্ণব। তিনি ছিলেন যেন মূর্ত্তিমান কল্পতরু। অসামান্য স্নেহ ও করুণা অজস্রধারায় তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে তারা—যারা তাঁর চরণপ্রান্তে এসেছে এবং বসেছে এবং বৈষ্ণবাচার্য্যের এমন কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের বা ছাত্রের সংখ্যা অগণিত। তবু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দীর্ঘকাল অবস্থান করা সত্ত্বেও অতি-নিকটের কত লোক তাঁকে পেতে ইচ্ছা থাক্‌লেও পেলে না, দেখ্‌তে ইচ্ছা থাক্‌লেও দেখ্‌লে না। তাই আজ তাঁর বিরহে কত লোককে এই আক্ষেপ করতে শুনা যায়। গুণীর, জ্ঞানীর, ভক্তের এবং অলোক-সামান্য প্রতিভাবান্ মহাত্মাগণের জীবিতকালে আজও ঠিক মত সমাদর হয় না—হয়ত বা তাঁরা চানও না!

শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছেন—"শাস্ত্রে আছে, তীর্থদর্শন অপেক্ষা সাধু দর্শনের পুণ্য অধিক, ইহা যে কত সত্য

পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

তাহা সেইদিন বুঝিলাম।...বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী এই বাঙ্গালী মহাপুরুষ যে এখনও এমন উজ্জ্বল দেহ-কান্তি ধারণ করিয়া, আমাদের এ যুগের সকল আবিলতা ও কোলাহল হইতে দূরে জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের অটল মূর্ত্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। ...সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের কত নব নব আন্দোলন—কত প্রতিভা ও মনীষার উদয় এবং অস্ত তিনি দেখিয়াছেন!—তাহাদের পরিণাম ও ফলাফলের বিচার তাঁহার মত আর কে করিতে পারিবে!...বাংলা দেশের ইহাই বোধ হয় শেষ, দীর্ঘ আয়ুর ও দীপ্ত প্রতিভার এমন সমাবেশ আর দেখা যাইবে না!" শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বলেছেন "দেবমূর্ত্তি"। সব চেয়ে বড় কথা—"গত অর্দ্ধশতাব্দী, অর্দ্ধশতাব্দীর পরে কিছু হবে, বাংলাদেশে যাঁরা বিশিষ্টতা লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই বিদ্যাভূষণের কাছে ঋণী, এ কথা বল্লে অত্যুক্তি হবে না।...ধনী, দরিদ্র তাঁর কাছে সমান আদৃত। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত ও সাহিত্যিক সকলেই তাঁর অযাচিত দানের অধিকারী হয়েছেন।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখেছেন—

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

সিদ্ধাচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের এই উক্তি যে কত সত্য তা বুঝা যায় শ্রীমৎ রসিকমোহন দর্শনে—তাঁর দর্শনে বাস্তবিকই মুখে যেন আপনি কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়। কত অভক্ত তাঁর দর্শনমাত্রেই ভক্ত হয়েছে, কত অবৈষ্ণব তাঁর মধুর কথা শুনে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে যে বৈষ্ণবতা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। স্বধর্ম্ম পালনের দ্বারা তিনি বাংলার নিজস্ব ধর্ম্ম অপরকে শিখিয়েছেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দের অপার কৃপা তাঁর ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে বর্ত্তমান যুগে এবং সে কৃপা পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র বিচার করে নি। তাই রসিকমোহন ছিলেন সকলকার পরম আত্মীয় এবং তাঁর বিয়োগে মর্ম্মান্তিক বিরহ-ব্যথা পেয়েছে তাঁর অনুগত এবং আশ্রিত সবাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ও অভেদাত্মা পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দের অপার কৃপা রসিকমোহন যে লাভ করেছিলেন তা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত থেকে বেশ বুঝা যায়। যে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ও বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের যে মহাপুণ্যভূমি গর্ভাবাসে শ্রীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাব হয় সেই তিথিতে এবং সেই স্থানে রসিকমোহন জন্মগ্রহণ করেন ১২৪৫ সালে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে তিনি এগার মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। রসিকমোহনের পিতা গৌরমোহন চট্টরাজ সার্ব্বভৌম সন্তান জন্মগ্রহণ করবার আগে স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছিলেন—ঐ স্থানের ব্রহ্মরন্ধ্রে নবজাতককে যেন আট দণ্ড ফেলে রাখা হয়। রসিকমোহনের মাতার নাম হরসুন্দরী দেবী। ইনি নিত্যানন্দবংশীয়া কন্যা। পিতৃপুরুষের দিক দিয়ে রসিকমোহন মহাপ্রভুর "প্রেমশক্তি-স্বরূপ" শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরের সপ্তম পুরুষ। "তাই রসিকমোহনের ধমনীতে বৈষ্ণব শোণিতধারার উচ্ছ্বসিত বিপ্লাবন। কৃষ্টিতে বৈষ্ণবীয় সার্থকতার বিপুল আয়োজন। ফলে সাধক রসিকমোহন বঙ্গদেশের অনন্যসাধারণ মহাপ্রভুর লীলামাধুরী প্রচারক, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়ে পরিপুষ্ট ভাগবত মহিমসংদর্শক।"

স্কুল কলেজে লেখাপড়া না শিখেও শুধু নিজের চেষ্টাতে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠে মানুষ যে একাধারে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতা অর্জ্জন করতে পারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু ছিল পুস্তক এবং সুনির্ব্বাচিত বহু বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগারের মধ্যে তিনি দীর্ঘ জীবন পাঠে ও গবেষণায় অতিবাহিত করেছেন। ফলে তাঁর মত একাধারে অসামান্য সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, শাস্ত্রবেত্তা দেখা যায় নি। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু ব্যক্তিকে তাঁদের নিজ নিজ জ্ঞান গবেষণা ব্যাপারে সংশয় নিরসন করবার জন্য

তাঁর নিকট আসতে দেখা যেত এবং তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন যে রসিকমোহন জীবন্ত জ্ঞান-কল্পতরু। তিনি ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র। জীবনের শেষ দিনেও দেখা গিয়েছে যে অধীত শাস্ত্ররাজির দুরাবগাহ অংশগুলি পর্য্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। এমন প্রখর স্মৃতিশক্তি, বীণাপাণির কৃপা ব্যতিরেকে সম্ভবে না। বহুভাবে তিনি দেশের ও সমাজের সেবা করেছেন। পেশা হিসাবে তিনি ছিলেন ডাক্তার এবং এদিক দিয়ে বহু দরিদ্রের উপকার করেছেন। ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন ছিল তাঁর নেশা এবং এদিক দিয়েও তিনি ভক্ত-সমাজকে বহু আনন্দ দিয়েছেন। আবার আর একদিক দিয়ে তাঁকে আমরা দেখি সাংবাদিকরূপে। "আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া" "শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া" "পারিজাত" "শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক" "প্রেমপুষ্প" "আনন্দ মন্দির" "শ্রীবিশ্বরূপ" প্রভৃতি বহু পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছেন এবং অমৃত-বাজার, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, নব্যভারত, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্ম্মবাণী, কল্যাণ, এডুকেশন গেজেট, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রাদিতে বহুদিন যাবৎ বহু মূল্যবান্ সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখেছেন। সাংবাদিক হিসাবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, মহাত্মা শিশিরকুমার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ সহকর্মী।

অন্যদিকে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্য সাধনার কথা ও বঙ্গ সাহিত্যে তাঁর অপরিমেয় দানের কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়। এ স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে তদ্বিষয়ে আলোচনা চলে না। তাঁর রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের মাত্র নামোল্লেখ করি—রূপসনাতন, শিক্ষামৃত, গম্ভীরায় গৌরাঙ্গ, সর্ব্বসংবাদিনী (মূল ও টীকা), সাধন সঙ্কেত, শ্রীচরণ তুলসী, অদ্বৈতবাদ, শ্রীনববৃন্দাবন, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, জগন্নাথবল্লভ নাটক (ও তাহার বঙ্গানুবাদ), নিত্যানন্দচরিত, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীমৎ দাস গোস্বামী, শ্রীমৎ স্বরূপ দামোদর, আনন্দ-মীমাংসা, ব্রহ্ম হরিদাস প্রভৃতি। ইহা ছাড়া দেশপ্রেমের অপূর্ব্বগ্রন্থ আত্মনিবেদন, অমৃতময়ী নীলাচলে ব্রজ-মাধুরী, টীকাসংবলিত শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত, শ্রীমন্নারায়ণদাস কবিরাজ কৃত ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত প্রাচীন টীকাসহ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচায়ক। তিনি "সেবারাম" এই ছদ্মনামে বহু সমালোচনা ও কবিতা প্রকাশিত করেছেন।

আজ আমাদের দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হ'তে মুক্তিলাভ করেছে। যাঁদের নীরব সাধনায় ও অজস্র দানে আমাদের দেশ ও আমাদের ভাষা প্রচুর পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়েছে, আজ তাঁদের বিষয় আমাদের চিন্তা করা ও তাঁদের ঋণ স্বীকার করা ও তাঁদের অবদান চিনে গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

তিস্তার বালুচর

শ্রীআশা দেবী এম-এ

তিস্তার বালুচর
ওপারে স্নিগ্ধ আমের ছায়ায় চাষীদের খোড়ো ঘর।
ঘুরে ঘুরে ফেরে আহারান্বেষী
কত পাখীদের ঝাঁক
কাদা খোঁচা আর যুগল-চক্রবাক।
ঝির ঝির জল অভ্রের ফ্রেমে কাঁচের ছবির প্রায়
স্বপ্নেতে মন ছায়।
হিমালয়-গলা বরফ-ধারায় তন্বী দেহটি ঘিরে
মৃত্যুর মত শীতলতা তার অণুতে অণুতে ফিরে।
তিস্তার বালুচর,
বরষা শ্রাবনে তারে ঘিরে বাজে মেঘ-মন্দ্রিত স্বর।
বন্ধ্যা মাটিতে মধুভরা স্নেহধারা
হিমগিরি-ভাঙা পাগল-ঝর্ণা নিসঙ্গ পথহারা।

রাত্রে স্বপ্নে দেখি
নীল স্রোত বেয়ে চৌধুরাণীর ডিঙ্গা চলেছে একি ?

দূর বলাকার পাখার মতন আকাশেতে পাল ওড়ে—
কালের চক্র ঘোরে
হাজারো মশালে রাঙা হয়ে যায়
নিশীথের কালো জল
কালো তরঙ্গ হেসে ওঠে খল খল।
দুধারে বালুকা বেলা
নীল জলরাশি নাগিনীর মত দুলে দুলে করে খেলা।
বালুকার চরে জাগে স্পন্দন সৃষ্টির আহ্বানে,
বন্ধ্যা বালুকা উপহার বয়ে আনে
মুঠো মুঠো কাশফুল
শ্যামলী পাতায় শিশু তরমুজ দুলে ওঠে দুল্ দুল্।

তীরে বাসা বাঁধে ঘর ছাড়া পাখী
কাকলী মুখর তানে
মিশে যায় সেই আনন্দ-গীতি
তিস্তার কলগানে।

পথ-নির্দ্দেশ

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। রাজনীতি চর্চ্চার শক্তি নাই—সাহস তো নাই-ই। দক্ষিণপন্থী হইলেও তবু না হয় চলিত। তা নয়, পুরাপুরি বিপ্লবী বামপন্থী দলের ব্যাপার। তবুও টিকিট কিনিতেই হইল—দু টাকার একখানা। ছাত্রের দলকে বিমুখ করা চলে না। দরিদ্র স্কুল মাষ্টারের পক্ষে চরম দুঃসাহস। ভরসা, দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে—আর হেড্ মাষ্টার মহাশয়ও টিকেট কিনিয়াছেন।

সহরের 'অগ্রগতি' ক্লাবের উৎসাহে খাস কলিকাতা "জন-নাট্যসংসদ" সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার টাউন হলে তাঁহাদের প্রথম অভিনয়। দলের পরিচালক একজন অধ্যাপক, সঙ্গে আটজন ছাত্র আর পাঁচজন ছাত্রীও আছেন। মনে পড়িল যখন ছোট ছিলাম তখন এই সহরেই কলিকাতা হইতে "ষ্টার থিয়েটার" আসিয়াছিল প্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের নিয়া। সেদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজ এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিল এবং "কন্‌সেশন টিকিট" দাবী করিয়াছিল। তাহাদের অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতে তাহারা পিকেটিং করিয়া এবং ঢিল ছুঁড়িয়া অভিনয় পণ্ড করিয়াছিল। আর আজ, ছাত্রদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই টিকিট কিনিয়াছি এবং যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উৎসাহিত করিব এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। বাস্তবিকই দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে।

ইহাদের হ্যাণ্ডবিল ও প্ল্যাকার্ডএ বিশেষত্ব ছিল—

> "রঙ্গমঞ্চ—আমাদের এই ধূসর ধরণী।
> অভিনেতা—পরিচয়হীন অবজ্ঞাত জন।
> ইহাতে পাইবেন—এই দুর্দ্দিনে মুক্তিপথের সন্ধান—
> নতুন অনাগত দিনের শ্রেণীহীন সমাজের ইঙ্গিত।"
>
> ইত্যাদি

আকর্ষণ করিবার কৌশল সত্যই ইহাদের জানা আছে। যথাসময়ে গিয়া দেখি টাউনহল লোকে ভরিয়া গিয়াছে। টিকেটের হার দশ টাকা, পাঁচ টাকা, তিন টাকা, দুই টাকা ও এক টাকা। একটু হতাশ হইলাম। আজ অন্ততঃ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থাই আশা করিয়াছিলাম—এবং তাহা ঘটিলে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতাম।

যাক্, বৃথা নিন্দা করিব না। আলোকসজ্জা, অভিনয়, সঙ্গীত, প্রয়োগকৌশল সব কিছুর মধ্যেই অভিনবত্ব ছিল। মন মুগ্ধ হইল।

"মন্বন্তর নৃত্যে" দেখিলাম বাংলার দুর্ভিক্ষের নিখুঁৎ ছবি। কি করিয়া দুর্ভাগা নরনারী করাল দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রার আঘাতে পথের ধূলায় পড়িল লুটাইয়া—আর এই শ্মশানের স্তূপীকৃত নরকঙ্কালের উপর কৌশলী ও নির্ম্মম স্বদেশী ও বিদেশী বণিক কি করিয়া গড়িয়া তুলিল তাহাদের অভিশপ্ত বিলাস সৌধ—চোখের উপর দেখিলাম সে জীবন্ত চিত্র। এ দৃশ্য ভুলিবার নয়। অভাগার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন মনের মধ্যে যেন প্রতিধ্বনি তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কৌতুক নাট্য "মন্ত্রীমিশন মস্করা"তে দেখিলাম, বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত তিন বৃটিশ ধুরন্ধর আকাশে উড়িয়া আসিলেন ভারতে—১লা এপ্রিল (তারিখটা লক্ষ্য করিবেন।) স্বাধীনতারূপ অশ্বডিম্ব ঘাড়ে বহিয়া। কৌশলী 'কানা' ওয়াভেল বড়শিতে টোপ গাঁথিয়া চার ফেলিয়া বসিলেন। টোপ গিলিতে আসিল দুই নির্ব্বোধ রুই কাৎলা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধূর্ত্ত প্রতিনিধির দল আর ধনিকের দালাল রাজা নবাবের দলের চক্রান্তে সোনার হরিণরূপ Interim Government—ধরা ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া নাচাইয়া ফিরিতে লাগিল দেশের ক্ষমতালোভী নেতাদের। পিছনে কলকাঠি টিপিতে লাগিলেন 'শয়তান' ওয়াভেল, 'গুণ্ডা' বারোজ, 'ধূর্ত্ত' জেনকিন্স!

লাগিল ঝগড়া—হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, রাজস্থানে। রক্তের বন্যা বহিল, অবিশ্বাসের বিষে দেশের বাতাস হইয়া উঠিল ভারী। তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বিদায় নিলেন ওয়াভেল। নাচিয়া নাচিয়া, মোহন বাঁশী বাজাইয়া আসিলেন আরো চাতুরী বিশারদ নয়নলোভন সাপুড়িয়াবেশী মাউণ্ট-ব্যাটেন! মুখে মিঠা বুলি আওড়াইয়া গোপনে ঝুড়ি হইতে বাহির

করিলেন কালসর্প। দিলেন সেই বিষধরকে পাঞ্জাবের বুকে ছুঁড়িয়া। বিষের জ্বালায় পাঞ্জাব হইল জর্জ্জরিত।

দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কি সত্য ব্যাখ্যান—দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার কী স্বচ্ছ বিশ্লেষণ! মনটা খুশী হইল।

সকলের শেষ দৃশ্য—"পথের সন্ধান"—

সুন্দর আনন্দময় বিরোধহীন পল্লীজীবন। সে সুখস্বর্গে প্রবেশ করিল সুদখোর জমিদার, ফ্যাক্টরীর মধুরভাবী ক্যাপিটালিষ্ট—বৃটিশ শাসনতন্ত্রের শয়তানী। হারাইয়া গেল মুখের হাসি, প্রাণের আনন্দ—নামিল মরণঘুমের কালোছায়া। কিন্তু সেই মরণঘুম ভাঙাইতে আসিল—লাল পতাকা হাতে গান গাহিয়া, সমাজতন্ত্রী কর্ম্মী, ছাত্র-ছাত্রীর দল। জাগিল চাষী, জাগিল মজুর, জাগিল দেশের জনসাধারণ—তেভাগা আন্দোলনে—শ্রমিক ধর্ম্মঘটে, নৌ-বিদ্রোহে, ছাত্রবিক্ষোভে। ধনিক হইল বিব্রত—শাসক হইল বিচলিত। আসিল কারাদণ্ড, ফাঁসীর মঞ্চ—আসিল বুলেট ও বেয়নেটের রক্তাক্ত আর্ত্তনাদ। কিন্তু রক্তের সাগর মন্থন করিয়া উঠিল—নতুন দিনের সূর্য্য, আকাশে উড়িল নতুন পতাকা—রক্তে-নাওয়া লাল নিশান। তাহার নীচে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল ছাত্রছাত্রীর দল। দৃঢ়মুষ্টিতে পতাকার দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইল কিষাণ, মজুর, অত্যাচারিত অবজ্ঞাত মানবের জনতা। দেখা দিল নূতন স্বর্গ—শ্রেণীহীন সুখী সমাজ।

ঘন ঘন করতালির মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হইল। মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল। রাস্তায় বাহির হইয়া শুনিলাম ছাত্রেরা বলাবলি করিতেছে "কংগ্রেসের জড়বুদ্ধি নেতা-গুলোকে দেখান উচিত এই নৃত্যনাট্য—তবে যদি ওদের চোখ খোলে।" বাস্তবিক, ইহাকেই তো বলে চাক্ষুষ প্রমাণ। ইহাকেই তো বলে পথনির্দ্দেশ! কত সহজ আমাদের সমস্যা—কত সহজ ইহার সমাধান।

বুঝিলাম,—আমাদের সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী ইংরাজ বণিক আর তার শাসন ব্যবস্থা। বুঝিলাম মিথ্যা এই হিন্দু মুসলমান সমস্যা, রাজন্যবর্গের সমস্যা, মণ্ডলীকরণের সমস্যা, জাতিভেদ সমস্যা।

বুঝিলাম—একটি মাত্র সমস্যা শোষক ও শোষিতের বিরোধ। পৃথিবীতে শুধু আছে দুইটি শ্রেণী—হিন্দু নয়—মুসলমান নয়—শোষক ও শোষিত। রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া—সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই একদিন মিটিবে এই বিরোধ—হইবে এই একমাত্র সমস্যার একমাত্র চূড়ান্ত সমাধান।

বুঝিলাম—আপোষের পথ, আলোচনার পথ—মিথ্যার পথ—অন্ধকারের গোলকধাঁধার পথ। বিপ্লবের পথ, রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ, একমাত্র সত্য পথ, একমাত্র সহজ পথ, একমাত্র আলোকের পথ। পৃথিবী যেদিন দীক্ষা নিবে বাম-মার্গে সেদিনই আসিবে মুক্তি। সেদিনই আসিবে শান্তি—যেদিন চাষী লুটিয়া লইবে তাহার ন্যায্য অধিকার, শ্রমিক আগুন জ্বালাইয়া প্রতিশোধ নিবে শতাব্দীর লাঞ্ছনার, ছাত্রছাত্রী যেদিন পথে বাহির হইবে সমস্ত শৃঙ্খল ভাঙিয়া! সেদিন অবসান হইবে সমস্ত দুঃখের, সমস্ত অবিচারের, সমস্ত সমস্যার। মনে হইল, মিথ্যার ঠুলি এক নিমেষে যেন চোখ হইতে খসিয়া পড়িল! সত্য লাভের পরমতৃপ্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। অনেক দিন এমন সুনিদ্রা হয় নাই।

সকালে উঠিতে কিছু দেরী হইল। গত রাত্রের আনন্দের সুরটি প্রাণে বাজিতেছে। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়া সংবাদপত্র দেখিতে বসিলাম। চোখে পড়িল "গতকল্য রাত্রিতে মিটফোর্ড হস্‌পিটালে 'সোনার বাংলা'র সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে কয়েকজন যুবক দুইদিন পূর্ব্বে ধীরেন্দ্রবাবুকে 'সোনার বাংলা' অফিসের কাছে অতর্কিতে তলোয়ার ছোড়া ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিয়া গুরুতর আহত করে। কিছুদিন যাবৎ ঢাকাতে বামপন্থী দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে মনোমালিন্য চলিতেছিল। ধীরেন্দ্রবাবুর উপর আক্রমণ সেই বিরোধেরই জের বলিয়া সন্দেহ। ধীরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি একটি মাতৃহারা বিধবা কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।"

"গুরগাঁওয়ের অবস্থা অবনতির দিকে গিয়াছে। বিশেষ এক সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক জনতা অন্য এক সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত দুইটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করিয়াছে। ব্যাপক ধর্ম্মান্তরকরণ এবং নারীহরণের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। একজন বৃটিশ সার্জ্জেণ্ট দুইটি নারীকে দুর্ব্বৃত্তদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে।"

"মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনাসভা গতকল্য স্থগিত রাখিতে

হয়। কয়েকজন ব্যক্তি প্রার্থনা সভায় কোরাণ পাঠে বিশেষ আপত্তি জানান। ইহাতে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। পুলিশের হস্তক্ষেপে সভায় শান্তি স্থাপিত হয়।"

"পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে বৃটিশ শ্রমিক পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঃ মলোটভের সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ জার্ম্মানীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে দুই পক্ষে গুরুতর মতভেদ প্রকাশ পায়।"

"গত সপ্তাহে সারণ জিলায় প্লেগের মৃত্যুসংখ্যা ৩২২।"

"রুশ অধিকৃত বার্লিন অঞ্চলে কয়লার অভাবে দারুণ শীতে কয়েকটি শিশু ও বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে।"

"পরীক্ষার প্রশ্নপত্র অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, ইহার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ পরীক্ষার হল হইতে একযোগে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য মেডিকেল স্কুলের সমস্ত ছাত্র এবং অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

"কানপুর পিওর অয়েল মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকেরা উত্তেজিত হইয়া মিলে আগুন ধরাইয়া দেয়। শ্রমিকদের বস্তিতেও আগুন ধরিয়া যায়। মিলটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে। শ্রমিক বস্তিতেও একটি স্ত্রীলোক তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে নিয়া পুড়িয়া মারা গিয়াছে।"

"বাঁচুয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরসংলগ্ন কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতে যাইয়া বর্ণহিন্দু পুরোহিতদের হাতে দুইজন হরিজন লাঞ্ছিত হইয়াছে।"

"প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্ম্মঘট চলিতেছে।"

"কলিকাতার গোলযোগ এবং তে-ভাগা আন্দোলন-জনিত যানবাহনের বিশৃঙ্খলার ফলে বগুড়া সহরের মার্চ্চ মাসের রেশন পৌঁছাইতে বহু দেরী হইয়া যায়। কাল রেশন নিয়া যে গাড়িটি আসিতেছিল সহর হইতে তিন মাইল দূরে পাঁচশত কৃষক তাহা থামাইয়া চারিশত বস্তা চাউল লুঠ করিয়া নিয়া যায়। যাত্রীদের গাড়ীতে উঠিয়াও ইহারা অত্যাচার করে। গাড়ী হইতে নামিয়া পলাইতে গিয়া একজন বৃদ্ধ গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। পুলিশ আসিয়া গুলি ছুঁড়িতে বাধ্য হয়, ফলে দুইজন কৃষক নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে। রেশন অভাবে সহরে চাল ও চিনির বরাদ্দ দুই সপ্তাহের জন্য অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুদের কার্ডে কোন রেশন দেওয়া হইবে না।"

কানে ভাসিয়া আসিতেছে কাল রাত্রে শোনা নৃত্য-নাট্যের কথাগুলি—

"বিপ্লবের পথ—রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ—একমাত্র সত্য পথ, একমাত্র সহজ পথ, একমাত্র আলোকের পথ। এই পথেই আসিবে শান্তি, আসিবে সকল সমস্যার সমাধান।"

কিন্তু চোখে আবার ঘোলা দেখিতেছি কেন?

বুড়ো বয়সে চশমাটা আবার পাল্‌টানো দরকার।

তবে

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মিথ্যা-বেসাতি লয়ে যদি হয় ধরণীর রাজনীতি,
হিংসা ও দ্বেষ যদি তার সম্বল,
স্বার্থ-সাধন-বিধানে না থাকে যদি সংকোচ-ভীতি,
নিত্য বহায় নিরীহ-নয়নে জল,
তবে কি ভাবিব, মরেছে ধর্ম, শান্তির আশা লীন?
তবে কি পৃথিবী গ্রাসিয়াছে শয়তান?
দস্যুর হাতে এমনি করিয়া মরিবে অন্নহীন?
অবিচার তবে হইবে কি বলবান?

যুগ যুগ ধরি আসিল জগতে মহামানবের দল,
দিল আশ্বাস, শুনাল শান্তিবাণী,
দরদী সাধুরা মুছাইল প্রেমে দুখী-নয়নের জল,
বরাভয় দিল সতত যুক্তপাণি।
সত্যের লাগি বীর দাশরথি বরি নিল বনবাস,
মানবের প্রেমে ঈশা করে প্রাণ দান,

মৈত্রী মাগিয়া কাটে গৌতম সিংহাসনের পাশ,
নিমাই গাহিল মানবত্বের গান।
তিমির-নিশীথে এদের জীবন জেলে দিল যত আলো
পাপ-ঝটিকায় হবে কি নির্বাপিত?
বসুধা ব্যাপিয়া আসিবে কি তবে অমার আঁধার কালো?
দৈত্যরাজ্য ধরণে প্রতিষ্ঠিত?
দেবকী কি তবে শৃঙ্খল পরি কাঁদিবে কারার মাঝে?
অর্ধেক রাতে হবে না চন্দ্রোদয়?
জানকী কি তবে অশোক কাননে রবে ভিখারিণী সাজে,
হবে না কি হায়! স্বর্ণলংকা জয়?

পাঞ্চালী কি গো বাঁধিবে না তবে এলায়িত কেশজাল
দুঃশাসনের শোণিতে সিক্ত করি?
বহিবে কি তবে গুরুলাঞ্ছনা প্রহ্লাদ চিরকাল?
স্তম্ভ ভেদিয়া দেখা কি দিবে না হরি?

শিল্প-জিজ্ঞাসা—ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ

শ্রীঅঙ্কুর মুখোপাধ্যায়

জীবনে কোলাহল উগ্র হয়ে উঠেছে ; বীর্যশুল্কে বসুন্ধরাকে ভোগ করবার ছাড়পত্র নিয়ে চতুর্দ্দিকে চলেছে উদগ্র লড়াই ! তখনও দেখেছি আর্টিষ্টের তুলির টানে সুন্দরের উর্দ্ধশিখ মৌন আরতি। পাটোয়ারী বুদ্ধির অভাবে পুলিসের পাসপোর্ট হয় তো তাঁরা খুইয়ে বসেন ; হিসেবী লোকের হুঁসিয়ারীর দিকে কানটা সব সময় রাখতে পারেন না ; তাই সামাজিক পুলিস চ্যালেঞ্জ করলে পকেট থেকে স্কেচ বইখানা বার করে সপ্রতিভ প্রতিবাদে বলে ওঠেন—পাসপোর্ট আছে বই কি ! এই দেখ, আমার কাছে অমৃতলোকের ছাড়পত্র ! সুন্দরের আগমনের পথের খবরটা তাঁরা কেমন করে জানতে পেরেছেন। সেই পথে তাঁদেরও চরণ-চারণা। সে চলায় ক্লান্তি নেই, দ্বিধা নেই, অবসাদ নেই। চলার সাথী হবার জন্ম তাঁরা আহ্বান করেন সকলকে। সুন্দরের নিমন্ত্রণে কেউ অপাংক্তেয় নয়। তাঁরা ডাক দিয়ে বলেন : তুমি চলো। এই পথে চলার আনন্দে তোমার লজ্জা পুষ্পিত হয়ে উঠবে ; তোমার আত্মা হবে ফলগ্রাহী। চলার বেগে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে সমস্ত অতীত তার কৃত্যাকৃত্য নিয়ে। অতএব তুমি চলো। বুঝতে পারলুম আর্টিষ্ট গজদন্ত গম্বুজের বাসিন্দা নন। Art is the most unselfish of all activities. পাষাণী অহল্যা জেগে ওঠেন একটি দুর্লভ পদরেণুর স্পর্শে। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় যাকে দেখলুম ধূলিমলিন, পৈস্তম্ভের আঘাতে যা কিছু জর্জর, মূক, বধির, জড় বলে যারা প্রতিভাত হয়েছিল, তাদের ওপর পড়ে আর্টিষ্টের ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি। কোন এক পরম ক্ষণে সৃজনের আকাশে সঞ্চারিত হয় নির্মোহ প্রশান্তি। আর সেই অবকাশের আকাশ ভরে ওঠে অপরূপ আকাশ-কুসুমে।

হয় তো প্রশ্ন উঠবে নির্মোহ প্রশান্তি কি সৃজনের অনুকূল ? আর্টের অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে মোহ-মুক্তি। রূপ-সৃজন ব্যাপারটা অবশ্য মুগ্ধবোধ অথবা মোহ-মুদ্গরের সগোত্র নয়। মনোগতকে আমরা মনোমত সাজে সাজাতে চাই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মনোগত আমাদের অধিগত হয়ে থাকেন মোহমুক্ত মননশীলতায়। শুনেছি লম্বমান মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগের স্নায়ুপিণ্ডটা বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে। মেরুদণ্ড-নির্ভর জীবনকে তবু আমরা অতিক্রম করতে পারি নি। আবেগ সংবেগের এই পীঠস্থানকেই যদি একান্ত বলে জেনে থাকি, তবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ, অনুরাগ, বিরাগই হবে সত্য নির্ধারণের মাপকাঠি। বলা বাহুল্য, সত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সমীহা এবং অনীহা শুধু অপ্রতুল নয়, একেবারেই অবান্তর। সত্য-জিজ্ঞাসার ন্যায় শিল্প-জিজ্ঞাসা অথবা সত্য-চিত্রের ক্ষেত্রেও ফরমূলাটা একই রকম প্রযোজ্য। আর্টের মধ্যে আছে সাধারণ আবেগ-সংবেগ-নির্ভর জীবনের অতিক্রম ; আর্ট ব্যতিক্রমও বটে।

আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে ; নির্মোহ প্রশান্তির আকাশে আকাশ-কুসুম ফুটলেও ফুটতে পারে ; কিন্তু সে তো, যাকে বলে নিরুপাখ্য, সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্য-চিত্রের উপজীব্য কি তা হলে অলীক ও অসার কল্পনা ? সাধক কবির গানের একটা কলি আমরা অনেকেই শুনেছি—ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ? উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্যে অস্তিত্ব সার্থক হলেই সুন্দরের অধিষ্ঠান ঘটে থাকে। কিন্তু অস্তিত্বই যার প্রমাণ-সাপেক্ষ, তার উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্য নিছক আকাশকুসুম নয় কি ? উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্যকে অন্য ভাষায় বল্‌তে পারি লাবণ্য। চিত্র বস্তুতে লাবণ্যযোজনা শিল্পের ষড়ঙ্গের অন্যতম। এই লাবণ্য আমরা যোজনা করতে পারি বস্তুতে ; বাস্তববিমুখ ভাবে নয়। সত্যই কি তাই ? রঙে ও রেখায়, নৃত্যে, কাব্যে অথবা সঙ্গীতে আমরা কি প্রকাশ করতে চাই ? একখণ্ড শিলীভূত কপালাস্থির মধ্যে প্রত্নবিদ্ পাঠ করে থাকেন একটি যুগের ইতিহাস। আর শিল্পীর তুলির টানে আঁখির তারায় অরণ্য পর্বত গান গেয়ে ওঠে ; কাশ্মিরী কল্‌কায় "ডাল-লেক্" টলমল করতে থাকে ; চীনা শিল্পীর তুলির আঁচড়ে আন্দোলিত বেণবনের মধ্যে জমাট বাঁধিতে থাকে Taoism এর সমগ্র রহস্য, বাঙ্গালী শিল্পীর একাগ্র সাধনায় স্বল্প-পরিসর পটের মধ্যে ধরা দেন "মা-গঙ্গা" স্নানরতা ও পূজারতা রমণীদের চোখের অভিভূত স্তব্ধতায় ; সমস্তকে ঘিরে একটি প্রশান্ত নির্লিপ্ততা, তবু বারবার মনে হতে থাকে আপনার আমার সব বাঙ্গালীর জীবনের পথে ইতিহাস বুঝি গঙ্গা-স্রোতগতি ! বুঝতে পারছি শিল্পী প্রকৃতির অনুকরণ করতে রাজী নন। শিল্পীর সৃষ্টি অনুকৃতি তো নয়ই, এমন কি প্রতিকৃতিও নয় ; অনেক সময়ই অতিকৃতি। অতিকৃতি অর্থে বুঝাতে চাই এমন কিছু কৃতি—যা উপলক্ষকে অতিক্রম করে একটা বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছেচে। সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পের মহৎ লক্ষণই হলো এই অতিক্রান্ততা। আর এই বিশেষ লক্ষ্যকেই বল্‌তে চেয়েছি আকাশকুসুম। ভাবের আকাশে ফুল না ফুটলে পটে-লেখা ফুল কাগজটারই মতো হবে প্রাণহীন, শ্রীহীন। লাবণ্যযোজনের আগে তাই প্রয়োজন ভাবযোজনার। পণ্ডিতী ভাষায় দুটো ক্রিয়াকে বলা হয়েছে actus primus. এবং actus Secondus. কবির ভাষায় : মাটির জনম হয় নি যখন, তখন করেছি চাষ।

আর্টের বিশেষ লক্ষ্যটি কি ? সুন্দরের বোধকে বোধগম্য করাই তো সকল রকম রূপকর্মের উদ্দেশ্য। অন্যতর কোনও লক্ষ্যের প্রয়োজন আছে কি ! সুন্দরের বোধকে বোধগম্য করা—এই বাক্যটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত সংরাগ-বিরাগের অনুরঞ্জন থেকে "সুন্দর" সর্বদাই মুক্ত। সত্যের মতই সুন্দরও উপলব্ধ হন বুদ্ধি যোগে, বোধির সহায়ে। শাস্ত্রে নির্দেশ আছে প্রতিমাকারকে ধ্যানরত হতে হবে। তার অর্থ হচ্ছে ধী-সূর্য উদিত না হলে মহাভাবের উপলব্ধি অসম্ভব।

Beauty is to do with cognition. সত্য উপলব্ধ হন বুদ্ধি-যোগে। সত্য ও সুন্দর সমার্থক নয়। সত্যের আকর্ষণী শক্তিকেই আমরা সুন্দর আখ্যা দিয়ে থাকি। এই শক্তি হ্লাদিনীও হতে পারে, ভয়ঙ্করীও হতে পারে। সত্যের এই আকর্ষণী শক্তিকেই দুঃসহ প্রকাশ-বেদনায় গৃহীত-ব্রত রূপকার প্রতিরূপায়িত করেন প্রতিমায়। প্রতিমা স্মরণ করিয়ে দেয় একটি পর্বকে। পর্ব শব্দটি শুধু কাল-বাচক নয়, বিশেষ করে ভাব-বাচক। প্রতিমার মধ্যে আমরা একটি বিশেষ দেশ ও কালকে দেশ-কাল-অতিক্রান্ত রূপদান করতে সক্ষম হই। বিশেষ বিশেষ ভাবের স্মারক ও সমর্থক হচ্ছে বিশেষ বিশেষ প্রতিমা। ভাব-প্রতিম হওয়াতেই প্রতিমার সার্থকতা। এই কারণেই বলতে পারি, কাকে প্রকাশ করছি, এইটিই হচ্ছে রূপসৃজনের ব্যাপারে মুখ্য। প্রকরণ অথবা পদ্ধতির স্থান গৌণ। অন্তরঙ্গের দ্বারাই নিরূপিত হয় বহিরঙ্গ; নির্গলিতার্থের মধ্যে নিহিতার্থেরই পরম প্রকাশ।

কাকে প্রকাশ করছি বলতে বিষয় বস্তুকে বোঝাচ্ছি না। বস্তু-রূপের পিছনে যে ভাবরূপ তাকে যথাযথ এবং যথাযোগ্য প্রকাশ করতে পারাটাই বড় কথা। যথাযথ প্রকাশ মানেই যথার্থ প্রকাশ—plato যাকে বলেছেন True অথবা Iconographically correct. "আইকন্" অর্থে বোঝায় ভাবরূপ। ভাবকে যদি যথাযথ রূপদান করতে পারি, তবেই তাকে বলবো সাদৃশ্যসিদ্ধি—সুন্দরের ষড়ঙ্গ সাধনায় যা অপরিহার্য।

এতদূর পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, রূপকারের সৃজন-শালায় প্রকৃতি হয়ে ওঠেন রূপান্তরিত। আর এই রূপান্তরিত প্রকৃতি আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্র শুধু নয়, আমাদের বুদ্ধির ক্ষেত্রও প্রসারিত করে। সৌন্দর্যের জ্যামিতিক সংজ্ঞা বহু প্রাচীন হলেও, তার ভিতরের সত্যটি আজও অপরিম্লান।

প্রকরণ-দক্ষতা লাভ করলেই সার্থক শিল্প-সৃজন সম্ভব নয়। সার্থক শিল্প সৃষ্টির লক্ষণ হচ্ছে যাথাযথ্য এবং যথোপযুক্ত। যথাযথ প্রকাশ আবার নির্ভর করে logic অথবা right reason of composition এর উপর। গঠনরীতির আলোচনায় নৈয়ায়িক তত্ত্বের অবতারণা করছি না। রূপের logic অথবা right reason বলতে বোঝায় রূপের প্রমাণ। আর এই প্রমাণ শিল্পের ষড়ঙ্গের অন্যতম অঙ্গ। রূপে রূপে যেমন বহু ভেদ, তেমনি তাদের প্রমাণও বহু এবং বিভিন্ন। অন্য কথায়, প্রত্যেক রূপই স্বপ্রমাণ।

উপযুক্ত প্রমাণাদির সহিত ভাবলাবণ্যযুক্ত যথাযথ রূপ যদি রঙ ও রেখার বন্ধনে ধরতে পারি, তবেই উৎকর্ষের ঔজ্জ্বল্যে রূপ সৃষ্টি হবে রসোত্তীর্ণ। একটি তালগাছ ক্যামেরার দৃষ্টিতে ধরে ফেললুম; একই তালগাছকে হুবহু লিখে ফেললুম ক্যানভাসের পটে; আবার সেই তালগাছটিই সার্থক শিল্পীর তুলির কয়েকটি আঁচড়ে ধরা দিলো। ফটোগ্রাফির তালগাছ আর নকলনবিশের তাল গাছ স্বপ্রমাণ নয়। শিল্প সৃষ্টির ইতিহাসে তাদের কোনও স্থান নেই। তুলির দুটো আঁচড়ে যার সৃষ্টি সে বলে কত কথা, কত কাহিনী। ফটোগ্রাফির প্লেটে সে তো জড়বৎ স্থাণু নয়। জগৎ সংসারের সব কিছুর মতো সেও জঙ্গম। শত সহস্রের গমনাগমনের এক প্রান্তে সেও ইতিহাসের সাক্ষী। কত রাখাল বালক, কত গোচারণের স্মৃতি তার মৌন-মুখর পত্রস্তবকে ধরা রইলো, ধরা রইলো মেঘ-মেদুর আকাশ আর তেপান্তরের বুক চিরে পায়ে-চলার পথ। স্বপ্রমাণ বলেই সে স্বয়ংরূপ। যা আছে তাকেই হুবহু প্রতিফলিত করার মধ্যে মুন্সিয়ানার পরিচয় আছে যথেষ্ট, কিন্তু তা শিল্পপদবাচ্য নয়। যথার্থ প্রমাণ জ্ঞান থাকলেই যা আছে তাকে অবলম্বন করে নূতনতর সৃষ্টি সম্ভব হয়। আর শিল্প কর্মের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নূতনতর সৃষ্টি।

রোমের capitolএ স্থাপিত মার্কাস্ অরিলিয়সের অশ্বারূঢ় প্রস্তরমূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এক ফরাসী শিল্পী ঘোড়াটির গড়নের অনেক ত্রুটি আবিষ্কার করলেন। তাঁর বন্ধুদের অনুরোধে বছরখানেক পরিশ্রম করে তিনি গড়লেন একটি পাথরের ঘোড়া। শরীর বিজ্ঞান, অস্থিবিদ্যা, তথা শিল্পের আঙ্গিকের সমস্ত আইনকানুন তাতে নিখুঁৎ ভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। মার্কাস অরিলিয়সের ষ্ট্যাচুর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো ঘোড়াটিকে। শিল্পী একবার তাকান সেই দিকে, পরক্ষণে নিজের গড়া ঘোড়াটির দিকে। বিস্মিত ও বেদনার্ত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন—আমারটা নিখুঁৎ সন্দেহ নেই; কিন্তু ওইটা জ্যান্ত, আমারটা মরা।

আঙ্গিক অথবা প্রেক্ষিত দুরস্ত হলেই সত্যচিত্র হয় না। প্রকরণ-দক্ষতা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রকরণের চাপে প্রাণ যেন মারা না যায়। "মাসেলের" স্ফীতিতেই স্বাস্থ্যের প্রমাণ নয়। স্বাস্থ্যের প্রমাণ দেহ-মনের পরিপূর্ণ প্রসন্নতায়। আলোছায়ার যথাযথ সমাবেশ এবং প্রেক্ষিত প্রকরণই রূপ সৃষ্টির প্রমাণ নয়। রূপের প্রমাণ তার অন্তর বাহিরের মননশীল পরিপূর্ণতায়। যুগযুগান্তের প্রতীক্ষায় ফুটলো—মুকুল। ফোটার বেদনাকে সে বড় করে দেখায় না। মনে হয় যেন খুব সহজেই সে সুন্দর। তেমনি আর্টিষ্টের সিদ্ধিও বহু আয়াসসাধ্য; কিন্তু তাঁর আর্টে যদি থাকে সেই আয়াসের পরিচয়, সৃষ্টিকে ছাপিয়ে বইতে থাকে দরবিগলিত ঘর্ম স্রোত, তবে আর তাকে আর্ট বলা যায় না। সুন্দরের সন্ধানে গলদ্ঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করছে এমন শিল্পী কল্পনা করা যায় না। পেয়ালা হাতে রসের সন্ধানে যতদিন ঘুরে বেড়াই, ততদিন শিল্পী হতে পারি নি। রসে পৌঁছলে আপনা থেকেই বলে উঠি—অয় ম্যয় জমকে বৈঠ্ গয়া হুঁ, ঘুম্ রহী হ্যায় মধুশালা। এখন আমি জমিয়ে বসেছি, মধুশালা আমার চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। একেই বলে শিল্পীর পুরুষসিদ্ধি।

সঙ্গতি, পরিমিতি ইত্যাদি বজায় রেখে প্রতিমাকার গড়লেন দুর্গা-প্রতিমা। দশদিক ঝলমল করে উঠ্লো। এই এক রূপ। উষর মাটির বুক ছাপিয়ে সবুজ তৃণ দুলতে লাগ্লো, দুলতে লাগ্লো মরকতদ্যুতি। এ আর এক রূপ। সপ্তাশ্ব-যোজিত রথে অরুণ-সারথি সূর্যদেব আকাশ পরিক্রমা করছেন। এই এক রূপ। আর ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মানুষ যাকে উদ্দেশ করে উদাত্ত কণ্ঠে গায়—

হে জবাকুসুমকান্তি, আমার তমো দূর কর, আমার ললাট জ্যোতির্ময় হোক্—সে সূর্যের রূপ আর এক। হিংস্র ক্ষিপ্রতায় শিকারীর অব্যর্থ সন্ধানকে বার বার যে ব্যর্থ করে, সে বাঘের রূপ এক ; আর উল্লসিত শিল্পী ভীষণে-মধুরে মিশিয়ে যে বাঘের রূপ আঁকলেন—Tiger, Tiger, burning bright!—সে বাঘের রূপ আর এক। এক গাছি মালা ও একটি তরবারী, এ দুয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কিন্তু বীরের হাতে আর্তত্রাণের জন্য শোভা পায় যে তরবারী, তার রূপ আর মালাগাছটির রূপ যেন একাকার হয়ে গেছে। হরশিরশ্চন্দ্রকলার মতো বারাণসীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার এক রূপ। আর অহল্যাবাই ঘাটের উপর সমভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন ধ্যাননিমগ্না মকরবাহিনী ; তাঁর রূপ আর এক। এইভাবে রূপে রূপে কত ভেদ। রূপকৃৎ এবং রূপবিদের ভেদে আবার একই রূপের কত ভেদ। শিল্পের ষড়ঙ্গের অন্যতম হচ্ছে এই রূপভেদ। রঙ, রূপ আর রেখার ত্রিবেণী সঙ্গমেই রসের অধিষ্ঠান।

এক রূপের সঙ্গে আর একের ভেদ থাকলেও উৎকর্ষের অনুপাতে রূপসৃষ্টির "তর-তম" বিচার করতে যাওয়া অর্থহীন। একটি সুন্দর খোড়ো চালের ঘর, আর তাজমহল, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর সুন্দর—এ প্রশ্নে শিল্পী নিরুত্তর। রঙ ও রেখার বন্ধনে ধরা পড়লো যে তৃণখণ্ড, রসোত্তীর্ণতায় তা ধ্যানী বুদ্ধের সগোত্র হতে পারে। সত্যের আকর্ষণী শক্তিকে উপযুক্ত প্রমাণাদির সাহায্যে যদি ভাবলাবণ্যযুক্ত রূপ দান করতে পারি তবেই তা হয় রসোত্তীর্ণ। রসোত্তীর্ণতাই শিল্প-জিজ্ঞাসার চরম কথা।

রসোত্তীর্ণতা যথোপযোগিতাকে অস্বীকার করে না। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি থেকে আরম্ভ করে একটি কাটারী, এ সবই গড়া হলো বিশেষ দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। কাটারীটা তৈরী করতে হয় ব্যবহারযোগ্য করেই। নতুবা, বৈষ্ণব কবির সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়—কনক কাটারী কামে নাহি আওল, উপরহি ঝকমকি সার।

যথোপযোগিতা আর্ট বিচারে একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। রূপের মধ্যে যদি অভাব থাকে ভাবানুষঙ্গের, সৃষ্টি যদি স্বয়ং রূপ না হয়, অর্থাৎ রূপসৃষ্টি যদি নিহিত ভাবের স্মারক ও সমর্থক না হয়, তবে রূপকার হন শিল্পনীতিভ্রষ্ট। বানরের মূর্তিতে কারুকৃৎ দান করেন বানরত্ব, তবেই হয় সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়া নিশ্চয় অপরাধ। কিন্তু বানর গড়তে শিব গড়াও কম অপরাধ নয়। উচ্চাঙ্গের প্রতিম এবং প্রতীক শিল্প থেকে সুরু করে নিত্য ব্যবহার্য কারুশিল্প—এ সবগুলোই একই সঙ্গে হলো সুন্দর এবং ব্যবহারযোগ্য। সৌন্দর্য এবং ব্যবহারযোগ্যতা, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো ন্যায়শাস্ত্রের বিচার্য ; শিল্প বিচারে এ রকম পার্থক্যের অবকাশ নেই।

চেতনার বিভিন্ন স্তরে, জীবনী শক্তির ক্রিয়াশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, একটি অর্থব্যাপক জীবনাদর্শ কখনও প্রতীকে, কখনও প্রতিমায়, কোথাও বা পটে আর কোথাও বা পুতুলে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, আল্পনায়, কারু ও চারু শিল্পে, নাগর ও গ্রামীন্ জীবনযাত্রায়, লোক-স্থিতি এবং রাষ্ট্রস্থাপনায়, খান্দানি এবং লৌকিক শিল্পে, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, ব্যবস্থাপক, কবি, বাউল, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, সকল প্রকার আর্টিষ্ট এবং আর্টিসানের মাধ্যতম রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। এই হলো যে কোনও সমাজের সুস্থ, সহজ, সুন্দর রূপ। এই রকম সমাজে কর্মী ও ভাবুকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে নি। সৌন্দর্য এবং ব্যবহারযোগ্যতার মূল্যবোধ অথবা মূল্যভেদ নিয়ে এখানে তর্কের কোনও অবকাশ নেই। সংস্কৃতির এই প্রকারের স্তরেই প্রতীকের আবেদন বিশ্বজনীন এবং উচ্চাঙ্গের প্রতীক শিল্প থেকে সুরু করে গ্রাম্য শিল্পীর পট, পুতুল এবং প্রতিমার মূল বক্তব্যটি একই সুরে গাঁথা। Level of referenceএর বিভিন্নতায় তারতম্যটুকু ঘটে থাকে কেবলমাত্র প্রকাশের।

কেন্দ্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত যে সমাজ, নূতন কোনও সার্বজনীন মূল্যকে অঙ্গীকার করার সৌভাগ্য যার হয় নি, এক কথায় যার তারতম্য বিনষ্ট হয়েছে, সে সমাজে আর্টিষ্ট ও আর্টিসানের মধ্যে কর্মী এবং ভাবুকের মধ্যে ব্যবধান হয় ক্রমপ্রসারণশীল। ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী তখন সুন্দর না হলেও বাজার চল্‌তি মূল্য পায়, আর সৌন্দর্য ব্যবহার-যোগ্যতাকে করে অস্বীকার। আর্টিষ্ট হয়ে ওঠেন গজদন্ত গম্বুজের অধিবাসী। প্রতীকের ভাষা সার্বজনীনতা হারিয়ে ফেলে হয়ে ওঠে একজনীন অথবা বিশেষ গোষ্ঠীজনীন।

সুস্থ, সুন্দর সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবস্থায় আর্টের উপর পড়ে collective অথবা co-operative ideationএর ছাপ। যুগ যুগ ধরে শত শত শিল্পীর সাধনায় জন্ম নিল বরোবুদর এবং প্রাম্বানের বিরাট ভাস্কর্য, দ্বাদশ শত শিল্পীর মানস শতদল গড়ে উঠলো কোনার্কের বৌদ্ধ মন্দির। কোনও ব্যক্তি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ তারা বহন করে না। তবু মনে হয় এগুলো বুঝি কোনও একক অসামান্য প্রতিভার সৃষ্টি। বহুর মধ্যে একত্বের সেতু রচনা করেছে collective ideation বিশিষ্ট অথচ সার্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী না হলে কোনও সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। অন্যত্র বিশ্ব-কেন্দ্রিক না হয়ে, শিল্প হয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

তাই অসুস্থ সমাজে রেখা ও বর্তনা, প্রেক্ষিত ও প্রকরণ, আলো ও ছায়ার নানা রকম পরীক্ষা, নিরীক্ষাই আর্ট-বিচারে পায় চরম মূল্য। প্রাচ্যের শিল্পীকে আলোর জগৎ-সংসারকে দেখেছেন উদ্ভাসিত, তাতে ছায়া পড়বার কোনও সম্ভাবনা নেই। abstract lightএর আলোয় দেখলে বস্তুর বস্তুত্ব নষ্ট না হয়েও তার রং রূপ এবং প্রেক্ষিত যায় বদলে। জীবন-দর্শনের বিশিষ্টতাই প্রাচ্য শিল্পে দান করেছে এই রকমের বৈশিষ্ট্য। আর সেই দর্শনের সার্বজনীনতাই উচ্চাঙ্গের abstract এবং Symbolic art কেও একদিন সার্বজনীন মূল্য দান করেছিল। আর্ট সেদিন ছিল আত্মসংস্কারের এবং আত্ম-দর্শনের উপায়।

চেনা ও জানা

শ্রীশিশির সেন

যুদ্ধের পরের সময়টার কথা বলছি।

ছাটাই ব্যবস্থায় অজয়েরও সাপ্লাই-অফিস থেকে চাকরী গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ ডিগ্রীটা চাকরী রাখতে এতটুকু সাহায্য করল না! সময় সময় এ কথাটাই ওর মনে বেশি করে লাগে।

আবার সেই পরীক্ষা পাশের পরে যেমন অফিসের দুয়োরে দুয়োরে ধর্ণা দিয়েছে, এবারেও ঠিক তেমনি করেই গোটা ডালহৌসী স্কোয়ার ও ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের অফিস অঞ্চলটা চষে ফেললে। তার পি-সি-রায়ের সদ্য-প্রকাশিত 'আচার্য্য বাণী' দুখণ্ডই নিঃশেষে পড়েছে—কিন্তু তা-ও মনে শান্তি পায় না। বাঙ্গালীর ছেলের চাকরী ছাড়া গতি নেই। তা'ছাড়া মূলধন কোথায়? ব্যবসায় আরও আছে নর্থ-পোল সাউথ-পোলের দূরত্ব সীমার মত 'লাভ' আর 'লোকসান' দুটি কথা—যেন আকাশ পাতাল তফাৎ।

সেদিন অফিসের ভূতপূর্ব সহকর্মী সমীর বলছিল: বাঙালীর ছেলের এবারে ব্যবসা ছাড়া গতি নেই। মূলধন মূলধন করে চীৎকার করে লাভ নেই। বীমার ব্যবসাই একমাত্র ব্যবসা—যা'বিনা মূলধনে করা চলে। আমিও যোগ দিয়েছি, তুমি-ও এসে হাতে হাত মিলাও বন্ধু!

জীবন-বীমা সম্বন্ধে অজয় একেবারে যে না ভেবেছে তা' নয়। কিন্তু সুলেখা কি ভাববে—এজন্য গা' করে না।

সুলেখার সঙ্গে অজয়ের বিয়ে একরকম ঠিক। শুধু একটু অপেক্ষা অজয়ের একটা ভাল চাকরীর জন্য। মেয়েদের আসল পরিচয় ত স্বামীর পদমর্য্যাদেই।

সেদিন সমীর এসে একরকম জোর করেই অজয়কে নিয়ে গেল, এক জীবনবীমার অফিসে।

বীমা কোম্পানার ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর জিজ্ঞেস্ করলেন: এ-লাইনে পূর্ব অভিজ্ঞতা কিছু আছে?

অজয় নির্বোধের মত একবার সমীর ও ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে ব'ললে: আজ্ঞে না।

সমীর একথা শুনে অজয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে: শিক্ষিত ছেলে, রেস্‌পেকটেবল্ কানেকশন এবং হাই সার্কেলে মেশামেশা—অভিজ্ঞতা কি বলছেন স্যার—জীবনবীমা করতে যা' যা' গুণ, তার সব কটাই এঁর আছে।

ম্যানেজার হো হো করে একচোট হেসে নিজের সিগারেটটিতে একটি জোর টান দিয়ে বললেন: বেশ শুনে খুব খুসী হলুম। জীবনবীমা প্রফেশন হিসেবে খুবই রেস্‌পেকটেবল্—বুঝলেন।

এর পর পূর্ব কথার জের ধরে বললেন: কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ করছি কিছু মনে করবেন না—প্রশ্নগুলো জীবন-বীমা ব্যাপারে একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত······

অজয় বললে: বলুন।

ম্যানেজার বললেন: দিনে ক' কাপ চা' খেতে পারেন?

অজয় একথা শুনে দস্তুরমত ঘাবড়ে গেল।

সমীর মুচকে হাসলো।

ম্যানেজার মুখে পর্ব্বত প্রমাণ গাম্ভীর্য্য এনে চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে কোন উত্তর না পেয়ে বললেন: আচ্ছা ক' প্যাকেট সিগারেট দিনে খেতে পারেন? ভয়ের কিছু নেই নিঃসংকোচে বলুন—We are all friends here।

অজয় থতমত খেয়ে যায়। বাপের বয়সী লোক, তার সঙ্গে সিগারেট খাওয়া সম্বন্ধে কি আলোচনা করবে বুঝতে পারে না। কারণ অজয় এ সব বিষয়ে একটু লাজুক ছিল।

অজয়ের চুপচাপ ভাব দেখে ম্যানেজার একটু হেসে বললেন: আপনি এত কি চিন্তা করছেন অজয়বাবু? ইন্‌সিওরেন্স্ লাইনে সাকসেস্‌ফুল হতে গেলে এসব জিনিষ শিখতেই হবে। এতে লজ্জার কিছু নেই।

সমীর বললে: তা' হয়ে যাবে স্যার, সেজন্য কিছু

ভাবনা নেই। এইবার ঠিক করে ফেলুন—তিন লাখ বা পাঁচ লাখ, কোনটাতে কাজ করবে।

ম্যানেজার বললেন : অজয়বাবুই বলুন ওঁর কি ইচ্ছে ?

সমীর বললে : পাঁচ লাখই ঠিক করে দিন—Direct organisationএ কাজ করবে…বুঝলে অজয়, পাঁচ লাখে ৩৫০৲ টাকা মাইনে, আর তিন লাখে ২২৫৲ টাকা। আপাততঃ মাসে ৩৫০৲ টাকা হিসেবেই কাজ কর।

ম্যানেজার বললেন : বেশ ত।

অজয় ভাবলে : এরা বলে কি। চাকরীর খোঁজ করতে করতে জুতোর তলায় আবার হাফ্‌সোল লাগাবার উপক্রম হয়েছে—তবু চাকরীর সন্ধান মিললো না, আর এমনি অযাচিতভাবে একটা ৩৫০৲ টাকা মাইনের চাকরী হাতে এসে পড়লো—এরা বলে কি…সে কি স্বপ্ন দেখছে, না কোন যাদুকরের আখড়ায় এসে পড়েছে…

ম্যানেজার আবার বললেন : পাঁচ লাখ টাকার কাজ কিছু নয়। একটা প্রোগ্রাম করে কাজে নেবে পড়ুন আপনি হয়ে যাবে।

সমীর বললে : তা'হলে একটা appointment letter issue করে দিন।

ম্যানেজার বললেন : আমি আজকেই issue করে দিচ্ছি।

সন্ধ্যার সময় নতুন খবর শোনাবার জন্য অজয় সুলেখাদের বাড়ীতে এলো।

দরজার কড়া নাড়তে সুলেখাই এসে দরজা খুলে দিলে।

অজয়ের চোখে মুখে আজ একটা খুসীর আমেজ জড়িয়ে ছিল। অজয়ের দৃষ্টিতে যে প্রাণ-প্রাচুর্য্যের আভাস ছিল, তা' দেখে সুলেখাও বহুদিন পরে আনন্দিত হলো। কারণ ইদানীং অজয়ের বিমর্ষভাব ও দুঃখবাদের কাহিনী শুনতে শুনতে মুষড়ে পড়েছিল সে।

সুলেখার টেবিলের উপর একটি বই খোলা পড়েছিল। অজয় বইটি হাতে নিয়ে বললে : কি বই পড়ছিলে সুলেখা ?

সুলেখা অজয়ের হাত থেকে বইটি কেড়ে নিয়ে বললে : থাক্—বইয়ের আলোচনা পরে হবে—এখন বল দেখি তোমার খবর কি ?

অজয় হেসে বললে : খবরের মধ্যে আজ বীমা কোম্পানীতে ৩৫০৲ টাকা মাইনের একটা চাকরী পেয়েছি।

সুলেখা উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে বললে : সত্যি ?

অজয় সান্ত্বনার ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে বললে : সত্যি তাই…

সুলেখা এবারে আব্দারের সুরে বললে : তবে আর দেরী নয়, আমার আর এখানে একটুও ভাল লাগছে না…

অজয় বললে : একটু ধৈর্য্য ধর, অন্ততঃ একটা মাস যেতে দাও—হাতে মাইনেটা পেয়ে নি…

সুলেখা বললে : তা'ত বটেই, ওটুকু ধৈর্য্য ধরার ক্ষমতা আমার আছে…

অজয় বললে : আজ যেন কি রকম পৃথিবীটাকে নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করছে…আমি যেন আবার নতুন আলো দেখতে পাচ্ছি…টাকাটা মানুষের কি দরকারেই না লাগে, টাকা না হলে চোখ একেবারে অন্ধকার…

সুলেখা বললে : তোমাকে কি কাজ করতে হবে ?

অজয় বললে : লোক বেছে বেছে এজেন্ট তৈরী করে তাদের দিয়ে Life Insurance case জোগাড় করতে হবে…এ কাজ ত কখনও করিনি…সবে হাতে খড়ি…এখন কাজটা রাখতে পারলেই হয়।

সুলেখা তর্জনী তুলে বললে : এই আবার তোমার দুঃখবাদ আরম্ভ হলো—আমার একটুও ভাল লাগে না—আজকের এই আনন্দের দিনে আমাকে কি দেবে বল দেখি ?

: কি চাও, তুমি বল ? আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই দেবো।

সুলেখা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে : মাগো, পুরুষগুলো কি বোকা…

অজয় হাত দুটো একটু ঝেড়ে নিয়ে বুকটা একটু ফুলিয়ে নিজের চেহারার দিকে বার কয়েক তাকিয়ে বললে : আমার বোকামির কি লক্ষণটা দেখলে…

সুলেখা বললে : তা-ও আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে…

অজয় একটু গম্ভীর হয়ে বললে : যারা বোকা তাদের না হয় একটু দেখিয়েই দিলে। সবার ত আর সমান বুদ্ধি হয় না।

সুলেখা অজয়ের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে খেলা করতে করতে বললে : যাক্ অভিমান আর করতে হবে না

—কিন্তু তুমি কি-ছু-ছু বোঝ না—এমন মানুষ নিয়ে আমি কি করব ?

অজয় হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে চুপ করে বসলো।

সুলেখা বললে : হয়েছে মশাই, ঢের হয়েছে···এবারে একটু সাহিত্যের কথা বলি শোন···

অজয় বললে : বল—

সুলেখা বললে : কি পড়ছিলাম জান ?

অজয় : কি ?

সুলেখা : এই ছোটলোকদের নিয়ে লেখা সাহিত্য আর পড়তে ভাল লাগে না। কতকগুলো চাষা—তার জীবন—তার কামনা-বাসনার বিচিত্র ইতিহাস—হয়ত বা আবার ওই চাষা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়ে বসলো—তখন চললো সেই চাষার কামনার জয়রথ—ইতরমো চরিতার্থ করবার পথে হয়ত নিজের ছেলে হয়ে দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী···তখন চাষা গেল রেগে—এ-রাগ বলে রাগ নয়, এ-হলো পুরুষের চিরকালের স্বভাব।

অজয় : হুঁ—এতো পার্ল বাকের 'গুড আর্থ'। নোবল পুরস্কার পাওয়া বই······

সুলেখা : তা'তে হলো কি ? তুমিও ত সেই পুরুষমানুষ।

অজয় : পুরুষমানুষ হলেও আমি চীন দেশের পুরুষ-মানুষ নই। আমার নীতি আছে, ধর্ম আছে, আমার সমাজের স্বাস্থ্য আছে।

সুলেখা : তোমাদের সমাজের স্বাস্থ্য আছে, দেহ নেই।

অজয় : কি দেহ নেই ? তবে দেখবে, দেখিয়ে দেবো।

সুলেখা : থাক্, অত সুখে আর কাজ নেই······

অজয় : তবে তোমার কি ভাল লাগে ?

সুলেখা : আমাদেরই পরিচিত যে সমাজ, যাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, তাদেরই পরিবেশে আমি কাহিনী শুনতে চাই······

অজয় : মানুষের জৈবিক ক্ষুধার কাহিনী ত শুনতে চাও······

সুলেখা : অসভ্য কোথাকার······

অজয় : অসভ্য বলছ, কিন্তু পুরুষের মুখ আল্‌গা করতে তোমরাই সাহায্য কর······

সুলেখা : বাজে বকো না বলছি······

এরপর একমাস একদিন পার হয়ে গেল।

অজয় যেদিন ৩৫০্ টাকা মাইনে হাতে পেল, তখন মনে হলো—পৃথিবীটা কি সুন্দর··· এখনো এখানে আছে আলো, আছে রং···অথচ এই পৃথিবীটাকেই একমাস আগে কি ভীষণ কুৎসিত মনে হয়েছে···

সুলেখাকে এসে অজয় বললে : তুমি কি চাও বলতো ? শাড়ী, ঘড়ি, আংটি, বই—কি চাই তোমার ?

সুখেলা বললে : আমি কিছুই চাই নে···তোমার উড়নচণ্ডে স্বভাবটা শুধরেছে দেখলেই আমি সবচাইতে সুখী হবো···ক'দিন আগেও দেখেছ দুটো পয়সার জন্ম কি কষ্ট পেতে হয়েছে···এখন একটু রাখতে শেখো···

অজয় : তখন জানতুম না পয়সা রোজগার এত সহজ······

সুলেখা : এখনই সহজ কোথায় দেখলে ? তুমিই ত সেদিন বললে কাজ কিছু এগোয় নি···

অজয় একটু বিমর্ষভাবে বললে : কাজ আমার থাকুক বা না থাকুক, আমার নতুন চাকরার একটা অংশ প্রথমে তোমায় দিতে চেয়েছিলুম, তা'কে তুমি অপমান করলে······

সুলেখা : একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে আমি কিছু অন্যায় বলিনি···টেলিফোন গাইড্ দেখে দেখে লোকের বাড়ী ঘুরে বেড়াও—এতে কম কষ্ট আমি দেখি নে······

অজয় : Insuranceএর কাজই ত এই···নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয়—এতে একটা রোমাঞ্চ আছে, জান ?

সুলেখা : যত রোমাঞ্চই থাকুক, আমার একটুও ভাল লাগে না···কত কষ্টের টাকা···

অজয় : ভারি ত আমার কাজ—সিগারেট খাওয়া, চা খাওয়া, আর গল্প করা—তা-ও যদি না পারি, তবে আর কোন্ কাজ পারবো, বলতো ?

সুলেখা : তুমি রাগ করো না—একটা বছর যাক্—

হাতে কিছু জমুক—তারপর যত খুসী দিও···দেবার দিন যথেষ্ট পাবে······

এরপর আলোচনা অকারণেই এক সময় ভেঙে যায়।

তিন মাস পার হয় হয়।

এমন সময় ম্যানেজার অজয়কে ডেকে পাঠালেন একদিন।

অজয় ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

ম্যানেজার বললেন: তিন মাস পার হতে চললো কিন্তু আপনার কোটা'র হাফও হয় নি। কি করবেন স্থির করলেন ?

যে অজয় কথা বলতে একদিন হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতো, সে আজ তিন মাস বীমা কোম্পানীতে কাজ করে চোখে-মুখে কথা কয়। এমনি গুণ বীমা কোম্পানার।

অজয় গম্ভীর হয়েই বলল: Pro-rate basis এ worker recruit করলে worker কাজের scope কি করে পায় বলুন ত ?

ম্যানেজার: কিন্তু তার জন্য ত আপনাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে···আপনাকে কোটার প্রথম তিন মাসে ৬০% পার্সেণ্ট কাজ করলেই চলবে, কিন্তু তার অর্দ্ধেকও হয় নি যে······

অজয়: আমার Sincere effort এবং honest attempt নিশ্চয়ই আপনি লক্ষ্য করছেন······

ম্যানেজার: তা' করছি বলেই ত চুপ করে আছি···

অজয়: তবে চুপ করেই থাকুন—বছর ঘুরে গেলে আমার কাজের বিচার করবেন······

সত্যি সত্যি একদিন বছরও ঘুরে গেল এবং অজয়ও মাস মাস ৩৫০৲ টাকা করে মাইনে পেল।

এখন অজয়ের একটা নিজস্ব মেজাজ হয়েছে। সব জিনিষ ঠিকমত কাছে না পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়।

সুলেখার বিষয়েও এখন মনে মনে কঠোর সমালোচনা করে। একদিন যখন চাকরী ছিল না তখন সুলেখার চিন্তাতেই মন ভরে ছিল। সুলেখার রূপ ও ব্যবহার এখন যেন কেমন বিশ্রী, অশোভন ঠেকে···

ইচ্ছে করলে সুলেখার চাইতে সুন্দরী মেয়ে সে এখন বিয়ে করতে পারে···বিয়ের আগেই সুলেখা বড্ড বেশি নগ্ন হয়ে গেছে। বিয়ের আগে আইবুড়ো মেয়ের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। হলোই বা অজয় প্রেমিক। যে মেয়ের এমনি স্বভাব, বিয়ের পরেও সে এমনি ঢলাঢলি করতে পারে···

অজয় সুলেখাদের বাড়ীতে যাতায়াত এখন কমিয়ে দিয়েছে······

জিজ্ঞেস্ করলে বলে: কাজের চাপ বেশি···

কিন্তু আসলে ওর মন সুদূরে আনাগোনা করে। সত্যি কথা বলতে সুলেখার চাইতেও অন্য কোন সুন্দরীর উপাসনায় মন ওর উন্মুখ। সময় সময় নিজের উপর ওর রাগ হয়—কেন এত তাড়াতাড়ি সুলেখার কাছে নিজেকে উন্মোচন করলে—ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার অপেক্ষায় একটু ধৈর্য্য ধরলে কি ক্ষতি ছিল······

এদিকে সুলেখা ভাবে: নারীর সত্যিকার পরিচয় হচ্ছে তার স্বামী। টাকা অবিশ্যি অজয় উপায় কচ্ছে। কিন্তু তার পরিচয় কি ? আসলে সে বীমার দালাল। মাগো, কি ঘেন্না···মরে গেলেও স্বামীর এই পরিচয় লোককে সে দিতে পারবে না—এর চাইতে কেরাণীও ভাল—মাইনে কম হলেও সম্মান আছে, সমাজে এ পদবী অচল নয়। দুর্গম পথের যাত্রার মতই হবে তার ভাবী স্বামীর পরিচয়—যার রূপ দুর্গমের মতই ভয়াল···আজকালকার ছেলেগুলোও হয়েছে বেয়াড়া ধরণের—নিজের পরিচয় পাকা হবার আগেই মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে আসে—একটু দুর্ব্বলতার সুযোগ পেলেই মাথায় উঠে বসে···

সুলেখার মা ওর বাবাকে বলছিল: এবারে অজয়ের সঙ্গে সুলেখার বিয়েটা শেষ করে দাও। অজয়ের চাকরাও ত বছর ঘুরে এলো।

বাবা বললেন: বেশ ত। তুমি মেয়ের মত নিয়েছ।

মা বললেন: এত কাণ্ডের পরেও মত। তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছ ?

বাবা বললেন: তবে দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেল···

সুলেখা ওর বিয়ের তারিখ শুনে বললে: মা তুমি অন্য পাত্র দেখ।

মা শুনে অবাক্ বললেন : সে কি রে লেখা ? এত ব্যাপারের পর অন্য পাত্র···মেয়েদের এত চঞ্চল হতে নেই···

সুলেখা বললে : তুমি পাত্রের মত নিয়েছ। ওই তারিখে ওর সুবিধে হবে কি না ?

মা একথা শুনে একটু লজ্জিত হলেন।

এরপর মা দূত পাঠিয়ে খবর পেলেন—অজয় এখন বড় ব্যস্ত। এ-সময়ে বিয়ে সম্ভব নয়।

মা বললেন : লেখা তোদের কি কোন গোলমাল হয়েছে রে···বল্, মা'র কাছে কোন লজ্জা নেই···

লেখা চোখেমুখে সরলতা ঢেলে দিয়ে বললে : কই··· না—ত !

আরও তিন মাস পর।

ম্যানেজার আবার অজয়ের তলব করলেন।

অজয় ধীর স্থির ভাবে ম্যানেজারের বাণী শোনবার জন্য বসেছে।

ম্যানেজার গভীর দুঃখ ও বিষাদের সঙ্গে বললেন : আপনার চাকরী আর কিছুতে রাখতে পারছি নে—হেড্ অফিস আপনার কাজের এ্যানালিসিস্ করেছে—গত বছরের কেস্ নাইন্‌টি পার্সেন্ট ল্যাপস্ করেছে—কাজেই আর আপনার চাকরী রক্ষা করা চলে না···

এ কথা শোনবার পর অজয়ের পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে গেলো। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। পৃথিবীকে মনে হলো কুৎসিৎ।

ম্যানেজারকে মুখে বললে : ধন্যবাদ।

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হলো এ-সময়ে সুলেখা ছাড়া ওকে সান্ত্বনা দেবার যে পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

বাসায় ফিরে একটা চিঠি লিখে চাকর পাঠিয়ে দিলে সুলেখার মা'র কাছে : ওই তারিখেই বিয়ে হবে ··

বিয়ের পর সুলেখা যখন শুনলে অজয়ের চাকরী নেই, তখন বললে : আমাকে বিয়ে করে বেকার ছেলে ফাঁকি দিলে শুধু আমার বাবা আর মা'কে—আমাকে কিন্তু এ-ত-টু-কু ফাঁকি দিতে পারনি ··চাকরী পেয়ে তুমি অজানা ও অচেনা দেশে চলে গিয়েছিলে, আজ তোমায় সত্যি সত্যি চিনলুম জানলুম···

অজয় ভাবলে—মেয়েদের এ-ছাড়া আর কি-ই বা আছে···এটা সুলেখার স্বামীকে সুখী করার একটা কথার কথা—ভা-ল-বা-সা···

এপারে—ওপারে

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, কাব্য-ভারতী

তোমার আমার জীবনের প্রেম মরণে কি হবে শেষ ?
অজানার পারে—এ ভালোবাসার—যাবে না কি গীতিরেশ ?

জগতের মাঝে যত হাসি গান
পেয়েছিনু মোরা দেবতার দান,
দিন শেষে কি গো হবে অবসান—
বিদায়ের সাথে সাথে ;
স্বপনসৌধ র'চেছিনু যাহা ফাগুন পূর্ণিমাতে।

পৃথিবীর বুকে সসীম-প্রেমের মৃত্যুর হাতে লয়
আলোকের তীরে অসীম-প্রেমের পুলক-শিহর রয়।

ধরা হ'তে মোরা যাইব মুছিয়া,
স্মৃতিটুকু শুধু রহিবে বাঁচিয়া,
বাঁধিবে মোদের নিবিড় করিয়া
অসীমের প্রেমডোর—
বিচ্ছেদ ব্যথা আসিবে না সেথা, বিগলিত আঁখি লোর।

বনফুল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে' সব বললেন তিনি। ছকুবাবু ব্রজেশ্বর দম্পতীর নৈশ-অভিযানের কাহিনী শুনে পুলকিত তো হলেনই না, উপরন্তু তারা যে কোনও মুহূর্ত্তে এসে পড়তে পারে শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"সীয়ারাম, সীয়ারাম—তারা তো তাহলে এলো বলে —অ্যাঁ"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো আশা করছি। আসবেন নিশ্চয়ই। তাঁদের এখানে দেখতে পাব আশা করেই তো এসেছিলাম আমি—"

"কিন্তু আমি তো তাহলে মহামুশকিলে পড়ে যাব দেখছি। তাঁদের কোন ঘরে থাকতে দেব কি করব আমার তো কিছুই জানা নেই। সুরো হয়তো চাবি নিয়েই চলে গেছে। হনুমানজি বোম বখেড়ায় ফেলে দিলে দেখছি ঝড়াক্‌সে"

ছকুবাবু চেয়ার থেকে উঠে অস্থির ভাবে ঘরের চারদিকটা পরিক্রমণ করে নিলেন একবার।

"এতে ভাবনার কি আছে"—সদারঙ্গবাবু বললেন—"চাকরটা নিশ্চয় জানে সব। জানা উচিত অন্তত। নিশ্চয়। ডাকব ?"

"ডাকুন, ডাকুন। কিছু করুন একটা। অপরিচিত লোক সব হুড়মুড় করে' এসে পড়লে দিল ঘাবড়ে যায় আমার। ওই ঘণ্টাটা টিপুন। আচ্ছা, আপনি বাইক করে' গিয়ে সুরেশ্বরীকে ডেকে আনতে পারেন ?"

"শুনুন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। ওদের জানি, অতি অমায়িক লোক ওরা। এসেই ঘরের লোকের মতো হয়ে যাবে দেখবেন। কিছু বেগ দেবে না। এসেই খুব সম্ভবত শিকারে চলে যাবে"

"তা হতে পারে। যাক্, ব্রজেশ্বরবাবু আসছেন তবু ভাল। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন কিছুদিন শুনেছি। খবরাখবর ছোঁবার মতো কিছু পাব আশা করি। খাঁটি কলকাতিয়া লোককে বড় ভয় করি। কেমন যেন ফসকে ফসকে যায়—"

"উনি বালিয়া জেলায় গিয়েছিলেন না কি ? হিষ্ট্রির রিসার্চের জন্তে, না কংগ্রেস ক্যামপেন্ ?"

"মালুম নেই"

পরেশ এসে প্রবেশ করল।

সদারঙ্গবিহারী তার দিকে চেয়ে বললেন—"ব্রজেশ্বর-বাবুরা যদি এসে পড়েন—আসবেনই—তাহলে তাঁরা কোন ঘরে থাকবেন, তাঁদের জন্তে কি কি ব্যবস্থা করতে হবে—তুমি জান তো সব ?"

"জানি"

পরেশ মিতবাক্ ব্যক্তি। বহুকাল থেকে সে সুরেশ্বরী দেবীর কাছে আছে। তার এই ছোট্ট 'জানি'র মধ্যে সে কতখানি যে প্রকাশ করলে তা বাইরের লোকের বোঝবার উপায় নেই। সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে সে যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার প্রাঞ্জল অর্থ—আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের মধ্যে আপনি ফোড়ন কাটছেন কেন মশাই।

"জান ? ও, তাহলে তো মিটেই গেল। বাস্—"

গলা খাঁকারি দিয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে একবার ছকুবাবুর দিকে চাইলেন। তাঁর মনে হল ছকুবাবুর অন্তরে সাহস সঞ্চার করতে হলে ব্যাপারটা আর

একটু বিশদ করা দরকার বোধহয়। পরেশের দিকে চাইলেন তিনি।

"তাঁদের খাবার বসবার শোবার হাতমুখ ধোবার ইত্যাদি ইত্যাদির সব ব্যবস্থা করতে পারবে তাহলে?"

"পারব ইত্যাদি ইত্যাদিটা কি বুঝলাম না—"

"না, ও কিছু নয়। মানে, তারা আসছে—মানে আই মীন, পথে আছে—একটু ইয়ে তো হবেই নিশ্চয়। তবে লোক খুব ভাল। দু'জনেই। আমি তাদের সঙ্গে কাল রাতটা কাটিয়েছি কি না—ঠিক পুরোরাত নয়, খানিকটা, তবু ধাতটা জানা হয়ে গেছে—বিশেষ বেগ পেতে হবে না, —সাদাসিধে একদম। তোমাকে তো বলেইছি গোড়ায় সব। কেবল বকুবাবু—ও ছকুবাবু—তোমাকে ডাকতে বললেন কি না তাই—"

"চুপ করুন"—ছকুবাবু বলেন—"আপনি সমস্ত গোলমাল করে' দেবেন দেখছি। শোন পরেশ, ব্রজেশ্বরবাবুরা আসছেন সব ঠিক করে' রাখ। আমাকে কোনও ঝামেলা যেন পোয়াতে না হয়। বাস্। অত বক্তৃতা করবার দরকার কি—"

সদারঙ্গবিহারীলালের দিকে ভ্রূকুটি করে' চেয়ে রইলেন তিনি।

"সব ঠিক আছে"

পরেশও ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করে' চাইলে সদারঙ্গবিহারীর দিকে।

সদারঙ্গবিহারী একবার ছকুবাবুর দিকে একবার পরেশের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। হাসলেন। পরেশের দিকে চশমার লেন্স থেকে এক ঝলক আলো ফেললেন। হাত দুটো ঘষলেন।

"যাক্ সব ঠিক থাক্‌লেই হল। চমৎকার ব্যবস্থা আছে তাহলে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঃ—খাসা। এইবার আমাকে উঠতে হবে কিন্তু। ওঠা উচিত। যেতে হবে অনেকদূরে কিনা, হনুমানপুর। বৃষ্টিও নামবে মনে হচ্ছে। যাচ্ছে তাই কাণ্ড। কিন্তু উপায় নেই, যেতেই হবে। একটু দেরী হয়ে গেল—তা হোক—এখানে এসে সব ব্যবস্থা যে করে' দিয়ে যেতে পারলাম তাতে ভারী আনন্দ হচ্ছে। খুব। আচ্ছা, এবার চলি তাহলে—নমস্কার বকুবাবু। এ কুকুরটা—"

ছকুবাবু বললেন—"পরেশকে দিন। পরেশ কুকুরটা নাও"

"ও—হ্যাঁ—পরেশ—তোমার নাম পরেশ বুঝি। এই যে নাও, ধর ভাল করে'। না, কামড়াবে না। হ্যাঁ—। আচ্ছা, চলি তাহলে এবার নমস্কার ছকুবাবু—"

কম্পমান ঝুমুককে পরেশের হাতে সমর্পণ করে চলে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ছকুবাবুর দিকে চেয়ে আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসলেন আর একবার। তিনি চলে যেতেই ছকুবাবু হাত উলটে মন্তব্য করলেন—আজব দুনিয়া!

পরেশ মৃদু হেসে বললে—"উনি বরাবরই একটু কিম্ভুত গোছের"

"কিম্ভুত নয়, বুদ্ধু। দিল ঘাবড়ে দিয়েছে একদম। আর একটা ষ্টিংগাহ বানাও। সোডাটা একটু সমঝে দিও, —বুঝলে"

"আজ্ঞে"

ষ্টিংগাহ শব্দটা কোন দেশীয় তা ঠিক না জানলেও পরেশ এটুকু বুঝেছিল যে 'ষ্টিংগাহ বানাও' মানে 'মদ ঢাল'। ঢালতে লাগল।

(১৫)

দু'দিনের মধ্যেই অনীতাকে আবার ট্রেণে চড়তে হল। এবার সঙ্গে মা বাবা। স্বয়ম্প্রভা দেবী একটি কোণে গিয়ে বসেছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ-চোয়াল-নিবদ্ধ মাংসপেশীগুলির কুঞ্চন-প্রসারণ দেখে মনে হচ্ছিল অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে যে সব বক্তৃতা করতে হবে তারই মহলা দিচ্ছেন যেন তিনি মনে মনে। অনীতার বাবা জিতুবাবু গাড়ির আর এক প্রান্তে বসেছিলেন। সুখের বিষয় গাড়িতে আর কেউ ছিল না। সঙ্গে জিনিসপত্রও ছিল না বিশেষ। স্বয়ম্প্রভা একটি মাত্র বড় ব্যাগ এনেছিলেন। ব্যাগটি তাঁর এবং অনীতার শাড়ি-ব্লাউস সায়া-সেমিজেই ভরে' উঠেছিল প্রায়। জিতুবাবুর একটি কাপড় এবং গেঞ্জিও ছিল অবশ্য তার মধ্যে। কোট কামিজ ছিল না। এক-কোটে এবং এক-কামিজেই তিনি চালিয়ে দিতে পারবেন এই সম্ভবত স্বয়ম্প্রভা প্রত্যাশা করেছিলেন। জিতুবাবু কিছুই আনতে চান নি, এমন কি নিজেকেও না। তাঁকে জোর

করে' টেনে এনেছেন স্বয়ম্প্রভা। গাড়ির এক কোণে চুপ করে' বসে ছিলেন তিনি বাইরের দিকে চেয়ে। বর্ষাকালে নির্জ্জন মাঠে গাছতলায় একক গাধাকে ভিজতে দেখেছেন কখনও? জিতুবাবুর অবস্থা অনেকটা সেই রকম।

অনীতাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। কালো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মর্ম্মভেদিনী হয়ে উঠেছিল যেন। মেজাজ সপ্তমে চড়ে' ছিল তার। সমস্ত পৃথিবীর উপরই চটেছিল সে। সব চেয়ে বেশী রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এত কেলেঙ্কারি কেন করতে গেল সে! রাগ হচ্ছিল খাণ্ডার মায়ের উপর। মা যেন তার এই দুর্দ্দশাটা উপভোগ করছে মনে মনে। ক্ষেপে বসেছিল সে। সুশোভনের উপর প্রথমে তার যে রাগটা হয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়ে অন্য রকম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এখন। অর্থাৎ তার হৃদয়-নাট্যমঞ্চে যে নিদারুণ নাটক অভিনীত হচ্ছিল সে নাটকে সুশোভনই এখন একমাত্র পাষণ্ড নয়। সুশোভনের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি প্রথমটা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল তার শিখা অনেকটা কমে' এসেছে এখন। প্রদাহও নেই আর তেমন। এখন আর একটা সূক্ষ্মতর এবং অধিকতর মর্ম্মান্তিক জ্বালায় তার সমস্ত বুকটা পুড়ে যাচ্ছিল। এতক্ষণ এ বিষয়ে সে তেমন সচেতনও ছিল না। স্বয়ম্প্রভার কুঞ্চিত চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি এবং চোয়াল-চিবুকের নীরব সঞ্চালন দেখে হঠাৎ সে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলে। করবামাত্রই সমস্ত চিত্ত তিক্ত হয়ে উঠল নিমেষে, স্কন্ধযুগল আপনিই উঠে পড়ল কানের দিকে। সুশোভন? হ্যাঁ সুশোভন তো তাকে দাগা দিয়েইছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যদিও মনে মনে সে এখনও সঙ্গোপনে আশা করছে যে হয়তো সন্দেহটা অমূলক, হয়তো তার ব্যবহারের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে একটা। কিন্তু মায়ের এ কি ব্যবহার? সুশোভনের দোষ ধরতে পেরে এবং বিনা প্রমাণে সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে বিজয়োল্লাসে তাকে শাস্তি দিতে যাওয়ার আগ্রহে মায়ের চোখে যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তা ঠিক যেন জাল-বদ্ধ পশুকে দেখে প্রলুব্ধ শিকারীর দৃষ্টির মতো। হিংস্র!......অনীতা অজ্ঞাতসারে কখন যে তার দোষী স্বামীর পক্ষ অবলম্বন করেছে মনে মনে তা সে নিজেও টের পায় নি প্রথমে। ছি, ছি, এমন বোকামি সে করতে গেল কেন! রাগের মাথায় কেন সে সব কথা বলতে গেল মাকে? ওই বলিষ্ঠ নাতি-বাগীশ নির্ম্মম মহিলাটিকে সে কি চেনে না? না, সুশোভনের উপর আর রাগ ছিল না তার। ঈর্ষ্যার একটা কাঁটা খচখচ করছিল যদিও মনের ভিতর কিন্তু রাগ আর ছিল না তার। বরং সমস্ত ব্যাপারটাকে অবিশ্বাস করে' ক্ষমা করবার জন্যেই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সে ভিতরে ভিতরে। মায়ের এই 'কর্ত্তাত্তি' করতে যাওয়ার মানে কি? সুশোভনের বিরুদ্ধে যদি কিছু করতেই হয় সে নিজেই করবে। সুশোভনের নাগাল পেলে মা তাকে থুড়বে, ধুনবে, নাস্তানাবুদ করে' ফেলবে সকলের সামনে। তার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল—না, যা করবার সে নিজেই করবে। পাঁচজনে মিলে তার স্বামীকে সকলের সামনে অপমান করবে—এ কিছুতেই হতে দেবে না সে। সুশোভনকে সে চায় আবার, তাকে সে ভালবাসে এখনও, তার সব দোষ সত্ত্বেও।

"মা—"

অনীতার কণ্ঠস্বর এত তীক্ষ্ণ শোনাল যে স্বয়ম্প্রভা চমকে উঠলেন। গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে জিতুবাবুও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন।

"কি? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলি কেন আচমকা! হল কি" স্বয়ম্প্রভা প্রশ্ন করলেন।

অনীতা মায়ের দিকে একটু ঝুঁকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কেবল রাগ নয় গভীরতর আর একটা কি যেন প্রতিভাত হচ্ছিল। আত্ম-সম্বরণ করবার চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে, কিন্তু পারছিল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে' চেষ্টা করছিল তবু।

"মনে হচ্ছে এতে তুমি যেন খুশীই হয়েছ"

"কি বলছিস বুঝতে পারছি না ভাল। কি একটা ভাবছিলাম তোর চীৎকারে গুলিয়ে গেল সব। খুশী! মানে?"

"উনি যে এই কাণ্ড করেছেন তাতে যেন আনন্দই হয়েছে তোমার মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা তুমি যেন উপভোগ করছ বেশ"

স্বয়ম্প্রভা ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করে' বাতায়ন-পথে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করলেন। তাঁর নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল। তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—"তোমার মাথার ঠিক নেই কথা বোলো না বেশী। এত বড় আঘাতের পর মাথা ঠিক রাখা কঠিন। তবু চেষ্টা কর। নিজের জামাই বাস্তুঘুঘু এ আবিষ্কার করে' খুশী হয় না কেউ। আমিও হই নি। তবে আশ্চর্য্যও হই নি। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম—"

"কি—"

জিতুবাবু ওদিক থেকে সরে' এলেন একটু।

"তুমি ওদিকেই থাক না। তোমাকে কিছু বলছি না—"

অনীতা বললে, "গোড়া থেকেই যদি জানতে তাহলে বিয়ের সময় আপত্তি কর নি কেন। তখন তো খুশীই হয়েছিলে—"

স্বয়ম্প্রভার মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল একটা। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন তিনি।

"একটি দিনের তরেও খুশী হই নি। গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছি। গোড়া থেকেই আমোল দিতে চাই নি—"

অনীতা এবার ফেটে পড়ল।

"মিছে কথা। এখন তুমি ওঁর শত দোষ দেখছ কিন্তু গোড়ার গোড়ায় প্রথম যখন উনি আমাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন তুমি কিছু বল নি। বরং যখন জানা গেল যে ওঁদের অবস্থা বেশ সচ্ছল, ব্যাঙ্কে বেশ টাকা আছে, কোলকাতায় বাড়ি আছে, মরিস 'কার' আছে, বড় বড় লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে তখন তো তুমি থল থল করে' উঠেছিলে আনন্দে, গলে পড়েছিলে—"

"মুখ সামলে কথা বল্। ভদ্রভাবে কথা বলতেও শিখিস নি? আমি গলে' পড়েছিলাম? থল-থল!"

"কি ব্যাপার কি—"

জিতুবাবু আর একবার এদিকে আসবার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভার উত্তোলিত তর্জ্জনীর নিষেধাত্মক আন্দোলনে থেমে যেতে হল তাঁকে আবার।

অনীতা বললে—"উনি সত্যি খারাপ এ সন্দেহ থাকলে কিছুতেই বিয়েতে রাজি হতে না তুমি। সে সন্দেহ তোমার ঘুণাক্ষরে ছিল না। আর উনি যে সত্যিই খারাপ তা এখনও প্রমাণিত হয় নি—"

"এই যদি তোমার বুদ্ধি হয় মা তাহলে বুঝতে হবে অনেক দুঃখ নাচছে তোমার কপালে। এ দেশের ঘরে ঘরে যে সব সতী সাধ্বীরা অপমানিত হয়েও স্বামীদের অধঃপতনে বাধা দেয় না তোমাকেও তাদের দলে গিয়ে হায় হায় করতে হবে সারাজীবন—"

"না, হবে না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওঁর কোনও অধঃপতন হয় নি। বাবা যেমন নিষ্কলঙ্ক আমার বিশ্বাস উনিও তেমনি—"

"দেখ মা পুরুষমাত্রেই উড়তে চায়। সে উড়বে কি না তা নির্ভর করে তার স্ত্রীর উপর। সব ঘোড়ার চালই বদচাল তাকে ঠিক চালে চালাতে পারে ভালো সওয়ার—" বলিষ্ঠ গর্দ্দান ফিরিয়ে স্বামীর দিকে চাইলেন একবার।

"বিশ্বাস করি না ওসব কথা আমি। উনি যা করেছেন তার কারণ আছে নিশ্চয়ই একটা। গেলেই বোঝা যাবে"

"যেমন বাপ তেমনি মেয়ে! একটা মাগীকে নিয়ে হোটেলে গিয়ে পড়ে' আছে তবু বলে কি না—"

"বিশ্বাস করি না আমি"—চীৎকার করে' উঠল অনীতা —"হয়তো ভুলিয়ে নিয়ে গেছে—কিম্বা—"

"ভুলিয়ে নিয়ে গেছে! আগে থাকতে যত্ন করে' স্টেশনে এসেছে, বলে কি না ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কচি খোকা! মোয়া দেখে ভুলে গেলেন!"

"সে যাই হোক, তুমি এ নিয়ে মাতামাতি করছ কেন"

"কর্ত্তব্য করছি। মাতামাতিটা কোনখানে দেখলি তুই"

"যখন থেকে ব্যাপারটা শুনেছ তখন থেকে তো উন্মত্ত হয়ে উঠেছ। তোমার জামাই দুশ্চরিত্র এটা আবিষ্কার করে' দিগ্বিজয় করে' ফেলেছ যেন একটা—"

"মুখ সামলে কথা বল অনি। ছোট মুখে বড় কথা মানায় না। চুপ করে' বসে থাক একধারে।"

"এ সব থিয়েটারি কাণ্ড ভাল লাগে না আমার"

"থিয়েটারি কাণ্ড করছে কে—আমি না তুই"

"বাবাকে নিয়ে এই যে তুমি ছুটছ এর কোনও মানে হয়?"

"এ সব কথা শোনবার পর কি ঘরে' বসে থাকা সম্ভব?"

"আমায় একা এলেই যথেষ্ট হত। আমি একাই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"ও! একা দেখা করতে চাও?"—স্বয়ম্প্রভার বলিষ্ঠ চিবুকের পেশীগুলি কুঞ্চিত হল—"একা দেখা করে' তার বানানো গল্পগুলি বিশ্বাস করতে চাও? এমনি করেই তো আরম্ভ হয়! একবার যদি ওদের বানানো গল্প বিশ্বাস করতে আরম্ভ কর—বাস্ তাহলেই হয়ে গেল—জন্মের মতো হয়ে গেল। বেশী দিন লাগবে না, ছ'মাস"—হঠাৎ স্বয়ম্প্রভা বামকরপল্লবটি বিস্ফারিত এবং দক্ষিণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি উত্তোলন করে চীৎকার করে' উঠলেন—"ছ'মাসের মধ্যেই ডুব মারবে। টিকিটি দেখতে পাবে না আর"

"আমার স্বামীর সঙ্গে আমি নিজের মতো করে' বোঝাপড়া করব। তাও করতে দেবে না আমাকে? এ কি জবরদস্তি তোমার"

"যারা অসুস্থ তাদের জবরদস্তি করেই ওষুধ গেলাতে হয়। এ জবরদস্তি নয়, বাঁচাবার উপায়। তোমার নিজের মতো করে' করতে গেলেই হয়েছে। তোমার চোখে ধূলো দিতে কতক্ষণ?"

"কিন্তু এরকম কেলেঙ্কারি করার কি দরকার ছিল? গুষ্টিসুদ্ধ মিলে—"

"কেলেঙ্কারি যাতে বেশী দূর না গড়ায় তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন থেকে ব্যবস্থা না করলে—টিটি পড়ে' যাবে। লোকসমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না তখন—"

"কি ব্যাপার কি"—জিতুবাবু আবার বললেন।

"তোমার আর শুনে কাজ নেই। ওইখানেই থাক তুমি"

"তাই তো আছি"

"তাই থাক"

জিতুবাবু মেয়ের দিকে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি থেকে সহানুভূতি যেন উপচে পড়ছিল। অনীতাও আড়চোখে একবার চাইলে বাবার দিকে। জিতুবাবুর মনে হল সে যেন নীরবে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে কিন্তু জিতুবাবু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

"কি নিয়ে এত বকাবকি করছ তোমরা"—একটু ইতস্ততঃ করে' আর একবার বললেন তিনি। একটু সরেও এলেন।

"তুমি আবার আসছ এদিকে! ওই দিকে থাক না যেমন আছ—আরও সরে' যাও বরং কোণের দিকে। আমাদের কথায় ফোড়ন দিতে হবে না তোমাকে"

"তোমাদের কাছে বসতেও দেবে না নাকি। সমস্ত পথটা একা একা আমাকে বসে' থাকতে হবে ওই কোণে!"

"সারাটা জীবনই তো আমাদের কাছে বসে আছ। কিছুক্ষণ দূরেই থাক না। সিগারেট খাও না"

"আমাকে সঙ্গে করে' আনবার কি দরকার ছিল"

হঠাৎ দু'হাত তুলে বলে উঠলেন জিতুবাবু।

অনীতা মায়ের দিকে চেয়ে বললে, "কেন, বাবা আমাদের কাছে এসে বসলে ক্ষতি কি"

"মেয়ে হয়ে তুমি মাকে যে সব কথা বলছ তা যাতে ওঁর কানে না যায় তাই ওঁকে দূরে থাকতে বলছি—"

"এমন কিছুই বলা হয় নি তোমাকে। সব কথা শুনলে বাবা আমার দিকেই সায় দেবেন"

"কি কথা—"

আর একটু এগিয়ে এলেন জিতুবাবু।

"বাড়িতে সিগরেট ফুঁকতে পেলে তো আর কিছু চাও না। ইঞ্জিনের মতো ফস ফস করে'-ধোঁয়া ছাড় খালি। তখন তো বকেও থামানো যায় না তোমাকে। এখন সুযোগ পেয়েছ তাই করগে যাও না"

অনীতা বাবার দিকে চেয়ে বললে—"আমি মাকে বলছি ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও তোমরা। তোমরা এর মধ্যে মাথা গলাতে যাচ্ছ কেন"

"ঠিকই তো"—জিতুবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন।

স্বয়ম্প্রভার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে উঠল। দাঁতের ভিতর দিয়ে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বসে রইলেন তিনি গুম হয়ে। অনীতা বলতে লাগল—"মা বলছে যে একা তার সঙ্গে দেখা করলে আমি নাকি কিছু বলব না। যদি দেখি সত্যিই তেমন কিছু নয় বলব কেন, কি বল"

তার কালো চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক আলো চকমক করে' উঠল।

"সত্যি সত্যি তার কোনও দোষ আছে কিনা সেইটেই তো সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা দরকার। আমার মনে হয় ও কিছু নয়"

"ও!"

ফোঁস করে' উঠলেন স্বয়ম্প্রভা। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, ট্রেনের ঝাঁকানি সত্ত্বেও নিজের ভারসাম্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে' বললেন—"তাহলে আমিই ওদিকে গিয়ে বসি। তোমরা বাপ বেটিতে ব'সে পরামর্শ কর। কিন্তু আমার একটা কথা লিখে রাখ—দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছবে, ঢিটিক্কার পড়ে' যাবে চতুর্দ্দিকে..."

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মভূমি

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম শিক্ষিত সমাজের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি সুপরিচিত। চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্টরূপে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহাতে একাধারে যেরূপ জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও অতি উচ্চ স্তরের কবি-প্রতিভার সমন্বয় দৃষ্ট হয় বিশ্ব-সাহিত্য তাহার তুলনা অতি অল্পই মিলে। গীতা যেরূপ উপনিষৎসমূহের সার স্বরূপ, চৈতন্যচরিতামৃতও সেরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থনিচয়ের নির্য্যাস স্বরূপ। বস্তুতঃ এই একখানি মাত্র গ্রন্থ অভিনিবেশ ও অনুধ্যান সহকারে পাঠ করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই মহাগ্রন্থ ব্যতীত কৃষ্ণদাস কবিরাজ সংস্কৃত ভাষায় "গোবিন্দলীলামৃত" নামক রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ বিষয়ক একখানি সুমধুর কাব্য ও বিল্বমঙ্গল কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃতের" "রসিক-রঙ্গদা" নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।(১)

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অধীন ঝামটপুর পল্লীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম তারিখ, বংশ-পরিচয় ও সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। তিনি বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঝামটপুরের অধিবাসীগণ পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহাকে বৈদ্য বলিয়াই জানেন। বর্ত্তমানে ঝামটপুরে কোনো বৈদ্যের বাস নাই। বিগত ৮ই কার্ত্তিক, রবিবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাবতিথি উপলক্ষে শ্রীপাট ঝামটপুরে গিয়া জনৈক শিক্ষকের নিকট শুনিলাম যে ঝামটপুরের অনতিদূরবর্ত্তী বৈদ্যপুর নামক গ্রামে বৈদ্যের বাস আছে এবং তাঁহারা নাকি কৃষ্ণদাস কবিরাজের জ্ঞাতিবংশীয়। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত কুলজীতে কৃষ্ণদাসের পিতার নাম ভগীরথ বলিয়া উল্লিখিত আছে। যথার্থই যদি এরূপ কোনো কুলজী থাকে, তবে তাহা প্রকাশিত হওয়া উচিত। উহা দ্বারা কৃষ্ণদাসের জাতি সম্বন্ধে বাদানুবাদের অবসান হইতে পারে।

কৃষ্ণদাসের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনাকাল সম্বন্ধেও মতান্তর আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকল কথা আমাদের আলোচ্য নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে তাঁহার জন্ম হয়, এই কথাটি বলিলেই এখানে যথেষ্ট হইবে।

কৃষ্ণদাসের জন্মপল্লী ঝামটপুর যাইতে হইলে পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল বারহাড়োয়া লাইনের বহড়ান হল্ট্ নামক ছোট ষ্টেশনে নামিতে হয়। হাওড়া হইতে বহড়ান ৯৯ মাইল দূর। ঝামটপুর বহড়ানের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত এবং ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দূর। ষ্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বহড়ান গ্রামের মধ্য দিয়া ঝামটপুর এবং তথা হইতে আরও তিন মাইল দূরবর্ত্তী গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই রাস্তা দিয়া অক্লেশে পদব্রজে যাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিলে মহিষের গাড়ীও পাওয়া যায়।

ঝামটপুর উত্তর রাঢ়ে অবস্থিত। কাটোয়ার কিছু উত্তরে অজয় নদ ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। এই নদের উত্তর দিকস্থ ভূভাগ উত্তররাঢ় ও দক্ষিণ অঞ্চল দক্ষিণরাঢ় নামে প্রসিদ্ধ। রাঢ়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ও ঝামটপুর প্রভৃতি পল্লীর ভূমি স্থানে স্থানে উচ্চাবচ ও মৃত্তিকা কিছু কঠিন ও ঈষৎ কঙ্করময়। শেষোক্ত কারণে এই অঞ্চলে নিম্ন বঙ্গের মত ঝোপ-জঙ্গল বড় একটা জন্মে না। বৃক্ষাদির মধ্যে তালবৃক্ষের সংখ্যাই অধিক, নারিকেল, সুপারি বা খেজুর গাছ বড় একটা চোখে পড়ে না। স্থানে স্থানে তালবৃক্ষবেষ্টিত জলাশয় উন্মুক্ত প্রান্তরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে, আবার কোথাও বা পথপ্রান্তে, কোথাও শস্যক্ষেত্রের সীমান্তে অশ্বত্থবৃক্ষরাজি ছায়াশীতল কুঞ্জ রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এদিককার গ্রামগুলি পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গ্রামের গৃহগুলি রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত—পথ চলিতে চলিতে মনেহয় যেন কোন বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছি। অধিকাংশ গৃহই মৃত্তিকানির্ম্মিত ও দ্বিতল। গৃহের চালগুলির মধ্যভাগ ধনুকের মত বাঁকানো ও চারিদিকে খুব ঢালু—ঠিক যেন জোড়বাংলার ছাদের মত। দূর হইতে দেখিলে অনেক সময়ে দেবমন্দির বলিয়া ভ্রম হয়। অধিকাংশ গৃহের সম্মুখের দেওয়াল বেশ পরিপাটিরূপে মার্জ্জিত ও নানা প্রকার আলিপনার দ্বারা চিত্রিত। কৃষ্ণদাসের জন্মপল্লীর নৈসর্গিক শোভা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বর্ণনা :—

"রাঢ়দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে অশ্বত্থমণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব সুন্দর স্থান শোভে গাভীগণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হৈল সেইক্ষণে॥"

(চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ১ম)

---

(১) বটতলা হইতে প্রকাশিত "রাগময়ীকণা", "স্বরূপ বর্ণন" প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকার পদ্যগ্রন্থে রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া উল্লিখিত আছে। বলা আবশ্যক, যে এই পুস্তিকাগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা নহে। উহা সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কুরুচি ও অপসিদ্ধান্তপূর্ণ এই গ্রন্থগুলির সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বা সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

বহড়ান গ্রাম পার হইলে ছোট একটি মাঠ, তার পরই ঝামটপুর। গ্রামের প্রায় পূর্ব্ব প্রান্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজের বাস্তুভিটা অবস্থিত। এই স্থান পাটবাড়ী নামে পরিচিত। পাটবাড়ীর পিছন দিক দিয়া একটি গলিপথ ধরিয়া মন্দিরের বাম পার্শ্ব দিয়া পাটবাড়ীতে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি সাধারণ গৃহের আকারের একটি ছোট দালান। সম্মুখ দিকে তিনটি খিলানযুক্ত একটি ছোট বারান্দা। এই গৃহটি খুব বেশী দিনের নহে, তথাপি সংস্কারের অভাবে ইহা জীর্ণপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এই দেবালয়ের মধ্যে দারু-নির্ম্মিত গৌর-নিতাই, একটি শালগ্রাম শিলা, রাধাকৃষ্ণের ক্ষুদ্রাকৃতি যুগল বিগ্রহ, একখণ্ড বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিলা ও গিরিধারী গোপালের ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহ বিরাজমান। শেষোক্ত বিগ্রহ অর্থাৎ গিরিধারী গোপালই এই পাটবাড়ীর আদি দেবতা। ইনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের কৌলিক বিগ্রহ। অন্যান্য বিগ্রহগুলি পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই সকল বিগ্রহ ছাড়া এখানে চৈতন্যচরিতামৃতের একখানি হস্তলিখিত পুঁথি আছে। উহা কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দদাসের স্বহস্ত লিখিত বলিয়া কথিত। মুকুন্দদাস নাকি কৃষ্ণদাসের নিজের লেখা মূল পুঁথি হইতে এই অনুলিপি প্রস্তুত করেন। মুদ্রিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বহু পাঠান্তর আছে এবং তদনুসারে তত্তৎ স্থানের বিভিন্ন—এমন কি অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যাও করা হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যানুরাগী স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, কয়েক স্থলের ব্যাখ্যার জন্য এই পুঁথি দেখিয়া তিনি বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই পুঁথিখানি মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা চৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত অর্থবোধের সহায়তা হইতে পারে।

মন্দিরের সম্মুখে টিনের ছাদ-দেওয়া একটি ছোট নাটমন্দির। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরনিবাসী জনৈক ভক্ত ইহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে পাঠ কীর্ত্তনাদি হয়। নাটমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি কুঠুরি; উহাকে ভজন-কুটীর বলা হয়। জনসাধারণের বিশ্বাস যে সংসারে থাকার সময় কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে বসিয়া ভজন করিতেন। কুঠুরিটি আধুনিক কালে নির্ম্মিত এবং সংস্কারাভাবে অধুনা জরাজীর্ণ। দেবালয়ের উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটি ছোট পুষ্করিণী আছে ইহারও আশু সংস্কার প্রয়োজন। পাটবাড়ীর দক্ষিণদিকে কয়েকটি গাছপালা ও একটি ডোবা, পূর্ব্বদিকে খোলা মাঠ এবং উত্তর ও পশ্চিমদিকে লোকের বাড়ী। একজন গৃহী বৈষ্ণব এই পাটবাড়ীর সেবায়েত। স্ত্রী পুত্র লইয়া তিনি পাটবাড়ীর সংলগ্ন একটি বাটীতে বাস করেন। স্থানীয় লোকেদের নিকট তিনি মহান্ত নামে পরিচিত। মাত্র ৭.৮ বিঘা ধানের জমি ছাড়া পাটবাড়ীর অন্য কোন সম্পত্তি নাই, সুতরাং সেবার কোন সৌষ্ঠব নাই। যিনি বর্ত্তমান সেবায়েত, সেবা-পূজার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হইল না। এই পাটবাড়ীতে পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল, দূরাগত যাত্রী-গণের জন্য বিশ্রামাগার ও তাঁহাদের আহারাদির কোনই ব্যবস্থা নাই। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার—কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম সুধী সমাজের সর্ব্বত্র সুপরিচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার স্বগ্রামবাসীগণ তাঁহার সম্বন্ধে অতি সামান্যই জানেন এবং তাঁহার গৌরবময়স্মৃতিবিজড়িত স্থানের উন্নতিসাধনে আদৌ মনোযোগী নহেন।

একমাত্র গিরিধারী গোপাল বিগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণদাসের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন নিদর্শন নাই। এইস্থানে কোন প্রাচীন-কীর্ত্তি চোখে পড়িল না। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহস্থ ছিলেন। এখন যেমন, সম্ভবতঃ তাঁহার সময়েও এই অঞ্চলে মাটীর ঘরের সংখ্যাই বেশী ছিল—অট্টালিকা বা মন্দিরাদি ছিল না। থাকিলে উহাদের ধ্বংসাবশেষ অবশ্যই থাকিত।

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মাত্র একস্থানে ঝামটপুরের উল্লেখ আছে এবং স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ঐ গ্রামই যে কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে কি ভাবে নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করেন, সেই কথা বলিতে গিয়া কৃষ্ণদাস যাহা লিখিয়াছেন, মাত্র তাহা হইতে তাঁহার সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়। উহা হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণদাস কবিরাজদের বাটীতে এক শ্রীমূর্ত্তির (গিরিধারী গোপালের) নিত্য-সেবা হইত এবং গুণার্ণব মিশ্র নামক জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ পূজারির কাজ করিতেন। একদা কৃষ্ণদাসের বাটীতে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন হয় এবং বহু বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হইয়া উহাতে যোগদান করেন। নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে মীনকেতন রামদাস নামে নিত্যানন্দের জনৈক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ইনি দিবারাত্র প্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য যে সকল আচরণ করিতেন তাহা সাধারণের চক্ষে বড়ই অদ্ভুত লাগিত। ইনি কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে সকল বৈষ্ণব উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন কৃষ্ণদাসের নিজের কথায় তাহা শুনুন :—

“নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চায়।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহারে চাপড়ে॥
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয় যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তার—আর অঙ্গে কম্প॥
‘নিত্যানন্দ’ বলি যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার॥”

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ)

মীনকেতন রামদাস যখন অঙ্গনে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে কোন কার্য্যবশতঃ পূজারি গুণার্ণব মিশ্র সেখানে আগমন করেন। মিশ্র ঠাকুর নিজের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সুতরাং রামদাসকে দেখিয়াও কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রামদাস তাঁহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। মিশ্র ঠাকুর কিন্তু তাহাতে রাগ করিলেন না, কারণ মীনকেতন রামদাসের প্রকৃতি তাঁহার ভালভাবেই জানা ছিল। রামদাসের দ্বিতীয় সংঘর্ষ উপস্থিত হইল কৃষ্ণদাসের ভ্রাতার সহিত।

(স্থানীয় ব্যক্তিগণের মতে, ইঁহার নাম—শ্যামদাস)। কৃষ্ণদাসের ভ্রাতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া মানিতেন, কিন্তু নিত্যানন্দ—বলরামের অবতার কি না সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল। এই ব্যাপার লইয়া নিত্যানন্দের একান্ত ভক্ত মীনকেতন রামদাসের সহিত তাঁহার বেশ বচসা হইল; কৃষ্ণদাস যুক্তি তর্কের দ্বারা স্বীয় ভ্রাতার মত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। রামদাস এতই ক্রুদ্ধ হইলেন যে সেস্থানে নিজের হাতের বাঁশীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া (পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দেওয়ার মত নহে কি?) চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন, "তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ।" এখানে 'সর্ব্বনাশ' বলিতে কি বুঝায় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, যে মহৎ-অপমানের ফলে কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা হঠাৎ কোন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সেই দিনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে এখানে 'সর্ব্বনাশ' শব্দের অর্থ পারমার্থিক অনিষ্ট অর্থাৎ মীনকেতন রামদাসের সহিত এরূপ ব্যবহারের ফলে কৃষ্ণদাসের ভ্রাতা ভক্তির পথে আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; তিনি "পাষণ্ড"-গণের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলেন। মোটের উপর এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য কৃষ্ণদাসের মন বড়ই বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সেই রাত্রেই নিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন।

"নৈহাটী(২) নিকটে ঝামটপুর গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দরাম॥
দণ্ডবত হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদ-পদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
'উঠ, উঠ' বলি মোরে বোলে বারবার।
উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ৫)

যে মনোহরবেশে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে দেখা দেন, অতি সুললিত ভাষায় কৃষ্ণদাস তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকপাঠিকাগণকে স্বয়ং সেই অংশ পাঠ করিয়া কাব্যরসাস্বাদনের জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।—ইহার পর কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন—

"আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি।
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস! না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয়॥"

(২) এই নৈহাটী যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী নৈহাটী নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইস্থান ঝামটপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহার নিকটেই দ্বাদশ গোপালের অন্যতম উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আদি-নিবাস 'উদ্ধারণপুর' গ্রাম। প্রাচীনকালে এই নৈহাটী খুব বৰ্দ্ধিষ্ণু স্থান ছিল। প্রবাদ অনুসারে এখানে নৈ-রাজা নামে এক রাজার বাটী ছিল। আজিও কতকগুলি ভগ্নস্তূপকে রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। রূপ-সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ শিখরভূম ত্যাগ করিয়া নৈহাটীতে আসিয়া বসবাস করেন ও পরে তথা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন। জীব-গোস্বামীর লঘুতোষণীতে নৈহাটীর সংস্কৃত নাম "নবহট্ট" বলা হইয়াছে।

এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তির পর কৃষ্ণদাস আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে গিয়া রূপ-সনাতনপ্রমুখ গোস্বামীগণের কৃপা লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হইলেন। বৃন্দাবনবাসী বিখ্যাত ষট্ গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ দাস (মতান্তরে রঘুনাথ ভট্ট) গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস তাঁহারই সহিত রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থান করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় বহু স্তবস্তুতি ও "গোবিন্দ-লীলামৃত" মহাকাব্য প্রণয়ন করার ফলে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বৃন্দাবন-বাসী বৈষ্ণব সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন এবং কবি-প্রতিভার জন্য বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় (জীব-গোস্বামী কর্ত্তৃক 'বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা' নামে উক্ত) হইতে "কবিরাজ" ("কবি-সম্রাট্"-এর অনুরূপ) উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সর্ব্বত্র তিনি "কবিরাজ গোস্বামী" নামে সুপরিচিত হন। অতি বৃদ্ধবয়সে তিনি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে তাঁহার অমর গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও বহু পরিশ্রমের দ্বারা উহা সমাপ্ত করেন। তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধেও নানা উপাখ্যান ও মতভেদ প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার জীবনী বা গ্রন্থালোচনা আমাদের লক্ষ্য না হওয়ায় এ বিষয়ে কোন কিছু বিবৃত হইল না।

অতি পরিণত বয়সে বৃন্দাবনধামে আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের তিরোভাব ঘটে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার গুরু রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীও এই একই তিথিতে (অবশ্য বিভিন্ন বৎসরে) স্ব স্ব সাধনোচিতধামে গমন করেন। এরূপ যোগাযোগ বড় একটা দেখা যায় না।

নিত্যানন্দের আদেশে কৃষ্ণদাস যে দিন স্বীয় জন্মভূমি ঝামটপুর ত্যাগ করেন, তাহার পর আর কোন দিন তিনি সেখানে আসেন নাই। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ-দেবতা গিরিধারী গোপাল ঝামটপুরেই রহিলেন। এই দেববিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই উত্তরকালে ঝামটপুরের পাটবাড়ীর সৃষ্টি হইল। কবিরাজ গোস্বামীর তিরোধানের পর হইতে বাংলার বিভিন্ন স্থানের বৈষ্ণবগণ তাঁহার স্মরণ-উৎসব পালন করিবার জন্য বৎসর বৎসর তাঁহার জন্মভূমিতে সমবেত হইয়া তৎ-সেবিত বিগ্রহের সম্মুখে তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন। বিগত তিন শত বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া এই স্মরণোৎসব চলিয়া আসিতেছে। একাদশী হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত এই তিন দিন ধরিয়া ঝামটপুর-পল্লী উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠে। অন্যূন তিন হাজার বৈষ্ণব নরনারী ও ভক্তগণ এই মহোৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়াগণ এই উপলক্ষে ঝামটপুরে সমবেত হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর নামে কীর্ত্তন করেন:—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত-মাঝ
যে রচিল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা
না ডুবিল তাহে মোর চিত॥
তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে নৈল কেন বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥"

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পুবপাড়ার তরুণ-সমিতি ভারী সুন্দর জায়গায়।

একটা পুরোণো সেকেলে জমিদার বাড়ি। মোটা মোটা থাম, উঁচু উঁচু খিলান। দোতলা অতিকায় বাড়িটার ওপরতলাটা প্রায় ধ্বসে পড়েছে, ভাঙা ছাতের ওপরে ঘাস গজিয়েছে, গজিয়েছে বট পাকুড়ের চারা। সাদা বাড়িটার সর্বাঙ্গ কাল্‌চে সবুজ শ্যাওলায় আচ্ছন্ন, তার ভেতর দিয়ে সরু মোটা অসংখ্য সাপের মতো ছড়িয়ে আছে বাদামী রঙের শিকড়। নীচের তলায় কতগুলো ঘর এখনো দাঁড়িয়ে আছে, তবে জানলা কবাটের বালাই নেই। বছর সাতেক আগেও এই জমিদার বংশের অবশিষ্ট দুজন নাকি এ বাড়িতে বাস করত—বিধবা মা, কুমারী মেয়ে আর এক হিন্দুস্থানী চাকর। একদিন সকালে দেখা গেল মা আর মেয়ে গলাকাটা অবস্থায় খাটের ওপরে পড়ে আছে, ঘরময় রক্ত। আর বাক্স প্যাঁটরাগুলো সব ভাঙা—হিন্দুস্থানী চাকরটাও অদৃশ্য।

সেই থেকে এই বাড়ি পরিত্যক্ত। কোনো দাবীদার একে অধিকার করতে আসেনি। খুন আর ভাঙাচুরো অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভূতুড়ে বাড়ি বলে এর নাম রটেছে, ছড়িয়েছে নানারকম অবান্তর আর অলৌকিক কাহিনী। সামনে একটা ছোট মাঠ, তার ভেতরে কোমর সমান ঘাস আর বিছুটির জঙ্গল মাথা তুলেছে। তা ছাড়া চারপাশে ঝুপসী আমের বাগান। সেকেলে সমস্ত জংলা গাছ—এককালে হয়তো ভালো আম হত, কিন্তু এখন যা হয় তা দুর্দান্ত টক আর পোকা লাগা। সর্বভুক্ ছেলেরা পর্যন্ত এ বাগানের দিকে পা বাড়ায় না, অবশ্য ভূতের ভয়ও যে এক আধটু না আছে এমন কথাও বলা যায় না।

কিন্তু 'তরুণ-সমিতি'র ছেলেরা একটু গোঁয়ার, তাই বেছে বেছে এই নির্জন অস্বস্তিভরা জায়গাতেই তাদের আখড়া গড়ে তুলেছে। বিছুটি আর ঘাসবনভরা মাঠটাকে কোদাল দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে ফেলেছে, বসিয়েছে প্যারালাল বার, রিং ঝুলিয়েছে, দুলিয়েছে বক্সিংয়ের বালির বস্তা। তা ছাড়া খেলার ব্যবস্থাও আছে, একপাশে করা হয়েছে দাড়িয়াবান্ধা (গাদী) আর ব্যাড্‌মিণ্টনের ঘর। লাইব্রেরীটা তবে এখানে নয়, সেটা পাড়ার মধ্যে ক্লাবের একজন মেম্বারের বাড়িতে।

ওরা দুজনে 'তরুণ-সমিতি'র জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ক্লাবে গিয়ে যখন পৌছুল, তখন চারদিকে শান্ত-বিকেল। ঝুপসা আমবাগানের আড়ালে বেলা শেষের রাঙা সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে। ক্লাবের প্রায় পনেরো বিশটি ছেলে একান্ত অভিনিবেশ সহকারে শরীর চর্চায় ব্যস্ত। কয়েকজন কুমীরের মতো লম্বা হয়ে হুস্‌হুস্ করে বুক-ডন দিচ্ছে, একজন ঝুলছে রিংয়ের সঙ্গে, আর একজন প্যারালাল বারে হাঁটু ভাঁজ করে আটকে দিয়ে মাথা নীচে ঝুলিয়ে দিয়ে দোল খাচ্ছে—ছবিতে দেখা শিম্পাঞ্জীর মতো। একজন দু হাতে দুটো বক্সিং গ্লাভ্‌স পরে ধাঁই ধাঁই করে ঘুষি বসাচ্ছে ঝুলন্ত বালির বস্তায়, পরিমল পরে বলেছিল, অমনি করলে নাকি ঘুষির ওজন বাড়ে। আর আখড়ায় ঢুকতেই সব চাইতে আগে যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে একটা আশ্চর্য মানুষ। কুচকুচে কালো রঙ, ছফুট লম্বা একজন মানুষ। চওড়া চিতানো বুক—যেন লোহায় গড়া চেহারা। মাথার ওপর মস্ত একখানা লাঠি নিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরাচ্ছে—এত জোরে ঘোরাচ্ছে যে লাঠিটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু চোখে পড়ছে যেন একটা বিরাট চাকার সূক্ষ্ম উড়ন্ত রেখা। দৃঢ় বিশাল শরীরের পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য 'মাস্‌ল' ঢেউয়ের মতো উঠছে পড়ছে, বাইশেপগুলো ফুলে ফুলে উঠছে এক একটা লোহার পিণ্ডের মতো। তিন চারটি ছেলে লাঠি দিয়ে তার মাথায় ঘা দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সেই প্রচণ্ড অশরীরী ঘূর্ণির কাছে গিয়ে চটাস্ চটাস্ করে তাদের হাতের লাঠিগুলো ঠিকরে

ফিরে আসছে, একজনের লাঠি তো ছিটকে বেরিয়েই চলে গেল হাত থেকে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে রঞ্জু চেয়ে রইল। বললে, অদ্ভুত।

পরিমলও সেই দিকেই তাকিয়ে ছিল। রঞ্জুর কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, অদ্ভুত, তাই না? উনিই বেণুদা, আমাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। বলতে গেলে ক্লাবের সব।

কথাটা পরিমল না বলে দিলেও রঞ্জু বুঝতে পারত। ওই স্বাস্থ্য, লাঠির ওপর অমন অপূর্ব দখল—এ লোক ছাড়া কে আর ক্লাবের সেক্রেটারী হবে!

সশ্রদ্ধভাবে পরিমল বলে চলল, এক লাঠির যে কতরকম কসরৎ উনি জানেন তার সংখ্যা নেই। আর শুধুই কি লাঠি? বক্সিংয়ের সময় ওঁর একটা মাঝারি সাইজের ঘুষি খেলে পনেরো মিনিট ধরে আমাদের মাথা ঘুরতে থাকে। রিং আর বারের এমন ফিগার নেই যা করতে পারেন না। এক নাগাড়ে দেড়শো ডন দিতে পারেন—একটু কষ্ট হয় না।

একটু পরেই লাঠি খেলা বন্ধ হল। কালো কুচকুচে একটা মূর্তির ওপরে বার্নিশ তেলের মতো ঘাম চক চক করছিল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেললেন বেণুদা, এগিয়ে এলেন সেদিকে যেখানে ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছিল। পরিমল কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ভরাট্ গম্ভীর গলায় কথা কয়ে উঠলেন বেণুদা।

—তুমি, রঞ্জন না?

মৃদু ভয় এবং গভীর বিস্ময়ের একটা মিশ্রিত অনুভূতি দোলা খেয়ে গেল রঞ্জুর মনে। কথার জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারল না, কেমন যেন ধরে এল গলাটা।

বেণুদা এবারে হাসলেন: আমাদের জিম্‌নাষ্টিক ক্লাব কেমন দেখছ রঞ্জন?

—খুব ভালো। কিন্তু—এতক্ষণে জড়তাটা কাটিয়ে উঠতে পারল রঞ্জু: আপনি আমার নাম জানলেন কেমন করে?

বেণুদা শুধু হাসলেন, কথাটার উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন, আমাদের ক্লাবের মেম্বার হবে তো?

রঞ্জুর হয়ে পরিমল জবাব দিলে। সোৎসাহে বললে, নিশ্চয় হবে। সেই জন্তেই ওকে ধরে নিয়ে এলাম।

—বেশ, বেশ, খুব ভালো কথা।—ভরাট গম্ভীর গলায় বেণুদা বললেন, শরীর ভালো করা চাই সবার আগে। গায়ে যার জোর নেই, সেই পড়ে পড়ে মার খায়, আর যার জোর আছে পৃথিবীতে নিজের অধিকার সেই-ই প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে। কী বলো রঞ্জন?

রঞ্জু মাথা নেড়ে বললে, নিশ্চয়।

ঘাসের ওপরে বসলেন বেণুদা, পাশে বসল ওরা দুজন। বেণুদার ঘামে ভেজা শরীর থেকে একটা গন্ধ আসতে লাগল রঞ্জুর নাকে কিন্তু ওই গন্ধটার ভেতরে যেন পাওয়া গেল শক্তির পরিচয়, পৌরুষের ব্যঞ্জনা।

বেণুদা বলে চললেন, তাই বলে অবশ্য আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য এই নয় যে শুধু শরীরকেই তাগড়া করতে হবে। সে শরীর কাবলীরও আছে, পাঞ্জাবীরও আছে। কিন্তু ফিজিক্ উইদাউট্ ব্রেণ অ্যাণ্ড্ অ্যাক্টিভিটি—কোনো দামই নেই তার। শরীরকে আমরা ভালো করব শুধু নিজেদের জন্তে নয়, অন্ত দশজনের জন্তে, সমাজের জন্তে। আমাদের ক্লাবের উদ্দেশ্য সব রঞ্জনকে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছ তো পরিমল?

পরিমল অপ্রতিভ ভাবে মাথা নাড়ল, না।

বেণুদা লঘু ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন পরিমলের দিকে, পরিমল লজ্জা পেল। বেণুদা বলে চললেন, আমরা সব রকম সোশ্যাল সার্ভিস্ করবার দায়িত্বও নিয়েছি। ধরো নার্সিং। কোথাও কারুর অসুখ-বিসুখ করলে আমাদের ক্লাবের মেম্বাররাই নার্স করতে যায়। কেউ যদি অন্তায় করে তার প্রতিবাদ করি আমরা। দুষ্টের দমন করা আমাদের মস্ত একটা কাজ। সহরের গুণ্ডা-বদ্‌মায়েসরা যাতে আমাদের নামে ভয়ে কাঁপে, সে ব্যবস্থাও আমরা করব। এতো গেল শরীর চর্চার দিক। তা ছাড়া আমাদের লাইব্রেরী আছে, সেখানে বাছা বাছা বই রেখেছি আমরা। দেশের ছেলেরা যাতে মানুষ হয়, তাদের শরীর আর মস্তিষ্ক একই সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে, এই হল আপাতত আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পরিমল, ফেরবার পথে তুমি রঞ্জনকে আমাদের লাইব্রেরী দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো।

পরিমল মাথা নেড়ে জানালো, আচ্ছা।

বেণুদা উঠে এগিয়ে গেলেন প্যারালাল বারের দিকে। পরিমল চাপা গলায় রঞ্জুকে প্রশ্ন করল, কেমন দেখলি ভাই বেণুদাকে?

এখানে এসে যে একটি কথা ক্রমাগতই রঞ্জুর মনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, সেই কথাটাই সে বলতে পারল : চমৎকার।

পরিমল সায় দিয়ে বললে, হাঁ চমৎকার। একটু বেশি করে মিশলেই বুঝতে পারবি কি রকম প্রাণখোলা মানুষ।

ভোনা, কালী কিংবা খাঁদুর একটা নোংরা আবহাওয়া অথবা নিজের ভেতরে আত্মসম্পূর্ণ একটা রূপ-কল্পনার জগৎ-এর বাইরে এসে রঞ্জু যেন আজ দাঁড়িয়েছে একটা দিগন্তপ্রসারিত নতুন পৃথিবীর সম্মুখে। কোথায় ছিল এতদিন এই ছেলেরা, এই ক্লাব? স্বাস্থ্য, সবলতা। ইতরতা নেই, দুর্বুদ্ধি নেই, বিড়ি খাওয়ার উৎসাহ নেই, নষ্টচন্দ্রের সুযোগ নিয়ে পরের বাগানের ফল-পাকড় লুটতরাজ করবার মতো স্পৃহাও নেই কারুর। রঞ্জু যেন বায়োস্কোপের ছবি দেখছে সমস্ত। রিংয়ে, বারবেলে, ব্যাডমিণ্টন আর দাড়িয়াবান্ধায়, ছোট বড় লাঠিতে বারো তেরো বছরের ছেলে থেকে শুরু করে কুড়ি বাইশ বছরের যুবক পর্যন্ত চমৎকার একটি দল। নতুন লাগে, অপরিচিত মনে হয়, কিন্তু এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেমন করে এদের সঙ্গে একটা মানসিক সহযোগিতা ঘটে গেছে, এদের একান্তভাবে বোধ হচ্ছে নিজের সগোত্র বলে।

তবু কোথায় সূক্ষ্ম অতৃপ্তিবোধ মৃদু বেদনার মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে রঞ্জুর। কিছুতেই ভুলতে পারেনি সেই ফাঁসির ডাক আর শহীদ সত্যেন। রক্তে রক্তে আগুন ধরে গেছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বুকের মধ্যে ফণা নাড়া দিয়েছে বাসুকী নাগ, দেশ ঘুমিয়ে পড়ল বলেই তো সে বশ মানতে চায় না। ওই বইগুলো যেন তার কাছে কোন এক যাদুকর সাপুড়ের তুবড়ী বাঁশির মাতাল করা ডাক পৌছে দিয়েছে, কিছু একটা করতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই, তৃপ্তিও নেই।

কেমন যেন আশা হয়েছিল, এই ক্লাব তার সন্ধান বলে দেবে। এইখানে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে গুপ্ত দরজা, যার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কোনো একটা মন্ত্র উচ্চারণ করলেই মাটির বন্ধন বিদীর্ণ হয়ে পাতালপুরীর দরজা খুলে যায়, দেখা যায় গল্পে শোনা শাদা মার্বেল পাথরের একটা অতলান্ত সিঁড়ি বিশাল অজগরের মতো পাক খেতে খেতে কোথায় নেমে গেছে—নেমে গেছে ক্ষুদিরামের কামানের কারখানায়। কিন্তু শুধু শরীর ভালো করতে হবে, শুধু মস্তিষ্ককে উন্নত করতে হবে। এর বেশি কিছু নয়, এর অতিরিক্ত নেই কিছু। রাত জেগে কতগুলো অসুস্থ মানুষের সেবা করাই কি তরুণ সমিতির শেষ সার্থকতা? বোমার ফুলঝুরি, ছুরির নীলোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ফলকের মতো রিভলভারের এক ঝলক আগুন আর ছায়ামূর্তির মতো ফাঁসিকাঠে বিকীর্ণ যে আকাশ গঙ্গা—সে কত দূরে, কেমন করে তাকে স্পর্শ করা যায়?

সমস্ত আখড়াটা আশ্চর্য কতগুলো ধ্বনিতে মুখর। রঞ্জু অন্যমনস্কভাবে শুনতে লাগল।

—শির, তামেচা, বাহেরা—

লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ।

ব্যাড্মিণ্টনের কোর্ট থেকে শব্দ : ফাইভ্ অল।

ধপাধপ্ করে ঘুষি পড়ছে বক্সিংয়ের বালির বস্তায়।

আস্তে আস্তে নেমে আসছে বেলা। আম বাগানের ঘন পত্রচ্ছায়ার আড়ালে লাল সূর্য ডুবে গেল। পরিমল চুপ করে কী ভাবছিল, রঞ্জু জিজ্ঞাসা করলে, তুই একসারসাইজ্ করবি না?

—নাঃ, আজ আর নয়। কাল কুস্তি করে গায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিচ্ছি।

—ওঃ।

আবার চুপচাপ। পরিমল কেমন গম্ভীর হয়ে আছে, রঞ্জুর মনের ভেতরে আবার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই আগুন-জ্বলা বইগুলো, কতগুলি অগ্নিপতঙ্গের মতো তাদের চলন্ত আর জ্বলন্ত অক্ষর। পরিমল জানে। ওই সুড়ঙ্গ পথটা তার জানা আছে। কেন সে বলে দেয় না রঞ্জুকে? কেন সে এমন করে দূরে দূরে সরিয়ে রাখছে ওকে?

—চল রঞ্জু, এবারে ওঠা যাক্—

রঞ্জুর উঠতে ইচ্ছে করল না। ক্লান্তস্বরে বললে, এখনি?

—আর একটু বসবি? কিন্তু লাইব্রেরী যে আবার বন্ধ হয়ে যাবে ওদিকে।

—ওঃ, চল্ তা হলে—

ওরা উঠতে যাবে, এমন সময় কাণ্ড হয়ে গেল একটা।

একটি ছেলে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে এল ছুটতে ছুটতে : বেণুদা, বেণুদা।

মাটিতে ঝুঁকে পড়ে বেণুদা তখন একটা ভারী বারবেল

তুলছিলেন, ধপাৎ করে সেটাকে ফেলে দিলেন মাটিতে। বললেন, ব্যাপার কা, কী হয়েছে?

—ফণীর মার ঘর থেকে সব জিনিসপত্র রাস্তায় টান মেরে ফেলে দিচ্ছে। বাক্স-প্যাটরা, বাসন-কোসন সমস্ত।

ছ ফুট উঁচু লোহার মানুষ বেণুদা তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত। লাঠির আওয়াজ, ব্যাড্‌মিণ্টন কোর্টের হাঁকাহাঁকি, চারপাশের ছোট বড় কথা আর কোলাহল। পোড়ো জমিদার বাড়ি আর ঘাসে-ছাওয়া মাঠটার ওপর দিয়ে যেন একটা কঠিন স্তব্ধতা নেমে এল।

—কে ফেলে দিচ্ছে? হালদার?—বেণুদার গলা গম্ গম্ করে উঠল, প্রতিধ্বনি কাঁপতে লাগল ভাঙা বাড়িটার ঘরে ঘরে গুম্ গুম্ শব্দে।—হালদার ফেলে দিচ্ছে?

—শুধু হালদার নয়, তার সঙ্গে আরো চার পাঁচটা ষণ্ডা লোক। লাঠিও নিয়ে এসেছে।

—পাড়ার লোকে কী করছে?

—দাঁত বের করে দেখছে সব, হাসছে। ফণী বাধা দিতে গিয়েছিল, একটা লোক তাকে এমন মেরেছে যে তার নাক দিয়ে দর দর করে রক্ত—

দূত তার সংবাদটা আর শেষ করতে পারল না। তার আগেই বেণুদা গর্জন করে উঠলেন।

—অ্যাটেন্‌শন!

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল একটা। ক্লাবের যেখানে যে ছিল, ব্যাড্‌মিণ্টন আর দাড়িয়াবান্ধার কোর্ট থেকে রিং পর্যন্ত যারা এতক্ষণ নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছিল, নক্ষত্রবেগে ছুটে এল তারা। ড্রিলের ভঙ্গিতে সব সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল মাঠের মাঝখানে।

—লেফ্‌ট টার্ণ—

একসঙ্গে কতগুলো পায়ের শব্দ করে দলটা ঘুরে গেল। কার যেন উত্তেজিত স্বর শোনা গেল: লাঠি নেব বেণুদা?

—নো। কুইক্ মার্চ।

সঙ্গে সঙ্গে বেণুদাকে অনুসরণ করে দলটা এগিয়ে চলল।

রঞ্জু বসেছিল অভিভূতভাবে। কিছুই বুঝতে পারেনি। এতক্ষণ যে বায়োস্কোপের ছবি দেখছিল এখন যেন তার রোমাঞ্চক একটা অধ্যায়ে এসে সে পৌঁছেছে। এর পরে?

রঞ্জুর কাঁধে আল্‌গাভাবে হাত ছোঁয়ালে পরিমল, ডাকলে, রঞ্জু?

—অ্যাঁ?

—চল্।

উত্তেজিত স্বরে রঞ্জু বললে, কোথায়?

—তরুণ সমিতি কী করতে চায় তার পরিচয় পাবি?

ততক্ষণে একটা কিছু আঁচ করে রঞ্জু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে: মারামারি হবে নাকি ভাই?

—বড্ড বকাস্ তুই রঞ্জু, তাড়াতাড়ি চলে আয় না—পরিমলের কথার উত্তাপ আর বিরক্তি স্পষ্টভাবে ফুটে বেরুল। দলটা তখন অনেক এগিয়ে গেছে, ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল পেছনে পেছনে। তারপর দু তিন মিনিটের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুল পাড়ার ভেতরে, এই রহস্যময় ঘটনার অকুস্থলে।

কেমন একটা গোলমেলে আর বিশৃঙ্খল ব্যাপার। ছোট একখানা মেটে বাড়ি—গরীবের বাড়ি যে তা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। সেই বাড়ির ভেতর থেকে চার পাঁচজন লোক ঘরের খাটবিছানা থেকে আরম্ভ করে তৈজসপত্র যা কিছু বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। টাকমাথা খাটো চেহারার একটা লোক নির্দেশ দিচ্ছে তাদের। একজন বিধবা ভদ্র মহিলা চীৎকার করে কাঁদছেন, একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে মাটিতে বসে আছে নির্জীবের মতো, তার গায়ের ছিটের জামাটায় রক্তের ছোপ। আর একটু দূরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পাড়ার ভদ্রলোকেরা, কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই—সব যেন চিত্রকরা একদল কেষ্টনগরের পুতুল।

বেণুদার দলটা গিয়ে পৌঁছুতেই টাকমাথা লোকটা তাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালো। তার ছোট ছোট চোখ দুটো দেখতে পেল রঞ্জু—সেই পড়ন্ত বেলাতেও দেখতে পেল যেন একটা ক্রূর কুটিলতায় তা চক্ চক্ করে উঠছে।

বেণুদা বললেন, হালদার মশাই, কী এসব?

হালদার কটু উগ্র কণ্ঠে বললে, তা দিয়ে দরকার কী আপনার?

বেণুদা হাসলেন। কালো মুখের ভেতর দিয়ে এক ঝলক শাদা শাদা দাঁত বেরিয়ে এল নিষ্ঠুর ভাবে: দরকার আছে বই কি। বিধবার ওপর এসব অত্যাচার চলবে না।

—নাঃ, চলবে না ?—বিশ্রী একটা জাম্বুবানের মতো দাঁত খিঁচুনি দিলে হালদার : যেন পুলিশ সায়েব এসেছেন ! আমার বাড়ি, আমার ঘর, বিনা ভাড়ায় ছ' মাস থাকতে দিয়েছি—সেই দয়াই হল আমার কাল। এখন নড়তে চাইছে না, ইয়ার্কী নাকি ?

বেণুদা শান্ত স্বরে বললেন, কিন্তু এভাবে ওদের বার করে দিলে ওরা যাবে কোথায় ?

—যেখানে খুশি। কিন্তু আপনারাই বা কেন মাতব্বরী করতে এসেছেন ? নিজের চরকায় তেল দিন না মশাই ?

—আপনি ওদের জোর করে তাড়িয়ে দেবেন ?

—হ্যাঁ, দেব দেব।—হালদার সশব্দে মাটিতে পা ঠুকল : আমার বাড়ি থেকে বের করে দেব আমি।

—কিন্তু ওরা যাবে কোথায় ? আপনি ভদ্রলোক— উনি ভদ্রঘরের মেয়ে, কোথায় গিয়ে উনি দাঁড়াবেন ?

হালদার এবারে চেঁচিয়ে উঠল।

—আপনি তো মশাই আচ্ছা লোক ! গাঁয়ে মানে না অথচ মোড়লী করতে এসেছেন। ভদ্রভাবে উঠে যেতে বলেছি, তখন তো যায়ই নি, আবার মেজাজ কত ! ধৰ্ম্মো আছে, আইন আছে ! জোর জুলুম চলবে না ! ওঃ, ভারী আমার ভদ্রঘরের মেয়ে রে ! ওঁর দাঁড়াবার জায়গা আমায় বাত্‌লে দিতে হবে। বেশ তো দাঁড়ান না গিয়ে কোনো বস্তিতে কিংবা খোলাপট্টিতে—

—চুপ রও অসভ্য জানোয়ার—

একটা বাজের গর্জন ফেটে পড়ল যেন। বেণুদার একটা প্রবল ঘুষিতে তিন হাত দূরে ঠিকরে পড়ল হালদার, নাক মুখ দিয়ে রক্তের ধারা নেমে এল দর দর করে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের ভেতরে যে লোকগুলো জিনিসপত্র টানাটানি করছিল, তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বাইরে। দুজনের হাতে দুখানা ছোরা ঝকঝক করে উঠল, পেশাদার গুণ্ডা ওরা— এর জন্যে এসেছিল তৈরী হয়ে।

তারপর শুরু হয়ে গেল মারামারি।

ভিড়ের মধ্যে ছোরাশুদ্ধ একটা হাত উঠল, আর একখানা হাত পেছন থেকে তাকে টেনে নামিয়ে নিলে। চীৎকার, কোলাহল। কয়েকটা আর্তনাদের শব্দ তীরের মতো চিরে দিলে আকাশকে, সমবেত ভদ্রলোকরা বিকট কলরব তুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন।

মারামারি কিল চড় ঘুষি চলছে, পরিমল কোথায় ছিটকে চলে গেছে। রঞ্জুর বুক কাঁপছে বাঁশ পাতার মতো, হাঁটুর কাছটা যেন ভেঙে আসতে চাইছে আতঙ্কে, গা দিয়ে দর দর করে ঘাম পড়ছে। কী করতে যাচ্ছিল খেয়াল নেই, মনেও নেই—খুব সম্ভব ছুটে পালাবারই উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু তার আগেই কপালের ডানদিকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা যেন আকাশ থেকে শিকরে বাজের মতো ছোঁ দিয়ে পড়ল, যন্ত্রণায় চোখ বুজে এল রঞ্জুর, পরক্ষণেই সব ঝাপ্‌সা আর অস্পষ্ট—কোনো বোধই আর জেগে রইল না শরীরের কোনোখানে। (ক্রমশ)

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন

'কৌটিল্য'

অর্থনীতির বিচারে সমাজে দুই শ্রেণীর লোক আছে—পুঁজিবাদী ধনী, আর সর্বহারা শ্রমিক। এ ছাড়া আপাতদৃষ্টিতে সমাজের যে সকল অপস্তর দেখা যায় যেমন মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ইত্যাদি সেগুলি ধনীর আশ্রিত ও অনুগৃহীত। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই সম্পদ ও শাসনক্ষমতা ধনীর হাতে। ধনীর আয়ত্তে অফুরন্ত সুযোগ ও অবসর, ফলে তার খেয়ালের অন্ত নেই। ধনীর খেয়ালের বসে জগত-জোড়া যুদ্ধ হয়, পরে সন্ধি হয়, আবার সন্ধির সর্ত ভঙ্গ হয়। শ্রমিক অবসর চায় না ; বাধ্যতামূলক অবসর বা বেকার অবস্থাকে সে ঘৃণা করে, কারণ তাতে তার দারিদ্র্য ও দুঃখ বাড়ে। ধনী সমাজে মিলনের অভাব নেই, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব বর্তমান ; যা কিছু মিলনের ব্যবস্থা সবই ধনের প্রাচুর্য প্রদর্শনে অপরের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদনের অথবা অধিক ধনাগমের নিমিত্তস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। শ্রমিক সমাজে কর্ম উপলক্ষে একত্রিত হওয়ার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা রয়েছে, আর নানাবিধ অভাব ও দুঃখের মধ্যে প্রতিবেশীর সহানুভূতি ও সাহায্যপ্রার্থী হিসেবে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের প্রয়োজন সর্বদাই বর্তমান। নিপীড়িত দুস্থ শ্রমিক যেদিন থেকে বুঝতে পারল—ধনের আরাধনায় নয়, ধনীর

অনুগ্রহে নয়, সংঘবদ্ধ আন্দোলনে তার দুঃখ দূর হবে সেদিন থেকেই জাতীয় আর আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হল।

ধনীর নিজ নিজ ধন সম্পত্তি আছে, বিশেষ বিশেষ ধনাগমের পথ ও এলাকা আছে, ফলে ধনীতে ধনীতে প্রভেদ ও বিরোধ অনিবার্য। অপরপক্ষে দুনিয়ার শ্রমিক একই প্রকার অভাব আর দুঃখের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও আকর্ষণের ভাব অনুভব করে। তাই শ্রমিক সংঘ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই লাভ করে থাকে। আন্তর্জাতিক কোন অনুষ্ঠান যদি বাস্তব ও কার্যকরী হবার স্বাভাবিক যোগ্যতাসম্পন্ন থেকে থাকে, তবে তা প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিদ্বারা গঠিত শ্রমিক সংঘ। শ্রম এক, শ্রমিক এক, দুনিয়ার শ্রমিকের দুঃখদৈন্য এক—এ কেবল কথার কথা নয়, অনুভূতির ঐক্যে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রমিকের ঐক্যবোধ ও মিলিত শক্তিকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে ধনী শ্রমিকের উৎপন্ন ধন ব্যবহার করে, ইহাই পুঁজিবাদী নীতির মূল কথা। দুনিয়ার শ্রমিক আজ মিলিত শক্তিতে পুঁজিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত। শত সহস্র বর্ষ ব্যাপী অগণিত প্রবঞ্চিত হতভাগ্য শ্রমিকের বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তে আজ পূর্ব গগন উজ্জ্বল শোণিত বরণ ধারণ করেছে, অচিরেই গৌরবময় প্রভাতের স্বপ্ন দেখছে দুনিয়ার শ্রমিক।

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (International working-men's Association) ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হয়। লণ্ডনে সর্বপ্রথম এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণ, ইংলণ্ড তখন পৃথিবীতে সবচাইতে অধিক শিল্পোন্নত দেশ এবং সেই সময়টায় মার্কস্‌-এর সমাজতন্ত্রবাদের নীতিতে বিশ্বাসী বিদেশী কয়েকজন শ্রমিকনেতা নিজ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালে ইয়োরোপের বহুদেশে এক সঙ্গে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠে। দেশের শ্রমিক জনসাধারণ এ বিদ্রোহে প্রধান অংশ গ্রহণ করে, সুতরাং বিদ্রোহ দমনের ফলে তারাই নাজেহাল হয়। এই ঘটনার পরে অনুরূপ প্রতিরোধকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের শ্রমিকনেতাগণ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা প্রচার করতে থাকেন। কার্লমার্কস্‌-এর অমর গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' তখনও প্রকাশিত না হলেও কমুনিষ্টদের ফতোয়া ১৮৪৭ সাল থেকেই প্রচারিত হচ্ছিল।

পুঞ্জীভূত টাটকা সমাজতন্ত্রবাদের বারুদে আগুনের ফুল্কি নিক্ষেপ করে জার-শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের মুক্তি সংগ্রাম। ১৮৬৩ সালে লণ্ডনে শ্রমিকগণ প্রকাশ্য সভায় পোল্যাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ফরাসী শ্রমিকপ্রতিনিধিগণ এসে এই সভায় যোগদান করেন. জগতের ইতিহাসে ইহাই সম্ভবত প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক বৈঠক, যেখানে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। পর বৎসর First International-এর উদ্বোধন হয়। লণ্ডনে এই উদ্বোধন সভায় বলা হয় যে ১৮৪৮ সালে বিচ্ছিন্নভাবে নানা দেশে শ্রমিক বিদ্রোহের পর থেকে তখন (১৮৬৪ সাল) পর্যন্ত শ্রমিকের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, পক্ষান্তরে সকল দেশেই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ধনীর অর্থভাণ্ডার স্ফীত হয়েছে। তদানীন্তন ব্রিটিশ অর্থসচিব স্বনামধন্য—গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবের ৭।৪।১৮৬৩ তারিখের মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখান হয়—ব্রিটিশ ব্যবসায় বাণিজ্যের কিরূপ অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে, আর সেই সঙ্গে সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখান হয় সে দেশের শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা কিরূপ অসন্তোষজনক। আরও বলা হয় শিল্পবাণিজ্যে জগতে অগ্রগণ্য ইংলণ্ডেই যদি শ্রমিকের এই অবস্থা হয়, তবে অন্যান্য দেশের অবস্থা আরও অধিক অসন্তোষজনক। ধনী মালিক ও মহাজনের ধনবৃদ্ধি ও দরিদ্র শ্রমিকের দারিদ্র্যবৃদ্ধি ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে এই সভায় ইয়োরোপের সকল দেশের শ্রমিককে এই ব্যবস্থায় প্রবল প্রতিরোধ করতে আহ্বান করা হয়—Proletarians of all countries unite ! সেই থেকে ক্ষুধাতুর দীন দৃষ্টি, ব্যথাতুর ম্লান মুখ, ভগ্নবুক আর ক্লান্ত বাহুতে স্বাভাবিক জীবনের জ্যোতি ও শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা চলছে।

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কার্ল মার্কস্‌ তাদের বুঝিয়ে দিলেন—ভূমি ও ধনের অধিকারিগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী এবং নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য তারা সর্বদাই সে ক্ষমতা ব্যবহার করবে। সুতরাং রাজনৈতিক শক্তি যতদিন তাঁদের হাতে আছে ততদিন শ্রমিকের দুর্দশা দূর হবার নয়। সমাজতন্ত্রবাদিগণ প্রচার করতে থাকলেন—রাজনৈতিক শক্তি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আবদ্ধ থাকাই মানুষে মানুষে সকল সংঘাত ও অসন্তোষের মূল কারণ। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদিগণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দেখা গেল যে First International গঠনের উপযুক্ত সময় তখনও আসে নাই। ইহার প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক সংঘের সভ্য দেশ গুলিতে তখনও উপযুক্ত শ্রমিক বা সমাজতন্ত্রবাদী অনুষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে দাঁড়াল এই, বিভিন্নজাতীয় শাখা সংঘ থেকে উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে আন্তর্জাতিক সংঘ বেশি দিন টিকে থাকতে পারল না। ১৮৭২ সালে 'হেগ' সম্মিলনে প্রথম আন্তর্জাতিক সংঘ ভেঙ্গে যায়। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলন এখানেই শেষ হল না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকলেও পৃথক পৃথক ভাবে নানা দেশে শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার ও প্রচার উত্তরোত্তর অধিক হতে থাকে। ১৮৭২ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে আন্দোলনকারিগণ দিন দিন শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে এবং ১৮৮৯ সালে প্যারিস্‌ নগরে আবার আন্তর্জাতিক সভা আহূত হয়। ইহার ফলস্বরূপ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ (Second International) গঠিত হয়। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সংঘ একদিকে যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করে সমাজতন্ত্রবাদী সরকার গঠনে যত্নবান হয়, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার শ্রমিককে সংহত করে তদানীন্তন সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদী সরকারের কাছ থেকে শ্রমিকের নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা আদায়ের

জন্ম (প্রত্যক্ষ) আন্দোলন করতে থাকে। প্যারীস্ বৈঠকে ঠিক করা হল—দিনে ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ করা উচিত নয়। এই উদ্দেশ্যে সর্বত্র আন্দোলন সুরু হয় এবং ১৮৯০ সালে ১লা মে আন্তর্জাতিক সংঘের নির্দ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রথম May Day Demonstration করা হয়। সেই থেকে প্রতিবৎসর ১লা মে দুনিয়ার শ্রমিক মিলনের ও অন্যায় অসাম্যবাদের মূলোচ্ছেদ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে আসছে। প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও শ্রমিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। আজ সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের আশ্রয় স্তম্ভ একে একে ধ্বসে পড়ছে দুনিয়ার সর্বহারা শ্রমিকের আঘাতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এখন সূর্য অস্ত যায়, ফরাসী সাম্রাজ্যগগনে পুনঃ ১৭৮৯ সালের ন্যায় রক্ত-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—সাম্রাজ্যবাদের সমাধি-যজ্ঞ বুঝি অতি নিকটে।

১৮৮৯ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হল। এর পরে ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যাহত হয়। যুদ্ধ বিরতির পর Second Internationalকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে বার্ন ও ১৯২০ সালে জেনেভা নগরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহূত হয়। এদিকে ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে যুগান্তকারী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে—মজুর কৃষকের প্রতিনিধি Communist দলের হাতে রাশিয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে। Communist দলের স্বদেশে এই বিজয়কে সুরক্ষিত ও মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে ইঁহাদের আদর্শবাদের আন্তর্জাতিক প্রয়োগের কথা উঠে। ফলে Second Internationalএর সভ্য ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান, সুইজ প্রমুখ জাতিকে উপেক্ষা করেই ১৯১৯ সালে মস্কোতে Third International (or Comintern) গঠন করা হয়। তারপর ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একদিকে বিভিন্ন দেশে কমুনিষ্টদল ও অপরদিকে ইংরেজ শ্রমিকদলের আদর্শে গঠিত সমাজ-তন্ত্রীদল নিজ নিজ আদর্শে বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলন চালাতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে জগতের শ্রমিক আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় সমাপ্ত হয়।

এই বারে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সন্ধির সর্ত অনুসারে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতি (International Labour Organisation) সম্বন্ধে উল্লেখ করে প্রবন্ধের উপসংহার করা হবে। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকনেতাগণ প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের ফলে বিজেতা ও বিজিত উভয় পক্ষের দেশসমূহে শ্রমিকগণ প্রায় সমান-ভাবেই লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে—বিজয়ের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার ও পরাজয়ের সকল অপমানভার বহন শ্রমিককেই করতে হয়। সুতরাং গোড়া থেকেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন যুদ্ধের বিরোধী ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে স্বার্থসংঘাতের ফলে ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধল, দুনিয়ার শ্রমিক তা রোধ করতে পারল না। কিন্তু যুদ্ধের পর যখন সন্ধি হয় তখন যুদ্ধপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার ফলে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র-সমূহ শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে আংশিকভাবে বোঝাপড়া করতে বাধ্য হয়, তারই ফলে ১৯১৯ সালে International Labour Organisation গঠিত হয়। সরকারী, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে এই অনুষ্ঠান গঠিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মারফত এই অনুষ্ঠান কাজ করে। প্রথম দিকে রাশিয়া ও আমেরিকা এতে যোগ দেন নাই, পরে ১৯৩৪ সালে এরা এই অনুষ্ঠানের সভ্য হন। ভারত গোড়া থেকেই এর সভ্য এবং ১৯২২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কার্যকরী সমিতির আটটি স্থায়ী সদস্য পদের একটি অধিকার করে আছে। ১৯৪৪ সালে ফিলাডেলফিয়া বৈঠকে এই প্রতিষ্ঠান নতুন করে মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ করে :—(১) শ্রমিক পণ্য নয়। (২) নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির জন্য প্রকাশ ও মিলনের অধিকার অবাধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। (৩) যে কোন স্থানের দারিদ্র্য সকল স্থানের প্রাচুর্যের পরিপন্থী। নানা-বিধ বিরোধী মতের উল্লেখ না করে এক কথায় বলা যেতে পারে—এই প্রতিষ্ঠান প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান নয়; তবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীতে শ্রমিককে সাহায্য ও সংহত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান প্রভূত সাহায্য করতে পারে এবং এই কাজের উপরই এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

কৈফিয়ৎ

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়

সন্ধ্যার পর ষ্টুডিও থেকে ফিরে এসে স্নান শেষ করে রেডিওটা খুলে বিনু কেবল চুলে চিরুণী দিয়েছে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। নিতান্ত বিরক্তিভরা দৃষ্টি মেলে অসহায়ভাবে বিনু 'রিসিভারটা' তুলে ধরলো—অনায়াসলব্ধ বিশ্রামের মুহূর্তেও কি লোকের উৎপাত চলবে? একবার মনে হলো রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চুপ করে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ে থাকে···

বিনু, অনেকক্ষণ কষ্ট করার পর তোমাকে পেলাম···

হ্যাঁ, বলুন আপনার বক্তব্য···একটু তাড়াতাড়ি···

আমাকে চিনতে পারছো না, আমি···

হুঁ, বলুন দয়া করে, একটু তাড়াতাড়ি।

আমি এডভোকেট অজিত···

কথা শেষ হবার আগেই বিনুর লজ্জিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—অজিতদা আমি তোমাকে চিনতে পারিনি, তিন

বছর তোমার খোঁজ একদম পাইনি, তারপর জানো তো আমাদের কাজ…নাওয়া খাওয়া ঠিক থাকে না, সম্প্রতি বাইরে থেকে ফিরেছি, আবার হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই যেতে হবে…সব ভাল তো, এখন সেখানেই আছো নাকি!

আজ ভাই একটু দরকারে তোমার খোঁজ করছি। তোমার ষ্টুডিওতে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তোমার টেলিফোন আর বাড়ীর ঠিকানা পেয়েছি। আমি ভাই বিপদগ্রস্ত…আমার ছোট মেয়ে রাণু—রুণু গো, যাকে তুমি চওড়া নীল ফীতে প্রায়ই দিতে। আজ ত্রিশ দিনের ওপর সে টাইফয়েডে গুরুতর অসুস্থ…মাঝে মাঝে বেশ জ্ঞান ফিরে আসে…এ কদিন অনেক সময়ই তোমার কথা বলছে…তাই তোমার বৌদি বল্লেন তোমাকে খবর দিতে, যদি সময় করে এসে একবার দেখো…তের চোদ্দ বছরের মেয়ে, আর কতদিন কষ্ট সইবে!

সেকি কথা অজিতদা', আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যাচ্ছি…আলিপুরের সেই বাগান বাড়ী তো…হঁ, আমি যাচ্ছি।

বিনয়কৃষ্ণ বা বিনু প্রথম যৌবনে মেসোপোটিমায়ারে দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকের গুরুভার বহন করে কার্য্যক্ষেত্রে নেমেছিলো—তারপর বীমার দালালি, ঔষধের কারখানা, জিনিষপত্র কেনা-বেচা, আমদানী রপ্তানা বহুবিধ কাজের সঙ্গে বহু বৎসর লিপ্ত থাকে সে। তারপরে কোনও বিশিষ্ট ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারিণী কর্ত্তৃক অভিনয়ের জন্ম মনোনীত হয় বিনু। তার লম্বা, পাতলা সুন্দর চেহারা, সুশ্রী মুখ ও লালিত্যপূর্ণ চোখ দুটি সত্বাধিকারিণীকে আকর্ষণ করেছিলো। ছায়াচিত্রে ক্রমাগত একটানা সাফল্য লাভ করে, কর্ম্মচঞ্চল যশবহুল যৌবনে বিনুর আর বিয়ে করবার অবসর বা ইচ্ছা হয়নি—বিবিধ অভিনেত্রীর বিভিন্ন সাহচর্য ও আলাপের মধ্য দিয়েই বিনুর বেশীর ভাগ সময় কেটে যেতো, একজনের কাছে বাঁধা হয়ে তারই সাথে অনুরাগহীন প্রেমের আদান প্রদান দীর্ঘকাল করার কথা মনে হলেই সে শিউরে উঠতো। তার মাতৃপিতৃহীন কৈশোরে কিছুদিন অভিভাবকের কাজ অজিতবাবু করেছিলেন—এই সূত্র ধরে ঐ পরিবারের সঙ্গে তার একটা স্নেহভারবিনত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ছায়াচিত্রে প্রবেশ করার পর কিছুদিন এই ধনী উচ্চশিক্ষিত পরিবারের অনেক সান্ধ্য আসরেই এই জনপ্রিয় চিত্রতারকার হাসি গান মুখরিত হয়ে থাকতো—সন্ধ্যাতারার মত এই আসরকে সে স্নিগ্ধ করে রাখতো সেই কিশোরী বালিকা রাণু। তার গৌরবর্ণ তনু, শুভ্র রূপালী হাসি, লম্বা বেণীর সঙ্গে চওড়া নীল সিল্কের ফিতে, আনত স্থির দৃষ্টি, মধুরতম কণ্ঠ সবই মিলে পরিচিত, অপরিচিত আগন্তুকের চিত্ত-ক্ষেত্রে সরসতার সৃষ্টি করতো। বিনু রাণুকে খুব ছোট্ট থেকেই দেখেছে—তার বাল্য, কৈশোরের পরিবর্তন বিনুর কাছে স্বাভাবিক ভাবেই ফুটে উঠেছে—চির আনন্দিত এই বালিকাকে সে অযথা আদর করেছে—খোঁপা ধরে টেনেছে—সময় অসময়ে নাইটএঙ্গল বলে ডেকেছে…হাত ধরে হারমোনিয়াম সেতারের বাজনা শিখিয়েছে, বায়স্কোপে নিয়ে যাবার কথা উঠলেই কত বকুনি দিয়েছে…শান্ত-স্তিমিত দৃষ্টি বিনুর দিকে মেলে রাণু মনে করতো বিনুদার মত এমন করে মিষ্টি গান কেউ গাইতে পারে না, দেশ বিদেশের এত বিচিত্র খবর কেউ রাখে না, এমন চমৎকার কর্মপটু লোক জগতে আর নেই…

বিছানার পাশে বসে রাণুর জীর্ণ নিষ্প্রভ মুখখানির দিকে চেয়ে বিনু কোমল কণ্ঠে বলে উঠলো, খুব ভুগে উঠলি, এবার সাবধানে থাকবি, দস্যিপানা করলে আবার…

সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরখানাতে মৃদু নীল আলো রোগ-শয্যাকে আরও কঠিন করে তুলেছিলো—রাণু ঠোঁট নেড়ে ম্লান কণ্ঠে কি বললো বোঝা গেল না—পাংশু দুর্বল মুখখানা অস্বাভাবিক জ্যোতিতে যেন ক্ষণকালের জন্ম উজ্জল হয়ে উঠলো। তারপর রোগ শীর্ণ হাতখানা বিনুর দিকে প্রসারিত করে আবার চোখ বুজলো।

মিসেস আরতি মুখার্জ্জি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিলেও সপ্রতিভতার জন্মই বোধ হয় দেহের যৌবনকে বেঁধে রেখেছেন—বীনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বল্লেন—ডাক্তার বলছেন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন আবশ্যক, বিশেষতঃ ওকে প্রফুল্ল রাখা সদা সর্বদা প্রয়োজন, সেজন্মই ওঁকে বলে তোমাকে এটুকু কষ্ট দিলাম। তুমি অবিশ্যি কাজের লোক, সব সময়েই engagement তোমার…

তাঁর শেষের দিকের কথাগুলিতে ঈষৎ বেদনাজড়িত

সংকোচের আভাস লক্ষ্য করে বীনু বাধা দিয়ে বল্লো, এ তিন বছর আমার ওপর দিয়ে কি রকম গেছে তা আপনাদের বোঝাতে পারবো না—এখন অবিশ্যি জের কমেছে, তাছাড়া এত অসুখের খবর পেয়ে আমার তো নিজের থেকেই আসা উচিত···রাণু তো আমার ছোট্ট বোনের মতই···

বাধা দিয়ে মিসেস্ মুখার্জ্জি একটু তৎপরতার সঙ্গে বল্লেন—ও তোমার মেয়ের মতই ছিলো, তোমার বিয়ে হলে এতদিন ওর মত মেয়ে হয়তো তোমার হতো। যন্ত্রচালিতের মত অর্থহীন দৃষ্টি বিনু মিসেস্ মুখার্জ্জির দিকে নিক্ষেপ করে চুপ করে রইলো।

আরও কয়েক দিন পর। রাণু এখন নিজে নিজেই বিছানার ওপর উঠে বসতে পারে—হাত ধরে বারান্দায় গিয়ে ইজিচেয়ারেও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। বিনু কয়েক দিনই সন্ধ্যার দিকে নিয়মিত এসেছে, গল্পগুজবে হাসি ঠাট্টায় রোগিণীর চিত্তবিনোদন করেছে। অনেক রাতে বাড়ী ফেরবার আগে দু একটি বাছা বাছা পুরাণো গান, যা হাতে ধরে রাণুকে শিখিয়েছে তাই গাইতো। রাণুর শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সঙ্গে অতিথিসৎকারপরায়ণ পরিবারটির কর্মচঞ্চলতা বেড়ে উঠেছিল; তেতালায় রাণুর ঘরে যাবার আগে মিসেস মুখার্জ্জির সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের সূত্র বিনু সতর্কতা সহকারেই পরিহার করে চলতো। মিঃ মুখার্জ্জি নিজের ব্যবসা, কাজকর্ম নিয়েই সদা-সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বাটীর খুঁটিনাটি কোন ব্যাপারেই থাকতেন না; গৃহিণী গৃহের সাম্রাজ্ঞীরূপে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, সব বিষয়েই তাঁর কর্তৃত্ব ছিল সমান।

বর্ষার এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে বিনু রাণুর ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছে আর আপনমনে গুণ গুণ স্বরে গাইছে—

ঘরে ঢোকবার একটু আগেই সে থমকে দাঁড়াল, সামনে বিশেষরূপে সজ্জিত হয়ে কোমরে হাত দিয়ে মিসেস মুখার্জ্জি দাঁড়িয়ে, তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগে আছে। অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বল্লেন—বুঝলে বিনু, আমরা কাল পুরী যাচ্ছি, ডাক্তার বল্লেন—এখন change দরকার। মাস দুয়েক change হলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। শোনো—বিনুর শরীর···তখন ঘরে ঢুকে গেছে সে, ঘাড় বেঁকিয়ে বল্লো—ও তাই না কি। রাণুর তো খুব মজা তাহলে···রাণু, ও রাণু, রুণু···ও। বারান্দায় আছিস বুঝি? বারান্দায় রেলিংয় সঙ্গে হেলান দিয়ে বিনু একটু জোরে সানন্দে বলে উঠলো—রাণু আসবার সময় আমার জন্য অন্তত ৩১টা রঙ বেরঙের ঝিনুক আনবি, বুঝলি। তারপর সমুদ্রের জলে নেয়ে মোটা কালো হয়ে আসবি। কেউ তোকে সহসা বিয়ে করবে না, বলবি বিনুদা, আমার একটা রাঙা বর দেখে দাও।

রাণু অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সরস দুর্বল কণ্ঠে বল্লো, বিনুদা ৩১টা ঝিনুক আনবো কেন? তার কম বেশী না কেন? ৩১ বছর তোমার বয়স বলে নাকি?

দূর তোর একেবারে বুদ্ধি নেই—আজ দিয়ে যে ৩১ দিন আমি এসেছিলাম তোর কাছে···রুগীর কাছে!

ঐ গুলো দিয়ে তুমি ঋণ শোধ করতে বলছো বুঝি, রাণুর কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী ও গম্ভীর···হঠাৎ এই রোগ-কাতর বালিকাটি আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলো!

নির্বাক বিস্মিত দৃষ্টিতে হতবুদ্ধি বিনু কিছুক্ষণের জন্য রাণুর দিকে চেয়ে রইলো···তারপর হঠাৎ কি মনে করে এগিয়ে এসে চিবুক ধরে রাণুর মুখখানা তুলে ধরতেই দেখলো—চোখের জল গালে লম্বা দাগ টেনে দিয়েছে···

বিনু স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বল্লে—৩১ একটা lucky number যে রাণু···আমার বাড়ীর নম্বরও যে ৩১! পুরীর খবর দিয়ে আমাকে ৩১ খানা মজার চিঠি লিখিস্—

নীলাচলে নীল সমুদ্রের বালুকাময় তীরে সূর্য্য কিরণ দেখার জন্য প্রতি সকালেই রাণু বের হতো—দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের ওপরে অবনত নীলাকাশ, গভীর জলরাশি সবই কিশোর বালিকার মনে এক অপরূপ পরিবর্তনের আলোড়ন আরম্ভ করলে। রোগ শয্যায় যার স্পর্শ, সেবা তাকে প্রতিনিয়ত মাদুলিকা সজ্ঞের মত নিরন্তর শক্তি ও শান্তি দিতো, দূর প্রবাসে আজ তার ব্যবধান যেন গুরুতর আকার ধারণ করেছে—বালিকা জীবনের অত্যুগ্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা নবরূপ ধারণ করে এক অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্যা-লোকে তাকে নিয়ে চলেছে। বীনুদাকে সে অনবরত চিঠি লিখেছে, জবাবও ঠিক মত পেয়েছে কিন্তু চিঠিগুলো বড় ছোট। বীনুদা এত গল্প গুজব করতে পারে, কিন্তু তাকে কি বড় করে ভালো করে একখানা চিঠি দিতে

পারে না? মাকে এ বিষয়ে অনুযোগ করেও কোন ফল হয় নি। দেখতে দেখতে দুমাস হয়ে গেছে, বাবা এসেছেন—কাল তাদের পুরী থেকে বিদায়ের দিন। বিনুদা ঝিনুকের যে ফরমাস দিয়েছেন তা কবে তোলা হয়েছে, আরও অনেক জিনিষ সংগ্রহ হয়েছে···একবার এখন দেখা হলে হয়—কোঁচড় ভরে যাবে যে তার।

বিনুর ঘরে টেলিফোন বেজে উঠলো সন্ধ্যার একটু আগেই। মিঃ মুখার্জি বল্লেন—বিনু আমরা আজই ফিরেছি···রাণুর আশ্চর্য্য পরিবর্তন—একেবারে ৩০ পাউণ্ড বেড়ে গেছে। তোমার কথাই হচ্ছিল, যদি পারো একবার এসো···

হাঁ্যা আমি যাচ্ছি—বলেই বিনু গায়ে পাঞ্জাবী চাপালো।

রাণু কোথায়? ঘরে নেই তো···রাণুর ঘরে ঢুকে নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে বিনু বারান্দায় এসে দাঁড়ালো; সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তার শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো—রাত্রির অনাবৃত নীল তারাখচিত আকাশের দিকে চেয়ে তার অন্তরের শূন্যতা সে সহসা অনুভব করলো। একটা অস্বাভাবিক বিরক্তিতে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠলো···

কিগো বিনুবাবু—সুসজ্জিত বেশে মিসেস মুখার্জ্জি দেখা দিলেন।

বিনু জোর করে একটু হাসি টেনে শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো—রাণুর নাকি খুব পরিবর্তন হয়েছে, তা হলে আপনাদের বিদেশবাস সার্থক হলো বলুন?

রাণু দরজার পাশে অনেকক্ষণ থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল—লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে সামনে এলো—কিসের সঙ্কোচে তার মুখ চোখ আড়ষ্ট, বীনুর মুখের দিকে চাইবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তার নেই।

বীনু সোল্লাসে বলে উঠলো—বাঃ চমৎকার চেহারা হয়েছে, এখন আর ভাবনার কোন দরকার নেই—

সরস সুন্দর মুখখানা বিনুর দিকে ঈষৎ প্রসারিত করে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে রাণু বল্লো—ধ্যেৎ। প্রথম যৌবনের নব উদ্দীপনায় রাণুর সমৃদ্ধ দেহখানি যেন অপরূপ সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে—এ রোগ শয্যায় ছিন্নলতা নয়, এ যেন নববর্ষা আপনার সজল নিবিড় কেশ নিয়ে আনন্দগর্জ্জনে চির প্রত্যাশী বনভূমির উপর বর্ষণের নিবিড় ছায়া ঘনিয়ে তুলবার উপক্রম করছে। মিসেস মুখার্জ্জি ইঙ্গিতে রাণুকে বাইরে যাবার নির্দ্দেশ দিলেন; তারপর সুর যথা সম্ভব দৃঢ় করে বিনুকে বল্লেন—আমি তোমাকে এতগুলো চিঠি দিলাম, একখানার জবাব দিলে না, অথচ রাণুর···

অতর্কিত আঘাতে অভিভূত হয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে বিনু চাইলো···

মিসেস মুখার্জ্জি এবার একটু জোরেই আরম্ভ করলেন, কেন উত্তর দিলে না সেটার একটা কৈফিয়ৎ তোমাকে আজ দিতেই হবে—আমি তার মা, অভিভাবিকাও বটে, মান অপমানের কথা ছেড়ে দিলেও জিনিষটা জানবার অধিকার আমার আছে, সেটা তুমি অস্বীকার করতে পারবে না···

বিনু ভ্রুকুঞ্চিত করে মাথা একটু নীচু করলো, তারপর ধীরে ধীরে অবনত মুখে সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলে।

মিসেস মুখার্জ্জি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেদনাহত কঠিন কণ্ঠে বল্লেন—নীতিবোধ বা ধর্মবোধ কি কিছুই তোমার নেই; আজ তোমাকে কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে···

বিনু ঘাড় বেঁকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বল্লে—কৈফিয়ৎ।

মিসেস মুখার্জ্জি জোরের সঙ্গে বল্লেন—হাঁ কৈফিয়ৎ, অসারল্যের কৈফিয়ৎ।

বিনু ঈষৎ ঠোঁট চেপে দৃঢ় সংযত কণ্ঠে উত্তর দিলে—আপনার রুগ্ন মেয়েকে, আপনাদের আমন্ত্রণেই প্রতিদিন এসে গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে প্রফুল্ল করাবার চেষ্টা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে করেছে—যার জন্য শারীরিক ও মানসিক ক্লেশকে সে প্রতিদিনকার সংগ্রামে পরাজিত করে রোগ শয্যার অশেষ কষ্টের সঙ্গে বসে কাটিয়েছে—রুগ্ন বালিকার অসহায়তা দেখে নিছক অনুকম্পায় বসেই যে এ কাজ করেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ আপনার না থাকতে পারে—কিন্তু কৈফিয়ৎ দেবার আগে এ অপ্রিয় সত্যটা বলতে হবে বলেই চলে যাচ্ছিলাম—ছায়া চিত্রে কাজ করলেও সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞান হয়তো আমার আছে···মিসেস মুখার্জ্জির নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে বিনু ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দুর্গের মধ্যে চারটি রাজ-প্রাসাদ আছে। মহারাজা শূরসিংহের তৈরী 'মতিমহল'। মহারাজা অভয়সিংহের তৈরী 'ফুলমহল', মহারাজা তখতসিংহের তৈরী 'শৃঙ্গার চৌকী'। যোধপুরের প্রত্যেক নূতন মহারাজার রাজ্যাভিষেক বরাবর এই প্রাসাদেই সুসম্পন্ন হয়। আর চতুর্থ হচ্ছে মহারাজা অজিতসিংহের তৈরী 'ফতেমহল' অর্থাৎ 'বিজয়-প্রাসাদ'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যোধপুর মোগলের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার সেই স্মৃতি উজ্জ্বল রাখবার জন্ত এই 'ফতেমহল' নির্ম্মিত হয়। 'ফতে' শব্দের অর্থ হ'ল 'জিৎ' বা জয়। উপস্থিত এই প্রাসাদটি যোধপুর রাজবংশের "জহরখানা" বা 'রত্ন-ভাণ্ডার' রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। মহারাজার ব্যক্তিগত অনুমতি পত্র ভিন্ন এর মধ্যে কোনো দর্শকের প্রবেশাধিকার নেই।
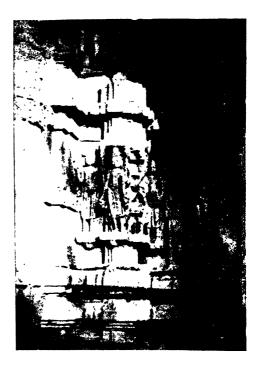
দুর্গের মধ্যে দু'টি জলাশয় আছে, একটি 'চিড়িয়ানাথজীর ঝর্ণা' আর একটি রাণী সাগর। কথিত আছে যে যোধপুর দুর্গ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই পাহাড়ের উপর এক সাধু মহাপুরুষ বাস করতেন। তিনি সকলের কাছে 'চিড়িয়ানাথজী' নামে পরিচিত ছিলেন। চিড়িয়ানাথজীর কুটীর সম্মুখস্থ এই পার্ব্বত্য ঝর্ণাটিও তাঁরই নামে অভিহিত হত। রাও যোধা নাকি এঁকে বিতাড়িত করে পাহাড়টি দখল করেছিলেন—দুর্গ নির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে। আর 'রাণী সাগর' নির্ম্মাণ করেছিলেন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্ত হাদিজীর রাণী, কিন্তু মহারাজা রায় মল্লদেব এটিকে যোধপুর দুর্গের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

মহারাজা যশোবন্তসিং সমাধি মন্দির

সমাধি মন্দির গাত্রের কারুকার্য্য

এই দুর্গের প্রাকারশীর্ষে কতকগুলি ঐতিহাসিক কামান সুরক্ষিত আছে। প্রত্যেক কামানটিতে নাম খোদাই করা ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আছে। 'কিল-কিল্লা' নামে একটি কামান আছে যেটি ১৭০৩ থেকে ১৭২৪ খৃঃঅব্দের মধ্যে আমেদাবাদে তৈরী হয়েছিল। এ থেকে

বোঝা যায় যে ইংরেজ এদেশে আসবার পঞ্চাশ বছর আগেও ভারতবর্ষে কামান ও বন্দুক যথেষ্ট তৈরী হত। একটি কামান আছে তার নাম
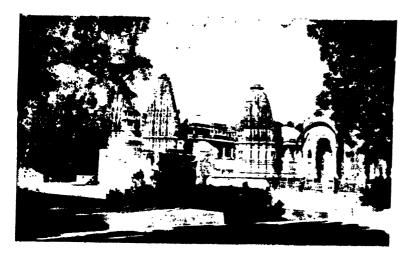
মান্দোরে রাজ সমাধি ক্ষেত্র

'গাজ্নী খাঁ' এটি ফরাসী দেশে তৈরী। ১৬২০-১৬৩৮ খৃঃঅব্দের মধ্যে মহারাজা গজসিংহ জালোর যুদ্ধে পরাস্ত শত্রুপক্ষের কাছ থেকে কেড়ে

মহারাজ অজিতসিং সমাধি মন্দির

নিয়েছিলেন। দুর্গের অস্ত্রাগারের মধ্যে (শাইলেখানা) এমন সব প্রাচীন ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত আছে যা দেখলে মনে হবে ভারতবর্ষকে ইংরেজ নিরস্ত্র করে না রাখলে এখানে 'মেশিন গান' প্রভৃতি অতি আধুনিক আগ্নেয় অস্ত্রও এতদিনে নির্ম্মাণ হ'তে পারতো।

দুর্গাভ্যন্তরের রাজপ্রাসাদগুলির মধ্যে মতিমহলের কথাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই মতিমহলের নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষ হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতে।

এই প্রাসাদের একটি কক্ষের অভ্যন্তর-গ চন্দ্রাতপ থেকে সুরু করে চতু কে থাঁটি সোনার কারু-কার্যে মণ্ডিত পাতে মোড়া। প্রাচীর গাত্রে নানা রাগ রাগিণীর মীনাকরা সুরঙ্গীণ চিত্র। প্রত্যেক ছবিখানি রাজপুত চিত্রকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন! এ ছাড়া ষড় ঋতু ও যোধপুর রাজ বংশাবলীর চিত্র অঙ্কিত আছে। বেশ দীর্ঘ প্রশস্ত ঘর। অনেকগুলি দেওয়াল মুকুর মণ্ডিত। দেখে বোঝা যায় এটি মহারাজাদের বিলাস কক্ষ। এখানে প্রায়ই ভারতীয় নৃত্য গীতাদির আসর বসে।

জেনানামহলের স্থাপত্য কলা দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। ঝরোকা ও জাফ্রীর বাহার দেখে আগ্রা দুর্গের মোগল স্থাপত্য কলা মনে পড়ে। এখানো কোনো পুরুষ দর্শকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু আমরা প্যালেস্ ইঞ্জিনীয়ার গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে যাওয়ায় এই নিষিদ্ধ প্রদেশেও প্রবেশ লাভ করেছিলুম। সে সময় কোনও মহারাণীই জেনানামহলের শোভা বর্দ্ধন কর-ছিলেন না। কারণ মহলটির সংস্কার চলছিল। এখানে থাকেন কেবল-মাত্র যোধপুরের যত মৃত মহা-রাজার বিধবা রাণীরা। বাবাজী এই রাজকীয় অন্তঃপুরের স্থাপত্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর 'লাইকা' ক্যামেরাটি বার ক'রে নিঃশব্দে যখন ছবি তুলছিলেন—হৈ হৈ করে বেরিয়ে এল রাণীদের মহল থেকে বেত্রধারিণী ও তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিনীর দল। সমস্বরে

মেহাজী গগাজী

হরভুজী অম্বাজী

রাও মল্লদেবের সমাধি মন্দির (১৫৭২ খৃঃ) ও মহারাজা তক্তসিং সমাধি মন্দির (১৮৭৩ খৃঃ)

চিৎকার শোনা গেল—"তস্‌বীর মত খিচ না! হুকুম নেই হ্যায়!"

বাবাজীর তখন কাজ হয়ে গেছে। 'বহুৎ আচ্ছা' বলে তিনি ক্যামেরাটি কেসে পুরে ফেলে বললেন "কসুর মাফ্ করণা! বহুৎ

'বাল সামান্দ' হ্রদ ও উদ্যানবাটী

উদ্যানবাটীর 'কমল উৎস'—(মর্ম্মর প্রস্তরে নির্মিত উৎস মধ্যে নবনীতা। ফোয়ারাটি যখন চলে পদ্ম-পাপড়ির উপর দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ে)

পিয়াস লাগা, থোড়া পিনেকা পানি মেহেরবাণী করকে দিজিয়ে!"… শীতল পানীয় জল এল বটে, কিন্তু সে মহারাণীদের মর্ম্মর খোদিত সোরাই থেকে নয়, চেড়ীদের ঘরের পিতলের লোটায়!

তৃষ্ণা নিবারণ হল বটে সকলেরই, কিন্তু কেমন যেন তৃপ্তি হল না। এরা রাণীর সহচরী বা পরিচর্য্যাকারিণী হ'লেও রাজপরিচারিকা ছাড়া রাজকন্তা নয়—একথাটা কোনমতেই ভুলতে পারিনি যে!

যোধপুর ছেড়ে আসবার আগে আমরা এই মরুরাজ্যের কয়েকটি রমণীয় হ্রদ পরিদর্শন করে এলুম। 'উমেদ্ সাগর', 'কৈলানা হ্রদ', 'সুর সাগর' ও 'বাল সামন্দ' তার মধ্যে প্রধান। 'বাল সামন্দ' অর্থে 'ছোট সমুদ্র' বোঝায়। এটি একটি প্রাকৃতিক পার্ব্বত্য বাঁধ, কিন্তু শিল্পী মানুষের প্রতিভা এঁকে অসামান্ত করে তুলেছে। বাল সামন্দের ফোয়ারা, ঝর্ণা, বিচিত্র উদ্যান ও পুষ্প বাটিকা এবং কুঞ্জকুটীর স্থানটিকে এমন একটি শোভা ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছে যে এর মধ্যে ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছা করেনা।

এইবার যোধপুরের প্রাচীন রাজধানী 'মান্দোর' এবং তারই সন্নিকটস্থ রাজা-মহারাজাদের সমাধি মন্দিরের কথা বলে আমি যোধপুর প্রসঙ্গ শেষ করবো, কেননা, রাজপুতের দেশের অনেক অংশের কথা এখনও বলতে বাকী রয়েছে। বিকানীর, যশলমীর, উদয়পুর, চিতোরগড়, জয়পুর, ভরতপুর ইত্যাদি আরও অনেক কিছু বাকী!

মান্দোরের বিশেষত্ব হচ্ছে এ নগরটি ইতিহাসে বহুবার হাতবদল করেছে। কথিত আছে, পুরাকালে 'মাণ্ডু' ঋষি এই নগরের পত্তন করেন। এরপর নাগবংশী রাজপুত, প্রামার ও পরিহার রাজপুতেরা পর পর এটিকে দখল করে, তারপর ১৩৯৫ খৃঃঅব্দে রাঠোর বীর রাও চন্দ্র মান্দোর অধিকার করেন। কিন্তু ১৪৫৩ খৃঃঅব্দে যোধপুরপতি রাও যোধাকে পরাস্ত করে মেবার বীর আহাদা হিঙ্গোলা 'মান্দোর' অধিকার করেন। এখানে তাঁর বিরাট এক স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। কিন্তু দশ বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৪৬৩ খৃঃঅব্দে আবার রাওযোধা মান্দোর আক্রমণ করেন এবং হিঙ্গোলাকে হত্যা করে মান্দোর পুনরধিকার

করেন। মন্দার নগরের আজ ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখতে পেলুম। তবে, যেটুকু আছে তা' সযত্নে রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। যোধপুরের 'যাদুঘর' (সর্দ্দার মিউজিয়ম) খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর ব্যবহৃত মৃৎপাত্র, ও অন্যান্য বহু প্রাচীন রাজপুত শিল্প-কলার নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। 'মান্দোর' নগরের প্রাচীন দুর্গ জুনাগড়ের চিহ্ন বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। তোরণদ্বার ও স্থাপত্য কলার যে নিদর্শন চোখে পড়লো তার মধ্যে বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের প্রভাবই বেশী।

মান্দোর ও জুনাগড়ের ধ্বংসাব-শেষের নিকটে রাজন্যবর্গের সমাধি-গুলি এখানে হিন্দুতীর্থ 'পঞ্চকুণ্ড' অবস্থিত। এই পবিত্র পঞ্চকুণ্ড তীরে নৃপতিদের মৃতদেহ সমাহিত করা হ'ত। যোধপুরে যাঁরা আসবেন তাঁরা যদি এই রাজ স্মৃতি মন্দিরগুলি না দেখে যান তাহ'লে যোধপুরের এক বিরাট ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন থেকে বঞ্চিত হবেন। এক একটি স্মৃতি-মন্দির ভারতীয় স্থাপত্য কলার গৌরবময় অপূর্ব্ব নিদর্শন বহন করছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পর পর নির্ম্মিত যোধপুর ও মাড়োয়ার নৃপতিগণের এই ছোট বড় সমাধি মন্দিরগুলির মধ্যে মেবারের উত্থান পতনের অলিখিত ইতিহাস পাঠ করতে পারা যায়। স্বর্গীয় রাণীদের স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত ছোট ছোট 'ছত্রী' আছে। তাছাড়া, এখানকার 'সতী-মন্দির' থেকে বোঝা যায় রাণীরাও কেউ কেউ সহমরণে যেতেন।

রাজপুত স্মৃতি ছাড়া এখানে ইসলাম অধিকারের লজ্জাজনক স্মৃতিও অক্ষয় হয়ে আছে,এখানে প্রবেশের সুগঠিত ও সুদৃঢ় পাষাণ তোরণ পথে। পাঠান গোলাম শের কালান্দার খাঁ ও তমন্না গাজীর বিজয় চিহ্ন আজও বিলুপ্ত হয়নি। তারাপীরের দরগায় কারুকার্য্যখচিত চন্দন কাঠের প্রবেশদ্বার এখনও মোগল মহিমা প্রচার করছে।
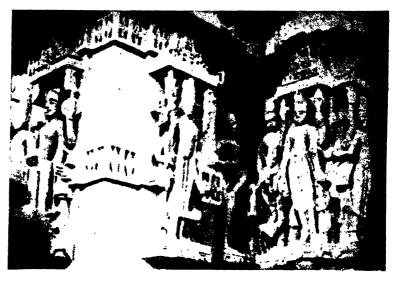
সমাধি মন্দির গাত্রে মূর্ত্তি শিল্প

আধুনিক সমাধি মন্দির

মান্দার নগরের একাংশে এক বিশাল স্বর্গপুরী ছিল। সেখানে নাকি তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ছিল। একটি পাহাড়ের ধারে ধারে পাহাড়ের গা-কেটে কেটে এই মূর্ত্তিগুলি খোদাই হয়েছিল।

কিন্তু "তেত্রিশ ক্রোড় দেবতা-কা স্থান" নামটাই আছে। দেবতা কেউ নেই। মহারাজ অভয়সিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে ষোড়শ বিচিত্র মূর্ত্তি এখানে নির্ম্মিত হয়েছিল, সেগুলি এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। এই ষোলটি মূর্ত্তির মধ্যে চামুণ্ডাবধ, মহীষাসুরমর্দ্দিনী, গোঁসাইজী, (রাজপুতানার প্রধান পুরোহিত) মল্লীনাথজী (মল্লানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা), প্রভুজী (গো-রক্ষার জন্ম ইনি প্রাণ দিয়েছিলেন), রামদেওজী (মহারাজা অনঙ্গ পালের বংশধর এক বীর), হরভূজ (ইনি রাওযোধাকে বর দান করেছিলেন), অম্বাজী (এই পানবর রাজপুত

রাজস্বপতি পত্নী শ্রীমতী অংশু দেবী

দেবতা বিকানীরপতিদের ইষ্টদেবতা), মেহাজী (একজন প্রসিদ্ধ রাজপুত বীর, চারণ গানের মধ্যেও এঁর উল্লেখ আছে), গগাজী (দানবীর বলে এঁর খ্যাতি ছিল), ব্রহ্মা, সূর্য্য, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব ও সাধু জলন্ধরনাথজীর মূর্ত্তি। দুঃখের বিষয় যে এই মূর্ত্তিগুলিকে ভাস্কর্য্য কলার দিক দিয়ে কিছুতেই উচ্চশ্রেণীর বলা চলে না।

ধীরেন ভায়ার সযত্ন পরিচালনার গুণে তিনদিনের মধ্যেই আমরা যোধপুরের যা কিছু দ্রষ্টব্যস্থান সমস্ত দেখা শেষ করে ওখানকার প্রবাসী বাঙালী সমাজের নেতা ও মুখপাত্র ডাক্তার বিজয়লালের বাড়ীতে একটি চা পার্টিতে বিশিষ্ট বাঙালীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ক'রে এবং একদিন শ্রীমতী গুপ্তার আতিথ্যলাভের সৌভাগ্যে ধন্ত হ'য়ে পরম পরিতুষ্ট মনে যোধপুর ছেড়ে উদয়পুরের দিকে রওনা হলুম।

ধীরেন ভায়ার স্ত্রীভাগ্য ঈর্ষাযোগ্য। শ্রীমতী গুপ্তাকে একজন অসামান্তা সুন্দরী বলা চলে। তিনি যে শুধুই 'তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি' তাই নন, অশেষ গুণবতী, বিদুষী, শিল্প কলানুরাগী এবং সবচেয়ে বড় কথা—অতি সরস সুমধুর আলাপচারিণী! অসুস্থ শরীরেও তিনি আমাদের যে রকম আদর যত্ন করেছিলেন তা যথার্থই

রাজস্বপতি শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রশংসনীয়। তাঁর মধ্যে তথাকথিক সাজা ভদ্রতার কোন কৃত্রিম রূপ বা ছদ্মবেশ নেই। তাঁর চরিত্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে সেটা আমাদের অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তিনি যেন—কবির ভাষায় একখানি সুন্দর সুগঠিত ও শাণিত 'খাপখোলা তলোয়ার!'

যেদিন যোধপুর ছাড়লুম, ধীরেন ভায়া, ডাক্তার বিজয়লাল, অধ্যাপক নন্দী প্রভৃতি ওখানকার মাননীয় বন্ধুগণ আমাদের ষ্টেশন পর্য্যন্ত এসে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন।

(ক্রমশঃ)
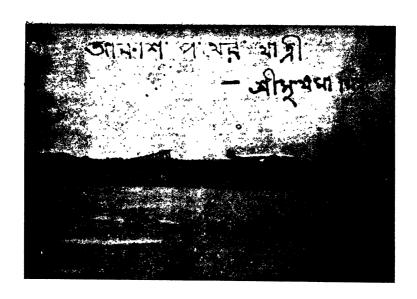
আমরা নর্থ সির সুদীর্ঘ আঁকা বাঁকা তীররেখা পেরিয়ে সুইডেনের উপর এসে পড়লাম। বিমান গোটেনবুর্কে ধীরে ধীরে নেমে দাঁড়ালো, আমরা নেমে এরোড্রমের ওয়েটিংরুমে গেলাম। পৃথিবীর মাটীতে নেমে কেবল মনে হতে লাগলো—এতক্ষণ যেন কোন মেঘের রাজ্যে ছিলাম। নিজের চোখকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না—চলচ্চিত্রের ছবির মত মুহূর্তে সব বদলে গেল ; মনে ধাঁ ধাঁ লেগে গেল।
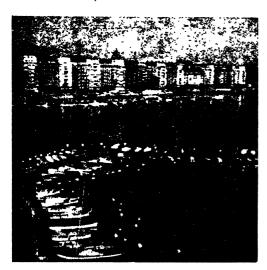
মানুষ। এখানে একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ডাক এল, আবারও বিমানে উঠলাম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ষ্টকহলমে পৌঁছে গেলাম। যথারীতি কাষ্টম ও পাশপোর্টের হাঙ্গামা সেরে বেরিয়ে এলাম। চারিদিক থেকে ছবিওলাদের ভীড় জমলো—নতুন দেশের নতুন মানুষের ছবি চাই। সামনেই দেখি প্রফেসার হে ম্যোন—স্থানীয় স্বনামধন্য স্ত্রীচিকিৎসক, গাড়ী নিয়ে এসেছেন আমাদের নিতে। আমরা প্রফেসারের সঙ্গে কথা-

ষ্টকহলম শহর (প্রাচীন অংশ)

ষ্টকহলম শহর (আধুনিক অংশ)

বার্ত্তা বললাম, তারপর তাঁর গাড়ীতে করে সহরের দিকে রওনা হলাম। বাইরে কনকনে শীত—তাপ প্রায় ৩৮°, আমাদের মোটর কিন্তু গরম, ঠাণ্ডা বুঝতেই পারছি না। প্রফেসার বললেন, এখন শীতের শেষ, জমির বরফ গলছে, গাছে এখনও কোন পাতা বেরোয়নি।

আমরা এখানে কিছু পাউণ্ডকে সুইডিশ ক্রোণে বদলে নিলাম। এ দেশের লোকেরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সুইডিশরা দীর্ঘকায়, খুবই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তাদের পাশে আমরা ছোট্টখাট্ট

শুনলাম শীতকালে—২০—২৫ অবধি টেম্পারেচার নামে Baltic Sea জমে বরফ হয়, তার উপর দিয়ে হেঁটে ওপারের দেশে যাওয়া যায়।

প্রফেসারের সাথে গল্প করতে করতে মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। Hotel Plazaতে তিনি আমাদের জন্য ২ খানি ঘর রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। আমরা বাক্সনিয়ে তিন তলার ২ খানি ঘরে গেলাম, চমৎকার সাজানো ঘর, উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, ঘরের টেম্পারেচার তখন ৬০°, আমরা ক্লান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

২রা মে। সকালে কাগজওলারা আমার ছবির জন্য এসে হাজির। আমাদের সাজ পোষাক ও আমাদের চেহারা তাদের মহাবিস্ময়ের কারণ হল—ঔৎসুক্যের অবধি নেই। আমার জরিপাড় সাড়ী, খুকুর সালওয়ার সুট ও ওঁর গলাবন্ধ কোট দেখে Costumeএর প্রশংসা আর ধরে না। ছবি তোলা হল, ভারতবর্ষের নানা কথা জিজ্ঞেস করল, তারপর ওঁর কাজকর্ম্মের খবর লিখে নিয়ে চলে গেল। দেখলাম তারা ভারতের কিছুই জানে না। পৃথিবীর এককোণায় এদের বাস, দেশ-

সুইডিশ সংবাদপত্রে আমরা।

দেশান্তরের মানুষদের এরা চোখে দেখে না, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে এশিয়া মহাদেশের খবরাখবর জানার সুযোগ এদের ভাগ্যে খুব কমই ঘটে।

আমরা প্রাতরাশ ঘরের ভিতরই সেরে নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছি। শীতে কেঁপে মরি, সামান্য একটু ঘুরেই আমি হোটেলে ফিরে এলাম। উনি গেলেন হাসপাতালে। এ দেশে লাঞ্চ খায় ১১টা হ'তে ১টার মধ্যে, সান্ধ্যআহার করে ৫টা থেকে ৭টায়। উনি ফিরে এলেন। ১২টার সময় লাঞ্চ খেয়ে আমরা ইলেক্ট্রিক ট্রামে করে চললাম সহর প্রদক্ষিণ করতে। ষ্টকহলম ছোট সহর, লোক কম, সারা সুইডেনের লোকসংখ্যা মাত্র দশ লক্ষ। ষ্টকহলমের শোভা হ্রদে, অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ এখানে রয়েছে, সরু লম্বা হ্রদগুলির উপর নানা রঙের দাঁড় টানা নৌকো, মোটর লঞ্চ ও ষ্টীমার ভাসছে। আমরা সহর ঘুরে একটি রেষ্টুরেন্টের সামনে নামলাম, সেখানে আহারাদি সেরে হোটেলে ফিরে গেলাম। রাত ১১টার সময় গরম কাপড়ের বোঝা পরে কনকনে শীতে রাস্তায় হাঁটতে নেমেছি। বিজ্ঞাপনের আলোয় রাস্তা আলোকিত—দোকানে জানলার কাঁচে সাজানো বহু রকমারি জিনিষ দেখতে দেখতে হাঁটছি। ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন ৩রা মে। আমরা সকালে উঠেই কাগজ খুলে দেখি আমাদের তিনজনের ছবি বেরিয়েছে, ছবির নীচে সুইডিশ ভাষায় কত কি লেখা

গ্রীষ্ম উৎসব

রয়েছে, একবর্ণও পড়তে পারলাম না। হঠাৎ চোখে পড়লো ওঁর কপালে টিপ, ছবি দেখে আমরা তো হেঁসে বাঁচি না।

মজার ব্যাপার, তাড়াতাড়ি ছবিটা কেটে নিলাম, কোলকাতায় আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠাতে হবে। একজন মহিলা অফিসারের কাছে কাগজ নিয়ে গেলাম, তিনি পড়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিলেন।

বাইরে রোদ নেই, বরফের গুঁড়োর মত বৃষ্টি পড়া সুরু হল, বুঝলাম আরো ঠাণ্ডা পড়বে। যত কিছু গরম পরিনা কেন, শীতের কষ্ট হাঁটা দায়। খাওয়া সেরে রাস্তায় বেরিয়েছি, কাঁপুনি ধরল, দৌড়ে দৌড়ে চলেছি, পার্কে পাইন গাছের ভিতর দিয়ে ছুটে এসে এদের অফিসের গরম করা ঘরে ঢুকে পড়লাম। উনি কাজ সেরে সেখান থেকে হাসপাতালে চলে গেলেন, আমরা বাইরে এসে দেখি রোদ উঠেছে। পার্কে এসে রোদ পোওয়াতে বসলাম, রোদ আর গায়ে লাগে না—অসহ্য শীত, দৌড় দিলাম হোটেলের দিকে।

এ দেশের লোকদের রং খুব ফর্সা; মেয়েরা বেশ সুশ্রী, চেহারায় কোমলতা আছে, নীল চোখের উপরে টানা কালো ভুরু ও মাথার কালো চুলে বেশ সুন্দর দেখতে—মোটের উপর তারা বেশ সুন্দরী।

এখানকার জীবজন্তুগুলো লোমে ঢাকা। প্রকৃতির সাথে লড়তে হয়

বলে তারাও নিজেদের প্রয়োজন মত দেহাবরণ তৈরী করে নিয়েছে—নচেৎ বাঁচা অসম্ভব হত।

আজ বিকেলে প্রফেসার হে ম্যানের বাড়ীতে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে আরো ১০।১২ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এসেছিলেন, আলাপ পরিচয় হল, বসবার ঘরে বসে সব গল্প করছি। প্রফেসারের স্ত্রী নেই, একটি বিবাহিতা কন্যা, জামাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ আমাদের ঘিরে নানা রকম প্রশ্ন করছেন। প্রফেসার বেরভ্যান (Prof, Bervan) বেশ রসিক মানুষ, নানা রকম মজার গল্পে আসর জমিয়েছেন। শুনলাম আমাদের আসার আগের দিন এখানে এক উৎসব হয়ে গেছে,

ষ্টকহলমের রাজপথ

স্কুল, কলেজ ও অফিস বন্ধ ছিল, লোকেরা সব রাস্তায় রাস্তায় প্রশেসন করে ব্যাণ্ড বাজিয়েছে—এটা হল ঋতু উৎসব—গ্রীষ্মের আগমনে সূর্য্যদেবের আরাধনা এমনি করে দেশবাসীরা করেছে।

এখানে সূর্য্যের এত অভাব যে গ্রীষ্মকালে রোদ উঠবে বলে লোকেরা এখন থেকেই আনন্দ করছে। শীতের অবসানে গ্রীষ্ম আগতপ্রায়। এঁরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বই কিছু পড়েন নি, এ দেশে কোন বইও বোধহয় নেই। তাঁরা বল্লেন, সুইডেনের স্কুল কলেজে ও অন্যান্য ইনষ্টিটিউশনে সব কিছু সুইডিশ ভাষায় শেখানো হয়। যাঁরা বিদেশী ভাষা শিখতে ইচ্ছুক তারা অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে সে সকল শিখতে পারেন। সুতরাং ইংরাজি এ দেশে খুব কম লোকই জানেন। অর্দ্ধেক নিমন্ত্রিত মহিলাদের সাথে কথা বলতে পারলাম না, তাঁরা ইংরাজি জানেন না, আর আমিও সুইডিশ ভাষা এক বর্ণও বুঝি না।

আমি অবাক হয়ে শুনলাম—যখন একজন আমায় জিজ্ঞেস করলেন ভারতবর্ষে রাস্তায় রাস্তায় সাপ হাতি বেড়ায় কিনা। আমি হাসি চাপতে না পেরে একটু জোরেই হেসে উঠেছি; তারপর বললাম সহরের পরিষ্কার পাকা বাঁধানো রাস্তায় আজকের এই সভ্যসমাজে কোথাও কখনও কি সাপ হাতি ঘেড়িয়ে বেড়াতে শুনেছেন? ভারতবর্ষের জঙ্গলে থাকতে পারে, সহরে তো নয়। সে কেবল ভারতে কেন, সারা পৃথিবীর জঙ্গলই তো বন্য জীবজন্তুর আবাসভূমি।

ডিনারের ঘণ্টা বাজলো, সুইডিশ প্রথা মত গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রী এগিয়ে এসে অতিথিদের হাতে হাত গলিয়ে এক একজনকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন। সবাই মিলে টেবিলে বসে একটা গান গাইলেন, তারপর গেলাস তুলে ধরে Scoll বলে খাওয়া আরম্ভ করলেন। অতি সুন্দর সাজানো টেবিল, কাটগ্লাসের বাসনে ঝকঝক করছে, বাতি দানীতে মোমের বাতি জ্বলছে। খুব সুন্দর রান্না, টাটকা খাদ্যদ্রব্য, আইসক্রীম অতি উৎকৃষ্ট। খাওয়া হলে সুইডিশ প্রথা মত গৃহকর্ত্তার সাথে হ্যাণ্ডসেক করে ধন্যবাদ জানালাম। বসবার ঘরে সবাই কফি খেলাম। প্রফেসারের মেয়ে-বৌরা আমাদের শাড়ীতে জরির কারুকার্য্য দেখে ভারতীয় শিল্পকলার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই সাঁচ্চা জরি ও সিল্ক তাঁদের খুবই পছন্দ।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাদেশিক নানা রকম গল্প গুজব হল। শুনলাম এই যুদ্ধের সময়ে এখানে ডাইভোর্সের সংখ্যা নাকি দ্বিগুণ বেড়েছে, তাতে সমাজপতিরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছেন। আমাদের বিবাহের কথা তারপর উঠলো। আমাদের দেশে মেয়েরা বিবাহের পর শশুরবাড়ী যায় এবং সেখানে সবাইকার সাথে একত্রে একজায়গায় বাস করে—এ তারা কেমন করে পারে? এত বড় কঠিন সমস্যার সমাধান না করতে পেরে শেষে সরল সোজাভাষায় আমাদের জিজ্ঞেস করে ফেললেন। বললাম "হাঁ, তারা একটু কষ্ট করে বৈকি। একত্রে বাস করতে গেলে স্বার্থ ত্যাগ কিছু করতেই হয়। জীবনে এইটুকু কষ্ট স্বীকার তারা অনায়াসেই করে—এটা কর্ত্তব্য বলেই মনে করে। বৃদ্ধ শশুরশাশুড়ীকে আমরণ সেবা যত্ন করা কি মনুষ্যত্বের দিকে থেকেও বড় কাজ নয়?

দেখলাম তাঁরা মাথা নেড়ে বল্লেন 'সত্য'। যাহোক সময় ভালোই কাটলো। আমার তো বকতে বকতে প্রাণ যায়, খুকুর অবস্থাও তাই, ঘুমে চোখ লাল হয়ে উঠেছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, টেক্সি ষ্ট্যাণ্ডে ফোন করে দিতেই টেক্সি এসে গেল, হোটেলে ফিরে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

ভারতে শিল্পসঙ্কট

যুদ্ধের মধ্যে ভারতে যে শিল্পসম্প্রসারণ দেখা যায়, তাহাতে এদেশের শিল্প-ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা করিবার অনেক কিছু ছিল। ভারতে কাঁচামাল, সুলভ শিল্পশ্রম বা শক্তিসম্পদের অভাব নাই, এতদিন অভাব ছিল শুধু কলকারখানা গড়িবার উপযুক্ত যন্ত্রপাতির এবং শিল্পোৎসাহের। যুদ্ধের সময় এদেশের শিল্পসংস্থান সম্পর্কে বুধ্যমান বিপন্ন ভারতসরকারের দৃষ্টিভঙ্গির আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে মহাসুযোগ আসে। আমদানী বন্ধের জন্য যন্ত্রপাতি যথেষ্ট পারিমাণে পাওয়া না গেলেও এই সময় সারা দেশে প্রচুর শিল্পোৎসাহ দেখা যায় এবং চাহিদার চাপে বৃহত্তর পণ্যবাজার সৃষ্টি হওয়ায় শিল্পাদি প্রভূত প্রসারিত হয়। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কাগজ, ইস্পাত ও বস্ত্র উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৫৯,০০০ টন, ৭,৫০,০০০ টন ও ৩৮০ কোটি গজ, ১৯৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৯৩,৫০০ টন, ১১,২৫,০০০ টন ও ৪৭০ কোটি গজে পৌঁছায়। এ ছাড়া এই যুদ্ধের সুযোগে ভারতে নানা নূতন পণ্য উৎপাদনের বহু ছোট বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার আর্দ্দেশির দালালের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তর (Planning and Development Department) এদেশে বিভিন্নপ্রকার শিল্প সম্পর্কে সুযোগ ও পরামর্শদানের জন্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া অনেকগুলি প্যানেলও গঠন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শাসনভার হাতে পাইয়া ট্যারিফ বোর্ডের সংস্কার করার পরও লোকে জাতীয় সরকারের আমলে অবিলম্বে ভারতীয় শিল্পপ্রগতি সম্পর্কে বিশেষ আশান্বিত হয়। কিন্তু দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আশা ক্রমেই ক্ষীয়মান হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে সম্প্রতি ভারতীয় শিল্পজগতে অত্যন্ত দুর্দ্দিন দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের সময় অত্যধিক কাজের চাপে বহু যন্ত্রপাতি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের সংস্কারের জন্য এবং নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানী করা দরকার, নানাকারণে সেই আমদানী সম্ভব হইতেছে না। ইহার ফলে অনেক কারখানায় কাজ কম হইতেছে এবং অনেকগুলি বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এদিকে যুদ্ধ শেষ হইবার আড়াই বৎসর পরে এখনো জিনিষপত্রের দাম কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ অবস্থায় বাঁচিবার উপযুক্ত নিম্নতম মজুরী ও ছাঁটাই বন্ধের জন্য শ্রমিক-শ্রেণী যে সঙ্ঘবদ্ধ দাবী জানাইতেছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ত্রস্ত শিল্পপতিরা সেই দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল না হওয়ায় দেশে শ্রমিকবিক্ষোভ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মঘট ইত্যাদি আজকাল খুবই সাধারণ ঘটনা এবং অসংখ্য কাজের দিন নষ্ট হওয়ায় ভারতের শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন সম্প্রতি নিদারুণ হ্রাস পাইয়াছে। মুদ্রা-স্ফীতির যুগে এই পণ্য-উৎপাদন হ্রাস কিরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা লইয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা যুদ্ধের কাজকারবারে লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটিয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণ দেশবাসী বর্ত্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও অন্নাভাবের সঙ্গে শিল্পসঙ্কটের চাপে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ভারতসরকার শিল্পপতি ও শ্রমিকদের একই সঙ্গে সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আবেদন নিবেদন ছাড়া সুদৃঢ় কোন নীতির অভাবে তাঁহাদের চেষ্টা বিশেষ সাফল্যলাভ করিতেছে না।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের শিল্প ও সরবরাহসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গত ১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে একটি শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের উদ্বোধন কালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে কাপড়, ইস্পাত এবং সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪৮০ কোটি গজ, ১১ লক্ষ ৮০ হাজার টন ও ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টন; ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই উৎপাদন হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৩৮০ কোটি গজ, ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ও ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টনে দাঁড়াইয়াছে। এই এক বৎসরে চিনির ও কাগজের উৎপাদনও যথাক্রমে ৯ হাজার টন ও ৮৪ হাজার হন্দর হ্রাস পাইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে টাটা কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক স্যার আর্দ্দেশির দালাল মত প্রকাশ করেন যে, দেশব্যাপী শ্রমিক বিক্ষোভ ও শ্রমশক্তির মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতার ক্রমবর্দ্ধমান অভাবই এই পণ্য-উৎপাদন হ্রাসের প্রধান কারণ। আগেই বলা হইয়াছে, উৎপাদন হ্রাসের এছাড়া আরও কারণ আছে। সুতরাং অবস্থার সত্যকার উন্নতি করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে এ ধরণের সংকীর্ণ মনোভাব অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক বর্ত্তমান দুঃসময়ে সকল দিক হইতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না হইলে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর 'উৎপাদন কর নতুবা ধ্বংস হও' (Produce or Perish) স্লোগান শুনাইয়া শ্রমিকশ্রেণীকে অধিকতর উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করিবার সমস্ত শুভপ্রয়াস শেষপর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে।

উপরিউক্ত দিল্লী সম্মেলনে ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে একটি ব্যাপক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। শিল্পসঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ মীমাংসার উপর বিশেষ জোর দেওয়া না হইলেও এদেশের শিল্প-ভবিষ্যতের দিক হইতে এই প্রস্তাবটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রস্তাবের মূলকথা হইল—(১) বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় রেল ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি আমদানী এবং দেশে ইস্পাত, সিমেন্ট, কষ্টিক

সোডা প্রভৃতি কাঁচামাল ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইবে ; (২) পণ্য-উৎপাদনের উচ্চহার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠন করিতে হইবে ; (৩) বিদেশ হইতে প্রয়োজনমত বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে হইবে ; (৪) দেশে কয়লা উৎপাদন বাড়াইতে হইবে এবং রেলপথে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা ও কাঁচামাল চলাচলের সর্ব্ববিধ সুবিধা দিতে হইবে ; এবং (৫) সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কতকগুলি কারখানায় আগামী পাঁচ বৎসরের জন্য পণ্য-উৎপাদনের হার বাঁধিয়া দিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, ভারতসরকার নিজদায়িত্বে যদি এই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে উৎসাহ দেখান, সে উৎসাহ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নিষ্ফল হইতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র সৃষ্টি যে আগে দরকার—সেকথা আজ এদেশের ছোটবড় সকলেই বুঝিয়াছে। এ সময় সরকারের দিক হইতে সুনির্দ্দিষ্ট শিল্পনীতি যদি ঘোষিত হয় এবং দেশের শিল্পপ্রগতি সম্পর্কে সরকারী প্রচেষ্টা যদি বাস্তবরূপ পায়, সকলেই সানন্দে সহযোগিতা করিয়া সরকারের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু হইতে ছোটবড় সমস্ত দেশনেতা আজ শ্রমিকদের ও সাধারণ দেশবাসীকে কিছুদিনের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে আহ্বান জানাইতেছেন। আশার কথা দেশবাসী এখন ক্রমেই দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্পর্কে সজাগ হইয়া উঠিতেছে এবং দলগত স্বার্থের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থরক্ষার প্রেরণায় তাহারা নেতৃবর্গের আবেদনে এখন কিছু কিছু সাড়াও দিতেছে। অবশ্য এই সময় শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি সম্পর্কে সরকারের সক্রিয় সহানুভূতি বৃদ্ধি পাওয়া বিশেষ দরকার।

উত্তর শিল্পাঞ্চলের সহিত কলিকাতার যোগাযোগ

যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত কলিকাতা উত্তরদিকে টালা-শ্যামবাজারেই সীমাবদ্ধ ছিল, ইহার যা কিছু অগ্রগতি হইতেছিল সবই দক্ষিণদিকে। এইভাবে সাপুর, রিজেন্ট পার্ক, ঢাকুরিয়া, এমন কি যাদবপুর পর্য্যন্ত বৃহত্তর কলিকাতারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলে যানবাহন যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বতঃই প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

যুদ্ধের শেষদিকে কলিকাতার জনসংখ্যা যখন অত্যধিক বাড়িয়া যাইতে থাকে, তখন গৃহসমস্যাপ্রপীড়িত হইয়া অনেকে কলিকাতার কাছাকাছি উত্তর সহরতলীতে বাস করা লাভজনক বিবেচনা করিলেন। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে টালা, পাইকপাড়া, বরানগর, সিঁথি প্রভৃতিতে বহু নূতন লোকের বাস আরম্ভ হইল। এছাড়া বলিতে গেলে কলিকাতা হইতে কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত শিল্পাঞ্চল এবং যুদ্ধের মধ্যে শিল্পাদি প্রসারিত হওয়ায় এই সব কলকারখানার লোকজন অনেক বাড়িয়া যায়। কাজেই সমগ্রভাবে ব্যারাকপুর মহকুমাই জনবহুল হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য বা মাঝে খাল থাকার দরুণ স্বাভাবিক অসুবিধার জন্য,—যে কারণেই হউক উত্তর অঞ্চলে যানবাহন অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও যুদ্ধের আগের তুলনায় মোটেই উন্নত হয় নাই।

বাঙ্গলা বিভাগের পর পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে অসংখ্য আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে এবং ইহাদের অধিকাংশেরই আর্থিক সংস্থান কম বলিয়া পল্লীঅঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থানে বাস করিবার ভরসা ইহাদের নাই। ইহারা পারতপক্ষে কলিকাতা বা সহরতলীতে (যেখানে কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ বা আশা আছে) মাথা গুঁজিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। কলিকাতায় স্থান নাই, দক্ষিণ কলিকাতা বহু দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে, দূরত্ব, গৃহাদির অপ্রাচুর্য্য, জমির দুর্ম্মূল্যতা এবং উন্নত-ধরণের জীবিকার মান এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পরিপন্থী, কাজেই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সমাগত জনতার অধিকাংশই টালা হইতে কাঁচড়াপাড়া —উত্তর কলিকাতার এই শিল্পাঞ্চলে বসবাস করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ইহাদের চাহিদার চাপে এই সব এলাকার জমির দর আগের হিসাবে তিন-চারগুণ বা আরও বেশী বাড়িয়া গিয়াছে (অবশ্য এই বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইহা দক্ষিণ অঞ্চলের ঢাকুরিয়া—যাদবপুরের জমির দরের কাছাকাছিও পৌঁছায় নাই)। তবে অতিরিক্ত চাহিদার জন্য বাড়তি দরে জমি কিনিবার খরিদ্দারেরও অভাব হইতেছে না।

উত্তর অঞ্চলে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, অথচ এদিককার যানবাহন ব্যবস্থার মোটেই উন্নতি হইতেছে না। লোকাল ট্রেণের সংখ্যা বাড়িবার পরিবর্ত্তে ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাবে ইদানীং কিছু কমিয়াছে এবং শ্যামবাজার হইতে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত ও ব্যারাকপুর হইতে হাজিনগর পর্য্যন্ত যে বাস চলিতেছে তাহাতে অসম্ভব রকম ভীড় লাগিয়াই আছে। লোক বাড়িবার জন্য এখন আপ বা ডাউন যে কোন লোকাল ট্রেনে এবং বাসে লোককে জীবন বিপন্ন করিয়া হ্যাণ্ডেল ধরিয়া ঝুলিয়া যাইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে অবস্থা ক্রমেই এমন হইয়া উঠিতেছে যে, গাড়ীর যাত্রাস্থল হইতে গাড়ীতে উঠিতে না পারিলে গাড়ী চড়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকিতেছে না এবং মধ্যপথে যাহাদের বাস ধরিতে হয়, তাহাদের দুর্দ্দশা ক্রমেই অবর্ণনীয় হইয়া উঠিতেছে। এইভাবে শ্যামনগর, ইছাপুর, খড়দহ, সুখচর, পানিহাটি, আগড়পাড়া বা বেলঘরিয়ার লোকেদের কলিকাতার সহিত যোগাযোগ রক্ষা এখন একটা মহা কষ্টকর ব্যাপার। ইহাদের অধিকাংশই চাকুরীজীবী, কাজেই কলিকাতায় নিত্য আসা যাওয়া না করিলে ইহাদের চলে না। এক্ষেত্রে ইহাদের ক্রমবর্দ্ধমান অসহায়তা সহজেই অনুমান করা যায়। ইহার উপর এই উত্তরাঞ্চলে কল-কারখানা প্রভৃতির জন্য ইতিমধ্যে বহু জমি ও বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। এখন অবশ্য গৃহ নির্ম্মাণের উপযোগী জিনিষপত্রের অভাবে ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইতেছে না, তবে বাড়ীঘর তৈয়ারী হইলে লোকসংখ্যা এখনকার তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক বাড়িয়া যাইবে। যানবাহনের এখন এই অবস্থা, লোক বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে লোকের দুঃখদুর্দ্দশা সত্য সত্যই সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইবে।

এই জন্যই সময় থাকিতে সমস্যার সমাধানে যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, এদিক হইতে প্রথম আগ্রহ দেখাইতে হইবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে। শুনা যাইতেছে উত্তর অঞ্চলে শীঘ্রই বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলিবে। যত শীঘ্র সম্ভব এই ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যতদিন তা না হয় ততদিন অন্তত: অফিস যাইবার ও অফিস হইতে ফিরিবার সময় অধিক সংখ্যক লোকাল ট্রেনের এবং ট্রেনে অধিকসংখ্যক কামরার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সরকার অনেক দিন ধরিয়া ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব, পাঞ্জাবের দাঙ্গা, পাকিস্থানের সমস্যা ইত্যাদি অসুবিধার কথা শুনাইয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছেন, এইবার ইহার শেষ হওয়া উচিত। ট্রেণ বাড়াইবার ব্যবস্থা যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল, ইহার সঙ্গে বাস বাড়াইবারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বারাকপুর হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যে লাইনটি আছে তাহাকে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত অবিলম্বে প্রসারিত করা উচিত। এই ব্যবস্থার অনুপূরক হিসাবে শ্যামবাজার হইতে কামারহাটি ও খড়দহ পর্য্যন্ত দুইটি নূতন শাখা লাইন খোলা দরকার। এইভাবে বারাকপুর হইতে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত একটি লাইন চলিবে এবং ইহার সহিত শ্যামবাজার-সিঁথি, শ্যামবাজার-কামারহাটি ও শ্যামবাজার-খড়দহ এই তিনটি শাখা লাইন চালু থাকিবে। ভাটপাড়া বা শ্যামনগর হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত একটি শাখা বাস লাইনও এই সঙ্গে খুলিতে হইবে। উত্তর অঞ্চলে লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে এই সব নূতন লাইনে বাস চালাইয়া বাস মালিকদের লোকসান যাইবার কোনই আশঙ্কা নাই।

যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ভিড় কমাইবার জন্য আর একটি দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। উত্তর অঞ্চলের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু কলিকাতার লোক কাজ করে এবং উত্তর অঞ্চল হইতে কলিকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে অসংখ্য লোক। এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার। অতঃপর সরকারের বা শিল্পপতিদের শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিতে কোন চাকুরী খালি হইলে নীতি হিসাবে স্থানীয় লোক গ্রহণ করার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বর্ত্তমানে স্থানীয় যোগ্য লোক পাওয়া যাইবে না একথা কেহই বলিবেন না। প্রতিদিন সকালে কলিকাতা হইতে যে কয়খানি লোকাল ট্রেণ ছাড়ে, সবগুলিই উপরিউক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়াতে বোঝাই থাকে। ইহারই বিপরীত দিকে কাঁচড়াপাড়া হইতে উল্টাডাঙ্গা পর্য্যন্ত অসংখ্য কলিকাতার চাকুরিয়াতে বোঝাই হইয়া উঠে ডাউন লোকাল ট্রেনগুলি। সুবিধামত কর্ম্মস্থলের পরিবর্ত্তন হইলে অন্ততঃ দুখানি আপ ও দুখানি ডাউন ট্রেনের লোক যে কমিয়া যায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞদের স্থানীয় লোক হইতে হইবে এমন কথা বলা হইতেছে না, তবে অধিকাংশই কেরাণী-শ্রেণীর চাকুরীজীবী এবং ইহারা খাস কলিকাতার লোক হউক বা সহরতলীর লোক হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। শ্রমিকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় স্থানীয় লোক, না হয় কারখানার কাছাকাছিই তাহাদের বাসা। প্রশ্ন ইহাদিগকে লইয়া নয়, প্রশ্ন ভদ্র মধ্যবিত্ত কেরাণীবাবুদের লইয়া। চাকুরী বিনিময় যদি সম্ভব নাও হয়, অতঃপর নূতন চাকরী প্রদানের সময় শিল্পাগারগুলির কর্তৃপক্ষ যাহাতে এদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখেন, তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকারকে আমরা আগ্রহশীল হইতে অনুরোধ জানাইতেছি। কাঁচড়াপাড়া রেল কারখানা ও ইছাপুর রাইফেল কারখানা, এই দুটি সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, এখানে কলিকাতার লোকের স্থলে সমান যোগ্যতা থাকিলে স্থানীয় লোকেদের অধিকতর সুযোগ দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে কঠিন নয়। এই সঙ্গে তাঁহারা শ্যামনগর পাওয়ার হাউস, টিটাগড় পেপার মিল, বেঙ্গল কেমিকেল, এবং চটকল, কাপড়ের কল ও অন্যান্য কলকারখানাগুলির মালিকদের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ জানাইতে পারেন। সাধারণতঃ উত্তর অঞ্চলের কলকারখানাগুলি যে সব শিল্পপতির সম্পত্তি, তাঁহাদের কলিকাতায়ও নানা কাজকারবার চলিতেছে, কাজেই কলিকাতা হইতে যাহারা এই সব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতে যায় তাহাদিগের জায়গায় যথাসম্ভব স্থানীয় লোক আনিয়া কলিকাতার লোকদের সুবিধামত কলিকাতায় কাজকর্ম্ম করিতে দিলে উত্তর অঞ্চলের যানবাহন ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্দ্ধমান চাপ ধীরে ধীরে অনেকটা কমিয়া যাইতে পারে। এই ধরণের কোন ব্যবস্থা সম্ভব হইলে কর্ম্মোৎসাহ সংরক্ষিত হইবে, তাহার পরিমাণও কম নয়। ২৮।১।৪৮

ছন্দোময়ী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

চরণের কিঙ্কিনী রিণি ঝিনি বাজে
যৌবন চঞ্চল অন্তর মাঝে।
কুসুমের মালা দোলে নৃত্যের ছন্দে,
সৌরভ হিন্দোল অলক নিবন্ধে;
আবেশে বিহ্বল আঁখি দুটি ঢল ঢল,
উচ্ছল তনুখানি মোহনীয়া সাজে!

অঞ্চল হ'তে ঝরে তারকার স্বর্ণা;
পুঞ্জিত আঁধিয়ারে বিদ্যুৎবর্ণা।
মূর্চ্ছিতা ধরণী যে আজি ফুলগন্ধা,
বসন্ত নিশীথিনী প্রেম-মধু-ছন্দা;
শিহরণ জাগে আজি মন্থর সমীরণে,
বনান্তে লাগে দোলা কম্পিত লাজে!

সোমনাথ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী, কয়েক সহস্র পদাতিক, বিশ সহস্র বারিবাহী উষ্ট্র ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, কোন দেশ জয়ে নহে, কোন জনপদ অধিকার করিতে নহে, কোন রাজ্য বিজয়ের উদ্দেশ্যেও নহে. হিন্দুর দেব-মন্দির চূর্ণ করিতে আসিয়াছিল গজনীর মামুদ। এই বর্ব্বর অভিযান ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের গলায় দড়ি যে, এই ধর্ম্মযুদ্ধের অভিযাত্রীদিগকে যোদ্ধা নামে অভিহিত করিতে তাহার বাধে নাই। ইহা যদি ধর্ম্ম, তবে অধর্ম্ম কাহাকে বলিব? এ হেন ধর্ম্মযুদ্ধও নাকি 'প্রফেটের' স্বপ্নাদেশে পরিচালিত হইয়াছিল। স্বপ্নে দৈব ঔষধির নির্দ্দেশ পাইতে শুনিয়াছি; স্বপ্নে বিগ্রহ প্রাপ্তির সংবাদও জানা আছে; ভাগ্যবানগণ স্বপ্নাদেশে ভূগর্ভ হইতে ধনরত্ন পায় বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে; কিন্তু স্বপ্নাদেশে ভিন্নধর্ম্মীর পূজার স্থান অপবিত্র ও চূর্ণীকৃত করিবার কলঙ্কিত কাহিনী হিন্দুস্থানের হিন্দুর মর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু সন্ততির শোণিতাক্ষরে কেবলমাত্র সোমনাথেই লিখিত হইয়াছিল। অনেকদিনের কথা সে; হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অধঃপতিত হিন্দুজাতি তাহার বহু অতীত গৌরব ও মহান ঐতিহ্যের মত, সুমহান সোমনাথকেও ভুলিয়াছিল। অকস্মাৎ একদিন, ভারতবর্ষের হৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, বোধ করি বা দৈবাৎ, হিন্দুস্থানের কালিমাচ্ছন্ন আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ বিকাশে প্রতিফলিত হইলেন, সোমনাথ! আকাশে আলোকের তরঙ্গ; আর বলিব কি, অভাগা হিন্দুর অন্তরেও পুলক প্রবাহ বহিয়া গেল। আরও বলিব কি, হারানো সুরে অজানা গানের ঝঙ্কারে ভারতবর্ষ মুহুর্মুহুঃ ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে সোমনাথ ভঙ্গের ইতিবৃত্ত লিখিত ছিল, বাল্যকালে তাহা পাঠ করিয়া দুঃখ বোধ করেন নাই, ঘৃণায় শরীর কম্পিত হয় নাই, এমন হিন্দু ছিলেন অথবা আছেন বলিয়া মনে হয় না। তবু কতটুকু আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম? পৈশাচিকতায় পশুও পরাজিত হয়, সে কাহিনী কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম? আজ নাকি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল সোমনাথ সংস্কারের বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাই আজ বিস্মৃতির অতল তল হইতে বর্ব্বরতার ভগ্নাংশমাত্র হিন্দুস্থানের হিন্দুকে জানাইবার সাধ হইতেছে।

বিরাটত্বে, বিশালত্বে, প্রভাবে, দেবত্বে ও মহত্বে সোমনাথের তুলনা ছিল না বলিলেও চলে। পুণ্যার্থী, তীর্থযাত্রী হিন্দুর তীর্থ পরিক্রমা পূর্ণ করিতে হইলে প্রভাস-মহাতীর্থে সোমনাথ দর্শন ছিল অপরিহার্য্য। মহাভারতবর্ণিত প্রভাস, মহামানব শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি দ্বারকান্তর্গত প্রভাস, আবার শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানক্ষেত্র প্রভাস—এমনই স্বয়ং সম্পূর্ণ মহাতীর্থ, তদুপরি সোমনাথ। হিন্দুর কল্পলোক, তাহার ইহলোক পরলোক তিনলোক বিজড়িত সোমনাথে নশ্বরদেহবিনির্গত অবিনশ্বর আত্মার সদগতি। দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমির বালুকাসমুদ্রের মাঝে কোথা হইতে, কোন্ মহামন্ত্রবলে ত্রিবেণীর ধারা বহিল, কেহ জানে না; কিন্তু পুণ্যাতুর স্বর্গকামী হিন্দু ত্রিধারা সঙ্গমে স্নান করিয়া পূজা দিতে আসিয়া দেখিল, দুর্দ্দম মহাসমুদ্র শান্তশুদ্ধান্তচিত্তে দেবাদিদেবের দ্বারে পূজার্ঘ্য হস্তে সমুপস্থিত। সোমনাথ দেবার্চ্চনা কালে সাগরে জোয়ার আসে, পূজান্তে জোয়ারের অবসান, ভাঁটায় জল মন্দির-চত্বর হইতে দূরে চলিয়া যায়।

সোমনাথ মন্দির কবে ও কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না; তবে কোন এক জন নৃপতির অর্থানুকূল্যে ও একই কালে যে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহার অনেক প্রমাণ ইতিহাসে ও কিম্বদন্তীতে জানিতে পারা যায়। মূল মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া শত শত মন্দির গড়িয়া উঠিয়াছিল। হীরকহারগাছটিকে সমধিক উজ্জ্বল করিবার জন্য যেমন ছোট বড় ও বর্ণ বহুল রত্নরাজি সন্নিবেশিত করা হয়, সোমনাথকে সুসমৃদ্ধ করিবার জন্য তেমনই বহু বিচিত্র মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দু শুধু ভক্তিই নিবেদন করিত না, দেবতার দ্বারে তাহার ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া রিক্ত করিয়া ঢালিয়া দিত। সোমনাথের সেবার্থ দশ হাজার ধনজনসমৃদ্ধ গ্রাম উৎসৃষ্ট হইয়াছিল; দুই হাজার ব্রাহ্মণ সোমনাথের পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত ছিল, তিন শত পরিচারক, তিন শত বাদ্যকর ও পাঁচ শত সেবাদাসী নর্ত্তকী মন্দিরে আরতি নৃত্য করিত। সৌরাষ্ট্র হইতে কনৌজের দূরত্ব নিতান্ত অল্প নহে, কনৌজ হইতে বাহকদল নিত্য গঙ্গাজল বহন করিত, সোমনাথের স্নান হইত। মন্দির দ্বারে একটি ঘণ্টা ছিল—প্রায় সকল দেবমন্দিরেই থাকে, ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে ভক্তের হৃদয়তন্ত্রীর ধ্বনি কি মহৎ পরিকল্পনা ভাই! সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত কর সংযুক্ত, উদ্ধত শির অবনত। সোমনাথ মন্দিরলগ্ন ঘণ্টাসংলগ্ন শৃঙ্খলটি সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং তাহারও ওজন ছিল দুই শত মণ।

এ হেন রাজরাজেশ্বর লুণ্ঠনে স্বপ্নাদেশ না হওয়াই আশ্চর্য্য। আধুনিক কালে যতগুলি ধর্ম্মযুদ্ধ আমাদের পাঠিকা ঠাকুরাণী এবং পাঠক মহাশয়গণ দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাদের উপক্রমিকা যেরূপ নরহত্যা, নারী-হত্যা, শিশু হত্যা, নারী নিগ্রহ ও যৌন মহোৎসব দ্বারাই লিখিত হইয়াছে সোমনাথেও যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ইহা বোধ করি না বলিলেও চলিতে পারে।

সোমনাথ সংহারকালে হিন্দুস্থানের হিন্দু নোয়াখালির হিন্দুর দশা প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা যতক্ষণ সম্ভব বাধা দিয়াছিল। হিন্দুর দেব দেবীগণের সহিত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমের কাহিনী ওতঃপ্রোত জড়িত। ভক্তের তাহাতে অবিচলিত আস্থা, বীর্য্যে তাহার অনন্ত নির্ভর।

তাই, প্রথমে রুদ্রভৈরব সোমনাথের উপর আত্মরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহিয়াছিল, তারপর শত কোটী মুদ্রা উপঢৌকন দিয়াছিল এবং এক দল প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বলি দিয়াছিল, আর একদল সত্যাগ্রহ করিয়া দস্যুর কুঠারে দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। যে পয়ঃপ্রণালী দিয়া দুগ্ধগঙ্গা নির্গত হইয়া মন্দির প্রান্তপ্রবাহিনী ত্রিবেণীর বারিধারা পবিত্র করিত, সেই পয়ঃপ্রণালী পথে হিন্দুর শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

দুর্ব্বৃত্তগণ সারাদিন সারারাত্রি কুঠার চালনা করিয়া মন্দিরের যে অংশ ভঙ্গ করে, সেখানেই আল্লা-হো-আকবর্ অবিরল আনন্দোল্লাস অহর্নিশি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। রাজার রাজকোষে যাহা নাই, সম্রাটের সাম্রাজ্য ভাণ্ডারও যাহার কল্পনা করিতে পারে না, হিন্দুর মন্দিরে তাহাই একত্রিত দেখিলে উল্লাস-উচ্ছ্বাস না হইবে কেন? অতঃপর তাহাদের এই সন্দেহও জাগিল, মন্দিরেই যদ্যপি এত ধন-রত্ন, বিগ্রহে না জানি কি আছে! দুর্ব্বৃত্ত ঠিকই অনুমান করিয়াছিল; দশ সহস্র উষ্ট্র বোঝাই দিয়াও রত্ন ভাণ্ডার সে শেষ করিতে পারে নাই। কথিত আছে, সেই দিনের সত্যাগ্রহীর শব দশহস্ত পরিমিত উচ্চ বিগ্রহের উচ্চতাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। দশ ক্রোশ দূর হইতেও সেদিন ও সেরাত্রি কুঠার ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। আজও, সহস্রাধিক বর্ষ পরেও, স্বকীয় বক্ষে জড় প্রস্তরের সে নর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইতেছেন, এমন হিন্দু কি হিন্দুস্থানে নাই?

ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি ত্রিশ সহস্র দস্যু দানবের প্রাণপণ যত্ন সত্ত্বেও সোমনাথের মণিময় তোরণদ্বার ভঙ্গ করিতে না পারিয়া মামুদ সে দুটিকে স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল; বলিয়া গিয়াছিল, মসজেদের পা-পোষ করিবে। মিথ্যা কথা! মামুদ দানব হইলেও বানর ছিল না; মণি-মুক্তার ব্যবহার তাহার ভালই জানা ছিল। তাই আফগান যুদ্ধের পরে বৃটিশ গভর্ণর জেনেরাল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া দুইখানি জাল দরজা ভিন্ন আর কিছুই পান্ নাই। বৃটিশের অশেষ অনুকম্পা, সেই নকলদ্বারও ভারতবর্ষে আনিয়াছিল। সে দু'টা আজও নাকি আগ্রার দুর্গে রক্ষিত আছে।

চিরাচরিত রীতি ও রুচি অনুসারে সোমনাথকে মসজেদে রূপান্তরিত করিয়া, সৌরাষ্ট্রান্তর্গত সোমনাথ রাজ্য পরিচালিত করিবার জন্য একজন গভর্ণর নিয়োগ করিয়া মামুদ মনানন্দে গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হিন্দুরাজগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মসজেদকে মন্দিরে রূপায়িত করেন; মামুদের গভর্ণর নিহত হয়। ১০৭২ খৃষ্টাব্দে রাজা ভীমদেব আনুষ্ঠানিক ভাবে সোমনাথ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু, করিলে কি হইবে? দস্যু বলিতে মামুদ ত একলাই ছিল না। মামুদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনে প্রলুব্ধ হইয়া ১২৯৭ সালে খিলিজী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলফ খান আর একবার মন্দিরটিকে ধূলিকণায় পরিবর্ত্তিত করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণতার পরিচয় দিল। এবারেও তাহারা মৃত্তিকা খনন করিয়া এত ধন-রত্ন প্রাপ্ত হয় যে, যে ধনবলে খিলিজী বংশ ভারতবর্ষে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়ে। ইতিহাস পড়িতেছি, হিন্দু তখনও জীবিত ও জাগ্রত জাতি; তাই, আবার হিন্দু-অভ্যুত্থান হয় এবং ৪০ বৎসর মধ্যে পুনরায় সোমনাথ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ হইয়া উঠে। তখনকার হিন্দু সমাজ যে এখনকার মত জীবন্মৃত ও হয় নাই, বারম্বার তাহার পরিচয় শিলাপাত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহাতেই বা কি! রক্ত বীজের বংশের শেষ কোথায়? সে যে দুর্জ্জনের সাগর তরঙ্গ! উচ্ছ্বাসে সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া ধাইয়া আসে, বেলাভূমি ভাসাইয়া দেয় আবার নৃত্যরঙ্গে স্বস্থানে ফিরিয়া যায়, হিন্দু তখনই আবার সংগঠনে প্রবৃত্ত হয়।

সোমনাথের বিচিত্র ইতিহাসে ইহাও লিখিত আছে যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মুজাফর খান নামক এক দস্যু পুনরায় মন্দির লুণ্ঠন করিয়া মসজেদে রূপান্তরিত করে। ইহার পরেও দুইবার সোমনাথ আক্রান্ত হয় এবং শেষবারে ইন্দোরের রাণী অহল্যা বাঈ সমুদ্রোপকূল হইতে ঈষৎ দূরে সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু রক্তবীজের বংশ ত নির্ব্বংশ হয় নাই; আহমদ শা ও দ্বিতীয় মুজাফর খান পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ঔরংজীব তাহার সাম্রাজ্যকালে উত্তর ও মধ্য ভারত কলুষিত করিয়া সোমনাথের পানে কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, গল্পচ্ছলে এইটুকুই শুধু শুনা যায়। একদিকে মারাঠা শিবাজী ও অন্যদিকে রাজসিংহের উদ্ভব হইয়া ঔরংজীবের জীবন বিষময় না করিলে সোমনাথ অঙ্গে তাহার হাতের কারুকার্য্যও হিন্দু দেখিতে পাইত। জীবনের সন্ধ্যাকালে দাক্ষিণাত্যে বসবাস করিয়াও সে যে পরম পুণ্যকার্য্যে বিরত হইয়াছিল, বোধ করি গলিত নখ দন্তে বল ও শক্তি সঞ্চয় করিবার পূর্ব্বেই ইহকাল হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হয় বলিয়াই তাহার বক্ষরুদ্ধ হায় হায় ধ্বনি ধরিত্রীর নিভৃত বক্ষে স্তব্ধ হইয়াছিল।

ইহার পরের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। অজ্ঞাত হওয়ারই কথা। শবের সৎকার হয়, ইতিহাসের হয় না। হিন্দুর ইতিহাসও ছিল না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল। জানিনা ভারত ভাগ্য বিধাতার কি ইচ্ছা, অক্টোবর মাসে জুনাগড়ের নবাবের পাকিস্তানী দুর্ম্মতি হইল এবং গণ বিদ্রোহে বিপর্য্যস্ত নবাব পশ্চাৎ পদদ্বয়ে লাঙ্গুল সম্বদ্ধ করিয়া পলায়ন করিতেই সোমনাথ স্বপ্রকাশ হইলেন। ধ্বংসস্তূপ, শিলাসমষ্টি, তথাপি সোমনাথ। হিন্দুর গৌরবের সোমনাথ, আবার, হিন্দুর লজ্জার সোমনাথ। পরাধীনতার গ্লানি মলিন সোমনাথ, আবার, স্বাধীনতার তরুণ অরুণালোকের উচ্ছ্বাস সোমনাথ।

সর্দ্দার প্যাটেলের জয় হৌক; তিনি সোমনাথ সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সর্দ্দারজীকে যাঁহারা জানেন (ভাগ্যবশে আমি জানি) তাঁহারা জানেন, একমাত্র তাঁহাকেই কর্ম্মবীর ও পুরুষসিংহ আখ্যায় আখ্যাত করা যায়; যে কাজে তিনি হাত দিয়াছেন, সে কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে না। মাসখানেক পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়া একদিনে নিঃশব্দে অর্দ্ধ কোটী টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছেন তাহাও আমি জানি; তিনি হাত পাতিলে সোমনাথ ভাণ্ডার পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না, তাহাও মানি; তবু দুঃখ হয়, তবু সন্দেহ জাগে—যেন মনে হয়, সেই সুবিশাল, সেই সুমহান, সেই মহামহিমান্বিত সোমনাথকে তাঁহার সনাতন মহিমায় শাশ্বত গরিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হিন্দুস্থানের হিন্দুমাত্রকেই আহ্বান না দেওয়ায় সংগঠনের বিপুল আনন্দ হইতে হিন্দুকে বঞ্চিত

করা হইয়াছে। সর্দারজীর না জানিবার কথা নহে, নানা কারণে ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদ করিতে পারে নাই, এখনও পারিতেছে না। আজ হরিষে বিষাদ। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধুর আর্তনাদ আনন্দ নিরানন্দ করিয়া দিয়াছে; পূর্ব্ব পাকিস্তান ভীষণ দুঃস্বপ্নের মত হিন্দুকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ে কাশ্মীর ও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ ভারতাকাশ ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। স্বাধীনতার আনন্দ সম্ভোগ কিরূপে করিবে?

এই দিগন্ত ঘেরা নিরাশার মাঝে সোমনাথ স্বর্ণ-দীপের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অতীতের ক্লৈব্য, অতীতের জাড্য, অতীতের গ্লানি নিঃশেষে দূর হইয়া হিন্দু সেই আলোক-ছটার পানে চাহিয়া নব জীবনের, নবারুণরাগরঞ্জিত নবীন দিবসের, নূতন প্রাণের এবং নূতন গানের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক সোমনাথের নামে একদিনে, এক মুহূর্ত্তে কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা, আসাম পর্ব্বত হইতে আরব্য সাগর হিন্দুর নৈতিক বিজয় অভিযান সুরু হইত। হিন্দু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিত, পথে প্রান্তরে গান গাহিত, রঙ্গমঞ্চে রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয় করিত, বায়স্কোপে বায়স্কোপে সোমনাথের চিত্র প্রতিবিম্বিত হইত, সোমনাথের জয়ধ্বনিতে নিখিল ভারত প্রতিধ্বনিত হইত। শিবাজীর শৌর্য্য, রাণা প্রতাপের প্রতাপ, যশোহরের প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব, নেতাজী সুভাষের উন্মাদনা আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষকে এক প্রাণ এক মন করিয়া স্বাধীনতার সার্থক অভিযানে উদ্বুদ্ধ করিত। যে ত্যাগপুণ্যে পুরাকালে হিন্দু সোমনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, স্বাধীন হিন্দু স্বেচ্ছায় আবার সেই ত্যাগ বরণ করিত। জয় সোমনাথ!

আততায়ীর হস্তে মহাত্মার জীবনান্ত বার্ত্তা শ্রবণে—

ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায় এল-এম-এস

—কি বলিছ? আর গান্ধীজী নাই? কে নিল তাঁহারে কাড়ি?
গেছেন চলিয়া দিব্যলোকেতে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ি?
ক্ষণেকের তরে শ্বাস-বায়ু যেন সহসা ফুরায়ে গিয়া
স্তব্ধ হইল সবার বক্ষ, বেদনা-কাতর হিয়া!
আঁধারে ডুবেছে ভারত-সূর্য্য সন্ধ্যারবির সাথে?
তাই নিভে গিয়ে নিখিলের আলো আনিল আঁধার রাতে?
সবে জনে জনে মুখে মুখে চাহে, প্রকাশিতে নারে ব্যথা;
নাই মহাত্মা? একি সম্ভব? স্বপন-অতীত কথা!
সত্য? বলিছ মানিয়া লইতে নিদারুণ শেলাঘাত?
সদ্য-মেঘমুক্ত ভারতে অশনির সম্পাত!!
নিমেষে হইল চন্দ্র তারকা দীপ্তিবিহীন, ম্লান,
চলে না দৃষ্টি আর কে শুধাবে সুপথের সন্ধান?
ক্ষমার প্রতীক বিশ্বপ্রেমিক জীব-কল্যাণরত
হিংসা-বিজয়-মন্ত্রের গুরু হিংসার হাতে হত!!!
ছিল নির্জ্জীব শৃঙ্খলগত সর্ব্বহারা যে দেশ
কোন্ সন্তান এনে দিল তারে মুক্তির পরিবেশ?
মাথায় বহিয়া দুঃখ দৈন্য শতেক পীড়নক্লিষ্ট
বিশ্বের বোঝা কে নিল? যেমন কৃষ্ণ অথবা খ্রীষ্ট!!
রক্তপিপাসু সাম্প্রদায়িক বিরোধ করিয়া নাশ
দুই মহাদলে এক করিবারে যার নোয়াখালিবাস
চিরকাল ধ'রে সোনার আখরে ইতিহাসে র'বে লেখা;
কখনো কাহারো কাছে যার ভালে ফোটেনি ভয়ের রেখা।
শত্রু মিত্র ছোট বড় আর সাম্প্রদায়িক ভেদ
বিনাশিতে যেই জীবন কাটালো—শুধু এই বড় খেদ—
তাহারে মৃত্যু হানিল যে জন, ভাসালো যে মহাশোকে,
কালিমা মাখালো ভারতের মুখে জগজ্জনের চোখে।
হে মহামানব! প্রেমের সাধক! রাষ্ট্র ও সাধারণে
স্বাধীনতা দিয়ে ধন্য করেছ; আজ তারি দু-রক্ষণে
দেশনেতাগণ চাহে কা'র পানে? ছুটে যাবে কার কাছে?
প্রাণবিনিময়ে যা' তুমি দিয়েছ তাহাই হারায় পাছে!
বিশ্ব বন্ধু! বিশ্বয় তুমি জগতের নয়নেতে!
রহিবে অমর হইয়া মর্ত্তে বাণী ও আদর্শেতে।

মৃত্যুঞ্জয় মহামানব

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

জানি, মৃত্যু জীবনের সাথী
দিনের দীপ্তির মাঝে জেগে রয় রাতি;
জানি, ধ্বংস সৃষ্টির উল্লাস
সৃষ্টি শুধু ধ্বংসের বিলাস,
কিন্তু, বৃথা আজ শাস্ত্র কলরব।

যে মহামানব,
ভারত মন্থনসৃষ্ট হলাহল-মৃত্যু পান করি,
বিশ্বের উষর পাত্র প্রেমের অমৃতে দিল ভরি,
বিশুষ্ক পৃথ্বীর মাঝে স্নিগ্ধছায়া ক্লান্তির আশ্রয়,
উদ্বেল সিন্ধুর তটে অচঞ্চল আর্দ্র হিমালয়,
তার মৃত্যু সেও কিগো জীবন-কল্লোল?
নিরশ্রু এ পৃথিবীর অশ্রু-কলরোল?

একদিন ক্রুশবিদ্ধ-দেহমুক্ত অন্তরের বাণী
প্লাবিয়া সমগ্র বিশ্ব প্রেমমুগ্ধ করেছিল জানি,
দেহের প্রাচীর ভাঙি তেমনি কি তোমার হৃদয়,
উদ্বেলিয়া সিন্ধুতল পরিপ্লাবি দূর দিগ্বলয়,
প্রেমের বন্যার স্রোতে ধোয়াইয়া রক্তাক্ত ধরণী,
দানবীয় মানবের শুষ্ক বুকে উঠাইবে ধ্বনি,
শাশ্বত সত্যের,
অখণ্ড প্রেমের?
এক সূর্য্য নিভিয়া কি গৃহে গৃহে জ্বালাইবে আলো?
অমানুষ মানুষেরা বাসিবে কি ভালো?

যমুনার বালুতটে আজিকার এই হাহাকার,
জুডাসের লজ্জাকুষ্ঠ পৃথিবীর মুক্ত অশ্রুধার;
মৃত্যু মাঝে দিল বুঝি জীবনের জয়!
সেবাব্রতী জীবনের এই কি সঞ্চয়?
মহামানবের সৃষ্টি বুঝি স্রষ্টার বিলাস—
উল্কাবহ্নি উদ্ভাসিত আঁধার আকাশ।

নব জয়ধ্বনি *

(জাতীয় সঙ্গীত—লঘুগুরু ছন্দ)

কথা ও সুর :—শ্রীদিলীপকুমার রায় স্বরলিপি :—শ্রীমতী সাহানা দেবী

ভারত-রাত্রি প্রভাতিল, যাত্রী ! অরুণশঙ্খ ঐ বাজিল রে !
প্রতি গৃহে স্বপন হ'ল জ্বালা···
হ'ল গাঁথা গৌরব-মালা···
নব আশা-সৌরভ-ঢালা···
হৃদি পুলকে নাচিল রে !

ঐ গগনে যৌবন-সূর্য
জয় সঘনে মন্দ্রিল তূর্য···
নর নারী সাজিল রে !

(একতানে)

প্রতি প্রাণে ঝঙ্কৃত আলো···
শিব গানে অশিব মিলালো···
চল' আগে···চল' আগে···
নব জাতির জীবন জাগে
নব প্রেমে রাঙিল রে !

মিথ্যা শঙ্কা অধর্ম দলি'—বরি' সত্য শুভঙ্কর ধ্যানমণি
প্রতি অন্তর ঝলিবে নিত্য···
চিরসুন্দর-বন্দন-স্নিগ্ধ···
নব-যুগঋষি-মাভৈঃ-দীপ্ত···
মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র স্বনি'।
নব কাল অনাগত জানি—
জপি' বরদা বিজয়া বাণী
রচিবে নব জয়ধ্বনি।

(একতানে)

প্রতি প্রাণে······ইত্যাদি

II { সা -া সা সা | মা -া মা মা | পা -া পা পা | র্সা ধা ধা মা |
ভা - র ত রা - ত্রি প্র ভা - তি ল যা - ত্রী -
মি - থ্যা - শ - ঙ্কা - অ ধ - র্ম দ লি ব রি

মা ধা পা মা | রা রা রণা -া | ধা পধা পা মগা | মা -া (-া -া)} মা পা |
অ রু ণ শ - ঙ্খ ঐ - বা - জি ল রে - - - } প্র তি
স - ত্য শু ভ - ঙ্ক র ধ্যা - ন ম ণি - - - প্র তি

ধা ধা -া ধা | ধা ধা ণা ধা | র্ধা পা পা -া | -া -া পা ধা |
গৃ হে - স্ব প ন হ' ল জ্বা - লা - - - হ' ল
অ - ন্ত র ঝ লি বে - নি - ত্য - - - চি র

ণা -া ণা -া | ণা -া র্সা র্সণা | ধা -া ধা -া | -া -া র্সা র্সা |
গাঁ - থা - গৌ - র ব মা - লা - - - ন ব
সু - ন্দ র ব - ন্দ ন স্নি - গ্ধ - - - ন ব

* ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ স্বাধীনতা দিবসে শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্তৃক সদলবলে রেডিওতে গীত।

র্সা ধা ধা মা | র্সা -া ধা মা | সা -া সা -া | -া -া সা সা |
আ - শা - সৌ - র ভ ঢা - লা - - - - হৃ দি
যু গ ঋ ষি মা - ভৈঃ - দী - প্ত - - - - মৃ -

গা গা পা -া | পণা ধণা পা মগা | মা -া -া -া | -া -া জ্ঞা রা |
পু ল কে - না - চি ল রে - - - - - ঐ -
ত্যু - ঞ্জ য় ম ন্ ত্র স্ব নি - - - - - ন ব

মা মা মা -া | মা -া গা মা | মপা -া পা -া | -া -া পা পা |
গ গ নে - যৌ - ব ন সূ - র্য - - - জ য়
কা - ল অ না - গ ত জা - নি - - - জ পি

পদা দা দা -া | দা -া ণা র্সা | র্সপা -া পা -া | -া -া দা পা |
স ঘ নে - ম ন্ দ্রি ল তূ - র্য - - - ন য়
ব র দা - বি জ য়া - বা - ণী - - - র চি

মা -া গা মা | মদা -া দপা মা | গা -া -া -া | -া -া র্সা র্সা |
না - রী - সা - জি ল রে - - - - - প্র তি
বে - ন ব জ য় - ধ্ব নি - - - - - প্র তি

র্সা -া র্সা -া | র্সা -া মা মা | মপা পা পা -া | -া -া র্সা র্সা |
প্রা - ণে - ঝ - ঙ্কৃ ল আ - লো - - - শি ব
প্রা - ণে - ঝ - ঙ্কৃ ল আ - লো - - - শি ব

র্সা -া র্সা -া | র্সা মা মা মা | মপা পা পা -া | -া -া সা সা |
গা - নে - অ শি ব মি লা - লো - - - চ ল
গা - নে - অ শি ব মি লা - লো - - - চ ল

সা মা মা -া | -া -া পা পা | পা ধা ধা -া | -া -া ধা ধণা |
আ - গে - - - চ ল আ - গে - - - ন ব
আ - গে - - - চ ল আ - গে - - - ন ব

পধা -া ধা ধা | ণা -া র্সা র্রা | র্রপা -া পা -া | -া -া র্রা র্রা |
জা - তি র জী - ব ন জা - গে - - - ন ব
জা - তি র জী - ব ন জা - গে - - - ন ব

র্সা -া ধা -া | ণা ধণা পা মগা | মা -া -া -া | -া -া -া -া | II II
প্রে - মে - রা - ঙি ল রে - - - - - - -
প্রে - মে - রা - ঙি ল রে - - - - - - -

রাজধানীর বুকে মহামানবের সাধনা

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

এক গভীর বেদনাময় ও হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া, আমাদের এই নব মহা-ভারতের যিনি স্রষ্টা, আমাদের এই জাতির যিনি জনক, যিনি আমাদের পথপ্রদর্শক মহাগুরু, বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সেই মহাত্মা গান্ধীকে মাত্র অল্প কয়েকদিন হইল, আমরা হারাইয়াছি। পিতৃ-বিয়োগজনিত জাতির ত্রয়োদশ দিবসব্যাপী জাতীয় অশৌচ এখনও কাটে নাই। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের বুকে তাই শোকের এক গভীর কালো ছায়া আজ ঘনাইয়া রহিয়াছে। ভগবান তাঁহার সৃষ্টি রহস্যের অন্যতম রহস্য শোকে মানুষকে সহনশক্তি দিয়াছেন, ভারত তাহার এই শোক কবে গিয়া যে সহ্য করিতে পারিবে তাহা জানি না।

চিত্ত আজ ব্যথাতুর, কণ্ঠ শোকরুদ্ধ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। বাপু তাঁহারই সৃষ্ট এই স্বাধীন ভারতের রাজধানীর বুকে মানবতার আবেদন লইয়া যে শেষ শান্তি-অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন এবং আমাদেরই পাপের জন্য তিনি তাঁহার অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গেলেন, অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে এখানে তাহারই দুএকটা কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

আমরা শুনিয়া আসিতেছি, কবে এক অনাদি কালে, কোন সে পৌরাণিক যুগে, দেব ও অসুরের সমুদ্র মন্থনের ফলে যে হলাহল উত্থিত হইয়াছিল, দেবাদিদেব মহাদেব তাহা পান করিয়া পৃথিবীকে নাকি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতীতের সেই সমুদ্র মন্থনের হলাহলের ন্যায় আমাদের দিনে এই ভারতের একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম ঘোষণা করিবার ফলে, ভারত মথিত করিয়া দিকে দিকে যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির হলাহল উথলিয়া উঠিল, এ যুগের পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তাহা পান করিয়া ভারতকে বাঁচাইবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন এবং ভারতের সাম্প্রদায়িক হানাহানির সেই গরল তিনি আকণ্ঠ পান করিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন—মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতা—তিনি অমর। তাই সমুদ্র মন্থনের হলাহল কণ্ঠে ধারণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া নীলকণ্ঠ হইলেন। এ যুগের যিনি মহামানব, তিনি ছিলেন কিন্তু এই মরজগতেরই একজন। তাই তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিষ পান করিয়া মৃত্যুকে এড়াইতে পারিলেন না, শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন দান করিলেন।

দ্বিধা-বিভক্ত ভারতের দিকে দিকে সাম্প্রদায়িক হানাহানির যে ধ্বংসাত্মক হলাহল উথলিয়া উঠিল, নীলকণ্ঠের ন্যায় সেই হলাহল পান করিবার জন্য মানবতার সাধক অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ মহাত্মা গান্ধী দেশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকল দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের জীবনকে সমূহ বিপদের সম্মুখীন করিয়া, শত্রুর নিন্দা ও ভক্তজনের স্তুতির ঊর্ধ্বে থাকিয়া শান্তি ও মৈত্রীর বাণী লইয়া তিনি অবিরাম পদে চলিলেন। নোয়াখালি, বিহার ও কলিকাতায় উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক-পন্থীরা যে বিষ পরিবেশন করিল, তিনি তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া সেই ক্রুর উন্মত্তদিগের বিষদন্ত বিনষ্ট করিলেন এবং তাহাদের জন্য মিলন-অমৃতের সন্ধান আনিয়া দিলেন প্রেমের মন্ত্র দীক্ষা দিয়া। নোয়াখালি, বিহার ও কলিকাতায় যে প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠিয়াছিল, সেই সকল স্থানে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিযানের ফলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে শান্ত আকার ধারণ করিল। কিন্তু ঐ সকল স্থানের প্রলয় উন্মাদনা শান্ত হইলেও ভারতের পশ্চিম গগনে পাঞ্জাবের উপর দিয়া সাম্প্রদায়িকতার আবার এক অতি রুদ্র কালবৈশাখী বহিয়া গেল।

১৫ই আগষ্ট মধ্য রাত্রিতে যখন এক পরম শুভ মুহূর্তে বিভক্ত ভারত বিপুল উৎসব আয়োজনসহকারে নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বরণ করিয়া লইতেছিল, যখন রাত্রির গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হইয়া আলোকচ্ছটায় সমগ্র ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল এবং সহর ও পল্লীর ঘরে ঘরে লোকের আনন্দ উল্লাসের সহিত শুভ শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি মিলিত হইয়া ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছিল, সেই সময়ে একটিমাত্র প্রদেশ শুধু এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিতে পারিল না। তাই বলিয়া সেদিন ঐ গভীর রজনীতে সেখানে অন্ধকারও ছিল না বা লোকে নীরব হইয়াও ছিল না। সেখানে আলোও জ্বলিয়াছিল এবং লোকের কণ্ঠধ্বনিও উঠিয়াছিল। তবে সে আলো দুর্বৃত্তজনের হাতে থাকিয়া প্রলয়ঙ্করী অগ্নিরূপে এক গৃহ হইতে অপর গৃহে ছুটিয়া লোকের কত শত পুরুষের প্রিয় বাসভূমিকে পোড়াইয়া শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। আর মানুষের যে আকুল কণ্ঠধ্বনি শোনা গিয়াছিল, প্রাণভিক্ষায় সে আর্তকণ্ঠ পাষাণকে গলাইতে সক্ষম হইলেও সেদিনের সে দুর্বৃত্তদিগের মনকে আদৌ দ্রবীভূত করিতে পারে নাই।

১৫ই আগষ্ট তারিখের মধ্য রাত্রি পর্যন্ত পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসনের যে ৯৩ ধারার বাঁধন ছিল, যে মুহূর্তে তাহা টুটিয়া গেল, অমনি বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই বাধাপ্রাপ্ত, রুদ্ধ, প্রতিশোধপরায়ণ উন্মত্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনগণ উদ্বেলিত মহাসমুদ্রের প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে নির্বিচারে ঝাঁপাইয়া পড়িল। যে আক্রমণের পশ্চাতে কোন যুক্তি নাই, কোন সমর্থন নাই, কোন সদ্‌-বিবেচনা নাই—শুধু এক সম্প্রদায়ের লোকে অপর সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতীত হইয়াছে এইমাত্র ক্ষীণ অজুহাতেই এই ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সুরু হইয়া গেল। একদিকে প্রতিশোধপরায়ণ ক্ষিপ্ত জনগণ, অপরদিকে বিভক্ত পাঞ্জাবের উভয় অংশেই সদ্যজাত গবর্ণমেন্ট। এই নবজাত গবর্ণমেন্ট নিজ নিজ

ক্ষমতা বুঝিয়া লইতে না লইতেই একপ্রকার বাধাহীনভাবেই উভয় অংশেই দুইদিন ধরিয়া হত্যাকাণ্ড চলিল।

এই নারকীয় কাণ্ড দেখিয়া, অবশেষে ভারত ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য আগাইয়া আসিলেন। ১৭ই আগষ্ট প্রাতে পাকিস্থানের অন্তর্গত আম্বালা সহরে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গের এক সম্মেলন বসিল। ইহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং ও সেনাবিভাগের সহকারী সর্বাধিনায়ক, কয়েকজন সহকর্মীসহ পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণরদ্বয় ও তাঁহাদের মন্ত্রীবর্গ ও উচ্চতম অফিসারগণ সম্মেলনে উপস্থিত থাকিলেন। সম্মেলনে স্থির হইল যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের উভয় অংশেই হানাহানি, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও অন্যান্য অপরাধ দমন করিবার জন্য উভয় গবর্ণমেণ্টই অপক্ষপাত হইয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং পাঞ্জাবের উভয় গবর্ণমেণ্ট ও উভয় কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শরণাগত ও বাস্তত্যাগীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

ইহার পর হইতেই আরম্ভ হইল শরণাগত ও বাস্তত্যাগীদের এক বিরাট অভিযান। সে যে কি, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। পাঞ্জাবের উভয় অংশ হইতেই লক্ষ লক্ষ লোক সর্বস্বত্যাগ করিয়া শুধু প্রাণ লইয়া পদব্রজে, ট্রেণে, বিমানে, মোটরে প্রভৃতিতে করিয়া নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিল।

ঠিক এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় বর্ষব্যাপী হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার এক চূড়ান্ত সমাধান করিবার জন্য ধ্যানে আত্মমগ্ন ছিলেন। দুর্গত পাঞ্জাব হইতে আবার তাঁহার ডাক আসিল। তিনি পাঞ্জাবের এই নিদারুণ সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন এবং কলিকাতার কাজ সমাধা করিয়াই পাঞ্জাব যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী বিনিময় হইয়া গেল, সেই সকল বাস্তত্যাগী সর্বহারার দল নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া আবার প্রতিশোধপরায়ণ হইয়া উঠিল। ভারত হইতে যে সকল মুসলমান পাকিস্থানে চলিয়া গেল, তাহারা সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অমুসলমানদের উপর হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচার সুরু করিল। আর পশ্চিম পাঞ্জাবের বাস্তত্যাগী, দিল্লীতে আশ্রয়প্রার্থী হিন্দু ও শিখগণ মিলিত হইয়া দিল্লীর মুসলমান নিধনে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দিল্লীর অধিবাসীরাও অনেকেই এই নিধনযজ্ঞে যোগদান করিল। ফলে কয়দিনেই সহস্রাধিক মুসলমান নিহত হইল।

মহাত্মা গান্ধী ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় হিন্দু মুসলমান মিলনের এক অভূতপূর্ব যাদু দেখাইয়া পাঞ্জাবের পথে পাড়ি দিয়াছেন। পথে দিল্লীতে অবতরণ করিয়াই তিনি যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী সহরের প্রায় ৪০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিলেন এবং এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে তিনি জানাইলেন—দিল্লীবাসীরা তাহাদের উন্মত্ততা ত্যাগ করিয়া শান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনমতেই পাঞ্জাব যাইতেছি না। প্রতিশোধ কখনই প্রতিকার নহে। ইহাতে আসল ব্যাধিই আরও দুরারোগ্য হইয়া উঠিবে। যাহারা নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যাপৃত আমি তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে একান্ত অনুরোধ করিতেছি। কলিকাতা ত্যাগ করিবার কালে এই শোচনীয় কাণ্ডের কিছুই আমি জানিতাম না। এখানে আসা অবধি আমি কেবলই এখানকার করুণ কাহিনী শুনিতেছি। কয়েকজন মুসলমান বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মর্মান্তিক কাহিনীর কথা বলিয়াছেন। দিল্লীর অবস্থা শান্ত করিবার জন্য আমি "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" নীতির প্রয়োগ করিব।

এই সময়ে রাজধানী দিল্লী নগরী যেন শ্মশানভূমে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। সহরের সর্বত্রই সান্ধ্য আইন। পথে যানবাহন ও লোকের নামগন্ধ নাই। সান্ধ্য আইনের কারণে মহাত্মার প্রার্থনা সভায় অতি অল্পসংখ্যক লোকই ঐদিন যোগদান করিল। তিনি তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলিলেন—ভাঙ্গীকলোনীতে আমি যে বাড়ীতে বাস করিতাম সেই গৃহটিতে আশ্রয়প্রার্থীরা বাস করিতেছে। সেই জন্য আমি বিরলা ভবনে আসিয়া উঠিয়াছি। আশ্রয়প্রার্থী সমস্যা বলিয়া কিছু থাকা, ইহা জাতি হিসাবে আমাদের পক্ষে একটা লজ্জার কথা।

ইহার পর মহাত্মা তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী শিবিরসমূহ পরিদর্শনের কথা উত্থাপন করিলেন। তিনি আশ্রয়প্রার্থীগণকে সততার সহিত ও নির্ভীকভাবে জীবনযাপন করিতে বলিলেন এবং কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রকাশ না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন।

ইহার পর হইতেই মহাত্মা গান্ধী প্রায় প্রতিদিনই মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং শিবিরের সহস্র সহস্র দুর্গত মুসলমান নরনারী ও শিশুদের সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি আপনাদের সাহায্যের জন্যই দিল্লীতে রহিয়াছি এবং এ জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, আপনাদের দুঃখে আমি বেদনা অনুভব করিতেছি। দিল্লীতে যাহাতে মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় পুনরায় সম্পূর্ণ শান্তিতে বাস করিতে পারে, আমি তাহার জন্য চেষ্টা করিব। হয় আমি এই কাজে সফলকাম হইব, নতুবা এই কাজ করিতে করিতেই আমি মৃত্যু বরণ করিব।

মহাত্মা গান্ধী যখন শিবিরগুলি পরিদর্শন করিতে থাকেন তখন সেখানের মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীরা সাশ্রু নয়নে করজোড়ে মহাত্মাকেই তাহাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলিয়া জানাইতে লাগিল। তাহারা তাঁহার নিকটে তাহাদের দুঃখের কাহিনী ও অভাব অভিযোগের কথা বলিল। তাহারা মহাত্মাকে অন্নবস্ত্র দিবার জন্য এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল। তাহারা আরও বলিল, তাহাদিগকে পাকিস্থানে যাইবার কথা বলা হইতেছে, কিন্তু সেখানে তাহারা ভিক্ষার দ্বারায় জীবিকা অর্জন করিবার জন্য যাইতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। তাহারা হিন্দুদের সহিত পুনরায় মিলিত হইয়া বসবাস করিতে চায়, মহাত্মা যেন অনুগ্রহ করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন।

মহাত্মা গান্ধী মুসলিম আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন কালে দিল্লীর অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলিও পরিদর্শন করিলেন, এই সব শিবিরে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত হিন্দু ও শিখরা অবস্থান করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকেও সান্ত্বনা দিয়া তাহাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার কথা বলেন এবং তাহাদিগকে প্রতিশোধপরায়ণ না হইতে উপদেশ প্রদান করেন।

মহাত্মা গান্ধী একদিকে যেমন প্রায় প্রতিদিনই আশ্রয়প্রার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করিয়া দুর্গতদের সান্ত্বনা দিতে থাকিলেন, অপর দিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই তিনি তাঁহার প্রার্থনা সভায় হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি হিন্দু ও শিখদিগকে বিদ্বেষ ভুলিয়া মুসলমানদের আপন ভাবিবার কথা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, এ কথা সত্য যে পাকিস্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখরা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমানরাও অনুরূপভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রেরই অকপটে দোষ স্বীকার করাই নিষ্পত্তির উপায়। উভয় রাষ্ট্রেরই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তব্য সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা। এতদিন যাহারা ভ্রাতৃভাবে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যাহাদের রক্ত একত্র প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহারা কিরূপে যে পরস্পর শত্রুতে পরিণত হইতে পারে তাহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে যে ভাবে দলে দলে পূর্ব পাঞ্জাবে চলিয়া অসিতেছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিহ্বল হইতে হয়। জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

অধিবাসী বিনিময়ের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—লক্ষ লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ স্থানান্তরিত করা—ইহা চিন্তা করাও যায় না। এরূপ স্থানান্তরিত করা এক অন্যায় বিশেষ।

মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ও শিখদের উদ্দেশ করিয়া বলিতে থাকিলেন—পাকিস্থান হইতে অমুসলমানদের বিতাড়িত করা হইতেছে বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান বিতাড়ন করা ঠিক হইবে না। পাকিস্থান ভুল পথ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ভারতবর্ষ কেন সে ভুল কাজ করিবে। তবে পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের উপর যে অন্যায় কাজ চলিতেছে তাহা উপেক্ষা করিবার কথা আমি ভারতগবর্ণমেণ্টকে বলি নাই। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের যথাসাধ্য রক্ষা করিতে ভারতসরকার বাধ্য। কিন্তু পাকিস্থানের পথ অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে মুসলমান বিতাড়ন ঠিক নহে। তবে যে সকল মুসলমান এখানে থাকিতে চাহে না, তাহাদিগকে নিরাপদে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

আজ শুনিতেছি ভারতে মুসলমানদের রাখা হইবে না, আজ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই ধ্বনি উঠিয়াছে, কাল পার্শী, খৃষ্টান ও ইউরোপীয়দের অবস্থা কি হইবে? অনেক বন্ধু আমার ১২৫ বৎসর বাঁচিবার আশা রাখেন, কিন্তু ভারতের এই দ্বেষ ও হানাহানি দেখিয়া আমার আর একমুহূর্তও বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।

তিনি হিন্দু ও শিখদিগকে ন্যায়পথে থাকিবার উপদেশ দিয়া বলিতে থাকিলেন—হিন্দু ও শিখরা যদি ন্যায়ানুমোদিত পথে গৃহত্যাগী মুসলমানদের পুনরায় স্বগৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান জানায়, তাহা হইলে তাহারা শুধু পাকিস্থানের নয়, সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করিবে। তিনি আরও বলিলেন—ন্যায়পথে থাকিয়া সমগ্র হিন্দুও যদি ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতেও কিছু মনে করিবার নাই। প্রতিশোধ না লইয়া মানুষের কর্তব্য ভগবানের হাতে দুর্বৃত্তকে ছাড়িয়া দেওয়া, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় আমার জানা নাই।

মহাত্মা তাঁহার প্রার্থনা সভায় মুসলমান শ্রোতাদের ভয় ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

একদিকে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনা সভায় দিনের পর দিন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ এই তিন সম্প্রদায়ের মিলনের জন্য যেমন আবেদন জানাইতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি শীত আসিয়া পড়ায় পাকিস্থান হইতে আগত অমুসলমান এবং দিল্লীর দুর্গত মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কম্বল চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার এই আহ্বানে দেশের চারিদিক হইতেই দিল্লীতে কম্বল আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই কম্বল পাঠাইলেন এবং কেহ কেহ কম্বল কিনিবার জন্য মহাত্মার নিকটে টাকাও প্রেরণ করিলেন।

১৫ই অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনা সভায় কম্বলের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—আমি কম্বল এবং কম্বল কিনিবার জন্য টাকা খুবই পাইতেছি। এক ভগিনী কম্বল কিনিবার জন্য দুই হাজার টাকার একটি চেক পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুইজন মুসলমান বন্ধুও কিছু কম্বল এবং আরও কম্বল কিনিবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাঁহারা নিজেরাই যেন দুর্গতদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দেন। উত্তরে তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়া জানাইয়াছেন, আমি যেন ঐগুলি হিন্দু ও শিখ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করি। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন এক সময়ে নাকি তাঁহারা আমার মধ্যে অন্যায় দেখিতে পাইতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমি সকলেরই মিত্র, কাহারও শত্রু নই।

ইহার পর মহাত্মাজী বলিলেন—একথা ঠিক যে, হাঙ্গামায় অনেক মুসলমান বুদ্ধি বিবেচনা হারাইয়া ফেলে, তেমনি বহু হিন্দু-শিখও বুদ্ধি বিবেচনা ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কতক লোকের দোষে, তাহারা সংখ্যায় যত অধিকই হউক না কেন, সকলকে দোষী বলা যায় না। বহু হিন্দু ও শিখ বলিয়াছেন যে, সহৃদয় মুসলমান বন্ধুদের সাহায্যে তাঁহাদের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। ঠিক এমনি অনেক মুসলমানও বলিয়াছেন, হিন্দু ও শিখ বন্ধুদের সাহায্যে তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। সকল স্থানেই এরূপ সৎপ্রকৃতির হিন্দু, মুসলমান ও শিখ যথেষ্ট রহিয়াছেন।

এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টও দিল্লীর দাঙ্গা দমন করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সহকারী প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রায় প্রতিদিনই মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদ্রব দমনের জন্য উপদেশ লইতে লাগিলেন।

এই ভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তায় ও মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে দিল্লীর অবস্থা কয়েক দিনেই সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া আসিল এবং কোথাও আর কোনরূপ উপদ্রব দেখা দিল না। কিন্তু এই শান্ত অবস্থার মধ্যেই ১৯শে অক্টোবর একজন মুসলমান হেল্‌থ অফিসার কর্তব্য-কর্মে রত থাকাকালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত গিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। স্বাস্থ্য-সচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর ঐ দিন রাত্রেই মহাত্মাকে এই সংবাদ দিলেন এবং তিনি আরও জানাইলেন যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারাও বলিতেছে তাহাদিগকেও হত্যা করা হউক। পরদিন মহাত্মার সাপ্তাহিক মৌন দিবস থাকায় তিনি এক লিখিত অভিভাষণে প্রার্থনা সভায় এই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—বাহ্যতঃ দিল্লীর অবস্থার উন্নতি হইয়াছে দেখা যাইলেও প্রকৃতপক্ষে অবস্থার উন্নতি হয় নাই। যতদিন না এইরূপ শোচনীয় ঘটনা বন্ধ হইবে, ততদিন পর্যন্ত দিল্লীতে প্রকৃত শান্তি আসিয়াছে বলা যাইবে না। কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পাদন করিবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমান পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতেছি। সংখ্যালঘুরা যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাহাদের ভীতিপ্রদর্শন সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষে ভীরুতারই লক্ষণ।

এই ভাবে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের ফলে দিল্লীর অবস্থা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল। দিল্লীর দুর্গত মুসলমানরা—যাহারা হিন্দু ও শিখদের অত্যাচারের ভয়ে আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদেরও কেহ কেহ ক্রমে তাহাদের পূর্ব বাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

দিল্লীর উপরে এই শান্ত ভাব দেখা দিলেও সত্যদর্শী মহাত্মা কিন্তু দেখিতে পাইলেন, ভিতরে ভিতরে গোলমাল ঠিক রহিয়াই গিয়াছে। যে কোনও দিন উহা আবার আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। লোকের ঠিক নৈতিক পরিবর্তন ঘটে নাই।

তাই তিনি অনন্যোপায় হইয়া হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলন আনিবার জন্য ১৩ই জানুয়ারী বেলা ১১টার অল্প পরে সত্যাগ্রহীর শেষ অস্ত্র অনশন আরম্ভ করিলেন এবং এ সম্পর্কে জানাইলেন—যখন বুঝিব যে বাহিরের চাপ ব্যতীতই কর্তব্য বোধে অনুপ্রাণিত হইয়া দিল্লীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তরের মিলন হইয়াছে, তখনই আমি অনশন ত্যাগ করিব।

মহাত্মা দিল্লীর সংখ্যালঘুদের রক্ষা করিবার জন্য অনশন করিলেন, দিল্লী নগরীর সহিত সমগ্র ভারত সঙ্গে সঙ্গে বিচলিত হইয়া উঠিল। দেশের নেতৃবৃন্দও জনসাধারণ হিন্দু, শিখ ও মুসলমানের প্রকৃত মিলনের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

পণ্ডিত নেহরু দিল্লীর মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাদের পূর্ব বাসস্থানে নিরাপদে রাখিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলনের পথ সহজতর করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট, অন্যায়ভাবে কাশ্মীর আক্রমণ করায় জন্য পাকিস্থানের প্রাপ্য যে ৫৫ কোটী টাকা আটকাইয়া রাখিয়াছিল তাহাও পাকিস্থানকে দিয়া দিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে মহাত্মার ব্রত যাহাতে সাফল্য লাভ করে এবং তাঁহার জীবন বিপন্ন হইবার পূর্বেই যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতের সর্বত্রই মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, গুরুদ্বারে—প্রভৃতি ধর্মস্থানে প্রার্থনার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীবর্গ যেমন মহাত্মা গান্ধীকে শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন, দিল্লীর শান্তি কমিটিও মহাত্মার নিকটে এক লিখিত প্রতিশ্রুতিতে জানাইল যে—আমরা মুসলমানের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্ম-বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিব এবং দিল্লীতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে উহা আর কখনও ঘটিতে দিব না।

দিল্লীর ২ লক্ষ নাগরিকও একটি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়া জানাইল যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে তাঁহারা দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান থাকিবে।

এই সকল প্রতিশ্রুতি পাইয়া মহাত্মা ১৮ই জানুয়ারী বেলা ১২-৪০ মিনিটের সময় অনশন ত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী অনশন ভঙ্গ করিলেন। ভারত তথা সমগ্র বিশ্ব শান্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মহাত্মা গান্ধী যে সময়ে দিল্লীর মুসলমানদের রক্ষা করিবার জন্য এবং অমুসলমানদের হৃদয়ের পরিবর্তন আনিবার জন্য আমরণ অনশন গ্রহণ করিয়া নিজে দ্রুতপদে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে পাঞ্জাবের গুজরাটে একটি অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থীবাহী ট্রেণকে আক্রমণ করিয়া মুসলমানরা একসঙ্গে দুই সহস্র লোককে হত্যা করিল! ইহাতে স্বভাবতই ভারতের একশ্রেণীর অমুসলমান জনসাধারণ মহাত্মা গান্ধীর উপরে বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারা পাকিস্থানে হিন্দু ও শিখদের নির্যাতনের কথা উল্লেখ করিয়া এবং এ সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার কথা বলিয়া মহাত্মার এই অনশনকে পক্ষপাত-মূলক ও অহেতুক মুসলিমপ্রীতি বা তোষামোদ বলিয়া অভিহিত করিল। শুধু এই খানেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিল না। মহাত্মার অনশন ভঙ্গের ২ দিন পরে পশ্চিম পাঞ্জাবের একজন সর্বহারা দিল্লীতে মহাত্মার শান্তি অভিযানে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া, মহাত্মার প্রার্থনা সভায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি দেশী হাতবোমা ছুড়িতেও ছাড়িল না। সৌভাগ্যবশতঃ এই ব্যাপারে মহাত্মা অক্ষতই থাকিয়া গেলেন, এবং তাঁহার প্রার্থনা সভায় তাঁহার স্বভাব মত তিনি অবিচলিতই ছিলেন ও বোমা নিক্ষেপকারী দুর্বৃত্তকে পরে ক্ষমা করেন।

মহাত্মার প্রতি এই বোমা নিক্ষেপ ছিল ২০শে জানুয়ারী তারিখের ঘটনা। ইহার পর আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল। মহাত্মা প্রতিদিনই হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরের মিলন-বন্ধন সুদৃঢ়তর করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন। ফলে রাজধানী দিল্লী নগরী তথা ভারতের অন্যান্য স্থানেও সাম্প্রদায়িক মিলনের সুফল দেখা দিল। মহাত্মার দিল্লীর কাজ সমাধা হইয়া গেল, বাকি রহিল পাঞ্জাবের দুর্গত অঞ্চল পরিভ্রমণ। ২৯শে জানুয়ারী তারিখে মহাত্মা তাঁহার

প্রার্থনা সভায় বলিলেন—পাকিস্থান একটি ভিন্ন রাষ্ট্র, সুতরাং পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইলেই আমি পাকিস্থানের দুর্গত অঞ্চলে যাইব। যতদিন না এই অনুমতি পাইতেছি, ততদিনের জন্ম দিল্লীবাসীদের সম্মতি থাকিলে আমি ওয়ার্ধায় যাইতে ইচ্ছা করি।

দিল্লীর কাজ শেষ হওয়ায় মহাত্মা ওয়ার্ধায় যাইবেন প্রায় ঠিক; কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্নে এক হৃদয় বিদারক অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। অপরাহ্ন ৫-৫ মিনিটের সময় মহাত্মা বিরলা ভবন হইতে তাঁহার প্রার্থনা সভায় যাইবার কালে, এক নর-কলঙ্ক দুর্বৃত্তের হাতে গুলিবিদ্ধ হইলেন এবং এই গুলিবিদ্ধ হইবার ৩৫ মিনিট পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে মুসলমানদের রক্ষা করিবার জন্ম যে আমরণ অনশন করিয়াছিলেন, তাহাতে যে কয়জন তথাকথিত হিন্দু, হিন্দুত্বের দরদ দেখাইয়া মহাত্মার উপরে দোষারোপ করিয়াছিল, মহাত্মার হত্যাকারী লোকটিও ছিল তাহাদেরই মধ্যেকার একজন চরম পন্থী। প্রতিশোধপরায়ণ দিল্লীবাসী অমুসলমানদের মুসলমান নিধনে বাধা দেওয়ার জন্ম, তাহাদের প্রতিশোধ গিয়া পৌঁছিল শেষে মহাত্মার উপরে। মানবতার সাধক মহামানব মহাত্মা গান্ধী সহাস্তে তাহা গ্রহণ করিবার জন্ম নিজের বুক পাতিয়া দিলেন।

এই শ্রেণীর প্রতিশোধপরায়ণ জনগণের কর্ণকুহরে মহাত্মা গান্ধী বরাবরই এই কথা শুনাইয়া আসিয়াছেন যে—প্রতিশোধ গ্রহণ কখনই আসল প্রতিকার নহে। তাহাতে বরং আসল ব্যাধি আরও জটিল হইয়া পড়িবে। ক্ষমা ও প্রেমের দ্বারাই মূল রোগটিকে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী যে ক্ষমাও প্রেমের ধর্মপ্রচারে জীবন দান করিয়া গেলেন, আমাদের এই মহাভারতের আধ্যাত্ম বাণীই হইল তাহাই। ক্ষমা ও প্রেমের দ্বারায় যে অটুট জয়, ভারতের ইতিহাস এরূপ বহুতর সাক্ষ্যে ভরপুর। তাই আমরা দেখিতে পাই—একদিন শতপুত্রঘাতক মারণোদ্যত মহাশক্তিশালী রাজা বিশ্বামিত্র, দীন ব্রাহ্মণ বশিষ্টের ক্ষমাগুণে গলিয়া পড়িয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু কলসীর কানা খাইয়াও প্রেম-বিতরণে বিরত হন নাই বলিয়াই সে যুগের দুইটি অতি বড় পাষণ্ডেরও পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছিল।

বুদ্ধের অহিংসা, যীশুর ক্ষমা ও মহাপ্রভুর প্রেম একটি দেহে রূপ পরিগ্রহ করিয়া যেন মহাত্মারূপে আমাদের এই যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি নিজের দীর্ঘজীবনের বহুবিধ ঘটনার মধ্য দিয়া সত্য, অহিংসা, ক্ষমা ও প্রেমের প্রয়োগ দেখাইয়া গেলেন। আঘাতের বদলে আঘাত না হানিয়া ক্ষমাও প্রেমের দ্বারাই তাহাকে জয় করিতে হইবে, তবেই এই ধরণীর ধূলির বুকে "রামরাজ্য" বা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহাই হইল মহাত্মার অনুসৃত সত্য ও অহিংসা নীতির মর্মবাণী। হিংসা, দ্বেষ ও রণজর্জরিত পৃথিবীর বুকে মহাত্মার এই বাণী আজই শুধু শান্তির এক আশ্চর্য প্রলেপ দিতেছে না, অনাগতকালের জন্মও তাহা সঞ্চিত হইয়া থাকিবে এবং আজিকার স্থায় ভাবীযুগের মানুষও এই মহামানবের আত্মিক প্রভাব বিস্ময়ের সহিত অনুভব করিয়া ধন্ম হইবে।

কিন্তু একথা আজ ভাবিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে যে, বাপু আর আমাদের মধ্যে নাই এবং এক অতি শোচনীয় ও কলঙ্কময় দুর্ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে আর একটিবার মাত্র এইরূপ এক মহামৃত্যু ঘটিয়াছিল। সেদিন ভগবানের প্রিয়পুত্র যীশুও এমনি করিয়াই ক্ষমা ও প্রেমের জন্মই জীবনদান করিয়াছিলেন। তারপর বহু শত বৎসর পরে মহাত্মার এই মৃত্যুর মধ্য দিয়া সেই মহামরণের আর একবার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। সেদিন যাহারা যীশুকে নির্দয়ভাবে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, জগৎ আজও সেই সম্প্রদায়ের লোককে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। এযুগের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডেও ভারতের হিন্দুসমাজের ললাটে যে কলঙ্কপঙ্কের ছাপ পড়িল, তাহাও কোনদিন মুছিবে বলিয়া মনে হয় না। হিন্দুর গৌরবোজ্জ্বল শুভ্র ললাটের একপার্শ্বে এই কলঙ্কের কাল দাগ চিরকালের জন্ম থাকিয়া গেল।

বাপু, আপনি আমাদের পাপের জন্মই আপনার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের এই মহাপাপের জন্ম আজ আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিবারও অযোগ্য। কিন্তু তবুও জানি, আপনি ক্ষমা ও প্রেমের অবতার রূপেই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা-সুন্দর হাসিতে মার্জনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সাহসেই আমরা আমাদের এই মহাপাপের জন্ম আপনার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি—আমাদের ছাড়িয়া আপনি আজ যে দিব্যধামে অবস্থান করিতেছেন, সেথান হইতে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আপনার কল্যাণ আশীষ দিয়া আমাদের অন্তরের সকল গ্লানি মুছিয়া দিন। ৮।২।৪৮

গান্ধীজি ও নোয়াখালি—

মহাত্মা গান্ধী নিহত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহকর্ম্মীরা যেন নোয়াখালিতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহে অহিংসা-নীতির ভিত্তিতে গঠনমূলক কার্য্য পরিচালনা করেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত পিয়ারীলালের নেতৃত্বে গান্ধীজির একদল সহকর্ম্মী শীঘ্রই নোয়াখালি যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বহরমপুর গার্লস-কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন সভায় শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী

ফটো—শ্রীরাধাপ্রসাদ সাহা

পূর্ব্ববঙ্গে আনসার বাহিনী—

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা তথা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের চিফ সেক্রেটারী মিঃ আজিজ আহমেদ গত ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা পাকিস্থান ন্যাশনাল গার্ড ছাড়াও দেড় লক্ষ লোক লইয়া নূতন এক আনসার (স্বেচ্ছাসেবক) বাহিনী গঠন করিবেন ও তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিবেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সময় তাহাদের কাজে লাগান হইবে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ১৮ হইতে ৪২ বৎসর বয়সের সকল লোক নূতন বাহিনীতে যোগদান করিতে পারিবে।

গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতি—

৭ই ফেব্রুয়ারী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি গুরুতর হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিবার ও খাদ্যদ্রব্যের চোরাই কারবার বন্ধ করিবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে পশ্চিম বঙ্গের জন্য খাদ্য সরবরাহের কোন ব্যবস্থা ভারত গভর্ণমেণ্ট করেন নাই। কি করিয়া খাদ্য সংগৃহীত ও বণ্টিত হইবে, ডাক্তার রায় সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই।

দমদম বিমান ঘাটিতে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

ফটো—তারক দাস

হিন্দুমহাসভা ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ—

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী গড্‌সে হিন্দুমহাসভার কর্ম্মী বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর গত ৬ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন—মহাসভার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে এই অপরাধের নিন্দা করিয়াছেন। হিন্দুমহাসভা কোন দিনই এই ধরণের সন্ত্রাসবাদী পন্থায় বিশ্বাস করে নাই। এখন

হিন্দুমহাসভার সম্মুখে দুইটি পথ আছে—(১) ইহাকে রাজনীতিক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিয়া সংস্কৃতিগত কার্য্যকলাপে নিজেকে নিয়োজিত করা (২) ইহার সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জ্জন করিয়া নূতন নীতি নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্ম ইহার দ্বার উন্মুক্ত করা। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ বর্তমানে ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য—তিনি পূর্ব্বে কয়েক বৎসর হিন্দু-মহাসভার নিখিল ভারত কমিটীর সভাপতিও ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি নিজের দিক হইতে ও হিন্দুমহাসভার দিক হইতে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করায় দেশবাসী সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সহজ হইবে।

দিল্লীর রামলীলা ময়দানে এক বিরাট জন সভায় বক্তৃতারত পণ্ডিত নেহরু—
শান্তির জন্ম জনসাধারণের কাছে আবেদন

পশ্চিম বঙ্গে বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বন্ধ—

৭ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করিয়াছেন যে—এই প্রদেশে বস্ত্রের নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হইবে ও বস্ত্র ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের প্রথা বাতিল করা হইবে। পশ্চিম বঙ্গে মজুত ৪৫ হাজার গাঁট কাপড় ব্যবসায়ের সাধারণ গতিপথেই বণ্টন করা হইবে। ২০শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মিলসমূহে যে কাপড় ছিল বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি তাহার মূল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন। সে কাপড়গুলি এখন বাজারে বিক্রয়ের জন্ম ছাড়া হইবে।

নেতাজী সুভাষ দিবস—

গত ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৫২তম জন্মদিবস উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র সাড়ম্বরে সেদিন সুভাষ দিবস পালিত হইয়াছে—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সেদিন ছুটির দিন ঘোষণা করায় বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, এমন কি ঘরে ঘরে লোক নেতাজীর উৎসব পালন করিয়াছে। শুধু সভা-সমিতি করিয়া তাঁহার কথা আলোচিত হয় নাই—সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানে, কারখানায় ও বাড়ীতে তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া উপযুক্তভাবে তাঁহাকে সম্মানিত করা হইয়াছে। কলিকাতায়ও সেদিন উৎসবের জাঁক-জমকের অভাব ছিল না। নেতাজী আজও জীবিত আছেন কি না জানি না—তবে আজ দেশের লোক তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছে। তিনি দেশকে যে নূতন আদর্শের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন, আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে দেশবাসী তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথে নিজেদের পরিচালিত করিলে দেশকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিতে পারিবে। এই শুভদিন উপলক্ষে আমরাও নেতাজীকে আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি এবং প্রার্থনা করি, তিনি সত্বর আমাদের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার অসমাপ্ত কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া দেশকে কৃতার্থ করুন।

পরলোকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী—

বাঙ্গালা দেশের স্বনামখ্যাত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার বিকাল ৫টার সময় তাঁহার কলিকাতায় বালীগঞ্জ ৫২এ হিন্দুস্থান পার্কের বাসভবনে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা

ব্যথিত হইয়াছি। নদীয়া জেলার জামসেরপুরের প্রসিদ্ধ জমীদার বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ডাফ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া কবি বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন—তাহার পর কিছুদিন তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টরের কাজও করিয়াছিলেন। তিনি পরে নাটোরের মহারাজা স্বর্গত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও পরে জমীদারীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হন এবং কিছুকাল কর কোম্পানী ও এফ-এন-গুপ্ত কোম্পানীতে কাজ করেন। ৬০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, বন্ধুর দান, জাগরণী,

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে কল্পতরু উৎসবে প্রধান অতিথি পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ফটো—তারক দাস

পথের সাথী, নীহারিকা, কাব্যমালঞ্চ, মহাভারতী, পাঞ্চজন্য প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন মানসী ও অল্পকাল যমুনা পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার দেশপ্রেম ও জনসেবার আগ্রহ তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে।

বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রীসভা—

বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ১৪ই জানুয়ারী পদত্যাগ করায় ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ২৩শে জানুয়ারী হইতে ১২জন সদস্য লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে—

(১) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগ (২) শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থ বাণিজ্য ও শিল্প (৩) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা (৪) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—অসামরিক সরবরাহ বিভাগ (৫) শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা—কৃষি ও পশু চিকিৎসা (৬) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—সমবায়, দুর্গতত্রাণ ও পুনর্বসতি (৭) শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—পূর্ত্ত ও যানবাহন (৮) শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ—কৃষি ও ভূমি রাজস্ব (৯) শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—বিচার ও আইন (১০) শ্রীভূপতি মজুমদার—সেচ ও জলপথ (১১) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—শ্রম (১২) শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—বন ও মৎস্য।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সর্ব্বপ্রথম ডাক্তার ঘোষের মন্ত্রীসভার সদস্য হইয়াছিলেন—কিন্তু পরে শ্রীযুক্ত রাধানাথ

বহরমপুরে পশ্চিম বাংলার গভর্ণর ফটো—রাধাপ্রসাদ সাহা

দাসের সহিত তাঁহারা ৩জনও পদত্যাগ করেন। শ্রীমোহিনী বর্ম্মণ, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর প্রথম হইতেই মন্ত্রী ছিলেন। শ্রীভূপতি মজুমদারকে প্রথম ৪ জনের পদত্যাগের পর গ্রহণ করা হইয়াছিল—তিনি তাঁহার কার্য্যের দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, ব্যারিষ্টার ও নির্য্যাতীত দেশকর্ম্মী—কাজেই তাঁহার নিয়োগ সকলের সমর্থন লাভ করিবে। প্রধান মন্ত্রী ডক্টর রায় সম্প্রতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ও কংগ্রেস দল তখনই তাঁহাকে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের স্থানে দলের নেতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা দেশের মধ্যে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই তিনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করায় দেশবাসী সকলেই আশান্বিত হইয়াছেন। তিনি মনে করিলে ও চেষ্টা করিলে এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বাঙ্গালা দেশকে সত্যই আবার সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নহেন, এমন ৩ জনকে ডক্টর রায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়াছেন—তাঁহারা (১) শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (২) রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও (৩) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তন্মধ্যে প্রফুল্লবাবু আজীবন কংগ্রেস-সেবক, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তিনি সারাজীবন গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। তিনি জনপ্রিয় নেতা, কাজেই তাঁহার পক্ষে পরে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হওয়া আদৌ কঠিন হইবে না। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারও হয়ত চেষ্টা করিলেই ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন; তাঁহার কর্ম্মশক্তিও অসাধারণ—কিন্তু নানা কারণে তিনি জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন নাই। তৃতীয় রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় শিক্ষিত জমীদার—তিনি বিদ্বান ব্যক্তি হইলেও কখনই জনগণের সহিত মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়াও সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইতিপূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরূপে তিনি ভাল বক্তৃতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু জনসাধারণ—যাঁহারা তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত চৌধুরী মহাশয়ের ব্যবহার ভাল ছিল না। তথাপি আমরা বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা দেশের উন্নতি বিধানে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করি। প্রধান মন্ত্রীর অসাধারণ ধীশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অপর সকলের দোষ ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীকে অবশ্যই জনপ্রিয় করিয়া তুলিবে।

নেতাজী সুভাষ দিবসে কলিকাতার রাজপথে নেতাজীর প্রতিমূর্ত্তি সহ বিরাট শোভাযাত্রা ফটো—শঙ্কর সেনগুপ্ত

নেতাজী দিবসে শোভাযাত্রার সঙ্গে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ ফটো—শঙ্কর সেনগুপ্ত

ভারতে মানসিক চিকিৎসার উন্নতি—

গত জানুয়ারী মাসে পাটনায় ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের সঙ্গে ভারতীয় মানসিক চিকিৎসক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে উক্ত সমিতির সভাপতি ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে ভারতে মানসিক চিকিৎসার উন্নতির জন্য এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন মানসিক রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই দেশে এই রোগের বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রধান কারণ। তাঁহার মতে মানসিক রোগকে দুরারোগ্য মনে করিবার কোনও বিশেষ কারণ নাই। এই সকল রোগের যে ভাল চিকিৎসা আছে সেই জ্ঞানের অভাবই মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের হাতে পড়িলে মানসিক ব্যাধিও অন্য যে কোনও ব্যাধির মত আরোগ্য হইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসালয় ও চিকিৎসকের একান্ত অভাব। ভারত সরকার নিয়োজিত "ভোর কমিটির" হিসাব অনুসারে ভারতে মানসিক চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ ৮ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা স্থান থাকা প্রয়োজন, কিন্তু আছে মাত্র ১০ হাজার। মানসিক চিকিৎসকদের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। এই অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য—আরও বেশী করিয়া সরকারী মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপন ও বেসরকারী চিকিৎসালয়গুলিকে সাহায্য করা। মানসিক চিকিৎসকের

সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্ত কলিকাতা ও বোম্বাই বিশ্ববিভালয়ে মানসিক চিকিৎসার বিশেষ উপাধি পরীক্ষার পরিকল্পনা পেশ করা হইয়াছে। আশা করা যায় তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে। মানসিক রোগীর শুশ্রূষাকারীদের শিক্ষার ব্যবস্থাও হইতেছে। তিনি বলেন বর্ত্তমানে সরকারী মানসিক হাসপাতালে রোগী ভর্ত্তি করিবার যে প্রথা আছে তাহা জেলে কয়েদী ভর্ত্তি করার মত। পুলিশের বিবরণীসহ আদালতের বা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম-নামা লইয়া ভর্ত্তি হইতে হয়। এই প্রথার আমূল রোগ নিবারণী ব্যবস্থা—বালক বালিকা, শিশু, পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্তান্ত লোকদিগকে তৎসম্পর্কীয় উপদেশ দান। ৩। শিক্ষা—(ক) চিকিৎসকদের (খ) শুশ্রূষাকারী ও আনুষঙ্গিক কর্ম্মীদের এবং (গ) সাধারণের মধ্যে মানসিক রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার। ৪। পরিচালনা—কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগ স্থাপন। ৫। মানসিক চিকিৎসা সম্পর্কে নূতন আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইনের সংস্কার। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের একটি স্থায়ী অভাব দূর হইবে।

ভবনগরে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার-প্যাটেল

পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অন্তান্ত রোগী ভর্ত্তি করার ব্যবস্থার মত প্রত্যেক বড় হাসপাতালের সঙ্গে অভিজ্ঞ মানসিক চিকিৎসকের হাতে একটি বাহিরের মানসিক রোগী দেখিবার চিকিৎসা কেন্দ্র থাকিবে এবং সেই চিকিৎসক যখনই কোনও রোগীকে মানসিক হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত মনে করিবেন তখনই সে ভর্ত্তি হইতে পারিবে—কোন আইন আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমনামার প্রয়োজন হইবে না। এইজন্ত আইনের যতটুকু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন তাহার খসড়া তৈয়ার হইতেছে। তিনি এই পরিকল্পনাকে ৫ ভাগে ভাগ করিয়াছেন:— ১। চিকিৎসা ব্যবস্থা—হাসপাতাল ও অন্তান্ত চিকিৎসা কেন্দ্র। ২। মানসিক

বিদেশে বাঙ্গালী সম্মানিত—

এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার তারাচাঁদ কাবুলে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ায় তাহার স্থানে এক বৎসরের জন্ত এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের প্রাণীবিভার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর এই সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরববোধ করিবেন।

শ্রীযুক্ত কে-এম মুন্সী—

বোম্বায়ের খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত কে-এম-মুন্সীকে ভারত গভর্ণমেণ্ট হায়দ্রাবাদে ভারতের এজেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নূতন সেচ ব্যবস্থা—

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে সম্প্রতি দুইটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া কয়েকটি জেলার সেচের ব্যবস্থা হইবে। তাহাতে ৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ও ৬ লক্ষ একর ধান জমীতে জল সরবরাহ হইবে; পশ্চিম বাঙ্গলার গভর্ণর রাজাজী ও প্রধানমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ গত ২৫শে ডিসেম্বর ঐ ব্যবস্থার আয়োজন দেখিতে গিয়াছিলেন। সাঁওতাল পরগণার মেসান জোড়ে ১২৫ ফিট উচ্চ এক বাঁধ হইবে ও সিউড়ীর নিকট ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রহ্মাণী ও কোপাই নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া ও ৮০০ মাইল খাল কাটিয়া বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলায় জল সরবরাহ করা হইবে।

পরলোকে রসিকমোহন—

পরম ভাগবত, পণ্ডিতপ্রবর রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৯ই অগ্রহায়ণ ১০৯ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। এই বয়সেও তাঁহার অসাধারণ স্বাস্থ্য, অটুট সৌন্দর্য্য, অসামান্য স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্য—দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিত। এখনও তিনি একাসনে ৫।৬ ঘণ্টা বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেন—এক ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা করিতেন। এ যুগে এই ধরণের লোকের শেষ হইল। তিনি দীর্ঘকাল ২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীটস্থ গৃহে বাস করিয়াছিলেন। ঐ গৃহটি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ভারতের তথা পৃথিবীর জ্ঞানী ও সজ্জনদিগের তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। তথায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুবৃহৎ পাঠাগার বর্ত্তমান। গৃহটি তাঁহার স্মৃতিচিহ্নরূপে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া রক্ষা করার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমরা এ বিষয়ে তাঁহার প্রিয় সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর কর্ম্মীদিগকে অবহিত হইতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস, স্বাধীন বাঙ্গালার জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন।

সোমনাথ—

কাটিয়াবারের অন্তর্গত জুনাগড় পরিদর্শনে গিয়া ভারত রাষ্ট্রের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল যেদিন সোমনাথ মন্দিরের সংস্কার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের হিন্দু নরনারীর অন্তরে যে উল্লাস ও যে উদ্দীপনা জাগিয়াছিল, বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতবাসী তেমন উন্মাদনার আস্বাদ পায় নাই। সোমনাথের ইতিহাস অতীব বিচিত্র। পুরাণে, মহাভারতে আমরা সোমনাথের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইতিহাসেও সোমনাথের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই ইতিহাস পাঠ করিবার সময়ে প্রত্যেক হিন্দু ভাবিয়াছে—সে কলঙ্কিত
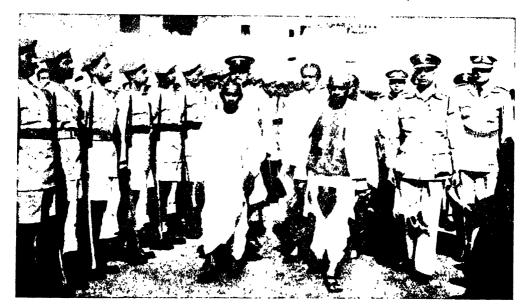
দমদম বিমান ঘাঁটিতে ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রীকে পশ্চিম বঙ্গের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর সম্মান জ্ঞাপন ফটো—তারক দাস

কাহিনী না থাকিলেই ভাল হইত। গজনীর মামুদ সোমনাথ মন্দির অপবিত্র, সোমনাথের রত্নরাজিও ধন সম্পদ্ লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। একবার নহে, বারম্বার সোমনাথ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। হিন্দুর অধঃপতন তখনই সুরু হইয়া গিয়াছে; ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তাই সোমনাথের কথা হিন্দুর অন্তর হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই তারিখে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই জুনাগড় বিভ্রাট উপস্থিত হয়। জুনাগড়ের নবাব সাহেবের পলায়ন, ভারত রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জুনাগড়ের শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে গিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হৃতশ্রী সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়া ভারতবর্ষীয় হিন্দুকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন; সোমনাথের মন্দির সংস্কারের আশ্বাস দিয়াছিলেন।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি-এস-সেনানায়ক, ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও পণ্ডিতজীর ভাগিনেয়ী

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার পর দুই মাস অতীত হইলেও আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সোমনাথকে পূর্ব্বগৌরবে ও সনাতন মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে; শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদ্যাবিদ্‌গণের সহযোগিতারও প্রয়োজন হইবে। ভারত রাষ্ট্র হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না। গান্ধীজী এ কথাও বলিয়াছেন। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দেশের লোকের সহায়তা চাহিলে অত্যল্পকাল মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দারজীর নিকট এই আবেদন করি যে তিনি ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিয়া দিন। ভারতবর্ষের হিন্দু ভারতের পরাধীনতার শেষ কলঙ্কচিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া দিবে।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মন্ত্রী সম্বর্দ্ধনায় নেতৃবৃন্দ

মহাত্মা গান্ধী শুভাগমন স্মৃতি উৎসব—

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-আন্দোলনে মেদিনীপুর একদিকে যেমন ভারতবাসীর নিকটে এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, অপরদিকে তাহাকে ঠিক তেমনি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের হাতে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। কারা-মুক্তির পর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিলে, তিনি বৃটিশ নির্যাতীত এই মেদিনীপুর পরিভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার এই মেদিনীপুর সফরের সময়ে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে তিনি কৃষ্ণনগর গ্রামে উপস্থিত হন। কৃষ্ণনগরে গ্রামপ্রান্তে প্রকাণ্ড এক দীঘির তীরে যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই স্থানের সত্বাধিকারী রাণী শরৎকুমারী দেবী কোন সৎ প্রতিষ্ঠানে লাগাইবার জন্য সেই স্থানটি জনসাধারণকে দান করেন। কৃষ্ণনগর ও উহার পার্শ্ববর্তী জয়রামনগর প্রভৃতি গ্রামসমূহের গ্রাম-সেবক কর্মীরা তথায় একটি "গান্ধী ভবন" স্থাপন করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথ অনুযায়ী গ্রাম সংগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর ৩রা জানুয়ারী তারিখে সভা ও গান্ধী-মেলা করিয়া মহাত্মা গান্ধীর শুভাগমন স্মৃতি উৎসব পালন করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান বৎসরের ৩রা জানুয়ারী তারিখেও মহাসমারোহের সহিত তথায় এই শুভাগমন স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব-সভায় পশ্চিম বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি সভাপতিত্ব করেন এবং সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় কুমারী আভা মাইতি বি এ, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীবনবিহারী পাল, সাংবাদিক শ্রীপূর্ণেন্দু ভৌমিক, হাঁসচড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুবোধ চন্দ্র মাইতি, দশগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঈশ্বর চন্দ্র প্রামাণিক, শ্রীভামাচরণ পাত্র প্রভৃতি মহাত্মা গান্ধীর জীবনী, বাণী ও নির্দেশিত কর্মপন্থা লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধী যিনি প্রাচীন ভারতের আত্মার মূর্ত প্রতীক এবং আমাদের এই জাতির জনক বলিয়া অভিহিত, তিনি যে স্থানে বাস করিতেন বা পদার্পণ করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহেই প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকটে তীর্থ বিশেষ। কৃষ্ণনগর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের কর্মীবৃন্দ কৃষ্ণনগরে যে মনোরম "গান্ধী ভবন" স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দেশবাসীর কাছে একটি তীর্থস্থান হইয়াছে। এ জন্য উক্ত কর্মীবৃন্দ সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

পরলোকে ধরিত্রী দেবী—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও এডভোকেট শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহধর্মিণী, রায় বাহাদুর চারুকৃষ্ণ মজুমদারের কন্যা ধরিত্রী দেবী পরিণত বয়সে স্বামী, পুত্র ও কন্যাদি

ধরিত্রী দেবী

রাখিয়া সম্প্রতি সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি অর্চনা-সম্পাদনার সময় হইতে কেশববাবুর সকল উদ্দীপনার মূলে ছিলেন এবং আতিথ্য ও অমায়িকতার দ্বারা সকলকে প্রীত করিতেন। তিনি স্বামীর সহিত বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতার সারদেশ্বরী আশ্রম প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী

আবির্ভাব—২রা অক্টোবর, ১৮৬৯

তিরোভাব—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮

ফটো—শ্রীতারক দাস

মহামানবের মহাপ্রয়াণ

মহামানব মহাত্মা গান্ধী গত ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৫টা ৪০ মিনিটের সময় নয়া দিল্লীতে বিড়লা ভবনে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। যে ভারতবর্ষের প্রতি নরনারীর সর্ব্ববিধ মুক্তি কামনায় তিনি গত ৩০ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার তিরোধানে সেই ভারতের অধিবাসীদের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজও নহে, তাহার সময়ও এখন পর্য্যন্ত আসে নাই।

তিনি বীরের মত কাজ করিতে করিতে আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শত্রুর দল বার বার তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তিনি কখনও তাহাতে ভীত হন নাই। তিনি জানিতেন ও প্রায়ই বলিতেন—"যতদিন এই দেহের ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্যের জন্য প্রয়োজন থাকিবে, ততদিন এই দেহ তিনি রক্ষা করিবেন।" এই বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি কখনও কোন দেহরক্ষী সঙ্গে লন নাই।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল তাঁহার সহিত কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। ৫টার সময় প্রত্যহ তিনি প্রার্থনা সভায় যোগদান করিতেন। কথা বলিতে বলিতে ৫টা বাজিয়া গেল—তিনি সর্দ্দারজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা সভার দিকে অগ্রসর হইলেন। এবার দিল্লীতে যাইয়া তিনি বিড়লা ভবনে বাস করিতেছিলেন—বিড়লা ভবনের পাশেই মাঠে প্রার্থনা সভা হইত। তিনি তাঁহার সঙ্গী শ্রীমতী আভা গান্ধী ও কুমারী মানু গান্ধীকে দুই পার্শ্বে লইয়া তাহাদের কাঁধের উপর ভর দিয়া প্রার্থনা সভার মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সভায় ৫শত লোক সমবেত হইয়াছিল। সমবেত জনতা উভয় পার্শ্বে সরিয়া গিয়া তাঁহার গমনের পথ করিয়া দিতেছিল। মঞ্চ হইতে আন্দাজ ১৫ গজ দূরে পৌছিলে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—আজ আপনার সভায় আসিতে ৫ মিনিট বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজি শুধু তাহার দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার বাহির করিয়া গান্ধীজিকে লক্ষ্য করিয়া ২ গজ দূর হইতে তাঁহাকে ৩ বার গুলী করিল—পেটে ও বুকে গুলী লাগিল—গান্ধীজি তখনই 'হরে রাম, হরে রাম' বলিতে বলিতে সেই স্থানে পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে তখনই ধরাধরি করিয়া বিরলা ভবনে লইয়া যাওয়া হয়। ঘটনার ৩৫ মিনিট পরে ৫টা ৪০ মিনিটে তাঁহার আত্মা দেহ ত্যাগ করিল।

আততায়ীর নাম নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে। সে পুনা

বাপুজী ফটো—য়ুনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

হইতে প্রকাশিত 'হিন্দু রাষ্ট্র' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। তাহার বয়স আন্দাজ ৩৬ বৎসর। সে ২৯শে জানুয়ারী অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে দিল্লীতে আসিয়াছিল। ঘটনার পর তাহাকে ধরিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। সে ঐ কার্য্যের জন্য আদৌ দুঃখিত হয় নাই। সে ঐ কার্য্যের জন্যই দিল্লীতে আসিয়াছিল। সে জাতিতে মারাঠী। পরদিন

তাহাকে আদালতে হাজির করিয়া বিচারের জন্ত তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজির নিহত হওয়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সর্দারজী তখনও গান্ধীজির নিকট হইতে স্বগৃহে যাইয়া পৌছেন নাই—পথে খবর পাইয়া তিনি বিরলা ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সকল সদস্য এবং দিল্লীবাসী অগণিত নরনারী তখনই সকলে বিরলা ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫টা ৪০ মিনিটে গান্ধীজির মহাপ্রয়াণের সংবাদ প্রচার করার পর ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চিকিৎসার জন্ত যখন চিকিৎসক আসিলেন, তখন গান্ধীজির আর চিকিৎসা বা ঔষধ-প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল না। তিনি শান্তভাবে, মুদিত নয়নে চির-নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। সারা রাত্রি ধরিয়া সেই ঘরে প্রার্থনা চলিতে লাগিল। গীতা পাঠ চলিল—তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল।

পণ্ডিত নেহরু পরদিনের কার্য্য সূচি ঘোষণা করিলেন।

মহামানবের ভাষণ ফটো—যুনিভার্সেল আর্ট গ্যালারী

ভারতের সূর্য যদি যায় অস্তাচলে,
বিচ্ছেদবেদনা-ঘন তমিস্রার তলে
রহিবে ভারত! আজি অন্ধ চরাচর—
বিশ্বের আকাশে নাহি বিশ্বের ভাস্কর।

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজির কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী সপরিবারে দিল্লীতে ছিলেন, তখনই তাঁহারা বাপুজীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৃতীয় পুত্র রামদাস গান্ধীও পরদিন দিল্লীতে আগমন করিলেন।

সংবাদ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সকলে শোকে অভিভূত হইয়া নিজ নিজ কাজ বন্ধ করিল। পথে যান চলাচল, লোক সমাগম সব বন্ধ হইয়া গেল। যেখানে রেডিও যোগে সংবাদ প্রচারিত হইতেছিল, দলে দলে লোক সেখানে গিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

পণ্ডিত নেহরুর নির্দ্দেশ মত পর দিন বেলা সাড়ে ১১টার সময় গান্ধীজির শবের শোভাযাত্রা বিরলা ভবন হইতে বাহির হইয়া ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া লাল-কিল্লার দক্ষিণ দিকে যমুনা তীরে রাজঘাটে লইয়া যাওয়া হইবে স্থির হইল। পণ্ডিতজী ঐ স্থানটি গান্ধীজির স্মৃতির সহিত সংযুক্ত করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। পর দিন ভারতের নেতৃবৃন্দ একে একে সব দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের গভর্ণর সার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বোম্বায়ের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত বি-জি-খের দিল্লীতে আসিলেন। যুক্তপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত গোবিন্দবল্লভ পন্থ দিল্লীতেই ছিলেন। বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন দিল্লীতেই ছিলেন—তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা কাল গান্ধীজির শবের নিকট উপস্থিত ছিলেন। লেডী মাউণ্টবেটেন মাদ্রাজে ছিলেন, তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহলে স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করিতে যাইতেছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে বাঙ্গলার গভর্ণর—গান্ধীজির বৈবাহিক শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী শনিবার বিকালে দিল্লীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বিভাবতীকে সঙ্গে লইয়া শনিবার দিল্লী যাইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইয়া গান্ধীজির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শনিবার বেলা ঠিক সাড়ে ১১টার সময় পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে বাপুজির শবের শোভাযাত্রা দিল্লীর বিরলা ভবন হইতে যাত্রা করিল। সকল বিভাগের সৈন্যদল সহ রাজকীয় শোভাযাত্রা ৫ মাইল পথ ঘুরিয়া ঠিক ৪টা
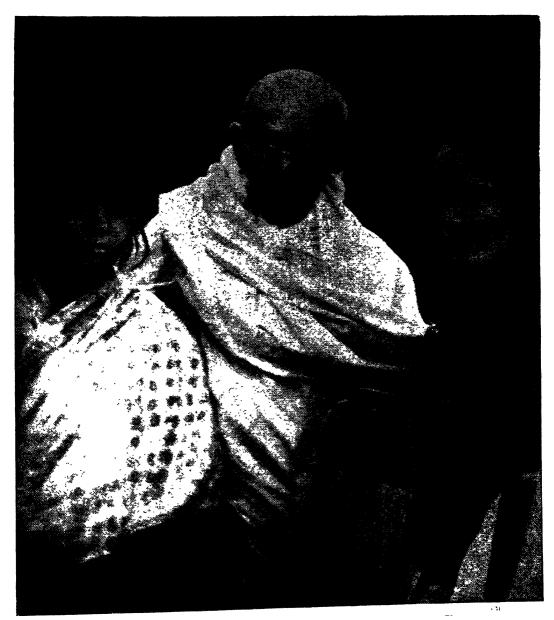
প্রার্থনা সভা অভিমুখে বাপুজী

ফটো—ডি-রতন

হে মহামানব,
রেখে গেলে যে জীবন
আমাদের মাঝে
জীবনের সর্ব কাজে
যেন তা বিরাজে।

শ্রীলীলাময় দে

২০ মিনিটে রাজঘাটে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ চিতা সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন—১৫ মণ চন্দন কাঠ, ৪ মণ ঘৃত, ২ মণ গন্ধদ্রব্য, ১ মণ নারিকেল ও ১৫ সের কর্পূর দিয়া চিতা সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। শব স্নান করাইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সাড়ে ৪টার সময় চিতার উপর তোলা হইল। ৪টা ৫৫ মিনিটে রামদাস গান্ধী চিতায় অগ্নিদান করিলেন। সেখানে বড়লাট লর্ড মাউণ্টবেটেন হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সর্দ্দারজী এক পাশে বসিয়াছিলেন—পণ্ডিত নেহরু চারিদিকে ঘুরিয়া জনতাকে শান্ত করিতেছিলেন। কত লক্ষ লোক যে শবানুগমন করিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই। ১ ঘণ্টার মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল। ৬টার সময় সব শেষ—সকলে ধীরে ধীরে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পণ্ডিতজীর নির্দ্দেশ মত সেদিন শনিবার সারা ভারতে হরতাল পালিত হইল। সকল লোক সারাদিন উপবাস ও প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন। সকল দেশবাসী বিকাল ৪টায় নদী বা সমুদ্রতীরে বা মাঠে সমবেত হইয়া গীতা-পাঠ, কোরাণ পাঠ, বাইবেল পাঠ প্রভৃতি দ্বারা সমবেত-ভাবে প্রার্থনা করিলেন।

বিশ্বকবি ও বিশ্বগুরু ফটো—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের সৌজন্যে

গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কিরূপ বিরাট ছিল, তাহা একদিকে আমরা যেমন তাঁহার জীবিতকালে লক্ষ্য করিয়াছি, অন্যদিকে তেমনই তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর দেখিতে পাইতেছি। ২রা ফেব্রুয়ারী সোমবার ভারত গভর্ণমেণ্ট মহাত্মার মৃত্যুতে দুইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করেন। একটিতে তাঁহারা বলেন—কোনও প্রতিষ্ঠানকে হিংসা বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতে দিবেন না। অপরটিতে বলা হয়—বেসরকারী সৈন্যদল কোথাও রাখিতে দেওয়া হইবে না। ঐ দিন ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা গণপরিষদের অধিবেশনেও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজির মহাপ্রয়াণে শোকসূচক প্রস্তাব উপস্থিত করেন—তাঁহার বক্তৃতার পর ৯জন সদস্য ঐ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই দিনই স্থির হইল—১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার গান্ধীজির অস্থি এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে নিমজ্জিত করা হইবে এবং চিতা হইতে সংগৃহীত ভস্ম ভারতের সর্ব্বত্র সকল তীর্থে—নদী, সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতিতে প্রদান করা হইবে।

যেই প্রচারিত হইল—হত্যাকারী গড্‌সে মহারাষ্ট্রীয় ও সে হিন্দুসভার নেতা—অমনই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নানা স্থানে হিন্দুসভাকর্ম্মীরা জনগণের হাতে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু হিন্দুসভা কর্ম্মীর গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হইল এবং কত লোক যে প্রহৃত ও নির্য্যাতীত হইল তাহার সংখ্যা নাই।

৪ঠা জানুয়ারী ভারত সরকার ঘোষণা করিলেন—রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সংঘ যে হিংসার আদর্শ প্রচার করিয়াছে, তাহার ফলে বহু লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। সংঘের সদস্যরা ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ চালাইয়াছে, বেআইনিভাবে অস্ত্র ও

গোলাবারুদ সংগ্রহ করিয়াছে, গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি এবং পুলিস ও সৈন্যদলকে অপকার্য্যে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসমূলক কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছে, অতএব সংঘকে ভারতের সর্ব্বত্র বেআইনি প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কংগ্রেস দলের নেতাদের যে সভা হয়, তাহাতে ঘোষণা করা হয়—প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা ভিত্তিহীন।

৫ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রাসাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় গান্ধীজির মৃত্যুতে শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কমিটীর সদস্যগণ ছাড়াও সভায় আচার্য্য কৃপালানী, খাদ্যসচিব শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, শ্রমসচিব জগজীবনরাম এবং বাঙ্গালা, বিহার ও পাঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভাপতিগণ বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন। স্থির হয়, ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভা কানপুরে না হইয়া দিল্লীতে হইবে।

গান্ধীজির মৃত্যুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুলিস সর্ব্বত্র ব্যাপক খানাতল্লাস করিয়াছে—বহু কাগজপত্র উদ্ধার করিয়াছেও বিভিন্ন প্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক-সংঘের ও হিন্দু মহাসভার বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর গৃহীত প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে—বলা হইয়াছে যে, গান্ধীজির জীবনকালে যাহা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদিগকে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। বেসরকারী ফৌজ বা অনুরূপ অন্য কোন বাহিনী গঠন নিষিদ্ধ হয় ও রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান গঠন নিষিদ্ধ হয়।

গান্ধীজির স্মৃতিরক্ষাকল্পে—সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠনমূলক কার্য্য চালাইবার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় স্মৃতি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর যে সকল রচনা ও উপদেশাবলী রহিয়াছে, সেগুলি সংগ্রহ ও প্রচার কার্য্যের জন্য এই ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয়িত হইবে—একটি যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় গান্ধীজির স্মৃতিপূত দ্রব্যাদি রাখা হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তত ১০ দিনের আয় এই ধনভাণ্ডারে দান করিতে বলা হইয়াছে। মহাত্মাজীর প্রাণনাশের দরুণ যাহাতে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ না করা হয়, তজ্জন্য জনগণের নিকট আবেদন করা হয়। মহাত্মা গান্ধী চিরদিনই প্রতিশোধ গ্রহণের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন—গবর্ণমেণ্টই সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এমতাবস্থায় জনগণ প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ব্যাহত হইবে।

গান্ধীজির হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট আলোয়ারের মহারাজা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ এন-বি-খারেকে সাময়িকভাবে আলোয়ার রাজ্যের বাহিরে থাকিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রকাশ—আলোয়ার রাজ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের কার্য্যকলাপ, মহাত্মা গান্ধীজির প্রাণনাশের ব্যাপারে ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য যোগাযোগ

আমার ধ্যানের ভারত

মহাত্মা গান্ধী

আমি সেই ভারতবর্ষকে গঠন করিবার জন্য কাজ করিয়া যাইব, যে ভারতবর্ষে দীনতম ব্যক্তিও মনে করিবে যে দেশ তাহারই দেশ। এই দেশ গড়িয়া তুলিতে তাহাদেরও অভিমত কার্য্যকরী হইবে। সেই ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণী বা নীচশ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকিবে না। সেই ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক রাখিয়া বাস করিবে। সেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের কোন স্থান থাকিতে পারে না, উত্তেজক পানীয় অথবা অন্য কোন মাদক সেবারও কোন প্রশ্রয় থাকিবে না। নারী-সমাজ পুরুষ-সমাজেরই মত সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ।

ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধমূলক কার্য্যকলাপে রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতা বা মৌন-সম্মতি সম্পর্কে যে সকল তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ঐ ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তর কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন শাসক সাময়িকভাবে রাজ্য চালাইবেন।

এক সপ্তাহকাল অনুসন্ধানের পর ভারত গভর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদিগকে হত্যার দেশব্যাপী ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন ও সেজন্য বিভিন্ন প্রদেশের বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংক্রান্ত একটি খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ জনসাধারণের উদ্দেশে লিখিত উহাই তাহার সর্ব্ব শেষ দলিল। ৭ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য যুগলকিশোর উহা প্রচার করিয়াছেন। গান্ধীজি উহাতে বলিয়াছেন—"ভারত দ্বিধা বিভক্ত হইলেও কংগ্রেস কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত উপায়ে দেশের রাজনাতিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে। প্রচার-যন্ত্র ও পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামের সামাজিক, নৈতিক ও বৈষয়িক স্বাধীনতা এখনও লাভ হয় নাই। ভারতবর্ষ স্বীয় অভীষ্ট গণতান্ত্রিক লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবার সময় সামরিক-শক্তির উপর শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রাধান্য লাভের সংগ্রাম চলিতে বাধ্য। সেরূপ অবস্থায় রাজনীতিক দল ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের অশুভ প্রতিযোগিতা হইতে উহাকে মুক্ত রাখিতে হইবে। এই হেতু ও অন্যবিধ কারণে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসকে ভাঙ্গিয়া দিয়া উহাকে লোক-সেবক-সংঘে রূপান্তরিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।"

৮ই ফেব্রুয়ারী ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতের সর্ব্বত্র মুসলেম লীগ, ন্যাশানাল গার্ড ও থাকসার প্রতিষ্ঠান বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কেন তাহা করা হইল সরকারী বিবৃতিতে তাহা পরিষ্কার ভাবে জানান হইয়াছে। সর্ব্বশেষে বলা হইয়াছে—এই ব্যবস্থা সলেম সমাজের বিরুদ্ধে অবলম্বন করা হইতেছে না। * * বেআইনি কার্য্যকলাপ বন্ধ করিয়া যাহাতে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়, গভর্ণমেণ্ট সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে সাতারা, কোলাপুর, বলগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে বাছিয়া বাছিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের উপর জনগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ হইতেছে জানিয়া ৮ই ফেব্রুয়ারী সর্দ্দার পেটেল এক সতর্কবাণী প্রচার করেন। পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া একদল সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধনের যে চেষ্টা করিতেছেন, সর্দ্দারজী তাহার তীব্র নিন্দা করেন।

দেশ বিদেশে শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ

মহাত্মা গান্ধীর আকস্মিক মহাপ্রয়াণে শুধু তাঁহার দেশবাসী শোকাকুল হন নাই—সারা জগতের সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই মর্ম্মাহত ও স্তম্ভিত হইয়া শোক ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন—আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটি মাত্র প্রকাশ করিলাম।

(১) "বন্ধুগণ, আমাদের জীবনে এতদিন যে দীপশিখা জ্বলিতেছিল, আজ তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে। একটা গভীর তমিস্রা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আপনাদিগকে আমি কি বলিব এবং কি ভাবেই বা তাহা বলিব, আমি তাহা জানি না। আমাদের নেতা, আমাদের বাপু, আমাদের রাষ্ট্রের পিতা আর নাই। একথা বলিলে হয়ত কিছুটা অন্যায় হইবে। তথাপি তাঁহাকে আমরা এতদিন আমাদের মধ্যে যে ভাবে দেখিতে পাইয়াছি, আজ হইতে আর সেইভাবে দেখিতে পাইব না। বিপদে পড়িলে আমরা তাঁহার উপদেশলাভের জন্য গিয়াছি. দুঃখে পড়িলে তাঁহার কাছে সান্ত্বনার জন্য গিয়াছি। আর আমরা সেইভাবে যাইতে পারিব না। এই যে প্রচণ্ড আঘাত, সে শুধু আমারই নয়, এই দেশের কোটি কোটি অধিবাসীর। আমি বা অপর কেহ যদি কোন উপদেশ আপনাদিগকে দেই, তবে তাহার দ্বারা এ আঘাতের কিছু উপশম হইবে না।

আমি বলিয়াছি, দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে। আমি জানি এ কথা বলা অন্যায়। কারণ, এই দীপ শিখা এক অসাধারণ আলোকবর্ত্তিকা। দীর্ঘ দিন যে আলো এই দেশকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, সেই আলো আরও অনেক দিন এমন কি সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আমাদের দেশকে পথের সন্ধান দিবে। সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে ইহা চাহিয়া দেখিবে। আর্ত্ত-

হৃদয়ে ইহা সান্ত্বনা যোগাইবে। এই যে আলো ইহা শুধু বর্ত্তমানের প্রতীক নহে, ইহা জীবন্ত সত্যের প্রতীক, ইহা চিরন্তন সত্যের প্রতীক। এই আলো আমাদিগকে ন্যায়ের পথে পথ দেখাইয়া চলে, ভুল করিলে সংশোধনের পথ নির্দ্দেশ করে। এই আলোই আমাদের এই অতি প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতার দ্বারদেশে লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আরও অনেক কিছু করিবার ছিল। আমরা মুহূর্ত্তের তরেও একথা ভাবিতে পারি না যে তিনি আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন অথবা তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ যখন আমরা বহু জটিলতার সম্মুখীন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে নাই, ইহা এক ভয়াবহ ও প্রচণ্ড আঘাত।

একজন বিকৃতমস্তিষ্ক লোক তাঁহার জীবনের অবসান ঘটাইয়াছে। কারণ, যে এই কাজ করিয়াছে, তাহাকে আমি বিকৃতমস্তিষ্ক ছাড়া আর কি বলিতে পারি। বিগত কিছুকাল ধরিয়া চারিদিকে একটা বিষবাষ্প ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, মানুষের মনেও তাহার ক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। এই যে দিগন্তবিস্তৃত হলাহল, ইহার সম্মুখীন আমাদিগকে হইতে হইবে, সমূলে ইহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে যে বিপজ্জাল ঘিরিয়া রহিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ইহার জন্য আমরা যেন এই উন্মত্ততার অনুসরণ না করি, আমাদের প্রিয় শিক্ষক আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন সেই পথেই আমরা যেন চলি। প্রথমে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা ক্রুদ্ধ হইয়াছি বলিয়া যেন উন্মত্তবৎ আচরণ না করি। একটা শক্তিশালী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি যে ভাবে চতুর্দ্দিকের ঘোর বিপদকে তুচ্ছ করিয়া দণ্ডায়মান হয় আমরাও যেন অনুরূপ শক্তির অধিকারী হইতে পারি। আমাদের মহান্ নেতা ও আমাদের মহান্ শিক্ষক যে নির্দ্দেশ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া পালন করিতে পারি। আমরা যেন একথা স্মরণ রাখি যে, আমরা যদি অন্যায় এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলে তাঁহার বিদেহী আত্মা বিক্ষুব্ধ হইবে। পরলোক হইতে তাঁহার আত্মা আমাদের প্রতিটি কার্য্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে।

কাজেই আমরা কোন অন্যায় যেন না করি। কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, আমরা দুর্ব্বল হইব। বরং শক্তি এবং সংহতির সাহায্যে আমরা আমাদের সম্মুখের সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন হইব। আমাদিগকে সংহত হইতে হইবে, সমস্ত বাদ বিসম্বাদ এবং সঙ্ঘর্ষের ঊর্দ্ধে উঠিয়া এই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার মুখে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই ঘটনা যতই মর্ম্মবিদারী হোক না কেন, এক হিসাবে ইহা একটি প্রতীকও বটে। সেই প্রতীক হইতেছে সমস্ত ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া যাইয়া আদর্শ জীবনের মহান বৈশিষ্ট্যগুলি সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করার প্রতীক। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি জীবনের বিরাট আদর্শের কথা এবং চিরভাস্বর সত্যের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। ইহা যদি আমরা মনে রাখি তবে ভারতের কল্যাণই হইবে।

—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

(২) "আমাদের পাপের জন্য পৃথিবীর মহামানবকে জীবন দিতে হইয়াছে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। গান্ধীজী যখন জীবিত ছিলেন তখন আমরা তাঁহার কথা শুনি নাই, আসুন তাঁহার মৃত্যুর পর আমরা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করি। শান্তির জন্য গান্ধীজী আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে তাঁহার আদর্শ অবশ্যই সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। জনসাধারণ যদি পারস্পরিক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষ ভুলিয়া যায় তবেই গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল

(৩) "একটা গভীর মর্ম্মান্তিক ঘটনা আমাদের সকলের মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। গান্ধীজীর মৃত্যুর ফলে সারা বিশ্বে যে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে আমাদের অন্তরেও তাহা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। গান্ধীজী বিশ্বের শিক্ষা গুরু। আদর্শের জন্য তিনি যে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন তাহা বিশ্বের অল্পসংখ্যক মানবের জীবনেই দেখা যায়।

বহুবার তিনি তাঁহার আদর্শকে বিজয়ের মূর্ত্তরূপ দিবার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। বহুদূর হইতেও আমরা উপলব্ধি করিয়াছি তিনি এই বিশ্বের ঊর্দ্ধে ছিলেন—তাঁহার জীবন ছিল আদর্শের মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার দেশবাসীর স্বাধীনতার কামনা তাঁহার মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য তাঁহার আরও দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহার মধ্যে স্বাধীনতার কামনা অপেক্ষা আরও একটা বড় জিনিষ ছিল। সেটা হইতেছে অহিংসা ধর্ম্ম। গান্ধীজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্রত সাঙ্গ হইবে না। এই বিশ্বের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু যে আদর্শ তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত হইয়াছিল তাহা চিরভাস্বর থাকিবে। আজ যাহারা সারা বিশ্বে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছে তাহারা তাঁহার মহান অহিংসা ও ঐক্যের আদর্শ চিরদিন অনুসরণ করিয়া চলিবে। এই আদর্শের জন্যই তিনি জীবনধারণ করিতেন, এই আদর্শের জন্যই তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন।"

—স্বস্তি সংসদের সভাপতি মিঃ ল্যাজেন হোপ

(৪) "বিশ্বের ইতিহাসে দেখা যায় মহামানবরা অনেকে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়াছেন। গান্ধী জানিতেন যে তাঁহার জীবন যে কোন সময়ে বিপন্ন হইতে পারে। বিপদকে যে মানুষ এইরূপভাবে তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারে ইহাই তাহার প্রথম নিদর্শন।"

—ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিঃ নোয়েল বেকার

(৫) "গান্ধীজী ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা। ভারতের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে গান্ধীজীর স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে। মুক্তির জন্য দীর্ঘদিনের সংগ্রামে তিনি ভারতবাসীকে পরিচালিত করিয়াছেন; তাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর নাম উল্লিখিত থাকিবে।"

—রুশ প্রতিনিধি মঃ আন্দ্রে গমিকো

(৬) "পাকিস্তান সরকার ও জনগণের পক্ষ হইতে—আমার পক্ষ হইতেও বটে, আমি বর্ত্তমান যুগের প্রগতিশীল হিন্দুধর্ম্মের মহৎ আদর্শের প্রতীক এই মহামানবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইতেছি। তাঁহার মর্ম্মান্তিক মৃত্যুতে ভারতের যতটা ক্ষতি হইয়াছে পাকিস্তানেরও তাহাপেক্ষা কম ক্ষতি হয় নাই। উপরন্তু ইহা বিশ্বের এক অপূরণীয় ক্ষতি। কোটি কোটি মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিত। যাহারাই তাঁহার নাম শুনিয়াছে শ্রদ্ধায় তাহাদের মস্তক অবনত হইয়াছে। তাঁহার জীবিতকালে যখনই কোন সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে তখনই তিনি সমস্ত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন। মানুষের হৃদয়ে ইহা তাঁহাকে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে।"

—পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লা খাঁ

(৭) 'তাঁহার অনিষ্ট কেহ চাহিতে পারে ইহা কল্পনাতীত। একজন আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অদৃষ্টের পরিহাস ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এই ঘটনা আরও মর্ম্মান্তিক কারণ; বর্ত্তমানের যে সকল সমস্যা, তাহার অনেকগুলির সমাধানের পথ তিনিই দেখাইয়া দিয়াছেন। একটি ঘৃণ্যতম লোকের হাতে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। ইহার পরিণতি যে কি হইবে তাহা বলা শক্ত। তথাপি আমরা এই প্রার্থনাই করিব যে, তিনি যে আদর্শের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর মধ্য দিয়া যেন সেই আদর্শের পরিপূর্ত্তি হয়। গান্ধীজী তাঁহার অনুবর্ত্তীদের শিখাইয়াছেন যে, আভ্যন্তরীণ বাদ বিসম্বাদ জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। যাহারা ভারতের উপর আধিপত্য করিতে চায় ইহা শুধু তাহাদিগকেই সাহায্য করিবে।"

—ইউক্রেনের প্রতিনিধি মঃ ভাসিলি তারশেঙ্কো

(৮) "আজ যখন বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কট চলিতেছে তখন এই মৃত্যু বড়ই মর্ম্মান্তিক। আমরা বিশ্বাস করি এই আত্মবিসর্জ্জন বিশ্ববাসীকে বিশ্বসভার আদর্শ পরিপূরণের জন্য সংগ্রামে প্রেরণা দিবে।"

—মার্কিন প্রতিনিধি সিনেটর অষ্টিন

(৯) "মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান এশিয়ার মহামানব মহর্ষির জীবনাবসান ঘটিয়াছে।"

— চীনের প্রতিনিধি ডাঃ টি এফ সিয়াং

(১০) "গান্ধীজী যে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আত্মার শক্তিকে তিনি তাঁহার কথা এবং কাজের মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর সম্মুখে তিনি মহান আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।"

—আর্জ্জেন্টিনার প্রতিনিধি ডাঃ যোশ আর্ক

(১১) "আমরা প্রার্থনা করি, যে বীজ তিনি বপন করিয়া গেলেন তাহা মানুষের মনে অঙ্কুরিত হউক এবং বিশ্বসভার কাজে সহায়তা করুক।"

—সিরিয়ার প্রতিনিধি করিস এল খুরী

(১২) "গান্ধীজীর মৃত্যু শুধু ভারতের দুর্ঘটনা নয়—সমগ্র বিশ্বের শুভকামী মানুষের দুর্ঘটনা।"

—কানাডার প্রতিনিধি জেনারেল এণ্ড্রু ম্যাকনটন

(১৩) "গান্ধীজী ভারতের একজন বিরাট জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বেরও নেতা ছিলেন। ভারতবাসী তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করে। তাঁহার প্রভাব শুধু রাজনীতি-ক্ষেত্রেই নয়, আত্মিক জগতেও। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে আদর্শের জন্য তিনি সারাজীবনে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার পরিপূর্ত্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার জীবন-সাধনা দীর্ঘদিন ভারতবাসীকে পথ দেখাইবে। তাঁহার দেশবাসীর কল্যাণের জন্য তিনি সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, ভারতের নেতারা তাহা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি তাঁহার আত্ম-বিসর্জ্জনের ফলে শুধু ভারতবাসীই নয় সমস্ত বিশ্ববাসীই শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য আরও উৎসাহ লইয়া কাজ করিবে।"

—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান

(১৪) "এই শোকাবহ ঘটনার পর ভারত ও পাকিস্থানের অধিবাসীরা গান্ধীজীর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া আমি আশা করি।"

—নয়াদিল্লীস্থ মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি

(১৫) "এই পুজনীয় ব্যক্তির হত্যা বর্ত্তমান ইতিহাসের নিকৃষ্টতম ঘটনা। মনুষ্যসভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে গান্ধীজীর ভাবধারা গ্রহণ না করিয়া বিশ্ববাসীর গত্যন্তর নাই। সংস্কারক হিসাবে পৃথিবীতে তিনি অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।"

—জেনারেল ম্যাক আর্থার

(১৬) "অহিংসার পুজারীকে হিংসার যূপকাষ্ঠে বলি হইতে হইল, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়।"

—ক্যানেডার প্রধান মন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং

(১৭) "প্রাচ্য একজন দেশপ্রেমিক মানুষ, জাতি একজন মহান সাধক হারাইল।"

—রাজা ফারুখ

(১৮) মহাত্মা গান্ধীর হত্যায় আমেরিকাবাসী শোকাভিভূত হইয়াছে। আমরা এই দুঃসময়ে আপনাদের সমবেদনা জানাইতেছি।

—মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জর্জ্জ মার্শাল

(১৯) "আমাদের ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। ভারত আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। আমরা শোকপ্রকাশ করিতেছি। মহাত্মার আকাঙ্ক্ষিত শান্তি ও সৌভ্রাতৃবোধে ভারত পূর্ণ হইয়া উঠুক, ইহাই আমার কামনা।"

—মিঃ ডি ভ্যালেরা

(২০) "আমার ও ফরাসী সরকারের পক্ষ হইতে আমি জানাইতেছি যে, গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছি। আমরা

তাঁহার নিকট মস্তক নত করি। আশা করি তাঁহার ভারতের অবস্থা খারাপের দিকে যাইবে না।"

—ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী রবার্ট স্যুম্যান

(২১) "এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পূর্ণ বিবরণ আমি পাই নাই। আমি অভিভূত হইয়াছি। তাহার মৃত্যুর পর ভারত শান্ত থাকিবে বলিয়া আমি আশা করি।"

—সমাজতন্ত্রী নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মসিঁয়ে ব্লুম

(২২) "তিনি মানুষের মনের হিংসাপ্রবৃত্তি দূর করিয়া শান্তি ও সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অন্ধ উত্তেজনা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া তিনি শহীদ হইয়াছেন।"

—ক্যাণ্টারবেরির আর্চ বিশপ ডাঃ ফিসার

(২৩) "রাণী ও আমি মহাত্মাজীর মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। এই দুর্ঘটনায় ভারতবাসীদের তথা মানবজাতির অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা ভারতবাসীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

—রাজা ষষ্ঠজর্জ্জ

(২৪) "এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি।"

—মিঃ চার্চ্চিল

(২৫) "এই অসাধারণ ব্যক্তির তিরোধানে কেবল বৃটেন নয়, সমগ্র পৃথিবী শোকে বিহ্বল হইবে। মনুষ্যজাতির এই মহান সেবকের অন্তর্দ্ধানে আমরা সকলেই শোকাভিভূত। অহিংসাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন। যাহারা হিংসা দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চাহিত, তিনি তাহাদের বাধা দিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্যের সরলতা ও সততা সকল সন্দেহের ঊর্দ্ধে ছিল। সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে যখন নবলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হইয়া উঠিতেছিল, তখন তিনি অনশন করিয়া বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সম্প্রতি দিল্লীতেও তিনি একবার অনশন করেন। তাহাতে আবহাওয়ার কিছু পরিবর্তন হয়। আততায়ীর আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তি ও মৈত্রীর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়াছে, কিন্তু আশা করি, তাঁহার দেশবাসী তাঁহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের তিরোধানে আমি সমগ্র বৃটিশ জাতির পক্ষ হইতেই ভারতবাসীদের উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করিতেছি। গান্ধীজী বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্দেহ নাই, তবু মনে হয় তিনি বর্ত্তমান যুগের নন। তিনি যে যুগের মানব, সে যুগ পৃথিবীতে এখনও আসে নাই—আদৌ আসিবে কিনা কে জানে। যে সুপ্ত কণ্ঠ সমস্ত জীবন শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন নরপিশাচের নির্ম্মম হস্ত তাহা চিরতরে রুদ্ধ করিয়াছে, তবু তাঁহার আত্মা সমস্ত বিশ্ববাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে, শান্তি ও সম্প্রীতির পথে পরিচালিত করিবে ইহাই আমার দৃঢ় অভিমত।"

—প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী

(২৬) "গভীর দুঃখের সহিত আমি আততায়ীর হস্তে গান্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছি। বিশ্বের সর্ব্বত্র এই দুঃখ অনুভূত হইবে এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। একজন বিরাট পুরুষের তিরোধান হইল। ভারতের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে আমরা দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।"

—দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মাটস্

(২৭) "ভারত ও পৃথিবীর যে ক্ষতি হইল, তাহা প্রকাশের ভাষা নাই।"

—পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন

(২৮) "গান্ধীজীর হত্যা ভারত তথা পৃথিবীর একটি মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। পৃথিবীতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক পুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

—স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস

(২৯) "পৃথিবীতে সহসা আর এইরূপ পুরুষের আবির্ভাব হইবে না।"

—দেশরক্ষা সচিব মিঃ এ, ভি, আলেকজেণ্ডার

(৩০) "অতি ভয়ঙ্কর সংবাদ। একজন মহাপুরুষের এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখের।"

—সহকারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ হার্ব্বার্ট মরিসন

(৩১) "মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদে শ্রমিকদল অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে।"

—বৃটিশ শ্রমিক দলের সেক্রেটারী মিঃ মর্গান ফিলিপস

(৩২) "খুব বেশী ভাল হওয়ার যে কি বিপদ হয়, ইহাতে তাহা বুঝা যাইতেছে।"

—জর্জ্জ বার্ণাড শ

(৩৩) "আমি মনে করি মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু কেবল ভারতের পক্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বের একটা ক্ষতি। কারণ বর্ত্তমান যুগের শান্তি সংগ্রামের তিনি ছিলেন নায়ক। ইহা এত বড় একটা বিপর্য্যয় যে আমি ঠিকভাবে চিন্তাও করিতে পারি না।"

—লর্ড লিষ্টোয়েল

(৩৪) "আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের প্রিয়গুরু গান্ধীজীর নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদ শুনিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমি জানি তাঁহার সব চেয়ে বড় ইচ্ছা এই যে, তাঁহার মৃত্যুর যেন প্রতিশোধ না লওয়া হয়, অথবা তাঁহার মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া যেন আরও হত্যাকাণ্ড না হয়। তাঁহার মৃত্যুর ফলে যেন এশিয়ার এই উপমহাদেশে সকল লোকের বিরোধ মিটিয়া যায়।"

—লর্ড পেথিক লরেন্স

(৩৫) "পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিরাট অধ্যায়ের অবসানের সাথে সাথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

—মিঃ এল্, এস্ আমেরী

(৩৬) "তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠা লইয়া আর কেহই ভারতের সেবা করেন নাই। ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁহার যে সকল বন্ধু

আছেন তাঁহারা এই আশা করেন যে, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের লোক তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিবে।"

—লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

(৩৭) "মিঃ গান্ধীর উপর ঘৃণ্যতম আক্রমণ ও তাহার ফলে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদে আমি মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই সময় আর আমাদের মধ্যে কোন বিরোধের প্রশ্ন নাই। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ যতই থাকুক না কেন, একথা সত্য যে, তিনি হিন্দুসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন এবং তিনি হিন্দুদের নিকট গভীর শ্রদ্ধার পাত্র ও আস্থাভাজন ছিলেন। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুতে আমি আমার গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং হিন্দুসম্প্রদায় ও তাঁহার পরিবারবর্গকে এই গভীর শোকের দিনে সহানুভূতি জানাইতেছি। ভারতের ও পাকিস্থানের স্বাধীনতা লাভের পর এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাঁহার তিরোধান সত্যই দুঃখের। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইল এবং এই সঙ্কটকালে তাঁহার স্থান পূরণ করিবার উপযুক্ত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতে নাই।"

—কায়েদে আজম জিন্না

(৩৮) "এই হত্যাকাণ্ড এত ঘৃণ্য ও জঘন্য যে প্রত্যেক ব্যক্তিই রূঢ়তম ভাষায় ইহার নিন্দা করিবেন। গান্ধীজী আমাদের যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। জনগণের মানসিক সুস্থতা ফিরাইয়া আনিবার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজীকে হারানোর বেদনা সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেই অন্তর দিয়া অনুভব করিবেন। বহু বৎসর যাবত গান্ধীজী ছিলেন কংগ্রেসের আত্মা এবং একথা বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না যে, তিনি ছিলেন কংগ্রেসের পিতা। অহিংসা-মন্ত্রের মধ্যেই হিংসানীতির শিকার হইলেন তিনি—ইহাকেই বলে ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস! সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনকল্পে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা শান্তিকামী প্রতিটি নরনারী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। ভারতীয় রাজনীতির এই সঙ্কট সময়ে তাহার জীবনাবসানে যে ক্ষতি হইল তাহা কোন দিনই পূরণ হইবে না।"

—লিয়াকৎ আলি খাঁ

(৩৯) "ভারতে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় ব্যক্তির যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ছিল সেই সময়েই তিনি নিহত হইলেন। এই অপরাধের তুলনা নাই।"

—খাজা নাজিমুদ্দীন

(৪০) "মনে হইতেছে সমস্ত পৃথিবীর ভিত্তি যেন ধ্বসিয়া পড়িল। নির্য্যাতিতের বেদনায় আর কে দিবে সান্ত্বনা, কে মুছাইবে তাহাদের উদ্গত অশ্রু? পথের নির্দ্দেশের জন্য আমরা তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকিতাম। বিপদের দিনে অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম তাঁহার উপদেশের জন্য। তিনি কোনদিন আমাদের বিমুখ করেন নাই।

হে ভারতের নরনারী, কাঁদো কাঁদো—যতক্ষণ না সমস্ত হৃদয় খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে! যে জীবনদীপ হইতে সত্য আর ন্যায়ের আলো বিচ্ছুরিত হইত, মানবতার প্রতি গভীর প্রেম, আর নির্য্যাতিত নির্ব্বান্ধবের প্রতি অলৌকিক সহানুভূতি, সেই দীপ আজ চিরতরে নিভিয়া গেল! তবু, এই চরম দুঃখের মুহূর্ত্তে তাঁহার বাণী আমাদের অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—শান্তির যে পরমবাণী তিনি আজীবন প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে মানব-প্রেমের জন্য তিনি প্রাণ উৎসর্গ করিয়া গেলেন তাহাকেই আমাদের কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। জাতির পিতা আমাদের প্রতিটি কাজ অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার হিন্দু-মুস্লিম ঐক্যের স্বপ্ন সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে, মানবতার সেবায় আমাদের মনেপ্রাণে এক হইতে হইবে।"

—জনাব সুরাবর্দী

(৪১) "আমার আন্তরিক প্রার্থনা ও আশা এই যে, যদিও শান্তির দূত আমাদের মধ্যে নাই, তথাপি তাঁহার আদর্শ দেশকে সঞ্জীবিত করিবে ও হিন্দুদের মধ্যে যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত তাহারা এই দিকে দৃষ্টি রাখিবে যে, তিনি ভারতের জন্য যে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিলেন তাহা যেন জঙ্গী ফ্যাসিবাদের নিকট পরাভূত হইয়া না যায়।"

—ফিরোজ খাঁ নুন

(৪২) "বহু শতাব্দীর মধ্যে তিনিই ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সকল শান্তিকামীর হৃদয়ে তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন এবং তিনি আমাদের মাঝে না থাকিলেও তাঁহার আত্মা শান্তিকামীদিগকে পরিচালিত করিবে।"

—ইফতিকার হোসেন

(৪৩) "সমগ্র সীমান্ত প্রদেশ এই আকস্মিক দুর্য্যোগে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ মানবের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মনুষ্যসমাজ এক বিরাট ও মহান চরিত্রের পুরুষকে হারাইল। তিনি চিরকাল আমাদের মনে বাঁচিয়া থাকিবেন।"

—আবদুল কায়ুম খান

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৬৭৪

ভারতবর্ষ ঃ ৩৮১ ও ২৭৭

ভারতবর্ষ বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের সরকারী চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া দল এক ইনিংস ও ১৬ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করেছে। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দল বনাম ভারতবর্ষের মধ্যে যে ৩টি টেষ্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে—অষ্ট্রেলিয়া দল প্রথম ও তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলায় জয়ী হয়েছে এবং দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দলের তিনটি খেলায় জয়লাভ হ'ল। পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলাতে ভারতীয় দল জয়লাভ করলেও 'রবার' পাওয়ার সম্মান এবার অষ্ট্রেলিয়া দলই পাবে।

২৩শে জানুয়ারী এডিলেডে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়। নির্ম্মল আকাশ, ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত আবহাওয়া। ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করলেন। অষ্ট্রেলিয়া দলের বার্ণেস ও মরিস প্রথম ইনিংসের খেলার সূচনা করলেন। মরিস নিজস্ব ৭ রান ক'রে দলের ২০ রানে আউট হলে স্বয়ং ক্যাপটেন ডন্ ব্র্যাডম্যান বার্ণেসের জুটী হয়ে খেলতে থাকেন। প্রথম দিনের খেলার শেষে দলের তিন উইকেটে ৩৭০ রান উঠে। বার্ণেস ১১২ এবং ব্র্যাডম্যান ২০১ রান করে আউট হ'ন। হ্যাসেট এবং মিলার যথাক্রমে ৩৯ এবং ৪ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট আউট থাকেন। বার্ণেস তিন ঘণ্টার কিছু বেশী সময় ব্যাট ক'রেছিলেন। তাঁর রানে ১৬টা বাউণ্ডারী ছিল।

এই দিনের খেলায় ব্র্যাডম্যান শত রান ক'রে এ বৎসরের ক্রিকেট খেলায় সাতটা সেঞ্চুরী করলেন, তার মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে সেঞ্চুরী করলেন তিনটে। এই খেলায় তাঁর ২০১ রান ধরে সর্ব্বসমেত ৩৭টি দ্বিশত রান (ডবল সেঞ্চুরী) হ'ল—এই সংখ্যা ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় ডবলউ আর হামণ্ডের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ৩৬টি দ্বিশত রান সংখ্যা অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলো। এই দিনের খেলায় ব্র্যাডম্যান যখন ৭৭ রান করলেন তখন এই বৎসরের খেলায় তাঁর ১০০০ রান পূর্ণ হয়। তার পূর্ব্বেই ভারতীয় দলের ক্যাপটেন লালা অমরনাথ ল্যানসেষ্টারে তাঁর সহস্র রান পূর্ণ করেন।

দ্বিতীয় দিনে হ্যাসেট ও মিলারের জুটী খেলতে থাকে। হ্যাসেট তাঁর নিজস্ব ৫৯ রানের মাথায় ভারতীয় দলের খারাপ ফিল্ডিংয়ের দরুণ সৌভাগ্যক্রমে রান আউট থেকে রক্ষা পান। লাঞ্চের পূর্ব্বের শেষ ওভারে হ্যাসেট তাঁর শত রান পূর্ণ করেন, মোট ১৬১ মিনিট ব্যাট ক'রে। তখন তাঁর বাউণ্ডারী হয়েছিল ৮টা। লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪৯৪ রান উঠে। মিলার ৬৩ রান এবং হ্যাসেট শতাধিক রান করে নট আউট থাকেন। লাঞ্চের পর মিলার নিজস্ব ৬৭ রানের মাথায় দলের ৫০৩ রানে আউট হ'লেন। হ্যাসেট ও মিলারের ৪র্থ উইকেটের জুটী ১১৩ মিনিট উইকেটে থেকে মোট ১১৩ রান তুলেছিলো। অষ্ট্রেলিয়া দল ৫৪০ মিনিট খেলায় ৬৫০ রান তুললো। দলের ৬৬০ রান উঠলে পর ১৯৪৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ায় সিডনিতে ইংলণ্ড দলের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচের ৬৫৯ রানের রেকর্ড ভঙ্গ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ৬৭৪ রানে শেষ হয়। এত অধিক সংখ্যক রান ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত কোন টেষ্ট ম্যাচে কোন দলই তুলতে পারেনি। সেই হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার এই ৬৭৪ রান টেষ্ট ম্যাচের ইতিহাসে রেকর্ড স্থাপন করেছে। এই

রান তুলতে ৯½ ঘণ্টা সময় নিয়েছিল। হ্যাসেট ১৯৮ রান ক'রে নট আউট থাকেন। মাত্র ২ রানের জন্য ডবল সেঞ্চুরী করার গৌরব পেলেন না, শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কোন জুটীই অপরদিকের উইকেটে টিকে থাকতে না পারায়।

হ্যাসেটের খেলা খুবই দর্শনীয় এবং উপভোগ্য হয়েছিল। প্রায় ৫ ঘণ্টা সময় খেলেছিলেন, বাউণ্ডারী ছিল ১৬টা। অষ্ট্রেলিয়া দলের এই বিপুল রান সংখ্যাকে পুষ্ট করেছিল ব্র্যাডম্যানের ২০১, বার্ণেসের ১১২, হ্যাসেটের নট আউট ১৯৮ এবং মিলারের ৬৭ রান। ভারতীয় দলের হয়ে বেশী উইকেট পেলেন রঙ্গচারী, ১৪১ রানে ৪টা। ফাদকার, মানকাদ এবং হাজারে প্রত্যেকে ২টো ক'রে পান।

প্রথম দিনের খেলায় হাতে আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়া দলের এই রেকর্ড রানের প্রত্যুত্তর দিতে প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। সূচনা শুভ হ'ল না। মাত্র দলের ৬ রানে সারভাতে এবং পি সেন আউট হলেন। মানকাদ ৩ ক'রে নট আউট রইলেন।

খেলার তৃতীয় দিন অর্থাৎ ২৬শে জানুয়ারী সোমবার, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের স্মরণীয় স্বাধীনতা দিবসে শনিবারের পরিত্যক্ত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন মানকাদ ও অমরনাথ। এই তৃতীয় উইকেটের জুটী বেশ হাত জমিয়ে খেলছিলেন কিন্তু দলের ভাঙ্গন আকস্মিকভাবেই দেখা দিল। তাঁদের জুটী ভেঙ্গে পড়ায় ক্রিকেট ক্রীড়ামোদিরা বিস্মিত হলেন। ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করলেন হাজারে ও ফাদকারের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটী। তৃতীয় দিনের খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে খেলা ভাঙ্গলে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল পাঁচ উইকেটে ভারতীয় দলের ২৯৯ রান উঠেছে। হাজারে ১০৮ এবং ফাদকার ৭৭ রান ক'রে ঐ দিনের মত নট আউট রইলেন। হাজারের খেলাই তৃতীয় দিনের খেলাকে সৌষ্ঠব এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছিল। তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য এবং আউট না হবার মত খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর শত রান পূর্ণ হ'লে দর্শকরা করতালি এবং আনন্দ ধ্বনিতে মাঠ মুখরিত করে এবং ব্র্যাডম্যান এগিয়ে গিয়ে তাঁর করমর্দ্দন করেন।

হাজারে অষ্ট্রেলিয়ার খেলার মাঠে 'mercury' এই নামে আখ্যা লাভ করেছেন। হাজারে ও ফাদকারের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটীতে ১৪০ মিনিটে ১৫০ রান উঠেছিল। লালা অমরনাথ এবং মানকাদ যথাক্রমে ৪৬ ও ৪৯ রান করেন। 'ফলো অন' থেকে রক্ষা পেতে হলে ভারতীয় দলের তখন আরও ১৭৫ রাণের প্রয়োজন ছিল। হাতে ৫টা উইকেট।

২৭শে জানুয়ারী ভারতীয় দলের পূর্ণ ৭ ঘণ্টা ব্যাট করার পর প্রথম ইনিংসের খেলা ৩৮১ রাণে শেষ হয়। হাজারে ১১৬ রাণ করেন। ফাদকার করেন ১২৩ রাণ। এবারের খেলায় তাঁর এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাহলেও তিনি যে যে টেষ্ট ম্যাচে নেমেছিলেন প্রত্যেকটিতে গড়পড়তা ৫০ রাণ করেছেন। ফাদকার ৪ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ব্যাট করেন। বাউণ্ডারী করেন ১৪টা। অষ্ট্রেলিয়ার বোলার জনসন ৬৪ রাণে ৪টে উইকেট পান। 'ফলো অন' থেকে রক্ষা পাবার প্রয়োজনীয় ১৭৫ রাণ তুলতে না পেরে ভারতীয় দল খেলার চতুর্থ দিনে ৮২ রাণ তুলে। ফলে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের ৬৭৪ রাণসংখ্যা থেকে ২৯৩ রাণ পিছনে পড়ে ভারতীয় দল খেলার চতুর্থ দিনেই 'ফলো অন' ক'রে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে বাধ্য হ'ল। এবারও সূচনা শুভ হ'ল না। মানকাদ ও অমরনাথ কোন রাণ না ক'রে আউট হলেন। দারুণ ভাঙ্গন সুরু হ'ল। দলের এই ভাঙ্গনের মুখে পুনরায় হাজারে গতিরোধ ক'রে নিজ ক্রীড়ানৈপুণ্যে দলের সম্মান রক্ষা করলেন। চতুর্থ দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৮৮ রাণ উঠলে পর সেদিনের মত খেলা বন্ধ হ'ল। হাজারে নট আউট ১০২ রাণ এবং তাঁর জুটী অধিকারী নট আউট ১৮ রাণ করলেন।

২৮শে জানুয়ারী খেলার পঞ্চম দিনেই চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলার জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়ে গেল। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৭ রাণে শেষ হয়ে গেল। বিজয় হাজারে ১৪৫ রাণ করলেন। তাঁর জুটী অধিকারী ৫১। বরোদার এই দুই খেলোয়াড় দলকে ইনিংসের পরাজয় থেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে খেলেছিলেন। লিণ্ডওয়েল ৩৮ রাণে ৭টি উইকেট পেলেন।

ভারতীয় দল চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় পরাজিত হলেও এই খেলায় বিজয় হাজারে যে ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তা পরাজয়ের গ্লানি অনেকখানি মুছে ফেলেছে। তিনি উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করে যে কৃতিত্ব

লাভ করেন তা টেষ্ট ম্যাচ খেলার ইতিহাসে মাত্র ১২জন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জীবনে এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয়েছে। হাজারের ক্রিকেট খেলার পদ্ধতি এবং বিশেষত্ব দেখে Mr. Huge Pruggy তাঁকে 'True Test temperament' অর্থাৎ টেষ্ট ম্যাচ খেলার উপযুক্ত হিসাবে সম্মানিত করেছেন। ক্রিকেট খেলায় দেশে বিদেশী ক্রিকেট সমঝদারের মুখ থেকে ভারতীয় খেলোয়াড় সম্পর্কে এরূপ প্রশংসা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের যে সব দুর্ব্বলতা এবং অক্ষমতার অভিজ্ঞতা আমরা ওদেশে লাভ করেছি তা স্মরণ করে ভবিষ্যতে নিজেদের সেই মত খেলার উপযোগী করে তৈরী করতে হবে নতুবা কেবলমাত্র এইরূপ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের আত্মগৌরবে নিশ্চেষ্ট থাকলে মস্ত ভুল করা হবে।

অষ্ট্রেলিয়া দল : ডন্ ব্র্যাডম্যান (অধিনায়ক), বার্ণেস, মরিস, হ্যাসেট, মিলার, নেলহার্ভে, ম্যাককুল, জনসন, লিণ্ডওয়াল, ট্যালন ও টোসাক।

ভারতীয় দল : লালা অমরনাথ (অধিনায়ক), সারভাতে, হাজারে, গুলমহম্মদ, ফাদকার, কিষেণচাঁদ, অধিকারী, রঙ্গনেকার, পি সেন ও রঙ্গচারী।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ঃ

কলকাতায় অনুষ্ঠিত এ বছরের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক খেলাধুলায় মোট সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করেছিল। খেলাধুলায় কোন দল কিরূপ স্থান অধিকার করেছে তার ফলাফল : ১ম বোম্বাই ৪১½ পয়েণ্ট ; ২য় কলিকাতা ৩২, মাদ্রাজ ১৭, আলীগড় ১৩, এলাহাবাদ ৮, পাটনা ৫ এবং বেনারস ৪½ পয়েণ্ট।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ হয়ে গেছে এবং খেলাটি ড্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইংলণ্ড বৃষ্টির জন্যই পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ফলাফল :

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৯৬ (জে হলমেয়ার ৭৮, জি গোমেস ৮৬ ; ১০৩ রাণে জে লাকার ৭ উইকেট) ও ৩৫১ (ডিক্লেয়ার্ড ; ক্রিসটানি ৯৯, উইলিয়মস ৭২)

ইংলণ্ড : ২৫৩ (রবার্টসন ৮০, জে হার্ডষ্টাফ ৯৮ ; জোন্স ৫৪ রাণে ৪ উই) ও ৮৬ (৪ উইকেট)

ন্যাশনাল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশন্যাল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় মালয়ের খেলোয়াড়রা বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। মালয় তিনটি ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয়েছে।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে : এস এ দুরাণী (মালয়) ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে এ সামুয়েলকে (মালয়) পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডাবলসের ফাইনালে : এ সামুয়েল ও সি লিয়ং (মালয়) ১৫-৬ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে টি মাডসেন ও পি হোমকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে : মিসেস সি আহম (ডেনমার্ক) ৫-১১, ১১-৮ ও ১১-৫ পয়েণ্টে মিস চিনোয়কে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসের ফাইনালে : টি মাডসন ও মিস সুমান দেওধর ১৫-১১ ও ১৫-৬ পয়েণ্টে সি লিয়ং ও মিসেস পিণ্টোকে পরাজিত করেন।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ক্রীকেট

বাংলাদেশের ক্রীকেট মরশুম প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণের জন্য ক্রীকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল তাঁদের এসোসিয়েশনভুক্ত ক্লাবগুলিকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সমস্ত খেলা বাতিল করতে সময়োচিত নির্দ্দেশ দিয়ে খুবই প্রশংসার কাজ করেছেন।

এবার একটিমাত্র প্রথম শ্রেণীর খেলা, বাংলা বনাম হোলকার, কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার হোলকার দল পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিশালী ছিল না সি, এস, নাইডু ও সারভাতে ভারতীয় দলের হয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাওয়ায়। কিন্তু তবুও বাংলা শোচনীয়ভাবে ১২৮ রাণে পরাজিত হল নিজ প্রদেশে খেলে। বাংলার এই পরাজয়ের জন্য প্রধানত দায়ী হোলকার অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় কর্ণেল নাইডুর অভিজ্ঞতা ও বাংলা দলের দৃঢ়তা ও নার্ভের অভাব। অবশ্য বাংলা দলের স্বপক্ষেও বলবার আছে যে তাদের পি, সেন অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে যাওয়ায় এবং নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জী তাঁর ফুটবল খেলায় আহত পা না সারায় খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। নির্ব্বাচিত অধিনায়ক কার্ত্তিক বসু ও কমল ভট্টাচার্য্যও অসুস্থতার অজুহাতে না খেলায় বাংলা দলের শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পায়। এই চারজন খেলোয়াড়, যাঁদের প্রত্যেকেই ভাল ব্যাট্‌সম্যান, তাঁদের অভাব বাংলা বিশেষ ভাবে বোধ করেছে তার প্রথম ইনিংসে। বাংলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় মাত্র ৯৫ রাণে! এই ইনিংসে একমাত্র এস, মুস্তাফী ছাড়া কেউ খেলতে পারেন নি। মুস্তাফী দলের ভাঙনের মুখে দৃঢ়তাপূর্ণভাবে খেলে দলের সর্ব্বোচ্চ ২৮ রাণ করেন। বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের তরুণ খেলোয়াড় পঙ্কোজ রায় কৃতিত্বপূর্ণ শতাধিক রাণ করেন। গত বৎসরে পঙ্কোজ রায় এই প্রতিযোগিতায় সর্ব্বপ্রথম খেলেন এবং যুক্তপ্রদেশের বিপক্ষে শতাধিক রাণ করেন। হোলকারের বিপক্ষে পঙ্কোজের এই খেলা একেবারে দোষ ত্রুটি শূন্য হয় নি। আউট হবার সুযোগ তিনি দিয়েছিলেন; তা ছাড়া তাঁর 'রানিং বিটুইন্ দি উইকেট'এর উন্নতির প্রয়োজন। প্রথম ইনিংসে ভ্যাণ্ডার গাচ্ তাঁর দোষে রাণ আউট হন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করবার পর তিনি নিজেই রাণ আউট হ'য়ে যান। পঙ্কোজের উপর আশা করবারও অনেক কিছুই আছে। দলের পতনের মুখে দৃঢ়তাপূর্ণভাবে খেলবার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং ভাল ব্যাট্‌সম্যানের উপযোগী নার্ভ ও পিটিয়ে খেলবার ক্ষমতা থেকেও তিনি বঞ্চিত নন। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যেই তিনি এই মরশুমে

পঙ্কোজ রায় ফটো—শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

তাঁর ১০০০ রাণ পূর্ণ করেছেন। পঙ্কোজকে আমাদের অনুরোধ যেন তিনি নির্ম্মল চ্যাটার্জ্জীর মতন ফুটবল খেলায় বেশী ঝোঁক দিয়ে তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নষ্ট না করেন। তিনি যদি তাঁর ব্যাটিংএর ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করেন তবে আশা হয় ভবিষ্যতে হয়ত তিনি পি, সেনের ন্যায় বাংলার গৌরব বাড়িয়ে ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান পাবেন। পঙ্কোজের সঙ্গে ডালহৌসি ক্লাবের ব্যাট্‌সম্যান আলেক্ গারবিসের নামও এখানে উল্লেখযোগ্য। ব্যাট্‌সম্যান হিসাবে তাঁরও ভবিষ্যত সমুজ্জ্বল বলে মনে হয়।

এদিকে পঙ্কোজ রায় যেমন ধীরে ধীরে বাংলার ক্রীকেট

জগতে নিজের স্থান করছেন অপর দিকে বাংলার খ্যাতনামা বোলার এন, চৌধুরীর খেলা তেমনি ক্রমশই পড়ে আসছে। তিনি তাঁর ক্লাবম্যাচগুলিতে সফলতার পরিচয় দিলেও রঞ্জি প্রতিযোগিতার মত প্রথম শ্রেণীর খেলায় আমাদের একেবারে হতাশ করেছেন। অবশ্য বাংলার অধিনায়ক ভ্যাণ্ডার গাচ্ অভিজ্ঞতার অভাবেই হোক বা অন্য কোন কারণে তাঁকে ঠিক মত খেলাতে পারেন নি বলেই মনে হয়। তবে চৌধুরীর ফর্ম আগের চেয়ে যে অনেক পড়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হয় প্র্যাক্টিসের দিকে বিশেষ ঝোঁক না দেওয়াই তাঁর এই পড়তির কারণ। কিছুদিন আগেও তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলারের সম্মান পেয়েছেন। আমরা আশা করি কেবলমাত্র গাফিলতির জন্য তিনি এই সম্মান এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা নষ্ট করবেন না।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দল

অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রীকেট দলের খেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এখন পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ সমেত আর অল্প খেলাই বাকী আছে। অষ্ট্রেলিয়া দলের শক্তির তুলনায় ভারতীয় দল যে কত পিছিয়ে আছে তার প্রমাণ টেষ্ট ম্যাচগুলিতেই পাওয়া যাচ্ছে। ভারতীয় দল ব্যাটিংএ কিছুটা কৃতিত্ব দেখাতে পারলেও বোলিংএর দিক থেকে একেবারে হতাশ করেছেন। ভারতীয় দলের ভাইস ক্যাপটেন বিজয় হাজারী ব্যাটিংএর দিক দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চতুর্থ টেষ্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে (১১৬ ও ১৪৫)। এ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এমন কি ব্র্যাডম্যান পর্য্যন্ত এই কৃতিত্ব এই মরশুমের আগে দেখাতে পারেন নি। এই মরশুমে মেলবোর্ণ টেষ্টে ব্র্যাডম্যান ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করে (১৩২ ও ১২৭ নট আউট) তাঁর বহু ব্যাটিং রেকর্ড মধ্যেকার এই ফাঁকটুকু ভর্ত্তি করেন। ১৯০৯ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ডব্লু, ব্রাডস্লি প্রথম এই কৃতিত্ব দেখান ওভাল মাঠে ইংলণ্ডের বিপক্ষে খেলে। ইংলণ্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফ ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের জর্জ্জ হেড্লি দু' দু'বার এই কৃতিত্বপূর্ণ একই টেষ্টম্যাচের উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ করবার গৌরব অর্জ্জন করেন।

বিজয় হাজারীর এই স্মরণীয় খেলাতে ভারতের ব্যাটিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড যে কত উন্নত তা পৃথিবীর ক্রীকেট জগতে প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু খালি বিজয় হাজারীর মতন একটিমাত্র ব্যাট্‌সম্যানকে নিয়ে একটি দেশের চলতে পারে না। আরও বিজয় হাজারীর প্রয়োজন আমরা এখন বোধ করছি বিশেষ করে বিজয় মার্চেণ্টের খেলার ভবিষ্যত যখন সন্দেহমুক্ত নয়।

অমরনাথও অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের উচ্চ ব্যটিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের পরিচয় দিয়েছেন ব্র্যাডম্যানের আগেই এই মরশুমে তাঁর ১০০০ রাণ পূর্ণ করে। মানকাদ ও কাদ্‌কারও ব্যাটিং কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে হতাশ করেছেন রঙ্গনেকার, যাঁর সম্বন্ধে অনেক আশাই আমাদের মনে ছিল। কিষেণচাঁদ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। রণবীর সিংজী, যাঁর খেলা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, তাঁকে না নিয়ে বোম্বাইএর কে, সি, ইব্রাহিমকে নিয়ে গেলে দলের শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেত বলে মনে হয়।

বোলিং শক্তিতে ভারতীয়দল যে কিরূপ দুর্ব্বল তার প্রমাণ এই অষ্ট্রেলিয়া সফরে বেশ পাওয়া যাচ্ছে। মানকাদ এবং কিছু পরিমাণে অমরনাথ ছাড়া আর কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট বোলারের পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। বাংলার বোলার এন চৌধুরীকে নিয়ে গেলে তাঁর 'কাটিং অফ্ ব্রেক্' সফরের গোড়ার দিকের বৃষ্টিসিক্ত অষ্ট্রেলিয়ান উইকেটে বিশেষ কার্য্যকরী হ'ত বলে মনে হয়। উইকেট রক্ষক হিসাবে পি, সেন বাংলার তথা ভারতের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন। ফিল্ডিংএ গুলমহম্মদ, অধিকারী ও রঙ্গণেকার তাঁদের ক্রীড়া-চাতুর্য্য দেখিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ফাষ্ট বোলারের অভাবই এখন ভারতীয়দল বিশেষ করে বোধ করছেন। ভাল ফাষ্ট বোলার ছাড়া প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য যে, হেরল্ড লারউড, মহম্মদ নিশার বা রে, লিণ্ডওয়ালের মত সত্যকারের ফাষ্ট বোলার এ দেশে বর্ত্তমানে নেই। এখন ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির প্রকৃত ফাষ্ট বোলার তৈরীর দিকে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ দরকার; তা' না হলে ভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণীর টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করা ভারতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। ভারতীয় ক্রীকেটের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়াতে হলে খেলার সর্ব্ববিভাগের উন্নতি করার আশু প্রয়োজন—বিশেষ করে বোলিংএর। আশা করি ভবিষ্যতে ভারতীয় ক্রীকেট কণ্ট্রোল বোর্ড এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

কবি নোগুচীর গান্ধী প্রশস্তি

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বীর, হে যোদ্ধা,
অপূর্ব্ব অচিন্ত্য তোমার রণ কৌশল
মাটির মরীচিকা নিয়ে তোমার সংগ্রাম নয়
বহু উর্দ্ধে তার স্থান
স্বর্গ তোরণের স্বর্ণ কেতনের কনক কান্তিতে সমুজ্জ্বল।

তোমার জয় অবধারিত,
হয়ত তা এখনও পুর্ণ প্রকট নয়
তবু সে বিষয়ে সংশয়ের অবসর নেই
হবে জয়, জয় সুনিশ্চিত।
তোমার নব পাঞ্চজন্যের তুর্য্যনাদ
নরকোর্ম্মির ধারেও পাপীতাপীদের আশ্বাস দেয়—
একক্ নিরস্ত্র হে অভী!
তুমি অনাগতদিগকে আহ্বান করেছো দৈবরথে
উত্তরের প্রতীক্ষায়
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছো
শান্ত সমাহিত অহিংস।
ক্ষীণ শীর্ণ তনু তোমার
কিন্তু কী বিশাল প্রাণের আধার,
কী বিপুল বিরাট্ বিস্ময়
হে মহান্ আত্মা—
তোমার বীর্য্যে পৃথিবী প্রকম্পিত।

যে প্রেমের দাবী আজও অবজ্ঞাত, অপমানিত
জীবনের যে অধিকার আজও ধুলায় লুণ্ঠিত লজ্জিত -
শ্রমের যে অর্জ্জিত মর্য্যাদা আজও মূল্যহীন্ মান-বর্জ্জিত
তারাই আজ বিদ্রোহে মূর্ত্ত হয়েছে তোমার মধ্যে।
শত অত্যাচার ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে
তোমার কণ্ঠে ধ্বনিত রণিত হয়েছে
তাদেরই উজ্জীবন্ মন্ত্র!

জয় হোক্ তোমার
জয় হোক্ সাধু বিচারের
ন্যায়নিষ্ঠ ভগবানের।
ধাত্রী ধরিত্রীর শ্যামল ক্রোড়ে তুমি
দুঃখ-রাঙা জীবন-বেদের গাথা গেয়েছো।
তোমার চেয়ে জ্বলন্ত দেশভক্ত আর কে আছে?
হে সত্যসন্ধানী, তুমি চলেছো একাকী
দুর্য্যোগ রাত্রির ঝঞ্ঝা তোমায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি।
আত্মরতি তুমি চাওনি
তোমার চেয়ে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা আর কে আছে?
হে পথিক্ যাযাবর
চিরযাত্রী তুমি, অনন্তের রথে
দুঃখদৈন্য ক্ষুৎক্লান্ত নিঃসীম পথে—
তোমার প্রণতি।

(শ্রীরাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত "মহাত্মা গান্ধী" প্রশস্তিতে প্রকাশিত কবিতার সারাংশ অবলম্বনে)

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী— শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়

মহালক্ষ্মী

চৈত্র—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চত্রিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

বাপুজী

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুপ্তির তিমিররাত্রে কে জ্বালিল মুক্তির মশাল
শ্মশানের প্রেতভূমে কে করিল জীবন-সাধনা,
শবের শীতল-বক্ষে সঞ্চারিল প্রাণ-উন্মাদনা
মৃত্যুমগ্ন মাতৃভূমি অকস্মাৎ উৎকণ্ঠ উত্তাল। *
আরণ্যক আফ্রিকায়, নীলোর্মির পরপার হতে
হে সন্ন্যাসী অগ্নিমন্ত্রে বিঘোষিলে লাঞ্ছিতের জয়
দুঃখের তামস ভেদী দেখা দিলে তুমি জ্যোতির্ময়
উদীচি-প্রতীচি-প্রাচী ভেসে গেল এক মহাস্রোতে। *
'দিনগত পাপক্ষয়'—ছায়া মূর্তি আমরা মানুষ,
দুরন্ত আশার ঢেউ জীর্ণ বুকে ব্যর্থ ভেঙে পড়ে,
সহসা শিহরি' উঠি রক্তমেঘ-সংকেতিত ঝড়ে—
মুহূর্তে ফাটিয়া যায় কল্পনার বিলাসী ফানুষ। *
চম্পারণে দেখিলাম 'অভীঃ' মন্ত্রী তুমি পুরোহিত
ডাণ্ডীর সমুদ্র পথে অর্ধনগ্ন তুমি সত্যাগ্রহী,
আমাদের যত পাপ নীলকণ্ঠ একা নিলে বহি'
আমরা দাঁড়ানু উঠি—মুগ্ধ বক্ষে জাগিল সম্বিৎ। *
ঘন হয় অবিশ্বাস, ক্ষমতার দ্যূতক্রীড়া চলে,
বিষাক্ত কুটিল হিংসা শান দেয় নগ্ন ছুরিকায়
বিহার-পাঞ্জাব-বাংলা ভেসে যায় হত্যার বন্যায়
ধর্মধ্বজী স্বার্থ হাসে চক্রান্তের সুড়ঙ্গের তলে। *
তার মাঝে একা তুমি হে মৈত্রেয় অহিংস-তাপস,
প্রেম-মন্ত্রে নিবারিলে সমুদ্যত হিংস্রতার ফণা—
মিলনের ঋক্-ছন্দ দিকে দিকে করিলে ঘোষণা
পূর্ণ হল মুক্তিব্রত—স্বাধীনতা হল আত্মবল। *
তোমারে হেনেছি তবু, করিয়াছি পিতৃরক্তপাত—
চিরন্তন ইতিহাসে কলঙ্কেরে করিয়াছি জমা—
পৃথিবী করুক ঘৃণা, তবু তুমি করে যাও ক্ষমা
তোমার মৃত্যুতে পিতা, শেষ হোক যত আত্মঘাত।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

৩০শে জানুয়ারী বিকেলে ঘরে বসে আমি ও অরুণবাবু কংগ্রেস কন্‌ষ্টিটিউশনের খসড়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম। খসড়াটি সেই দিনই প্রাতে পেয়েছি—মহাত্মা গান্ধীর তৈরী খসড়া। দুইদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমাদের প্রায় দুঘণ্টা আলোচনা হয় কংগ্রেস গঠনতন্ত্র নিয়ে—তারই ফলে তিনি খসড়া তৈরী করে পাঠিয়েছেন আমাদের বিচার-বিবেচনার জন্যে। আমি অরুণবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছি এই জন্যে যে, সেদিনই রাত্রে ৯টায় আমাদের গঠনতন্ত্র কমিটির মিটিং রয়েছে। সেই মিটিংএ মহাত্মার তৈরী খসড়া বিচার-বিবেচনা করে আবার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হ'লে তা সেরে রাখতে হবে তিনি ২।৩ দিনের মধ্যে। তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন ৩ তারিখে ওয়ার্ধা চলে যাচ্ছেন। ফিরে আসা ১৪।১৫ তারিখের আগে হবে না।

বসে আলোচনা করছি এই সময় আমাদের কংগ্রেস জাতীয় বাহিনীর জীবন এসেছে দেখা করতে—সে কলকাতায় চলে যাচ্ছে পরদিন প্রাতে। তাকে একটু বসতে বল্লাম। হাতের কাজটা শেষ করে নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইব। তখন বোধ করি সাড়ে পাঁচটা কি পৌনে ছ'টা হবে, এক বন্ধুর কাছ থেকে টেলিফোন এল,—মহাত্মা গান্ধীকে একজন শিক্ষিত হিন্দু গুলি করে মেরে ফেলেছে—পর পর তিনটি গুলি করেছে। ঘরের সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল 'কি সর্ব্বনাশ হ'লো!'

মুহূর্ত্তের মধ্যে চোখের সব জ্যোতি যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। রাস্তায় জনতার স্রোত চলেছে বিড়লার বাড়ীর দিকে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত ও অরুণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মত আমরা সেই রাত্রে বিড়লার বাড়ী গেলাম, ফিরে এলাম এবং পরদিন জন মহাসমুদ্রের মধ্যে যমুনার তীরে সারাদিন কাটিয়ে মহাত্মার দেহ ভস্মীভূত হবার পর রাত্রে বাড়ী ফিরে এলাম। দাঁড়িয়ে দেখেছি চোখের সামনে—তাঁর নশ্বর দেহ ক্রমে ক্রমে ভস্মীভূত হ'লো। কিন্তু অনুভূতিতে উপলব্ধি হচ্ছে তিনি রয়েছেন। তিনি নাই বারবার বুদ্ধি তাই নিয়ে আপশোষ কচ্ছে, ম্রিয়মান হচ্ছে, অথচ অন্তরের অনুভূতিতে তিনি তেমনি সত্য হয়ে আছেন যেমন পূর্ব্বে ছিলেন। মনে হ'লো গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন "নমে ভক্ত প্রণশ্যতি" আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। শ্রীভগবানের বাণীর মর্ম্ম অনুভব করতে থাকলাম। 'নমে ভক্ত প্রণশ্যতি' মহাত্মা মরেন নাই—তিনি বেঁচে আছেন ভারতের সকল নরনারীর চিত্তে।

এক বৎসরের কিছু অধিককাল যাবৎ নোয়াখালী আসবার কিছু আগে থাকতে মহাত্মাকে বারবার বলতে শুনেছি—আরও অনেকে শুনেছেন—বাংলার উপর তাঁর ভরসার কথা। তাঁর নিজের ভঙ্গ নিয়ে তিনি বলেছেন "বাংলা জাগলেই ভারত জাগবে।" বাঙ্গালী ভারত আত্মাকে জাগাতে পারলেই ভারত তার আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পাবে—আর সেই ভারতবর্ষই হবে জগতের পথপ্রদর্শক। আজকের এই হিংসা ও ক্রুরতার মধ্যে নিমজ্জমান বিশ্ব-মানব-সমাজকে অমৃতময় মানবজীবনের সন্ধান দেখিয়ে দেবার মহান দায়িত্ব বিধাতা ভারতবর্ষের স্কন্ধে অর্পণ করে রেখেছেন। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে সেই অমৃতের অধিকারী করে তোলবার জন্য অলক্ষ্য থেকে বিধাতাপুরুষ কাজ করে চলেছেন। ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র এসেছিলেন—একবার অসামুদ্র হিমাচল—সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি সেই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করে একসূত্রে বেঁধে রামরাজ্যের গোড়া পত্তন ক'রে গিয়েছিলেন। রক্তমাংসের মানুষ একটানা সেই আদর্শ নিয়ে বেশী দূর এগোতে পারল না। বিধাতাপুরুষ কিন্তু ভারতবাসীকে ত্যাগ করলেন না। আবার এলেন শ্রীকৃষ্ণ, আবার ভারতবর্ষ তার সাধনা ফিরে পেল—শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে আত্মসম্বিৎ তার ফিরে এলো। আবার পড়ে গেল ভারতবর্ষ তার আদর্শ থেকে—আবার এলেন বুদ্ধ—আবার ভারতবর্ষ এগিয়ে চললো বিশ্বমানবের জন্য তার বার্ত্তা নিয়ে। আবার পড়ে গেল—এলেন শঙ্করাচার্য্য—এবার ভারত কিন্তু তার নিজের আত্মচেতনা আর

ফিরে পেলো না। যে শঙ্কর ৩২ বৎসর বয়সে পায়ে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করলেন—সমস্ত শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করে তার ভাষ্য, টিকা, টিপ্পনী লিখলেন ভারতবর্ষের আত্ম-চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য, ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য—সেই ভারতবাসী ঠাউরে নিলে শঙ্কর বলেছেন সংসার মিথ্যা—একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। কেউ ভাবলে না একবার যে এই মহামানব সংসারটাকে যদি একটা মায়া, মিথ্যা দুঃস্বপ্ন বলেই জেনেছেন, তাহ'লে সেই দুঃস্বপ্নের জন্য এত মাথা ব্যথা কেন? কেন সমগ্র ভারত প্রদক্ষিণ করা —কেনই বা মঠস্থাপনা, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তৈরী করা, কেনই বা শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করা। একটা দুঃস্বপ্নের জন্য এত সব কাণ্ড অতি বড় পাগলেও করে না। ভারতবর্ষের পতনের জের তখনও ব্যাহত হয় নাই। এলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তিনিও কেঁদে কেঁদে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন—কেউ চিনতে পারল না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ বলে গেছেন—মহাপ্রভুর সমজদার মাত্র ছিলেন সাড়ে তিনজন।

ভারতবর্ষ দুর্দ্দশার চরমের দিকে এগিয়ে যেতে থাকল। সর্ব্ব পাপের মধ্যে প্রধান পাপ পরাধীনতা এসে গ্রাস করল আমাদের।

পরাধীনতার মহাপঙ্কের মধ্যেও বিধাতা পাঠালেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে, পাঠালেন বিবেকানন্দকে—এলেন আমাদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাপ্রাণ দেশবন্ধু, পেলাম আমরা ভারত-আত্মার বাণী মূর্ত্ত শ্রীঅরবিন্দকে—আর ভারতের জনতার চিত্তে চিরন্তন অমর ভারত-আত্মাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলবার জন্য আমরা পেলাম আমাদের মধ্যে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীকে।

মহাপুরুষ যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন সে জাতি ভাগ্যবান সন্দেহ নাই। যে ভূমিতে বারবার মহাপুরুষ আসেন সেই ভূখণ্ড পবিত্রের চাইতেও পবিত্রতম সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতি যদি আপন নিয়ন্তাকে না চেনে, তা হ'লে সে মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তও নিদারুণ হয়।

ইহুদীরা খ্রীষ্টকে মানবের পথপ্রদর্শক বলে চিনতে পারল না। তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মারল, আর সেই যুগের ইউরোপীয় বর্ব্বরেরা হায় হায় করে কেঁদে উঠল সেই নিদারুণ সংবাদে যে মহামানব ভগবানের পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইহুদীরা আজও সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে চলেছে, আর ইউরোপের সেই বর্ব্বরেরাই পৃথিবীর নেতৃত্ব পেয়েছিল।

ভারতবর্ষ শঙ্করকে না চিনে, মহাপ্রভুকে না চিনে, মহাপাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত করেছে। ভগবানের অপার অনুগ্রহ পিতৃপুরুষের অজস্র তপস্যার ফলে সেই সব পাপের বোঝা আমাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন—ভারতবর্ষকে পরাধীনতার পাপ থেকে মুক্ত করে—স্বাধীন করে দিয়ে গেলেন শ্রীভগবানের বরপুত্র নিষ্ঠার অবতার, কর্ম্মের প্রতীক, অহিংসার মূর্ত্ত বিগ্রহ মহাত্মা গান্ধী। জীবনে যা দিয়ে গেছেন তিনি, আততায়ীর হস্তে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দিয়ে গেছেন তার লক্ষ গুণ। মহাত্মার জয় হোক্, ভারতের জয় হোক্, বিশ্বমানবের জয় হোক্।

উপসংহারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উপন্যাস গ্রন্থের ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি'তে তুলে দিয়েছেন, সেইটি আলোচনা ক'রে কথা শেষ করছি।

রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চ'লে চ'লে ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রামের জন্য ঘরে ফিরে চলেছেন, তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র পর-পর পাঁচবার তাঁকে বললেন—

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর শ্রীর অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠজন হলেও ক্রমে নীচ (পাপ) হতে থাকে, অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক থেকেও তার অপূর্ব শোভা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তার আত্মা দিনে-দিনে বিকশিত হতে থাকে, এই তো মস্ত ফল। তারপর তার চলার শ্রমে চলবার মুক্ত পথে তার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হয়ে পড়ে শুয়ে। পাপের সমস্যার জন্য আর তার বৃথা মাথা ঘামাতে হয় না। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে বসে থাকে তার ভাগ্যও থাকে বসে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও চলে এগিয়ে। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"কলি শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

ঘুমিয়ে থাকাটাই হ'ল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই হল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমানাং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি।

চলাটাই হ'ল অমৃতলাভ, চলাটাই তার স্বাদু ফল, চেয়ে দেখো ঐ সূর্য্যের আলোক সম্পদ, যে সৃষ্টির আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়েনি। অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

রাষ্ট্র পিতা! জেগে ওঠ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যুগে যুগে বাণবিদ্ধ ক্রুশবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ হয়ে
মানব কল্যাণে তুমি আপনারে করে গেলে দান।
হে ক্ষমা সুন্দর শিব! দুর্বিষহ অত্যাচার সয়ে
দ্বন্দ্ব-দ্বেষ হলাহল হাসিমুখে করিয়াছ পান।
মানবের প্রতি তব এত কৃপা! এত ভালোবাসা!
জীবের বেদনা লয়ে শিশুসম করেছ ক্রন্দন।
তোমার রচিত পৃথ্বী তোমাতেই পেলো ভাব-ভাষা,
হে অসীম! লীলাচ্ছলে নিয়েছ যে সীমার বন্ধন।
অন্ধ যেথা রচিতেছে নিখিলের দুঃখ ইতিহাস
স্বার্থোদ্ধত দানবীয় অত্যাচারে হিংসা-রাত্রিতলে:
তুমি সেথা আলো দিয়ে আপনারে করেছ প্রকাশ
শান্তি প্রেম সাম্য মৈত্রী শুনাইতে নর-পশুদলে
মৃত্যুরে করিয়া ভৃত্য দেখাইয়া অনন্ত বিভূতি:
লীলার মাহাত্ম্য বটে! দানবেরে করিয়াছ স্তুতি।

এবার এসেছ তুমি দ্বাপরের লীলাক্ষেত্রে তব
গুর্জ্জরের মৃত্তিকায় মর্ত্ত্যকায়া রচিয়া আবার;
সভ্যতা সঙ্কট পথে অবতার রূপে অভিনব,
প্রতীকারহীন রাত্রি দিন যেথা চিত্ত হাহাকার
মর্ম্মান্তিক বেদনারে করিছে বিস্তার—সে ভারতে
সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চীর বাস পরি' শীর্ণ দেহে
করিয়াছ ত্রাণ শৃঙ্খলিতা জননারে কারা হতে।
ঐশ্বর্য্যেরে তৃণসম ঠেলে দিয়ে রহি পর্ণ গেহে
সমাজে পতিত যারা রাজপথ-কুক্কুরের সম
তাদের টেনেছ বুকে করুণায় হে পুরুষোত্তম!

তুমি কি দিবে না সাড়া? চিতাবহ্নি জলে যমুনায়,
প্রার্থনা-প্রাঙ্গণে আসি হৃদয়ের কাঁদে কিশলয়!
কীর্ত্তির হিমাদ্রি তব বৈজয়ন্তী-সঙ্গীত শুনায়
কথা কও! কথা কও! হে প্রেমিক! নির্ভীক দুর্জ্জয়!
দিনে দিনে নব নব রূপে তুমি পরিক্রমা করি'
নিখিলের চিত্ত তটে বেণু তব বাজায়েছ বসে;
বর্ষে বর্ষে ঋতুগণে লাবণ্য দিয়েছ তনু ভরি'
শত শত শতাব্দীর অশ্রুসিক্ত বিস্মৃত প্রদোষে।
নহেক সম্ভব কভু বহ্নি দিয়া বহ্নি নির্ব্বাপন,
এই সত্য প্রচারিয়া অহিংসায় করেছ সাধন।
ভারতের হে ভাগ্য বিধাতা! জাতির জনক তুমি,
অশোক কানন হ'তে জানকীরে করেছ উদ্ধার।
তোমার প্রয়াণে আজি ভাগ্যহীনা মোর জন্মভূমি,
জন্ম যবনিকা প্রান্তে নেমে এলো ঘন অন্ধকার।
নিঃশব্দে চরণ ফেলে চলে গেলে অভিমান করে,
করাল নিশীথ ছায়ে বিভীষিকা বিষায়েছে বায়ু:
বিষণ্ণ হোলো যে বিশ্ব, ধরণীর পূর্ব্ব দ্বারে ঝরে
অশ্রুধারা অবিরল—আজ তুমি কোথা অমিতায়ু?
এখনো ঘাতক বৃন্দ এ রাষ্ট্রের রক্তলোভাতুর,
রাষ্ট্র পিতা! জেগে ওঠ, কাণ পেতে শোনো আর্ত্তসুর!

শ্রেষ্ঠ মানব

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী—এ বিশ্ববাণীমুখর আজ নর-জগত। প্রিয়জন-বিরহে আবেগের উৎস-মুখ হ'তে যশোগান উদ্বুদ্ধ হয়—আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব স্বর্গতের গুণকীর্তন করে, গুণাবলী একটু অতিরঞ্জন করে। সে অত্যুক্তি অশোভন বা মিথ্যা নয়। কারণ সে কথা শোকাচ্ছন্ন ভাবপ্রবণ চিত্তের উচ্ছ্বাস। চিতার আগুন মিত্রের বহু দোষ ভস্মীভূত করে। আবার ক্ষেত্র বিশেষে শত্রুর গুণরাশির বিলোপ করে।

আত্মীয় বিয়োগ চোখে যে জল আনে, তা পবিত্র। সে শোক নিবিড় ও গভীর। নিজের লোকের তিরোভাব-জনিত মর্মব্যথা একান্ত নিজস্ব। মানুষের জীবনের কর্মধারা হয়তো পরিবর্তিত হয়, ব্যাহত হয় পরমাত্মীয়ের বিয়োগে। শোকার্তের পূর্ণ সত্তাকে অভিভূত করে সে বিরহ-বেদনা।

শ্রেষ্ঠ মানবের মহাপ্রয়াণ বিশ্বের শোক। তেমন শোক মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করে। মানুষের মনকে নিজের স্বার্থের কূপ হ'তে উদ্ধার করে। তার সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে বিস্তার করে। সে শোকাবেগের অন্তরালে থাকে বিচারবুদ্ধি—একের নয় বহুর সিদ্ধান্ত। কলাকাষ্ঠাদিরূপে পরিণামপ্রদ কালেরও সীমার রেখা প্রলম্বিত হয়। প্রায় কুড়িশতক পূর্বের দুরন্ত দুর্ঘটনা, প্রভু যীশুর নির্যাতন আজিও বিশ্ববাসীর পূতচক্ষু অশ্রুপ্লুত করে।

বিশ্বজনের নিবিড় শ্রদ্ধা মাত্র তো আবেগ নয়। মহাত্মার মহাপ্রয়াণের শোক বিচারমূলক উচ্ছ্বাস। এর ব্যাপ্তির অন্তরে অবশ্য হারাণোর স্বার্থ-বোধ আছে। কিন্তু যে স্বার্থের গণ্ডী বহুকে বেষ্টন করে, সে স্বার্থের পটভূমি পরার্থবোধ। দেশের কি হবে, দশের কি হবে, জগতের কি হবে, এ যুগের ও অনাগত যুগের মানব জাতির কি দুর্দশা হবে—এ সব ভাবনা আছে মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাব-জনিত মনোবেদনার অন্তরালে। তাই এই বিশাল শোকোচ্ছ্বাস মানুষের আত্মাকে প্রসার করেছে, বসুধার সকলকে কুটুম্ব ভাবতে শিখিয়েছে, মানবপ্রকৃতিকে ঊর্দ্ধ জগতে উঠিয়েছে। মহাপুরুষ জীবনে যে আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে চান, তাঁর মরণে সে আদর্শ আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়। সজ্জনের ক্ষণেক সঙ্গতিও তাই ভবার্ণব তরণের নৌকা। সে সঙ্গ দেহের সঙ্গ নয়, ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য নয়; সে ভাবের ছোঁয়াচ, মহান্ উদ্দেশ্যের অনুভূতি। একের ভাবনা অন্যের মনকে বিঁধতে পারে। মহাজনের মহচ্চিন্তা বহুর অন্তর ভেদ ক'রে আপনাকে বিকশিত করে, দেশ, কাল, পাত্রের বেষ্টনীর বিলোপ সাধন করে। মহাত্মা গান্ধী বহুর চিত্তাসনে ভাবরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠতার এ এক লক্ষণ।

মহাত্মা গান্ধী মানব ছিলেন। অন্তরে মহাপুরুষ ছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু মানুষের মত সুখ দুঃখ, ভুলভ্রান্তি, সাফল্য নৈরাশ্যের অনুভূতি নিয়ে জন্মেছিলেন। সকল লোকের মত তিনি আবেগ, বিচার, শুদ্ধতা এবং কর্মক্ষমতা নিয়ে জীবন-পথে বিচরণ করেছিলেন। প্রত্যেক জীবনধারা যেমন ভাবে বহে, মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের স্রোতও তেমনি ভাবে বহেছিল। তাই বিশ্ব মানুষ তাঁকে নিজেদের একজন জেনে, তাঁর সাথে কুটুম্বতার গৌরব স্পর্দ্ধায় আপনাকে উন্নত ভাবছে। যার জন্মে বংশ সমুন্নত হয় সে অভিজাত। তাই আজ চিন্তাশীল ও ভাবপ্রবণ, বিজ্ঞ ও অজ্ঞ, সকল মানুষ তাঁকে বিশাল মানব-কুলের মানুষ জেনে নিজেকে কুলীন ভাবছে। জ্ঞানদীপ্ত পণ্ডিত, আর যুগ-যুগান্তর নির্যাতীত ভাঙ্গী উভয়েই গান্ধীজির পরমাত্মীয়। সেদিন তারা উভয়ে একই শ্মশান-তীর্থে মহাত্মার দেহাবশেষের উপর পবিত্র অশ্রুধারা বর্ষণ করেছে। ইহাই গান্ধীজির মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের বিরাট প্রমাণ।

গান্ধীজি আদর্শবাদী ছিলেন। বলেছিলেন জগতকে ভালোবাসো, অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো। বরণীয়, স্মরণীয় বহু সাধু, সন্ত, অবতার, পয়গম্বর তেমন কথা বলে গেছেন। আমার মাত্র স্বকর্ণে আজ সে ধ্বনি শুনিনি। অন্তরে অন্তরে, মজ্জায় মজ্জায় বুঝেছি, বিচার করে দেখেছি, প্রমাণ পেয়ে উপলব্ধি করেছি যে ক্ষমা করো, বিদ্বেষ-বিষ নাশো, মাত্র আদর্শবাদীর নীতি কথা নয়।

এগুলি বাস্তব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার নিয়ম। অসাধ্য সাধনায় জপ মন্ত্র নয়, অহিংসা শব্দটি। এমন মানুষ আমাদেরই মাঝে ছিলেন যিনি এই মন্ত্র সাধনায় অমোঘ ফল লাভ ক'রে মাহাত্ম্য অর্জন করেছেন। ভাব ও কর্মের সমন্বয় সম্ভবপর, ভাব যতই কেন সুউচ্চ হ'ক না। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ মানব।

গান্ধী-নীতির বিপরীত কর্মপদ্ধতি সত্যানুসন্ধী মানব সমাজে নিজের পরাজয় সপ্রমাণ করেছে। হিংসাবাদের ধ্বংসের উপর অহিংসা নীতি ধীরে ধীরে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট।

কায়মনোবাক্যে মানুষকে অহিংসা মন্ত্রের সাধনা করতে হবে—নীতি বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-হিসাবে এ বিচার উৎকৃষ্ট। এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল। চিরদিন এ তত্ত্বকে মানুষ ব্যক্তি-ধর্মের মূল হিসাবে স্বীকার করেছে। এ মন্ত্র সাধনার জন্য সাধুরা সঙ্ঘ রচনা ক'রে, আসুরী ভাবপূর্ণ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেছেন সব দেশে, সকল যুগে। বৌদ্ধ খৃষ্টীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মের সার এই অহিংসা নীতি। নিজ নিজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সজ্জনেরা মঠ, মোনাষ্টারী, নানারী প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। অহিংসা মন্ত্রের গৃহী সাধকও সাধ্যমত সংসারের কুৎসিৎ কলহ-মুখর দিক্ হতে আপনাকে দূরে রাখবার চেষ্টা করত। বৈষ্ণব গৃহীর আদর্শ ছিল—মেরেছ কলসীর কানা—তা বলে কি প্রেম দিব না।

সনাতন নীতি, সাম্যবাদ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র স্বাধীনতা উচ্চ আদর্শ। যার দেহ মন সামাজিক বিরুদ্ধধর্মী শোষকের ইচ্ছাধীন, তার পক্ষে কোনো সাধনা সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যে এ আন্দোলন কয়েক শতকে শুভফল লাভ করেছে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার—এ নীতিতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে অষ্টাদশ শতকে ফরাসী, মার্কিন, ইতালী প্রভৃতি দেশে নর-শোণিতের স্রোত বহেছে। এ দেশের কবিরাও নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গীতে বুঝিয়েছেন—স্বাধীনতাহীন জীবন মৃত্যুর নামান্তর। বহু শহীদ স্বাধীনতা সংগ্রামে—রক্তের বদলে রক্ত দিয়েছেন ও নিয়েছেন।

সমষ্টিরূপ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অহিংসাবাদের সাধনায় লাভ করা যায়, এ সত্যের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। এই তাঁর বিশেষত্ব, এইটি তাঁর সত্যপথের পরীক্ষা। যা' ব্যষ্টির পক্ষে সম্ভবপর, সে নীতি সমষ্টির হিতকর এবং আয়াসসাধ্য—এই গান্ধী নীতি ধীরে ধীরে দেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নিরত হ'ল। গান্ধী মহাত্মা। মহাজন যে পথে চলে, সেই পথ—তাঁর দেশের প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বের বর্ণিত এ নীতি তিনি মানতেন। কিন্তু এ পথের মহাপুরুষ কোথায়? তিনি তাঁর গুরুজী রবীন্দ্রনাথের উদাত্তস্বর শুনলেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলোরে। তিনি বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একেলা চললেন। তিনি পথ আবিষ্কার করলেন—তাঁর প্রদর্শিত পথ হ'লো মহাজনের পদরজঃপূত পথ। তিনি মন্ত্র দিয়ে ক্ষান্ত হ'লেন না। নশ্বর শরীর পতনের আশঙ্কা তাঁকে মন্ত্রের সাধনার ক্লেশ হ'তে বিরত করলে না। তিনি আদর্শ নেতার মত জনতাকে বল্লেন—এসো, পিছনে এসো। পিছনে থেকে তিনি অগ্রসর হ'তে আজ্ঞা দিলেন না কাকেও।

অহিংসা এবং সশস্ত্র বিদেশীর কবল হ'তে নিরুপদ্রবে দেশোদ্ধার অসম্ভব—এ দুটি পরস্পর বিরোধী নীতির সমাধান করলে গান্ধী নীতি। যুদ্ধ শেষ করবার যুদ্ধ নতুন ক'রে সমর শিখা জ্বালাবার ইন্ধন সংগ্রহ করেছে। গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনী সবাই যুদ্ধ ক'রে, রক্তের পথে জয়যাত্রা ক'রে স্বাধীনতা অর্জন ক'রেছিলেন। যাঁরা সে সমরে জীবন দান করলেন, বিজয়ের দিন এ মর-ভূমিতে তাঁরা স্বাধীনতার সুফল উপভোগ করতে পারলেন না। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ শান্তিতে স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতভূমির। বহু শহীদ প্রাণ বিসর্জন করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে রক্ত-লোলুপতা পরাস্ত করেছে বিপক্ষ শোণিত-পিপাসুকে। গান্ধী-অনুসৃত প্রতিহিংসা বিষ ছড়ায়নি জগতে। অথচ অহিংসা-নীতি সাফল্য লাভ করেছে স্বাধীনতা অর্জনের সফল সংগ্রামে।

গান্ধীত্ব যে শ্রেষ্ঠ নীতি সে কথা সকল মানুষ বুঝবে গত মহাসমরের ইতিহাস পর্য্যালোচনায়। অসংখ্য লোকক্ষয় হয়েছে, অজস্র অর্থনাশ হ'য়েছে, অথচ বিসম্বাদের বীজ বিনষ্ট হয়নি, কোনো যোদ্ধার কামনা সিদ্ধ হয়নি। আজ জগতব্যাপী বুভুক্ষা অনাহার এবং অনির্দেশের

কুহেলিকায় ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন। তাই বিচারবুদ্ধি যাচাই-করছে অহিংসার আদর্শ। চির-লাঞ্ছিত, প্রবলের অবহেলা-জর্জরিত নিঃসহায়, গান্ধীজির মহান্ অন্তঃকরণের অকৃত্রিম সৌহার্দ্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। চিন্তাশীল বুদ্ধিমানের জগত তাঁর নীতির প্রোজ্জল জ্যোতিতে স্তম্ভিত। আর এই উভয় শ্রেণীই লক্ষ্য করেছে যে গান্ধীজির নীতি সুধা মাত্র বচন সুধা বা শাস্ত্রের সূত্র নয়। এ আদর্শ বাস্তবে পরিণত করবার জন্ম মহাত্মা নিজের শক্তিকে আপ্রাণ নিয়োজিত করেছিলেন। কথা ও কাজের এমন সমন্বয়, দেহের সচ্ছন্দতার কঠোর নির্বাসন মানুষের চিত্তকে বহুযুগ এমন বন্দী করেনি। তাই আজ সারা বিশ্বের অন্তরের জ্যোতি কেন্দ্রীভূত সে তপঃক্লিষ্ট, ক্ষীণতনু-হাস্য মুখ, প্রফুল্ল-চেতা, পরার্থপর, জ্ঞান যোগী, কর্ম যোগী, ভক্তি যোগীর মহাপ্রয়াণের অকরুণ পথে।

আর তাঁর দেহের নিধন? নিদারুণ মর্মভেদী, পৈশাচিক লীলা! জগত তাই সমকণ্ঠে বিস্ময়ে, বিষাদে, ক্ষোভে ও বেদনায় তাঁর বর-মুখের শেষ কথায় প্রতিধ্বনি করে বলছে—হায় রাম।

মহাবলি

নরেন্দ্র দেব

তোমারে যে হত্যা করিয়াছে
তার'পরে করিব না ক্রোধ
অপরাধ কত গুরুতর
জেনেও লব না প্রতিশোধ।
তুমি বলিয়াছো বারে বারে
দোষীরে করিতে হেসে ক্ষমা,
অন্তরেতে বিরাগ বিক্ষোভ
তিলমাত্র না রাখিতে জমা।
তোমার শ্রীমুখে প্রতিদিন
শুনেছি এ অমোঘ নির্দ্দেশ—
'ভালবেসে শত্রু করো জয়,
দাও তারে প্রেমের আশ্লেষ।'

জানি জানি তোমার সে বাণী
কেহ মোরা করিনি পালন,
লজ্জা মানি মনে পড়ে যেই
আমাদের শূন্য আস্ফালন :—
অহিংসা ভারুর ক্লৈব্য নীতি,
বীর-ধর্ম্ম—শত্রুর বিনাশ ;
ক্ষমার যে যোগ্য নহে তারে
ক্ষমা করা মহা সর্ব্বনাশ!

প্রতিহিংসা জীবের স্বভাব,
আঘাতের প্রত্যাঘাত চায়,
রুদ্ধ রোষে তারা ফোঁসে যারা
একান্ত দুর্ব্বল নিরুপায়!

তুমি শুনে স্মিত হাস্যে শুধু
বলেছিলে—ভ্রান্ত মোর ভাই,
অহিংস সৈনিক হ'তে হলে
অপ্রমেয় বীর্য্য থাকা চাই!
উদ্যত নিধনে আততায়ী,
অস্ত্রমুখে অগ্রসর হ'য়ে,
বুক পেতে দিতে হবে তাকে
অকম্পিত নির্ভীক হৃদয়ে!
তুমি ছিলে হেন শ্রেষ্ঠ বীর,
আপন আদর্শে অবিচল,
প্রাণ দিলে প্রেমের প্রচারে,
মৃত্যু তব হবে কি নিষ্ফল?

সৃষ্টির অনাদি কাল হ'তে
জগতে চলেছে হানাহানি,

সেই হিংসা বর্ব্বরতা ’পরে
মহামানবেরা দেছে টানি
যুগে যুগে প্রেম যবনিকা,
বলেছে বাসিতে সবে ভালো,
ছড়ায়েছে জ্ঞানদীপ জ্বালি
শান্তির নির্ম্মল শুভ্র আলো।
নতুবা প্রভেদ রহে কোথা
অরণ্যের পশু সাথে তার,
সভ্যতার সেই ত সাধনা—
স্বভাবের উর্দ্ধে উঠিবার।

তোমার এ হত্যা নহে কভু
অভাবিত দৈবাপদ কিছু,
ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কোনো
আক্রোশ নাহিকো এর পিছু।
অস্তাচল পথযাত্রী তুমি
জীবন সায়াহ্নে অকস্মাৎ—
তব হত্যা ইতিহাসে পুনঃ
রচি দিল আদর্শ সংঘাত।

হিংসা আর অহিংসার মাঝে
ধরণী দুলেছে বার বার,
বুদ্ধ খৃষ্ট জৈন মহাবীর
শ্রীচৈতন্য সাক্ষ্য বহে তার।

জীবন ধারণ করি মোরা
লক্ষ প্রাণী হরি’ নিশিদিন,
যুদ্ধ আর হত্যা পাপ কিনা—
প্রশ্ন ইহা শাশ্বত প্রাচীন।

সহস্র শতাব্দী গেছে ধীরে
অনন্ত কালের গর্ভে ডুবে,
দেবতা অসুরে যুগে যুগে
যুঝিয়াছে পশ্চিমে ও পুবে;
সমস্যা ঘোচেনি তবু আজো,
মেলেনি সংশয়ে সমাধান,
সে দ্বন্দ্ব মেটাতে কিগো আজ
দিলে নিজ প্রাণ বলিদান?

আমি সুখী হয়েছি

শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর মৃত্যুতে আমি সুখী হয়েছি।

আমার এই লাইনটা অনেকের শ্রবণে সূচীবিদ্ধ করবে—প্রাণে ধরাবে জ্বালা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে এত বড় নির্ম্মম উক্তি করা বুঝি বাতুলের পক্ষেই সম্ভব।

আমার বলবার কথা: নোয়াখালীর ঘটনা থেকে সুরু করে অধুনা কাশ্মীরের চলতি ঘটনার কথা স্মরণ করুন। হাজার হাজার ধর্ষিতা নারীর চাপা দীর্ঘশ্বাস, লক্ষ লক্ষ পতিপুত্র হারার আকুল ক্রন্দন, কোটী কোটী গৃহহারার করুণ আর্ত্তনাদ প্রতি পলে পলে “ইথারে” ভেসে এসে বিঁধছিল ঐ শীর্ণ বৃদ্ধের অন্তরের অন্তস্থলে। হৃদয়ের রক্তক্ষরণের তাই বিরাম ছিল না। বন্ধুর মত মৃত্যু এসে আজ বন্ধ করেছে সে রক্তক্ষরণ, নির্ব্বাণ দিয়েছে সেই বিরতিহীন জ্বালাকে। গান্ধীজীর জীবাত্মা আজ আর দুঃখ ভোগ করছে না—এ জন্যে আজ আমি সুখী হয়েছি।

গান্ধীজীর মৃত্যু দৃশ্যটা হয়েছে অতি সুন্দর।

যেখানে ব্যাধের শায়কে বিদ্ধ হয়ে অবতার শ্রীকৃষ্ণ করলেন দেহ রক্ষা, যেখানে ক্রুসে বিদ্ধ হয়ে অবতার যীশুখৃষ্টের হল মহাপ্রয়াণ, সেখানে অবতার গান্ধী যদি রোগে ভুগে মারা যেতেন তাহলে এই মৃত্যুটাই হ’ত তাঁর সারা জীবনের একটা ছন্দ পতন।

মৃত্যু বাসরে শ্রীকৃষ্ণের দেহ হতে রক্ত ঝরেছে, রক্ত ঝরেছে যীশু খৃষ্টের দেহ হতে। অবতার গান্ধীর বেলাও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

লক্ষ লক্ষ সন্তানের রক্ত দিয়ে জাতির জনক ভারতের স্বাধীনতা আনেন নি—তাই স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ নিজের রক্ত দান করে গেলেন।

যুগে যুগে যাঁর আসা সম্ভব তিনি এসেছিলেন। কাজ শেষ করে তিনি আবার চলে গেলেন। যে দেবলোক থেকে মহাত্মা এসেছিলেন তিনি আবার ফিরে গিয়েছেন সেই দেবলোকে। এই শোক দুঃখ ভরা ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর বন্ধনে তাঁর জীবাত্মা আজ আর কষ্ট পাচ্ছে না—এই জন্যে এই মহামানবের মহাপ্রয়াণে আমি সুখী হয়েছি।

গান্ধীজীর সাধনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

"যারা আমার প্রতি দোষারোপ করে তাদের প্রতি আমি ক্রুদ্ধ না হই যেন। তাদের হাতে আমার মৃত্যু হ'লেও আমি যেন তাদের অমঙ্গল কামনা না করি। ঈশ্বর যেন আমাকে সেই মানসিক শক্তি দেন।"

এ উক্তি মহাত্মা গান্ধীর উক্তি। এই তাঁর অন্তরের বাণী, এই তাঁর জীবন সাধনার মূলমন্ত্র। কায়-মন এবং বাক্য দ্বারা তিনি এই বাণীকে পৃথিবীর ইতিহাসে জ্যোতির্ম্ময় রূপে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেলেন। বুদ্ধিবাদসম্মত সকল হিসাব নিকাশ এবং সকল সংশয়ও প্রশ্নের উর্দ্ধে স্থান লাভ ক'রে এই বাণী এবং এই সাধনা অশান্তি ও মৃত্যুশঙ্কাজর্জ্জরিত মানুষের সমাজে শান্তি ও অমৃতের স্পর্শ দিয়ে গেল; কায়ার বিলুপ্তি সত্ত্বেও অমরত্ব লাভ করলেন মহাত্মা। মানুষের মনে সত্যবান রূপে নবজীবন লাভ করলেন, অমিতাভ বুদ্ধের জাতকোপাখ্যানে তিনি যোজনা করলেন নূতন আখ্যান, খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মত তিনি আবির্ভূত হয়েছেন সকল অন্তরে। রক্তাক্ত বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে তিনি শুভ্রতার মহিমা, দুঃখের পৃথিবীতে তিনি অনন্ত সান্ত্বনার সন্ধান দিয়ে গেলেন তাঁর ওই শুভ্রতার মহিমায়। হিংসা ও অহিংসার চিরন্তন সংগ্রামের ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বলতম অধ্যায়। হিংসা চিরদিনই তার স্বভাব ধর্ম্ম অনুযায়ী হত্যার মধ্যে মৃত্যু দিয়ে অহিংসাকে বিলুপ্ত করতে চায়, কিন্তু মৃত্যুর মধ্যেই অহিংসা অমৃতকে লাভ করে মানুষের সমাজে প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত করে অপরাজেয় মহিমায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যাগ্রহী মহাত্মাজীর অহিংসা সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তও বহুজনের মনে প্রশ্ন এবং সন্দেহ ছিল। মহাত্মাজীর পূর্ব্বে অহিংসার সাধক যাঁরা আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জীবন সাধনাকে প্রযুক্ত করেন নি। কোন একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন সংগ্রামে এবং আত্মিক কলুষ মুক্তির তপস্যায় এক সঙ্গে নেতৃত্ব করতে হয় নি। রাজনৈতিক ক্ষেত্র মিথ্যাবাদের উর্ব্বরতায় সুফল দিয়ে থাকে। সেখানে মিথ্যার আশ্রয় ভিন্ন সাফল্য অর্জ্জন অসম্ভব; মারণাস্ত্র এবং সৈন্যবলই একমাত্র শক্তি। সেই কারণেই গান্ধীজীর এই সাধনা সত্যই অকপট জীবন সাধনা অথবা কৌশলময় রাজনৈতিক ছলনা—এ নিয়ে প্রশ্নের এবং সন্দিগ্ধ দৃষ্টির তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের সীমা ও অবধি ছিল না। গান্ধীজী গুলীর আঘাতে হত হয়ে সকল প্রশ্ন ও সন্দেহের নিরসন ক'রে গেলেন। আততায়ী পর পর তিন বার তাঁকে গুলীর আঘাত হেনেছে। গান্ধীজী তিন তিনবার মৃত্যুযন্ত্রণাদায়ক আঘাতের সকল প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। ক্ষত স্থান চেপে ধরেন নি, চীৎকার করেন নি; আততায়ীর প্রতি ক্ষণিক ক্রোধেও তিনি আচ্ছন্ন হন নি, কৃতাঞ্জলি হয়ে আততায়ীকেই তিনি সপ্রেম নিবেদন ক'রে গেলেন—'হিংসাকে সম্বরণ কর'। নিবেদন করেছিলেন —'হে রাম আততায়ীকে তুমি ক্ষমা কর।'

গান্ধীজী নাই। তাঁর অভাবে সমগ্র ভারতবর্ষ দুর্ব্বলতা অনুভব করছে, অপরিমেয় দুর্ব্বলতা। যুদ্ধক্ষেত্রে হত-নায়ক সৈন্যবাহিনীর মত চঞ্চলতায় ভারতবর্ষ আজ চঞ্চল। আকস্মিকভাবে পিতৃহীন সংসার অনভিজ্ঞের মত অসহায়তা অনুভব করছে। অন্ধকার রাত্রে দুর্গমপথের যাত্রীদলের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়ার মুহূর্ত্তটিতেই পুরোভাগবর্ত্তী উজ্জ্বলতম দীপশিখাটি নির্ব্বাপিত হয়ে গেলে যে মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়—সমগ্র ভারতবর্ষের মনের অবস্থা ঠিক সেই রূপ। আসমুদ্রহিমাচল আজ বিভ্রান্ত বিমূঢ়। আজ ভারতবর্ষ নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করছে যে, গান্ধীজীর সাধনার সঙ্গেই জড়িত ছিল তার ভাগ্য এবং সাধনা। গান্ধীজীর মধ্যেই ভারতবর্ষের আত্মার পুনরুত্থান মহিমা এবং নবজাগরণ শক্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল মহামহিমায়। গান্ধীজীর জাগরণেই জাগ্রত হয়েছে সমগ্র দেশ। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা আমরাই সে মূর্ত্তিকে সহ্য করতে পারলাম না; আমাদের সহ্য শক্তি অপেক্ষাও বহুগুণ প্রখর সে মূর্ত্তির মহিমা, আমাদের ধারণ ক্ষমতা অপেক্ষাও বহুগুণ গুরুভার তাঁর অবস্থান—তাই আমরাই তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলাম।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত হ'ল—এ ফেলে দেওয়া। একটি মানুষের তিরোধানে সমগ্র ভারতবর্ষ থর থর ক'রে কেঁপে উঠল।

শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের জীবনে একটি সংঘাত দিয়ে গেল—গান্ধীজীর তিরোধান। বহুকাল ধরে তারা বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাঁকে উপেক্ষা করেছে। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ও মহিমাকে অপমানিত করতে চেয়েছে। ভোগবিলাসিতাসমৃদ্ধ শোষণপরিপুষ্ট সাম্রাজ্যবাদী তাঁর ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে ঘৃণা করতে চেয়েছে, ব্যঙ্গ ক'রে বলেছে—অর্দ্ধনগ্ন ফকীর। অনেকে তাঁকে বলেছে ভ্রান্ত। ভণ্ড বলে সন্দেহ পোষণ করেছে। আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাসী কঠোর বস্তুতন্ত্রবাদীদের বিশ্লেষণে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। দরিদ্রের কল্যাণ কামনা করলেও ধনীর অকল্যাণ করেন না ব'লে তাঁকে ভণ্ড ছদ্মবেশী ধনীর অনুচর অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নি। আজ কিন্তু তাঁর এই জীবনদানে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁদের চিন্তা করতে হবে এবং তাঁর হৃদয়ের কল্যাণ কামনাকে স্বীকার করতে হবে। গান্ধীজীর অহিংসা সাধনার পরীক্ষা এতকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল বলে পৃথিবী তাকে স্বীকার করে নাই। এই সাধনায়—ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায়ই তাঁর স্বাধীনতা কামনায় সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মুসলমান তাঁকে মিত্র বলে গ্রহণ করতে পারে নাই। বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্তির প্রাক্কালে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে রক্তাক্ত হিংসার আগুন জ্বলে উঠল তাতে হিন্দুর পাশে তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন নোয়াখালিতে, মুসলমানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন বিহারে, দিল্লীতে। সাম্প্রদায়িকতার সকল গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি সকল অত্যাচারিত মানবাত্মার ত্রাতা ও বন্ধুরূপে প্রতিভাত হ'লেন। কলকাতায় এবং দিল্লীতে অনশন ক'রে এই কৃশতনু মহামানব তাঁর স্বরূপকে উদ্ভাসিত করলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কূটনীতিকে অতিক্রম ক'রে ভারতীয় রাষ্ট্রকে পাকিস্থানের প্রাপ্য অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিয়ে তিনি সত্য ও ন্যায়ের উপাসক ব'লে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। অহিংসার সাধনায় ভারতের মুক্তি ও মুক্ত ভারতবর্ষের দুই যুদ্ধোন্মত্ত অংশের যুদ্ধোদ্যম থেকে নিবৃত্তির সার্থকতা দেখে বিশ্বের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হ'ল। তার অব্যবহিত পরেই তাঁর এই তিরোধান ভারতবর্ষ এবং সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে তাঁর জীবনের গভীরতম রূপটিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিলে।

পৃথিবীর বুকে জীব-জীবনের স্তরে স্তরে উন্নীত যে সাধনা মানুষের অন্তর লোকে চলেছে, ভোগ ও ত্যাগ, ক্রোধ ও ক্ষমা, বিদ্বেষ ও প্রেম, ক্ষুদ্রতা ও উদারতা, হিংসা ও অহিংসার মধ্যে দ্বন্দ্বের যে চিরন্তন প্রবাহ প্রবহমান মানুষের জীবন ধারার মধ্যে—তারই এক মহাপ্রকাশ ঘটল বিংশশতাব্দীতে দু-দুটি মহাযুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে মহাত্মাজীর জীবন প্রকাশের মধ্যে। বুদ্ধিগত বস্তুতন্ত্রবাদের প্রভাবের সুযোগে হিংসা, ভোগলালসা, বিদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা যখন পৃথিবীকে করলে উন্মত্ত, অশান্তি জর্জ্জরিত, রক্তাক্ত, তখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে মহাত্মাজীর অহিংসা, প্রেম, ত্যাগ ও উদারতার সাধনা সার্থকতা লাভ করলে মহামহিমায়। পৃথিবী বিস্মিত হ'ল উন্মুখ হল। যুদ্ধশঙ্কাতুর, বস্তুতন্ত্রবাদী, আত্মায় অবিশ্বাসী পাশ্চাত্য মানবসমাজকে অবশ্যম্ভাবীরূপে স্পর্শ করেছে, ক্ষণিকের আশ্বাসেও আশস্ত করেছে এই মহিমা।

মহাত্মাজী আজ সমগ্র মানব সমাজের অন্তর দ্বন্দ্বের অহিংসা প্রেম ত্যাগ উদারতার জীবন্ত প্রকাশ। কোন দেশ কোন ধর্ম্ম কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন তিনি, সমগ্র পৃথিবীর মানুষের ভাবজগতের অর্দ্ধাংশের প্রতিনিধি। মানব ভাবনার আদিকাল থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আবদ্ধ অর্থাৎ তিনি শুধু বর্ত্তমানের সমস্যাকেই সমাধান করতে চান নি, সকল কালের অর্থাৎ চিরন্তন কালের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনের পূজা নিবেদিত হয়েছে মহাকালের উদ্দেশে, সে পূজা তিনি গ্রহণ করেছেন। মহাকাল বহন করে চলবেন তাঁর পূজা ও তাঁর মন্ত্র। পৃথিবী যখনই পীড়িত হবে তখনই তাঁর বাণীকে স্মরণ করবে, তাঁর পূজার পদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হবে। হয় তো আবির্ভূত হবেন নূতন সাধক; যিনি অভিহিত হবেন মহাত্মাজীর অবতার রূপে। মনীষী রোমাঁ রোঁলা বলেছিলেন—"গান্ধীর আত্মা খৃষ্ট এবং বুদ্ধের মত নব নব অবতারের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করবে।"

এই অবতারের জন্ম বস্তুতন্ত্রবাদের প্রবল প্রভাবের মধ্যে মানুষের গভীর অন্তরে একটি নিরন্তর তপস্যা চলছে এবং চলবে। জাগতিক সৃষ্টি এই মহাসাধনার সৃষ্টির আদি থেকে নিমগ্ন রয়েছে। ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্ব, বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব, শুদ্ধবুদ্ধি এবং হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, বস্তু এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে নিঃসংশয়ে মানুষ আজ ঘোষণা করেছে সে চায় শান্তি, সে চায় সুখ। বস্তুতন্ত্রবাদ তাকে ভোগ সুখের সার্থকতা দিতে পেরেছে, কিন্তু তৃপ্তি দিতে পারে নাই, শান্তির সন্ধান তো বহুদূরে। শান্তির প্রতিষ্ঠার কল্পনা করে সে মারণাস্ত্রের সাহায্যে, আণবিক বিভূতির ধ্বংসাত্মক শক্তির সাহায্যে—এ কল্পনায় তারা নিজেই শিউরে উঠছে। প্রতিটি দেশ যদি আজ আণবিক শক্তির অধিকারী হয় তবে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ কারও নাই। ঠিক এই কালেই মহাত্মাজীর আবির্ভাবে বুদ্ধ যীশুর সাধনায় অভিনব মহিমায় এই প্রকাশ ইঙ্গিতময় অর্থপূর্ণ।

মানুষের অন্তর লোকের সাধনা বিলুপ্ত হয় নাই, ও ধারা বিলুপ্ত হবার নয়। যুগে-যুগে এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মানুষ চলেছে তার সার্থকতার পথে চরম লক্ষ্যের দিকে, ব্যষ্টির মধ্যে অহিংসা পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই কিন্তু হিংসাকে সেখানে সকল শাস্ত্র সকল ন্যায় অস্বীকার করেছে। দল, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র শুধু তাকে গ্রহণ করতে পারছে না। মহাত্মাজী তাঁর সাধনাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, সেই যুদ্ধে তাকে জয় যুক্ত করে, মানুষের এই সাধনাকে বিপুল বলে বলীয়ান্ ক'রে গেলেন; সেই তাঁর সর্ব্বোত্তম জয় এবং সর্ব্বোত্তম দান। ভাবী কালে নব অবতারের সাধনায় এই দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাবে শুধু ব্যষ্টির মধ্যে নয়—সমষ্টির মধ্যে; সমাজকে অতিক্রম ক'রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হবে তার মহাপরীক্ষা।

অহিংসার ঋত্বিক্ মহাত্মাজী

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

১৯১৯-২০ সাল। তখন আমরা ষ্টেট্‌প্রিজনার হিসাবে রাজসাহী জেলে। রোজ গোপনে অমৃতবাজার পত্রিকা সংগ্রহ ক'রে পড়ি। দিনের পর দিন তখন দেখছিলাম নবজীবনের কি জোয়ার এল দেশে—রাওলাট আইন, খিলাফৎ আন্দোলন, পাঞ্জাবের অত্যাচার আর মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে! সবের পেছনে অবশ্য ছিল সমরোত্তর চাঞ্চল্য। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে এলেন এবং আবেদন নিবেদনের কর্মসূচীর জায়গায় ঢুকে দিলেন একটা বিপ্লবী কর্মপন্থা, জাতের আত্মসম্মানবোধ জাগাবার মতো একটা কর্মপদ্ধতি। বিপুল উদ্দীপনায় সমস্ত জাত জেগে উঠ্‌লো।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র উপলক্ষে ১৯১৬-১৭ সালে ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশনে বন্দী করবার বেলায় আমাদের অনেককে বলা হয়েছিল, সারাজীবনই কারাবাস ভোগ করতে হবে। ১৯১৮-১৯ সাল থেকে কিন্তু অনেকের মুক্তি শুরু হ'ল। আমরা যারা রইলাম, আমাদের তখন নিজেদের বন্ধুবান্ধবের ভিতর দিনের পর দিন আলোচনা চলেছে, জেল থেকে বেরিয়ে কি কর্মপদ্ধতি আমরা অনুসরণ করব। সিদ্ধান্ত হ'ল—শুধু মাত্র একটা গুপ্তসমিতির ষড়যন্ত্র দিয়ে এখনকার দিনে ভারতবর্ষের মতো একটা দেশের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনে আমাদের যোগ দিতে হবে। কংগ্রেস গণ-আন্দোলনের পথ ধরছে। অতএব আমাদের কর্তব্য হবে, কংগ্রেসকে আর উপেক্ষা না ক'রে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া।

খালাস পেলাম নাগপুর কংগ্রেসের কয়েকদিন আগে। আমার আগে আমাদের ভূতপূর্ব সহকর্মীরা অনেকে খালাস পেয়েছেন; ময়মনসিংএর সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, চব্বিশপরগণার হরিকুমার চক্রবর্তী, বরিশালের অরুণ গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, যশোরের বিজয় রায়, হুগলির ভূপতি মজুমদার, কলকাতার গিরীন ব্যানার্জি, ফরিদপুরের পূর্ণ দাস, ঢাকার জীবন চাটার্জি, আরও অনেকে। যাদুগোপাল মুখার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র চাটার্জি, এবং এঁদের আরও কয়েকজন সঙ্গী তখনও পলাতক। নতুন কর্মীও তখন অনেকে জুটেছেন। এঁদের সবার তরফ থেকে আমার উপর ভার দেওয়া হ'ল নাগপুরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর আন্দোলনের মর্মকথা কি, তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য কি, বুঝে আসবার, অথবা বুঝে খবর পাঠাবার। প্রতি জেলার কর্মীরা তখন আবেগ-চঞ্চল হয়ে রয়েছেন; নেতাদের প্রতি আহ্বান এসেছে, তাঁরা জেলায় গেলে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

নাগপুরে মহাত্মাজীর শিবিরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। কে একজন

হঠাৎ ছুটে এসে আনন্দোচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধ'রে ডাক্‌লো, ভূপেনদা! চেহারায় প্রথমটা চিন্‌তে পারি নাই, গলার স্বরে চিন্‌লাম—গোবিন্দ মিশ্র। ১৯১৪ সালে উড়িষ্যার দশপাল্লা রাজ্যে খন্দজাতের একটা বিদ্রোহ হয়। তার নেতা হিসাবে বালক গোবিন্দ কেয়ার হয়ে কলকাতায় আসে। যে বন্ধুদের কাছে এসে ওঠে, তাঁরা আমায় জিজ্ঞেস করেন, কোনো স্কুলে ওকে ভর্তি ক'রে দিতে পারি কিনা। ৺অমূল্য বিদ্যাভূষণ মশায়ের সাহায্যে এ কাজ আমি আগেও করেছি—বিনা সার্টিফিকেটে রাজনৈতিক কর্মীদের স্কুলে ভর্তি করা। গোবিন্দও ভর্তি হ'ল।

১৯১৬-১৭ সালে আমি যখন পলাতক, গোবিন্দও দুএকটা কাজে আমাদের সাহায্য করতে কতকটা গা-ঢাকা দেয়। নাগপুরে সে তার কাহিনী বল্‌লে—আমি ধরা পড়ার পর আর সে কারও সাথে যোগাযোগ রাখতে পারেনি। তারপর থেকে সে সারা ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয়দের পেছনে পেছনে ঘুরেছে, কোথাও শান্তি পায় নাই। তারপর জুটেছে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে। একটা গভীর তৃপ্তি পেয়েছে। ও সেই আশ্রয়েই থাকতে চায়, আমাকেও মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চায়।

আমি-ও তা-ই চাই। প্রথম দিন অনেকে সঙ্গে রইলেন। পরে স্থির হ'ল, আর কেউ যাবেন না, আমি একাই মহাত্মাজীর সঙ্গে আলোচনা করব। আমি কিন্তু সঙ্গে নিলাম কুন্তল চক্রবর্তীকে। মহাত্মাজীর কাছে ব'সে ছিলেন কাকাসাহেব কালেলকর, অধ্যাপক বেনারসীদাস চতুর্বেদী, আচার্য কৃপালানি, অধ্যক্ষ রামদেব, চম্পারণ সত্যাগ্রহের রামরক্ষণ ব্রহ্মচারী, আরও কয়েকজন।

সেই জীবনে প্রথম দেখলাম মহাত্মাজীকে—চেহারায় সৌন্দর্য নেই, মাধুর্য আছে অন্তহীন। কথায় মন কেড়ে নেয়। প্রথম আহ্বানেই মাঝখানের সব অন্তরাল যেন ভেঙ্গে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার মনের কথা কি? আপনার কি ইচ্ছা, আপনি অসহযোগের যে কার্যসূচী দিয়েছেন, দেশ যদি তা অনুসরণ করে, আপনি কংগ্রেসকে স্বাধীন ভারতীয় রিপাবলিকের পার্লিয়ামেন্ট ব'লে ঘোষণা করবেন?"

"ঠিক এইটিই আমার মনের কথা" (Exactly that's my idea). তার পর সবিস্তারে তাঁর মত বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। একটা রাষ্ট্র কি ক'রে সে দেশে শান্তিরক্ষা করে, শিক্ষার ব্যবস্থা করে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে। এসব যদি আমাদের কাজ আমরা নিজেরাই করার আয়োজন করতে পারি, তখন ইংরেজের রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে এদেশে থাকবার আর কোনো নৈতিক অধিকার থাকবে না। তাকে স'রে যেতেই হবে।

কথা বলতে বলতে বিশদভাবে তাঁর মতামতের অনেক কথাই বিশ্লেষণ ক'রে বললেন। কথায় কি আকর্ষণী শক্তি! গুরুগম্ভীর আলোচনার মাঝে মাঝে তাঁর সহজ হাসি-আনন্দের উৎসের সে কি চপলতা!

কথাপ্রসঙ্গে এক সময়ে বল্লেন, অনেক কাজ তাঁকে করতে হয়, কিন্তু সত্যের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হয়ে কাজ করেন ব'লে দুশ্চিন্তায় কখনও তাঁকে অস্থির হ'তে হয় না—শুয়ে যখন পড়েন, এক মিনিটের ভিতর ঘুম এসে যায়, আর ছয় ঘণ্টা তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত কখনও হয় না।

অন্নের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার কথা, অনেক কথাই উঠ্‌লো। বস্ত্রের কথা বলতে বলতে বললেন, আমাদের গরম দেশের স্বাভাবিক পোষাক সাদা পোষাক। হাসতে হাসতে হঠাৎ আমার গায়ের কোটটি ধ'রে বললেন, "আমি যখন প্রথম বিলেতে গিয়ে নামি, আমার সাদা পোষাক নিয়ে আমি বোকা ব'নে গেলাম, যেমন তুমি তোমার কালো কোট গায়ে এখন বসেছ।" (When I first landed in England I looked a fool with my white clothes just as you do here with your black coat on). বেশ একটু হাসাহাসি হ'ল।

তাঁর সব কথা শুনবার পর আমি বললাম, "আপনার নীতি কতকটা বুঝলাম। কংগ্রেস যদি নিজেকে স্বাধীন ভারতের পার্লিয়ামেন্ট ব'লে ঘোষণা করতে পারে, তা'তেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে ব'লে মনে করিনে। ওদের এখানে থাকবার নৈতিক অধিকার চ'লে গেলেই ওরা চ'লে যাবে, এ বিশ্বাস আমার নেই। কিন্তু আপনার এ প্রচেষ্টায় দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন বৈপ্লবিক স্তরে উঠ্‌বে নিশ্চয়ই এবং সেই হিসাবে আমাদের বিপ্লবী দলের তরফ থেকে কথা দিচ্ছি, যে একবছরে আপনি স্বরাজ দিতে পারবেন বলেছেন, সেই এক বছর আর আমাদের পুরোনো আন্দোলনের আয়োজন করব না। আমরা কংগ্রেসে নেমে সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের কাজই করব।"

মহাত্মাজী খুসি হ'লেন।

এর পর বললাম, কিন্তু মহাত্মাজী, এই এক বছরে স্বরাজ হবে ব'লে আমার বিশ্বাস নেই। এর পর আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজনই করতে হবে; ইংরেজের অস্ত্রবলকে আমাদের অস্ত্রবল দিয়েই হটাতে হবে।

তখন উঠে পড়লো হিংসা-অহিংসার আলোচনা। মহাত্মাজীও গীতার উল্লেখ করেন। প্রতিদিন গীতা প'ড়ে গীতার অনেক শ্লোক আমারও তখন কণ্ঠস্থ। তিনি গীতার ব্যাখ্যা করেন তাঁর মতো ক'রে, আমি গীতার প্রচলিত ব্যাখ্যাই করি। রাত হয়ে গেল। মহাত্মাজী বললেন, "এইবারে আমি শোব। তুমি শেষ রাত্রে আবার এসো।"

তিন মাইল দূরে থাকি। নাগপুরের ডিসেম্বরের শীত। ঘুম আসে না—কর্তব্যও আছে, আকর্ষণও আছে। কুন্তল আর আমি ঠিক সময় মতোই আসি।

মহাত্মাজী প্রাতঃকৃত্য সেরে বসেছেন, কথা উঠ্‌ছে—এমন সময় শিবিরের দরজায় দেখা দিলেন মৌলানা শওকত আলি। হাতে মস্ত বড় একটা খিলাফতের ঝাণ্ডা, পেছনে একদল খিলাফৎ ভলান্টিয়ার—সমস্বরে একটা উর্দু গান গাইতে গাইতে এসে দাঁড়ালেন।

গান্ধীজি অমনি জোড়হস্তে চোখ বুজে বসলেন। আমি লক্ষ্য না ক'রে আমার কথা ব'লে চ'লেছি। ঈষৎ রুক্ষভাবে বললেন, "আমি ঐ গান শুনব।"

গান আমরা বুঝতে পারছিনে। তা ছাড়া, মনে হ'ল, এখন গান্ধীজি মৌলানা সাহেবের সঙ্গে কথায় বসবেন। কুন্তল আর আমি উঠে পড়লাম।

গান শেষ হ'তেই গান্ধীজি গোবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, কোথায় গেল? গোবিন্দ বলেছে, জানি না তো। গান্ধীজি তাকে আদেশ দিয়েছেন, যাও, যেখানে পাও ডেকে নিয়ে এস।

ছুটে বাঙালী প্রতিনিধিদের শিবিরের কাছে গিয়ে গোবিন্দ আমাদের ধরলো।

কস্তুরবা এসে গান্ধীজির খাবার দিয়ে গেলেন—একবাটি দুধ, দুটুকরো পাঁউরুটি, কিছু খেজুর আর মনাক্কা। চামচেতে ক'রে তুলে খাচ্ছেন, আর আলোচনা চলছে। জ্যেষ্ঠপুত্র হীরালাল একবার শিবিরের ভিতরের দিকে যাচ্ছেন, আবার বাইরে আসছেন।

সেই হিংসা আর অহিংসারই আলোচনা। এর আর শেষ নেই। মাঝখানে একবার বললেন, তোমরা যদি পলিসি হিসাবেও অহিংসা মেনে নাও, আমার আপত্তি নেই।

আর এক সময়ে গভীর ব্যথায় একবার ব'লে উঠ্‌লেন, "তোমরা যদি আমার অহিংসায় প্রেরণা না পাও, মুসলমানদের সঙ্গে মিলে তোমরা হিংসার যুদ্ধের আয়োজন কোরো। যারা আমার সঙ্গে যেতে চাইবে, আমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চ'লে যাব, সেখানে গিয়ে পৃথিবীর একমাত্র ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করব।"

রাওলাট রিপোর্টে উল্লিখিত "রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্রের" রেশ তখনও চলছিল, তখনও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর • চেষ্টা চলছিল। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ মুসলমান নেতারা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমিও খালাসের পর যেদিন কলকাতায় আসি সেই দিনই এর সম্পর্কে আসি। এর কিছুদিন পরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের উপদেশে এই ষড়যন্ত্রে যবনিকা পড়ে। মহাত্মাজীর কথায় বুঝলাম, তিনিও এই আয়োজনের খবর রাখেন।

সেদিন সন্ধ্যায়, পরদিন সকালেও অনেক বেলা পর্যন্ত কথা হ'ল। তার পর বললাম, মহাত্মাজী, আপনিও আমায় মানাতে পারলেন না, আমিও আপনাকে মানাতে পারছি না (Nither I convince you, nor you convince me).

সেই সুমধুর স্নেহের হাসি হেসে তিনি কাকা সাহেবকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এঁর সাথে আলাপ কর, ইনিও তোমারই মতো একজন এনার্কিষ্ট ছিলেন, এখন সম্পূর্ণভাবে আমার মত মানেন।"

আমি হেসে বললাম, "না, মহাত্মাজী, আমি কিন্তু এনার্কিষ্ট নই। ও দুর্নাম বরং আপনারই আছে।" গান্ধীজি, আবার তেম্‌নি হেসে বললেন, জানি, জানি।

কাকা সাহেবের সাথে ভাব হ'ল, চতুর্বেদীজির সাথে, রামরক্ষণ ব্রহ্মচারীর সাথে এবং উপস্থিত আরও কয়েকজনের সাথে। তাঁরাও কিন্তু আমার অহিংসা মানাতে চেষ্টা করেন নাই, আমিও তাঁদের সাথে তর্ক করিনি।

এর পর পণ্ডিচেরী যাবার আগে বাংলায় বন্ধুদের খবর পাঠাই, মহাত্মাজীর আন্দোলনের অর্থ এবং গুরুত্ব যা বুঝেছি, তা'তে এখন আমাদের বিনা দ্বিধায় কংগ্রেসে নেমে কাজ করা উচিত। বন্ধুরা অনেকে যাঁর যাঁর জেলায় চ'লে গেলেন।

সেদিন মহাত্মাজির সাথে আলাপে তাঁর অহিংসা নিয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি। তার পর থেকে অনেক বছর গেছে, অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে, মহাত্মাজীর অনেক কথা শুনেছি, অনেক কাজ দেখেছি, তাঁর অসহযোগ আন্দোলন দেখেছি, আইন অমান্য আন্দোলন দেখেছি, একক সত্যাগ্রহ এবং তার পর তাঁর আগষ্ট বিপ্লব দেখেছি ; পূর্ণ স্বাধীনতার পথে ভারতবর্ষকে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পেতে দেখেছি, তাকে খণ্ডিত হ'তে দেখেছি, আর দেখেছি নির্মম আত্মকলহ। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে—যার অবসান হয়েছে আণবিক বোমার আবিষ্কার ও পরীক্ষার ভিতর দিয়ে।

আজ মনে পড়ে মহাত্মাজীর সঙ্গে হিংসা আর অহিংসার সেই বিচার আলোচনা, গীতার ব্যাখ্যা আর প্রমাণের উপর সেই তর্ক। মনে হয়, ইতিহাস তো এক জায়গায় ব'সে নেই। তাকে দুর্বার স্রোতে নিরন্তর এগিয়ে চলতে হয়েছে, হচ্ছে। চিরদিন সে যদি অতীতের নজীরের উপর চলে, তা হ'লে তো তাকে অগ্রগতির দিকে না গিয়ে পেছন দিকে চলতে হয়, সত্য চিরস্থির কিনা, কিন্তু সত্য নিত্যস্ফূর্ত।

মানুষের ইতিহাসে মানুষ অস্ত্রের আবিষ্কার আর ব্যবহার যে উদ্দেশ্যেই শুরু ক'রে থাক্, অস্ত্রের ব্যবহার প্রধানত হয়েছে, আজও হচ্ছে, ধনঐশ্বর্য, রাজ্যসাম্রাজ্য, ক্ষমতাপ্রতিপত্তি—অপরের যা' প্রাপ্য, তাকে আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে। এম্‌নি ক'রে আজকার দুনিয়ায় কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব, দাস, তাদের মানবত্বের পরিচয় বিস্মৃত। আর ক্রমে স্বল্পসংখ্যক লোক হয়ে উঠ্‌ছে সুখসুবিধা, ধন-ঐশ্বর্য, ক্ষমতা-প্রতিপত্তির মালিক।

আশ্চর্য এই যে, যতো আমরা বলছি, আমরা গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, যতো আমরা শুনছি, গণতন্ত্র প্রসার লাভ করছে, অস্ত্র ততো অল্পসংখ্যকের হাতে প্রবলতর হয়ে উঠ্‌ছে। দুএকটা আণবিক বোমা আজ দু-একটা রাষ্ট্রের যে-দুদশজন মালিকের হাতে, পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের জীবনমরণ তাদের মুঠোর ভিতর। অস্ত্র যত ক্ষমতাশালী ক্ষমতাপ্রভুত্ব, ধন-ঐশ্বর্য ততো মুষ্টিমেয়ের হাতে।

এর শেষ কোথায়?—মনে হয়, এই প্রশ্নের চরম ক'রে জবাব দেবার দিন এসেছে আজকের দুনিয়ায়।

পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে, পরাধীন জাতগুলোর পক্ষে অস্ত্রের ব্যবহারের নৈতিক অধিকার আছে—এই তর্ক আটাশ বছর আগে মহাত্মাজীর সঙ্গে করেছিলাম। সে-তর্কের জবাবে মহাত্মাজী প্রশ্ন করেছিলেন, ইংরেজের অস্ত্রবলের সঙ্গে অস্ত্রের যুদ্ধে সফল হবার আমাদের সম্ভাবনা কতখানি?

সুযোগের পর সুযোগ নিয়ে যুগের পর আমরা যুদ্ধ ক'রে যাব—যতোদিন না ইংরেজের সমস্ত ভারতীয় সৈন্য আমাদের দিকে যোগ দেয়,

আর একটা আন্তর্জাতিক কলহের আমরা চরম সুযোগ পাই। এর চেয়ে স্পষ্ট জবাব সেদিন দিতে পারিনি এবং বৈজ্ঞানিক অস্ত্র সম্ভারের আবিষ্কার ও আয়োজনও সেদিন আজকের স্তরে এসে পৌঁছায় নাই।

মহাত্মাজীর পন্থা যে ভাষায় তিনি সেদিন প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই পন্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সেদিন তাঁর কথায় আমার কাছে অন্ততঃ তা স্পষ্ট হয় নাই, এত বৎসরের তাঁর আন্দোলনে এবং দুনিয়ার ইতিহাসের বর্তমান পরিণতিতে ক্রমে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ছে।

দাসত্বের পরে দাসত্বের বোঝার বার বার বহু যুগের ইতিহাসে আমাদের জাতের মানুষ তার মানুষের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। দাসত্বের বোঝা আজ সে স্বেচ্ছায় অবাধে মাথা পেতে নেয়। দাসত্ব তাই তার এখন চিরস্থায়ী হয়ে উঠেছে।

এবেলা যে জানে না, ওবেলা কোথা থেকে কি দিয়ে তার উদরপূর্তি হবে, তার ভাব্‌বারও অবসর নেই সে দাস কি মানুষ। দারিদ্র্যের কষাঘাতে আত্মবিক্রয় না ক'রে, দাসত্ব না ক'রে সে যা'তে নিজের দুটি অন্ন ক'রে খেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাকে গান্ধীজি ধরতে বললেন চরকা। চরকার চেয়ে পুঁজি যাতে বেশীর প্রয়োজন হয়, তেমন উপায় তাকে দেখিয়ে কোন লাভ নেই। লাভ নেই ব'লে স্বাবলম্বী হবার এই দীন আয়োজনের কথাই তাকে শুনালেন। স্বাবলম্বী মানুষ নিজের স্বাধীন জীবিকায় বেঁচে থেকে দুনিয়ার সামনে তার মানুষ পরিচয় দিতে শিখুক, তার মনের দাসত্ব ঘুচে যাক্‌, সে স্বাধীনতার সৈনিক হয়ে গ'ড়ে উঠুক।

কোটি কোটি মানুষ সহস্র বৎসর ধ'রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, পতিত, অচ্ছুত হয়ে থেকে নিজের কাছেও সংকুচিত হয়ে গেছে। নিজেই সে নিজেকে মানুষ ব'লে জানে না—জানে শূদ্র ব'লে, জানে অচ্ছুত ব'লে, জানে নগণ্য ব'লে। সমাজে তার কোনো বিশিষ্ট স্থান আছে, দাম আছে, তা সে ভাবতেও পারে না। সে কি ভাব্‌বে স্বাধীনতার কথা?

মহাত্মাজী তাঁর কার্য-তালিকার বিভিন্ন অংশে যে-ইংগিত জাতের বিভিন্ন অংশের কাছে তুলে ধরেছিলেন তা'তে জাতের প্রতিটি অংশের ভিতর—নারী, হরিজন, মুসলমান, দীনহীন, এমন কি কুষ্ঠ রোগীর পর্যন্ত তাদের নিজের নিজের মানুষ-পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাদের নিজের কাছে। নিজের কাছে নিজের মানুষের দাবী ফুটলে তবেই সে জাতের দাবীর মর্ম বুঝবে, জাতের দাবীর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠ্‌তে পারবে।

এই মানবত্বের বোধ জাগাতেও তিনি সংস্কারকের মতো একথা মনের কোণেও স্থান দেন নাই যে, আগে জাতের মানুষ মানুষ হোক্‌, তারপর হবে স্বাধীনতার সংগ্রাম। তাঁর বিপ্লবী-নেতৃত্বে বরং মানুষের মানবত্বের গৌরববোধ জাগাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টার সঙ্গে চলেছে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। দুই সংগ্রাম পরস্পরের শক্তি যুগিয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তিনি স্তরের পর স্তর জাতকে শক্ত ক'রে গ'ড়ে তুলেছেন। প্রথম একটা নীতিমূলক আন্দোলনের ভিতর দিয়ে তাকে নিয়ে গিয়ে, তারপর একটা সাধারণ আইন ভাঙবার উপলক্ষে বিদেশী রাষ্ট্রকে মৃদু আঘাত হেনে এবং সর্বশেষে সাম্রাজ্যবাদীকে 'ভারত ছাড়' ব'লে জাতকে 'কর বা মর'র মন্ত্র দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন। যুগযুগের আত্মবিস্মৃত অগণিত সাধারণ মানুষের ভিতর মানবত্বের গৌরববোধও তিনি জাগিয়েছেন এক অভিনব পন্থায়। একদিকে ক্ষমতার মালিক সমাজপতিদের উপদেশ দিয়েছেন—যা তোমাদের সত্যিকারের প্রাপ্য নয় তা ছাড়, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা, সুযোগ, সুবিধা, ধন-ঐশ্বর্য ত্যাগ কর। অপরদিকে বঞ্চিতদের বলেছেন, তোমাদের অধিকার যা, তা বুঝে নিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠায় শক্ত হয়ে দাঁড়াও। কিন্তু আঘাত হেন না।

এই আঘাত হানার অস্ত্রে ক্ষমতার মালিকরা যুগ যুগ ধ'রে অনেক বেশী শক্তিমান হয়ে উঠেছে বঞ্চিতদের চেয়ে। আঘাতের বদলে আঘাত হানতে পারলেই ক্ষমতার মালিকরা খুসি। আঘাত হানার বিদ্যায় বঞ্চিতেরা মালিকদের সাথে এঁটে উঠ্‌তে পারবে না, বরং নিজের প্রতিষ্ঠায় দাঁড়াতে গেলে তাদের শক্তি অপরাজেয় হয়ে উঠ্‌বে।

চিরদিনের ইতিহাসে এই হয়ে এসেছে—বঞ্চিতেরই এক অংশকে অর্থের দাস ক'রে তার হাতে অস্ত্র দিয়েই অধিকাংশ মানুষকে দাস ক'রে রেখেছে ক্ষমতার মালিকরা। অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি, রাষ্ট্র—অনেক কিছুর ভাঁওতা জোড়া হয়েছে আত্মবিস্মৃত মানুষকে বিভ্রান্ত করতে।

যুগেযুগে অগণিত বঞ্চিত, আত্ম-বিস্মৃত মানবের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যদি আঘাত হানার, অস্ত্র ব্যবহারের প্রতিযোগিতা চলে, তা'হলে বঞ্চিত মানুষই মার খাবে, শুধু যে ক্ষমতার মালিকের হাতে তা-ই নয়, নিজের হাতেও—আত্মবিস্মৃতের জাগরণ সম্পূর্ণতা লাভের আগে ক্ষমতা-লোভীর দল তাকে বিভ্রান্ত করবে, তার হাতেই অস্ত্র দিয়ে তাকে আত্ম-হত্যার পথে নিয়ে যাবে, ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে যা' হয়েছে।

ইতিহাসের গতি সহজ, সরল নয়—তার ভবিষ্যৎ তার অতীতের সাথে জড়িয়ে ওঠে। অতীতে মানুষ অস্ত্র ব্যবহার ক'রে এসেছে—অস্ত্র ব্যবহারের মোহ তার মজ্জাগত হয়ে রয়েছে। অপরদিকে, নিরস্ত্র আত্ম-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাগছে তার মানবত্বের গৌরববোধ। এই মানবত্বের গৌরববোধে প্রতিষ্ঠা, আর মানবত্বকে হত্যা করবার লক্ষ্যে অস্ত্রের ব্যবহার—এ দুটি পরস্পরে ভিন্নধর্মী বস্তু।

এই দুই ভিন্নধর্মী বস্তুর সংমিশ্রণে আমাদের দেশে যে-বিস্ফোরকের সৃষ্টি হ'ল, তা'তে ভারতবর্ষ টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। অর্ধজাগ্রত মানবত্বের দুই বিভিন্ন অংশ ক্ষমতালোভীর দুর্দান্ত টানে ছুটলো দুই বিভিন্ন দিকে। এদের হাতের অস্ত্রের হানা হানিতে মানুষের আদিম বর্বর প্রকৃতি তার পরিপূর্ণ স্বরূপে ফুটে উঠ্‌লো।

মানুষের আশা করবার প্রায় স্থান রইলো না। কিন্তু মানবত্বের উদ্বোধন যিনি করছিলেন, সেই পুরোহিত আশা ছাড়েন নাই। তিনি দুই দিকেরই ক্ষমতালোভীর মোহ থেকে জাগরণশীল মানবত্বকে মুক্ত ক'রে পূর্ণতর পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছিলেন। অপরিসীম প্রেমে

নিজের হৃদয়-রক্ত বিন্দু বিন্দু করে দিয়ে দুই দিকেরই বর্বর প্রকৃতিকে প্রশমিত করেছিলেন। অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ উপবাসের পর উপবাস বরণ ক'রে দুই দিকেরই নরাকৃতিদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তারা পশু নয়, মানুষ।

ক্ষমতালোভীর এক গোষ্ঠী বরদাস্ত করতে পারলে না, মানবত্বের অর্ধজাগরণে ক্ষমতালোভী অপর গোষ্ঠীর যে-সুযোগ জুটেছিল সেই সুযোগে অস্ত্রের ব্যবহার চলতে থাকলো।

সেই অস্ত্রেরই একটিতে প্রাণ হারালেন সেই পিতা, সেই 'বাপু' যিনি পশুর ভিতর মানবত্বের সঞ্চার করছিলেন নিজের জীবনের প্রতিটি-মুহূর্তের প্রেম, প্রতিটি মুহূর্তের ধ্যান, প্রতিটি মুহূর্তের কর্ম দিয়ে।

জাতির বাপু, মানবত্বের জনক চলে গেলেন। আজ আমরা হাহাকার করছি। অথচ জীবিত থাকতে আমরা তাঁকে চিনি নাই। বিশ্বের অগণিত সাধারণ মানুষ—কিন্তু কোন্ নাড়ীর টানে তাঁকেই আপনার মানুষ ব'লে জেনেছিল, জেনে তাঁকে 'মহাত্মা' নাম দিয়েছিল, 'বাপু' ব'লে ডেকেছিল। এই মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়, সবাই কেন এমন ক'রে নিজেদের এই বাপুর সন্তান ব'লে মনে ক'রে, একবার বুঝতেও চাই নাই—নিজেরা বুঝতে চাই নাই, অথচ নির্বোধ ধ'রে নিয়েছি তাঁকে, তাঁকে যারা ভালবাসে, তাদের।

কতো শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে যে শুনেছি, এই মহাত্মাই দেশটার সর্বনাশ করলো! তিনি যখন অহিংসার কথা বলেছেন, বুদ্ধির আর বীর্যের অভিমান নিয়ে আমরা বেশ জাঁক ক'রে বলেছি, দেশটাকে ক্লীব ক'রে ফেল্লে! তিনি যখন যুগযুগের লাঞ্ছিত, নির্জিত মুসলমান জনসাধারণের মনে মানুষ হিসাবে, ভারতীয়হিসাবে তার সত্যিকারের অধিকারবোধ জাগাতে চেয়েছেন, আমরা তাকে বলেছি তাঁর "তোষণ-নীতি"। এম্নি ক'রে নাথুরাম গোড়সে যে আবহাওয়ায় পিতৃহত্যা করলে, সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছি আমরা সবাই মিলেই। আমাদের ভারতীয় জাতের এ-কলঙ্ক মুছবে ইতিহাসের কোন্ পাতায়?

আত্ম-বিস্মৃত, মানবত্ব-বিস্মৃত, মানুষ ক্ষমতাশালীর দাসত্ব ক'রে, ক্ষমতশালীর অস্ত্র ধ'রে চিরদিন নিজের পায়ে কুঠারাঘাত ক'রে এসেছে। নিজের ভবিষ্যতের পথে নিজের হাতেই দোর এঁটে দিয়েছে, নিজের অগণিত আত্মীয়-স্বজন দুনিয়ার সাধারণ মানবকে দাস ক'রে রাখতে, চিরবঞ্চিত ক'রে রাখতে, সমাজে পতিত ক'রে রাখতে সাহায্য করেছে—সমাজকে এদের সবার দানে সমৃদ্ধ হ'তে দেয়নি।

এই বিকৃতি আজ চরমে পৌছাতে চলেছে আণবিক বোমার শ্রেণীর অস্ত্রের আবিষ্কারে। 'যা হোক্ একটা কিছু হবে' ব'লে যখন অগণিত সাধারণ মানুষ অন্ধের মতো এক চরম ধ্বংসের দিকে স্রোতের বেগে চলেছিল তখনই যেন "সম্ভবামি যুগে যুগে"র পরিচয় হিসাবে এসেছিলেন আমাদের মাঝে মহাত্মা গান্ধী।

তিনি বললেন 'যা হোক্ একটা কিছু হবে' নয়' স্মরণ কর, তুমি মানুষ। মানুষ-হিসাবে তোমার একটা ভবিষ্যৎ আছে। সেই ভবিষ্যৎকে চিনে নাও। অগণিত সাধারণ মানুষের ভবিষ্যতকে দেখে নাও। অন্ধের মতো অপরের দেওয়া অস্ত্র হাতে তুলে নিও না। ওতে তোমার নিজেরই সর্বনাশ, সমস্ত মানব জাতের সর্বনাশ।

এই শিক্ষায় আজ যদি মানুষ-আত্মস্থ, আত্ম-নির্ভর হয়ে না দাঁড়ায়, তবে তার ভবিষ্যৎ কোথায়?

সেদিন নাগপুরে আরও একটা আলোচনার বস্তু ছিল আমার মহাত্মাজীর সঙ্গে। আমরা তখন কারাবাস থেকে মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু যাদুগোপাল মুখার্জি, সতীশ চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, অমরেন্দ্র চাটার্জি, নলিনী কর প্রভৃতি ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তখনও পলাতক। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ চাইলাম, এঁদের সম্পর্কে কি করব?

তিনি বললেন, নিজেদের অস্ত্রপাতি নিয়ে এঁদের বল, আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। এঁরা তো বেরিয়েছিলেন স্বাধীনতার চরম মূল্য দেবার সংকল্প নিয়েই। না-হয়, শেষ পর্যন্ত তা-ই দিতে হবে।

আমরা দুর্বল মানুষ। এ উপদেশ আমাদের বন্ধুদের দিতে পারিনি। এর পর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, এঁদের হারানো আমাদের চলবে না। বরং সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর চন্দননগরের মতিলাল রায় যে-চেষ্টা করেছেন—গবর্ণমেন্টের আর এই সব পলাতক বিপ্লবীদের ভিতর একটা সন্ধি স্থাপনের, তা যদি সফল হয়, সেই পন্থাতেই এঁদের বের ক'রে আনবার চেষ্টা কোরো। সেই উপদেশই আমরা পালন করেছিলাম।

কিন্তু গান্ধীজির ঐ কথাটি এক দিন আমাদের বিপ্লবীদেরও প্রতি মুহূর্তের সাধনার কথা ছিল। স্বাধীনতা পেতে হ'লে চরম মূল্যই দিতে হবে। চরম মূল্য সেদিন আমাদের কাছে ছিল ফাঁসিতে বা গুলিতে প্রাণ বলিদান। কিন্তু আজ দেখ্ছি, ব্যক্তিগত, পরিবারগত, শ্রেণীগত, জাতিগত স্বার্থ, ক্ষমতা প্রতিপত্তি বলিদান প্রাণবলিদানের চেয়ে মানুষের কাছে বেশী বই কম নয়।

অথচ এই বলিদান ছাড়া মানুষের মানবত্ব প্রতিষ্ঠায়, সাধারণ মানবের দাসত্ব ঘুচাবার আশা কোথায়? আজকের দিনে বিপ্লবী যে হবে, ক্ষমতা-ঐশ্বর্যের মালিককে এই কথাটিই তাকে বলতে হবে—তোমার বুদ্ধিতে চলব না, তোমার দেওয়া অস্ত্র ধরব না, তোমার কৌলীন্যের ভাঁওতা মান্‌ব না—তোমার দেওয়া দুমুঠো দাসত্বের অন্নে বা গুণ্ডামীর মূল্যে আমার প্রয়োজন নেই! আমি অগণিত সাধারণ মানুষের সাথে এক হয়ে নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলব। এতে তুমি আমার কাছ থেকে যে-মূল্য হয় নেবে, আমি সব মূল্যই দিতে প্রস্তুত।

এই বলিদানের জীবনে যিনি নিত্য আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছিলেন, নিয়ত আমাদের অভ্যস্ত ক'রে তুলছিলেন আজ তাঁকে আমরা হারিয়েছি।

নীরবে যখন বসি, আজকের ব্যথা পাঁজরার বাঁধ মানতে চায় না। ও-কথায় কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পাইনে যে, ম'রেও তিনি আমাদের সাথেই আছেন। প্রতি পদক্ষেপে হাত ধ'রে নিয়ে চলেছিলেন, তবু প্রতিপদে পথ ভুলেছি, প্রতিপদে পা পিছ্‌লে গেছে। আর, আজ তাঁর স্মৃতি, তাঁর আদর্শ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? আদর্শকে অত বড় প্রতিষ্ঠা দেবার শক্তি ও বুদ্ধি অর্জিত হয়েছে?

আবার এ-প্রশ্নও মনে জাগে—প্রেমের ঐ সম্পূর্ণতা, মানবের ইচ্ছা-শক্তির ঐ পরিপূর্ণতা—মানবসমাজ এর কি কোনো মূল্যই দেবে না? ও কি ব্যর্থ যাবে? পশুত্ব আর দাসত্বের গ্লানি থেকে মানবত্ব কি কোনো কালে মুক্তি পাবে না?

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

অশীতি বৎসর আগে যে জগতে হে মহাপুরুষ,
জন্ম নিলে সে জগতে মানুষ হয়নি অমানুষ,
পশুত্ব তাহারো ছিল পশুত্বের গূঢ় অন্তস্তলে
মনুষ্যত্ব ছিল সুপ্ত, তাহাই জাগাতে প্রেমবলে
চেয়েছিলে, হয়ে নাই মানবের সকল সম্বল
তখনো বিজ্ঞান, তাই সে সাধনা হয়নি নিষ্ফল।
        নিলে আজ যে জগৎ হইতে বিদায়
সে জগৎ যুগচক্রে নির্মানব, সে জগৎ হায়
দানবে ভরিয়া গেছে। সেথা ব্যর্থ সাধনা নিষ্কাম,
সুপ্ত নয়, লুপ্ত সেথা মনুষ্যত্ব, মর্ত্ত্য দৈত্যধাম।
তবু আশা ত্যজ নাই, আশা তব প্রাণাধিক প্রিয়
দৈত্যেরে বানাতে দেব স্বর্গ হ'তে আনিয়া অমিয়।
পাষাণে রোপিয়া বীজ অঙ্কুরের ছিলে প্রতীক্ষায়
অকপট শিশুসম নিষ্কলুষ মৌন মমতায়।
        হন্তা তব উপলক্ষ, এ বিশ্বের সর্বদানবতা
কেন্দ্রীভূত তার মাঝে, তার ধ্বংস করিবারই কথা
যাহা কিছু সত্য শুচি শুভঙ্কর সুন্দর মহান্।
যুগে যুগে দেশে দেশে এই লীলা করে শয়তান।
শুনাইলে হরিনাম যে হিরণ্যকশিপুর কানে
ফিরিয়া চাহিল সে কি অসহায় প্রহ্লাদের পানে?
•   লভিলে বাঙ্ময়ী ভক্তি তুমি দেশে দেশে,
তোমারে চিনিল তারা প্রেমগুরু তব ছদ্মবেশে?
তোমারে চিনিত যদি ধরিত যে তব ব্রত শিরে
নিষ্ক্রিয় দর্শক হ'য়ে রক্তবন্যা প্রবাহের তীরে
দাঁড়াইয়া দেখিত না তব ব্রতে ডুবিতে অতলে,
শুধু জয়ধ্বনি নয়, সর্ব্বস্বই দিত পলে পলে।
খৃষ্টেরে ভুলেছে যারা ক্রুশকাষ্ঠে গড়েছে ক্রুশ্যার
        সত্যই কি তারা তোমা করিল স্বীকার?
অহিংসা সাধনালভ্য, আজীবন করিয়াছ তপ,
তার লাগি করিয়াছ চিরদিন মহামন্ত্র জপ।
        না করিয়া তপো মূল্য দান,
যাহারা করিল শুধু অভিনয়ে সাত্ত্বিকতা ভাণ,
তারাও চিনেনি তোমা। লোকোত্তর তব বাণীব্রত,
হইয়াছে খণ্ডিপথে তাহাদের পাথেয়ের মত।
যে অস্ত্রে নিহত তুমি সে অস্ত্র যাদের আবিষ্কার,
তারাও সমান দায়ী অপরাধী তোমার হত্যার
প্রার্থনার মহাপথে সবারে করিয়া যাও ক্ষমা—
তাই তব শেষ দান, শেষ বাণী তাই অনুত্তমা।
যেই মহাযজ্ঞে তুমি আত্মাহুতি করিলে অর্পণ
তার ধূমজালে আজ নিপীড়িত মোদের নয়ন,
বাষ্পাচ্ছন্ন রক্তনেত্রে সত্যাসত্য চেনাই কঠিন
        সে নেত্রে বুঝিতে নারি রাত্রি কিংবা দিন।
বুদ্ধিরে স্তম্ভিত আজি করিয়াছে মর্ম্মভেদী শোক।
এই শুধু জানি হোতা যজ্ঞফল পাবে জীবলোক,
নির্ব্বাসিত মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসিবে তার সাথে,
দৈত্যধাম স্বর্গ হবে হে দধীচি তব রক্তপাতে।
মানবের ইতিহাসে এত বড় উৎসর্গ মহান্
হয় নাই কোন দিন। ব্যর্থ যদি এই অবদান,
সবই মিথ্যা, নাই তবে সত্য, ধর্ম্ম, নাই ধর্ম্মরাজ,
        সত্য শুধু এ কলঙ্ক লাজ।
পঞ্জর হইল চূর্ণ ব্রত তার রহিল ধরায়
মন্দির হইল ভগ্ন দেবতা লভিল মুক্তি তায়,
যাহা ছিল ভারতের তাহা হ'লো সারা বসুধার,
ত্রিকালের ধন হ'ল যাহা ছিল শুধু আজিকার।
প্রবর্ত্তিলে নবধর্ম্ম নিজ প্রাণে করি প্রাণবান্,
জগতের সর্ব্ব ধর্ম্ম তার মাঝে হবে মজ্জমান।
তব বক্ষোরক্তধারা মেঘচ্ছেদী নবারুণসম
        বিদূরিয়া হিংস্রতার তমঃ,
অভিনব সভ্যতার প্রভাতেরই করিল সূচনা;
        শোচনায় ইহাই সান্ত্বনা।

কর্ম্মযোগী-গান্ধী

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

বাপুজী নাই, গান্ধীজী নাই, ভারত আজ গান্ধীহীন! ভারতের অন্তরে বাহিরে সকল চিন্তা আজ স্তম্ভিত হ'য়ে শুধু—গান্ধী নাই, গান্ধী নাই—বলে কেঁদে মরছে। আসমুদ্র-হিমাচলে আজ দুর্ব্বিষহ বেদনার বিপুল আলোড়ন, জনসমুদ্রে আজ চোখের জলের জোয়ার লেগেছে, অগণিত নরনারীর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে ভারতময় আজ ঝড় বইছে। গান্ধী নাই, ভারতবর্ষে আজ গান্ধী নাই! ভারতের মর্ম্মে অনুভূতির কোন্ সুগভীর তল আজ কি ভূমিকম্পে এমন মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠছে? কাশ্মীর থেকে কুমারিকা, দ্বারকা থেকে পুরী—কান্নাধারার দোল-যে আর থামছে না! বাপুজী নাই, গান্ধীজী নাই! আজ বাপুজীর সেই দেবদুর্লভ হাসিকে ভারতবাসী তার বিরহের রোদন দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছে।

তবু কান্নার কলরোলের মাঝে ভারতের আকাশে বাতাসে আজ প্রার্থনার এ উতরোল কেন? যে স্বর কান্নায় ভেঙে পড়ছে, সে কি প্রার্থনায় আবার আপনাকে বেঁধে নেবার প্রয়াস করছে?

অপরাহ্ণ বেলায় একদিন বাপুজীর প্রার্থনার পর গান হ'য়েছিল:

> "আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেবো গো
> এই বিষম ঝড়ের বায়ে,
> তোমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে"

ভয়ভাঙা সেই বিশ্বাসের নায়ে প্রার্থনার পাল তুলে দিয়ে বাপুজী আমাদের দুঃখের সাগরে পাড়ি দিয়েছিলেন। বাপুজীর বিরহের পারাবার কি এই হতভাগ্য দেশ তেমনি করে প্রার্থনা সহায়ে পার হতে পারবে? দেশ কি এমনি করে তাঁর মহামরণের মধ্য দিয়ে মহাজীবনের সন্ধান করছে, তাঁর অন্তরের সাধনা ও সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করছে? প্রিয়তম গান্ধীকে হারিয়ে ভারত কি আজ একান্ত দুঃখের পরিব্যাপ্ত শূন্য অসহায়তায় স্থিতধী গান্ধীর আশ্রয় খুঁজছে? তাই যেন

মহামানবের মহানিদ্রা ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

হয়, বাপুজীর আশীর্ব্বাদে তাই যেন হয়! বাপুজীর সাধনাকে ভারতবর্ষ যেন তেমনি ক'রেই ধারণ করতে পারে, তেমনি ক'রেই বহন করতে পারে, তেমনি ক'রেই কর্ম্মে প্রকাশ ক'রে ধরতে পারে। সে সাধনা যে ভারতেরই অন্তরের চিরন্তন সাধনা—গীতার কর্ম্মযোগীর সাধনা।

আজ এর বড় প্রার্থনা আর নেই। জওহরলালজী এই

প্রার্থনাই করেছেন। দীপ নির্ব্বাণ হ'য়েছে না বলতেই তিনি সেই অনির্ব্বাণ দীপশিখার চিরদাপ্তির কথা বলেছেন। সুদূর ভবিষ্যতের মানুষও এই অজস্র আলোক-ধারায় স্নান করে সত্য প্রেম ও অহিংসার পথে ভগবানের মন্দিরে পূজার নৈবেদ্য বহন ক'রে নিয়ে যাবে। এ শিখা ভারতের, এ শিখা জগতের, এ শিখা মহামানবের। যাত্রী আমরা, এই দীপশিখায় আমাদের পথের সন্ধান ক'রে নিতে হবে।

গত ১৩ই জানুয়ারী গান্ধীজী অনশন গ্রহণ করেন। তার আগের দিন অপরাহ্ণ-প্রার্থনার পর ভাষণে তিনি বলেন, "অনশন-গ্রহণের সিদ্ধান্ত আলোর চমকের মত আমার অন্তরে দীপ্ত হয়ে ভেসে উঠেছে।" তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্মময় জীবনের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলি এই আলোর চমক। এক একটা সিদ্ধান্ত ভারতের ভাগ্যকে বহন করে অগ্রসর হ'য়েছে নিবিড় পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে নিয়ে। এই আলো ভিতরের আলো—গীতার সেই অন্তর্জ্যোতি:

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।

অন্তরে যাঁহার আনন্দ, অন্তরে যাঁহার শান্তি, অন্তরে যাঁহার জ্ঞানের জ্যোতি, এ আলোর চমক সেই রাজ্যের। রাগ-দ্বেষ সংশয়-অশ্রদ্ধায় যে বুদ্ধি আচ্ছন্ন, এ রাজ্যের সন্ধান সে পায় না।

বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা-প্রতিষ্ঠিতা।

ইন্দ্রিয় যাঁহার বশ, তাই প্রজ্ঞা যাঁহার প্রতিষ্ঠিতা, 'মর্য্যর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ' মনবুদ্ধি যাঁহার ভগবানে অর্পিত সেই কর্ম্মযোগীর সম শান্ত চিত্ততলে ঐ আলো ভেসে ওঠে।

আলোর চমকের মত সেই সিদ্ধান্ত এল শান্তিবারি নিয়ে। ভারতবর্ষ গুরু দুঃখে বিচলিত হ'য়ে আছে। স্থিতধী গান্ধী অবিচলিত চিত্তে, অবিকম্পেন যোগেন' অনশনের সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়ালেন।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকম্ ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাঁকে লাভ করলে অন্য কোন লাভ তদপেক্ষা অধিক বলে মনে হয় না, যেখানে স্থিতিলাভ করলে গুরু দুঃখেও মন বিচলিত হয় না, তার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন—তাঁর অপূর্ব্ব লোকোত্তর জীবন তার সাক্ষী। সেইখানেই ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠা—তাঁর মহাভারতীয় জীবনের চাবিকাটি সেইখানে—নহিলে তাহা বুঝা যায় না।

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "হে মরণ, আমার সখা অনুপম!" আর বললেন, "আমার এই বিশুদ্ধ অনশন ধর্ম্মপালনের মত ফলনিরপেক্ষ—এর সুফল এরই মধ্যে নিহিত। সুফল ফলবে এই আশা ক'রে আমি অনশন গ্রহণ করছি না। আমি অনশন গ্রহণ করছি, কারণ, না ক'রে পারছি না।" 'না ক'রে পারছি না'—অনিবার্য্য মানবপ্রেম কতবারই না তাঁকে এমনি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমে তিনি মৃত্যুঞ্জয় হ'য়েছেন। তাই বলতে পেরেছেন, "মরণ, আমার সখা অনুপম।" তাই বলতে পেরেছেন "ধর্ম্মের অনিবার্য্য আহ্বানে আমি এই অনশন গ্রহণ করছি।...আত্মিক অনশন গ্রহণ ক'রে আমি যত সুখী হই, এমন আর কখন হই না। এই অনশন আমাকে যে-সুখ দিয়েছে সে-সুখ পূর্ব্বে আমি অনুভব করি নি।" আর বলেছেন, "এরূপ অনশন গ্রহণ করতে হ'লে দু'টি চরম যোগ্যতার অধিকারী হওয়া চাই—ভগবানে জলন্ত বিশ্বাস, আর তাঁর অনিবার্য্য আহ্বানের উপলব্ধি।"

অনশনকে তিনি বলেছেন ধর্ম্মপালনের মতই তা ফলনিরপেক্ষ, তার সুফল তারই মধ্যে নিহিত। সর্ব্বভূত-হিতেরত কর্ম্মযোগীর কর্ম্মধারা এমনই অনুপম, নিষ্কাম কর্ম্মের এমনই গহন গতি। তাই তাঁর কর্ম্মসাধন-মার্গের নাম দিয়েছেন অনাসক্তি যোগ।

কর্ম্মযোগী গান্ধী আমাদের জীবন্ত গীতা। সত্য, প্রেম ও অহিংসা সহায়ে ভারতে তিনি যে কর্ম্মধারার সন্ধান দিয়েছেন, তারই তরঙ্গে তরঙ্গে গীতার শ্লোকগুলি তাদের জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিপূত মূর্ত্তি নিয়ে জেগে উঠেছে—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'-কে বাঁচবার নূতন প নির্দ্দেশ করছে।

সারা পৃথিবীতে মানুষের শক্তি আজ সংযমে অপ্রতিষ্ঠ, শক্তির মত্ততায় মানুষ ধর্ম্ম ভুলেছে—যে-ধর্ম্মকে রক্ষা করতে পারলে তবে মানুষ রক্ষা পায়। মানবতার চরম অপমান আজ মানুষের বুদ্ধিকে আশ্রয় করে দিন দিন স্ফীতকায় হয়ে উঠছে। পৃথিবীময় বুদ্ধিমানরা জোট বেঁধেছে সোনার নেশায় মেতে ওঠে। তৃষ্ণা রাক্ষসী আজ শক্তিমানদের চাবুক মারতে মারতে দুনিয়ার হাটে হাটে

ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অমিত যন্ত্রশক্তির অধিকারী হয়েও মানুষ আজ তপ্ত, ক্লান্ত, রিক্ত—হিংসায় উন্মত্ত। কর্ম্মযোগী গান্ধী সেই হিংসানলে শান্তিবারি সেচন করছেন।

দিনের প্রথম কাজ তাঁর ছিল প্রার্থনা, আর প্রার্থনার প্রথম কথা :

ঈশাবাস্যমিদম্ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ভগবানকে সর্ব্বত্রাবস্থিত জেনে লোকব্যবহারে ত্যাগের দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা বিষয় ভোগ কর—কাহারও ধনে লোভ ক'রো না। ত্যাগের দ্বারা এই যে ভোগ, দেওয়া-নেওয়ার এই যে মিলন, পাওয়ার সঙ্গে ছাড়ার এই যে নিগূঢ় সংযোগ, কর্ত্তব্যসাধনের পথে এই যে অধিকারের আবির্ভাব—এই মূল সত্য এবং এই মূল সূত্র ধ'রেই গান্ধীজী সাধু-শ্রম ও শোষণহীন-কর্ম্ম ব্যবস্থার উপর নতুন মানব-সমাজ গড়তে চেয়েছেন।

বাপুজীর প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় আছে :

ন ত্বহং কামযে রাজ্যং ন স্বর্গং
নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্
প্রাণিনামার্ত্তিনাশনম্॥

রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মুক্তি চাই না, দুঃখতপ্ত প্রাণীগণের দুঃখ নাশ হউক এই আমার প্রার্থনা। তাঁর সমস্ত জীবনের সকল কর্ম্ম এই একটি মাত্র প্রার্থনায় রূপ ধ'রে তাঁকে লোকোত্তর করেছিল। অপর্য্যাপ্ত প্রাণে অপর্য্যাপ্ত প্রেম নিয়ে বাপুজী দুনিয়ার সদর রাস্তার মানুষের কান্নার ভিতর দিয়ে চলে গেছেন। সহস্র কর্ম্মে লক্ষ লক্ষ লোককে আকর্ষণ করে ভারতময় পরিভ্রমণ করছেন—যেন ভ্রাম্যমান্ হিমালয়। তাঁর পথযাত্রায় সারা ভারত উথলে উঠেছে—দিকে দিকে নব নব প্রেরণা, নব নব চিন্তা, নব নব কর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়েছে, নতুন আশা, নতুন সাহস জেগেছে। কিন্তু বাপুজীর মন্ত্র ছিল বৈরাগীর মন্ত্র,

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

এই ত কর্ম্মে নিষ্কামতার মন্ত্র, অনাসক্তির মন্ত্র, কর্ম্মযোগীর মন্ত্র। মানুষের শক্তি, চেষ্টা ও কর্ম্মকে সত্যের পথে ফিরিয়ে নিয়ে তিনি সংযমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আর কর্ম্মযোগের মধ্যে তার পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। গান্ধীজীর অনুপম জীবনে পৃথিবীতে কর্ম্মযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যে যোগ, গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।

যে যোগ দীর্ঘকালবশে ইহলোকে নষ্ট হয়েছে। আমাদের মহাভাগ্য, এই মহামানব আমাদের, কর্ম্মভূমি ভারতে আমাদের নিয়েই তিনি সমস্ত জগতের।

বাপুজীর চিতার চারিপার্শ্ব ঘিরিয়া নেতৃবৃন্দের শোকাঞ্জলি ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

গান্ধীজীর প্রার্থনায় প্রতিদিন গীতাপাঠ হত এবং বিশেষ ক'রে পাঠ করা হ'ত যে শ্লোকগুলিতে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণিত আছে সেই গুলি। গত কয় বৎসর ধ'রে গান্ধীজী অপরাহ্ণ প্রার্থনার পরই ভাষণ দিতেন। প্রার্থনা-সভার সময়ে সময়ে দশলক্ষ লোকেরও সমাবেশ হয়েছে। প্রার্থনায় রামধুন গানের সুরে ও তালে সকলকে নিয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, আর ভাষণে নব্য ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসায় এবং সকলের সকল কর্ম্মসাধনে সত্য ও নিষ্কামতার প্রয়োগ করা। এইরূপে প্রার্থনা ও

ভাবন—একদিকে ভগবান্ একদিকে মানুষ, একদিকে ধর্ম্ম আর একদিকে কর্ম্ম, একদিকে স্বর্গ একদিকে মর্ত্ত্য, একদিকে সত্য একদিকে প্রেম—আর অনাসক্তির সূত্রে তাদের মধ্যে অপূর্ব্ব সংযোগ। এই ছিল বাপুজীর জীবন, অহিংসা, সত্য ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিধানের সর্ব্বগুরুতম সত্যের সঙ্গে সে জীবন যুক্ত হতে পেরেছিল ব'লে সে ছিল মুক্ত, তার গতি ছিল সরল, তার ছন্দ ছিল অমৃতময়, তার অক্লান্ত কর্ম্মসাধনার ভিতরের সুরটি ছিল বৈরাগীর একতারার সুরের মত সংযত, মধুর, মঙ্গলময়, আনন্দময়—অবিচ্ছিন্ন তার প্রবাহ।

মাধ্যাকর্ষণের বিধান যেমন বাহিরের জগতে, ধর্ম্মের বিধান তেমনি অন্তর্জগতে—পালনে ব্যতিক্রম ঘটলেই তার শাস্তি অনিবার্য্য। ধর্ম্মরাজবিধি আজ পৃথিবীর রাজবিধি থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে। লালসা, মিথ্যা, প্রতারণা, শোষণ, বিদ্বেষ, হিংসা আজ বসেছে মানুষের পূজার বেদীতে। আসুরী শক্তির নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে দিকে দিকে আজ আগুন জ্বলে জ্বলে উঠছে। মানব সমাজ মহাভয়ে উদ্বেজিত। এই মহাভয়ে অভয় চ্যারিত হয়েছে বাপুজীর কণ্ঠে।

গান্ধীজী নিজ জীবনের সাধনায় কর্ম্মকে আবার ধর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, আর রাজবিধিকে যুক্ত করেছেন ধর্ম্মরাজবিধির সঙ্গে। কর্ম্মযোগীর এই ছিল তপস্যা। সে তপস্যা স্বাধীন ভারত গ্রহণ করবে কি? তাঁর প্রেমের ঋণ ভারতবাসী বহন করবে কি? দেশজোড়া কান্নার মধ্যে দেশজোড়া প্রার্থনা দেখে বড় আশায় এই প্রশ্নই আজ মনে জাগছে।

প্রার্থনার পর বাপুজী যখন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর সেই অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে সর্ব্বজনকে নমস্কার করতেন, তখন চোখে তাঁর কি সে চাহনি—সে চাহনিতে অমৃত ঝরে পড়ছে। মনে পড়ে যায় গীতায় শ্রীভগবানের সেই কথা—

সর্ব্বভূতস্থিতম্ যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ ক'রে সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যিনি ভজনা করেন, তিনি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন—সংসারের সহস্র কর্ম্মের কলকোলাহলে অথবা বিবিক্তদেশে ধ্যানাবস্থিতভাগতমনে—তিনি আমাতেই আছেন।

আর বাপুর মুখের সেই হাসি! যে হাসি দেখে দেখে চোখ ফিরত না, আশা মিটত না, যে হাসি ঝরণার মত অমৃত ধারায় ঝরে ঝরে পড়ত—আপন স্বচ্ছতায় আপনি সুন্দর, আপন চাঞ্চল্যে আপনি মুখর, আপন পূর্ণতায় আপনি ভাস্বর। মানুষকে নিয়েই আনন্দকৌতুকের সেই হাসি, কিন্তু তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে শেষে তা স্থির হয়ে যেত শান্তির স্থিরভূমিতে—যেখানে সকলই অমৃতময়।

স্থিতধী হবার সাধনা তিনি করেছিলেন। স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা অর্থাৎ লক্ষণ তাঁর মধ্যে প্রস্ফুট হয়েছিল। তাই সে মহাজীবন মহাকাব্যে পরিণত হয়েছিল—তাই সে জীবন দলের পর দলে, শতদলে সহস্রদলে এমন করে এত মাধুরী নিয়ে ভারতের সর্ব্বত্র ফুটে উঠেছিল। সে মাধুরীর স্পর্শে তাঁর অমিত বীর্য্য ও তেজও মধুময় হয়েছিল। পৃথিবীর মনীষীরা তাঁর সেই মাধুর্য্য, সেই অপূর্ব্বতা, সেই অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে সত্যের জয় ঘোষিত হয়েছে উপলব্ধি করেছিল।

ভাবীকালে যে-পথে মানুষের জয়যাত্রা হবে সেই পথ বাপুজী কেটে তৈয়ারি করে দিয়ে গেছেন। তাই হঠাৎ তিনি চলে গেছেন ব'লে পৃথিবীর লোক আপন জন হারিয়ে বেদনাখিন্ন হয়েছে। ভারতে তিনি ছিলেন বাপুজী, গান্ধী-মহারাজ। দর্শনপাগল লক্ষ লোক নিয়ত তাঁর সন্ধানে ফিরত, যেমন ভ্রমরদল সন্ধান করে প্রস্ফুট কমলের। কি নিবিড় আত্মীয়তাবোধ! স্বার্থের যোগ নেই, রক্তের যোগ নেই, পরিচয়ের সূত্র নেই—তবু সে মানুষ আপনার হতে আপনার। শুদ্ধ প্রেমের গতি এমনই অমোঘ, এমনই দুর্নিরীক্ষ্য। দেবমানব সেই রাজ্য রচনা করে মানুষকে কি নতুন মর্য্যাদাই না দিয়ে গেছেন।

এত সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও তিনি থাকতেন অচঞ্চল। সেই

অপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

দিক্‌দেশের নদীর জল সমুদ্রে প্রবেশ করে। কিন্তু সমুদ্র আপনাতে আপনি পূর্ণ, প্রশান্ত, স্থির—নদীবেগে সমুদ্র-হৃদয়ে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। তেমনি স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তর আপনাতে আপনি পূর্ণ—প্রশান্ত ও স্থির। অসংখ্য

কর্ম্মের স্রোত তার তটপ্রান্তে আঘাত করলেও তার গভীর জল অচঞ্চল থাকে। সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও মহাত্মাজীর ভিতরের মানুষটি থাকতেন অচঞ্চল—তাই সত্যের বিধান সেখানে যে রেখাপাত করত তা হ'ত উজ্জ্বল ও অবিকৃত। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত অনেক সময় আলোর চমক বলেই মনে হত। লালসাবিক্ষুব্ধ মন, তৃষ্ণাদগ্ধ হৃদয় তার মোহাচ্ছন্ন তামসী বুদ্ধি সহায়ে ত সে পথের সন্ধান পায় না।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

অনুরাগ ও বিদ্বেষ হ'তে যিনি মুক্ত, যিনি সংযতমনা, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় উপভোগ ক'রে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই ত কর্ম্মে নিষ্কামতা, অনাসক্তিযোগের মর্ম্মকথা। গান্ধীজী সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের মধ্যে, পার্থিব সকল ব্যাপারের মধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে গেছেন। কিন্তু কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর প্রবল কর্ম্মশক্তি তাঁকে সুগভীর আত্মপ্রসাদ দিতে পেরেছিল। সকল ব্যাপারেই তিনি ভগবানের সেই নির্দ্দেশ পালন করে গিয়েছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

যাহা কিছু কর, ভোজন কর, হোম কর, দান কর, তপস্যা কর সে সকলই আমাতে অর্পণ কর। তাই তাঁর কর্ম্মের বোঝা—আর সে বোঝা ত সামান্য নয়—হাল্কা হয়েছিল, সে কর্ম্মে ভাগবত ছন্দ ফুটে উঠে তা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়েছিল, তা পুণ্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় হয়েছিল।

গীতায় শ্রীভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা করে বলেছেন :

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সম শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

গান্ধীজী ত ভগবানের এই অতীব প্রিয় ভক্তই ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষরহিত, সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণাসম্পন্ন, স্বার্থশূন্য ব'লে মমত্ববুদ্ধিহীন, সকল লোকব্যবহারে নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে সমান এবং ক্ষমাশীল। জীবনে তাঁর কর্ম্মচেষ্টার তুলনা হয় না—কিন্তু সকল কর্ম্মের মধ্যে তিনি ছিলেন সদানন্দ, সমাহিতচিত্ত ও সংযত। সত্য ও অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস ছিল হিমালয়ের মত অটল, আর মনবুদ্ধি তাঁর ছিল ভগবানে অর্পিত। মহাভারত-রচনায় তাঁর দেশব্যাপী বিরাট কর্ম্মচেষ্টায় কেহ উদ্বেগপ্রাপ্ত হয় নি, তিনিও লোকের কারণে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হ'য়ে কখন পথভ্রষ্ট হন নি। তিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত ছিলেন। কর্ম্মে তাঁর মত দক্ষ কে, শুচিই বা কে, ফলাফলে এমন উদাসীন আর কোথাও মেলে? তিনি ছিলেন বাসনারহিত, শত বেদনার মধ্যেও আনন্দময়। ফল কামনা ক'রে তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন নি। ইষ্টলাভে তিনি চাঞ্চল্যে আত্মহারা হন নি, শোক দ্বেষ এবং আকাঙ্ক্ষামুক্ত হয়ে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ত তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। শত্রুমিত্রে, মানে অপমানে, শীত উষ্ণে, সুখে দুঃখে তিনি চিত্তের সমতা রক্ষা ক'রেছেন, নিন্দাস্তুতিতে তিনি তুল্য ছিলেন, সহস্র কর্ম্মের মাঝেও মৌন পালন করতেন, সন্তোষ তার সহজসিদ্ধ ছিল। তাঁর নিকেতন ছিল না, কর্ম্মযোগ অবলম্বন ক'রে তিনি মুসাফিরের মত, পক্ষীর মত দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর মত স্থিরমতি ভক্তিমান জগতে আর কোথায়?

একলা চল, একলা চল, একলা চল রে—এই একটা মানুষের চলার পথ ধ'রে, তারই ভরসায় ভারতবর্ষ সত্যাগ্রহের নতুন পথে যাত্রা ক'রেছে। একটা মানুষের ভরসায় চল্লিশ কোটির জড়-বিষাদ দূর হয়ে গেছে, ভারত পরাধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়েছে, এ কথা ত আজ একান্ত অবিসংবাদী সত্য।

বাপুজীর মহাপ্রয়াণ তাঁর মহাজীবনকে চরম মহিমায় মণ্ডিত ক'রে দিয়ে গেল। শেষ আহুতির সেই মুহূর্তটি কি করুণাঘন—সত্য, প্রেম, অহিংসা যেন নিবিড় আলিঙ্গনে সেই পরম ক্ষণটির মধ্যে স্থির ও পরিমুক্ত হ'য়ে আছে। সেই চরম মুহূর্তটি স্বর্গে মর্ত্যে বাপুজীর জয় ঘোষণা করেছে। আর কালপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে যেন মানুষের সত্যসাধনার চিরসাথীরূপে বিরাজ করছে।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাপুজী শেষ কথা ব'লে গেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতার প্রাথমিক ব্যাপার যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কংগ্রেস তা অর্জন ক'রেছে। এইবার সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা তাকে অর্জন করতে হবে—তবেই ভারতে কৃষক-প্রজা-মজুররাজ বা পঞ্চায়েতরাজ গঠিত হবে। সেই পথেই আজ আমাদের কর্ম্মচেষ্টা চলবে। সাত লক্ষ গ্রামে গাঁথা ভারতবর্ষে বাপুজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্ম্মীর দলকে আজ লোকসেবার কারণে কর্ম্মযোগ গ্রহণ করতে হবে। বাপুজীর এই শেষ আহ্বান। নিষ্কাম কর্ম্মীর নিরলস, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সঙ্ঘবদ্ধ লোকসেবা ভারতময় বাপুজীর সাধনাকে বহন করুক। সেই পথেই ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে, সাধু শ্রমের উপর নতুন সমাজ গঠন করে পৃথিবীতে বিপ্লব ঘটাবে। গান্ধীজীর আহ্বান সেই পথে—আমাদের গান্ধীজী—সেই ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিঃ শাশ্বতী!

দুর্বিবহ দুঃখের দিনে আজ ভারতের আর এক যোগী বলছেন—যে আলো পথ দেখিয়ে স্বাধীনতা এনেছে সেই আলোই পথ দেখাবে, যতদিন না ভারতবর্ষের জয় সম্পূর্ণ হয়।

জয়তু গান্ধীজী, জয়তু গান্ধীজী, জয়তু গান্ধীজী!

জাতীয় প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আই-সি-এস

যাঁর অনির্বাণ তপস্যার ফলে স্বাধীনতার স্বাদ পেলুম তাঁরই জীবনশিখা নির্বাপন করে ও করতে দিয়ে মহাপাতকের ভাগী হলুম আমরা চল্লিশ কোটি নরনারী। সময় থাকতে যদি মহাপ্রায়শ্চিত্ত না করি তবে স্বাধীনতা আমাদের ছাড়বেই, লক্ষ্মী তো অনেকদিন ছেড়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ মহাপাপের তুলনা নেই, কারণ এ অকৃতজ্ঞতার তুলনা নেই। বার্ত্তা যখন কানে এলো প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। বিশ্বাস যখন হলো বার বার প্রার্থনা করলুম, হে ভগবান, আমাদের মার্জনা করো। আমাদের ক্ষমা করো।

ইহুদীরা এখনো ক্ষমা পায়নি, দু' হাজার বছর ধরে সাজা পেয়ে আসছে। মান নেই, ইজ্জৎ নেই, বাসভূমি নেই, এক স্থান থেকে অপর স্থানে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, নিহত। কেন তাদের এই শাস্তি? কারণ তারা তাদের প্রেমিককে বধ করেছিল। আমরাও তাই করেছি। আমাদের পাপের পরিমাণ বেশী, কারণ আমাদের প্রেমিক আমাদের মুক্তির স্বাদ দিয়ে গেছেন।

জগতের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে মাথা আমাদের আবার হেঁট হলো। এই অর্ধ অবনমিত জাতীয় পতাকা কি আবার সগর্বে উড়বে? কে জানে সে কত কাল পরে! তেরো দিন, না তেরো বছর, না তেরো শো বছর!

জনগণের শাশ্বত ক্ষুধা তিনটি। স্বাধীনতার ক্ষুধা, শান্তির ক্ষুধা, অন্নের ক্ষুধা। স্বাধীনতার ক্ষুধা তাঁরই সাধনায় মিটেছে। শান্তির ক্ষুধা তাঁরই প্রভাবে মিটতে যাচ্ছিল। অন্নের ক্ষুধা তাঁরই গঠনপ্রতিভায় মিটত। তাঁকে যারা অকালে অপসারণ করল তারা কোটি কোটি নিরন্নের মুখের গ্রাস কেড়ে নিল। আর কেড়ে নিল জীবনের শান্তি।

জানিনে প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতি কী, মেয়াদ কতকাল। যে অধর্মবুদ্ধি, যে বিবেকহীনতা সমাজের উচ্চতম স্তর থেকে এ অপকর্মের প্রেরণা ও প্ররোচনা দিয়েছে, হয় তার সংশোধন ঘটবে, নয় তার আশ্রয় ভাঙবে। সমাজের উচ্চতম স্তর ধুলোয় লুটোবে, রাশিয়ার মতো।

হয় চিত্তবিপ্লব, নয় সমাজবিপ্লব। আর নয়তো স্বাধীনতা বিলোপ। সেই সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ, মন্বন্তর। নৈতিক অধঃপতনের শাস্তি এমনি নিষ্ঠুর।

সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা

১৮৬৯—২রা অক্টোবর গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দরে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম করমচাঁদ বা কাবা গান্ধী, মাতার নাম পুতলিবাঈ।

১৮৭৬—তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাঁহার পিতা দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী হইয়া রাজকোটে যান। এই বৎসরই রাজকোটে তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় গান্ধীজী

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

১৮৮৩—তের বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম কস্তুরাবাঈ।

১৮৮৬—গান্ধীজীর বয়স যখন ১৬ বৎসর তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

১৮৮৭—ম্যাট্রিক পাশ করেন।

১৮৮৮—ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশের পর গান্ধীজী কিছুদিন কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপর ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার মাতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, বিলাতে গিয়া তিনি মদ্যপান করিবেন না, মাংস খাইবেন না এবং স্ত্রীসংসর্গ করিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা বিলাতে তাঁহাকে বহু প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

১৮৯০—একটি প্রদর্শনী দেখিবার জন্য তিনি প্যারিসে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ৭ দিন ছিলেন।

১৮৯১—১০ই জুন তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া ১২ই জুন ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। দেশে পৌঁছিয়াই গান্ধীজী জানিতে পারেন, কিছু দিন পূর্বেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। দেশে ফিরিয়া প্রথমে তিনি কয়েক মাস বোম্বাইয়ে ব্যারিষ্টারী করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। বোম্বাই হইতে তিনি রাজকোটে যাইয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তাঁহার মাসিক আয় ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়।

১৮৯৩—দাদা আবদুল্লা নামক এক ধনী ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বড় ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩৭ লক্ষ টাকার একটা মামলা চলিতেছিল। ঐ মামলা সম্পর্কে তাঁহারা গান্ধীজীকে এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত করিতে চাহেন। তিনি তাঁহাদের এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এপ্রিল মাসে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন।...ট্রান্সভালে ভারতীয়দিগকে ফুটপাথে চলিতে

লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়ার সময় গান্ধীজী (১৮৯০)

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

দেওয়া হয় না। গান্ধীজী প্রাতঃভ্রমণের জন্ত একটা রাস্তার ফুটপাথ দিয়া রোজই যাইতেন। সেই রাস্তায় প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের বাড়ি ছিল। একদিন একজন বুয়ার পাহারাওয়ালা তাঁহাকে ঐ বাড়ির ফটকের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় এবং লাথি মারিয়া ফুটপাত হইতে নামাইয়া দেয়।

১৮৯৪—তিনি নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস গঠন করেন এবং জীবিকা অর্জনের জন্ত ডারবানে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন।

১৮৯৬—পরিবার লইয়া যাইতে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষে আসেন। বোম্বাইতে ফিরোজ শা মেটা ও দিন শা ওয়াচার সাহায্য ও সহানুভূতিতে এক সভা করেন। শ্রীযুক্ত গোখলে এবং লোকমান্ত তিলকের সহিত এই সময়েই তাঁহার পরিচয় হয়। ১৮ই ডিসেম্বর তিনি ডারবানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফিরিয়া যান।

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহী গান্ধীজি

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্তে

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাগত সপত্নী গান্ধীজী

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্তে

১৮৯৯—ভারতীয় এ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গড়িয়া বুয়র যুদ্ধে সাহায্য করেন।

১৯০১—গান্ধীজী আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই বৎসর দীনশা এদুলজী ওয়াচার সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই প্রথম তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। কয়েক মাস বোম্বাইতে ব্যারিষ্টারী করিবার পরই আবার তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার ডাক পড়ে। তথনই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া যান।

১৯০৩—"ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ান" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ডারবানে ফিনিক্স আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৬—২২শে আগষ্ট ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্টের গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় "এশিয়াটিক অর্ডিনেন্স বিলের' খসড়া প্রকাশিত হয়। এই

দক্ষিণ আফ্রিকায় জুলু বিদ্রোহের সময় ভারতীয় এম্বুলেন্স্ বাহিনীর ক্যাপ্টেন (১৯০৬)

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্তে

আইনের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং যাহারা ঐখানে থাকিবে তাহাদিগকে দাগী আসামীর মত করিয়া রাখা। সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী ট্রান্সভালে চলিয়া যান। ১১ই সেপ্টেম্বর এই আইনের প্রতিবাদে এক জনসভায় গান্ধীজী প্রথম অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি ঘোষণা করেন।

১৯০৭—এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করেন এবং জনসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য আইন-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন।

১৯০৮—ট্রান্সভাল ছাড়িয়া যাইবার আদেশ অমান্য করিবার জন্য ১০ই জানুয়ারী তিনি ২ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ৩০শে জানুয়ারী জেনারেল স্মার্টসের সহিত আপোষ হওয়ায় তিনি মুক্তি পাইলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী এক ভারতীয় ভুল বুঝিয়া তাঁহার জীবন-নাশের চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন। জেনারেল স্মার্টস চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় ১৬ই আগষ্ট পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৫ই অক্টোবর মহাত্মাজী ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯০৯—"হিন্দ্ স্বরাজ" নামক পুস্তক রচনা করেন।

১৯১০—জোহেন্সবার্গের সন্নিকটে 'টলষ্টয় ফার্ম' প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১১—সহকর্মীর পতনের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মহাত্মাজী প্রথম ১ সপ্তাহ ও পরে ১৪ দিন অনশন করেন।

১৯১৩—ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় তিনি পুনরায় সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন এবং ১১ই নভেম্বর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু ১৮ই ডিসেম্বর বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করেন।

১৯১৪—এশিয়াটিক অর্ডিনেন্স উঠিয়া যাওয়ায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি ইংলণ্ডের পথে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৯১৫—২৫শে মে আহ্মেদাবাদে সত্যাগ্রহ আশ্রম (পরে সবরমতী আশ্রম) স্থাপন করেন।

১৯১৮—নীলকর চাষীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করার জন্য চম্পারন সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্দোলন সফল হয়।

১৯১৯—ইয়ং ইণ্ডিয়া (ইংরাজী) ও নবজীবন (হিন্দী) পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন। ১৩ই এপ্রিল অনশন করিয়াছিলেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আইন অমান্যের জন্য তিনি সত্যাগ্রহ সভা গঠন করেন। ৬ই এপ্রিল হরতাল ঘোষণায় দ্বারা ভারতব্যাপী আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং সেই হরতাল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন সম্পর্কেই অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ডায়ারী হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনায় সারা দেশ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহার পরেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর স্মৃতিমণ্ডিত অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই কংগ্রেসেই দেখা যায়, জনসাধারণ আপনা হইতেই গান্ধীজীকে নেতৃরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

১৯২০—সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজী অসহযোগের প্রস্তাব করেন। এই কলিকাতা কংগ্রেসই কংগ্রেসের ইতিহাসে নূতন গান্ধীযুগের সূচনা করে। কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী সারা দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের আলোড়ন উপস্থিত হয়। আইন-সভা বর্জন, স্কুল কলেজ বর্জন, আইন-আদালত বর্জন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি সাফল্যমণ্ডিত হয়। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ কর্মপন্থা গৃহীত হয়।

১৯২১—আমেদাবাদ কংগ্রেসে নিরুপদ্রব আইন অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে বহু সহস্র নরনারী কারাগারে প্রেরিত হন। বহুলোক পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের সম্মুখীন হন। ৯ই নভেম্বর বোম্বাই দাঙ্গার জন্য তিনি অনশন করেন এবং ১৩ই নভেম্বর অনশন ভঙ্গ করেন।

কস্তুরবাঈ গান্ধী ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

১৯২২—ফেব্রুয়ারী মাসে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ১০ই মার্চ রাজদ্রোহের অভিযোগে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৮ই মার্চ আমেদাবাদের দায়রা জজ কর্তৃক গান্ধীজী ৭ বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২৪—ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী কারামুক্ত হন। বেলগাঁওতে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেলগাঁও কংগ্রেসের পর গান্ধীজী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং চরকা প্রচারে ব্রতী হন। কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি স্থগিত রাখা হয়। ঐ বৎসর গান্ধীজী নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ গঠন করেন।

১৯২৫-২৯—গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উত্থাপিত এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, এক বৎসরের মধ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি

নেহরু কমিটির শাসনতন্ত্র গ্রহণ না করেন, তবে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার নামে আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সমস্ত ভারতে স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা গান্ধী মার্চ মাসে গবর্ণমেণ্টকে চরমপত্র দানের পর আইন অমান্ত আন্দোলন সুরু করিয়া দেন।

১৯৩০—১২ই মার্চ ৭৯জন সত্যাগ্রহী সহ লবণ আইন অমান্তের জন্ত ডাণ্ডী যাত্রা করেন। ৫ই মে বিনা বিচারে বন্দী হইলেন। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স পুনরুজ্জীবিত হইল। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায়ও বাঙ্গলার বাহিরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও দেখা দিল।

১৯৩১—২৬শে জানুয়ারী বড়লাট ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্ত সদস্যগণের সহিত মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেন। ৪ঠা মার্চ, 'গান্ধী-আরউইন' চুক্তি হয় ও আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। ২৯শে মে গান্ধীজী 'রাজপুতানা' জাহাজে করিয়া রাউণ্ড টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্ত বিলাত যাত্রা করেন।

১৯৩২—বোম্বাইয়ে মনি ভবনে ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। হরিজনদের জন্ত পৃথক নির্ব্বাচনের প্রতিবাদে তিনি ২০শে সেপ্টেম্বর আমৃত্যু অনশন করেন। পুনা চুক্তির ফলে তিনি ২৬শে সেপ্টেম্বর উপবাস ভঙ্গ করেন।

১৯৩৩—৮ই মে আত্মশুদ্ধি ও কর্মীদের শুদ্ধির জন্ত ২১ দিনের উপবাস আরম্ভ করেন এবং ঐ দিনই তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী আইন অমান্ত এক মাসের জন্ত স্থগিত বলিয়া ঘোষণা করেন। পুনরায় ১লা আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্তা কস্তুরবা গান্ধী, মহাদেব দেশাই ও সবরমতী আশ্রমের আরও ৩২জনকে শেঠ রণছোড়লালের বাংলো হইতে গ্রেপ্তার করিয়া সবরমতী জেলে লইয়া যাওয়া হয়। ৪ঠা আগষ্ট পুনায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ৭ই নভেম্বর হইতে তিনি হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নের জন্ত সমগ্র দেশে সফর করেন। এই সফরকালে একশ্রেণী সঙ্কীর্ণচেতা হিন্দু তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল।

১৯৩৪—১লা অক্টোবর হইতে রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া পল্লীশিল্প, হরিজনসেবা ও বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৯—৩রা মার্চ রাজকোটে অনশন আরম্ভ করেন, কিন্তু বড়লাটের মধ্যস্থতায় প্রতিনিবৃত্ত হন।

১৯৪০—৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন। ১৩ই অক্টোবর ওয়ার্দ্ধায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে, ব্যাপকভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন না করিয়া মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা করিয়া সত্যাগ্রহ সুরু করা হইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ, বহু কংগ্রেস নেতা ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা এই সত্যাগ্রহে যোগদান করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করেন।

১৯৪২—২৭শে মার্চ স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সঙ্গে দেখা করেন। ৮ই আগষ্ট মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব বোম্বাইতে এ-আই-সি-সিতে গৃহীত হয়। ৯ই আগষ্ট মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মহাত্মা জাতিকে "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া যান। গান্ধীজীকে আগা খাঁ প্রসাদে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৫ই আগষ্ট মহাদেব দেশাইএর মৃত্যু হয়।

১৯৪৩—১০ ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী পুনায় বন্দিনিবাসে (আগা খাঁ প্রাসাদে) অনশন আরম্ভ করেন। ৩রা মার্চ তিনি ২১ দিন ব্যাপী অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৪৪—২২শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধী পুনায় প্রাসাদকারায় পরলোকগমন করেন। ৬ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী বিনা সর্তে মুক্তিলাভ করেন।

১৯৪৫—জুন মাসে সিমলায় নেতৃসম্মেলনে বৃটিশ প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনায় মহাত্মা গান্ধীকে বৈঠকের সময় সিমলায় উপস্থিত থাকিবার জন্ত লর্ড ওয়াভেল অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৬—এপ্রিল মাসে নয়াদিল্লীতে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স এবং স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা করেন। অতঃপর মে মাসে সিমলায় মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত বড়লাট ও বৃটিশ মন্ত্রীসভার সদস্যদের বৈঠক হয়। অতঃপর জুন মাসে হরিজনে এক প্রবন্ধে গান্ধীজী অবিলম্বে ভারত হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী জানান। ১০ই অক্টোবর নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হয়। ৭ই নভেম্বর গান্ধীজী দাঙ্গাবিধ্বস্ত পূর্ব্ব বঙ্গ পরিদর্শন করিবার জন্ত সদলবলে চৌমুহনী পৌছেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া নোয়াখালি দাঙ্গার ধ্বংসলীলা দেখেন।

১৯৪৭—২রা জানুয়ারী প্রাতে গান্ধীজী চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা

শান্তি অভিযানে মহামানব ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

করেন এবং এখান হইতে তাঁহার ঐতিহাসিক পল্লী পরিক্রমা সুরু হয়। নোয়াখালি পরিক্রমার গান্ধীজীর বিরাট জীবনের আর একটি বিরাট আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পল্লীর প্রতি গৃহে গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যাচারিত মানবের সেবা করিতে আর কোন মহাপুরুষকেই ইহার পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ৩রা মার্চ্চ গান্ধীজী নোয়াখালী পরিক্রমা শেষ করিয়া সোদপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং এখান হইতে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন। ১২ই মার্চ বিহার পরিক্রমা সুরু হয়—২৫ দিন পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে মহাত্মাজী দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারত স্বাধীন হইবে। ৩রা জুন পুনরায় ভারতবর্ষ বিভক্ত করিয়া ভারত ও পাকিস্থান নামক দুইটি ডোমিনিয়ন গঠন করার কথা ঘোষিত হয়।

গান্ধীজী ভারত বিভাগের প্রস্তাবে অত্যন্ত দুঃখিত হন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য তিনি এই প্রস্তাব স্বীকার করেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। তদনুসারে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১লা এপ্রিল নয়া দিল্লীতে এশিয়া মহাসম্মেলনে গান্ধীজী অখণ্ড বিশ্ব গঠনের ইচ্ছা ঘোষণা করেন। ৫ই এপ্রিল হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য তিনি ২৪ ঘণ্টার জন্য অনশন করেন। ১৫ই তাঁহার জাতির প্রতি ঐক্যের আবেদন প্রচারিত হয়। ইহাতে হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের নিন্দা করিয়া দেশের লোককে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইতে অনুরোধ করা হয়। ৬ই মে পুনরায় গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার হয় এবং গান্ধীজী ভারত বিভাগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

অবশেষে ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে গান্ধীজী কাশ্মীরে যান এবং কাশ্মীরবাসীদের ইচ্ছানুযায়ী কাশ্মীরের ভবিষ্যত নির্দ্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময়ে কলিকাতা দাঙ্গার খবরে গান্ধীজী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং কলিকাতা আগমন করেন। তিনি বেলিয়াঘাটার দাঙ্গা-

বিহারে শান্তি অভিযানে মহাত্মা

ফটো—দৈনিক ভারতের সৌজন্যে

বিধ্বস্ত অঞ্চলের এক পরিত্যক্ত মুসলমানের বাড়িতে জনাব সুরাবর্দ্দিসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের এক অভূতপূর্ব্ব স্বতস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তিতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ায় গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর দাঙ্গা থামিয়া যায় এবং কলিকাতায় পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে। নেতৃবৃন্দও শান্তি বজায় রাখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন।

১৯৪৮—১৩ই জানুয়ারী হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গান্ধীজী অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দিল্লীতে অনশন আরম্ভ করেন। ১৮ই জানুয়ারী অনশন ভঙ্গ হয়। ২০শে জানুয়ারী প্রার্থনা সভায় মহাত্মার ১৫ গজ দূরে একটি বোমা পড়ে কিন্তু তিনি কোনরূপ বিচলিত না হইয়া বক্তৃতা করিতে থাকেন। ৩০শে জানুয়ারী ৫টা ৫ মিনিটে এক উন্মত্তের গুলিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনাবসান হয়। ৩১শে জানুয়ারী রাজকীয় সম্মানের সহিত যমুনা তীরে এই সর্ব্বত্যাগী ফকিরের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হয়।

গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী। তখন আমরা দিল্লীতে।

বিকালে বন্ধুবর শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের গৃহে বসে আলোচনা করছিলাম—কংগ্রেসের পুনর্গঠন সম্বন্ধে গান্ধীজীর নূতন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় আমার গৃহ হ'তে ফোন (phone) করল—আততায়ীর গুলির আঘাতে মহাত্মাজী নিহত। বিশ্বাস হ'ল না কথাটা। সত্যই এত বড় উন্মাদ কেউ হ'তে পারে—এ যেন কল্পনায়ও আসতে চায় না। ফোনে ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা হ'ল—খবর সত্য।

এক মুহূর্তে যেন সব অন্ধকার মনে হ'ল। সুরেনবাবুর আগ্রহ হ'ল—তখনই একবার বিরলার গৃহে যাওয়া। আমার ইচ্ছা গৃহকোণে নিজের মনকে নিয়ে কিছু সময় একলা থাকা। সুরেনবাবুকে প্রায় ফাঁকি দিয়েই নিজের গৃহে চলে এলাম। বাসায় ঢুকে দেখি বসবার ঘরে ৩।৪টি লোক ব'সে আছে। তাদের এড়িয়ে নিজের কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছু সময় পরেই সুরেনবাবুর আহ্বান এল—বিরলা গৃহে যেতে হবে। যেটুকু সময় নিরালা ছিলাম, তার মধ্যে যেন নিজেকে গুছিয়ে নেবার কিছু অবসর পেলাম।

আমাদের জীবনে গান্ধীজী কখনও তেমন ভাবে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর প্রবেশের বহুপূর্বে আমরা রাজনীতি সুরু করেছি। ছোট বয়স হ'তে রাজনীতির যে শিক্ষা-দীক্ষা আমরা পেয়েছি এবং রাজনীতির যে রূপ আমাদের জীবনের একটা বিশেষ অংশকে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করেছিল, তার সঙ্গে গান্ধীজীর রাজনীতির একটা বেশ পার্থক্য ছিল। ১৯২০ সালে জেলে থাকতেই আমরা গান্ধীজীকে গ্রহণ করেছি;—কিন্তু তাঁর সব কিছু গ্রহণ করি নি। অন্ধভক্ত হিসাবে তাঁর কাছে আমরা যাই নি;—গিয়েছি তীব্র সমালোচক হিসাবে—কিন্তু তাঁর গুণগ্রাহী হ'য়ে। গান্ধীজীর ভক্তদের যে একটা বিশেষ গণ্ডী ছিল, আমরা কোন দিনই তার ভিতর ছিলাম না। আমাদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক জীবন মূলত গান্ধী-নিরপেক্ষই ছিল।

তবুও গান্ধীজীর মৃত্যুতে এমন দিশেহারা হয়েছি কেন? কলিকাতা থেকে বন্ধুবর শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত লিখছেন—"আজ মনে হচ্ছে যেন জাতের আর কোন আশা ভরসাই নেই। তাঁর পায়ের তলা থেকে পৃথিবীর মাটি যেন সরে গেছে; তার চোখের সামনে থেকে যেন সব আদর্শ মুছে গেছে। কি সম্বল নিয়ে যে আজ জাত চলবে ভেবে পাই না…।"

দিল্লীর রাজপথে মহাত্মার শব সহ বিরাট শোভাযাত্রা • ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

সুরেনবাবু ত' অসুস্থ ও দুর্বল শরীর নিয়ে সেই রাত্রি এবং তার পরদিন সকাল থেকে রাত ৯টা পর্য্যন্ত ছুটাছুটি ক'রেই বেড়িয়েছেন—গান্ধীজীর মৃতদেহের একটু দৃশ্য দেখবার জন্য।

আমাদের মনের অবস্থা থেকে বুঝতে পারি—কংগ্রেস নেতৃবর্গের মনের অবস্থা কি হ'তে পারে। সেদিন রাত্রে বিরলা গৃহের সামনে সমবেত জনতাকে শান্তভাবে চলে যাবার জন্য জওহরলাল ক্রমাগত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে থেমে থেমে বলছিলেন। জওহরলালের সঙ্গে সমবেত জনতা হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে সুরু করেছিল।

জওহরলালের প্রথম কথা হ'ল—আলো নিভে গেছে। তাঁর চোখের সামনের আলো, জাতির চোখের সামনের আলো সব নিভে গেছে।

ঠিক এর ৭ দিন পূর্বে আমি দিল্লী এসেছি। ১৮ই গান্ধীজী উপবাস ভঙ্গ করেন, তার ২।৩ দিন পর ২০শে তাঁর উপর বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা

হয়। তার ২।৩ দিন পরই আমরা দিল্লী এসেছি। ঐ উপবাস ও বোমা নিক্ষেপে হত্যার চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা এসে দেখলাম—গান্ধীজীর প্রতি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার চেয়ে বিরাগ ও বিরক্তিই প্রবল। গান্ধীজী হিন্দুদের উপর জুলুম করছেন—এই মনোভাব প্রায় সর্বব্যাপী। মুসলমান ও পাকিস্থানের তোষণের জন্য তিনি ব্যগ্র—এই অভিযোগ প্রায় সর্বত্র। রোজ রোজ প্রার্থনান্তিক সভায় তিনি যে ভাষণ দিচ্ছিলেন—তা কারুর কান দিয়েও ঢুকছিল না, মনকেও স্পর্শ করছিল না। দিল্লী শহরে অযাচিতভাবে এসে অনেকে আমাদের জানিয়ে গেছে—তারা সবাই কংগ্রেসেরই ভক্ত, কিন্তু তার জন্য এমনি মুসলমান তোষণের সমর্থক তারা নয়। এর পর যে সব বাক্য বলত তা সাধারণত জনসমাজে বলার নয়।

এই আবহাওয়ায় গত কয়মাসের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অসম্ভব প্রসার ও প্রতিপত্তি হয়। আজ যারা গান্ধীজীর মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে রা ষ্বঃ সেঃ সংঘের ও হিন্দুমহাসভার ঘাড়ে লাঠি মারতে ছুটছে, ৩০শে জানুয়ারী বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাদের অনেকেই ঐ সংঘ ও ঐ মহাসভার অনুকূল মনোভাব ছড়িয়ে বেড়িয়েছে।

আজ আত্ম-বিশ্লেষণ করলে অনেকে দেখবে—মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর জন্য কেবল মদনলাল ও গোড়সেই দায়ী নয়—সাধারণ জনতাও অনেকটা দায়ী। গান্ধীজীর মৃত্যুর খবরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন নগরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে। এই ভাবে মিষ্টি বিতরণ আপনা থেকে হয় নি; একটা ষড়যন্ত্রের নির্দেশেই এটা সম্ভব। ষড়যন্ত্রকারীরা জানত বা মনে করত—দেশে যে আবহাওয়া চলছে—যে মনোভাব বাড়ছে, তাতে গান্ধীজীর হত্যাকে মিষ্টি বিতরণের মতো উপযুক্ত ঘটনা ব'লে লোকে মনে করবে। এই মনোভাব প্রচার করেছে কে? এই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে কে? কংগ্রেস অনুরাগী সাধারণ হিন্দু জনতাই এই মনোভাব ও এই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। নিজেদের কৃতকর্মের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে আজ তারা স্তম্ভিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাসে" পুত্রশোকাতুরা মা দেবতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

> "শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা
> শোন নি কি জননীর অন্তরের কথা!"

আজ দেশবাসীর মনের অবস্থা ঐ পাগলিনী মোক্ষদার মনের মতো। ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় তারা কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে গাল দিয়েছে—গান্ধীকে দেশের ও হিন্দু ধর্মের শত্রু বলে অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু এটা ছিল তাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির বিরক্তির কথা—অন্তরের কথা নয়। তারা অন্তরে অন্তরে জানত—কংগ্রেস ও গান্ধী ভিন্ন তাদের সত্যিকার মিত্র কেউ নেই। কলিকাতার দাঙ্গায়, নোয়াখালীর হাঙ্গামায় গান্ধী ও কংগ্রেসই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—সুখে-দুঃখে কংগ্রেস ও গান্ধীই তাদের বল ও ভরসা দিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা এনেছে গান্ধী ও কংগ্রেস; এই স্বাধীনতাকে সমাজে ও জীবনে রূপ দিয়ে ফুটিয়েও তুলবে—গান্ধী ও কংগ্রেস। অন্ধকার ও দুর্যোগের মধ্যে এই আশা নিয়েই তারা ছিল।

দুঃখ ও দৈন্য চারিদিক থেকে মানুষকে ছেয়ে ফেলছে। যেখানে কোন পথের সন্ধান নেই—সেখানে তারা তাকিয়েছে কংগ্রেস ও গান্ধীর দিকে, পথের সন্ধানের জন্য। চারিদিক থেকে হিংসা ও বিদ্বেষের পাগলা ঢেউ আসছে; দেশের জনতা ভরসা করছে—গান্ধী ও কংগ্রেসের তরণী চড়ে তারা ঢেউ উত্তীর্ণ হবে। খাবার নেই, পরবার নেই; দেশবাসী আশা করেছে যাদুমন্ত্র বলে কংগ্রেস ও গান্ধী এই সব

দিল্লীর রাজপথে শোভাযাত্রার একাংশ ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

জুটিয়ে দিবে। আশে-পাশে সর্বত্র আমরা চোরাবাজার ও অসততার দোকান খুলে রেখেছি—আর আশা করেছি গান্ধী ও কংগ্রেস সব বন্ধ করে দিবে। আশা আমাদের সর্বমুখী; কিন্তু সেই আশা পূরণ করার মতো উৎসাহ ও উদ্যম আমাদের নেই। গান্ধীর ফুক মন্ত্রে যেন সব আসমান ফুটে পড়বে। এই রাষ্ট্র তরী যখন দেহে অসংখ্য ছিদ্র ধারণ করে প্রায় ডুবু ডুবু ঠিক তখন ইংরাজ তা দেশবাসীর হাতে দিয়ে সরে পড়ল। দেশবাসীর আশা ও দাবী রইল অফুরন্ত; কিন্তু তা আশু পূরণের সুযোগ রইল না কিছুই। সবই সময় সাপেক্ষ;—দীর্ঘ দিনের চেষ্টার প্রয়োজন আছে এর সবটাতেই।

কিন্তু অভাবগ্রস্ত দুস্থ মানব বিচারের দিক দিয়ে ত ভাবে না;—তারা যাবে ও গিয়েছে নিজেদের দাবীর দিক দিয়ে। তাতে হয়েছে নিরাশ। ১৫ই আগষ্ট থেকে ৩০শে জানুয়ারীর মধ্যে তাদের কোন অভাবই মিটেনি। তার উপর এসেছে—মূল-উৎপাটিত লক্ষ লক্ষ নর-

নারী। বাড়ি ঘর ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজন হারিয়ে, আদরের কন্যা, ভগিনী স্ত্রীকে অপরের বিলাস সামগ্রী হ'তে দেখে—আশ্রয়হীন, সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ নরনারী এক একটি অসন্তোষের অগ্নিপিণ্ড হ'য়ে দেশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে এর জন্য দায়ী? চারিদিক থেকে রব উঠছে—কংগ্রেস ও গান্ধী। দেশের নেতা কংগ্রেস, দেশের নেতা গান্ধী। তাই অবনত মস্তকে সবার সব দায়িত্বের বোঝা তারা স্বীকার ক'রে নিচ্ছে। দেশ বিভাগের সময় যারা ছিল মুখের বচনে শত মুখ,—দেশ বিভাগের ঠিক প্রাক্কালে যারা এর জন্য বাহাদুরী নিয়েছে ষোল আনা—এই মূল উৎসাদিত মানবের দুঃখ দহনের সামনে তারা গিয়ে লুকাল মূষিকগর্তে। তখন তারা কংগ্রেসের দিকে অঙ্গুলি দেখিয়ে সরে পড়ল। কিন্তু কংগ্রেস ও গান্ধী জানত—দেশের সমগ্র সুখ-দুঃখের দায়িত্ব তাদের। তারা যে কারুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নিরাপদ কোনে সরে দাঁড়াতে পারে না। সমুদ্র মন্থন করেছে অনেক বাহাদুর মিলে; কিন্তু যখন তা থেকে বিষ উঠল, তখন ডাক পড়ল নীলকণ্ঠের। বিপ্লবের সমুদ্র-মন্থন থেকে যে বিষ উৎগীর্ণ হ'চ্ছে—কংগ্রেস ও গান্ধী নীলকণ্ঠের মতো তা ধারণ করল। যার যত দোষ-ত্রুটি, যার যত অপবাদ সবাই সব এনে ফেলেছে—কংগ্রেস ও গান্ধীর স্কন্ধে। তারাও তা মেনে নিয়েছে;—কারণ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে দেশকে চালাবার দায়িত্ব যে নিয়েছিল কংগ্রেস ও গান্ধী।

কাজেই স্তূপাকার হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে গ্লানি;—বিরাট হয়ে জমেছে তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ। আর সেই সুযোগে বাম ও দক্ষিণে যে যার ঘর গুছাবার প্রয়াস পেয়েছে। আজ গোড়সের বিরুদ্ধে সবার রাগ—বামপন্থীরা আজ সর্দার পেটেলের মুণ্ড দাবী করেছে—কেন গোড়সেকে হত্যা থেকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। অথচ কয়মাস পূর্বে যখন গোড়সের কুৎসাপূর্ণ কাগজের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকার ৬০০০৲ টাকা জামীন দাবী করেছিল, তখন সব বামপন্থী কংগ্রেসকে পেটাবার এক ভাল যষ্টি হিসাবে তা প্রয়োগ করেছিল। সবাই মিলে চাঁদা তুলে ৬০০০৲ টাকার পরিবর্তে ১০০০০৲ হাজার টাকা গোড়সের হাতে তুলে দিয়েছিল।

যে মহামানব পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর গায় হাত তুলতে সাহস পেল এই গোড়সে। মানবতায় যিনি অতুলনীয়, মহত্বে যিনি বিরাট, দাক্ষিণ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, কর্মে যিনি অমিত, ধর্মে যিনি মহীয়ান, মর্মে যিনি সকলের অন্তরঙ্গ—সেই গান্ধী—ক্ষীণকায় কটিবাস গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। দেশের অন্তরে যে অন্ধ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল—এই গুলি তারই স্ফুরণ। নতুবা গোড়সে বা এমনি কোন লোকের পক্ষে এই দুঃসাহস হ'তে পারে না।

গান্ধী বিপ্লবী, গান্ধী যুগপ্রবর্তক। যে যুগে তাঁর জন্ম, সেটা তাঁর পক্ষে অতীত। তাঁর সমকালীনদের পক্ষে সে যুগ এখনও অনাগত, সত্যিকার ভাবে দেখতে গেলে, গান্ধী ছিলেন সেই যুগের। যে মতবাদ তিনি প্রচার করতেন, যে আদর্শের প্রেরণা তিনি দিতেন, যে পথে তিনি চলতেন—তা সবই আজকার মানবের অনধিগম্য। কাজেই এই বেখাপ্পা মানুষটিকে তারা বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তাই যুগপ্রবর্তক বিপ্লবীদের মৃত্যু প্রায় এমনি অবস্থায়ই হয়।

শ্রীকৃষ্ণ মরেছিলেন ব্যাধের তীরে; বুদ্ধ মরেছিলেন মারবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শূকর-মাংস ভক্ষণ করে; সক্রেটিস মরেছিলেন বিষ পান করে—আর যিশু মরেছিলেন ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হ'য়ে—সাধারণ চোর ডাকাতের সঙ্গে। এর মধ্যে সক্রেটিস ও যিশুকে তাঁদের নিজ নিজ সমাজ গ্রহণ করে নি। সমাজের তরফ থেকে তাদের দণ্ড দেওয়া হ'ল—মৃত্যুদণ্ড। সক্রেটিসের সময়ে গ্রীসে মৃত্যুদণ্ড পালিত হও বিষপ্রয়োগে; আর যিশুর সময় পেলেষ্টাইনে তা পালিত হ'ত ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ ক'রে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ও বুদ্ধকে তাঁদের সমাজ থেকে দণ্ড দেয় নি—বরং বলা যায় সমাজ তাঁদের গ্রহণ করেছিল। আজ গান্ধীর মৃত্যু এল আততায়ীর গুলিতে। এটা সমাজের প্রদত্ত দণ্ড নয়। কিন্তু এ'কথা ভুললে চলবে না যে আততায়ী বলে ধৃত নাথুরাম বিনায়ক গোড়সে কেবল একটা আলগা নয়; সমাজের বক্ষ থেকেই সে উঠেছে। পূর্বে বলেছি সমাজের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের যে দাহ জ্বলছিল, ঐ আততায়ীর গুলি তারই স্ফুরণ, সমাজের একদিকে গান্ধী ও অপর দিকে গোড়সে; এই দুইটি মানুষ।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে—প্রত্যেক জাতি তার যোগ্যতা মতো নেতা পায়। গান্ধী—মৃত্যুঞ্জয়ী গান্ধী ভারতের অবিসংবাদিত নেতা। এই যুগে আমরা যারা জন্মেছি—এটা আমাদের যোগ্যতারই পরিচায়ক এবং আমাদের গৌরবেরই বিষয়। গান্ধী আমাদের স্বাধীনতার দ্বারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। জগতের ইতিহাসে কোন জাতির স্বাধীনতা লাভের ঘটনা পরম্পরায় যদি কোন নেতার কিছুমাত্র কৃতিত্ব থাকে, তবে ভারতের স্বাধীনতা লাভে গান্ধীর তা আছে। সত্যিকারভাবে তিনি "Father of the nation"—জাতির জন্মদাতা—স্রষ্টা। তা সত্বেও, স্বাধীনতার দ্বারদেশে এসেই আমরা তাঁর প্রতি সন্দিহান হলাম। তবুও তিনি বলে চললেন—তাঁর যা বলার ছিল। যত তিনি বলে যাচ্ছেন—যত তিনি আমাদের কর্মের ও চিন্তার ত্রুটি দেখাচ্ছেন—ততই তাঁকে আমরা অস্বীকার ক'রে চলেছি। তারপর এল আততায়ীর গুলি। বিদ্বেষান্ধ জাতি—আত্ম-সম্বিত ফিরে পেল। আজ জাতি শোকে বিহ্বল। কি সে হারিয়েছে—তা হয় ত এখন বুঝছে।

সক্রেটিসের মৃত্যুর পর গ্রীস শোকে বিহ্বল হয় নি;—যিশুর মৃত্যুর পর ইহুদি জাতি শোকে বিহ্বল হয় নি। কিন্তু কৃষ্ণ ও বুদ্ধের মৃত্যুর পর ভারত শোকে বিহ্বল হয়েছিল;—আর আজ গান্ধীর মৃত্যুর পর ভারত শোকে বিহ্বল হয়েছে। জাতি আজ গান্ধীকে সত্যিকাররূপে গ্রহণ করেছে। জীবিত গান্ধীকে জাতি যতটা গ্রহণ করেছিল—মৃত গান্ধীকে জাতি তার চেয়ে বেশী ক'রে গ্রহণ করবে। নতুবা তাঁর এই আত্মাহুতির সার্থকতা কোথায় ও কিসে মিলবে?

জীবনের ও সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে গান্ধী তাঁর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা তিনি এনে দিয়েছেন, এখন এই স্বাধীনতাকে সমাজে ও অর্থনীতিতে ফুটিয়ে তুলবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভারতে এতকাল

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতি তিনি চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন—বিদেশী শাসন থাকতে এই মিলন সম্ভব নয়; তিনি এ-ও জানতেন—বিদেশী শাসনের অবসানের পর হয়ত আমরা আত্ম-কলহে নিমজ্জিত হব। কিন্তু একথাও ব'লে গেছেন—এখানেই এর শেষ নয়;—আত্ম-কলহের ভিতর দিয়ে আমরা পরস্পরকে একদিন যাতে চিনতে পারি—তার জন্ত আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে স্থির ও ধীর রাখতে হবে।

যখন দেশ স্বাধীনতা লাভের উল্লাসে উন্মত্ত, যখন কৃতজ্ঞ জাতি তার স্রষ্টার কুটির-দ্বারে গিয়ে তাঁর প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবার তোড়জোড়ও করছে, তিনি বললেন—তাঁর স্বাধীনতা এখনও আসে নি; বিশ্রামের বা উল্লাসের সময় তাঁর এখনও আসে নি। তিনি ছুটে চললেন—নোয়াখালীর দিকে। মানুষের মর্যাদা যেখানে অপমানিত হয়েছে;—তাকে পুন-প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমেদাবাদের সবরমতী আশ্রম ১৯৩০ সালে ত্যাগ ক'রে এসেছিলেন,—স্বাধীনতা না এলে আর সেই আশ্রমে যাবেন না। ভারত স্বাধীন হয়েছে;—যাঁরা এতকাল ভরতের মতো সেখানে তাঁর খড়ম পূজা করছিলেন—তাঁরা আহ্বান দিলেন—স্বাধীন ভারতে তুমি ফিরে এসো সবরমতীতে। তিনি বললেন—না, আমার স্বাধীনতা ত এখনও আসে নি; সবরমতী এখনও বহু দূর, নোয়াখালি বরং নিকট—"সবরমতী দুর অাস্ত"। কিন্তু নোয়াখালি যাবার পথে—তিনি আটকে গেলেন কলিকাতায়। কারণ তাঁর নিকট নোয়াখালি ও কলিকাতা দুটা বিচ্ছিন্ন সমস্যা বা স্থান নয়।

নোয়াখালী ও কলিকাতা তাঁর জীবনের পরম দান ও চরম সার্থকতা। নোয়াখালীতে যে বীজ বপন করেছিলেন, কলিকাতায় সেই বীজ থেকে অঙ্কুর বেরুল। এই অঙ্কুর থেকে গাছ হ'বে; তাতে ফুল হবে ও ফল হবে। তিনি ভেবেছিলেন—দিল্লীতে অন্তত গাছটা দেখতে পাবেন;—কিন্তু পেলেন না। নিজের রক্ত দিয়ে সেই অঙ্কুরের গোড়ার মাটিকে তিনি সরস ক'রে দিয়ে গেলেন।

এই গাছ একদিন বড় হবে;—তাতে ফুল হবে—ফল হবে। এই সাধনার দীক্ষাই ত' তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। যখন অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন—যখন কোথাও এতটুকু আলোর লেশ নেই—তখন নিজের অন্তরের আলো জ্বালিয়ে অন্ধকারের বক্ষ চিরে পথ করতে চেয়েছিলেন। অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে আলোর পথ তিনি তৈরি করেছেন। এই পথ বেয়ে আমাদের যেতে হবে নূতন উষার দেশে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন ভারতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে; একদিন বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন ভারতের ধর্মবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে; একদিন আচার্য শঙ্কর চেয়েছিলেন কুমারিকা হ'তে হরিদ্বার এবং দ্বারকা হ'তে পুরী পর্যন্ত আসমুদ্র ভারতকে নূতন ধর্মে দীক্ষা দিতে; একদিন শ্রীচৈতন্ত চেয়েছিলেন—পুরী, কুমারিকা, নাসিক, দ্বারকা, বৃন্দাবন, সমন্বিত ভারতে মানবতার ধর্মে উদ্বুদ্ধ করতে। ইতিহাস বলে—এদের সবাইর নাকি অপমৃত্যু হয়েছিল। আজ গান্ধী চাচ্ছিলেন—অহিংসা ও প্রেমের ভিত্তিতে ভারতে নূতন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। মহৎ প্রয়াসের দণ্ডস্বরূপ—বিপ্লবীর মৃত্যু তাঁর হ'ল। আমরা ক্ষুদ্র-বুদ্ধির লোক; তাই খেদ করি। কিন্তু মহতের মৃত্যু এই রকমই হয়। একেই বলে জীবনকে আহুতি দেওয়া; নিজের জীবন দিয়ে জীবন-যজ্ঞ সমাপন করা।

কিসের জন্ত তিনি এমনি ক'রে জীবনকে আহুতি দিলেন? ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ঐক্য স্থাপন, হিন্দু মুসলমানের সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা—এই কি তাঁর জীবনের শেষ কথা? না, তা নয়। তাঁর যা বাণী তা দেশ ও কালের অতীত—সমস্ত বিশ্বের, সমস্ত জীব-জগতের জন্ত সেই বাণী। বাহ্য সম্পদ মানুষ পেয়েছে প্রচুর; তা কুড়াতে গিয়ে সে তার অন্তরের সম্পদকে হারিয়েছে। তার ঐশ্বর্য ও বিলাস সম্ভারের মধ্যে মানুষ তার নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। গোলকধাঁধার অন্ধকারে—সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হারিয়ে যাওয়া মানুষকে খুঁজে বের করাই হ'ল গান্ধীর পরম শিক্ষা। কেবল পরিমাণের হিসাব নিয়েই আমরা এতদিন ব্যস্ত ছিলাম;—গান্ধী এসে বললেন পরিমাণের বাইরে পরিণামের হিসাবও করতে হবে। quality যে কেবল quantityর পরিণতি নয়—তার যে নিজস্ব একটা সত্ত্বা আছে গান্ধী সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইতিহাস যে পথে চলছিল, তার মোড় ফিরালেন গান্ধী। এত বড় একটা বিপ্লবের ধারা মানুষের ইতিহাসে তিনি এনে দিয়ে গেলেন। নূতন ক'রে লিখবার পূর্বে ইতিহাসের পুরাণো পাতার পুরাণো লেখা মুছবার জন্ত যে মানুষের রক্তের দরকার। তাই যুগে যুগে বিপ্লবের সঙ্গে আসে নরমেধযজ্ঞ। সেই নরমেধযজ্ঞ গান্ধী সম্পন্ন করলেন—নিজের রক্ত দিয়ে লিখলেন ইতিহাসের পুরাণো লেখাকে।

৩০শে জানুয়ারী বেলা পাঁচটা পর্যন্ত যে জনতা গান্ধীর প্রতি বিরূপতায় ক্রমেই স্ফীত হচ্ছিল, সেই জনতাই ছয়টার সময় মৃত গান্ধীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ইতিহাসের পুরাণো লেখা ধুয়ে মুছে গেল;—হয়ত রইল কেবল একটি লোকের বক্ষে। কার্পণ্যবুদ্ধির অন্ধকারে মহতকে অনুভব করার ক্ষমতা যার নেই আজকার দিনে করুণার স্পর্শ দিয়ে তাকে ক্ষমা করাই উচিত। অখণ্ড ভারতের হিন্দু ও মুসলমান আজ গান্ধীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। যে গান্ধী ছিল এক, সে আজ কোটি কোটি রূপে ফুঠে উঠেছে নর-নারীর বুকে।

ধন্ত আমরা—গান্ধীর দেশে এবং গান্ধীর যুগে আমরা জন্মেছি। জীবনের অক্লান্ত সেবা দিয়ে তিনি যা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, মৃত্যু দিয়ে তিনি তা প্রতিষ্ঠা ক'রে গেলেন। গান্ধী জীন্দাবাদ—জয়তু মহাত্মা—জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়।

মহা অভিযান

রাধারাণী দেবী

মানব-আকারে দৈববাণী তুমি!

হিংসা-উন্মত্ত বিংশ শতকের অহিংস মানব!
তুমি মহান্ আশ্চর্য।
আশ্চর্য তোমার জীবন-বাণী
আরও আশ্চর্য তোমার জীবনের পথ-চলা।

আবার শুরু হোলো তোমার নতুন যাত্রা,—
আর এক নতুন ডাণ্ডি-অভিযান;
নবীনতম সত্যাগ্রহ—
অভিনব নির্মম অসহযোগ।

এবার শুধু আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষই নয়,
কেঁপে উঠেচে সমগ্র ধরিত্রীভূমি;
দুলে উঠেচে সপ্ত সাগরের সকল পারের মানুষ
তোমার এই মহা অভিযানে।

জীবন-দীপ হাতে নিয়ে দুর্গম মৃত্যুলোকে
বারংবার যাত্রা করেছো তুমি।
অপরাজিত আত্মার বীর্যে ফিরে এসেছো আবার।

এবার বাক্য দিয়ে হোলোনা—
কর্ম দিয়ে হোলোনা—
কায়-মন উৎসর্গ করেও হোলোনা—
তাই, প্রাণ দিয়ে পৌঁছে দিতে হোলো বাণী
বিভ্রান্ত মানুষের প্রাণে।
জানি, এ ছাড়া তোমার উপায় রাখিনি আমরা।

একে হত্যা বলবোনা কখনই,—
একে মৃত্যু ভাবলে হবে মহাভ্রম;
এ যে তোমার নতুন যাত্রা
মানুষের মনুষ্যত্বের দ্বারে দ্বারে।
এবার আর নোয়াখালি—বিহার শুধু নয়,
সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার অরুন্তুদ অসূয়াবুদ্ধির বিরুদ্ধে
তোমার চরম অভিযাত্রা।

স্ব-সমুত্থ আদর্শের মহান্ শক্তি বলে
শেষবার ঘা' দিতে চেয়েচ
স্বার্থান্ধ মানুষের বিবেকের রুদ্ধ দুর্গে।
তাই—
সারা পৃথিবীর হিংসাবিশ্বাসী মানব
মিলিতকণ্ঠে আর্তবেদনায় বলছে
তুমিই চিরদিনের শ্রেয়োপথ-যাত্রী।
তুমি শ্রেষ্ঠ,
তুমিই শুভঙ্কর।

হে মহাতপস্বি! তোমার দিব্যপ্রাণের স্পর্শে
মৃত্যু হোলো আজ চির-অমরত্বে উন্নীত।

পুণ্যতীর্থ রাজঘাটে বাপুর শেষকৃত্য

ফটো—শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত (দিল্লী)

শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজীর সম্বর্দ্ধনা ফটো—ডি-রতন

বাপুজী গো ! ক্ষম ক্ষম

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত

শতসূর্য্যের তেজোরাশি লয়ে শব সাধনার দেশে ;
এসেছিলে তুমি হে মহামানব ! চিরভিখারীর বেশে।
হলাহল যত পান করেছিলে, নীলকণ্ঠের সম।
ভিক্ষাপাত্রে প্রেম যেচে তুমি ফিরেছিলে অনুপম !
বৈরাগী ! তুমি উদ্দাত্ত-সুরে গেয়েছিলে বারবার—
মানুষের বড় জাত নেই ভাই, একই সন্তান মা-র ॥

মাটী ও মানুষ খাঁটী হয়ে থাক্—এসারা ভারত জুড়ে—
তব সাধনার এ অমর বাণী শুনেছি—নানান্ সুরে !

প্রেম দিয়ে প্রেম লাভ করেছিলে ; জয় করেছিলে যাহা-
নিঃস্ব জাতির জাতীয়-জীবনে সম্পদ হ'ল তাহা।
স্বাধীন ভারত ! সোনার ভারত ! মুক্ত ভারত তব।
তোমারই রক্তে রচনা করেছে—তীর্থ সে অভিনব !

সেই তীর্থের উদ্দেশে চলে—যাত্রীরা দলে দলে ;
যমুনার কূলে ভাসিছে মানুষ ; দুখের অশ্রুজলে !
মরা যমুনায় ঢেউ খেলে যায়—প্রেমের জোয়ার আসে—
বাংলার কবি প্রণাম জানায়—পুণ্য-স্মৃতির পাশে !

বলে : বাপুজী গো ! ক্ষম ক্ষম ;
বুদ্ধ, যীশু ও চৈতন্যের প্রতিনিধি মনোরম !

মহাত্মাজী স্মরণে

শ্রীঅশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ৩০শে জানুয়ারী দিল্লী নগরীতে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীজীর নশ্বর দেহের শেষ নিঃশ্বাস পাত হইয়াছে। জাতির পরিচালকের এই আকস্মিক তিরোধানের জন্য একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান ভিন্ন কেহই প্রস্তুত ছিল না। যাহা অনিবার্য্য, তা নিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোন শক্তি দ্বারাই ইহাকে আটকাইয়া রাখা যায় না। মহাত্মার এই আকস্মিক তিরোধানে সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান। এতদিন আমরা মহাত্মাজীকে জাতির সামনে রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিতেছিলাম, আজ তাঁকে হারাইয়া মনে উদয় হইতেছে তাঁর আবির্ভাবের দিন হইতে তিরোধানের দিন পর্য্যন্তের বিভিন্ন ঘটনা। দেশ বিদেশের বহু নরনারী বিভিন্ন কর্ম্মব্যপদেশে এই মহামানবের সংস্পর্শে আসিয়া আপন আপন জীবন সার্থক করিয়াছেন। আজ এ দেশের সকলের মনেই উদয় হইতেছে সেই দিনটির কথা, যেদিন এই মহামানবের দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অথবা সংবাদপত্র যোগে তাঁহার অমৃতময়ী বাণী পাঠ করিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য করিয়াছেন। এই স্বাভাবিক আলোড়নের ফলে মনে পড়ে ১৯১৪ সালের একটি দিনের কথা। বাংলার যুবকগণ বিপ্লব আন্দোলনে ব্যস্ত, বিশ্বযুদ্ধ আগত। বহুদিনের চেষ্টার ফলে বিদেশে ইংরেজ শত্রুদিগের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করিয়া এ দেশে সশস্ত্র বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করা যখন আর স্বপ্ন কিম্বা বিলাস-চিন্তার বিষয় বলিয়া উপেক্ষিত নয়, তখন বাংলার যুবশক্তির বিপ্লবপূর্ণ মনোভাবের আবহাওয়ার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা ব্যারিষ্টার মিঃ এম, কে, গান্ধী বাঙ্গালীর অতিথিরূপে আসিলেন কলিকাতায়। হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া নেতারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া নিরাশ হইলেন, মিঃ গান্ধীর দেখা পাওয়া গেল না। হঠাৎ দেখা গেল যে তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরা হইতে বাহির হইলেন গান্ধীজি সস্ত্রীক, নিজেদের বাক্স বিছানা নিয়া। সাহেবী পোষাকের পরিবর্ত্তে মাথায় সুবৃহৎ গুজরাটী পাগড়ী। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া একটী ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল বাগবাজারে ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ী। আমরা রাস্তার উপরের একটী বাড়ীর দোতালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, অন্য দশজন পথিক যে ভাবে দেখিয়াছিল। বিশেষ বিশেষত্ব কিছু ছিল না। সাধারণ সভা হইল, অপার সারকুলার রোডে কাশীমবাজার রাজবাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে। দক্ষিণ আফ্রিকার কথা আলোচিত হইল মামুলি ভাবে। আমার যতদূর মনে হয়, আন্দোলনের ইতিহাস, কর্ম্ম ও পরিচালন পদ্ধতি জানার চেয়ে আন্দোলনকারীকে দেখবার জন্যই সভা শোভনকারীদের আগ্রহ বেশী ছিল। এর পর কয়েক বছর বাংলা দেশে বিপ্লববাদের চরমলীলা চলিতে লাগিল। নির্য্যাতন লাঞ্ছনার অগ্নি পরীক্ষায় জয়ী হইয়া বাংলার হাজার হাজার যুবক স্থান পাইল কারাগারের নির্জ্জন কক্ষে। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয় গান গাহিয়া মরণ-ভোলার দল জাতিকে অমর করিয়া, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া মহাপ্রয়াণ করিল অনন্তের পথে। বিপ্লববাদের প্রথম অঙ্কের যবনিকা পাত হইল, দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভের ক্ষীণ মনোভাব লইয়া নিরাশার মধ্যে।

শবানুগমন

কারাগারের নিভৃত গৃহে খবর যাইত বাতাসের সঙ্গে গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহের কথা, 'বাঙলার বিলের' (যে বিল উপলক্ষ করিয়া

প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয় দেশবাসীর কাছে 'রাউলাট্ মিত্র' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন) প্রতিবাদে আমেদাবাদ, বোম্বে, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে গণআন্দোলন এবং এই আন্দোলনের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। যাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এই মহাসমরে ইংরাজের সহায়তা করিয়া ভারতবাসী যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছে, ইংরেজ সরকার এবং ইংরেজজাতি মানবতার দিক হইতে ইহা কৃতজ্ঞতার সূত্রে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীর হস্তে দায়িত্বপূর্ণ শাসন ভার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু এই আশা সফল হইল না। ইংরেজ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া ও জালিয়ানওয়ালাবাগের সহস্র সহস্র বালক, বৃদ্ধ ও শিশুর জীবন নাশ করিয়া। গান্ধীজি বিচলিত হইলেন, কিন্তু জাতিকে দৃঢ় হস্তে পরিচালন করিবার ভার গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না ; তাই ১৯২০ সালে লালা লাজপত্ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ এবং দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কংগ্রেসকে সম্প্রসারিত করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা। কংগ্রেসের জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত কংগ্রেস কতিপয় সহরবাসী শিক্ষিত লোকের ভিতরই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নীতির ফলে কংগ্রেসের ডাক ভারতের প্রত্যেকটি পল্লীতে যাইয়া ঝঙ্কার তুলিল, বিপ্লবান্দোলনে আমরা যাহারা কারাগারে বন্দীছিলাম, বিপ্লবের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ায় যে কতকটা নিরাশ হইয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। জেলের বাহিরে গিয়া কিভাবে পুনরায় কাজ আরম্ভ করা যাইবে,এই ভাবনায় অনেকের মন উদ্বেলিত হইতেছিল। ১৯২০ সাল হইতে কংগ্রেসের এই সম্প্রসারণ ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কাজে লাগাইবার সুযোগ ত্যাগ করা সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া বাংলার বিপ্লববাদীরা অনেকেই কংগ্রেসের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। যাহাদিগকে এতদিন আত্মগোপন করিয়া কাজ করিতে হইতেছিল এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ্যভাবে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া বিপ্লববাদীরা নিজেদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়া দেশবাসীদের সাহায্য লাভে সক্ষম হইল।

বরিশালে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইল বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মধ্যে। এই আন্দোলনের জনক মহাত্মা গান্ধীর দর্শন লাভ করিবার আশায় বরিশালের ক্ষুদ্র সহরে যে জনসমাগম হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। মহাত্মাজী বিশেষ কার্য্যে অন্যত্র ব্যাপৃত থাকায় এই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। জনসমুদ্র মহাত্মাজীর দর্শনলাভে নিরাশ হইয়া তাঁহারই প্রবর্ত্তিত "অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের" বাণী লইয়া আপন আপন পল্লীতে ফিরিয়া গেল। ১৯২১ সালের বর্ষাকালে বরিশালবাসীর আকুল আবেদনে মহাত্মাজী তাহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে মৌলানা আজাদ শোবানী ও মৌলানা মহম্মদ আলী। বরিশালবাসীর নয়ন পবিত্র হইল মহাত্মাজীকে দর্শন করিয়া, কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল তাঁহার মহান্ বাণী শ্রবণ করিয়া। আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল দেশের স্বাধীনতালাভ, একজাতি, একনীতি এবং একমাত্র পন্থা।

বাংলাদেশে মহাত্মাজী প্রধান সহকর্ম্মী হিসাবে পাইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে। দেশবন্ধুর বিরাট আত্মত্যাগ ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া বাংলাদেশের প্রত্যেক স্থান হইতে শত শত কর্ম্মী আসিয়া তাঁহার নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইল। সঙ্গে সঙ্গে আসিল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা, কারাগারের লৌহ কটক বিপুল কারারাক্ষসীর মত মুখব্যাদন করিয়া গ্রাস করিতে লাগিল দেশনেতা ও দেশসেবকদিগকে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ফলে গয়া কংগ্রেসে দেখা দিল মত ভেদ। মহাত্মার অনুপস্থিতিতে পরিবর্ত্তন-বিরোধী দল পরিচালনা করিলেন রাজাগোপালাচারী। জয়ী হইয়াও বেশীদিন জয় ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য পার্টি আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে মতবাদ সৃষ্টি করিয়া মহাত্মার আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হইল। দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সময় হইতে ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাত্মাজী, একাগ্র চিত্তে গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৫ সালে বরিশালবাসীর পক্ষে পুনরায় গান্ধীজীর দর্শন লাভ করিবার সুযোগ ঘটে। গান্ধীজি বরিশাল হইতে ঝালকাঠীর পথে খুলনা আসিয়া দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং সোজা কলিকাতায় আসেন। ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর হইতে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ মনোমালিন্যের লক্ষণ যে দেখা দিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে গোপীনাথ সাহার দেশভক্তির প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে স্বরাজ্য পার্টির উপর পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের মনোভাব আরও তিক্ত হইয়া উঠে। ঐ বৎসর জুন মাসে আমেদাবাদ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে ইহা আরও প্রকট হয়। মহাত্মাজী নিজে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের প্রকৃত অহিংস মনোভাবের অভাব দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সভায় ভোটাভোটির ফলে যে তিক্ততা আসিয়া ছিল তিনি ইহাতে মর্ম্মাহত হইলেও ধীরভাবে সহাস্য বদনে পরস্পরের মতের উপর তিক্ততা বর্জ্জন করিয়া কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য উপদেশ দেন। এই অধিবেশন উপলক্ষে সভামণ্ডপে ও সবরমতি আশ্রমে তাঁহার কাছে বসিয়া যেরূপ দেখিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়, উহা জীবনের পরম সম্পদ। ১৯২৩-২৪ সালে বাংলার বহু কর্ম্মী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হইল। আমরা জেলে স্থান লাভ করিয়াছিলাম। ১৯২৫ সালের একটা দিনে ছাদে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সহরে জন-কোলাহলে শুনিলাম—মহাত্মা গান্ধী বহরমপুরে আসিয়াছেন। মহাত্মা এত নিকটে আসিয়াছেন অথচ আমাদের ভাগ্যে তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হইবে না ভাবিয়া দুঃখ হইল। কিন্তু ব্যাপার ঘটিল অভিনব। বৈকালে সভা ভঙ্গের পর, মহাত্মা আসিয়া দাঁড়াইলেন জেলের পশ্চিম পাশের দেয়ালের পার্শ্বে ভাগীরথীর বাঁধের উপর পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া। আমরা হাসপাতালের ছাদের উপর সারিবদ্ধভাবে

দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম—সে দৃশ্য, সে সুযোগ জীবনে দুর্লভ। বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তাই সংক্ষেপে বলা দরকার যে কংগ্রেস ১৯২০ সাল হইতে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে বিপ্লবীরা সর্ব্বতোভাবে তাহাতে যোগদান করিয়া আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর সকল নীতি যে বিপ্লবীরা মানিয়া লইতে ছিল একথা বলা ঠিক হইবে না। বাংলা কংগ্রেসে বিপ্লবীদের প্রধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত। কংগ্রেসের ভিতর থাকিয়া বিভিন্ন গণআন্দোলনে যোগদান করিয়া কংগ্রেসকে একটা বিপ্লব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা ছিল বিপ্লববাদীদের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন সময় মহাত্মাজী ইংরেজ সরকারের অনুমতি লইয়া কারা-প্রাচীরের ভিতরে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে দেখা করিয়া বহু আলাপ আলোচনা করিয়াছেন ইহা দেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত নয়। বিপ্লববাদীরা কংগ্রেসের ভিতর থাকিয়া কার্য্য করার ফলে কংগ্রেসের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও পবিত্র গান্ধীবাদ যে ব্যাহত হইতেছিল সে কথা অস্বীকার্য্য নহে। হরিপুরা ও ত্রিপুরাতে ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সাময়িক উত্তেজনায় অনেকে গান্ধীবাদের এই পরাজয়ে উৎফুল্ল হইলেও এইজন্য দেশবাসীকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে আজ পর্য্যন্তের ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

জীবন বেদের যে উচ্চ আদর্শ মহাত্মা গান্ধী জাতির ভিতর প্রচার করিয়া জাতিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে পরিচালনা করিতে চাহিয়াছিলেন, আমরা সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়নের প্রচেষ্টার আকুল আগ্রহে, মহাত্মাজী প্রদর্শিত পথ সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ না করিয়া অনেক সময় সোজা পথ ধরিবার প্রয়াস করিয়া, স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু মনুষ্যত্বলাভ করিতে পারি নাই। তাই আজ মহাত্মাজীর অশরীরী আত্মার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আশীর্ব্বাদ কামনা করি—

"তোমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগিয়া উঠুক দেশ।"

জ্যোতিঃ যদি নিভে যায়

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

জ্যোতিঃ যদি নিভে যায়, নেভে শেষ রশ্মি,
　　সভয়ে জপিও নাম গোপনে,
ঘোরা অমাবস্যায় আশাহীন পূজারী
　　আনিও জ্যোতির্ম্ময়ে স্মরণে।

জীবন যাঁহার লীলা, মৃত্যু তাঁহারি দান,
　　ঘুরিয়া চলেছে কালচক্র,
আবার উদিবে ভানু উজলি' পূর্ব্বাচল,
　　চন্দ্র উদিবে নভে বক্র।
ফুল যে ফোটালো গাছে রক্তকরবী আর
　　রজনীগন্ধা বনে বনে,
তাহারি সুবাসটুকু সঞ্চিত হ'য়ে থাক—
　　চিত্তে গোপনে মনে মনে।
নদী কি হারায় ধারা, ডুবে যায় বিন্ধ্য,
　　সিন্ধু সলিলহারা হয়?
খেলা ও ভাঙ্গার পালা, তাঁরি হাতে খেলনা
　　অন্তরে মানিও না ভয়।

মৃত্যু পথেতে নেমে মুখে তাঁর রাম নাম
　　জোড়হাতে মাগে মার্জ্জনা,
এ জীবনে ক্ষয় নাই, এ মরণে লয় নাই—
　　আঁকা অক্ষয় আলিপনা।
অন্তরে আনো তাঁরে ধেয়ানে বরণ কর',
　　স্মরণে আনিও তাঁর নাম,
প্রেমে ও মৈত্রী গানে, হে কবি ধ্বনিত হোক্
　　স্বর্গ নরক ধরাধাম!

রিক্তা পৃথিবী

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতা

তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী রামনামে-স্থিরমতিমান
সম মান-অপমানে শত্রুমিত্রে সর্বত্র সমান
হিংসা শূন্য সত্য-সন্ধ দীনবন্ধু নিত্যশান্তিময়
চিরমুক্ত অচপল ক্ষমা-পূর্ণ নিয়ত নির্ভয়
তুমি গীতা বাণী মূর্ত্তি, হে গান্ধিজি যুগ-অবতার
তব অন্তর্ধানে ধরা নিরাশ্রয়া করে হাহাকার!
ঈর্ষা-দ্বেষ দ্বন্দ্ব-হিংসা সারা বিশ্বে করিছে দহন;
সংকীর্ণ হইয়া আসে মানুষের প্রসারিত মন;
দুর্ণিবার ধন লোভ বিশ্বগ্রাসে বসুধা বিস্তারী
বাহু বাড়াইছে তার; দুর্বলের হৃদয়-বিদারী
আর্তধ্বনি, নির্বাসের নিরন্নের নিষ্ফল ক্রন্দন,
শক্তিমান বঞ্চকের দম্ভময় উচ্চ আস্ফালন,
স্বার্থপর রাজন্যের বন্ধুরূপী ছদ্ম-ব্যবহার,
পুণ্যময় ধর্মনামে পাশবিক হীন অত্যাচার
দেখিতেছি দিকে দিকে বিষাইছে জীবনের বায়ু,
তিলে তিলে ধ্বংস করে মানুষের কল্যাণের আয়ু।
তুমি ছাড়া কে রোধিবে অন্যায়ের এই অভ্যুত্থান,
নির্মম মানব হস্তে মানবের এই অসম্মান?
জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে কে করিবে আর্ত-সমুদ্ধার?
হিংসা গ্লানি মরু বক্ষে কে আনিবে শান্তি পারাবার?
লাঞ্ছিতের বঞ্চিতের কে ঘুচাবে পুঞ্জীভূত ভয়?
আপনার পক্ষপুটে পতিতেরে কে দিবে আশ্রয়?
গান্ধীহীনা এ ধরণী সৃষ্টি মাঝে আজি রিক্ততমা,
মনুষ্য সভ্যতা আজি অগ্নিহীন ভস্মরাশি-সমা।
পৃথিবীরে ঘিরি নামে শ্রাবণের অমানিশীথিনী।
ঘোর অন্ধকার মাঝে বসুন্ধরা কাঁদে অনাথিনী।

আজ

বনফুল

বিরাট দেশ এই ভারতবর্ষ, বিরাট এর বৈচিত্র্য, বিরাটতর এর বাণী। কতো ভাল-মন্দ, সত্য মিথ্যা, স্বাধীনতা-পরাধীনতা ধর্ম্ম-অধর্ম্মের জটিলতার ভিতর দিয়ে এর ইতিহাস রচিত হয়েছে যুগে যুগে। এখনও হচ্ছে।

এর বৈচিত্র্যের মধ্যেই ফুটে আছে এর বৈশিষ্ট্য। বহু সংগ্রামের সমাধান হয়েছে এখানে, বহু ধর্ম্মের সমন্বয়, বহু বিরোধের ঐক্য। এই হিমালয়-শীর্ষ সমুদ্র-বেষ্টিত পুণ্যভূমিতে সম্মিলন ঘটেছে বহু সভ্যতার।

এই দেশের মাটির গুণেই নরঘাতক রত্নাকর হয়েছেন কবি বাল্মীকি, পরস্বাপহারী দস্যু হয়েছেন আদর্শ সম্রাট, ছদ্মবেশী তস্কর পেয়েছেন অতিথির মর্য্যাদা।

সেই সুদূর অতীত থেকে আজ পর্য্যন্ত বহুবিধ উত্থান-পতন সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত সনাতন রূপ অম্লান আছে।

ভারতের কবি, ভারতের ঋষি—আজও—এই লেফাপা-সর্ব্বস্ব সীমানা-লিপ্সু বিংশ শতাব্দীতেও অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন—"আমার ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ নয়, আমার ধর্ম্মে ভণ্ডামি নেই, নীচতা নেই, হিংসা নেই। আমার ধর্ম্মের সঙ্গে যদি কোন-কিছুর সাদৃশ্য থাকে তা হচ্ছে আকাশের, যে আকাশ অনন্ত, যে আকাশে সকলেরই স্থান, যে আকাশে সূর্য্য চন্দ্র এবং ধূলিকণা সগৌরবে নির্ব্বিরোধে বর্ত্তমান। আমি বিরাটের উপাসক, আমি অল্পে তুষ্ট হই না। ভূমা আমার কাম্য, মুক্তি আমার লক্ষ্য, প্রেম আমার পাথেয়, ত্যাগ আমার আনন্দ। আমার গার্হস্থ্যের ভিত্তি পরার্থপরতায়, আমার সন্ন্যাসের আদর্শ পরহিত-ব্রতে। আমার বাণী সাম্যের বাণী, উদারতার বাণী, সৌন্দর্য্যের বাণী, সঙ্গীতের বাণী। সরস্বতী নদীর মতোই আমার বাণী—সরস্বতী হিমালয়-সম্ভবা, অন্তঃসলিলা, সমুদ্র-মুখিনী। তার শুভ্র কান্তিতে সকল বর্ণের সম-সম্মিলন, তার বীণার ঝঙ্কারে সর্ব্বসুরের শোভন সমন্বয়। কোনও একটি বিশেষ জ্ঞানের নয়, সর্ব্বজ্ঞানের প্রতীক যে পুস্তক তাই অঙ্কে ধারণ করে' সে বাণী পুস্তক-শ্রী। যে পদ্মাসনের উপর সে বাণী অধিষ্ঠিতা তা একদল নয়, শতদল। যে হংস তার বাহন, তা মানসসরোবরবাসী আকাশচারী।"

এই বাণী, এই আদর্শ ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল ধ্বনিত হয়েছে। আজও হচ্ছে।

এই ভারতবর্ষে বহু মুখোস খসেছে, বহু শিকল টুটেছে। বহু রূপ হয়েছে রূপান্তরিত, বহু বাধা হয়েছে অবাধ, বহু শত্রু হয়েছে মিত্র।

বহু রাবণ-দুঃশাসন-কংস-জরাসন্ধ, বহু অনার্য্য-আর্য্য-গ্রীক-শক-কুশান-হুন-মুসলমান-ইংরেজ, বহু পুষ্যমিত্র-তোর-মানা-মিহিরগুলা, বহু নাদির-চেঙ্গিস-তৈমুর, বহু ক্লাইভ-হেষ্টিংস-ডায়ার-ওডায়ার এসেছে—অবলুপ্ত হয়েছে। ভারত-বর্ষের শাশ্বত বাণীর কিন্তু সুর বদলায়নি আজও।

রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-উপনিষদ-গীতা-ত্রিপিটকের মহা-বাণী এই ভারতবর্ষের আকাশেই তার প্রতিধ্বনি শুনেছে কোরাণে বাইবেলে জেন্দাবেস্তায়। তাকে আপনার করে' নিতে চেয়েছে, নিতে পেরেছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী কলহবিলাসী ভ্রষ্টচরিত্র স্বয়ংসর্ব্বস্ব অভারতীয় মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের দিকে নয়—বিরাট ভারতবর্ষের বিশাল জনতার দিকে চেয়ে দেখুন—এ বাণী আজও স্পন্দিত হচ্ছে সেখানে।

মহাত্মা গান্ধিও এই বাণী শুনিয়ে গেলেন আমাদের। আজও শোনাচ্ছেন। চিরকাল শোনাবেন।

আমরা ধন্য, আমরা কৃতার্থ যে সে বাণী স্বকর্ণে শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, সে মহাবাণীর বাহককে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর যুগে জন্মলাভ করেছি।

ঝঞ্ঝার অন্ধকারে রক্তকর্দ্দম-পিচ্ছিল-পথে চলতে চলতে হতাশায় অবসাদে যখন আমরা ক্ষীণবীর্য্য হয়ে ভাবছিলাম যে, রাত্রির বোধ হয় আর অবসান নেই, তখন বুকের রক্ত দিয়ে অরুণাচলের উদয় শিখরে তিনি লিখে গেলেন—মাভৈঃ, এই পথ।

তমসা ভেদ করে' জ্যোতি নির্গত হচ্ছে।

স্মৃতি-সৌধ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গান্ধীজীর স্মৃতি রক্ষা করিতে হইবে। যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ হইবার নহে, তাহা সকলেই জানে; স্মৃতিরক্ষা করিয়া মানুষ শোকে ঈষৎ সান্ত্বনা পাইতে চাহে। স্মৃতি-সৌধ সেই সান্ত্বনার অভিব্যক্তি ও বহির্বিকাশ। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও সর্ব্বোত্তম। তাই মানুষ মাত্রেই ভাবিতেছে কিরূপে স্মৃতি রক্ষিত হইলে একাধারে বিরাট বিশালত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব খোদিত ও গ্রথিত এবং প্রকাশিত হইবে। মাদ্রাজের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া গান্ধীপত্তম অবশ্যই করা যায়; কিন্তু তাহাই কি যথেষ্ট হইবে? তদ্বারা কি গান্ধীজীর মহামানবত্ব অনন্তকাল সমীপে প্রেরণ করা যাইবে? এমন কোন্ স্তম্ভ রচিত হইতে পারে যাহা অনাগত অনন্তকাল পর্য্যন্ত গান্ধীজীর বিশালত্ব বিজ্ঞাপিত করিতে পারিবে? এমন কোন্ মন্দির নির্ম্মাণ করা যায় যাহা দৃষ্টিমাত্রে মানুষ মনুষ্য-প্রেমিক মহাত্মার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবে?

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, গান্ধীজীর পুণ্যস্মৃতির বাস্তব মূর্ত্তির পরিকল্পনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। যাহাই করি না কেন, মনে হইবে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। পটে হিমালয় আঁকিয়া কে কবে হিমালয়কে দেখাইতে পারিয়াছে? বর্ণ বিন্যাসে নীলাম্বু অঙ্কিত হইতে পারে, কিন্তু চিত্র পরিচিতি লিখিয়া দিতে হয়। 'ডাণ্ডি মার্চ্চ'—লবণ সত্যাগ্রহের বিজয় অভিযানের মর্ম্মর মূর্ত্তি গঠিত হইলে অর্দ্ধশতাব্দী পরিব্যাপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে কি গান্ধীজীর পরিচয়ের সহস্রাংশের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই নহে? গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ কামনায় দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছিলেন ইহা যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশের জীবন-মরণ সংগ্রামে, যুদ্ধাহত সৈনিক বহন শিবিকা বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিয়া বৃটিশকে অকুণ্ঠিত সহায়তা দান, তেমনই বাস্তব সত্য। এই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারা ব্যক্ত হইবে কিরূপে? মহাত্মা গান্ধীর জীবন দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার সমষ্টিমাত্র। সৃষ্টির বহু দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মাঝে গান্ধীজী আর এক নিবিড় রহস্য।

গান্ধীজীর যে মূর্ত্তির সহিত পৃথিবী পরিচিত, সে মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কি কল্পনা করিতেও পারিত যে, এই কৌপীনধারী নগ্নদেহ নগ্নপদ ব্যক্তিটি বিলাতী পাশ ব্যারিষ্টার? এই কটীবাস-পরিহিত 'কৃষক' আখ্যাধারী ব্যক্তির লিখিত ও কথিত ইংরাজী ভাষা ইংরাজের ইংরাজীকেও পরাস্ত করিত, কয়জন লোকের পক্ষে ইহা ধারণা করা সহজ ছিল? গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত অপূর্ব্ব ও অভিনব অহিংস যুদ্ধকৌশল দেখিয়া বিশ্ব বিস্ময়-বিমুগ্ধ, ভূলোকের তিন চতুর্থাংশের অধিকারী, বিশ্বজিৎ বৃটিশ যাঁহার নিকট পরাভূত, সেই গান্ধীজী যে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মত 'নাম' বিলাইয়া বেড়াইতেন, এই দৃশ্যই বা বাস্তবে বিশ্বাস করিতে কয়জনে পারিবে? শত সহস্র যুদ্ধের সর্ব্বাধিনায়ক, রাজনীতিবিশারদ গান্ধী, ভারতের স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষ ও কূটনীতিজ্ঞ গান্ধী মৃত্যুকালে 'রাম' নাম উচ্চারণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ইহাই কি অল্প বিস্ময়?

১৫ই আগষ্ট (১৯৪৭) স্বাধীনতা মহামহোৎসবের দৃশ্য স্মরণ করুন। ভারতবর্ষ (ও পাকিস্তান) প্রমোদতরঙ্গে ভাসমান। পত্রপুষ্পপতাকায় ধরিত্রী নব যৌবন সাজে সজ্জিত হইয়াছিল; স্থলে জলে, গগনে পবনে পুলকের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। বুঝি, এত আলো আর কখনও জ্বলে নাই; বুঝি, এত গান কেহ কোনদিন গাহে নাই; বুঝি এত বাদ্য আর কোথায়ও বাদিত হয় নাই; বুঝি, আনন্দহিল্লোলে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল একাকার হইয়া গিয়াছিল কিন্তু, তাহার মাঝে গান্ধী কুত্রাপি নাই। গলে মালা পরিতেও নাই, শিরে মুকুট ধারণ করিতে নাই। বিশ্বময় গান্ধী গান্ধী রব; পৃথিবী ভরিয়া গান্ধীর জয়ধ্বনি। কিন্তু যজ্ঞস্থলে যজ্ঞেশ্বর অনুপস্থিত; গান্ধীজীকে দেখা গেল না। মানুষের অধিকার কর্ম্মে; কর্ম্ম-ফলে তাহার অধিকার নাই। ইহা কি তাহাই? নিন্দাও জগদীশ্বরের, প্রশংসাও তাঁহার। ইহা কি তাহাই? তাহাই হোক, আর নাই হোক, এমনটি আর কে পারিয়াছে? এ শুধু ভারতেই সম্ভব; এ কেবল গান্ধীই পারেন। ঐ ১৫ই আগষ্ট, পৃথিবীর এক অজ্ঞাত প্রান্তে, বেলেঘাটার শ্মশানে গান্ধীজী মানুষের অবলুপ্ত মনুষ্যত্বের সাধনায় তপস্যামগ্ন অবস্থায় বলিয়াছিলেন "আমার স্তুতি কেন? তাঁহার কাজ তিনি আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। আমি সেই যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রমাত্র!" এই কথা একালে কে বলে? বলিতেন, গান্ধী। গান্ধী বিশ্বের বিস্ময়!

গান্ধীজী দুর্জ্ঞেয় রহস্য বটে; কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত, ভারতের আত্মার সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তাঁহার নিকট গান্ধীজী অতীব স্বচ্ছ, অত্যন্ত সরল। আমাদের সে পরিচয় নাই বলিয়াই গান্ধীর সহিত তুলনা করিতে আমাদিগকে নানা দেশ ও নানা কাল হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইতেছে। আমরা আমাদের দেশের ইতিহাস পড়ি নাই; আমাদের প্রাচীন ইতিবৃত্তের সহিত আমাদের পরিচয় নাই; আমাদের অতীত মহত্ত্বে আমাদের শ্রদ্ধার অত্যন্তাভাব তাই আমরা গান্ধীজীর সহিত যীশুখৃষ্টের সামঞ্জস্য দেখি; তাহারই তুলনা করি। এক অপঘাত মৃত্যু ব্যতিরেকে এতদুভয়ে তুলনার সামগ্রী কি আছে তাহা ত আমি ভাবিয়াই পাই না। অপিচ গান্ধীজীর মৃত্যু অপঘাতে মৃত্যু কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু মনে করি। স্বীয় বাসনাই তাঁহার দেহাবসানের কারণ; শিখণ্ডী নিমিত্ত মাত্র। অনাগত ভবিষ্যৎ আমার উক্তিই সমর্থন করিবে। আমার দেশের সুপ্রাচীন ইতিহাসে তাহার

প্রমাণ আছে। অমর অপিচ ইচ্ছামৃত্যু নয় যে ইচ্ছামাত্রে দেহত্যাগ করিতে পারে, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সে হয়ত 'রূপক', সে হয়ত উপন্যাস। উপন্যাস মানুষ বিশ্বাস করে না। সে কথা থাক্। যীশুর সহিত তুলনা কি সঙ্গত? যীশু নিরক্ষর, গান্ধী মহামহোপাধ্যায়; যীশু রাষ্ট্রজ্ঞান রহিত, গান্ধী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা; যীশু ধর্ম্মব্যবসায়ী। ভরসা করি, গান্ধীজীকে কেহই সে আখ্যা দিবেন না। যীশু নিরীহ, গান্ধী দিগ্বিজয়ী; যীশু অক্ষম ও শান্তিবাদী, আর গান্ধী শান্তিকামী হইলেও কর্ম্মবীর গান্ধীর কর্ম্মক্ষমতা তুলনারহিত। বিশাল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা গান্ধীর কর্ম্মফল—কর্ম্মের ফল। অতুলনীয়কে তুলনা করিতে যাওয়া মানসিক বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। অত্যন্ত দুঃখের সহিত এ কথাটা না বলিয়া পারিলাম না। ইহার মধ্যে খৃষ্ট-বিদ্বেষের কোন কথা নাই।

গান্ধীজীর তুলনা গান্ধীজী, এই কথা যদি কেহ বলেন, আমি রাজী আছি। আর যদি তুলনা মিলাইতেই হয়, পুরাণকালে ফিরিয়া যাইতে হইবে; মহাভারত খুলিতে হইবে। তুলনা মিলিবে। দেখা যাইবে, গান্ধীর মতই আর একজন ধর্ম্মপ্রাণ, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মপ্রদাতা এই ভারতবর্ষে, এই ভারতের মৃত্তিকায় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার তরে নরদেহ ধারণ করিয়া, নরের জীবন যাপন করিয়া, কর্ম্মান্তে গান্ধীর মতই ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরবিদ্ধ হইয়া ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে তাঁহার কীর্ত্তি স্তম্ভও নাই, স্মৃতি-সৌধও কেহ গড়ে নাই, তথাপি মানুষের অন্তরে তিনি চিরস্মরণীয়, চিরবিরাজমান, চিরদীপ্ত ও চিরভাস্বর। দেখিয়াছি, অসম্ভব নহে, অপূর্ব্ব বা অভাবনীয়ও নহে, যুগে যুগে কল্পে কল্পে তিনি আসিয়াছেন, নরদেহে নরলীলা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন, ইহাও বলিয়া গিয়াছেন।

আজ, অবিশ্বাসের জগতে বিশ্বাস করিতে বাধিতেছে; সেকালে কংসেরও বাধিয়াছিল, শিশুপালেরও বাধিয়াছিল; দুর্য্যোধনেরও বাধিয়াছিল। কংস শ্রীকৃষ্ণের বধ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল; শিশুপাল জীবন পণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়াছিল; দুর্য্যোধন শান্তিদূতরূপী শ্রীকৃষ্ণকে নিগ্রহের চেষ্টা পাইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর জীবনে কি অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব আছে? জীবদ্দশার কথা না-হয় ছাড়িয়াই দিই, মৃত্যুর পরেও শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকারে অসূয়ার পরিচয় কি পাওয়া যায় নাই? শিশুপাল সেকালেও ছিল, একালেও আছে, বোধ হয়, চিরকাল থাকিবে।

দেবত্ব আরোপ আমি করিতেছি না; আমাদের নিকট গান্ধীজী মাটীর জগতের মাটীর মানুষ ছিলেন, তাহাই থাকুন। যে যুগে তিনি মাটীর দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্তে বাস করিয়া গিয়াছেন, আমরাও যে সেই মরতে, সেই কালে বাস করিয়াছি ইহাতেই আমাদের মনুষ্যজন্ম ধন্য হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি; আমরা কেহ কেহ তাঁহার সান্নিধ্য সম্ভোগের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি, কখনও বা তাঁহার সহিত কথা কহিবার মহাভাগ্য আমাদের হইয়াছে, কভু বা কেহ চরণরেণু শিরে ধারণ করিয়া অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন মানিয়াছি; আমাদের কাছে তিনি মানুষ—মানুষের মত মানুষ, মানুষের মধ্যে মানুষ, মানুষের সেরা মানুষ হইয়াই থাকুন। ভারতের বহুভাগ্যে ভারত আবার একটি আলোকের স্তম্ভ দেখিয়াছিল, উচ্চাদর্শের হিমালয় দর্শন করিয়াছিল; বর্ত্তমান ধন্য হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু একদিন আসিবে যেদিন বর্ত্তমান অতীত হইবে; আজিকার বাস্তব ভূতে বিলীন হইবে। সেদিনের মানুষ কি করিবে? সেদিন কি তাহারা পুরাণ অন্বেষণ করিবে না? নূতন করিয়া মহাভারতের সন্ধানে ব্যাপৃত হইবে না? আজই, এই গান্ধী-যুগে, গান্ধী বৎসরে বাস করিয়াও যাহার উচ্চতার পরিমাপ করিতে না পারিয়া বিপুল বিশ্ব বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতেছে, যাহার মহত্ত্বের তুলনা করিতে গিয়া জ্ঞান হারাইয়া হতবাক্ হইতেছে, দিগন্ত বিস্তারিত হিংসার অনলরাশির মধ্যে অপরিম্লানজ্যোতিঃ স্নিগ্ধ-শীতল স্নেহধারা বর্ষিত হইতে দেখিয়া প্রত্যক্ষকেও অপ্রত্যয় করিতে উদ্যত হইতেছে, আর, যে-অনাগত ভবিষ্যৎকাল গান্ধীজীর নরদেহ দেখে নাই, তাঁহার সেই কোমলমৃদুক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনে নাই, শুধু ইতিহাসে পড়িবে, লোকমুখে কাহিনী শুনিবে, জনশ্রুতিতে পল্লবিত গল্প গাথা প্রাপ্ত হইবে, তাহারা যদি পুরাকালের মত আমাদের চোখে দেখা মহাত্মা গান্ধীর মুখেও

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

বাক্যপরম্পরা সংযোজিত করে, তাহা হইলে কে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবে? আর প্রতিনিবৃত্ত করিবেই বা কেন? গান্ধীজীর সহিত তাঁহার পার্থক্যই বা কোথায়? পার্থক্য যদি বা থাকে, কতটুকু?

আমরা যাঁহার কথা লিখিতে বসিয়া জীবন ধন্য, লেখনীকে পুণ্য-পবিত্র করিতেছি তাঁহার জীবনের প্রতিরূপই কি আমরা দেখি নাই? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কে করিয়াছিল? আমাদের স্বাধীন ভারত (ও পাকিস্তান) রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা কে? কুরু পাণ্ডব, বিবাদমান এই দুই পক্ষের হিতার্থ শান্তিদৌত্য কে করিয়াছিল? নোয়াখালি পরিক্রমা কি কোন অংশে ন্যূন? যুধ্যমান মধ্যে অযুধ্যমানঃ ও কুরুক্ষেত্র রণসমুদ্র মধ্যে নিরস্ত্র থাকিতে সেই একজনই পারিয়াছিলেন; বিংশ শতাব্দীর হিংস্র ভারতে হিন্দু মুসলমান মিলন সাধনে একজনই মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' সার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, রণক্ষেত্রে সেদিনও গীতা কথিত হইয়াছিল, আজও হইয়াছে। পাঞ্জাব জ্বলিয়া গিয়াছে, সিন্ধু বিধ্বস্ত, সীমান্ত ভস্মীভূত, দিল্লী বিদগ্ধপ্রায়, তারই মাঝে কি ঐ একজন মানুষই—একটি নরোত্তমই ক্রোধ, দ্বেষ, শোক, রোষবিবর্জ্জিত অনুদ্বিগ্নচিত্তে গীতাই পুনরুক্ত করিলেন না?

আমি আগেই বলিয়াছি, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা মহাভারত অধ্যয়ন করি নাই; আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে আমরা চিনি না; শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র পঠন-পাঠনে আমাদের রুচি ছিল না, এখনও নাই। তবে একথা সত্য যে, থাকিলে ভাল হইত। নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে আমাদের নৈতিক জীবনের অপমৃত্যু না ঘটিলেই মঙ্গল হইত। পতিত ঊষর ভূমিতে বীজ বপন ও বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফলভোগের পূর্ব্বেই

গান্ধীজীকে জীবন বলি দিতে হইত না। যাঁহারা ক্রম-বিবর্তন ও ক্রম-বিকাশে বিশ্বাসী, আশা করি তাঁহারা আমার বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। একটি সর্ব্বলোকপরিজ্ঞাত দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথা আরও পরিস্ফুট হইবে। আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের ক্রমবিকাশ আশা করি সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধ আন্দোলন, অগ্নি যুগ ও সন্ত্রাসবাদ উর্বর ও পতিত ক্ষেত্র কর্ষণ ও মোক্ষণ করিয়া পূর্ব্বেই জমিতে বীজ বপিত হইয়াছিল, তাই গান্ধীজীকে বৃক্ষরোপণে সুযোগ পাইতে বিলম্ব হয় নাই। শতাব্দীর এক পাদ মধ্যেই পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছে; গান্ধীজীর সাধনা সার্থক হইয়াছে; দীর্ঘকালব্যাপী জাতির জীবন-মরণের যুদ্ধে জয়লাভও ঘটিয়াছে। একদিকে এই বিরাট সাফল্য, অন্যদিকে নৈতিক অধঃপতন! একদিকে পর্ব্বত অধিরোহণ, অন্যদিকে শোচনীয় অবতরণ। ভারতের অপার দুর্ভাগ্য নৈতিক অধঃপতন রোধ করা সম্ভব হয় নাই। তাহার ফল ভারতবাসী ভোগ করিবে না ত কে করিবে? মহাত্মাজী মালী ছিলেন ভালই; সাধক রামপ্রসাদের ভাষায় তিনি ভাল কৃষিকাজ জানিতেন, তাই ফসল করিয়া সুবর্ণ ফলাইয়া গিয়াছেন। মহাভারতের কালে মহামানব শ্রীকৃষ্ণ এই মহাভারতে ধর্ম্ম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সাধনা করিয়াছিলেন। তাহার জন্য তপঃ জপ, যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রসাধন সমস্তই করিয়াছিলেন; হীনতা দীনতা স্বীকারেও কুণ্ঠা করেন নাই; অবিশ্বাসী বিংশ শতাব্দীর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ, সাধন, তপস্যারই বা তুলনা কোথায়? তাঁহার মত দীনতা ও হীনতা স্বীকার করিতেই বা কয়জন মনুষ্য পারিয়াছে? শ্রীকৃষ্ণ পারিয়াছিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ, যোদ্ধশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইয়াও অতিহীন দৌত্যকার্য্যেও তাঁহার রুচির অভাব হয় নাই। মহাত্মা গান্ধীর জীবনেও এমন কি দৃষ্টান্তের অভাব আছে?

বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়ার গল্পটি বোধ হয় সকলেরই জানা আছে; নোয়াখালির 'হাট'টিকে তাহার পার্শ্বে রাখিলে কিছুমাত্র বেমানান্ হইবে কি?

দ্রুপদের রাজধানীতে দ্রুপদ রাজনন্দিনী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার দৃশ্য স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। একদিকে ছদ্মবেশী পঞ্চ 'ব্রাহ্মণ', অপরদিকে যাবতীয় রাজন্যবর্গ—সুরক্ষিত, সুশোভিত, সুরভিত সভা শোণিত স্নাত হইতে চলিয়াছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের কথাটা কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল? কে বলিয়াছিল, রাজন্যবৃন্দ, ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মমতে পাঞ্চালীকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করিয়া আপনারা অধর্ম্ম করিতেছেন? কাশ্মীর-যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটী মুদ্রা আটক করায় ভারতবর্ষ উল্লসিত হইয়াছিল; 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!' ভাবিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইয়াছিল? বাধা দিবারও কেহ ছিল না। কিন্তু ধর্ম্মের কথাটা কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। জীবন পণ করিয়া কে ভারতসরকারের মতি ফিরাইয়া আনিয়াছিল? দুর্য্যোধনের মত পাপিষ্ঠ ও দুরাচারীর সৎ ও ন্যায়াচরণ না করিলেও সাধারণ মানবের ন্যায়জ্ঞান ক্ষুণ্ণ হইত না; কিন্তু অসাধারণ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়বোধ অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ। মহাভারত পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, দ্বৈপায়ন হ্রদ তটে দুর্য্যোধনের সহিত শেষ গদাযুদ্ধেও বৃকোদর ভীমকে অন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে অনুরোধ শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছিলেন। শ্রীমান ভীম আমাদেরই মত স্থূলবুদ্ধি মনুষ্য, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' নীতির বশবর্ত্তী হইয়া দুর্য্যোধনকে 'এলোপাথাড়ি' গদাঘাতে ঘায়েল করিতে উদ্যত। গদা যুদ্ধে যে নাভির অধোদেশে আঘাত করিতে নাই, করিলে অধর্ম্ম হয়, সে কাণ্ডজ্ঞান ভীমের থাকিবার কথা নহে (রাগের মাথায় কাহারই বা থাকে?), শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে তিরস্কার সহকারে ন্যায় ও নীতি স্মরণ করাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্য ভাল বলিতে হইবে—যেহেতু ভীম মহাশয় গদাখানি ঘুরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাথাটি ভাঙ্গেন নাই। গান্ধীজীর দুর্ভাগ্য (?) অনুরূপ অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

গান্ধীজীর তুলনা গান্ধীজী; অন্য তুলনা নাই। থাকিবে না কেন, আছে; কিন্তু আমি ত এখনই দেখাইয়াছি আত্মবিস্মৃত জাতির তাহা জানা নাই। মহামানব শ্রীকৃষ্ণের কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। যেটুকু মনে আছে সেটুকু না থাকিলে বোধ করি উপকার হইত। গোঁসাই ঠাকুর মহাশয়গণ কোথা হইতে একটি শ্রীমতী আমদানী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের মানস আলোকিত এবং চিত্ত পুলকিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ-নির্ঘোষ আমরা শুনিতে পাই না, রাধা নামের সাধা বাঁশীই আমাদিগকে উচকিত করিয়া রাখিয়াছে। জরাসন্ধের কোপানল হইতে বলির জন্য উৎসর্গীকৃত রাজন্য-বর্গকে তিনিই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহা আমাদের জানা নাই; আমরা জানি, পরকীয়া প্রেমোন্মাদ শ্রীকৃষ্ণের তরে ব্রজবালাদের "কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো রঙ্গিনী, চললো সঙ্গিনী, চললো ভামিনী"র রাগিনী। হিংস্র বিশ্বে, বিদ্বেষবিষজর্জ্জরিত মনুষ্যলোকে সম্প্রীতি ও শান্তি স্থাপনোদ্দেশ্যে তিনি যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, আজিকার কালে সে কথা কে বা জানে? কিন্তু, কালীয় হ্রদে ষোড়শী নারীর বস্ত্র হরণের সংবাদ সবাই জানে। নেড়া দাস বাবাজীগণের কবিত্ব ইহজগতে হয় ত তুলনা-রহিত—হয় ত কেন, সত্যই তুলনা রহিত; পৃথিবীর কাব্য সাহিত্য মন্থন করিলেও এমন অমৃতের উৎস কোথায়ও দেখিতে পাইব না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব; কিন্তু তাঁহারা উত্তর জগতের যে বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বা অস্বীকার করিব কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্য বীর্য্য, পরাক্রম, মনুষ্যত্ব ও লোকহিতব্রতের কোন নিদর্শনই তাঁহারা প্রচারিত হইতে দেন নাই; এক গোরোচনা গৌরী নবীনা কিশোরীর নীল-শাড়ী দিয়া (নীলাকাশের মত) সমস্তই আবৃত ও আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীটাকে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে মুড়িয়া দিয়াছেন।

জানি না গান্ধীজীর অদৃষ্টে কি লেখা আছে? মন্দির যে হইবেই, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখি না; তবে মন্দিরে অপর কোন উপসর্গ আবির্ভূত হইবেন কি-না তাহাই চিন্তার বিষয়। উপসর্গের উপদ্রবে মহামানব শ্রীকৃষ্ণের মহৎ জীবন ও মহান শিক্ষা হইতে পৃথিবী বঞ্চিত হইয়াছিল; আমাদের বরাত দোষে গান্ধীজীর জীবনের আদর্শও না

বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হয়! গান্ধীজী-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাষ্ট্র পরিচালনার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত তাঁহারা যত্তপি মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মময় জীবনের অক্ষুণ্ণ আদর্শ প্রচারে যত্নবান হইতে পারেন তাহা হইলে অধঃপতিত বিশ্বও পঙ্কজের রূপরসগন্ধশোভায় সমুদ্ভাসিত হইতে পারে।

কাজ কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে 'যত্নে কৃতে' অসম্ভব নহে। গান্ধীজী এমন একটি জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন, যাহার কোন অংশ গোপন, বর্জ্জন, পরিবর্ত্তন বা পরিমার্জ্জনের প্রয়োজন নাই। সুকুমার-মতি বালকবালিকা হইতে পরলোকযাত্রী বৃদ্ধ বৃদ্ধাও তাহা অধ্যয়ন, মনন, অনুশীলন করিতে পারিবেন; তাহাতে অন্দর বাহির নাই, প্রাইভেট পাবলিক ভেদ নাই; যাহাকে খোলা বহি (open book) বলে, মহাত্মার জীবনীও তাহাই। গান্ধী সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে সর্ব্বগুণের আধার। গান্ধী অপরাজেয় এবং অপরাজিত; তিনি দয়াময়, লোক-হিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, নিরপেক্ষ, ক্ষমাশীল, নিরহঙ্কার ও ধর্ম্মাত্মা। গান্ধীজী মানুষী শক্তির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাঁহার চরিত্র অমানুষ। মানুষে অতিমানুষ পৃথিবীতে সুদুর্লভ বলিয়াই মানুষ তাহাতে দেবত্ব আরোপিত করিয়া থাকে। আমরাও তাহাতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। মানুষ স্বীয় কর্ম্মবলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই ঈশ্বরত্বপূর্ণ মানুষকে আমরা দেখিয়াছি, ইহা ত আমাদেরই জন্মজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল!

মহাত্মা গান্ধী বলিতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'! এই মহৎ ও মহিমময় জীবনী তাঁহার স্মৃতিসৌধ হোক; অন্য স্মৃতিসৌধে প্রয়োজন নাই। এই অতি-মানুষী কাহিনী লুপ্তমনুষ্যত্ব বিশ্বে মনুষ্যত্বের প্রেরণা দান করুক, গান্ধী-মন্দিরে কাজ নাই। আমরা অনেক কিছু বিস্মৃত হইয়াছি কিন্তু সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মার নাম করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথা আজও আমাদের মনে পড়ে। যুধিষ্ঠিরের স্মৃতিমন্দির কোথায়ও আছে কি? কোনও রাজা প্রজানুরঞ্জন করিয়াছেন শুনিবামাত্র প্রজানুরঞ্জনে প্রাণাধিকা পত্নীত্যাগী শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী আজও আমাদের অন্তরদেশ আর্দ্র করে। পাণ্ডাঠাকুররা ভিন্ন কেহই রামের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইয়াছেন কি? কাশীর হরিশ্চন্দ্র ঘাটের নামও যে শুনে নাই, রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতার কাহিনী তাহারও জানা আছে। বশিষ্ঠাশ্রম কোথায়, তাহাও যে জানে না, বশিষ্ঠের ক্ষমাধর্ম্মের মধুর স্মৃতিতে তাহার অন্তর ভরিয়া আছে। যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ শব্দগুলা মনুমেণ্ট গড়িয়া লিখিয়া রাখিতে হয় নাই, অথচ হেন মনুষ্য নাই যে মর্ম্মার্থ জানে না। সেকালের ক'টা খবরই বা আমরা জানি, ক'টা কথাই বা শুনিয়াছি? নীতি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা কি কেহ করিয়াছিল? তবু মনে হয়, সেকালে যদি খবরের কাগজ না থাকিয়া থাকে, রেডিয়ো যদি না থাকিয়া থাকে, সিনেমাও যদি অবিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তাহা সত্ত্বেও যত্তপি মনুষ্যত্বব্যঞ্জক উচ্চাদর্শ দীর্ঘকাল যাবত সুপ্রচারিত ছিল বলিয়াই ভগ্নাংশ আজও আমরা শুনিতে পাই, তাহা হইলে, মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র ও মহান জীবনের আলেখ্য ভারতীয় জাতির অন্তরে সুগ্রথিত করা কেনই বা সম্ভব হইবে না? মহাত্মা গান্ধী বেলেঘাটার মশানে দাঁড়াইয়া ধীরস্থির অবিচলিত কণ্ঠে ক্রুদ্ধ জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে হত্যা করিবে? কর, আমি বাধা দিব না, কেহই বাধা দিবে না। কিন্তু জানিও, আমার যে কাজ, তাহার বিনাশ নাই।" গান্ধীর জীবনের এই ত শেষ কথা, এই ত মর্ম্মবাণী। আমরা আধুনিক যুগে, বিজ্ঞানের যুগে বাস করিতেছি। আমাদের তার আছে, বেতার হইয়াছে, আমাদের সংবাদপত্র সাময়িকপত্র সাহিত্যপত্র রহিয়াছে, আমাদের পাঠশালা বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যাভবন রহিয়াছে, থিয়েটার বায়োস্কোপ রহিয়াছে, সর্ব্বোপরি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছে, অহিংসা ও সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াই কি গান্ধীজীর স্মৃতিতর্পণ করিতে আমরা পারি না? সত্যের বিনাশ নাই—কালের করাল আঘাতেও সত্য লুপ্ত হয় না; দ্রুতগামী সময়ের স্রোতেও সত্য ভাসিয়া যায় না, নশ্বর জগতে সত্যই অবিনশ্বর! সত্যে সুগঠিত ও সত্যনিষ্ঠ ভারতীয় মনুষ্যই অবিনশ্বর গান্ধীজীর স্মৃতি নশ্বর পৃথিবীতে অক্ষয় ও অব্যয় করিতে পারিবে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে, গান্ধীজীর আত্মা সেই স্মৃতিসৌধ দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।—বন্দে মাতরম্।

তিরোভাব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হলো ব্যাধ শরাঘাতে,
মহামানবের মৃত্যু হীন ঘৃণ্য ঘাতকের হাতে।
জগতের হিতব্রতী ভারতের নর-নারায়ণ
ঘাতকের করে দিল পুণ্যময় অনন্ত জীবন।
রাহু কেতু গ্রাস করে চন্দ্র সূর্য্যে মরি মনঃক্ষোভে
কিন্তু নিত্য নবোদয়—মহাদ্যুতি ডুবিয়া না ডোবে?

কেমনে অমৃত উৎস আঘাতে করিবে কলঙ্কিত?
সুধাধারা শতধারে যুগে যুগে হবে উচ্ছ্বসিত।
যাঁহাদের মৃত্যু নাই চিরোজ্জ্বল অমৃত প্রদীপ
কে করে নির্ব্বাণ তাহা? আসি মৃত্যু ফিরে অপ্রতিভ।
অমর মহাত্মা গান্ধী! চিরজীবী চিরমৃত্যুহীন—
মহত্ব হইল তাঁর আজ হতে দেবত্বে বিলীন।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জরিপাড় শাড়ীর একটুখানি আঁচল, খানিকটা টিংচার আয়োডীনের গন্ধ, একখানা সরু সুগোল হাতে কয়েক গাছা চুড়ির ঝিলিক আর মাথায় পাখার মিষ্টি বাতাস, রঞ্জুর প্রথম চেতনায় এগুলোই আভাসিত হয়ে উঠল ছায়া-ছবির মতো। তারও পরে টের পাওয়া গেল কপালের ডান দিকে একটা টনটনে যন্ত্রণা, অস্ফুট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—একটুও কি কমেনি?

স্নেহকোমল মৃদু কণ্ঠ কানে এল।

এবারে চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে ফেলল রঞ্জু।

—মা?

কিন্তু মা তো নয়। অচেনা ঘর, অচেনা পরিবেশ। মাথার কাছে টিপয়ের ওপরে লণ্ঠনের আলো। শ্যামল সুন্দর একখানি মুখ, কপালে সিঁদুরের টীপ। বয়েসে ছোটদির মতোই হবে, কিন্তু চোখে মুখে মার মতোই স্নেহগভীর আকুলতা।

—বাড়ি যাবে? একটু সুস্থ হও, বাড়ি পাঠিয়ে দেব বই কি।

তখন মনে পড়ল। মনে পড়ল পুবপাড়ার জিমন্যাষ্টিক ক্লাব, কুইক্ মার্চ, হালদারের দলের সঙ্গে সেই মারামারি। ছুটে পালাবার কথা ভেবেছিল, আচমকা একটা চোট লাগল মাথায়, তারপরই চারদিকের পৃথিবীটা দুলে উঠল, হঠাৎ চলতে সুরু করা একটা গাড়ির চাকার মতো ঘুরে উঠল সমস্ত, তারও পরে—

সব শাদা—সব অন্ধকার। একেবারে ছেলেবেলার অশরীরী অবিনাশবাবুর হাতছানিতে সেই ভাঙা আশ্রমের পাশে সেই অভিজ্ঞতা। অন্ধকার সরে গিয়ে যখন আলো পড়ল, তখন দেখা গেল শাড়ীর আঁচল, একটি মিষ্টি স্নেহকরুণ মুখ, আর উৎকণ্ঠাভরা প্রশ্ন: একটুও কমেনি?

এর পরে চিন্তাধারাটা বয়ে গেল খরগতিতে। রঞ্জু উঠে বসল বিছানায়। এবারে সমস্ত ঘরটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। ঘরে শুধু সেই মেয়েটিই নয়। ওদিকে একখানা চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন বেণুদা। বিছানায় তার পায়ের কাছে পরিমলও বসে আছে, বিষণ্ন আর বিপন্ন তার মুখ।

সাগ্রহে পরিমল বললে, কি রে, ভালো লাগছে একটু? তোকে ওখানে নিয়ে যাওয়াই ভুল হয়েছিল আমার। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত কাপুরুষ আর দুর্বল বলে বোধ হল, মনের ভেতরে বিঁধল অপমানবোধের একটা সূক্ষ্ম কাঁটা। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে পা-টা টলে গেল একবার, কিন্তু রঞ্জু সামলে নিলে নিজেকে। বেশ সহজ সতেজ গলায় বললে, না, আমার কিচ্ছু হয়নি।

—না হওয়াই তো উচিত।—গম্ভীর গমগমে গলায় কথাটা বললেন বেণুদা, হাসলেন সস্নেহ ভঙ্গিতে।—এত সহজেই কি দমে গেলে চলে? আজকাল ছেলেরা তো আর ননীর পুতুল নয়, তাদের হতে হবে আয়রণম্যান।

—তুমি থামো তো দাদা। মহিলাটি ভ্রূভঙ্গি করলেন: ও-সব বক্তৃতা রেখে দাও। ছেলেটাকে তো প্রায় মেরে ফেলবার দাখিল করেছিলে তোমরা। সকলেই তো তোমাদের মতো আয়রণম্যান নয়, গোঁয়ারও নয়। ও সব সকলের সয়না বাপু।

পরিমল হেসে উঠল, করুণাদি, আপনি কিন্তু রঞ্জুকে অপমান করলেন।

—অপমান! অপমান কেন?—করুণাদি একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন রঞ্জুর ওপরে, তারপরে তাকালেন পরিমলের মুখের দিকে: এতে অপমানটা হল কোন্‌খানে?

—বাঃ, অপমান নয়? ওকে আপনি দুর্বল বললেন, কিন্তু দুর্বলতার অভিযোগটা রঞ্জু নিশ্চয় মেনে নিতে রাজী নয়।

—উঃ দাদা—বেণুদার দিকে ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টি প্রসারিত করলেন করুণাদি: তোমার শিষ্যদের কী বক্তৃতা দিতেই যে তুমি শিখিয়েছ! আর কিছু না হোক কথার চোটেই এরা ভারত উদ্ধার করে ফেলবে দেখছি। বক্তৃতা দিয়েই ইংরেজকে একেবারে ধুলোর মতো উড়িয়ে দেবে ভারতবর্ষ থেকে।

ঘরশুদ্ধ সবাই হাসল, রঞ্জুও হাসল। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এই যে প্রসঙ্গটা উঠেছে তার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছে না সে, কেমন অপ্রতিভ, কেমন সংকুচিত মনে হচ্ছে যেন। সত্যিই তো, সে যে দুর্বল, তার যে শক্তি নেই এটা পরিষ্কার ধরা পড়ে গেছে সকলের কাছে। না হয় লেগেছে একটা লাঠি কিংবা ইঁটের চোট, তাই বলে অমন ভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়াটা তার উচিত হয়নি, উচিত হয়নি একটা গভীর করুণা আর সমবেদনার প্রার্থীরূপে নিজেকে সকলের সামনে ধরে দিতে। দেখেছে ফাঁসির দড়ির স্বপ্ন, বুক পেতে নিতে হয়েছে এগিয়ে চলার পথের কঠিনতম যা কিছু আঘাত, গুরু-গোবিন্দের মতো 'তুরঙ্গসম অঙ্গ-নিয়তি'র রশ্মি আঁকড়ে তাকে ছোটাতে চেয়েছে মৃত্যু আর দুর্গমের অভিসারে। কিন্তু একি হল। এই মুহূর্তে সকলের কাছে ধরা পড়ে গেল তার দুর্বলতা আর অশক্ত পঙ্গুতা।

এ ঘরে আর থাকা চলে না—অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ির কথাও মনে পড়েছে। বেরিয়েছে সেই বিকেল চারটেয়, অথচ ঘরের দেওয়াল ঘড়িতে এখন দেখা যাচ্ছে পৌনে আটটা। বাড়িতে কৈফিয়তের কথাটা ভাবতেই আশংকায় আর সংশয়ে তালু অবধি শুকিয়ে উঠল তার।

—বাড়ি চল পরিমল।

করুণাদি বললেন, বোসো, একটু চা খেয়ে তাজা হয়ে যাও।

—নাঃ, চা আমি খাব না।

বেণুদা বললেন, তা হলে একটা গাড়ি ডেকে আনো পরিমল। ও হেঁটে যেতে পারবে না।

—কিচ্ছু দরকার নেই। আমি বেশ হাঁটতে পারব, আমার কিছু হয়নি।

করুণাদি এগিয়ে এলেন, সস্নেহ নরম আঙুলে একবার কপালের ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করলেন রঞ্জুর। আশ্চর্য ভালো লাগল স্পর্শের এই অনুভূতিটুকু। ভারী নরম, ভারী কোমল করুণাদির হাতের ছোঁয়া। কেমন যেন ঘুম জড়িয়ে আসে, ব্যথা জুড়িয়ে যায়, মনে হয় মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ছেলেবেলায় ঘুম পাড়ানোর আগে।

—আচ্ছা এসো ভাই।—করুণাদি হাসলেন: তাই বলে আমাদেরও ভুলে যেয়ো না। পরিচয়টা তো হল, পরিমলের সঙ্গে এসো মাঝে মাঝে এখানে, কেমন?—করুণাদি একটু থামলেন, প্রসন্ন কৌতুকে শান্ত চোখ দুটি ঝিকমিক করে উঠল: তাই বলে অজ্ঞান অবস্থায় নয়, বেশ ভালো ছেলের মতো এবং লক্ষ্মী হয়ে।

এত সুন্দর লাগল কথাগুলি। বুকের ভেতরে কেমন ছলছলিয়ে উঠল, কেন যেন ইচ্ছে করল হেঁট হয়ে সে করুণাদির পায়ের ধুলো নেয়। কিন্তু কেমন বাড়াবাড়ি ঠেকবে, করুণাদি কী ভাববেন কে জানে। তবু আচমকা একটা খেয়ালের মতো বোধ হল অজ্ঞান হয়ে এলেও নেহাৎ মন্দ হয় না, অন্তত করুণাদির এই হাতের ছোঁয়াটা পাওয়া যাবে এবং সেও নেহাৎ মন্দ একটা জিনিস নয়।

—আচ্ছা, আসব।

লণ্ঠন ধরলেন করুণাদি, আগে আগে চললেন বেণুদা, মাঝখানে রঞ্জু। আর এতক্ষণে জায়গাটাকে চিনতে পারল। ওই তো বড়ালদের মন্দিরটা, বরদাবাবুর বাগান, মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় কেরোসিনের আলো টিপ টিপ করে জ্বলছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বেণুদা বললেন, রঞ্জন?

—উঁ?

—ব্যথা পেয়েছ সত্যি, কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ো না। জানোই তো,

> অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
> তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে?

রঞ্জু চুপ করে রইল, কী জবাব দেবার আছে ভেবে পেল না।

বেণুদা বললেন, আচ্ছা, তবে যাও। রাত হয়ে গেছে, আর দেরী কোরো না। পরিমল, ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে কৈফিয়তের হাত থেকে ওকে বাঁচিয়ে তবে তোমার ছুটি, বুঝেছ?

পরিমল মাথা নাড়ল।

দু পা এগিয়েছে, হঠাৎ পেছন থেকে ডাক এল, রঞ্জু?

করুণাদি। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন লণ্ঠন হাতে। শাড়ীর জরিপাড়টা চিক চিক করছে আলোয়, কানের একটা গয়না উঠছে ঝিলমিল করে। সুকুমার শ্যামল মুখের ওপরে প্রতিটি ভাঁজে আর রেখায় আরো গভীর, আরো নিবিড় কোমলতা যেন বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

করুণাদি বললেন, ভুলো না রঞ্জন, আবার এসো, কেমন?

—আসব, নিশ্চয় আসব। রঞ্জুর গলা আবেগে কেঁপে উঠল এবারে।

বেণুদার পাশে, লণ্ঠন হাতে তখনো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন করুণাদি। কিন্তু আর পেছন ফিরে তাকানো চলে না, এবার এগোতেই হবে বাড়ির দিকে।

ল্যাম্পপোষ্টের মিটমিটে আলোয়, খোয়া-ওঠা প্রায় নির্জন পথ দিয়ে চলল দুজনে। পরিমল যেমন মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে চুপ করে থাকে, তেমনি নিঃশব্দেই চলেছে রঞ্জুর পাশাপাশি। ল্যাম্পপোষ্ট যত পেছনে সরছে, তত দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে নিজেদের ছায়া, অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দীর্ঘতর হয়ে, আবার আর একটা লাইট পোষ্টের কাছাকাছি আসতেই পায়ের নীচে গোল হয়ে জড়ো হচ্ছে সেটা—ছড়িয়ে পড়ছে পাশে।

কিন্তু কতক্ষণ আর ভালো লাগে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে চলা? রঞ্জু অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল, ওটা বেণুদার বাড়ি, না?

—হুঁ।

—করুণাদি কে ভাই?

পরিমল সংক্ষেপে বললে, বেণুদার বোন—আমাদের সকলের দিদি।

—বেশ করুণাদি, না?—রঞ্জু সাগ্রহে পরিমলের দিকে তাকালো, করুণাদি সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চায় বিস্তীর্ণ ভাবে।

—হুঁ।—একটু থামল পরিমল: কিন্তু ভারী কষ্টের জীবন করুণাদির—ভারী ব্যথার জীবন।

—কষ্ট, ব্যথা!—রঞ্জুর বুকে যেন একটা ঘা লাগল: কেন?

—আর একদিন বলব—শ্রান্ত স্বরে জবাব দিলে পরিমল।

ক্ষুণ্ণভাবে রঞ্জু চুপ করে রইল। ওই এক দোষ পরিমলের। পরে বলব, আর একদিন বলব। আভাস দেয়, অথচ স্পষ্ট করে না, ঠেলে দিতে থাকে জিজ্ঞাসার আকুল আর কালো অন্ধকারের মধ্যে।

আট

এক একটি দিন। খণ্ড, বিচ্ছিন্ন। একটি সূর্যোদয় থেকে আর একটি উদয়রাগ পর্যন্ত সৌরগোলকের পরিক্রমা। চব্বিশটি ঘণ্টা দিয়ে ছকে কাটা দিন—নানা রঙের দিন। আলাদা আলাদা রূপ, নতুন ভাবনা, নতুন সংঘাত, পরিচিত পৃথিবীতে অজস্র অগণিত অপরিচয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। তিলে তিলে পলে পলে নিজেকে জানা, নিজের শক্তিকে, দুর্বলতাকেও।

নানা রঙের খণ্ড ছিন্ন দিন, অগণ্য বৈচিত্র্যে পরিকীর্ণ স্বাতন্ত্র্যে সীমাঙ্কিত। তারপর দূরে সরে এলে অন্ধকার রাত্রিতে চলন্ত ট্রেণের যাত্রীর মতো তমসাস্তীর্ণ বন-বনান্ত গ্রাম-গ্রামান্তের একটা নির্বিশেষ অবিচ্ছিন্নতা যেন ধরা দেয় চোখের সামনে। সেই অচ্ছেদ চলিষ্ণুতার ভেতরে দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া ছোট ষ্টেশনের এলোমেলো আলোর মতো নির্বিশেষের মধ্যেও কোনো বিশেষের মোহময়তা। সুদূর অতীতে বিস্মৃতপ্রায় রূপদক্ষের হাতে তীক্ষ্ণোজ্জ্বল শিলা-ছেদনী ঝকমক করে ওঠে শিলালিপির পাষাণ পট্টে। রঞ্জুর সমস্ত মানসিকতার সঙ্গে যাদের যোগ ছিল—হয়তো অলক্ষ্য, হয়তো নিছক অর্থহীনভাবে—আজ তাদের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ধরা পড়ে গেছে; পাওয়া গেছে মানসিক সংযোগের সেই সূক্ষ্ম সূত্রটি—সেদিন অজানিতে যার অঙ্কুর পড়েছিল, আজ তা পল্লবিত হয়ে জীবনে এনেছে অপরূপ ছায়াচ্ছন্নতা। আর সেই ছায়া বিস্তারের নীচে শুকিয়ে মরে গেছে অনেক গুল্ম, অনেক নতুন চারায় নতুন পাতা—যেগুলিকে হয়তো সেদিন ভুল হয়েছিল আগামী কালের বনস্পতি ভেবে।

সেদিনকার সেই মারামারি ব্যাপারটা অনেকখানি গড়িয়েছিল অবশ্য। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসেছিল। হালদারকে ধমকে দিয়ে গেছে, একটা নাম মাত্র ভাড়ার ব্যবস্থাও ফণীর মার কাছ থেকে করে দিয়েছেন

কোতোয়ালী থানায় অফিসার ইন্ চার্জ স্বয়ং। হালদার গজর গজর করে বলেছে, এভাবে অন্যায় জুলুম যদি গরীবের ওপর হয় তার—

দারোগা ধমকে দিয়েছেন: বেশি কথা বাড়াবেন না মশাই। গুণ্ডা এনে হামলা করেছিলেন, মারামারির ব্যবস্থা করেছিলেন। বেশি বকবক করেন তো ট্রেস্পাস্, গুণ্ডা আইন আর রায়টিঙের চার্জে চালান করে দেব। শহরের মানী ব্যবসায়ী বলে এ যাত্রা আপনাকে ছেড়ে দলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি হুঁশিয়ার হবেন।

তারপরেই মুখ গোঁজ করে সরে পড়েছে হালদার। তবে যাবার সময় বলে গেছে, যদি দিন পাই তবে ওই তরুণ সমিতির ছোকরাদেরও একবার আমি দেখে নেব। এ অপমান সহজে আমি ভুলব না।

তবে দারোগার নিরপেক্ষতা আছে। বেণুদাকেও তিনি থানায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন এসব অনধিকারচর্চা করতে। যদি কোথাও কোনো অন্যায় ঘটে, তার জন্যে পুলিশ আছে এবং এই কারণেই গবর্ণমেণ্ট পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে পোষণ করে থাকেন। কিছু করণীয় থাকলে থানাতেই একটা খবর দেওয়া উচিত, নিজেদের হাতে আইনের ভার তুলে নেওয়াটা বে-আইনি।

বেণুদা হাসি মুখে বলেছেন, আচ্ছা, মনে থাকবে।

দারোগা আরো দু চারটে কথা বলেছেন বেণুদাকে, কিন্তু গলা নামিয়ে এবং অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে। হিতৈষী বন্ধুর মতো তিনি বেণুদাকে জানিয়েছেন যে তরুণ সমিতির কার্যবিধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট্ নানা কারণে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং এই ক্লাবটির পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রেও শুভার্থী হিসেবে তিনি বেণুদাকে সংযত এবং সাবধান থাকবার অনুরোধ জানিয়েছেন।

বেণুদা বলেছেন, অনুরোধ তিনি ভুলবেন না।

মোটামুটি ভাবে ঘটনার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে ওখানেই। আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় রঞ্জু বাড়িতে এসে পৌছোতে যে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরমা গলা ছেড়ে আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছিলেন। তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে পরিমল। বেশ চমৎকার করে বুঝিয়ে দিয়েছে এবং কথাটা সত্যিও বটে, যে নিরীহ ভালোমানুষ রঞ্জুর কোনো দোষই ছিল না। পথে দুদলের মধ্যে মারামারি হচ্ছিল, তারই একটা ঢিল ছটকে এসে রঞ্জুর কপালে হঠাৎ লেগে যায়, তাই—

তাই দুরন্ত ছেলের ওপর একপ্রস্থ বকুনি বর্ষণ করেই বড়রা ক্ষান্ত হয়েছেন। কপাল ভালো, বাবা এক সপ্তাহ থেকে মফঃস্বলে, তাই জেরার সামনে পড়তে হয়নি। নইলে হয়তো পরিমলের সঙ্গে মেশা কিংবা তরুণ সমিতিতে যাতায়াত করাটাও বন্ধ করে দিতেন তিনি।

পরিমল পরের দিন সকালেই খবর নিতে এল। মাথাটায় অল্প অল্প যন্ত্রণা, রঞ্জু তখনো নির্জীবভাবে বিছানায় পড়েছিল। পরিমল চলে এল একেবারে শোওয়ার ঘরেই—ছোট বোন্ আধুলী ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

পরিমলকে দেখে খুশিতে চক চক করে উঠল রঞ্জুর চোখ: আয়, আয়।

বিছানার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল পরিমল: আছিস কেমন?

রঞ্জু ততক্ষণে গায়ের চাদরটা সরিয়ে উঠে বসেছে। অপ্রতিভভাবে বললে, ভালোই আছি।

—যন্ত্রণা-টন্ত্রণা বিশেষ কিছু নেই তো?

—না।

—যাক্, বাঁচালি—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পরিমল: দস্তুর মতো আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলি তুই। যা করে পড়ে গেলি আর যে ভাবে রক্ত ছুটল—দেখে তো আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া!

লজ্জিত রঞ্জু নীরবে কড়ে আঙুলের নোখটাকে কামড়াতে লাগল।

পরিমল বললে, ওই জন্যেই তো তোকে বলি চলে আয় আমাদের জিমনাষ্টিক ক্লাবে। শরীর শক্ত হবে, বুকে বল আসবে। একটা ঘা খেয়েই অমন অজ্ঞান হয়ে পড়বি না।

—হাঁ, আমি ক্লাবের মেম্বার হবো—আস্তে আস্তে, যেন ঘোরের মধ্যে পরিমলের কথার জবাব দিলে রঞ্জু। শুধু শরীরটা শক্ত করবার জন্যে নয়, শুধু একটা ঘা খেয়ে অতি সহজেই অজ্ঞান হয়ে পড়বার অপবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যেও নয়। একটা প্রকাণ্ড দশাসই জোয়ান—ভীম ভবানী কিংবা রামমূর্তি হওয়ার বাসনাও

তার নেই। সত্যি বলতে কি, হাত পায়ের ডুমো ডুমো মাস্‌ল ফুলিয়ে, বুকের ওপর একটা পাঁচটনী রোলার চাপিয়ে কিংবা দুহাতে দুখানা চলতি মোটর টেনে ধরে যারা কসরৎ দেখায়, সেই সব অতিকায় জোয়ানেরা রঞ্জুর মনে কোনো মোহ জাগায় না। কেমন স্থূল মনে হয়, নিজের শরীরকে অত করে দেখানোর মধ্যে কোথায় যেন একটা অশালীনতা বোধ করে রঞ্জুর মন। আসলে তরুণ সমিতি তার মনে কেমন একটা বিচিত্র প্রলোভন জাগিয়েছে—সৃষ্টি করেছে একটা নেশার মাদকতা। ওখানকার ছেলেরা, ওখানকার জীবন, ভূতুড়ে জমিদার বাড়ির পরিবেশে ওদের ওই আখড়াটা, বেণুদা, বেণুদার একটি কথার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলের লাইন বেঁধে এসে দাঁড়ানো—আর তারপরে মার্চ করে চলা—এদের সবগুলি এক সঙ্গে মিলে কিসের একটা রোমাঞ্চিত চাঞ্চল্য জাগিয়েছে তার চেতনায়। তা কী সে জানেনা, অথচ এটা জানে যে তরুণ সমিতির ছেলেদের সঙ্গে তার মনের চমৎকার সহযোগিতা ঘটে গেছে।

রঞ্জু আস্তে আস্তে বললে, লাইব্রেরীতে যাওয়া হল না যে।

—তুইই তো বাগড়া দিলি। নইলে চমৎকার যাওয়া যেত আজকে।

—বেশ তো, চলোনা আজকে।

—ধ্যেৎ, আজ কী করে হয়। তুই তো উঠতেই পারবি না।

রঞ্জু জোর গলায় বললে—আমার কিচ্ছু হয়নি, আমি ঠিক আছি।

—তুই ঠিক থাকলে কী হবে, বাড়ি থেকে যেতে দেবেনা তোকে।

—ঠিক দেবে—সে ব্যবস্থা আমি করব।

—আচ্ছা দেখি—চুপ করে খানিকক্ষণ কী ভাবল পরিমল। তারপর মৃদু হেসে বললে, আজ সকালেই বেণুদা এসেছিলেন তোর খোঁজ নিতে—করুণাদি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে।

—করুণাদি। রঞ্জুর মনটা হঠাৎ যেন ছলছল করে উঠল। মনে পড়ল অচেনা ঘর, লণ্ঠনের আলো, শাড়ীর পাড়, কয়েকগাছা চুড়ি আর মায়ের মতো স্নেহভরা মিষ্টি কণ্ঠ।

—বেণুদাকে নিয়ে এলেনা কেন?

—আর একদিন আসবেন বললেন।

রঞ্জুর আর একটা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সামলে নিলে। করুণাদি কি আসতে পারেন না তাকে দেখতে। এলে কিন্তু বড় ভালো হত। করুণাদি সম্পর্কে একটা বেদনাসিক্ত কৌতূহল কাল সমস্ত রাত্রি মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরেছে তার। করুণাদির জীবন নাকি বড় কষ্টের, ভারী দুঃখের। কিন্তু কিসের কষ্ট, কিসের দুঃখ তাঁর? বেণুদার বোন—করুণাদির মতো মানুষ—সংসারে এমন কী আছে যা তাঁকে ব্যথা দিতে পারে?

করুণাদির যোগাযোগে আর একটি নামও চমকে উঠল চেতনায়—সে মিতা, সংঘমিত্রা। বড় ভালো লেগেছে, ভারী মিষ্টি লেগেছে মুখখানি। আচ্ছা, মিতা কি জানে তার এই আঘাতের ইতিহাস? একটু কি দুঃখিত হয়নি, একটুখানিও কি চিন্তিত হয়নি তার জন্যে?

কিন্তু মিতার কথাটা জিজ্ঞাসা করা তো আরো অসম্ভব। কেন কে জানে, একবার বিদ্যুচ্চমকের মতো দেখা ওই মেয়েটির কথা মনে পড়লে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর গন্ধ এসে চেতনাকে আবিষ্ট করে দেয়। ফুলের গন্ধ আসে, ধূপের গন্ধ আসে—ছবিতে দেখা, স্বপ্নের মধ্যে দেখা একটা বাগান, হেনার কুঞ্জ, শ্বেত পাথরের ফোয়ারা, আর তার সঙ্গে—

মিতার প্রসঙ্গটা মনের ভেতর উঁকি মারতেই রঞ্জুর মুখে পড়ল লজ্জার আভা, কেন সে জানে না। জোর করেই সে চিন্তার মোড়টা ঘুরিয়ে নিলে, জিজ্ঞাসা করল, মারামারির কী হল ভাই?

পরিমল বললে। হালদারের কথা, দারোগার কথা, বেণুদার কথা। আর পরিমলের সংক্ষিপ্ত কথাগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়ে উঠল: তরুণ সমিতি সম্পর্কে কী সন্দেহ করেন দারোগা? আর এর উদ্দেশ্যকেই বা এমন বিপজ্জনক বলে মনে করেন কেন গবর্ণমেণ্ট?

কিন্তু এ প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক। রঞ্জু জানে কী বলবে পরিমল। তেমনি ঘুরিয়ে জবাব দেবে, আজ থাক, আর একদিন বলব সে কথা। আর একদিন!

রঞ্জু ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এই আর একদিনের উৎপীড়নে। মাটির তলায় পাতালপুরীর সুড়ঙ্গ পথ খুলবার মন্ত্রটা নিশ্চয় জানা আছে পরিমলের। কিন্তু সে বলবে না, খালি প্রতীক্ষায় আকুল করে রাখবে, অস্বস্তিতে বিতৃষ্ণ করে রাখবে মন। তার চাইতে কৌতূহলকে সংযত করে রাখাই ভালো।

রঞ্জু বললে, নতুন বই দিবিনা আমাকে ?

পরিমল চোখ তুলে সতর্কভাবে তাকিয়ে নিলে ঘরের চারদিকে। আস্তে আস্তে বললে, চুপ। সে হবে পরে, কিন্তু সত্যিই আজ বিকেলে যাবি তুই লাইব্রেরীতে ?

—হুঁ, যাব।

—ডাকতে আসব ?

—না। কেউ টের পেলে বেরুতে দেবেনা। তার চাইতে আমিই এক ফাঁকে যাবো তোদের বাড়িতে—তোকে ডেকে নেব।

—কিন্তু না বলে গেলে বাড়িতে তো বকাবকি করবে।

রঞ্জু হাসল। সগুপড়া রবীন্দ্রনাথের একটা লাইন আউড়ে বললে,

পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়োনা ভালো ছেলে করে—

পরিমল হাসল প্রসন্নভাবে। ওর মুখের ওপর কেমন একটা লঘু অকারণ মেঘাচ্ছন্নতা ঘনিয়ে ছিল, সেটা যেন উড়ে গেল একটা হালকা বাতাসে। বললে কবি, জীবনে সবটাই কাব্য নয়। আঘাত যখন আসে তখন ওই কাব্যের ওপর দিয়েই তাকে কাটিয়ে দেওয়া যায়না।

—তা জানি।—আবেগভরে রঞ্জু বললে, তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতেও পারব।

পরিমলের চোখে কৌতুক চকচক করে উঠল, কানাই-লালের ওপর কবিতা লিখেই ?

—না। দরকার হলে কানাইলালের মতো পিস্তলও ধরতে পারব।

—বটে বটে!—একটা আঙুল ঠোঁটের ওপর দিয়ে পরিমল বললে, স্‌স্‌। অত জোরে নয়। পিস্তল ধরবার অত উৎসাহই যদি থাকে, তা হলে সময় মতো তার পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

রঞ্জুর শরীরের মধ্যে যেন ঝড়াৎ করে খানিকটা বিদ্যুৎ বয়ে গেল—ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে মাথার চুলগুলো পর্যন্ত। প্রায় সাপের গর্জনের মতো একটা তীব্র উত্তেজিত শব্দ করে উঠল রঞ্জু : পরিমল !

কিন্তু ততক্ষণে পরিমল উঠে দাঁড়িয়েছে। অনেকটা বেশি বলে ফেলেছে, অসংযত হয়ে অনধিকার চর্চা করে ফেলেছে অনেকখানি। বললে, থাক ওসব। আমি চললাম।

নিরুত্তাপ, কঠিন গলা। রঞ্জু টের পেল কয়েক মুহূর্ত আগেকার অসংযত শিথিলতার ওপরে পাথরের মতো নিষ্ঠুর কঠিনতা ঘনিয়ে এসেছে। একে ঠেলে দেওয়া যাবেনা, কোনো অনুরোধ উপরোধেই স্থানভ্রষ্ট করা যাবেনা একে।

রঞ্জু দাঁতে দাঁত চাপল, যেন অত্যন্ত দ্রুত ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সামনে বাধা পেয়ে আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হল তাকে। পরিমল আবার বললে, আমি চলি।

—আচ্ছা।

—বিকেলে যাবি তো ?

—যাব।

—আচ্ছা—

পরিমল বেরিয়ে যাচ্ছিল, পেছন থেকে রঞ্জু ডাকল : শোন ?

—কিছু বলবি ?

একটা ঢোক গিলে নিয়ে রঞ্জু বললে, বেণুদা আর করুণাদিকে বলিস আমি ভালোই আছি।

—বলব।

বেরিয়ে গেল পরিমল, একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটা।

কিন্তু তখন মনের মধ্যে যেন ঝড়ের মাতন আরম্ভ হয়ে গেছে রঞ্জুর। সমস্ত শরীরে রক্ত উছলে উছলে উঠছে, তার ঝাঁঝ যেন ছড়িয়ে পড়ছে তার নাক মুখ থেকে, একটা জ্বরের মতো উত্তাপ যেন অকস্মাৎ দেখা দিয়েছে তার ত্বকের ওপর। পেয়েছে—যা চেয়েছিল তার সন্ধান পেয়েছে, মিলেছে বহু প্রত্যাশিত আর সুদূর প্রতীক্ষিত গোপন মণিকোঠার সন্ধান। পাথরের বাধা চকিতের মধ্যে এসে আড়াল করে দিয়েছে দৃষ্টিকে, কিন্তু ওই মুহূর্তের অবকাশেই রঞ্জু দেখে নিয়েছে সেই আশ্চর্য জগতের একটুখানি আভাস। কোথায় দুর্নিরীক্ষ্য আকাশগঙ্গার মতো—সহস্র কোটি মাইলেরও ওপারের প্রসারিত আকাশগঙ্গার মতো ধরা ছোঁয়ার বাইরে সেই বিচিত্র পথ। সেখানে বোমার ফুলঝুরি ফুলের মতো ফুটে পড়ল, পিস্তলের আগুন ছুটে গেল নীলিমোজ্জ্বল একটা সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলকের মতো—ফাঁসি কাঠে দুলে উঠল জ্যোতির্ময় শহীদদের ছায়া মূর্তি !

এবার সে পথ তারও পথ। শুধু আর একটু অপেক্ষা করতে হবে—আরো একটু তৈরী করে নিতে হবে নিজেকে।

(ক্রমশঃ)

বোম্বায়ে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী বাঙ্গালীরাই বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বর্ত্তিকাবাহক। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন প্রবাসের বাঙ্গালী নর-নারীর অভাব-অভিযোগ সুখ-দুঃখের আলোচনা ও পরস্পর মিলনের প্রধান ক্ষেত্র। ভারতের নানা প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন নগরে এই সম্মেলনের চব্বিশটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৩৫৪ সালে বোম্বাই মহানগরীতে মহাসমারোহে সম্মেলনের জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের ইহাই প্রথম অধিবেশন। সেই নিমিত্ত এই অধিবেশনে বাঙ্গলার বহু কৃতী সাহিত্যিক ও প্রবাসের অনেক সুধীজন সম্মিলিত হইয়া সম্মেলনকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গত অতুলপ্রসাদ সেন, স্বর্গত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, স্বর্গত ললিতমোহন সেন রায়, স্বর্গত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতির উদ্যোগে বারাণসীধামে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌরোহিত্যে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। বার বৎসর অন্তর জন্মভূমি দর্শন করা বাঙ্গালীর এক প্রাচীন সংস্কার, এই সম্মেলনের দ্বাদশ ও চব্বিশ বার্ষিক অধিবেশন ১৯৩৪ ও ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন বোম্বাই সহরে এই প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়।

বোম্বাই সহর কলিকাতারই ন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্য পত্তনেরই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্বের নানা জাতির কর্ম্মস্থল ও বাসস্থান এই বোম্বাই সহর। পার্শী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয়-প্রধান এই বোম্বাই নগরে মাদ্রাজী ও বাঙ্গালী অনেক আছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০০, ইহার মধ্যে আড়াই হাজার বাঙ্গালী—স্বর্ণকার ও মণিকার—বোম্বাইতে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। জহুরী বাজারে তাহাদের বেশ প্রতিপত্তি, কেহ কেহ লক্ষাধিপতিও আছেন, কয়েকজন নিজ নিজ বাটী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন। এই সম্প্রদায়ের একখানি দুর্গোৎসব হয়। প্যারেল ও দাদারে কর্ম্মজীবী বাঙ্গালীরা বসবাস করে। এখানে বেঙ্গলী এডুকেশন্যাল সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে একটি বাংলা-ইংরাজি হাইস্কুল আছে। তাহার নিজস্ব সুদৃশ্য ত্রিতল বাটী আছে এবং স্কুলটিতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলার মাধ্যম পাঠও পরীক্ষা-গ্রহণ হইয়া থাকে। ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গেই কিণ্ডার গার্ডেন ক্লাস হইতে ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পাঠ করে। বিদ্যালয়ে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আছেন। শ্রীমতী শিশিরকণা সেন, মিসেস্ বি-এন সেন, শ্রীমতী মায়া ভারা বি-এ, বি-টী তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

প্যারেলে বাঙ্গালী ক্লাব বাঙ্গালীদের একটী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এখানে একটি পুস্তক ও পত্রিকার পাঠাগার আছে। সভ্যগণ দুর্গোৎসব, বাংলা নাটক অভিনয় এবং গানের মজলিস অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্মেলনের প্রাক্কালে ভিক্টোরিয়া জুবিলী ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতা হইতে আগত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, গজেন্দ্র মিত্র, সুমথ ঘোষ, অতুল গুপ্ত প্রভৃতিকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই পুরাতন। ছাত্রসংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা অনেক অল্প। কয়েক বৎসর হইল বাংলা ভাষা পঠন ও পাঠের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার সংশ্লিষ্ট পুস্তকালয় "রাজাবাই টাওয়ার" নামে সুউচ্চ ঘড়িস্তম্ভ সংযুক্ত, সুবৃহৎ, সুন্দর পাথরের অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রায় ৮০,০০০নানা ভাষার পুস্তক সংগৃহীত আছে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে কোন বাংলা পুস্তক ছিল না। নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদকরূপে লেখক বাংলা পুস্তক দান করিয়া এই গ্রন্থাগারে বাংলা পুস্তকের সংগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। বর্ত্তমানে প্রায় দুই শত বাংলা বই আছে।

বোম্বাই সহরে বাঙ্গালীদের চারখানি দুর্গোৎসব হয়। খারে রামকৃষ্ণ মিশন বাঙ্গালার সংস্কৃতি পরিবেশন করে।

২৬শে ডিসেম্বর হইতে দিবসত্রয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়। প্রায় ১৬০জন প্রতিনিধি বোম্বাইএর বাহির হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কলিকাতা হইতে ৪৪ ও এলাহাবাদ হইতে ৪২জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশই ভিক্টোরিয়া টেকনিক্যাল বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ও পারেলে বাংলা স্কুল গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

সুদৃশ্য মণ্ডপে বিপুল আনন্দ ও উত্তেজনার মধ্যে অধিবেশন ৩টার সময় আরম্ভ হয়। নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বিভিন্ন শাখা সভাপতিসহ সভামণ্ডপে প্রবেশ করেন। দ্বারে মহিলা সেচ্ছাসেবিকারা লাঠি হস্তে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান। মঞ্চোপরি সভাপতিগণ আসন গ্রহণ করিলে বোম্বাইএর প্রধান মন্ত্রী মাননীয় খের মহাশয় আগমন করেন। শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন।

তিনি বলেন—অ-বাঙ্গালীরা অপবাদ দেয় যে বাঙ্গালীরা স্থানীয় লোকের সহিত মেলা-মেশা করে না, তাহা সত্য নহে। এ কথাও বিশ্বাস-যোগ্য নয় যে বাঙ্গালীরা প্রবাসে কেবল ডাক্তারী, মাষ্টারী ও কেরাণীরই উপযুক্ত, ব্যবসায়ে অপটু। বোম্বাইয়ে জহুরীরা কৃতী ব্যবসায়ী, তাহারা অপবাদ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বোম্বাইএর সহিত বাঙ্গালীর প্রতিভা আজ ৬০ বৎসরের অধিক কাল হইতে সংযুক্ত। তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, নগেন্দ্র গুপ্ত, সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন বসু, বিপিন পাল,

ডাঃ ডি-এন বসুর সংগ্রবের বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের "বোম্বাই প্রবাস", রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ," শ্রীঅরবিন্দের "ইন্দুপ্রকাশের প্রবন্ধ" বোম্বাই প্রদেশেই লিখিত হইয়াছিল বলেন। পাগল হরনাথের ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের অনেক ধনী গুজরাতী ভক্ত ও শিষ্য আছেন। এখানকার রবীন্দ্র সোসাইটী প্রধানত অ-বাঙ্গালী শান্তি-নিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারাই পরিচালিত। চলচ্চিত্র-জগতে অনেক বাঙ্গালী ডিরেক্টর, লেখক, শিল্পী, গীত-বাদ্য পরিচালক বোম্বাইতে থাকেন। যদিও বাঙ্গালী আজ স্বাধীন ভারতে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে, তথাপি আশা করা যায়, বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার মধ্যে সুপথ আবিষ্কার করিবে। সেইজন্য মনে হয় এই সাহিত্য সম্মেলন স্বাধীন ভারতের পথপ্রদর্শক হইবে।

তৎপরে প্রধান মন্ত্রী খারে বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বাংলা ভাষাতে বলেন "আমি বাংলা বুঝি, পড়িতে পারি, তবে ভাল বলিতে পারি না। বাংলা ও মহারাষ্ট্র ভাষা একই সংস্কৃত ভাষার মূল হইতে আগত, প্রতি ১০টী কথার মধ্যে ৯টী কথা বাংলার সহিত এক গোষ্ঠীয়।" তিনি বিচারপতি সেনের মুদ্রিত বক্তৃতা হইতে পড়িয়া তাহা দেখাইয়া দেন।

অতঃপর মূল সভাপতি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় ক্ষিতীশচন্দ্র সেন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"ভারত দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত হউক না কেন—আজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। ই-উ-নোর অধিবেশনে নানা জাতির সংঘাত ও পরস্পর দোষারোপ আস্ফালনের মধ্যে একাকী ভারত ন্যায় ও সত্যের মানদণ্ডহস্তে প্রবেশ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর গান্ধীজির বাণীর ভীমকঠোর সৌন্দর্য্য সমগ্র জগতে শনৈঃ শনৈঃ প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক নয় কি যে ভারতের নিজস্ব ও বৈশিষ্ট্য কিছু আছে?"

তিনি সাহিত্যিকদের নিকট নিবেদন করিয়াছেন—"দেশের প্রতি, জনসাধারণের প্রতি, ভবিষ্যত জাতিগঠনের প্রতি আপনাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিবেন। তাহা হইলে বঙ্গ-সরস্বতীর বাণী আপনাদের লেখনীমুখে প্রকাশিত হইবে; তাহা হইলেই আপনাদের পাঠকরা দেখিবে তাহাদের অন্তর যাহা চাহিয়াছিল তাহাকেই আপনারা মূর্ত্তি ও কণ্ঠস্বর দিয়াছেন।"

তিনি 'শুদ্ধ' সাহিত্য ছাড়া অন্য অন্য বৈষয়িক ও ব্যবহারিক সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"এই কর্ম্মজগতের সহিত সাহিত্যের সহকারিতা চাই। দেশের কল্যাণার্থ আপনারা বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য লিখুন, এ বিষয়ে আমাদের ভাষা এখন দরিদ্র, আমাদের ভাণ্ডার দ্রুত বাড়াইতে হইবে, পূর্ণ করিতে হইবে, কারণ সকল বিষয়ে বাংলা ভাষায় কাজ ও ব্যবহার হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং হইবেও, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। * * * এই কর্ম্মজগতের সহিত সাহিত্যের সহকারিতা চাই। ইতিহাসকে নিজ সৃষ্টিতে প্রতিফলিত করিলেই চলিবে না, ইতিহাস গঠনের কার্য্যেও সাহিত্যকে হাত লাগাইতে হইবে। এজন্য দেশের শাসনতন্ত্রের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় ও লেখক-সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ-সাহচর্য্য ও সহযোগিতা থাকা আবশ্যক।"

সভাপতি মহাশয় বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"বহুকাল ভাগ্যবিধাতা তাহার রুদ্র মুখই আমাদিগকে দেখাইয়া আসিয়াছেন। অন্য প্রদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুখে বহুক্ষেত্রেই বাংলার উদ্যম ও শক্তি হটিয়া গিয়াছে। তবু আজ বাংলার লেখকের সংখ্যা, পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা এত বেশী যে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। আজও বাংলার উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক অন্য প্রদেশের লেখকেরা অকাতরে অনুবাদ করিয়া চলিয়াছেন। আজও ভারত শাসনতন্ত্রের কাজে বাঙ্গালীর বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতার আবশ্যকতা রহিয়াছে।" উপসংহারে তিনি বলেন—"বাংলা দেশের সাহিত্যসৃষ্টির পথ কখনও নিরুদ্ধ হইবে না—সে দেশের উর্ব্বর ভূমি কখনও ঊষর মরুভূমিতে বা জনবর্জিত অরণ্যে পরিণত হইবে না—একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলা যাইতে পারে।" প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে গুরুদায়িত্বের উল্লেখ করিয়া বলেন—"যাঁহারা লিখিতে পারেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রবাসলব্ধ অভিজ্ঞতা লইয়া গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, স্থানীয় আচার-ব্যবহারের বর্ণনা, নৃতত্ত্ব, ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে পারেন। তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সহিত পরিচয় দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতার ও সম্ভবতঃ বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে পারেন।" তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের তৎপ্রদেশের বাসিন্দাদের সহিত মেলা-মেশা ও তাহাদের মধ্যে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বিতরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন—"যাঁহাদের প্রদেশে আমরা বাস করিতেছি, তাঁহাদের প্রীতি অর্জ্জন করিতে আমাদের বিশেষ প্রয়াস করা দরকার, নহিলে তাঁহাদের বিশ্বাস ও সাহায্য কি করিয়া অর্জন করিব?"

তৎপরে এলাহাবাদনিবাসী সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ কর সমস্ত বৎসরের কার্য্য বিবরণ প্রদান করেন এবং সম্মেলন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের বিবরণ অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ প্রদান করেন। উত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদের নাম ঘোষণা ও সাফল্য পত্র দান করা হয়।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে দীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন এবং পরদিন সাহিত্য-শাখায় কয়েকটি প্রবন্ধও আলোচনা হয়। ইহাতে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, অতুল গুপ্ত, বিমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় "গণ-সাহিত্য" শাখার সভাপতিরূপে গণ-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও রূপ প্রদান করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষ (মৌমাছি) শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতিরূপে দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন।

এই দিবস সন্ধ্যায় বোম্বাই "মণিমেলা" সঙ্ঘ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া "অরুণ-বরুণ-কিরণমালা" রূপকথার সুন্দর রূপাভিনয় করিয়া ভবিষ্যৎ বাংলায় শিশুদের কৃতিত্বের আভাস দেন। শ্রীমতী রাঘব বাই বীণাবাদ্য ও সঙ্গৎ সহিত মধুর মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ভজন গান করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত মহাশয় ভিক্টোরিয়া জুবিলী টেকনিক্যাল

স্কুল গৃহে একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চিত্রগুলি দর্শনীয় ছিল।

তৃতীয় দিন প্রাতে নয়টার সময় লেখকের সভাপতিত্বে মণ্ডপে বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন হয়। পুনার সীতা মুখোপাধ্যায় ব্যতীত অন্য কোন মহিলা প্রতিনিধি ছিল না। কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বেলা দশটা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে সভায় অধিবেশন চলে। প্রথমে ১০টায় মূল অধিবেশন শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে হয়। সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৮৬ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে শুভ ইচ্ছা প্রেরণ করা হয়। এই সভায় অতুল গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্তুতি করিয়া বলেন, শীঘ্রই পূর্ণিমায় বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণ তাঁহার সকাশে গিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবেন। সেই অনুষ্ঠানে এই সম্মেলনের প্রতিনিধি যেন পাঠান হয়।

এই দিবস পর পর বা এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে—ডাঃ সত্যেন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে বিজ্ঞান শাখা, ডাঃ হীরেন্দ্রলাল দের সভাপতিত্বে "অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ও পরিকল্পনা" শাখায়, শ্রীমতী লীলা রায়ের সভানেত্রীত্বে মহিলা শাখা, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র সাহিত্য শাখা ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে সাহিত্য শাখায় অধিবেশন হয়।

মণ্ডপে প্রায় ৫০০ মহিলার সমাগম হইয়াছিল। এলাহাবাদের শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় একটি সদ্য রচিত কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। কল্যাণী ভট্টাচার্য্য এম-এর প্রস্তাবে ও মৃণালিনী মজুমদারের সমর্থনে শ্রীমতী লীলা রায় (কলিকাতা) সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কুলসুম সেয়ানী স্বাগত অভিভাষণ পাঠ করেন।

মৈত্রেয়ী শুক্লা—"প্রাচীন সাহিত্যে নারীর স্থান", মায়া ভায়া বি-এ, বি টি "স্বাধীন ভারতে নারীর দায়িত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় শহীদদের তর্পণ, বিধবাদের বেশ পরিবর্ত্তন, বিধবাবিবাহ অধিক প্রচলন, পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার আইন প্রচলন, বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় বহু বিবাহ রোধ প্রবর্ত্তন, বরপণপ্রথা উচ্ছেদ, যৌতুক প্রদান সহ বিবাহে কন্যাগণের অমত এবং প্রয়োজন ও কারণ থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তন প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীমতী প্রীতি সেন নারীর স্বাবলম্বন দ্বারা আর্থিক উন্নতি করণ, শ্রীমতী আভা বসু বাঙ্গালা নারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার, নীলিমা সিংহ কিশোরকিশোরীদের উপযুক্ত চলচ্চিত্র গঠনের জন্য সরকারের চেষ্টা দাবী, শ্রীমতী নলিনী দত্ত বাধ্যতামূলক নারীর শিশু-পালন শিক্ষা প্রবর্ত্তন আইনের দাবী, শ্রীমতী লীলা হাজরা ও মৃণালিনী মজুমদার শিশু মনবিকাশে মাতার দায়িত্ব, শ্রীমতী অলকা উকীল (কলিকাতা) রাষ্ট্রে ও সমাজে শিশুর দায়িত্ব, শ্রীমতী রমা ব্যানার্জ্জি নিগৃহীত ও ধর্ম্মান্তরিত নারীদের স্বধর্ম্মে ও সমাজে গ্রহণের দাবী, শ্রীমতী নুরজাহান দত্ত শিশুপালন সম্বন্ধে প্রস্তাব, আলোচনা ও বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যেকের ভাষণ ও আলোচনা প্রাণস্পর্শী, দরদী ও সময়োপ-যোগী হইয়াছিল। শ্রীমতী রাণী সেন সকলকে ধন্যবাদ দেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য-শাখা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা শাখা অনুষ্ঠিত হয়। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র নাথের সাহিত্যের এক দিক' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ক্ষিতিমোহন বাবু বোম্বাইএর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—তাঁহার সহিত আমেদাবাদ ও বোম্বাই ভ্রমণকালে—বোম্বাই ও আমেদাবাদ তাঁহার সাহিত্য সাধনায় এক মোড় ফেরান স্থান (Turning point)। আমেদাবাদে তাঁহার গানের প্রথম সুর যোজনা হয়। মহামান্য তিলক তাঁহাকে প্রথম সাধারণভাবে সমালোচনা করেন ও ৫০০০০৲ দিবার প্রস্তাব করেন। রবীন্দ্রনাথ এইখানে বলেন—মনের ব্যথা কীর্ত্তন সুর ছাড়া ব্যক্ত হয় না। তাঁহার জন্য বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের মনের কথা এত গভীরভাবে পূর্ণ। তাঁহার "তোমার গোপনে কথা" ও "জীবনবল্লভ হে" বোম্বাইতে রচিত। শান্তিদেব ঐ গান এবং আরো কয়েকখানি গান ক্ষিতিমোহন বাবুর বক্তৃতার সঙ্গে গাহেন। এই স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেন "বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হবে না ত অন্য কি ভাষা হতে পারে।" সন্ধ্যায় বোম্বাইএর বাঙ্গালীদের স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণ জাতীয় সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক, নৃত্য গীতের দ্বারা সকলের চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দিনের অধিবেশন

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিক্ষা ও সাংবাদিক সাহিত্য শাখায়, শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের সভাপতিত্বে সঙ্গীত শাখা, দিল্লীর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে ইতিহাস শাখার, ডাঃ সরোজকুমার দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে দর্শন শাখা, শান্তিনিকেতনের শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে শিল্প শাখার অধিবেশন হয়।

মধ্যাহ্নে মূল অধিবেশনে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐক্য বিষয়ের আলোচনা সভা হয়। কলিকাতার প্রবীণ সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় সভাপতিত্বে উহা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে অতুলবাবু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়া বলেন- বাংলা রাষ্ট্র ভাষা না হইলেও ইহার কোন ক্ষতি হবে না। তারাশঙ্করবাবু অনুরূপ মত পোষণ করিয়া বলেন যে তথাপি বাংলা ভাষার প্রসার ও বাংলা ভাষাভাষীদের এক-বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করিলে বাংলায় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের গতি ব্যাহত হইবে।

এই সভায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী তটিনী দাস বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে ও প্রতিনিধিগণের পক্ষে পরস্পর ধন্যবাদ প্রদান করেন মূল সভাপতি বিচারপতি সেন, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র সিংহ। ক্ষিতিমোহন সেন ও লক্ষ্ণৌ প্রবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়গণ বিদায়ের পালার দুইটী রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করিয়া মধুরেণ সমাপন করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের সম্মেলন স্বাধীন ভারতের বাঙ্গালীদের একটি মহাসম্মেলন। সুদূর বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত হওয়াতে ইহার প্রথম বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় ইহার জয়ন্তী উৎসব বর্ষ। অনেক বড় ছোট সাহিত্যিক সমাবেশ হইয়াছিল। স্থানীয় লোকের আগ্রহ উৎসাহ যথেষ্ট ছিল। প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয়ও হইয়া গেল। কিন্তু লাভ হইল কি? দূর হইতে আগত সাহিত্যিক ও সুধীগণও কয়েক হাজার টাকা ব্যয় ও ক্লেশ ভোগ করিয়া পাইলেন কি? পাঁচটাকায় পাঁচদিন বোম্বাই বাস, জুহুতে সমুদ্র স্নান, এলিফেন্টা গুহা দর্শন ব্যতীত আর কি লাভ হইল। কোন গঠনমূলক কার্য্যের আভাসও নাই, মেলমেশারও সুযোগ পাওয়া যাইল না। স্বাধীন ভারতের বাঙ্গালীর এ দীনতা অপনোদন করা বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদেরই কর্ত্তব্য। পার্শ্বেই হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের প্রচার ও প্রভাবের নিকট প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ম্লান হইয়া গেল।

গান্ধীপ্রস্থ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

নিশান্তে পথের প্রান্তে যাত্রী হনু রাত্রির তিমিরে,
নিবিড় নিদ্রায়
দিল্লীর পল্লীর শান্তি শ্যাম কান্তি জানাইল ধীরে
তন্দ্রিত বিদায়,
শুধু একা স্মৃতিমাখা রাজপথ শুধাল হাসিয়া—
চলে যাও কোথা ?
কহিনু—তোমারে বাহি' মৃদু গাহি অতীতে চাহিয়া
পুরাতনী ব্যথা।

২

কহিনু—নগরী তুমি গড়ি' ভূমি সময় সৈকতে
রচি' ইতিহাস
আজ যারে পুষ্পহারে রাজ ছত্রে বসাও মরতে
তারি সর্বনাশ
করে যাও, ভুলে যাও ক্ষণিকের পুলকে একেলা,
চাহ না কাহারে ;
চরণে নূপুর তব চিকণ ছুরিকা সম খেলা
করে ছুনিবারে।

৩

তুমি ত বাসনি ভাল মহাকাল ভগিনী বন্দিতা
রূপসী নগরী,
অন্ধকার সন্ধ্যাকালে ভালে লয়ে টীকা অনিন্দিতা
স্মৃতির গাগরী
ভরিয়া যমুনাতীরে ঘিরে তব অনাবৃত দেহ
লুপ্ত ইতিহাসে
শুধু লক্ষ্য কর দূরে রাজপুরে নবাগত কেহ
পুন বুঝি আসে।

৪

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজপাটে অর্ধচন্দ্র শোভিল নিঠুর,
ভ্রূক্ষেপ ত নাহি ;
তারে পুন অর্ধচন্দ্রে মেঘ মন্দ্রে করিলে আতুর ;
জলে অবগাহি'
পাশ্চাত্য বণিক দল ধ্বনি' ব্যাঘ্র-রণ-ভেরী না'
উড়াল পতাকা,
বিশ্বরণে জিনি' তবু নিঃস্ব প্রাণে পূরিল বিষাদ—
পড়ে গেল ঢাকা।

৫

বিশ্বের বিস্ময় মাঝে নগ্ন সাজে উদিল সন্ন্যাসী,
হিংসাহীন রণ,
অগ্নিবাণ ব্যোমযান আণবিকা শক্তি সর্বনাশী
সবি অকারণ ;
সংহার লীলার পরে ভক্তি ভরে প্রণমে সংসার
প্রেমের ঠাকুরে,
হ'ল আশা ভালবাসা রচি' দিবে প্রীতিরে ধরার
নব শান্তিপুরে।

৬

নাই ক্ষমা নিরুপমা তোমার নিষ্ঠুর কটাক্ষবাণে,
রক্তশক্তি জানো
প্রতিটি যুগান্তে শান্তি ক্লান্তি তব বক্ষতলে আনে
তাই অস্ত্র হানো।
বিশ্বের হিংসার দাবী ভাবীকালে ভুলিবে যাহারে
পূজিয়া মানবে
অমোঘ তোমার বিধি সে নিধিও সহসা সংহারে ;
তম ঘিরে ভবে।

৭

তাই আমি যাই চলে পিছে ফেলে শতেক স্মৃতিরে,
যে মহাপথের
একপ্রান্তে দিকভ্রান্তে নব নব রাজ্যের গতিরে
কর্ণের রথের
মত মগ্ন ভগ্ন করি ফেলে দাও, হাস উপেক্ষিয়া
উদাসে হেলায়,
সে পথ তোমারি থাক্, দূরে থাক্ ; শুধু শূন্য হিয়া
পান্থ চলে যায়। *

* গান্ধীজীর মৃত্যুর পর দিল্লী পরিত্যাগের সময় বিমানপথে রচিত।

বনফুল

পূর্বানুবৃত্তি

পরের বড় জংসনটাতে নাবলেন তাঁরা। আগে থাকতেই এই প্ল্যান ছিল। অবশ্য স্বয়ম্প্রভা দেবীর প্ল্যান। তাঁর আর তর সইছিল না যেন। চলতি ট্রেন থেকেই লাফিয়ে নাবলেন তিনি। তাঁর পাশের চিবুকের এবং শরীরের অন্যান্য চর্ব্বিবহুল অংশের স্পন্দন দেখে মনে হল লাফিয়ে নাবতে গিয়ে সমস্ত দেহে বেশ একটু নাড়া খেয়েছেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। নেবেই একটা কুলিকে এক ধমক দিলেন তিনি। সে বেচারা ছুটে এসে তাঁর পতনোন্মুখ দেহকে জাপটে ধরতে গিয়েছিল।

অনীতা চুপ করেছিল। তার কেমন যেন অবসন্ন মনে হচ্ছিল। জিতুবাবুর কানের ডগাটা লাল হয়ে' উঠেছিল। ফাঁকি ধরা পড়ে যাবার পর বড়বাবুর কাছে বকুনি খেয়ে ফাঁকিবাজ কেরাণীর যেমন মুখভাব হয়, জিতুবাবুর মুখভাব সেই রকম দেখাচ্ছিল অনেকটা।

"আমরা এইখান থেকেই মোটর নেব, বুঝলে"—স্বয়ম্প্রভা বললেন—"তুমি আগেই ট্যাক্সি ঠিক করে' ফেল একটা। পরে হয় তো না-ও পাওয়া যেতে পারে। আমরা ষ্টেশনের ধারের ওই হোটেলটায় খেয়ে নি, তুমি ততক্ষণ একটা মোটর দেখ। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"কি"—ট্রেন থেকে নাবতে নাবতে জিগ্যেস করলেন জিতুবাবু। ভীড়ে গোলমালে ভাল করে' সব কথা শুনতেই পান নি তিনি।

স্বয়ম্প্রভা আবার সব বললেন।

"আঃ, চেঁচিও না অত। লোকে চেয়ে চেয়ে দেখছে"

"দেখছে তোমাকে। কাছাটা ঠিক করে' দাও"

"দোহাই তোমার, থাম। ইস্—কি বিশ্রী ষ্টেশনটা। এখানে হোটেল কোথা? ষ্টেশনে তো মোটর দেখছি না একটাও, সব ছ্যাকড়া গাড়ি—"

"একটু দূরে ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড আছে, আমি খবর নিয়েছি"

"কোথায় সে ষ্ট্যাণ্ড, জানব কি করে'। তাছাড়া কোথায় আমরা যাচ্ছি তাই তো জানি না। ট্যাক্সিওলাকে বলতে হবে তো জায়গাটার নাম। কি বলব তাকে"

"কাকে"

"তাকে। ট্যাক্সিওলাকে"

"ডেকে আন না। কোথায় যেতে হবে আমি তাকে বুঝিয়ে বলে' দেব"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকলে তক্ষুণি জানতে চাইবে কোথা যেতে বে"

"সে আমি বলব তাকে"

"কিন্তু তুমি তো থাকবে হোটেলে। আমি তাকে হোটেলে ডেকে নিয়ে আসব? সে হয় তো আসতেই চাইবে না, ড্রাইভারগুলো প্রায়ই তেরিয়া মেজাজের লোক হয়"

"সামান্য একটা ড্রাইভারের ভয়ে তুমি যদি অস্থির হও পুরুষমানুষ হয়ে, তাহলে আমার আর—"

"মোটেই না। কিন্তু একটা কথা আমি জানতে চাই—আগে থাকতেই ট্যাক্সি ডাকবার দরকার কি। চল না আমিও হোটেলে গিয়ে খেয়ে নি, তারপর ট্যাক্সি ডাকলেই হবে। আমারও খিদে পেয়েছে।"

"সমস্ত লুচিগুলি তো রাস্তায় একা তুমিই খেলে। এর মধ্যেই ক্ষিদে পেয়ে গেল ?"

"দেড়টা বাজে, ক্ষিদে পাবে না ? খেয়ে নিয়ে ট্যাক্সি খুঁজলেই হবে। এতে আপত্তি কি তোমার ?"

"খাবার পর ট্যাক্সি খুঁজতে গেলে ট্যাক্সি পাবে না। এ তো আর কোলকাতা নয়। দুটো চারটে ট্যাক্সি হয় তো আছে, ভাড়া হয়ে যাবে"

"তার মানে ট্যাক্সি খুঁজে না আনা পর্য্যন্ত খেতে পাব না আমি—"

"তুচ্ছ খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করতে লজ্জা করে না তোমার বুড়ো বয়সে ! সবাই চেয়ে চেয়ে দেখছে যে। আমরা হোটেলে যতক্ষণ খাব, ততক্ষণে তুমি যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে পার এক-ঢিলে দুই পাখী মারা হবে"

"তুমি দেখছি আমাকেই মারতে চাও। আমি তা হলে খাব না ?"

"ট্যাক্সিটা ডেকে এনেই খেও। খুব যদি ক্ষিদে পেয়ে থাকে রাস্তায় কেক বা সন্দেশ যা পাও কিনে নিয়ে খেতে খেতে যাও"

"সেটা কি—"

"এই কুলি হোটেলে চল। আমরা হোটেলে চললুম, বুঝলে। তুমি ট্যাক্সি দেখ একটা"

ঈষৎ চিন্তার পর জিতুবাবু উপলব্ধি করলেন গত্যন্তর নেই। হোটেলের দিকেই অগ্রসর হলেন তাঁরা। অনীতা একটু পিছিয়ে রইল। এসব কোন-কিছুর মধ্যে থাকবে না সে। থাকতে ভাল লাগছিল না।

জিতুবাবু বেরিয়েই গোটা চারেক কেক কিনে নিলেন এবং স্বয়ম্প্রভার অগোচরে অনীতাকে দুটো দিতে এলেন।

"আমি খাব না বাবা"

"দেখ না চেখে"

অগত্যা অনীতাকে নিতে হল।

"ট্যাক্সিওলা যদি জানতে চায় কোথায় যেতে হবে, কি বলব। জানতে চাইবেই"

"বোলো ফতিমারং যাব"

"ফতিমারং ? ফতিমারং কোনও জায়গার নাম হতে পারে না"

"রংপুর যদি হতে পারে ফতিমারং হতে বাধা কি"

"রংপুর আর ফতিমারং আকাশ-পাতাল তফাত।"

"যাক সে আমি তাকে বুঝিয়ে বলব এখন। ওই দিকে গেলেই নামটা জানা যাবে। ফতিমারং কিম্বা ফাংনারঙ— ওই ধরণেরই নাম সে গ্রামের। ওদিকে গেলেই জানা যাবে"

"কোন দিকে যেতে হবে তাও হয় তো সে জানতে চাইবে"

"কেন"

"কি কেন"

"কেন তাই তো আমি জানতে চাইছি। আমি তাকে নিয়ে যাব, তার আগে থাকতে জানবার দরকার কি"

"না জেনে সে যদি না আসতে চায়"

"দেখ কুঁড়ে লোকেরাই 'যদি' 'হয় তো'—এই সবের আশ্রয় নেয়। তুমি গিয়েই দেখ না।"

"জায়গাটা কত দূর হবে এখান থেকে"

"ঠিক জানি না। তবে কাছেই। বেশী দূর হতে পারে না"

"হবার বাধা কি"

"হলে কোলকাতা থেকে ওরা মোটরে করে' গিয়ে সেখানে রাত্রিবাস করছে কি করে' ? ঘটে কি একেবারে কিছু নেই !"

"কি বললে"

"কিছু নয়। যাও তুমি। এমন তর্ক করা স্বভাব হয়েছে"—

জিতুবাবু গেলেন। ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লাগল। ফিরে দেখলেন স্বয়ম্প্রভা মারমুখী হয়ে বসে আছেন। হোটেলওলা, হোটেলের চাকর-চাকরাণী, হোটেলের ঠাকুর সকলের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছেন। প্রায় ফৌজদারি কাণ্ড। অনীতা চুপ করে' বসে আছে একধারে। চারিদিকে নোংরা, মাছি ভনভন করছে, সমস্ত গা ঘিনঘিন করছিল তার। জিতুবাবু কিন্তু বেশ উল্লসিত এবং উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরেছেন মনে হল।

"চলে এস ! ট্যাক্সি পেয়েছি—"

"উঃ একটা গাড়ি ডাকতে যে কারও এতক্ষণ লাগতে পারে তা ধারণার অতীত ছিল"

"কেউ আসতে চায় না। জিগ্যেস করে' করে' বার করলাম গ্রামটার নাম। ফাৎনা ফিরিঙ্গিপুর। কেউ যেতে চায় না। অনেক কষ্টে এই লোকটাকে রাজি করেছি। জায়গাটা বেশ দূর, ভাড়াতে ফতুর করে' দেবে। যাক্ চল—যেতেই যখন হবে"

"ডিভোর্স করতে হলে উকীলের ফী যা লাগবে ট্যাক্সি-ভাড়া তার চেয়ে বেশী হবে না আশা করি"

"মা"—ফোঁস করে' উঠল অনীতা।

"থাক। তুমি আবার সুরু কোরো না। কোথায় মোটর"

"বাইরে। তুমি কি আশা করেছিলে মোটর এসে একেবারে রান্না ঘরে ঢুকে পড়বে?"

জিতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। অনীতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ম্প্রভাও বেরিয়ে এলেন। জিতুবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দু'একবার নাক কুঁচকে নিশ্বাস নিয়ে স্বয়ম্প্রভা অবশেষে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন।

"মদ খেয়েছ না কি"

"খেয়েছি। মানে, খেতে বাধ্য হয়েছি। শরীর আর বইছে না। আমি উট নই, মানুষ"

"খাওয়ার ইচ্ছে যদি ছিল স্টেশনের কেল্নারে ঢুকে ভদ্রভাবে খেলেই হ'ত। আমাদের হোটেলে বসিয়ে রেখে একটা বাজে তাড়িখানায় ঢুকে ধাঙড়ের মতো তাড়ি না গিললে চলছিল না"

"তাড়িখানা নয়, ভাল দোকান। 'বিয়ার' পেয়ে গেলাম"

"কতটা খেয়েছ? মাতলামি করবে না কি রাস্তায়"

"কোয়ার্টখানেক খেয়েছি। ওতে নেশা হয় না। ভাল বোধ করছি বরং"

"আমরা নোংরা হোটেলে এক ঝাঁক মাছির মধ্যে বসে' একদল অসভ্য লোকের সঙ্গে বকাবকি করছি, আর তুমি গিয়ে ওদিকে মদ মারছ! লজ্জা করে না তোমার?"

"না"—মরীয়া হয়ে বলে উঠলেন জিতুবাবু—"আমার সঙ্গ যদি তোমার পছন্দ না হয় বল এক্ষুণি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি"

"ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বস। তোমার পাশে বসতে পারব না। গন্ধে বমি আসছে"

"বল তো বাড়ি ফিরে যাই"

"যা বলছি কর"

১৬

ছকুবাবু পিছনে হাত দিয়ে লাইব্রেরি ঘরে উত্তেজিত-ভাবে পদচারণ করছিলেন। ব্রজেশ্বরবাবুদের কিভাবে অভ্যর্থনা করবেন তারই নানা রকম মক্সো করছিলেন তিনি মনে মনে। কি এক ফ্যাসাদ এসে জুটল, রাম কহো! অভ্যর্থনা! এসে পড়লে করতেই হবে, উপায় নেই এবং যদি করতে হয় এক-হাত দেখিয়ে দেবেন তিনি। সুচারুরূপে সংক্ষেপে এবং অভিনবত্ব সহকারে যাকে বলে! মাঝে মাঝে থেমে ঝাঁকড়া ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গেটের দিকে চাইছিলেন। এখনই আসবে! ওই বোধহয়! অনতি-বিলম্বেই একটা মোটরকার সশব্দে এসে দাঁড়াল। ছকুবাবুও এক নিমেষে গ্লাসে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং যে সাদর সম্ভাষণ করবেন ঠিক করেছিলেন সেটা আওড়ালেন আর একবার মনে মনে।

মোটরের ভিতরও রিহার্সাল চলছিল একটা। ভিন্ন রকমের। নেবেই প্রথম আলাপের মোহড়ায় কতটা প্রকাশ করা উচিত এবং কতটা চেপে যাওয়া উচিত—তারই আলোচনা চলছিল দু'জনের মধ্যে। দু'জনেই বেশ একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। সান্ত্বনা অবশ্য চোখে মুখে খুব একটা সহজ ভাব ফুটিয়ে রেখেছিল, রাখবার চেষ্টা করছিল অন্তত! মুখে খুব একটা সপ্রতিভ হাসি ফুটিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে বাড়ির সামনেটা!

সুশোভন ঝোঁকে নি। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে গাড়ির এককোনে সেঁটে বসেছিল—চোখে মুখে একটা বে-পরোয়া ভাব ফুটিয়ে।

রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে উইংসের ধারে দণ্ডায়মান নূতন অভিনেতাদের যে মনোভাব—এদের উভয়েরই মনোভাব অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল প্রায়।

"প্রথম ঝোঁকটা তুমিই সামলে নাও, বুঝলে সান্ত্বনা, যা কৈফিয়ত টৈফিয়ত দেবার দিয়ে ফেল তুমিই প্রথমে। 'উঃ, কি বিপদে যে পড়েছিলাম' গোছের একটা কিছু—বুঝলে। বারান্দাটা দেখতে পাচ্ছ?"

"হ্যাঁ"

"কেউ দাঁড়িয়ে আছে না কি"

"না। সামনের দরজাটা তো বন্ধ"

"বাঁচা গেল। অনীতা দাঁড়িয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি! একটু দম না নিয়ে অনীতার সামনা সামনি দাঁড়াতে পারব বলে' তো মনে হয় না। কিন্তু দেখো, ঠিক তার সঙ্গেই আগে দেখা হয়ে যাবে! যা কপাল—"

"সে যা হয় হবে। আচ্ছা, আমিই আগে নাবি। আপনি ভিতরেই থাকুন এখন। আমি আগে দেখে আসি—হাওয়া কি ভাবে কোন দিকে বইছে"

"বেশ। তাই যাও। গুছিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে' দিও আগে, বুঝলে। তারপর আমাকে এসে টেনে বার কর—'এই যে সুশোভনবাবু এখানে রয়েছেন'—এই গোছের কিছু একটা, বুঝলে। সব নির্ভর করছে অনীতা কোথা আছে তার উপর। প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি—"

মোটর এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াল। গণেশ একটা আড়িমুড়ি ভেঙে স্টিয়ারিং ছেড়ে নাবল নীচে।

সান্ত্বনা নাববার আগেই বারান্দার দরজাটা খুলে গেল। বেরিয়ে এল পরেশ। পরেশ ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন হেঁকে বললে—"ছটু—এই ছটু—ব্রজেশ্বরবাবুরা এসে গেছেন, খবর দাও ভিতরে"—বলে নিজেই চলে গেল আবার ভিতরে।

একটা অজানা আতঙ্কে দু'জনেরই বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আতঙ্কের সঙ্গে মিশল বিস্ময়। কপাট খুলতে না খুলতেই ঝুমু বেরিয়ে এল। তখনও থর থর করে' কাঁপছে। কান দুটো খাড়া। বারান্দায় একটু দাঁড়িয়েই এক ছুটে নেবে এল নীচে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় আবদারে গদগদ একেবারে। কি যে করবে ভেবে পেল না বেচারি, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির হয়ে উঠল।

"ওমা, ঝুমু যে"—বলে' উঠল সান্ত্বনা।

"ও আবার জুটল কি করে'"—গলা বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে সুশোভন।

"আপনাদের সেই কুকুরটা দেখছি যে"—গণেশ বলল—

"কেউ কুড়িয়ে দিয়ে গেছে বোধ হয়"

"হ্যাঁ। জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেল"

সুশোভনের দিকে চেয়ে সান্ত্বনা বললে—"কেউ এসেছিল এখানে তাহলে"

"হ্যাঁ এবং সব ফাঁস করে' দিয়েছে হয় তো।"

"কে হতে পারে"

সুশোভন গম্ভীরভাবে তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে গোঁফ জোড়ার উপর তা দিতে লাগল।

"ওই চাকরটাকে জিগ্যেস করলে হয় না। উঁকি মেরেই সরে পড়ল কোথায় লোকটা"

"আমি যাই। আপনি অপেক্ষা করুন"

পরেশ আবার বেরিয়ে এল। ঠোঁটে মধুর একটি হাসি ফুটিয়ে সান্ত্বনা এগিয়ে গেল তার দিকে।

বিনীত নমস্কার করে' পরেশ বলল—"আপনারা যে এ সময়ে এসে পড়বেন তা আমরা আন্দাজ করতে পারি নি। ওঁরা তাই শিকারে বেরিয়ে গেছেন সবাই। গিন্নিমাও সঙ্গে গেছেন। আপনারা আসবেন জানলে উনি অন্তত থাকতেন"

"তাতে কি হয়েছে। বরং ভালই হয়েছে এক হিসেবে। আমাদের আসবার খবর পেলে হয়তো শিকার পার্টিটাই মাটি হয়ে যেত। ট্রেণ ফেল করে' আসতে পারি নি আমরা। ঝুমুকে কে দিয়ে গেল। কাল রাত্রে হারিয়ে গিয়েছিল। সে কি মুশকিল"

পরেশ স-স্নেহে চাইলে একবার ঝুমুর দিকে।

"সব শুনেছি আমরা। একটু আগেই এ অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক দিয়ে গেলেন ওকে। তিনি আপনাদেরও চেনেন। কাল রাত্রের সব খবরও বললেন। তাঁর কাছে খবর পেয়ে আমরা বুঝলাম ব্যাপারটা—তখন গিন্নিমা চলে গেলেন—"

"কে বল তো ভদ্রলোকটি"

"সদারঙ্গবিহারীবাবু"

"ও"—সান্ত্বনা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু, তারপর তাড়াতাড়ি বললে—"জিনিসপত্রগুলো নাবিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা কর তাহলে"

"হ্যাঁ, এই যে"

"সুশোভনবাবুর স্ত্রীও শিকারে গেছেন না কি"

"তাঁরা তো আসেনই নি। কোনও খবরও আসে নি"

সান্ত্বনা মোটরের দিকে এগিয়ে গেল ধীরে ধীরে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে একটু ইশারা করতেই সুশোভন মুণ্ড টেনে নিলে গাড়ির ভিতর। সে অধীর হয়ে

উঁকি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল ব্যাপার কতদূর গড়াল।

"আচ্ছা"—সান্ত্বনা আবার পরেশকে জিজ্ঞাসা করলে—"সদারঙ্গবাবু আসবার আগেই মেসোমশায়রা শিকারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নয়? আমাদের খবর ওঁরা তাহলে কিছুই পান নি"

"না। পেলে কি আর বেরিয়ে যেতেন! ছকুবাবু আর আমি ছাড়া কেউ জানে না"

"ছকুবাবু?"

"হ্যাঁ। গিন্নিমার দূর সম্পর্কের কে যেন হন। বেড়াতে এসেছেন।"

"ও। ছকুবাবুর সঙ্গে সদারঙ্গবাবুর দেখা হয়েছে তাহলে"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ বসে' গল্প-সল্প করলেন দু'জনে"

"ও। আচ্ছা, জিনিসগুলো নাবিয়ে ফেল"

গণেশ ও পরেশ দু'জনে মিলে জিনিসগুলো সামনের হলে রাখতে লাগল। সান্ত্বনা এগিয়ে গেল মোটরের দিকে।

"সুশোভনবাবু, আপনার নাবা চলবে না। শুধু তাই নয়, চাকরটা যেন আপনাকে দেখতে না পায়"

"অদৃশ্য হব কি করে! যাদু বিদ্যা তো জানা নেই। কেন, কি হল?"

"পরেশ হরিমটর হিন্দু-পান্থ-নিবাসের সমস্ত কথা শুনেছে"

"সমস্ত?"

"কতটা ঠিক জানি না। কিন্তু সদারঙ্গবিহারীবাবু যখন ঝুনুকে এনেছিলেন তখন—"

"সেই ব্যাটাচ্ছেলে বাক্যবাগীশ এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছিল? অ্যাঁ, বল কি? আঃ! অনীতার খবর কি?"

"অনীতা এখানে নেই"

"যাক্, এটা সুখবর। কোথা সে এখন? শিকারে—"

"সে আসেই নি"

"আসেই নি! বল কি! আসেই নি? কোথা গেল সে তবে?"

"তা এরা কি করে' জানবে। পরেশ বলছে, আপনাদের আসবার কথা ছিল কিন্তু আপনারা কেউ আসেন নি"

"কি হল অনীতার তাহলে! কি হতে পারে?"

অতিশয় বিচলিত চিত্তে গাড়ীর মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সুশোভন।

"সে হয়তো আর একটা হোটেলে আর কারও সঙ্গে রাত কাটিয়ে আসছে একটু পরে"

অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা ক'টি বলে' নির্ব্বিকার-ভাবে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।

"না, রসিকতা ভাল লাগছে না সান্ত্বনা। ব্যাপার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। আচ্ছা, সে কি ফিরে গেল না কি? তা'হলে তো—আমি বরং চলে যাই, বুঝলে"

"আমিও তো তাই বলছি। পরেশের দৃষ্টি থেকে সরে' থাকতেও বলছি সেই জন্যে। হিন্দু পান্থনিবাসের কীর্ত্তি ওঁরা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুনে থাকেন তাহলে আপনার আত্মগোপন করে' এই মোটরেই সরে' পড়া উচিত। আমি বলব বিশেষ একটা জরুরি দরকারের জন্য আমার স্বামীকে এই মোটরেই ফিরে যেতে হল—"

"এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্বামী হয়তো হাজির হয়ে যাবেন পরের ট্রেনে"

"কালকের আগে তাঁর আসবার সম্ভাবনা নেই"

"কিন্তু শোন, আমরা সত্য কথাটা অকপটে বলব বলেই তো প্রস্তুত হয়ে এসেছি। তাই করি না কেন। কি দরকার এই লুকোচুরির? এই হোটেলে দু'জনে রাত্রিবাস করলেই চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই। সে কথা যদি কেউ ভাবে, তাহলে নিতান্ত ইয়ে বলতে হবে তাকে—"

"কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন"—সান্ত্বনা শান্তভাবে বোঝাতে লাগল—"ঝুনুকে সদারঙ্গবাবু এখানে যখন দিয়ে গেছেন তখন এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করতে হয়েছে তাঁকে গোঁসাইজির কাছে। গোঁসাইজি তাঁকে কতটা কি বলেছেন তাতো জানা নেই—তার ওপরই সব নির্ভর করছে"

"পরেশকে জিগ্যেস করেছিলে কিছু এ বিষয়ে?"

"নিশ্চয় না। তা কি করা যায়?"

"ধর যদি গোঁসাইজি সদারঙ্গবাবুকে সব কথা বলেই থাকেন যে আমরা একঘরে দু'জনে শুয়েছিলাম, তাহলে সে কথা কি গাড়োলটা এখানে এসে চাকরদের কাছে গল্প করবে—এও কি সম্ভব না কি"

"ইচ্ছে করে' না করলেও কথায় কথায় বেরিয়ে পড়তে পারে বই কি। বলা যায় কি কিছু। ঝুনুকে নিয়ে কম কাণ্ড তো হয় নি, ঝুনুর গল্প করতে করতেই হয়তো বেরিয়ে পড়েছে সব। আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হোটেলে ছিলাম, এর বেশী অন্য লোককে জানতে দেবার দরকারই বা কি। আপনি যদি এখন ফিরে যান লুকিয়ে, মানে, কেউ যদি আপনাকে দেখে না ফেলে, তাহলে আমি স্বচ্ছন্দে এখানে প্রচার করতে পারি যে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে হিন্দু পান্থনিবাসে ছিলাম, সকালে এখানে মোটরে করে' এসেছিলাম, হঠাৎ একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আমার স্বামীকে ফিরে যেতে হল, কাল নাগাদ আবার হয়তো তিনি এসে পড়বেন। তার পর কাল যদি উনি সত্যি সত্যি আসেন তখন আমি ওঁকে খুলে বলব সব। তারপর আপনারা স-স্ত্রীক এসে পড়ুন, কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে পারবে না"

"তুমি দেখছি পাকা মিথ্যুক একটি। ওফ—! বেশ, ব্যাপারটা যদি এইভাবে দাঁড় করাতে পার মন্দ হবে না নিতান্ত"

সান্ত্বনা হেসে বললে, "এ সব ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলায় দোষ নেই। সব দিক যাতে রক্ষে পায় তাই করাই ভালো নয় কি"

"বেশ। কিন্তু ভেবে দেখ আমি চলে গেলেই সব দিক রক্ষে হবে তো! ফাঁকি ধরা পড়া গিয়ে শেষকালে আরও জটিল কিছু না হয়ে পড়ে"

"না, তা হবে না। অনীতার খবর নেবার জন্যে আপনি তো যেতেই চাইছেন। আমি কেবল বলছি এখানে আত্মপ্রকাশ করবেন না। লুকিয়ে চলে যান আমি সব ঠিক করে' নিতে পারব"

"তা পারবে। যদি না ওই সরগরমবাবু হুড়মুড় করে' এসে আবার—"

"সে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আপনি আর দেরি করবেন না। পরেশ আসছে এ দিকে, ডাকতেই আসছে বোধ হয় আমাদের। তাহলে কি ঠিক হল, কি বলব আমি এখানে"

"যা তোমার খুশী। কিন্তু আমি যদি অনীতাকে নিয়ে ফিরি আবার, কি করে' জানব তুমি কি বলেছ"

"আমি কি বলব, সেটা নির্ভর করছে এরা কতটা কি জেনেছে তার উপর। এখানে পরেশ ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক আছেন কি না"

"আবার কে"

সান্ত্বনাকে আর বুঝিয়ে বলতে হল না। অতিশয় নাটকীয়ভাবে ছকুবাবু স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করলেন। হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে সামনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে' তিনি বলে উঠলেন—"আঁই, আঁই রেঁায়া আঁয়ি আঁয়ি—এতানা দেরি কাহে ভইল—আঁয়ি, উপর পাধারি—"

হাস্যোদ্ভাসিত মুখ তাঁর। খোঁচা খোঁচা গোঁফগুলো পর্য্যন্ত হর্ষ-কণ্টকিত।

"সর্ব্বনাশ, ও কি!"

সান্ত্বনাও সবিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল।

"বেহারের ভাষা বোধ হয়। উনি বলিয়া জেলায় ছিলেন, কিছুদিন ওঁর মুখে এই ধরণের কথা শুনেছি"

"যাব কি না একটু দ্বিধা হচ্ছিল, কিন্তু এ ভাষা শোনার পর আর দ্বিধা নেই। বুঝলে, আমি চললাম। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। গণেশ"

"এই যে"—

"আঁয়ি, আঁয়ি, রেঁায়া, আঁয়ি—"

সান্ত্বনা দাঁড়িয়ে রইল স্মিতমুখে।

গণেশ দ্রুত হস্তে 'গিয়ার' বদলে গাড়ি স্টার্ট করে' দিলে এবং স্টিয়ারিং ধরে' সেঁা করে' গাড়িটা ঘুরিয়ে একেবারে পঁচিশ মাইল বেগে সুরু করলে চালাতে। গাড়িটা দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে যেতেই সান্ত্বনা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বারান্দায়। পরেশের দিকে চেয়ে বললে—"একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়াতে উনি ফিরে গেলেন এই গাড়িতে"

"ও"

"কালই ফিরবেন সম্ভবত"

জনৈকা মহিলার সান্নিধ্য সত্ত্বেও ছকুবাবু আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁর ভাষা বদলে গেল। তিনি বলে ফেললেন—"আরে মোলো, এ যে চোঁচা দৌড় দিলে! তাজ্জব কি বাত!"

তার পর সান্ত্বনার নমস্কারের উত্তরে প্রতি নমস্কার করে' ছকুবাবু বললেন—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো। আসুন, ভিতরে আসুন" (ক্রমশঃ)

শান্তিনিকেতনে ২৩ বৎসর পরে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

আমি যেদিন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পড়ার জন্য শান্তিনিকেতনে পৌঁছি তার পরদিন গুরুদেবের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সংবাদ আশ্রমে আসে। তারপর যতদূর মনে পড়ে ১৯১৭ সালে আমি ওখান হইতে অন্যত্র পড়াশুনার জন্য চলিয়া যাই। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকার আশ্রমবাসীরা যে শান্তিনিকেতনে আসিয়া বাস করিতেছিলেন এবং গান্ধীজী যে আসিয়া আমাদের রান্না ঘরের ঠাকুর চাকর ছাড়াইবার জন্য আমাদের মত করান, সেই স্মৃতিটি আমার মনে উজ্জ্বল হইয়া আছে। আর শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবনযাত্রার যে ছবিটি আমার মনে আনন্দলোকের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যমণি হইলেন গুরুদেব। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন—অধ্যাপক জগদানন্দ রায়, নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায়, প্রমোদরঞ্জন রায়, কালিদাস বসু প্রভৃতি

তখনকার দিনে কি শীতে কি গ্রীষ্মে আকাশে তারা থাকিতেই আমাদের প্রাতঃকৃত্যের জন্য ঘণ্টা পড়িত। তার পরের ঘণ্টার সাথে সাথেই শালবীথিতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া প্রভাতবাবুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অনুকরণ করিয়া ব্যায়াম করিতে হইত। তখন পূর্বদিকে মাঠের উপর রেললাইনের ওপারে সূর্যোদয় হইতেছে দেখিতাম। তারপরই স্নানের ঘণ্টা। তারপরই উপাসনার ঘণ্টা। মাঠের মধ্যে দূরে দূরে আসন পাতিয়া নিরিবিলি বসিয়া থাকিতাম। উপাসনার শেষে শালবীথিতে দাঁড়াইয়া উপনিষদের শ্লোক পাঠ করিতে হইত—'যো অশ্বত্থ, যো বনস্পতিষু'। (প্রতি বুধবার মন্দিরে উপাসনা হইত)

উত্তরায়ণ

তারপরই জলখাবারের ঘণ্টা পড়িত। সেখানে সারি দিয়া বসিয়া গমের পায়েস, মুড়ি বেগুনী, মুড়ি গুড়, দুধ চিড়া চিনি, লুচি তরকারী, অথবা হালুয়া খাইতাম। শরৎকুমার রায় মহাশয় সারির মধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তদারক করিতে করিতে বলিতেন, 'ফেলিও না, চাদরে বাঁধিয়া দিব'।

ইহার পর সুরু হইত গাছের তলায় ক্লাশ। জগদানন্দবাবু বসিতেন আম্রকুঞ্জের পাশে শালবীথির শেষপ্রান্তে। প্রভাতবাবু বসিতেন—লাইব্রেরীর কাছাকাছি হলঘরের বারান্দায়, ঐ বারান্দারই অপরপ্রান্তে অঙ্ক শিখাইতেন শরৎবাবু, ক্ষিতিমোহনবাবু বসিতেন মোহিত কুটিরের মধ্যে অথবা তাহার দক্ষিণের মাঠে। কালিদাসবাবু বসিতেন ছাতিমতলার পথে দেবদারুর বীথিতে। তাঁহারা বসিয়া থাকিতেন, ক্লাসের ঘণ্টা বাজিলে আমরা একজন অধ্যাপকের ক্লাশ হইতে উঠিয়া অন্যের কাছে যাইতাম।

প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা পর্যন্ত এই ভাবে ক্লাশ চলিত। তারপর দুপুরের আহার, ভাত ডাল তরকারী ও নিরামিষ ঝোল বা ডালনা। মাছ ছিলনা, কোন কোন দিন ডিম হইত। দুপুরে প্রত্যহ পাতে ঘি পাওয়া যাইত। নিজ নিজ থালা বাসন ধুইয়া ঘরে লইয়া আসিতে হইত।

আম্রকুঞ্জের দক্ষিণে ছিল শিশু বিভাগ। তাহারই পূর্বে কতকগুলি বাড়ী। উহার একটির বারান্দায় পিয়ার্সন সাহেব আমাদের ইংরাজী পড়াইতেন। পেটাভেল সাহেবও পরে ঐ বাড়ীটাতেই বাস করিতেন। উহার পুবের দোতালা বাড়ীটায় গুরুদেব থাকিতেন। তাহার পেছনে ছিল হাসপাতালের বাড়ী।

দুপুরের খাওয়া হইয়া গেলে ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। তারপর আবার ক্লাশ বসিত। বিকালে ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে জলখাবার সুরু হইত।

উহার পর আবার সারি বাধিয়া শাল বীথিতে দাঁড়াইতে হইত। সেখানে নায়কগণ নিয়মভঙ্গকারীদের নাম প্রকাশ করিয়া দিয়া লজ্জিত করিতেন। তারপরই বিস্তীর্ণ খেলবার মাঠে খেলা—

রাত্রে ঝুলান কেরোসিনের বড় আলোতে বসিয়া পড়িতে হইত। কদাচিত নেপালবাবু গল্প বলিতেন, কোনদিন বা নাটক হইত। প্রাতে বৈতালিক হইত। দীনুবাবু গান শিখাইতেন, আর তালমান শিখাইতেন একজন মারাঠি ওস্তাদ।

পশ্চিমে খাওয়ার ঘর ও ছাতিমতলা, উত্তরে মন্দির, পূর্বে বোলপুরের রাস্তা, দক্ষিণে সতীশ ও মোহিত কুটীর—ইহাই ছিল আশ্রমের গৃহাদির সীমা—তারপরই চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ করে মাঠ। কেবল মোহিত কুটীরের ওপারে মাঠ পার হইয়া দ্বিজেন-ঠাকুরের বাড়ী, রাস্তার ওপারে সন্তোষ মজুমদারের বাড়ী, আর শ্রীনিকেতনের পথে সাওতাল পল্লী—পায়খানা ২।১টি মাত্র ছিল, পশ্চিমদিকের মাঠে ওকাজ হইত এবং শূকরদল অবিলম্বে ওসব সরাইয়া ফেলিত।

দ্বিজেন ঠাকুরের বাড়ীর দক্ষিণে শ্বেতপদ্মের দীঘি। উৎসব দিনে প্রাতে কত পদ্মই না আহরণ করিয়া আনিতাম।

বড়ই ইচ্ছা হইল এসব আবার শীঘ্র একবার দেখিব। এমন সময় প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্ঘ—আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক পৌষ উৎসব সম্পর্কে আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ৫ই পৌষ সকাল বেলার গাড়ীতেই রওনা হইয়া গেলাম। ১৯২২ সালে একবার ও ১৯২৪ সালে আর একবার শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। এবার আমার ২৩ বৎসর পর যাত্রা।

বোলপুর ষ্টেশনে নামিয়া একটা সাইকেল রিকসা লইয়া আশ্রমে রওনা হইলাম। বোলপুর সহরের প্রান্তের গির্জাটি আর দেখিতে পাইলাম না। আর সহরের প্রান্তও তো দীর্ঘতর হইয়াছে দেখিতেছি। দ্বিজেন ঠাকুরের বাড়ী পর্য্যন্ত মাঠটির ডাহিনে বামে এখন বিস্তর বাড়ী হইয়াছে—ডাক বাঙ্গলা, অধ্যাপক প্রভাতবাবুর একাধিক বাড়ী, ইলেকট্রীক কারখানা, একটি শিল্পকারখানা, তৈলের কল, বিশ্বভারতীর কতকগুলি কুটির, আরো অনেক বাড়ী। দ্বিজেনবাবুর উদ্যান আর নাই, পদ্মদীঘিও নাই, সেখানে অনেকগুলি অধ্যাপকের গৃহ নির্মিত হইয়াছে। সন্তোষবাবুর বাড়ীর মাঠে বিস্তর বাড়ী উঠিয়াছে। খেলার মাঠটি ছোট হইয়া গিয়াছে। তাহার উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম ঘেরিয়া বিরাট বিরাট বাড়ী উঠিয়াছে। খেলার মাঠের আয়তন এখন ¼ অংশ হইয়াছে। আর সব বাড়ী উঠিয়াছে—কতক বসতবাটী, কতক বিশ্বভারতীর শিক্ষালয়। গ্রন্থাগারের আয়তনের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অধ্যাপকরা অধিকাংশই এখন সপরিবারে নিজ বা বিশ্বভারতীর গৃহে বাস করিতেছেন। মোহিতকুটিরের দক্ষিণের মাঠটিতে এখন বিস্তর বাড়ী হইয়া গুরুপল্লী স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদের সেই বাল্যকালের আশ্রম বেষ্টন করিয়া এই যে সব নূতন বাড়ী তৈরী হইয়াছে তাহার মালিক কতক বা বিশ্বভারতী, কতক তাহার অধ্যাপকগণ, কতক প্রাক্তনছাত্রগণ, কতক রবীন্দ্রভক্তগণ, কতক বা অবসরযাপনকারী বিত্তশালী ব্যক্তিগণ, কতক বা ব্যবসায়ী।

বিশ্বভারতীর নূতন বাড়ী দুই প্রকার। ছাত্র, ছাত্রী এবং

আলিপনা—মন্দিরের একাংশ

অধ্যাপকদের বাসগৃহ এবং অধ্যাপনাগৃহ। অধ্যাপনাগৃহের মধ্যে রবীন্দ্রভবন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই ভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমার কোন কোন বিষয়ের আলোচনা ছিল। দুপুরে আশ্রমে পৌছিয়া আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে আমি তাঁহার নিকট এই রবীন্দ্রভবনে উপস্থিত হইলাম। রবীন্দ্রনাথের নূতনতম বাসগৃহ উত্তরায়ণে এই রবীন্দ্রভবন এবং সেই বেষ্টনীর মধ্যেই তাঁহার পরবর্ত্তী বাসস্থান 'শ্যামলী' ও 'পুনশ্চ'। বিবিধ ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্য, জীবনী ও আলোচনামূলক পুস্তক, চিত্র ও অন্যপ্রকার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এই বাড়ীতে কি ভাবে রক্ষিত হইতেছে এই রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ মহাশয় তাহা দেখাইলেন।

সন্ধ্যার পর বাহির হইলাম আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সন্ধানে। সতীশকুটীর মোহিতকুটীরের স্থলে যে উন্নত অট্টালিকা হইয়াছে তাহার একটির নাম হইয়াছে 'সিংহভবন'। উহাতে সভামঞ্চ বা নাট্যশালায় দেখিলাম স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাদের

উৎসব উপলক্ষে কাজের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। উহার পশ্চাতে একটি ছাত্রগৃহের একাংশে নিরঞ্জনবাবুর সন্ধান পাইলাম। প্রাচীন কালের ও একালের কত কথাই আমাদের হইল। এখন বিশ্বভারতীর কর্ম্মীদের ছেলে মেয়েরা এখানে পড়িতেছে। তাহাদের সংখ্যা আশ্রম-বাসী ছাত্রছাত্রীর তুল্য। খাবার ঘণ্টার আগের ব্যায়াম, স্নান ও উপাসনা আর পূর্ব্বের মত হয় না। থালা মাজিতে হয় না, টেবিলে খাইতে হয়। ক্লাসের ব্যবস্থা পূর্ববৎ। খেলার ব্যবস্থাও তাই। তবে চারিদিকে বহু বসতি হওয়াতে নিরিবিলি আবভাব কিছু কমিয়াছে। কিন্তু সঙ্গীত, ছবি আঁকা, হাতের কাজ প্রভৃতির প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। তখন ছিল ম্যাট্রিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত পড়া—এখন হইয়াছে বি, এ পর্য্যন্তপড়া। তারপর সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম বিষয় গবেষণার প্রচুর আয়োজন। সেই শালবীথি, সেই আম্রকুঞ্জ, সেই শান্তি-নিকেতনের বাড়ী, সেই কাচ-বাংলামন্দির, সেই ছাতিমতলা, সেই নীচু বাংলা সবই আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পুরাতন বাড়ী (এখনকার নাম দেহলী)র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীর ফুলের বাগান নাই। হল ঘর ও দেবদারু বীথির মধ্যকার সজীবাগানটিও অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু আসিয়াছে চীনা অধ্যাপক ও চীনা ছাত্র চীনভবনে পড়িতে; আসিয়াছে হিন্দী-ভবনে হিন্দী গবেষক। আরও নব নব নানা আয়োজন।

খরচা বাড়িয়াছে, আমাদের সময় ছাত্রদের লাগিত মাসিক ২৫৲ টাকা এখন লাগে ৭০৲ হইতে ১০০৲ টাকা। সে দোষ বিশ্ব-ভারতীর নয়। সে দোষ এই দেশের ও কালের। কলিকাতায়ও এই খরচই হয় ছাত্রদের। তবে এখানে উন্মুক্ত আকাশতলে স্বাস্থ্যনিকেতন এই শান্তিনিকেতনে উৎকৃষ্টতর খাদ্য ও নির্ম্মলতর আনন্দপরিবেশের মধ্যে হৃদয়মনদেহ গড়িয়া উঠিবার অবসর পায়। কলিকাতায় সম্ভব কেবল জীর্ণতা ও দ্বন্দ্ব।

পরদিন ৬ই পৌষ সকাল হইতে আকাশে দারুণ মেঘ জমিয়া

উপাধি সভায় মিঃ হোমসের বক্তৃতা

উপাধি দান

গেল। ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতন স্থাপন উৎসব। পাছে তাহা বৃষ্টিতে ব্যাহত হয়, এজন্য সকলের মন বড়ই শঙ্কিত। আমি পরিচিত প্রাক্তন ছাত্রদের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম। দেখা

পাইলাম তপনদা, মুকুলদা ও হীতেনদা'র। সকলে মিলিয়া প্রফুল্লদা ও প্রদ্যোতদার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে বীরেনদা ও কালিপদ রায় আসিলেন; সাগরময় ঘোষ ও পুলিন সেনের সঙ্গেও দেখা হইল। আরও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী অনেক আসিয়াছেন। অনেককে আমাদের পরবর্তী কালের বলিয়া বোধ হইল। বিভূতিদাকে দেখিলাম, বিদ্যালয় বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। বিশ্বভারতী সৃষ্টির আগেকার ছাত্র ও পরবর্ত্তীকালের ছাত্রদের মধ্যে এই প্রভেদ দেখা গেল যে পূর্বকালের ছাত্রদের মনে তাহাদের কাল সম্বন্ধে অধিকতর স্নেহ ও শ্রদ্ধা; কিন্তু পরবর্তীদের আগের যুগ অজানা; তাদের মনে কোন দুঃখই নাই। আশ্রমের মধ্য দিয়া সাইকেল রিক্স বেগে চলিয়া যাইতেছে, পূর্বদিক আচ্ছাদিত, সূর্য্যোদয় আশ্রম হইতে আর দেখিবার উপায় নাই, সকল ছাত্রই আর আগের মত একসঙ্গে বসবাস, শয়ন, খেলাধুলা আহার করিয়া এক পরিবারভুক্ত রহে না এবং নিয়ম পালন বিষয় আর পূর্ববৎ কঠোরতা নাই, বহিরাগত দর্শকের দ্বারা ছাত্রছাত্রীর ক্লাস অধিকমাত্রায় উপদ্রুত হইতেছে, সঙ্গীত ও কলার অনুশীলনে অন্য পড়ার গতি ও মনোযোগ ব্যাহত হইতেছে এবং বহু সংখ্যক ছাত্রীর বসবাসে নবতর পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিকালে সুরুল দেখিতে গেলাম সাইকেলে চড়িয়া—আমাদের কালের সুরুল বন এখন শ্রীনিকেতন হইয়াছে—বন আর নাই। শিল্প-কার্যের জন্য ও কর্ম্মীদের জন্য বহু বাড়ী উঠিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অবসর সময় এখানেই থাকেন। গ্রাম উন্নয়ন কার্য্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারক ধর মহাশয় পল্লীর অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। শান্তি-নিকেতন হইতে শ্রীনিকেতন পল্লী মাত্র ১॥০ মাইল। এ পল্লীর

মেলাপ্রাঙ্গনে সাঁওতালদের তীর প্রতিযোগিতা

ছাত্র ছাত্রীদের লইয়া বিশ্বভারতীর মটর বাস ৭ টায় আশ্রমে পৌছায়, ১১॥ টায় আহারার্থ ফিরাইয়া আনে। এবং আবার ১টায় আশ্রমে নিয়া যায়।

বোলপুর সহরের সঙ্গেও বিশ্বভারতীর এই যোগ হইয়াছে। সেখান হইতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বভারতীতে কলেজের ক্লাসে আসিয়া পড়ে, কোন বাধা নাই। এই ভাবে আর ইহা এখন পূর্বের শিক্ষায়তন নাই—পূর্বে একস্থানে একত্র বাস করিয়া ছাত্ররা এক পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িত। সেই এক পরিবারের লোক এক বিদ্যালয়ে পড়িত। এখন বিভিন্ন পরিবারের লোক এক স্থানে বসিয়া পড়িতেছে।

আমার প্রাচীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহারা আর ছাত্র পড়ান না এখন। ক্ষিতিবাবু বিদ্যাভবনে বসিয়া গবেষণা করিতেছেন এবং প্রভাতবাবু গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষরূপে সেখানে বসেন বটে কিন্তু 'রবীন্দ্রজীবনী'তে প্রায় সর্বসময় নিয়োজিত হয়। রথীদার সঙ্গেও দেখা করিলাম। (শান্তি-নিকেতনে যে সকল সুন্দর গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সৃজনে ইহারই প্রতিভা। ইনি আমেরিকায় স্থপতিবিদ্যা শিখিয়া ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ বিল্ডার মিঃ বি, এম, সেন ইহারই কাছে প্রথমে কাজ করিতেন)। শান্তি-নিকেতনের পুরাতন ছাত্রদের বিবরণী সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ জন্য ইতিমধ্যে আশ্রমিক সঙ্ঘের সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন বলিলেন।

কাল উৎসব সুরু হইবে। আজ রাত্রি ৯॥টায় একটি রবীন্দ্রনাথের আরাধনা সঙ্গীত গাহিয়া আশ্রম পরিভ্রমণ করিয়া তাহা উদযাপিত হইল।

পরদিন ৭ই পৌষ প্রাতে ৫টায় "আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে" গাহিয়া উৎসব সুরু হইল। সেই গান যখন সমস্ত আশ্রমে গীত হইল তখন আকাশের ঘন মেঘ ও গুঁড়িবৃষ্টি যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। ৭॥টায় ক্ষিতিবাবু মন্দিরে উপাসনা করিলেন। সমবেত সকলের কপালে চন্দন তিলক মন্দিরের প্রবেশ পথে পরাইয়া দেওয়া হইল এবং উপাসনায় ও সঙ্গীতে মন্দির একটি শান্তরসাস্পদ আনন্দ-লোকে পরিণত হইল। উপাসনান্তে আমরা প্রাক্তনছাত্রগণ অভ্যাগতদের সঙ্গে মিলিত হইয়া 'কর তার নামগান যতদিন দেহে রহে প্রাণ' গাহিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনস্থল ছাতিমতলে চলিয়া গেলাম এবং

সেখানে বেদী প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলাম প্রস্তর ফলকে আগের মতই লিখিত আছে—

তিনি আমার
প্রাণের আরাম
মনের আনন্দ
আমার শান্তি
(বেদীটি সংস্কৃত হইয়াছে)

আকাশের মেঘ কাটিয়া তখন সূর্য্যালোকে শান্তিনিকেতন উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তীদের লোক রঞ্জনার্থ যে মেলা হয় তাহা তখন বসিয়া গিয়াছে। চা, পান, ভাজা, মিষ্টি, খেলনা ও মনোহারী জিনিষ এবং কাপড়ের দোকান। দুপুর ১টায় সেখানে কর্ণ-অর্জ্জুনের বিষয় স্থানীয় কবির লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল। সেখান হইতে উঠিয়া ২৷৷টায় আম্রকুঞ্জে আশ্রমিক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিলাম। সেখানে প্রাক্তন ছাত্র হাইকোর্টের জজ সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় সভাপতিত্ব করিলেন এবং অপর প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ প্রবোধ বাকচী মহাশয় বক্তৃতা দিলেন বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। প্রাক্তন ছাত্রদের বিবরণী প্রকাশ জন্য রথীন্দ্রদা যে প্রস্তাব করিলেন তাহা পাশ হইয়া গেল এবং 'প্রাক্তনী' নামে প্রাক্তন ছাত্রদের যে গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই সংলগ্ন আরও গৃহ নির্ম্মাণ করা হইবে স্থির হইল। প্রায় ১৫০ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেখিলাম পুরাতন ছাত্রছাত্রীদের শান্তিনিকেতনের প্রতি বড় মমতা। কামাখ্যাদা এখানে বাড়ী করিয়াছেন, তিনিও সভায় উপস্থিত হইলেন। হীতেনদা, মুকুলদা, অমিতা দেবী, বীরেন সেন প্রভৃতিও এখানে বাড়ী করিয়াছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত দ্বারা প্রার্থনা হইল এবং 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গাহিয়া অনুষ্ঠান শেষ হইল। বার্ষিক জমা খরচ ও রিপোর্ট দেখিয়া আমাদের মনে হইল যে ভারতবর্ষের আর কোন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ এত সংঘবদ্ধ নহেন।

রাত্রে মেলার মাঠে বাজী পোড়ান হইল এবং তারপরই রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ছায়াচিত্রে দেখান হইল। স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, নির্ধন, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই দেখিলাম মাঠে বসিয়া সে ছবি দেখিতেছেন।

পরদিন ৮ই পৌষ আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতী পরিষৎএর সভা হইল। প্রায় ৩০০০ লোক ইহাতে বসিয়াছিলেন। উচু বেদীর উপর চন্দ্রাতপতলে বসিয়াছিলেন সভানেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, গভর্ণর রাজাগোপালাচারি মিঃ হোমস, ক্ষিতিবাবু ও রথীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ বার্ষিক রিপোর্ট পড়িলেন, ক্ষিতিবাবু মঙ্গলাচরণ করিলেন এবং মিঃ হোমস, শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সেই আলোকে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও বিশ্বশান্তির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বিশ্বভারতীর ছাত্র ছাত্রীরা একে একে আসিয়া সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত ও গ্রাম উন্নয়ন বিষয় উপাধি লইলেন—সভানেত্রী হাতে তুলিয়া দিলেন এক একটি 'ছাতিম পল্লব' আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রধান অধ্যাপকগণ অনিল চন্দ, নন্দলাল বসু, শৈলজা চক্রবর্ত্তী ও চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় দিলেন লিখিত মানপত্র। 'শান্তিনিকেতন' গান দিয়া সভা ভঙ্গ হইল। তারপর বিশ্বভারতীর সদস্যদের সভা সুরু হইল ওখানে বসিয়াই।

কিন্তু এই যে এত লোক আসিয়া এইস্থানে সমবেত হইয়াছেন ইহারা কাহারা? বিশ্বভারতীর ছাত্র ছাত্রী কর্ম্মী ও তাহাদের পরিবার পরিজন অনেক আছেন। প্রাক্তন ছাত্র আসিয়াছেন অনেক। বোলপুর ও তৎসন্নিহিত স্থানের অধিবাসীও আসিয়াছেন অনেক। বিশ্বভারতীর সদস্য ও ছাত্রছাত্রদের অভিভাবকগণও কিছু আসিয়াছেন। সাংবাদিক ফটোগ্রাফারের সংখ্যাও প্রায় ৭৫জন হইবে। আর শত শত লোক দেখিলাম এ-বেলা আসিয়া ও বেলা চলিয়া যাইতেছেন। ইহারা স্বস্থানে ফিরিয়া যাইয়া আমেরিকান টুরিষ্টরা যেমন ১৫ দিনে ভারত সম্বন্ধে বিশারদ হন সেইরূপ শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবেন। উৎসবের কয়দিনই বিশ্বভারতীর সব বন্ধ থাকে।

মেলা স্থানে দৃষ্টিকটু কিছু কিছু দৃশ্য দেখিয়াছি। উহার কতখানি এই আগন্তুকদের আমদানী এবং শান্তিনিকেতনের অধিবাসীদের সঙ্গেই বা ইহার কতখানি যোগ, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না। সমস্ত দেশই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের দোহাই দিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, সেই উচ্ছৃঙ্খলায় ঢেউ বুঝিবা স্বর্গও স্পর্শ করিবে—শান্তিনিকেতন কোন ছার। এই দহন হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইবে, তবেই শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করা যাইবে। নতুবা টাকা শান্তিনিকেতনকে টিকাইতে পারিবে না, টাকায় শান্তিনিকেতন হয় নাই। শান্তিনিকেতনে চাই এমন নৈতিক চরিত্রের অধিষ্ঠান ও প্রভাব যাহাতে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা আশ্রয় না পায় ও জন্মলাভ না করে।

খৃষ্ট দয়ার অবতার। তাঁর শিষ্যরা ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া যুগে যুগে মরিতেছে। মহাপ্রভু প্রেমের অবতার। বৈষ্ণব কবিরা সাধক। আর নেড়ানেড়িরা গৃহস্থের অবজ্ঞাত হইয়াছে আজকাল। বৌদ্ধধর্ম্ম যে সঙ্ঘের ও মঠের আমদানী করিয়াছিল তাহা কালে কালে হীনযানে পরিণত হইল। শঙ্করাচার্যের ঢেউয়ে তাহা মুছিয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ মহামানবতার সাধক। মানব সভ্যতা রক্ষার উহাই একমাত্র পথ। সে পথ সমস্ত মানবজাতির। যদি মানবজাতি সেই অনুসরণকালে উহা কণ্টকিত করিয়া কদর্য্য করিয়া তোলে তবে সে দুর্ভাগ্য মানবজাতিরই।......শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার আসন পাতিয়াছিলেন। তাহা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই।

৯ই পৌষ প্রাতে প্রাচীনতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরলোকগত আশ্রম বন্ধুদের শ্রাদ্ধ সভা হইল। আশ্রমবাসীরা সকলেই একপরিবারভুক্ত, সুতরাং পরলোকগতদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান আমাদের করণীয়, এই কথা বলিয়া হরিচরণবাবু পরলোকগতদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রার্থনা সঙ্গীত দ্বারা সভা ভঙ্গ হইল।

পুরাতন ও নূতন বন্ধুদের বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া আসিলাম।

আমার বাল্যকাল যেখানে কাটিয়াছিল, যে রবীন্দ্র বিত্তায়তনের কতক শিক্ষা ব্যবস্থার স্পর্শ পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, যাহার ক্রমপরিণতি এবার আসিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা আমার মনে গভীর রেখাপাত করিল। তাহার সঙ্গীত আমাকে আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু যুগপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কতক কালধর্ম্ম, যুগলক্ষণ বলিয়া মানিয়া লইলাম। কিন্তু এই ক্রমপরিণতির সূত্র ধরিয়া আরো কি ঘটিবে জানি না। যদি আর অনেকদিন না যাই, যদি ২০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি এবং তারপর যাই তখন কি আমি আমার সেই শান্তিনিকেতনের আত্মাকে তাহার প্রাণকে চিনিতে পারিব? যেন চিনিতে পারি, এবারের মতই যেন তাহাকে প্রণাম করিতে পারি ভারত ভাগ্যবিধাতা যেন তাহাই করেন

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম্।
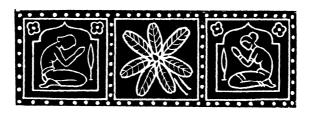
৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮

শ্রীমতী লীলা মজুমদার এম্-এ

পৃথিবীর মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে আমি আজ দিলীপকুমারকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কে না জানে আমরা স্বভাবতঃ বাক্যহীনা এবং প্রশংসাবাদে বীতরাগিণী। মুখের উপর প্রশংসাতে আমরা অনিচ্ছুক ত' বটেই; পারত পক্ষে অসাক্ষাতে প্রশংসা পর্যান্ত এড়িয়ে চলতে চেষ্টা ক'রে থাকি।

কিন্তু আজ আমাদের মতামতের কোনও মূল্য নেই; কারণ আজকে আমাদের আপত্তি থাকলেও সকলেই দিলীপকুমারের প্রশংসা করবেনই এবং আজ আমরাও অকপটচিত্তে স্বীকার করছি যে, যদিও আজীবন অবিবাহিত থেকে দিলীপকুমার পরোক্ষভাবে জগতের সমগ্র নারী সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন, তবুও অনন্তকাল সামনে প'ড়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি যে আমাদের কালে জন্মেছেন, সেই জন্ম তাঁর কাছে আমরা ঋণী আছি।

দেবতাদের প্রসাদ যে পক্ষপাতদুষ্ট হয়, এ কথা নিঃসন্দেহ। কেন একজনের কণ্ঠস্বর মধুময়, সুরজ্ঞান নির্ভুল, ছন্দবোধ অবিসম্বাদী, লেখনী পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সাধনাশক্তি অপরিসীম হবে, আর বাকী এক সহস্র জনের হবে না। এ প্রশ্নকে যুক্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায় না। কেন একজনের সৌম্য সুদর্শন কান্তি হবে, শান্ত স্নিগ্ধ প্রকৃতি হবে, আর পাঁচ জনের হবে না, তাই বা কে জানে। ব্যক্তিগতভাবে দিলীপকুমারকে এ সকলের জন্য প্রশংসা করা ন্যায় সঙ্গত কি না, তা নিয়ে পর্য্যন্ত প্রশ্ন উঠতে পারে।

কিন্তু আমরা, পৃথিবীর নারীরা, ঔচিত্যের কি বা ধার ধারি? সংসার আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। আমাদের জীবন কেটে যায় রাঁধাবাড়া ছেলে-ঠাঙানো, আর ঘরকন্নার শত শত ঝামেলা নিয়ে—দেখতে দেখতে আমরা আধাবয়সী হ'য়ে যাই। নিয়ত কানের কাছে কালের রথের চাকার ধ্বনি শুনতে পাই। ভেবে আকুল হই, সব বুঝি ফাঁকি দিল।

ঠিক সেই সময়ে দিলীপকুমার পণ্ডিচেরী থেকে এসে কীর্ত্তন ধরেন। তখুনি আমরা আমাদের প্রতি সংসারের সমস্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ, সংসারের প্রতি দিলীপকুমারের সমস্ত অবহেলা এবং দিলীপকুমারের প্রতি দেবতাদের অহৈতুক কৃপাদৃষ্টি সমস্ত ক্ষমা ক'রে ফেলি।

কারণ আমাদের ঘরে তিনি একা আসেন না, সঙ্গে নিয়ে আসেন দলে দলে শত শত সাধুজন, যাঁদের নাম করলেও নাকি পুণ্য হয়। কোথায় ছিল কমলাকান্ত, তাকে এনে আমাদের বাড়ীতে বসতে দেন। মীরাকে তিনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে এনে দেন। আর কোথায় কবে যমুনা নদীর তীরে কে জানি বাঁশি বাজিয়ে পৃথিবীর দুঃখ-ব্যথা দূর ক'রে দিয়েছিল, জোর ক'রে তার কথা আমাদের ভাবিয়ে দেন। নইলে কী ক'রে আমরা দিনের পর দিন বাজারের হিসাব আর ব্যসনের তালিকা আর সংসারের অনন্ত চাহিদা মেটাব?

দিলীপকুমারের প্রতিভার বিচার করবার আমরা কে? যা ছিল আমাদের নাগালের বাইরে, তাকে তিনি আমাদের হাতের মধ্যে এনে দেন। মাটির সঙ্গে বাঁধা থাকি, শেকল কেটে দেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে কোনও দিনও যা'কে লাভ করা যায় না, তার সন্ধান ব'লে দেন।

যুগে যুগে পৃথিবীতে কত কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, লিখিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে, অমরতার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে এসেছেন। কা'কে কতখানি মূল্য দেব, আমরা তার কিবা খবর রাখি?

মেক্সিকোর পণ্ডিত-সভা থেকে চিঠি এসেছে যে, দুনিয়ার একশ'জন সেরা গুণীর মধ্যে দিলীপকুমার একজন। দেশের জন্য গর্বে আমাদের বুক ফুলে উঠেছে। দিলীপকুমার ত' উপলক্ষ মাত্র! কিন্তু অসীম প্রতিভাশালী পিতার পুত্র, ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া অশেষ শক্তির উত্তরাধিকারী, পুরুষমানুষরা তাঁর দোষগুণের সমালোচনা করবেন—আজকের দিনে অবিশ্যি দোষত্রুটির কথা উত্থাপন করাও অশোভন হবে,—কিন্তু আমরা নারীরা দিলীপকুমারের প্রতি আমাদের অপরিমেয় ঋণ স্বীকার করব এবং প্রসন্নচিত্তে চিরকাল ঋণীই থেকে যাব। *

---

* আই-টি-এক প্রেক্ষাগারে দিলীপকুমারের একান্নতম জন্মবাসরে শ্রীমতীর ভাষণ।
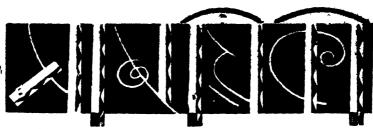
'ভারতবর্ষে', গান্ধী-কথা—

আজ মহাত্মা গান্ধীর কথা ভারতের সর্ব্বত্র ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু যে সময়ে তাঁহাকে কেহ জানিত না, সে সময়ে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ১ম বর্ষের ২য় খণ্ডে, ২য় সংখ্যায় (মাঘ, ১৩২০) 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী' শীর্ষক প্রবন্ধে গান্ধীজির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। সে প্রবন্ধের লেখক ছিলেন—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। উভয়েই এখন সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। প্রবন্ধটি ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী—তাহাতে ৪খানি চিত্রও ছিল। তাহা হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কারাগারে গমন করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তানটি কঠিন পীড়ায় মৃতপ্রায়। তাহাকে দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবাসীকে সেবা করাই তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক—ঈশ্বরের হস্তে তাঁহার মৃতপ্রায় সন্তানটিকে দান করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তারপর দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হইবার সময় সংবাদ আসিল—তাঁহার পত্নী অত্যন্ত পীড়িত। এমন কি ম্যাজিষ্ট্রেট গান্ধীকে সামান্ত জরিমানা দিয়া পীড়িত পত্নীর সহিত মিলিত হইতে বলিলেন—কিন্তু অসংখ্য ভারতবাসী যখন অকাতরে জেলে যাইতেছে, তখন কি করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন? তাই তিনি স্বেচ্ছায় কারাগারে গেলেন। তাঁহার ১৭ বৎসর বয়সের বালকটি যাহাতে দুঃখ ও কষ্টের মধ্য দিয়া মানুষ হইতে পারে, এ আশায় তিনি তাহাকে এই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ ব্যাপারে যোগদান করাইয়াছেন। তাহার পর এই নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ মন্ত্রে ভারতবাসীগণকে দীক্ষিত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—Remember that we are descendants of

ব্যারাকপুরে বাপুজীর চিতাভস্মসহ শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার জীবনই আমার বাণী — মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজীর হস্তলিপি

Prahlad and Sudhanva, both passive resisters of the purest type. They suffered extreme torture, neither of them inflicted suffering on their persecutors.*

ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা আর কোন সাময়িক পত্রে গান্ধীজির জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর পরে আমরা লেখকদ্বয়কে অভিনন্দিত করিতেছি এবং

বারাকপুরে সুসজ্জিত বেদিকার পরে রাজাগোপালাচারী কর্ত্তৃক ভস্মাধার স্থাপন ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষ' যে সে সময়েও গান্ধীজীর আন্দোলনে সাহায্য করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া গৌরববোধ করিতেছি।

বাঙ্গালা সরকারের নুতন ব্যবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগে তিনটি পদ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন—(১) এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টী (২) অফিসিয়াল রিসিভার ও (৩) অফিসিয়াল এসাইনী। সম্প্রতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় এডমিনিষ্ট্রেটার জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টী পদে এবং ব্যারিষ্টার মিঃ আজিজল হক অফিসিয়াল রিসিভার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীন বাঙ্গালায় ঐ সকল বিভাগের কার্য্য ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে ঐ গুলি পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন।

মহাত্মাজীর শ্রাদ্ধদিবসে বারাকপুরে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ধর্মগ্রন্থ পাঠ—কোরাণ পাঠ ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ম্যালেরিয়া নিবারণ ব্যবস্থা—

গত ২৫শে জানুয়ারী মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ এন্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটীর অষ্টাবিংশ বার্ষিক সাধারণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে ১৯১৮ সালে পানিহাটী ও সুখচর কেন্দ্র করিয়া যে ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, আজিও তাহা সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এখনও ডাক্তার গোপালচন্দ্রের নেতৃত্বে একদল কর্ম্মী এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিতেছেন। সোসাইটীর গ্রাম্য কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫৬৮—তাহা বাঙ্গালার ৫টি বিভাগের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। বাঙ্গালা দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য এই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এতদিন ধরিয়া যে কার্য্য করিয়া

আসিতেছেন, বর্তমান স্বাধীন দেশে পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেন্টের সেই অসমাপ্ত কার্য্যভার গ্রহণ করা উচিত।

বারাকপুর গান্ধী ঘাটে কীর্তনানুষ্ঠান ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

আছে—তাহার পার্শ্বে জমী সংগ্রহ করিয়া আর একটি গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় যক্ষা চিকিৎসার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভাণ্ডারের শিক্ষা বিভাগ সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন—ছাত্রাবাসে কয়েকটি ছাত্রকে বিনা ব্যয়ে আহার, বাসস্থান প্রভৃতি প্রদান করা হয়। ভাণ্ডারের সব বিভাগ লইয়া ১৯৪৫ সালে আয় হইয়াছিল—৮২৪০৬ টাকা ও ব্যয় হইয়াছে ৬৪২৬৯ টাকা। ১৯৪৬ সালে আয় হইয়াছে ৪৬৫১১ টাকা ও ব্যয় হইয়াছে ৪৩৭৪১ টাকা। তাহা ছাড়া গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে ৬৪৭৩৪ টাকা জমা আছে। কলিকাতার বর্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী ভাণ্ডারের পরিচালক কমিটীর সম্পাদকরূপে ভাণ্ডারের প্রসার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সৈন্যবাহিনী ভারতীয়করণ—

আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের পরিচালনাধীন হইবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সৈন্যদল পরিচালনা করিবেন। প্রধান সেনাপতি লেপ্টেনান্ট জেনারেল কারিয়াপ্পা, সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ—মেজর জেনারেল কুলবন্ত সিং, কোয়েটার মাষ্টার জেনারেল—মেজর জেনারেল চিমনী, মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল থাপার, এডজুটান্ট জেনারেল—মেজর

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার—

কলিকাতা ৬৫-২বি বাডন ষ্ট্রীটস্থ দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার নামক প্রতিষ্ঠানটি গত ১৯২২ সাল হইতে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নানাভাবে সেবা করিতেছেন। ভাণ্ডারের সেবা বিভাগ হইতে দুগ্ধ বিতরণ, আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দান প্রভৃতি করা হয়। চিকিৎসা বিভাগ (১) চিত্তরঞ্জন দাতব্য চিকিৎসালয় (২) কিরণশশী সেবায়তন ও (৩) গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল পরিচালনা করেন। কিরণশশী সেবায়তনের ১০৫।১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে নিজস্ব ত্রিতল গৃহ

বারাকপুর গান্ধী ঘাটে বাইবেল পাঠ ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

জেনারেল শ্রীনাগেশ, দিল্লী ও পূর্ব্বপাঞ্জাব কম্যাণ্ডের সেনাপতি—মেজর জেনারেল থিমায়া, কাশ্মীর জম্মু সেনাবাহিনীর সেনাপতি—মেজর জেনারেল চৌধুরী। কয়েকজন বৃটিশ সিনিয়ার অফিসার পরামর্শদাতারূপে কাজ করিবেন।
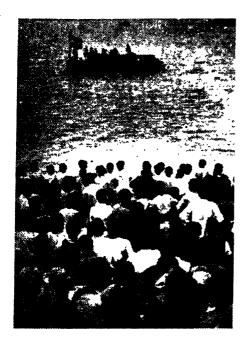
গঙ্গাবক্ষে মহাত্মাজীর অস্থি নিমজ্জন

ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরলোকে ডাক্তার মুঞ্জে—

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও নাসিকস্থ শিবাজী ভোঁসলে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার বি-এস-মুঞ্জে গত ১৯শে ফাল্গুন রাত্রিতে ৭৬ বৎসর বয়সে নাসিকে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিলাসপুরে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৮ সালে চিকিৎসক হইয়া কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম জীবনেই তিনি লোকমান্য তিলকের অধীনে কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি বহু বৎসর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন ও আজীবন দেশহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষে প্রথম বেসরকারী সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুবার তিনি বাঙ্গালা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও ১৯৪৫ সালে জলপাইগুড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি পাটনায় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসম্মিলনেও সভাপতি হইয়াছিলেন। যে সকল নিষ্ঠাবান দেশকর্মীর চেষ্টায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ডাক্তার মুঞ্জে তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

ত্রিবেণী সঙ্গম অভিমুখে ভস্মাধার—সঙ্গে শোকাবনত পণ্ডিতজী

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়—

গত ২০শে ফাল্গুন শুক্রবার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় পশ্চিম বঙ্গে অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া পশ্চিম বঙ্গের মোট মন্ত্রীর সংখ্যা হইল ১৩জন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য পূর্ব্ব বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে যোগদান করিয়া পাকিস্থান গণ-পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা হইয়াছিলেন। সহসা তিনি সে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া এখানে মন্ত্রী হওয়ায় জনসাধারণ বিস্মিত হইয়াছে। ইহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে ও তাঁহারা নিজেদের নিঃসহায় ভাবিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিবে। পশ্চিম বাঙ্গালা প্রদেশ আয়তনে অতি ক্ষুদ্র—কাজেই এখানে ১২র পর নূতন মন্ত্রীরও প্রয়োজন ছিল না। কিরণবাবু

বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু কখনও তাঁহার বুদ্ধি কোন শুভ কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। কাজেই এই নিয়োগে দেশবাসীর মধ্যে দারুণ অসন্তোষই দেখা যাইতেছে। তথাপি আমরা আশা করি, নূতন মন্ত্রী তাঁহার অসাধারণ কার্য্যের দ্বারা যেন লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সমর্থ হন।

রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইন্সটিটিউট—

কর্ণেল ডি-এন-ভাদুড়ী তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর স্মৃতি-রক্ষা করে কলিকাতা বালীগঞ্জে ১১১ রসা রোডস্থ বাড়ীটি রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনিষ্টিটিউটকে দান করিয়াছেন। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী ইনিষ্টিটিউটের নূতন গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে তথায় এক উৎসব হইয়াছিল। ইনিষ্টিটিউট হইতে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাত খণ্ডে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি উৎসবে উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ গঙ্গা অভিমুখে ভস্মাধারসহ শোকযাত্রা—সম্মুখে সুচেতা কৃপালনী, অরুণা আসফ আলী প্রভৃতি

আসামে নূতন মন্ত্রী—

আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মৌলানা মহম্মদ তায়েবুল্লা গত ৫ই মার্চ্চ আসামের অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া মোট ৮ জন মন্ত্রী হইল। তিনি আজীবন কংগ্রেসের সেবক।

কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—

৫ই মার্চ্চ কাশ্মীর ও জম্মুর মহারাজা ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি ১লা মার্চ্চ হইতে শেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন ও নূতন মন্ত্রীসভার হাতে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন। মহারাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত দেওয়ানও অন্যতম মন্ত্রী হইয়াছেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফেরার পর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু মহারাজার নূতন ব্যবহার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছেন।

পরলোকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ—

শনিবার ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৭-২০ মিনিটের সময় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরস্থ বাটিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৮২ বৎসর হইয়াছিল। ১২৭৩ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তিনি ঢাকা জেলার পারজোয়ার পরগণার ভভাঢ্য গ্রামে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তাঁহার অগ্রজ জগৎচন্দ্র শিরোরত্ন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। দুর্গাচরণ অগ্রজের নিকট ব্যাকরণ পড়িয়া গ্রামস্থ পণ্ডিত রাসমোহন সার্বভৌমের নিকট বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে বিখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত পাঠ করেন। তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তের বিভিন্ন উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতায় যে ভাগবত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন তিনি তাহার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মধুসূদন সরস্বতীর "ভক্তি রসায়ন" গ্রন্থ তিনি টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। বেদান্ত দর্শনের দুরূহ তত্ত্ব সকল তিনি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন আর কেহ সেরূপ পারেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ এবং বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘের সভাপতি ছিলেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সহকারী সভাপতি ছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় (Bengal National

ভস্মাধার বাহক পণ্ডিত জহরলাল ও রফি আহমদ কিদওয়াই —সঙ্গে সরোজিনী নাইডু, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, আভা গান্ধী প্রভৃতি—এলাহাবাদ

১৯২২ সালে তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। তিনি ২বার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক বেদান্ত ফেলোশিপ বক্তৃতা প্রদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত হন। উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সম্পাদিত প্রধান উপনিষদগুলি বাঙ্গলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ; ব্রহ্মসূত্রের রামানুজ ভাষ্য (শ্রীভাষ্য) তিনিই প্রথম বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। Council of Education) এর প্রারম্ভ হইতে তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য যেরূপ বিশাল ছিল, তাঁহার নিরহঙ্কার ও অমায়িক ব্যবহারও সেইরূপ হৃদয়স্পর্শী ছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার খ্যাতি সমগ্র ভারত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সুধীসমাজে বক্তৃতা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৯৪৫ সালে কলিকাতার এক জনসভায় তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া ২০০০৲ উপহার প্রদান করা হয়। বিচারপতি

শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় সেই অভিনন্দন পাঠ করেন। পাশ্চাত্য সংস্কার দ্বারা বিক্ত না হইয়া হিন্দু দর্শনের নির্মল ধারা যে সকল পণ্ডিতদের মধ্য দিয়া এখনও প্রবাহিত হইতেছে তিনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। যে বিজাতীয় ভাবধারা বর্ত্তমান ভারতকে প্লাবিত করিবার চেষ্টা করিতেছে তিনি তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান এবং প্রতিভা লইয়া তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধান বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু

এলাহাবাদের পথে ভস্মাধারবাহী ট্রেন—এটোয়া
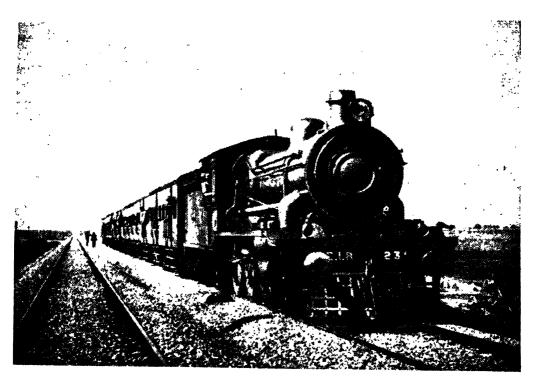
সংস্কৃতির পক্ষে অসাধারণ ক্ষতির বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুর তিনদিন পরে তাঁহার পত্নী পরলোকগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার পত্নীর কোনও অসুখ ছিল না। তাঁহার পত্নীর রোগ নির্ণয় হয় নাই।

আন্দামানে পোর্ট ব্লেয়ারে শোক—

আন্দামান দ্বীপস্থ পোর্ট ব্লেয়ার হইতে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু সেনগুপ্ত জানাইয়াছেন—৩০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর শোক সংবাদ পোর্ট ব্লেয়ারে পৌছিলে চীফ কমিশনার পরদিন সকল অফিস আদালত বন্ধ করিয়াছিলেন ও ৩১শে জানুয়ারী বিকাল ৫টায় জিমখানা ময়দানে এক জনসভায় মিঃ জে-এস-মাথুর গীতা পাঠ ও প্রার্থনা করেন। চীফ কমিশনার মিঃ আই-মজিদ তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাসের আশুতোষ-অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি গত ৩০ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন।

বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মিলন—

গত ১৫ই ও ১৬ই ফাল্গুন শনিবার ও রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে কবিরাজ শ্রীযুত প্রমথনাথ রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। গভর্ণর শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন এবং মন্ত্রী শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কবিরাজ শ্রীযুত অনাথনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্বাধীন বাঙ্গালায় আয়ুর্ব্বেদের প্রসার ও উন্নতি বিধানের জন্য সকল চেষ্টা করা প্রয়োজন।

ভস্মাধার দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ভস্মাধারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থ ভারতের প্রধান মন্ত্রীর গমন

শ্রীযুত ক্ষিতীশ-চন্দ্র নিয়োগী—

পশ্চিম বঙ্গের অতিরিক্ত নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী গণ-পরিষদের সদস্য বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ক্ষিতীশবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি মন্ত্রীরূপে সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন।

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে উভচর রথে (দক্ষিণে) গান্ধীজীর অস্থি—এলাহাবাদ

ফটো—জলধিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী—

পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ব্যবস্থা পরিষদের নিম্নলিখিত ৬ জন সদস্যকে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২) শ্রীবঙ্কুবিহারী মণ্ডল (৩) শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল (৪) শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর নস্কর (৫) শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য ও (৬) শ্রীনিশাপতি মাঝি।

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ই মার্চ্চ হইতে আরও ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধিতে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সঙ্কট-জনক পরিস্থিতিতে তাঁহার মত অভিজ্ঞ কর্ম্মীর পক্ষেই সকল দিক রক্ষা করিয়া কার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব।

কয়লার পরিবর্ত্তে টাকু—

ভারত গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই জাপানকে ৩০ হাজার টন কয়লা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে জাপান হইতে কাপড়ের কলের জন্য ১ লক্ষ টাকু আমদানী করিবেন। আগামী ১১ মাসে টাকুগুলি এ দেশে আসিবে। ১ লক্ষ টাকু আসিলে ভারতবর্ষে উৎপন্ন কাপড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বস্ত্র সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে।

পরলোকে খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী—

খ্যাতনামা পণ্ডিত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী গত ৯ই ফাল্গুন ৯৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা ভবানীপুরে গঙ্গাতীরে স্বর্গলাভ করিয়াছেন—তিনি কলিকাতা গীতা সভা, ভবানীপুর সনাতন ধর্ম্মসভা প্রভৃতির আচার্য্য ছিলেন।

পুরীর মন্দির পরিচালনা—

পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিচালনার জন্য উড়িয়া ব্যবস্থা পরিষদে শীঘ্রই একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। বিলটি উড়িয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্দির ও তৎসংশ্লিষ্ট সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত কমিটীর উপর ন্যস্ত করা হইবে। ফলে যাহাতে আর কোনরূপ অব্যবস্থা না থাকে তাহার চেষ্টা হইবে।

জুনাগড়ে গণভোটের ফল—

সম্প্রতি জুনাগড় রাজ্যে যে গণভোট গৃহীত হইয়াছে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী নয়া দিল্লীতে তাহার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্র সংঘে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছে ১৯০৭৭৯ ব্যক্তি ও পাকিস্থানে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়াছে—৯১ ব্যক্তি মাত্র।

পরলোকে রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর—

বীরভূমের প্রসিদ্ধ ময়নাডাল গ্রামনিবাসী মিত্র-ঠাকুরবংশীয় কীর্ত্তন বিশারদ পণ্ডিত রাসবিহারী মিত্র-ঠাকুর রসসাগর গত ৬ই ফাল্গুন ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা তারক প্রামাণিক রোডে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তনের সহিত বাঙ্গালী মাত্রই পরিচিত ছিলেন।

গান্ধীজির ৭৯ ফিট উচ্চ প্রস্তরমূর্ত্তি—

২৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বায়ে কাথিয়াবাড় রাষ্ট্র সংঘের নেতা নবনগরের জাম সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে বোম্বায়ের উত্তরস্থ চণ্ডীভিলী গ্রামে ৬৯৪ ফিট উচ্চ এক শৈল শিখরে মহাত্মা গান্ধীর ৭৯ ফিট উচ্চ এক বিরাট প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। কাথিয়াবাড়ের রাজন্তবর্গ শুধু সৌরাষ্ট্র রাজ্য গঠন করিবেন না—সকলেই জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করিবেন। মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত পথে সকলে পরিচালিত হইবেন।

উড়িষ্যায় নূতন আদিবাসী মন্ত্রী—

সম্বলপুর জেলার পদমপুর হইতে নির্ব্বাচিত উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য লালা রণজিৎ সিং বরিহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী উড়িষ্যা মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রথম আদিবাসী মন্ত্রী। তিনি ৬ বৎসর বিলাতে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

মহীয়সী মহিলার পরলোক গমন—

মৈমনসিংহ হেসনগর নিবাসী খ্যাতনামা দানশীল জমীদার ৺হেমচন্দ্র চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী গত ৩০শে অগ্রহায়ণ সজ্ঞানে ৺কাশীলাভ করিয়াছেন। তিনি জীবনব্যাপী কঠোর নিয়মব্রত প্রতিপালন, দেব দ্বিজে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, দরিদ্রের দুঃখ মোচনে মুক্তহস্তে দান ও সরল মধুর ব্যবহারের জন্য সকলের প্রিয় ছিলেন। তিনি বিধবা হইয়া কঠোর জীবনযাপন করিতেন ও বৃদ্ধ বয়সেও স্বপাক খাইতেন—ফলে কখনও তাঁহাকে রোগ ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি বহু পুত্র-পৌত্র দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সমাবর্ত্তন—

গত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ ভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির সভাপতি বিচারপতি শ্রীযুত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-সচিব রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে উৎসবে উপস্থিত হইয়া জানাইয়াছেন যে পশ্চিম বাঙ্গালার সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবার জন্য সরকার শীঘ্রই এক কমিটী গঠন করিবেন ও আগামী বৎসর সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। সমিতির সম্পাদক ও কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তাহার বিবরণে বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। উৎসবে বিচারপতি শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সুধী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী—

গত ৭ই মার্চ্চ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বহু খ্যাতনামা সুধীকে সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ও রাজকুমারী অমৃত কাউর ছাড়াও ১৩ জন পণ্ডিত ব্যক্তি ঐরূপ উপাধি পাইয়াছেন। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক দিল্লীস্থ জাতীয় মহাফেজখানার অধ্যক্ষ ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁহাদের অন্যতম। সুরেন্দ্রবাবুর এই সম্মানলাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন।

আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ—

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে বেলগেছিয়া রোডে যে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আছে, সম্প্রতি তাহার কর্তৃপক্ষ উক্ত কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তন করিয়া 'আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল' নামকরণ করিয়াছেন। খ্যাতনামা দানবীর চিকিৎসক ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের প্রাণপাত চেষ্টায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে উহা প্রতিষ্ঠার সময় সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্য তৎকালীন গভর্ণরের নামে উহার নামকরণ করা হইয়াছিল। সেই দাসমনোবৃত্তির পরিবর্তন হইয়া স্বাধীন বাঙ্গালার যে উহার নাম পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব ও আনন্দ বোধ করিবেন।

স্বাধীন সিংহলের প্রতি শুভেচ্ছা—

সিংহল দেশ সম্প্রতি স্বাধীনতা লাভ করায় গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী সকালে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার মহাবোধী সোসাইটীতে এক বিরাট অনুষ্ঠানে স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতে তাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। উৎসবে গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, প্রধান মন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু রাষ্ট্রদূত বক্তৃতা করিয়া নূতন স্বাধীন লঙ্কার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিয়াছেন। গভর্ণর রাজাগোপালাচারী পৃথিবীর সকল দেশকে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজি

শ্রীপ্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হাহাকারে যবে ব্যাপ্ত আকাশ, হত্যা চতুর্দ্দিকে।
আমরা পেয়েছি প্রেমের প্রতীক দেবতা গান্ধীজিকে।
সত্যাশ্রয়ী সহজ সরল
মুছাতে বেদনা ঘুচাতে গরল
ডাক দিয়ে কহে—"করুণা তরল বাঁচাবে ধরিত্রীকে—
"হে মুঢ় মানব! প্রেমের বারতা নিয়ে যাও দিকে দিকে।

"একই মায়ের অঙ্কের পরে হিন্দু মুসলমান;
"যে নামেই ডাকো "আল্লা" বা "হরি" একই সে ভগবান,
"একই শোণিত বহিছে শিরায়
একই ব্যথা বাজে নিঠুর পীড়ায়,
একই আনন্দে প্রাণ গলে যায়, একই সুরে একই গান।

"একই শস্য দূর করে ক্ষুধা—তৃষ্ণায় একই জল
"একই রবির রশ্মিতে জাগে জীবনের শতদল।
"জননী হৃদয়ে আছে একই স্নেহ
শিশু কলরোলে মন্দ্রিত গেহ
একই মন একই প্রাণ একই দেহ
একই গাছে একই ফল।

নমঃ নমঃ নমঃ ওগো প্রিয়তম! সত্যের অবতার
জরা ভারে নত তবু অবিরত বহিয়াছ কত ভার!
ভারতের নহ তুমি পৃথিবীর
ঝড়ে ঝঞ্ঝায় তুমি ধীর-স্থির
শ্রেষ্ঠ মানব হে শ্রেষ্ঠ বীর প্রেমের কৃপাণ যার—
হিংস্র বিংশ শতাব্দী মাঝে সকলের আপনার।

উন্মাদ যুবা হানিল তোমার বক্ষে আঘাত হানি—
করুণ কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া শেষ "হরে রাম" বাণী
কৃশ তনুখানি রুধিরেতে ঢাকা
ভীতি কোথা? মুখে প্রীতি ছিল মাখা
নয়নের কোণে ক্ষমা ছিল আঁকা জোড় ছিল দুটি পানি।
আমাদের শত শত অপরাধ ক্ষমা করে গেছ জানি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
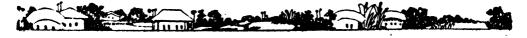
পঞ্চম টেষ্টম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৫৭৫ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ভারতবর্ষ ঃ ৩৩১ ও ৬৭

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৭৭ রানে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী মেলবোর্ণ মাঠে শেষ পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হয়। খেলা আরম্ভের পূর্ব্বে উভয় দলের খেলোয়াড়েরা একত্র দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে এক মিনিটকাল মৌন অবলম্বন করেন। খেলার মাঠের দর্শকগণও নিজ নিজ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে অনুরূপভাবে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ করে প্রথমে দলকে ব্যাট করতে পাঠান। আবহাওয়া ক্রিকেট খেলার অনুকুল ছিল না। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছিল। ঐ সময়ে এক উইকেটে ৯৬ রাণ উঠে। দিনের শেষে খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিন উইকেটে ৩৩৬ রাণ উঠে। ব্রাউন ৯৯ রাণ করেন এবং ব্র্যাডম্যান ৫৭ ক'রে পেশীর টান ধরার জন্য অবসর গ্রহণ করেন। নেলহার্ভে ও লক্সটন যথাক্রমে ১৮ ও ৪৮ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

খেলার দ্বিতীয় দিন ৭ই ফেব্রুয়ারী, চা পানের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ৮ উইকেটে ৫৭৫ রাণ উঠলে পর ব্র্যাডম্যান ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করেন। নেলহার্ভে ১৫৩ ও লক্সটন ৮০ রাণ করেন। নেলহার্ভে ২৪৯ মিনিট উইকেটে ছিলেন এবং বাউণ্ডারী করেন ১১টি। নেলহার্ভে ও লক্সটন ৪র্থ উইকেটের জুটিতে ১৫৯ রাণ তুলেন। চা পানের পর ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। সূচনায় অশুভ লক্ষণ দেখা দিল। মাত্র তিন রাণে প্রথম উইকেট পড়ে গেল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল ভারতীয় দলের ৪৩ রাণ উঠেছে এক উইকেট গিয়ে।

খেলার তৃতীয় দিন ৯ই ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় দল সারা দিনই ব্যাট করলো। মানকাদ ১১১ রাণ করলেন। এই দিনে ভারতীয় দলের ৬টা উইকেট পড়ে যায়।

খেলার চতুর্থ দিনে ১০ই ফেব্রুয়ারী, ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস ৩৩১ রাণে শেষ হয়। হাজারে ৭৪ রাণ করেন এবং ফাদকার ৫৬ রাণ করে নট আউট থাকেন। ভারতীয়দল 'ফলো অন' করতে বাধ্য হ'ল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতে ভারতীয় দল অতি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মাত্র ১১০ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৬৭ রাণে শেষ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া দলের বোলার জনসন ৮ রাণে ৩ এবং রিং ১৭ রাণে ৩টে উইকেট পান। ভারতীয় দলকে ১ ইনিংস ও ১১৭ রাণে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অষ্ট্রেলিয়া সফরের ফলাফল ঃ

মোট খেলা—২০ ; জয়—৫ ; ড্র—৭ ; পরাজয়—।

সেঞ্চুরী ভারতীয় দল—১৫টি : ভারতীয় দলের বিপক্ষে ১৭টি।

ভারতীয় দলের পক্ষে সেঞ্চুরী :

লালা অমরনাথ—৫

১৪৪ (দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

২২৮ নট আউট (ভিক্টোরিয়া দলের বিপক্ষে ১মইনিংসে)

১৭২ (কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

১৭১ (টাসমানিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

১০৫ (টাসমানিয়ার ২য় খেলার ১ম ইনিংসে)

ভি মানকাদ—৩

১১৬ (দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে ২য় ইনিংসে)

১১৬ (তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংসে)

১১১ (৫ম " ")

বিজয় হাজারে—৪

১৪২ (নিউ সাউথ ওয়েলসের বিপক্ষে)

১১৫ (টাসমানিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

১১৬ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংস)

১৪৫ (" ২য় ইনিংস)

কে রঙ্গনেকার—১২৩ (ভিক্টোরিয়া কাউন্টি একাদশের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে)

ডি জি ফাদকার ১২৩ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ১ম ইনিংস)

সিটি সারভাতে

১২৮ (টাসমানিয়ার বিপক্ষে ১ম ইনিংসের দ্বিতীয় খেলায়)

ভারতীয় দলের বিপক্ষে সেঞ্চুরী ঃ

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াদলের পক্ষে : আর নিহাল—১৩৭ ; আর জে ক্রীগ—১০০ ; ডি ব্র্যাডম্যান—১৫৬। মোরিস—১৬২ (নিউ সাউথ ওয়েলসদলের পক্ষে ১ম ইনিংসে) ; ডি ব্র্যাডম্যান—১৭২ (অষ্ট্রেলিয়া একাদশ দলের পক্ষে ১ম ইনিংসে) ; ডবলউ মোরিস—১১৫ (কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে ১ম ইনিংস) ; সি ম্যাককুল ১০১ (ঐ খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে) ; আর মরিসবাই—১০০ (:টাসমানিয়ার দ্বিতীয় খেলার ১ম ইনিংসে) ; ডবলউ ওয়ামসলি—১৮০ নট আউট (ঐ খেলার ১ম ইনিংসে)

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে—টেষ্ট সেঞ্চুরী : অষ্ট্রেলিয়া—৮ ; ভারতবর্ষ—৫টি ডি ব্র্যাডম্যান—৪টি

১৮৫ (প্রথম টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংস)

১৩২ (তৃতীয় " "

১২৭ (" ২য় ইনিংস)

২০১ (৪র্থ " ১ম ইনিংস)

এ মরিস ১০০ (তৃতীয় " ২য় ইনিংস)

এ এল হাসেট ১৯৮ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ")

এস বার্ণেস ১১২ (" ")

নেল হার্ভে ১৫৩ (৫ম " ১ম ")

ভারতীয়দলের পক্ষে

ভি মানকাদ—২

১১৬ (তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ, ১ম ইনিংস)

১১১ (৫ম ")

ভি এস হাজারে—২

১১৬ (৪র্থ " ")

১৪৫ (" " ২য় ইনিংস)

ডি জি ফাদকার—১

১২৩ (৪র্থ টেষ্ট ম্যাচ ১ম ইনিংস)

নিখিল ভারতীয় অলিম্পিক ঃ

ত্রয়োদশ বার্ষিক নিখিল ভারতীয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোমতী ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। পাতিয়ালা ৯৮ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। মহিলাদের প্রতিযোগিতার প্রথম হয়েছে মহীশূর ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে। ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার বাঙ্গলাপ্রদেশ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। ফলাফল (১ম) পাতিয়ালা—৯৮ পয়েন্ট;, (২য়) বোম্বাই—৩৯, (৩য়) মহীশূর—২৩, (৪র্থ) যুক্তপ্রদেশ—২২, (৫ম) বাঙ্গলা—১৭, (৬ষ্ঠ) পূর্ব্ব পাঞ্জাব— (৭ম) মাদ্রাজ—১১, (৮ম) কোলাপুর ও বিহার—৬, (৯ম) ফরিদকোট—৩ এবং (দশম) বরোদা—১।

আন্তঃস্কুল স্পোর্টস ঃ

ভারতীয় স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কলিকাতা শাখার উদ্যোগে নবম বার্ষিক আন্তঃ স্কুল স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর অনেক বেশী ছাত্র যোগদান করেছিল।

ফলাফল : ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান : বড়দের—রবিন মল্লিক (স্কটিশ স্কুল)—১১ পয়েন্ট। মধ্যম শ্রেণীর—তাপস গুপ্ত (স্কটিশ স্কুল)—৬ পয়েন্ট। ছোটদের—জগন্নাথ দাস (হুটবিহারী)—৮ পয়েন্ট।

স্কুল চ্যাম্পিয়ানসীপ—স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল—৩৯ পয়েন্ট।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্রিকেট

অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল তাঁদের তালিকাভুক্ত সব খেলা শেষ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তাঁদের খেলার ফলাফলে তাঁরা আমাদের বিশেষ সন্তুষ্ট ও আশান্বিত করতে পারেননি সত্য, কিন্তু সব কিছু বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায় তাঁদের খেলার ফলাফলে অসন্তুষ্ট বা নিরাশ হবারও কিছু নেই। তবে যাঁরা অত্যধিক আশা করেছিলেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। একে ভারতের ক্রিকেট স্ট্যাণ্ডার্ড অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক নীচে তার উপর তিনজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, মার্চেণ্ট, মান্তাক ও মোদী না যাওয়ায় ভারতীয় দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দলের সঙ্গে তার সর্ব্বশক্তি না নিয়েই। এরূপ একটি দুর্ব্বল দলের কাছ থেকে, যার মধ্যে নূতন ও অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়ই বেশী, আশাতিরিক্ত ভাল ফলাফল আশা করা অন্যায়। তা' ছাড়া মনে রাখতে হবে ইহাই ভারতীয় দলের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতাবর্জ্জিত সর্ব্বপ্রথম অষ্ট্রেলিয়া সফর। এর উপর ঘটেছে ভাগ্যবিপর্য্যয়। গোড়ার দিকে খেলতে হয়েছে অতিরিক্ত বৃষ্টিসিক্ত নরম উইকেটে এবং শেষের দিকে অত্যধিক গরমে। এই অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় ভারতীয় দল নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারায় অনেক সময়ে তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। ভারতবর্ষে সব সময় ক্রিকেট খেলার আদর্শ আবহাওয়ার মধ্যে খেলবার চেষ্টা হয়ে থাকে। এটা একটা মস্ত বড় ত্রুটি বলেই মনে হয়। দেখা যায় ভারতের বাইরের কোন দেশে সফরের সময় প্রায়ই অত্যধিক বৃষ্টি, শীত বা গরমের মধ্যে খেলতে হয়। এই রকম অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় ভারতীয় দল অনেক সময় তাঁদের স্বাভাবিক ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখাতে পারেন না। এই জন্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে যাঁরা টেষ্ট ম্যাচের উপযুক্ত, তাঁদের বৃষ্টিসিক্ত নরম উইকেটে এবং বেশী গরমের সময়েও খেলার অভ্যাস রাখা দরকার।

অধিনায়ক অমরনাথের অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছে এবং রয়টারের বিশেষ সংবাদ-দাতা, প্রিন্স দলীপ সিংজী, অমরনাথকে গোড়ার থেকেই আক্রমণ করে এসেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় অমরনাথ দল পরিচালনায় বিশেষ অযোগ্যতার পরিচয় দেন নি। তাঁর অধীনস্থ খেলোয়াড়দের তিনি যে ভাবে খেলিয়েছিলেন খেলোয়াড়দের গুণাগুণ বিচার করে দেখলে বোঝা যায় তার চেয়ে ভালভাবে খেলান সম্ভব ছিল না। খেলোয়াড়দের নিজের দোষে খেলতে না পারার জন্য অধিনায়ককে সব সময়ে দায়ী করা ঠিক নয়। হয়ত অল্প-স্বল্প ত্রুটিবিচ্যুতি অমরনাথের পরিচালনার মধ্যে ঘটেছিল।

অমরনাথ

যেমন সি, এস, নাইডুকে আরও বেশী ওভার বল করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল এবং অনবরত ব্যাটিং অর্ডার পাল্টানও ঠিক হয় নি। কিন্তু এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি ভারতীয় দলের বিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ নয়। বরং অমরনাথের ভুলের চেয়ে তাঁর মন্দভাগ্যকেই দোষ দেওয়া

চলতে পারে। পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই তিনি টসে ব্রাডম্যানের কাছে পরাজিত হয়েছেন। এই টসের জয় পরাজয়ের উপর ক্রিকেট খেলায় বিশেষ করে টেষ্ট ম্যাচের জয় পরাজয় অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রথম ব্যাট করার সুবিধা পাওয়া প্রায় একশ' রাণের সমতুল্য। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অমরনাথকে সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন চারটি টেষ্টেই। একে ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক দুর্ব্বল, তার উপর ভাগ্য বিপর্য্যয় ও বৃষ্টিপাত মিলে ভারতীয় দলকে একেবারে কোনঠাসা করে তুলেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও অমরনাথের সিংহ হৃদয় ছিল অটল এবং তিনি প্রকৃত অধিনায়কের মত ও খেলোয়াড়োচিতভাবে এই সব বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। টসের পরাজয় তিনি গ্রাহ্য করেন নি, শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদলের বিপুল রাণ-সংখ্যা তাকে দমিয়ে দিতে পারে নি, ভিজে মাঠের নরম পীচ তাঁকে ভীত করেনি। যখন সব কিছু তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে তখনও তিনি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিপক্ষে তাঁর দুর্ব্বল দল নিয়ে জয়লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। পরাজিত হয়েছেন সত্য কিন্তু গৌরবজনক-ভাবে। তাঁর দৃঢ়তা এবং বহুলাংশে শক্তিশালী ব্রাডম্যান পরিচালিত অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে জয়লাভের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। অমরনাথ ও তাঁর দলের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা অষ্ট্রেলিয়াবাসীদেরও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। এ পর্য্যন্ত যত ক্রিকেট দল অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেছে তার মধ্যে এই ভারতীয় দলই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ব্যারাকিং অভ্যস্ত অষ্ট্রেলিয়ান দর্শকদের কাছ থেকে এই জনপ্রিয়তা লাভই অমরনাথ ও তাঁর দলের যোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমরা অমরনাথকে তাঁহার সাহসিকতাপূর্ণ অধিনায়কত্বের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিজয় মার্চেন্টের অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যতে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার হয়ত পুনরায় অমরনাথের উপর পড়বে। তখন আশা করি অমরনাথ তাঁর যোগ্যতার পরিচয় আরও ভালভাবে দিতে পারবেন। আমরা তাঁর ভবিষ্যত সাফল্য কামনা করি।

এই সুযোগে আমরা ভারতীয় দলকে, বিশেষ করে বিজয় হাজারী, মানকাদ, ফাদকার, অধিকারী এবং ভারতের সুযোগ্য উইকেট রক্ষক প্রবীর সেনকে তাঁদের কৃতিত্বপূর্ণ খেলার জন্য আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই সঙ্গে আমরা ভারতের সুদক্ষ ম্যানেজার শ্রীযুত পঙ্কজ গুপ্তকেও তাঁর নিখুঁত ব্যবস্থাপনার জন্য অভিনন্দিত করছি এবং তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

*　　*　　*　　*

এই মরশুমে বাংলা দেশের ক্রিকেট খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের পঙ্কজ রায় ছাড়া আর কোন খেলোয়াড়ই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। পঙ্কজ রায় হোলকারের বিপক্ষে তাঁর শতাধিক রাণ ও এই মরশুমে তাঁর সহস্র রাণ পূর্ণ করা ছাড়া গণেশ বসুর বাংলা দেশের সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। বাংলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় গণেশ বসু ল্যান্সডাউন শীল্ডের খেলায় সিটি কলেজের পক্ষে খেলে যে সর্ব্বোচ্চ রাণের রেকর্ড করেছিলেন, শ্রীমান পঙ্কজ এতদিন পরে এস, রায় মেমোরিয়াল শীল্ডের ফাইন্যাল খেলায় বিদ্যা-সাগর কলেজের পক্ষে খেলে সেই রেকর্ড ভঙ্গ করে নিজস্ব ২৮০ রাণের নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন। পঙ্কজের এই রেকর্ড আবার কবে ভঙ্গ হবে জানিনা। তবে

পঙ্কজ রায়

আশা করি শ্রীমান পঙ্কজ নিজেই অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্য কোনও ছাত্র অচিরে এই রেকর্ড ভঙ্গ করে বাংলার ক্রিকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের দানের পরিমাণ বর্দ্ধিত করবেন। শ্রীযুত বসু যখন ২৭১ রাণ করে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন তখন তাঁর ছাত্রাবস্থা ছিল। তার পর এতদিন কেটে গেছে এবং শ্রীযুত বসুও অনেক খেলায় তাঁর ব্যাটিংকৃতিত্ব দেখিয়ে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সম্মান পেয়ে এসেছেন, কিন্তু ভারতীয় দলে স্থান পাবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। পঙ্কজ গণেশবসু স্থাপিত রেকর্ড ভঙ্গ করে এবং নিজের অন্যান্য ব্যাটিং কৃতিত্বে এখন বাংলার ক্রিকেট জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকারূপে বিরাজমান। পঙ্কজেরও এখন সবে ছাত্রাবস্থা এবং তাঁর

সামনে পড়ে আছে সমুজ্জল ক্রিকেট ভবিষ্যত। আশা করি পঙ্কজ গণেশ বসুর মত বাংলার ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ না থেকে ভারতীয় টেষ্ট দলে তাঁর স্থান করে নিতে পারবেন। বাংলায় ক্রিকেটে সর্ব্বোচ্চ রাণের নূতন রেকর্ড স্থাপন করার জন্য আমরা পঙ্কজকে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্ ঃ

শীতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্পোর্টসের মরশুমও শেষ হল। ক্রিকেটের ন্যায় এ্যাথলেটিক্‌সেও বাঙালী যে কত পেছিয়ে আছে তা এই সব স্পোর্টসের ফলাফল দেখলেই বোঝা যায়। বাংলা থেকে এ পর্য্যন্ত যত পুরুষ এ্যাথ্‌লেট্ নাম করেছেন তাঁদের বেশীর ভাগই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। মহিলাদের কথা আর না বললেও চলে। আজকাল তবু বাঙালী মহিলারা

তপতী মিত্র   ফটো—জে, কে, সান্যাল

লজ্জাশীলতা কাটিয়ে স্পোর্টসে নামছেন। এর আগে যাঁরা স্পোর্টসে নাম দিতেন তাঁদের মহিলা না বলে বালিকা বলাই উচিত। কিছুদিন আগেও বাঙালী মেয়েরা একটু বয়স্কা হলেই খেলাধূলা ছেড়ে দিয়ে গৃহের কোণে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু যাঁদের খেলাধূলায় প্রতিভা আছে তাঁদের কর্তব্য খেলাধূলার মধ্য দিয়ে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা। আজকাল বাঙালী মহিলাদের মধ্যে যাঁরা স্পোর্টসে কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কুমারী তপতী মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। কুমারী তপতী সাইকেল চালনায় বাংলাদেশের মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। কুমারী তপতীর যে প্রতিভা আছে তার উপর ঠিক মত অনুশীলন যদি তিনি করে যেতে পারেন তাহলে ভবিষ্যতে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও স্পোর্টসে বাঙালী-মেয়ের দুর্নাম ঘুচিয়ে বাংলার মুখোজ্জল করতে পারবেন বলে আশা হয়।

এবারে সর্ব্বভারতীয় আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে ৩০শে জানুয়ারী যে সময়ে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সেই সময় মোহনবাগান মাঠে শেষ হয়। এবারে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়

আন্ত-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টসে ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রথম—এল, জে, ক্রীড্ (বোম্বাই), দ্বিতীয়—এ, আর, এস, দোহা (কলিকাতা), ও তৃতীয়—ডি, সিল্‌ভা (মাদ্রাজ)

ফটো—জে, কে, সান্যাল

দল প্রতিযোগিতায় যোগদান না করায় আশা হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল হয়ত চ্যাম্পিয়ানশীপ পাবে। কিন্তু বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল শেষ মুহূর্ত্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোহা ও অধিনায়ক টেরী শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন কলিকাতাকে চ্যাম্পিয়ানশীপ পাওয়াতে; কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নি। বোম্বাই কয়েক পয়েন্টে শেষের দিকে অগ্রগামী

হয়ে যায় এবং চ্যাম্পিয়ানশীপ পায়। এই স্পোর্টসে কয়েকটি বিষয়ে ষ্টার্টিং দেওয়া বিশেষ ক্রটিপূর্ণ হয়েছে। ঠিকমত ষ্টার্টিং পাওয়ার উপর প্রতিযোগিতায় বিশেষ করে দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে এবং এ রকম একটি বিশিষ্ট স্পোর্টসে এরূপ ক্রটি হওয়া অবাঞ্ছনীয়। কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে স্পোর্টসের জনপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। এই সব ছাত্রদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যত ভারতের এ্যাথ্‌লেট তৈরী হবেন যাঁদের উপর ভারতের এথ্‌লেটিক স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়িয়ে বিশ্ব-অলিম্পিক স্ট্যাণ্ডার্ডের তুল্য করার দায়িত্ব পড়বে।

* * * *

এবার বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হবে এবং এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে প্রতিযোগিদল পাঠানো স্থির হয়েছে। ভারতবর্ষ এ্যাথ্‌লেটিক্‌সে বিশ্ব-অলিম্পিকের স্ট্যাণ্ডার্ডের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে এবং এই বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রতিযোগিদল যে বিশেষ ভাল ফল দেখাতে পারবেন না তা আমরা জানি। তবে ভারতীয় প্রতিযোগিদল যে বিশ্ব-অলিম্পিকে যোগদান করতে যাচ্ছেন এইটাই আশার কথা। বড় বড় প্রতিযোগিতায় যোগদান না করলে প্রতিযোগিদের স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ে না। এই বিশ্ব-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ভারতীয় প্রতিযোগিদল তাঁদের দোষক্রটিগুলি কোথায় তা বুঝতে পারবেন বলে মনে হয় এবং আশা করি তাঁরা সেই সব ক্রটিগুলি শোধরাবার চেষ্টাও করবেন। ভারতীয় অলিম্পিকের কর্ম্মকর্তাগণও এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন বলে মনে করি। তাঁরা যে গুরুভার নিয়ে দল পাঠাচ্ছেন তার জন্য তাঁদের প্রশংসা করি এবং তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত নাটক "কালো টাকা"—২৲
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত রাজনৈতিক প্রবন্ধ-সমষ্টি "আমাদের বাঙ্গলা" (দ্বিতীয় পর্ব্ব)—১৷৷৹
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী"—৩৲
শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী ও শ্রীরঞ্জিত সিংহ প্রণীত শিশু-সাহিত্য "দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে"—১৷৷৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা" (১ম খণ্ড)—৪৷৷৹
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস (কিশোর-সংস্করণ) "সন্দীপন পাঠশালা"—২৷৹
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শেষ বসন্তে"—২৲
মৌলবী আলী আহমদ্‌ প্রণীত "বাংলা কলমী পুথির বিবরণ" (১ম ভাগ)—১৷৷৹
শ্রীমলিনা মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বাদল ধারা"—১৷৷৹
শ্রীমহীতোষ রায় চৌধুরী সম্পাদিত "মহাত্মাজীর তিরোধানে"—২৷৷৹
স্বপনবুড়ো প্রণীত ছোটদের নাটক "বিষ্ণুশর্ম্মা"—১৷৷৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বৈশাখ—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড | পঞ্চত্রিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

মহাভিক্ষুক

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি-শেষের নির্ঘোষ শুনিলাম
তোমারি কণ্ঠে মুক্তি-উষার দ্বারে,
নবীন সূর্য্য উদয়ের পথে জানাইল আহ্বান ;
শাসন-রুদ্ধ কণ্ঠ হঠাৎ ভয়বিমুক্ত হয়ে
তব জয়গানে দিক্ দিগন্তে মুক্ত করিল পাখা ;
স্বপ্ন-সফল প্রভাত বেলায়
দু'শ বছরের বন্ধন-শৃঙ্খল
ভূতলে লুটায় দেখিলাম বিস্ময়ে।

তবু বিমর্ষ জাতির জনক,
আশঙ্কা জাগে প্রলয়ের সঙ্কেতে
নয়নে তাহার তাই কি ঘনায় ব্যথায় অশ্রু কণা ?
হিমালয় হোতে কন্যাকুমারী
জাতিধর্ম্মের মিলন-মহোৎসবে
হাতে বেঁধে ফিরে রাঙা-রাখী মিলনের
সে সাধনা তার সফল হোল না
ভাঙা দেশ জুড়ে ফাটল ধরিল যেন
ফাটল ধরিল তাহারও দীর্ণ বুকে।

সেই দুখে বুঝি তুমিও রাজেন্দ্রাণী
মুকুট দণ্ড দূরে সরাইয়া অঞ্চলে ঢাকো মুখ ?
এত আশা, এত উন্মাদনার মাঝে
মুখে নাই কথা ছল ছল দুটি আঁখি ?
বৈভব তব এমনি কি হীন
দুর্ব্বার স্নেহ সেকি বিশুষ্ক আজি
তুমি পারিলে না শাসন করিতে
বিপথে ভ্রান্ত অযুত দু'র্ব্বিনীতে ?

মহাশ্রমণের তাই ডাক এল—
পথে প্রান্তরে, গ্রামে ও গ্রামান্তরে,
জনে জনে ডাকি মহাভিক্ষুক
ভিক্ষা মাগিল অগ্নিদাহের মাঝে,

প্রভাত-আলোয় সুস্নিগ্ধ শ্যামলিমা ;
ভ্রাতৃ-শোণিতে সিক্ত পথের পরে
শান্তির জল সিঞ্চন করি'
সে ফিরেছে ঘরে পরিশ্রান্ত দেহে ;
সফল হয়েছে কখনও যাত্রা
কখনও বিফল হইয়াছে আহ্বান,
তবুও যাত্রা থামেনি জীবনে তার
সেই যাত্রায় মহা যাত্রাই হোল।

তারই আহ্বানে তুমি জাগিয়াছ যদি
স্বরূপে প্রকাশো মঙ্গলময়ী মাতা,
অকাল-বোধনে জাগো জাগো শঙ্করী।
মহাজীবনের শেষ আহুতির অনঘ সম্ভাবনা
এ মহা শ্মশানে এনে দিক বরাভয়।
তব ভাণ্ডারে অমূল্য ধন
যেথানে যা' কিছু আছে
মর্ম্মের মাঝে যে মহতী বাণী
ছিল এতদিন মৌন হতাশাসে—
তাহারি কণ্ঠে দিয়েছিলে সেই বাণী
অন্তর তার দিয়েছিলে ভরি'
সেই সে রত্ন অভিনব সম্ভারে।
তিনি শুনালেন সকল-ধর্ম্ম-সংহতি-সংহিতা
নব ভারতের সেই ত নবীন গীতা
গান্ধীজি তার আমরণ উদ্গাতা।

আজি বিশ্বের উৎসুক আঁখি
ফিরেছে তাঁহারি দিকে,
ধ্যানী প্রবুদ্ধ মহাজীবনের আশা
সারা বিশ্বের আশাভরা মন
তন্ময় তাঁরি মাঝে।
মাঝে মাঝে দ্বিধা, মাঝে মাঝে তবু
জাগিতেছে সংশয়
সংশয় জাগে বিশ্ববাসীর মনে—
প্রচারিত যেথা সাম্যের বাণী
মানব-সমাজ-মিলন-মাঙ্গলিকে,
হৃত রাজ্যের উদ্ধার হোল
যেথা নিরস্ত্র মন্ত্র অহিংসার
শত্রুরও সাথে হোল নাক সংগ্রাম,
ম্লান গৌরব উজ্জ্বলতর
মহামানবের পরম আশীর্ব্বাদে
সেথায় সেদিন কেমনে না জানি

দামামা বাজিল স্বজন-বিদ্রোহের
ভ্রাতৃ রক্তে রঞ্জিত হোল
ভাইয়ের দু'খানি হাত,
সেই বিদ্রোহ মিটাতে যে জন
অনশন ব্রতে করিল মৃত্যুপণ
একক জীবনে দুরূহ তপস্যায়—
সেথায় অকস্মাৎ
তারি বুকে বিঁধে আগ্নেয়াস্ত্র
সেই সে ভাইয়েরই হাতে!
কাল চক্রের চাকা ঘুরে গেল
আসিল প্লাবন আসিল প্রলয় ঝড়
রক্তকহীন দেহ-অবসান
গোপন অস্ত্রে প্রকাশ্য দিবালোকে।

তাই মাঝে মাঝে সংশয় জাগে মনে
সন্দেহ জাগে বিশ্ববাসীরও মনে,—
অমৃত যাদের বিলাবার কথা
তারা স্বহস্তে পান করে হলাহল।
সেই হলাহলে নীলকণ্ঠের
আকণ্ঠ সুধাপানে
মৃত্যু বুঝিবা অমর হইল আজি।

মাগো, তুমি আজ ফিরায়ে পেয়েছ
দণ্ড মুকুট অসি,
ফিরায়ে পেয়েছ হুকুমনামায় রক্তের স্বাক্ষর,
রাজরাণী তুমি ফিরায়ে পেয়েছ
বিশাল হৃদয় শক্তি অপরিমেয়
তুমি এক হাতে দিবে বরাভয়
অন্য হস্তে রুধিবে আত্মদ্রোহ
স্মিত হাস্যের উজ্জ্বলতায়
দিক্ দিগন্ত আবার উঠিবে ভরি।
রত্ন-খচিত মুকুটে তোমার
অপূর্ব্ব শিরোশোভা
বিশ্বের চোখে জাগাইবে বিস্ময় ;
বিস্ময়ে মোরা চাহিয়া দেখিব
তোমার আনন 'পরে
অপরূপ হাসি ফুটিতেছে ধীরে ধীরে,
হারা-মণি তুমি ফিরায়ে পেয়েছ
ঘরে ঘরে তার জ্যোতি বিকীর্ণ হেরি'
সান্ত্বনা পাবে শোকাকুল অন্তরে

সে যে দিয়ে গেল কণ্ঠে তোমার
শ্বেত পদ্মের অক্ষয় জপমালা।

নয়নে তোমার তেমনি আবার
স্নেহ ঢল ঢল স্নিগ্ধ দৃষ্টিখানি
সবার উপরে তেমনি পড়িবে আসি।
আলো ঝলমল চন্দ্রাতপের তলে
মিলন-মেলার সঙ্গীত শুনি
দূর দূরান্ত হোতে
কাতারে কাতারে ফিরিয়া আসিবে
গৃহহারা তব কোটি কোটি সন্তান ;
তেমনি আবার দাঁড়াবে তোমারে ঘিরি'।
নদী প্রান্তর বনরাজি বেলা
নব উৎসাহে আসিবে অতিক্রমি
দিগন্ত ঘেরা স্বর্ণশস্য
সুগন্ধে তার পাঠাবে নিমন্ত্রণ,
সম্মুখে তুমি দাঁড়াবে রাজেন্দ্রাণী।
তোমার চরণে নত মস্তকে
নিবেদিবে তারা প্রাণের প্রণতি শত,
আকুল হৃদয়ে বারবার তা'রা
করিবে অন্বেষণ
শেষ আহুতির কোথা সে পীঠস্থান
ধ্যান নিমগ্ন কোথায় সে মহাযোগী—॥
সেথা কি এখনও শেষ আহুতির
শোণিত চিহ্ন আছে,
সেথা কি ফুটেছে অমরাবতীর
পারিজাত মন্দার ?

ব্যথা বেদনায় সস্ফুট অস্ফুট
অতীত দিনের কত না মর্ম্মকথা
জানাইবে তারা প্রাণের আবেগে মাগো।
মহাজীবনের বিচিত্র ইতিহাস
মর্ম্মে মর্ম্মে গাথা হয়ে রবে দেবী ;
মহা মহিমায় মহিমান্বিতা
তুমি যে রাজেন্দ্রাণী.
প্রাণ-বিনিময়ে মহান আত্মা
মহা ভিক্ষুক বিশ্বের দ্বারে দ্বারে
অঞ্জলি পাতি দাঁড়াবে স্তব্ধ হয়ে।

গান্ধী-অর্থনীতির গোড়ার কথা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুসারে ভারতের লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ, ইহার মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ সহরের অধিবাসী, বাকী ৩৩ কোটি ৯৩ লক্ষ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। আগে ভারতের গ্রামগুলি শিল্পের দিক হইতে সমৃদ্ধ ছিল, ইংরেজ রাজত্বে বিভিন্ন কারণে এই সমৃদ্ধ কুটিরশিল্প ধ্বংস হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষিজীবনের উপর উত্তরোত্তর চাপ বাড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দারিদ্র্য বাড়িয়া গিয়াছে। এখন এদেশে যন্ত্রশিল্পের যেটুকু প্রসার হইয়াছে, প্রায় সবই হইয়াছে সহরে বা সহরতলী অঞ্চলে। সুতরাং ভারতের শতকরা ৮৫ জন অধিবাসী গ্রামে বাস করিলেও কৃষিকর্ম্ম ছাড়া তাহাদের অধিকাংশেরই অন্ন সংস্থানের আর কোন উপায় নাই। এদিকে ভারতের কৃষিব্যবস্থা এখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পড়িয়া আছে। ভারতে সব কয়টি পুত্র মৃত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় বলিয়া জমি খণ্ডিত হইয়া যায় এবং কৃষিকার্য্য ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। এ দেশে কৃষিকর্ম্মও আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় না। এইভাবে কতকটা জমির দোষে এবং কতকটা ব্যবস্থার অভাবে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের গড়পড়তা উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পৃথিবীর অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশের তুলনায় অনেক কম। কাজেই ৩৪ কোটি গ্রামবাসী গ্রামে বাস করিলেও গ্রামগুলি স্বভাবতঃই তাহাদের অন্নবস্ত্র জোগাইতে পারে না। ইহার উপর আবার গরীব চাষীর ফসল উপভোগ বা বাজারজাত করার ব্যাপারে জমিদার, সমৃদ্ধ কৃষিজীবী, দালাল ও ব্যাপারীদের প্রবঞ্চনা এবং শোষণ আছে। ফলে ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী দারিদ্র্যের শেষস্তরে কোনক্রমে জীবনধারণে বাধ্য হয় এবং অভাবের লাঞ্ছনায় আত্মধিক্‌কৃতি ও হতাশাবোধের ভিতর দিয়া তাহাদের মনে নিদারুণ জড়তার সঞ্চার হয়। এই সব কারণে বিপুল সম্ভাবনাময় অজস্র শ্রমসম্পদ বৃথা নষ্ট হইয়া জাতীয় ক্ষতিতো হয়ই, তাছাড়া যাহাদের লইয়া সত্যকার দেশ, তাহাদের মানসিক অধঃপতনের ফলে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষের প্রাণশক্তিও ক্রমেই কমিয়া আসে। মুষ্টিমেয় জনকয়েক প্রখ্যাতনামা ভারতবাসীর বিরাটত্বের ঐশ্বর্য্য তাহাইয়া বহির্জগতে ভারতবর্ষ যে সম্মানেরই অধিকারী হউক, এইরূপ নিরন্ন, নিঃস্ব ও প্রাণধারণের সমস্যায় আতঙ্কগ্রস্ত ৩৪ কোটি অধিবাসীর অস্তিত্বের প্রশ্ন তাহার অগ্রগতির পথে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর যে কোন পুনর্গঠন পরিকল্পনায় এই

অসংখ্য দরিদ্র ও অসহায় ; দেশবাসীর কথাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে।

খুবই দুঃখের বিষয়, বিদেশী শাসনের আমলে ভারতবাসীর মধ্যে শ্রেণীবিভাগ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সমস্ত সম্পদের চাবিকাঠি ক্ষুদ্রাকার একটি বিত্তবান শ্রেণীর হাতে চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে যে অর্থনৈতিক পটভূমিকায় দাঁড়াইয়া আছে, সেখানে কোটি কোটি দরিদ্র-অধ্যুষিত সত্যকার ভারতবর্ষের কোন মর্য্যাদা বা অধিকার নাই। কৃষিনীতি ও তাহার সহায়ক কুটিরশিল্পের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আঞ্চলিক পরিবেশে বড় বড় যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। মালিকত্বের মায়াবাদ (magic of proprietorship) দেশের সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জনসাধারণের নিম্নতম জীবিকার দাবীটুকুও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দীর্ঘকালের একটানা দুর্নীতি ও অব্যবস্থার জন্যই যে পরিস্থিতি এতটা শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। শিল্পপতিরা এদেশে যে পণ্য উৎপাদন রীতি চালু করিয়াছেন, তাহাতে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যটুকু রক্ষার দিকেও নজর রাখা হয় না। এখানকার বাজার যদি লাভজনক মনে না হয়, ব্যক্তিগত লাভালাভের প্রশ্ন বড় করিয়া দেখিয়া পণ্যাভাবে এ দেশের লোক মরিয়া গেলেও শিল্পপতিরা অসঙ্কোচে বিদেশের বাজারে পণ্য পাঠাইয়া মুনাফা লুটিবার অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছেন। মোটের উপর, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি আর শাসন কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা বর্ত্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির চারিপাশে যে জঘন্য ধনতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিলে স্বাধীন ভারতে সাধারণ ভারতীয় নাগরিকের সত্যকার স্বাধীনতা ভোগের আশা স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যাইবে। ইংরেজ ভারতবর্ষকে আধুনিক পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করাইয়া দিবার কিছুটা গৌরব দাবী করিতে পারে সত্য, কিন্তু একথা ঠিক যে, ইংরেজের এই কীর্ত্তি ভারতের জনগণের পক্ষে সুখের কারণ না হইয়া মহাদুঃখের কারণ হইয়াছে। কৃষি ও কুটিরশিল্পের সাচ্ছল্যে ভারতের, বিশেষ করিয়া গ্রাম্য ভারতের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। ইংরেজ সেই ভিত্তি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আর্থিক স্বয়ং সম্পূর্ণতার উপযোগী বিকল্প কোন ব্যবস্থা স্থির করিয়া না দেওয়ায় আধুনিক জীবনের বাহুল্য ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধিরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের এই কীর্ত্তি হৃদয়হীন বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের স্বার্থপর বৈনিয়াবৃত্তির শোচনীয় ফল।

ভারতের জনগণের কল্যাণ সাধন মহাত্মা গান্ধীর জীবনব্রত। সন্তোষের ভিত্তিতে গ্রাম্য ভারতের দরিদ্র ও অসহায় এই ৩৪ কোটি নরনারীর অর্থ-নৈতিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির শুভেচ্ছাই গান্ধী-অর্থনীতির গোড়ার কথা।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহাতে পৃথিবীর অধিকাংশ সম্পদ স্বাভাবিকভাবে অল্পসংখ্যক এক শ্রেণীর পরশ্রমজীবীর কুক্ষীগত হইতেছে, দরিদ্র পরার্থজীবী বা শ্রমজীবীদের সত্তার স্বাতন্ত্র্য এই ব্যবস্থায় স্বীকারই করা হয় না। শ্রমিক এখানে পণ্য উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, এ ছাড়া তাহার আর কোন পরিচয় বা মর্য্যাদা নাই। মালিক নিজ স্বার্থেই তাহাকে কোনক্রমে বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ দেয়। তাহাকে তাহার শ্রমশক্তির বাড়তি ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া মুনাফাখোর মালিক সেই সম্পদে নিজের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়াইয়া তোলে। গান্ধীজী দৃঢ়কণ্ঠে এই অসঙ্গত ও অন্যায় শোষণের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অহিংসনীতি শুধু ইংরেজের সহিত যুদ্ধেই প্রযোজ্য নয়, জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সকল ভালমন্দের প্রশ্নেই তিনি এই অহিংসানীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন। যেটুকু পরিশ্রম করিলে শ্রমিকের অন্নবস্ত্রের সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত, শ্রমিককে তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে বাধ্য করা হয়। এইভাবে ধনতন্ত্রবাদের আওতায় ধনিক শ্রমিকের যে বাড়তি শ্রম বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া ফাঁপিয়া উঠে, ধনতন্ত্রবাদের ভিত্তি সেই শ্রমশক্তির বাড়তি মূল্যের শোষণকে (Exploitation of the surplus value of human labour) তিনি কুৎসিত হিংসানীতির চরম পরিচয় বলিয়াছেন। ভারতের সনাতন জীবনাদর্শ হইতেছে—জাগতিক অভাববোধকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনন্দময় পারিবারিক পরিবেশে জ্ঞান সম্প্রসারণের চেষ্টা করা। গান্ধীজী এই জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই ভারতীয় অর্থ-নীতিকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। যে শ্রেণীর মানুষই হউক, মানুষ মাত্রেই তাঁহার চোখে সম্মানের অধিকারী। এই মানব মর্য্যাদাকে কেন্দ্র করিয়া গান্ধীজীর অর্থনৈতিক আদর্শ বা পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। মানুষের পরিশ্রমকে গান্ধীজী কখনও ছোট করিয়া দেখেন নাই। দিল্লীর দরিদ্র ভাঙ্গীরা কায়িক পরিশ্রম করিয়া বহু কষ্টে জীবিকার্জ্জন করে, শেঠ ঘনশ্যামদাস বিড়লার রাজ-অট্টালিকার সহিত ভাঙ্গীদের কুটিরও মহাত্মা গান্ধীর বাসগৃহের মর্য্যাদা পাইয়াছে। গান্ধীজীর ভাষায় পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাতেও অহিংসানীতির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ইহার অর্থ, রাষ্ট্রকে এমনভাবে দেশের পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হইবে, যাহাতে পণ্য উৎপাদন পণ্যের প্রয়োজন এবং প্রকৃত ব্যবহারের সহিত সমতারক্ষা করিয়া চলে ; অর্থাৎ পণ্য যেন অবিলম্বে ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন হয় ইহা ব্যবসাদার বা মুনাফাখোরদের স্বার্থসাধনের উপায় হইয়া না উঠে। বর্ত্তমানে দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পণ্য প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও মানুষকে সেই পণ্য ব্যবহারে বঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। এইভাবে নিউইয়র্ক সহরের অসংখ্য শিশু যখন দুধের অভাবে শীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন বাজার চড়া রাখিবার জন্য মার্কিন দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা সহস্র সহস্র গ্যালন দুধ নিঃসঙ্কোচে সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। মানুষের প্রতি মানুষের এই মমতার অভাব লোভ হইতে জন্মায়। এই দুর্নীতিই গান্ধীজীর মতে হিংসাত্মক কার্য্য। শিল্প যদি কেন্দ্রীভূত না হয়, মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিল্পপতির হাতে অজস্র শিল্পপণ্য বণ্টনের অধিকার যদি না থাকে, কৃষি ও কুটীরশিল্পের সত্যকার উন্নতি যদি হয়, অর্থাৎ এককথায় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে বর্ত্তমান শোষণনীতি সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও যদি বহুলাংশে বিদূরিত

হয়, তাহা হইলে কাহারও কাহাকেও হিংসা করিবার প্রয়োজন থাকিবে না। 'থিঙ্গস টু কাম' গ্রন্থে মণীষী এইচ জি ওয়েলস যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, মানুষ আর উন্নতির নামে অস্থিরতা চায় না, এখন তাহার প্রয়োজন শান্তির, প্রয়োজন বিশ্রামের। জীবনের উদ্দেশ্য হইল সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকা। ওয়েলস তাঁহার 'দি রাইটস্ অফ ম্যান' গ্রন্থেও যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অশান্ত জীবনের প্রতি অসংখ্য মানুষের নিদারুণ বীতরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী মানুষের এই—সুখে স্বচ্ছন্দে সহজভাবে জীবনযাপন বড় করিয়া দেখিয়াছেন। এইভাবে যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে, পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও তাহা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধনীরা প্রত্যক্ষও পরোক্ষ উপায়ে সর্ব্বসাধারণের চলাফেরা ও কথাবলার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করে; সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কঠোর হয় বলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা কতকটা বিসর্জ্জন দিতে হয়ই, কিন্তু গান্ধীজীর পরিকল্পিত রামরাজ্যে শক্তিমানের শোষণের কোন সুযোগ না থাকায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা রাষ্ট্রের পক্ষে কোন আশঙ্কারই কারণ হয় না। রামরাজ্যে কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে সকলকেই অন্নসংস্থান করিতে হইবে, সকলের প্রয়োজনই যথাসম্ভব বৈচিত্র্যহীন ও সীমাবদ্ধ হইবে, পার্থিব সম্পদ-প্রাচুর্য্যের চেয়ে আত্মিক বিকাশ ও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্টিবোধ অনেক বেশী মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করিয়া লইতে একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন ও শিক্ষিত মন চাই। লোভ একপ্রকার পশুপ্রবৃত্তি, ইহা ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়। ব্যক্তিজীবনের ক্ষয়কীট স্বরূপ এই লোভকে কেন্দ্রীভূত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্যই গান্ধীজী কতকগুলি গ্রামকে এক একটি একক হিসাবে ধরিয়া লইয়া সেই সব গ্রামের পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা এবং সমগ্রভাবে গ্রামসঙ্ঘ পরিচালনার ভার জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের হাতে ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছেন। যন্ত্রশিল্প ধনতন্ত্র-বাদের পোষক, গান্ধীজী ভারতের মত জনবহুল দেশে সমতার ভিত্তিতে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের জন্য যন্ত্রশিল্পের সঙ্কোচসাধন করিয়া কুটির-শিল্পের সম্প্রসারণ কামনা করেন। গান্ধীজী বারবার বলিয়াছেন, শিল্প বা অর্থ দুইই মানুষের জন্য, মানুষ শিল্প অথবা অর্থের চেয়ে অনেক বড়। এই জন্য ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর সহজ সুন্দর জীবনধারা অব্যাহত রাখিতে গ্রামোন্নয়ন কুটিরশিল্পের প্রসার, কৃষির উন্নতি প্রভৃতিকে গান্ধীজী তাঁহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া বা ক্যানাডার মত যে সব জনবিরল দেশে বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের সমস্যা নাই, সেখানে যন্ত্রশিল্পের প্রসার গান্ধীজীও অপছন্দ করেন নাই। ভারতে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থান একটা প্রকাণ্ড জটিল সমস্যা। (হরিজন, ১৬-১১-১৯৩৪) কাজেই ভারতের সাড়ে ছ লক্ষাধিক গ্রামকে আর্থিক হিসাবে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে তিনি খাদি আন্দোলনের ন্যায় কুটিরশিল্পের প্রসারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কৃষিজীবী ভারত অন্ন উৎপাদন করে, কিন্তু অন্ন ছাড়া মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি জিনিষ আছে। এই সব জিনিষের মধ্যে বস্ত্রের স্থান সর্ব্বাগ্রে। এদেশে চাষী গৌণবৃত্তির অভাবে বৎসরে অন্ততঃ ছয়মাসকাল বেকার হইয়া বসিয়া কাটায়। কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণ হইলে ইহাদের এই দুর্ব্বহ বেকারবৃত্তির অনেকটা শেষ হয় এবং ইহারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলভাবে বাঁচিবার সুযোগ পায়। এই শিল্পপ্রসার অবশ্য ব্যয় ও আয়োজনসাপেক্ষ এবং ইহার প্রাথমিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতে হইবে। কুটিরশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে সহজভাবে বহু প্রসারিত হইবার সুযোগ আছে সূতা কাটা ও কাপড় বোনার। অর্থকরী দিক ছাড়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতার আদর্শের দিক হইতে কৃষিজীবী ভারতে খাদি আন্দোলনের বিপুল সার্থকতা আছে। গ্রাম্য ভারতের অধিবাসীরা অবসর সময়ে তুলা উৎপাদনের, সূতা কাটার এবং কাপড় বোনার চেষ্টা করিলে তাহাদের অন্নের ও বস্ত্রের অনেকটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এদেশের লোকের জীবনযাত্রার যে মান, তাহাতে বৎসরে মাথাপিছু কুড়ি গজ করিয়া কাপড় হইলেই উপস্থিত মোটামুটি চলিয়া যাইবে। মিলের কাপড়ের চেয়ে খদ্দরের কাপড় কিছু কমই লাগে। গ্রাম্য ভারতের ½ অংশ লোকও যদি রুগ্ন, অক্ষম, বৃদ্ধ বা শিশু হয়, তাহা হইলেও বাকি লোক দৈনিক মাত্র একঘণ্টা হিসাবে বৎসরের এগারো মাস বস্ত্রোৎপাদনের জন্য পরিশ্রম করিলে অর্দ্ধেক গ্রামের সব লোকের সম্বৎসরের কাপড়ের সমস্যা মিটিয়া যাইতে পারে। গান্ধীজীর প্রীতি-ভাজন শিষ্য ও ওয়ার্দ্ধার সেকসারিয়া বাণিজ্য কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমান নারায়ণ অগ্রবাল তাঁহার 'The Gandhian Plan' গ্রন্থে (৭৫ পৃঃ) নানা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব দিয়া এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন। খাদি ব্যবহার জীবনযাত্রার সারল্যেরও পরিচায়ক। সুতরাং যদি খাদি উৎপাদনের ব্যাপারে গ্রামবাসী যত্নবান হয়, তাহা হইলে খাদি শুধু তাহাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিবে না, উদ্বৃত্ত খাদি বিক্রয় করিয়া তাহারা দারিদ্র্যপূর্ণ কৃষিজীবনকেও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল করিয়া তুলিতে পারিবে।

গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র সাধারণ ভারতবাসীর কথা আলোচনার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের কথাগুলি বলা হইল। সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন বিচার করিবার সময় গান্ধীজী বৃহদাকার মূলশিল্প এমন কি অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করেন নাই। ভারতবাসী সম্পর্কে যে সব কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ গ্রাম্য ভারতের অধিবাসীদের স্বার্থের বা প্রয়োজনের কথা। ভারতের গ্রামগুলির অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দ্দশা ও নোংরামি গান্ধীজীকে অবিরাম ব্যথিত করিয়াছে। গান্ধীজী বিশ্বাস করিতেন—গ্রামবাসীদের বা গ্রামের অবস্থা এতটা খারাপ হইবার কোন কারণ নাই, সুযোগের অভাবে তাহাদের সমৃদ্ধি সম্ভব হয় না। 'কনষ্ট্রাকটিভ্ প্রোগ্রাম' (গঠনমূলক পরিকল্পনা) পুস্তকে গ্রামের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে শ্রমশক্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তির যে বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে গ্রামের নোংরামি তাহারই অনিবার্য্য ফল। তাঁহার মতে কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যদি গ্রামের লোক হইত (এইরূপ হওয়াই আদর্শের দিক হইতে

স্বাভাবিক ছিল) এবং তাহারা গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্ম চেষ্টা করিত, তাহা হইলে গ্রামগুলির অবস্থা বর্ত্তমানের ন্যায় শোচনীয় হইত না।

কেহ কেহ অর্থনীতির দিক হইতে ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক এবং শ্রেণী-সংগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠিত শ্রমিকসঙ্ঘের শত্রু হিসাবে গান্ধীজীর সমালোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট লেখক শ্রীযুক্ত রজনী পাম দত্তও তাঁহার India-to-day গ্রন্থে এই দৃষ্টিকোণ হইতেই প্রকাশ্যভাবে গান্ধীজীর নিন্দা করিয়াছেন। দলগত স্বার্থসাধনের হিসাবে এইরূপ অসংযত ও অসঙ্গত উক্তি করিয়া হয়তো এই সব লোক লাভবান হইয়াছেন, কিন্তু গান্ধীজীর জীবনাদর্শ, প্রাত্যহিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সাময়িকভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগও যাঁহাদের হইয়াছে,তাঁহারাই গান্ধীজীর ন্যায় দীনবন্ধুর সম্বন্ধে এইরূপ বিরুদ্ধ মন্তব্যের অযৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। গান্ধীজী দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, বন্ধু ছিলেন অসহায় হতভাগ্যদের। দুঃখী দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের নিকট-সাহচর্য্যে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়া গিয়াছে। কথায়, কাজে বা জীবনযাপন প্রণালীতে কখনও তিনি নিঃস্ব ও অসহায় দেশবাসীকে পরিত্যাগ করেন নাই। তবে গান্ধীজী বৈবর্ত্তনিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই দেশে সত্যকার কিষাণ-মজদুর প্রজারাজের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাঁহাকে কখনও দেশের সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আকস্মিক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়নের জন্ম উত্তেজিত হইতে দেখা যায় নাই। ধনীদের সম্পদ সঞ্চয়ের তিনি সব সময়েই ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, ধনীরা বর্ত্তমানের মত শোষণ বৃত্তির সাহায্যে ধন সঞ্চয় করিয়া গেলে একদিন না একদিন সর্ব্বহারা শোষিতের দল ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিবে। স্বাধীন ভারতে ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ একটি দিনের জন্যও স্থায়ী হইবে না, ইহাই ছিল গান্ধীজীর স্বপ্ন।*

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর গান্ধীজীর মৃত্যু হইয়াছে এবং মোটামুটি গান্ধীজীর নির্দ্দিষ্ট পথেই এখনও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের শাসনযন্ত্র পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃত কিষাণ—মজদুর প্রজারাজ-বা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গান্ধীজীর সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক করিতে রাষ্ট্রকর্ণধারগণ অতঃপর কতটুকু কি করেন, তাহা এখন সাগ্রহে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

* The contrast between the palaces of New Delhi and the miserable hovels of the labouring class can not last for one day in a free India in which the poor will enjoy the same power as the richest in the land.

Gandhiji.—Constructive Programme. P I8.

সত্য ও অহিংসার মহাসাধক

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

সত্য শব্দের উৎপত্তি হ'ল সৎ শব্দ থেকে, যার অর্থ—অস্তিত্বশীল, বিদ্যমান বা নিত্য। একমাত্র সত্যই শুধু চিরন্তন, সত্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না, সমস্তই মিথ্যা। তাই সত্যই হ'ল ঈশ্বর বা ঈশ্বরই হ'ল সত্য। তবে ঈশ্বর সত্য হ'লেও, তিনি সত্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু এবং তাঁর নামও অসংখ্য। মহাত্মা গান্ধী এই সত্যরূপী ভগবান সম্বন্ধে তাঁর আত্ম-কথায় তাই লিখেছেন—"পরমেশ্বরের বিভূতি অগণিত, তাঁর সংজ্ঞাও অগণিত। এই প্রকাশ আমাকে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত করে, ক্ষণেকের জন্ম মুগ্ধ করে। কিন্তু আমি সত্যরূপী পরমেশ্বরেরই পূজারী। এই এক সত্যই আছে, আর অন্য সকলই মিথ্যা।" এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন যে, এই সত্যলাভের জন্ম তিনি তাঁর প্রিয় হতেও যা প্রিয় তাকেও ত্যাগ করতে এবং সত্যসন্ধানরূপ যজ্ঞে তাঁর শরীরকে হোম করতেও তিনি প্রস্তুত। এই সত্যকেই তিনি আজীবন তাঁর পথপ্রদর্শক প্রদীপ জেনে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই সত্য সন্ধানের পথে তিনি চলেছিলেন বলেই, তাঁর ভয়ঙ্কর ভুলও তাঁর কাছে অতি ছোট বলে মনে হয়েছে এবং এই পথের জন্ম তিনি ভুল করেও বেঁচে গেছেন। এই সত্য সম্বন্ধে দিনের পর দিন তাঁর এই বিশ্বাসই বেড়ে গিয়েছিল যে, "কেবল সত্যই আছে, উহা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোনও বস্তু পৃথিবীতে নাই।"

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অতি শৈশবকাল হ'তেই এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাল্যে তিনি এক নাটক কোম্পানীতে একবার হরিশ্চন্দ্র নাটক দেখেছিলেন। এই নাটকের উপাখ্যান তাঁর বালক মনের উপরেই এক গভীর ছাপ রেখে দেয়। নাটক দেখে অনবরতই তিনি নিজের মনে এই প্রশ্নই করেছিলেন যে, সকলে হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যবাদী হয় না কেন? তিনি নিজে সেই বয়সেই স্থির করে নিয়েছিলেন যে, হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়ে তাঁরই মতন তিনিও সত্য পালন করবেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই সত্যেরই সেবায় জীবন ব্যয় করে গেছেন। এর জন্য তিনি অশেষ লাঞ্ছনা, অপমান ও যন্ত্রণা ভোগ করতে, সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারে, এমন কি মৃত্যুর ভয়েও পশ্চাৎ-পদ হন নি। তিনি বলতেন—মানুষকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে আমি আর ভগবানের বিরোধিতা করতে পারি না। তাই তিনি সর্বধর্ম নির্বিশেষে, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব মানুষ মাত্রেরই সেবায় মধ্য দিয়ে ঈশ্বর

সেবায় যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্য থেকে বিচ্যুত হলেন না বলেই দিল্লী সহরে তাঁকে জীবন দিতে হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী যে আত্ম-কথা লিখেছেন, তার নাম দিয়েছেন তিনি "সত্যের প্রয়োগ।" নিজের জীবনকে তিনি সত্যের কষ্টিপাথরে ফেলে যাচাই করেছেন এবং তাতে তিনি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছেন, তারই প্রকাশ দেখিয়েছেন এই আত্মকথায়। তিনি তাঁর দোষের কোনও কথা গোপন না ক'রে, অকপটে সমস্তই মেলে ধরেছেন পাঠকের কাছে। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"সত্যরূপ শাস্ত্রের পরীক্ষা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য, লোকটা কেমন—তাহা বর্ণনা করার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নাই।"

মহাত্মাজী রাজনীতিতে যে অভিনব আন্দোলনের প্রবর্তন করেন, তারও নাম দেন "সত্যাগ্রহ"। কারণ তিনি বুঝেছিলেন—একমাত্র সত্য যেমন শাশ্বত, তেমনি সত্যের জয়ও অবধারিত এবং সে অপরাজেয়। মহাত্মার এই আন্দোলন ও এর মহান্ সাফল্য পৃথিবীর ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় উজ্জ্বল অধ্যায়।

মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সুদীর্ঘ কুড়িটা বছর গৌরবময় সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়ে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ফিরে এলেন ভারতে। পর বৎসর আমেদাবাদ শহরের নিকটে সবরমতী নদীর তীরে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন, তারও নাম দিলেন—সত্যাগ্রহ আশ্রম। আর এই আশ্রমবাসীদের জন্য তিনি যে একাদশ ব্রতপালনের নির্দেশ দিলেন, তার মধ্যেও বিশেষ স্থান রইল "সত্যে"র।

সত্য-ব্রত পালনের মধ্যে মহাত্মাজী কেবল সত্যভাষণকে বুঝেছিলেন না। সত্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"এই সত্য স্থূল সত্যবাদিতা নহে। ইহা যেমন বাক্য তেমনি বিচার সম্বন্ধেও সত্য। ইহা কেবল আমাদের কল্পনা লোকের সত্য নহে, পরন্তু স্বতন্ত্র স্বাধীন চিরন্তন সত্য অর্থাৎ পরমেশ্বর।" তিনি বলতেন—শুধু বাক্যে নয়, কাজে এমন কি চিন্তায়ও সত্যের স্থান থাকা চাই। তিনি আরও বলতেন যে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই যে সত্যের প্রয়োগ হবে তা নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রকৃষ্ট প্রয়োগ করতে হবে এবং সেই সত্য পালনের জন্য জীবনপণে প্রস্তুত থাকতে হবে। একথাও অবশ্য তিনি বলেছেন যে, সত্য বলতে গিয়ে অনেক সময়ে অপ্রিয় সত্যেরও সম্মুখীন হতে হয়। সে ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব বিনয়ের সঙ্গেই তার প্রকাশ করা উচিত। কারণ সত্য যে তাকে প্রকাশ করতেই হবে, তাকে ত আর বিকৃত করা চলে না। তবে কাকেও ইচ্ছাপূর্বক আঘাত দেবার উদ্দেশ্য না নিয়ে অপ্রিয় সত্য বলার মধ্যেও যে কোন দোষ নেই একথা বলা যেতে পারে।

সত্যের যাঁরা পূজারী তাঁদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—সত্যের অনুসন্ধান যে করতে চায় তাকে ধূলিকণার চেয়েও নিচু হতে হবে। জগৎ ধূলিকণাকে পিষে ফেলে, কিন্তু সত্যের পূজারী যদি এমন দীন না হয় যে, ধূলিকণা তাকে পিষে ফেলতে পারে, তবে তার পক্ষে স্বতন্ত্র সত্যের দর্শন দুর্লভ। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। খৃষ্টান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মেও এ বিষয়ের প্রমাণ আছে।

পৃথিবীতে ধর্মের পার্থক্য থাকলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি সর্বধর্মেই এই সত্যের প্রয়োগ ও প্রভাব অপরিসীম। এমন কি যারা নাস্তিক তারাও সত্যের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। পৃথিবীর সকল ধর্মগুরুই তাঁদের ধর্মে তাই সত্যের প্রচার করেছেন। হিন্দুধর্মে ত সত্যম্, শিবম্ ও সুন্দরম্ বলে ব্যাখ্যাই করা হয়েছে ভগবানের। তাছাড়া সত্যের প্রয়োগ ও জয়গানে হিন্দুশাস্ত্র ভরপুর ; খৃষ্টধর্মের প্রচারক যীশু তাঁর ভক্তদের বলেছিলেন—Ye shall know the Truth and the Truth shall make you free (John viii 32) তোমরা সত্যকে জানবে, তাহলে সত্যই তোমাদের মুক্তি দেবে। যীশু সত্য সম্বন্ধে আরও বলেছিলেন যে, To this end was I born and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. (John xviii 37) এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মেছি এবং এই কারণেই আমি পৃথিবীতে নেমে এসেছি যে, আমি সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করব।

বুদ্ধও তাঁর ভক্তদের আত্মশুদ্ধির জন্য যে "আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ" বা আট প্রকার পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তার মধ্যেও সত্য অন্যতম।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখের হরিজনে তাঁর নিজের জীবনে সত্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—পৃথিবীকে আমি নূতন কিছুই শেখাই নি ; আমি আমার নিজস্ব উপায়ে, আমার দৈনন্দিন জীবনে এবং আমার বহুবিধ সমস্যায় শাশ্বত সত্যের প্রয়োগ করেছি মাত্র। সত্য ও অহিংসা এরা পৃথিবীতে আদিম পর্বতের ন্যায়ই সুপ্রাচীন। আমি যা কিছু করেছি, যতটা সম্ভব এদের মধ্য দিয়েই করার চেষ্টা করেছি।

মহাত্মা গান্ধী বলতেন—সত্য উপলব্ধি বা দর্শনের প্রকৃষ্ট পথ হ'ল অহিংস সাধনায়। কেন না অহিংসা বর্জিত সত্য, সে ত সত্যই নয়, সে মিথ্যারই সামিল। মহাত্মা গান্ধী আচার্য কৃপালনী লিখিত "দি গান্ধীয়ান ওয়ে" পুস্তকের মুখবন্ধে নিজে লিখেছেন যে, তিনি সত্যের সন্ধানে থাকার কালে অহিংসারূপ রত্নকে লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসাকেও তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। অহিংসা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—সকল ধর্মেরই প্রাণকেন্দ্র হ'ল অহিংসা এবং এই অহিংসার পরিণতিই হচ্ছে সত্য লাভ। তাই অহিংসাও সত্য ছাড়া কিছু নয়। তিনি উপমা দিয়ে বলতেন—সত্য আর অহিংসা এরা যেন, একটা ছাপহীন মসৃণ ধাতু নির্মিত থালার এপিঠ আর ওপিঠ, এবং এরা এমনি একই প্রকারের যে এদের পৃথক করা কঠিন। মহাত্মার কাছে তাই সত্য ও অহিংসা একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, দুটা সম্পূর্ণ ভিন্ন নয় মোটেই। তাঁর কাছে সত্য ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং অহিংসা ছিল তারই পথ।

এই যে অহিংসা, মহাত্মাজীর মতে এর মূলসূত্র হ'ল প্রেম। অহিংসার শব্দগত অর্থ যে, শুধু হিংসা না করা, এই অর্থে তিনি অহিংসা গ্রহণ করেন নি। কেননা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, বেঁচে থাকার জন্য মানুষ কিছু না কিছু হিংসা করতে বাধ্য। তাছাড়া সে বাঁচতে পারে না। তাই মহাত্মাজী বলেছেন—জীবনধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয়

হিংসাকে ত্যাগ করাই হ'ল অহিংসা। চিন্তা, বাক্য এবং কাজের দ্বারায় কাকেও অপ্রেমবশত কষ্ট না দেওয়া—সেই ত অহিংসা। মহাত্মাজী বলতেন—হিংসা এমন কি হত্যাকাণ্ডও, অনেক সময় অহিংসারই সামিল, অবশ্য যদি সেটা প্রেমপ্রসূত হয়। এর উদাহরণস্বরূপ ইয়ং ইণ্ডিয়াতে তিনি এক সময়ে লিখেছিলেন—Should my child be attacked by rabies and there was no helpful remedy to relieve his agony I would consider it my duty to take his life." আমার কোন সন্তান যদি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয় এবং তার যন্ত্রণা উপশমের ও জীবনের যদি আর কোনও উপায় না থাকে, তখন তার জীবন নাশ করাই আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

এক সময়ে মহাত্মার আশ্রমে একটি বাছুর এক কঠিন রোগে পড়ে এবং তার জীবনের কোন লক্ষণ থাকে না, অথচ বেচারা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। তখন মহাত্মা বাছুরটির শরীরে বিষের প্রয়োগ ক'রে তাকে যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এইভাবের প্রেমমূলক হিংসা বা হত্যাকে মহাত্মা আদৌ দোষের বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে যাদের নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে অথচ অসহ্য যন্ত্রণার কষ্ট পাচ্ছে, তখন তাদের শান্তিময় মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দেওয়াটা ঠিক হিংসা নয়।

এছাড়া বিপদকালীন কর্তব্য হিসাবেও মহাত্মা গান্ধী কয়েকটি ক্ষেত্রে হিংসাকে সমর্থন করেছেন। যেমন—সমাজের ক্ষতিকারক পাগলা কুকুর, প্লেগের বীজাণু বাহক ইঁদুর, ম্যালেরিয়াবাহী মশা, দংশনোদ্যত সাপ, আক্রমণ করতে আসছে এমন যে বাঘ প্রভৃতিকেও তিনি হত্যা করার কথা বলেছেন। এমন কি মানুষের ক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়ে তিনি বলেছেন—যদি এরূপ হয় যে, একজন হত্যাকারী কোনও লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, অথচ সেই হত্যাকারীকে কোনওরূপে প্রতিনিবৃত্ত করা যাচ্ছে না, তখন তাকে হত্যাকরা ছাড়া উপায় কি? এ ছাড়া তিনি আরও বলেছেন যে, যদি হনুমানে কিংবা বাঁদরে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করতে থাকে, তখন ভয় দেখিয়ে বা হিংসার পথ অবলম্বন করে, তাদের ক্ষেত থেকে তাড়াতে হবে এবং কোন পাগল ব্যক্তি যদি পাগলামি করতে থাকে, তখন কোন কোন ক্ষেত্রে তার সঙ্গে হিংসার পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হবে।

এই সব কাজগুলোকে মহাত্মা ঠিক হিংসার মধ্যে ধরেন নি। কারণ এর মধ্যে কোন মন্দের গন্ধ তিনি পান নাই, বরং মঙ্গলেরই সন্ধান রয়েছে বলে এদের সমর্থন করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী তাই বলেছেন যে, অহিংসার মূল সূত্রটা হবে ভালবাসা। এইদিক থেকে অহিংসাপন্থীর কোন শত্রুই থাকতে পারে না, কারণ যাঁরা তার শত্রুতা করতে চেষ্টা করবে, তিনি তাঁদের মিত্রে পরিণত করবেন ভালবাসার দ্বারায়। মহাত্মা বলতেন—শত্রুকে আঘাতের বদলে আঘাত না হেনে, তাকে প্রেম ও ভালবাসার দ্বারাতেই জয় করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনব্যাপী অহিংসা সাধনার সকল ক্ষেত্রেই প্রেমের প্রয়োগ দেখিয়ে গিয়েছেন। তিনি সারা জীবন ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে অশেষ নির্যাতন ভোগ করলেও, ইংরাজকে তিনি কোনদিনই শত্রু ভাবেন নি, বরাবরই তাঁদের মিত্র বলে গেছেন। জীবনে বহু লোকের হাতে তিনি অপমান, কিল, চড়, পদাঘাত ও লাঠি খেয়েছেন, কিন্তু কারও উপরে তিনি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন নি, সকলকেই ক্ষমা-সুন্দর হাসিতে মার্জনা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সেদিন ভারতের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ঘোর দুর্দিনে তিনি যখন শান্তি অভিযানে ধ্যানস্থ ছিলেন, তখন সঙ্কীর্ণ মনোভাব নিয়ে যারা নানাভাবে তাঁর উপরে দোষারোপ করেছিল তখনও তাঁকে একথা বলতে শুনেছি—যাঁরা আমার উপরে দোষারোপ করেন, তাঁদের হাতে যদি আমার মৃত্যুও হয় তবু যেন তাঁদের অমঙ্গল কামনা না করি, ভগবান আমাকে এরূপ মানসিক শক্তি দিন।

মহাত্মার মৃত্যুর ১০দিন পূর্বে নয়া দিল্লীতে তাঁর প্রার্থনা সভায় এক উগ্র-সাম্প্রদায়িক উন্মাদ মহাত্মাকে লক্ষ্য ক'রে বোমা নিক্ষেপ করেছিল। তার সম্পর্কে মহাত্মা পরদিন তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেছিলেন—যেই এরূপ করে থাক, আমি তার মঙ্গল কামনা করছি। পুলিশ ইনেসপেক্টর জেনারেলকে এ কথাও আমি বলে দিয়েছি যে, যুবকটিকে যেন কোন রকম উৎপীড়ন করা না হয়। তাকে বুঝিয়ে সৎ পথে আনার চেষ্টা করাই উচিত।

তার পর মৃত্যুর দিনে মহাত্মা আততায়ীর হস্তে গুলিবিদ্ধ হ'য়ে তাঁর ইষ্টদেবতা রামকে শুধু ডাকার সময় ছাড়া, সংজ্ঞাহীন না হয়ে আর একটু যদি সময় পেতেন, তাহলে যীশু যেমন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকালে তাঁর পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে তাঁর হত্যাকারীদের জন্য প্রার্থনা করে বলেছিলেন—"Father forgive them, for they know not what they do." পিতা, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে—মহাত্মা গান্ধীও তেমনি মৃত্যুকালে তাঁর আততায়ীর জন্য যীশুর মত শুধু ক্ষমাই চাইতেন না, অধিকন্তু তার মঙ্গলও কামনা করে যেতেন।

আজ হতে প্রায় তিন হাজার বছর আগে ভগবান বুদ্ধ এমনিভাবেই ভারতের পুণ্যভূমে প্রচার করেছিলেন—

ন হি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।

ইহ জগতে শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা কখনই দমন করা যায় না। পরন্তু শত্রুতা শূন্যতা (অক্রোধ) দ্বারাই একে দমন করা যায়। ইহাই সনাতন ধর্ম।

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে;
জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করবে।

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলতেন—ডাকাত ও হত্যাকারীরা যদি করাত দিয়েও তোমাদের শরীর ক্ষত বিক্ষত করতে থাকে এবং তাতে যদি

তোমরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠ, তা হ'লে বুঝব, তোমরা আমার আদেশ ঠিক মত পালন করছ না।"

বুদ্ধের মহানির্বাণের বহু বৎসর পরে ভগবানের প্রিয় পুত্র, মানুষের ত্রাণকর্তা, ক্ষমার অবতার যীশু এই পৃথিবীতে নেমে এসে আর একবার প্রচার করেছিলেন—

"Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye and a tooth for a tooth.

"But I say unto you, that you resist not evil ; but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also.

"And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also.

"And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain."

তোমরা শুনে আসছ, বলা হয়ে থাকে যে, একটা চোখের বদলে একটা চোখ এবং একটা দাঁতের বদলে একটা দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলব,—মন্দে প্রতিরোধ ক'রো না, এবং কেহ যদি তোমার ডান গালে চড় দেয়, তবে তাকে অপর গালটিও পেতে দিও।

কেহ যদি তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করে এবং তোমার কোটটি নিয়ে যায়—তা হলে তাকে তোমার চাপকানটাও দিয়ে দিও।

কেহ যদি তোমাকে এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তাহলে তার সঙ্গে তুমি দু মাইল যেও।

যীশুর এই ক্ষমাদর্শ প্রচারের বহু শত বৎসর পরে, বুদ্ধ ও যীশুর বাণীসমূহ যেন একটি দেহে রূপ পরিগ্রহ ক'রে আবার এই ধরণীর ধূলায় "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী এসে অবতীর্ণ হলেন এই পাপপঙ্কিল পৃথিবীতে। সত্যরূপী ভগবানের মহাসাধক, অহিংসা ও ক্ষমার পরম পূজারী, দেবোপম এই মহামানব আজিকার এই হিংসা ও মিথ্যাময় পৃথিবীর ঘনান্ধকার পথকে, সত্য ও অহিংসার অনির্বাণ মশাল হস্তে আলোকোজ্জ্বল ক'রে গেলেন, আর একবার নতুন ক'রে।

গান্ধী-স্মরণে

শ্রীমতিলাল দাস

ভক্ত যারা, ভাবুক যারা, শুনেছি ত তাদের বাণী
যুগে যুগে আর্ত্ত ধরায় বিধাতারি বার্ত্তাবহ
আসেন নামি বসুন্ধরায় রক্ষাকবচ বক্ষে আনি
গান্ধী ছিলেন সে দূত ধরার লও প্রণতি আজকে লহ।
জীবনে যা হয়নি সফল মরণে তা আজকে হবে
জগৎ ছেয়ে প্রাণে প্রাণে জ্বলবে তোমার প্রেমের গীতা
মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ ! সবাই তোমার মন্ত্র লবে।
আসবে ফিরে আবার ঘরে হারিয়ে যাওয়া আশার সীতা।
দেব মানবের জন্ম হবে, তোমার মহৎ সাধনাতে,
পশু মানুষ উঠবে জাগি দৃপ্ত তব মন্ত্র শুনি
জগৎ জুড়ি যজ্ঞ সুরু সে মহিমার কামনাতে
মৃত্যু তোমার হয়নি ঋষি, মরণজয়ী তুমি গুণী।
খৃষ্ট বুদ্ধ পারেন নি যা পারেন নি স্রষ্টা পার্থগুরু
এবার তোমার আত্মবলি করবে তাহা করবে সাধন
মহামিলন প্রেম যাগের বোধন আজি হবে সুরু
শত যুগের সঞ্চিত সব কাটবে আঁধার ঘুচবে বাঁধন।
প্রণাম লহ জগৎ গুরু, আশীষ দেহ জগৎজনে
অভিশপ্ত মানুষেরে রক্ষা কর অভয় দানে
তোমার জীবন গীতাখানি নেব জানি মৃত্যুপণে
জগৎ প্লাবি জাগবে জ্যোতি সত্য প্রেমের উছল বানে।

করিও মার্জ্জনা

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

জীবনের প্রতি কর্ম্মে তোমারে করেছি অস্বীকার
কেন মিথ্যা শোকোচ্ছ্বাস তবে, কেন এই বঞ্চনা আত্মার ?
হিংসা পাপে আচ্ছন্ন অন্তর মানুষেরে বাসি নাই ভালো,
বিষায়েছি স্বদেশের বায়ু, নিভায়েছি বিধাতার আলো।
তুমি যে দিয়াছ ডাক বারে বারে মোদের দুয়ারে
দেই নাই কোন সাড়া, বারে বারে দিয়েছি ফিরায়ে।
একেলা কণ্টকভরা পথে চলে গেছ বান্ধববিহীন
মানুষেরে করেছ বিশ্বাস হৃদয় রেখেছ শঙ্কাহীন।

তুমি ছিলে অমানিশা মাঝে একমাত্র ধূম্রহীন শিখা
তোমার অহিংসা বাণী একমাত্র আশার বর্ত্তিকা।
নিভে গেল সে মঙ্গলদীপ দানবের বিষাক্ত ফুৎকারে
নিপীড়িত হারালো আশ্বাস আকাশ ভরিল হাহাকারে।
সে দানব সে কি পর ? সে আমার, সে সবার পাপ
মোদের পুঞ্জীত হিংসা রচিয়াছে এই অভিশাপ।
নিতে হবে প্রতি জনে জনে এই মহাপাতকের ভাগ
ঘুচাইতে হবে এ কালিমা, ক্ষমাহীন কলঙ্কের দাগ।

হে অমর মুক্ত আত্মা, আমাদের করিও মার্জ্জনা
অন্তরের দ্বেষ করো দূর, দূর করো সব আবর্জ্জনা।

গান্ধীজীর প্রয়াণ

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

যিশুখৃষ্টের মতই গান্ধীজীর জীবনান্ত হইল। প্রভেদ এই যে, যিশুখৃষ্টকে ভগবান যে শারীরিক ক্লেশের ভিতর দিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়েন, গান্ধীজীর বেলা তাহা করেন নাই। গান্ধীজীকে অকস্মাৎ লইয়া যান এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পর্য্যন্ত অবকাশ দেন না।

লোক জিজ্ঞাসা করে—কে তাঁহাকে গুলি করিয়াছে—সে ধরা পড়িয়াছে কিনা, কোন দেশের লোক, ইত্যাদি। আক্রমণকারী ধরা পড়া না পড়ায় আমাদের আর কোন প্রয়োজন? তবে সে যে হিন্দু এইটুকু জানার বড়ই মূল্য আছে। ভারতবর্ষের হিন্দুদের আত্মপরীক্ষার পক্ষে উহা সহায়ক হইবে।

গান্ধীজীকে কোনও মানুষ হত্যা করিয়াছে ইহা স্বীকার করিতে পারি না ও পারিব না। মরণ বাঁচন ঈশ্বরের হাতে। যখন গান্ধীজীকে এই শরীরে রাখার প্রয়োজন শেষ হইল, তখনই তিনি তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন—গান্ধীজীও 'হে রাম' বলিয়া আনন্দ-লোকে প্রয়াণ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে লইয়াছেন। যাহার হাত দিয়া লইয়াছেন—তাহার পাপ পূর্ণ হইয়াছিল, সে যে সমাজের, সে সমাজের পাপ পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই ঈশ্বর এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাবার বেলায় গান্ধীজীর জীবন ও মৃত্যু সার্থক করাইয়া ভগবান তাঁহাকে লইয়াছেন।

গান্ধীজী সর্বকালের সর্বদেশের সর্বসম্প্রদায়ের নিজস্ব লোক। হিন্দুর হাতে তাঁহার পবিত্র শরীর গুলিবিদ্ধ করিয়া ঈশ্বর প্রমাণ করাইয়া দিলেন যে গান্ধীজী মুসলমানদের কত হিতকারী ছিলেন। সভারকরীয় ব্যাঘ্রোচিত মনোবৃত্তি দেশের ভিতর কি প্রতিক্রিয়া করিতেছে তাহারও প্রমাণ হইয়া গেল। বহু বর্ষ পূর্বে হিন্দুসভার তখনকার সভাপতি সভারকার মহাশয় খুলনায় আগমন করিয়া হিন্দু-মুসলীম ঐক্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। তিনি ও তাঁহার দল হিংসা দ্বারা হিংসার উত্তর দেওয়ার নীতিতে বিশ্বাসমান। গান্ধীজী বরাবর হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর কথা বলিতেছিলেন, তদনুযায়ী চলিতেন, ইহা প্রতিহিংসাবাদীদের বরদাস্ত করা কঠিন হইত। খুলনায় এক বড় অধিবেশনে সভারকার মহাশয় বলেন যে, হিন্দু গাই, মুসলমান বাঘ। এই দুইয়ের ঐক্য তখনই হয়—যখন গাই বাঘের পেটে যায়। যে মনোভাববশতঃ এই উক্তি করিয়াছিলেন উহা ব্যাঘ্রোচিত। উহা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত একটা সম্পর্কই স্বীকার করে—উহা হইতেছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খাইয়া ফেলিতে হয়। সেই ব্যাঘ্রবৃত্তি, ভারতবর্ষের কতকের মনোভাব যে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছে গান্ধীজীকে হত্যা করাই তাহার প্রমাণ। এই মনোভাব হইতে ভারতবর্ষ মুক্ত হউক, জগত মুক্ত হউক—গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ আমাদের সকলকে কল্যাণের পথে লউক। হানাহানি বন্ধ হউক।

যেভাবে গান্ধীজী অতর্কিতে আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন তাহাতে দুঃখের তীব্রতা অসহনীয়রূপে দেখা দিয়াছে সত্য, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় গান্ধীজীর জন্য ঈশ্বর শ্রেষ্ঠতম মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন। গান্ধীজী যে অহিংস নীতির পূজারী, উহারই ফলস্বরূপ তিনি জাতি, ধর্ম ও দেশ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সমান প্রেমপরায়ণ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। কিন্তু প্রাকৃত লোক ভেদ চায়। ভেদ নাই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেনা। আর যখন দেখে কার্য্যতঃ ভেদ নাই এইভাবে ব্যবহার চলিতেছে, তখন তাহা বরদাস্ত করিতে পারেনা। গান্ধীজী যাহাই বলুন আর যাহাই করুন—তিনি মুসলমানদের শত্রু, এই বিশ্বাস সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে মুসলীম সম্প্রদায়ের ছিল। তিনি একই কারণে হিন্দুর বিরাগভাজন ছিলেন। হিন্দুরা বলিত তাঁহার একদেশদর্শী মুসলীম-প্রেমবশতঃ তিনি হিন্দুদের প্রতি অন্যায় করিতেছেন ও হইতে দিতেছেন। ফলে কোনও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, কি হিন্দু, কি মুসলীম তাঁহাকে সহ্য করিতে পারেনা। অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান যে কংগ্রেস, তাহারও অনেক সভ্য ঐ কারণেই গান্ধীজীর বিরোধী ছিলেন।

গান্ধীজী মৃত্যু দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন সৎ পথ কি, মৃত্যুর দ্বারাই তাঁহার উক্তির সততা প্রমাণ দিয়াছেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িক নিষ্ঠুরতার বলিস্বরূপ তাঁহাকে হিন্দুর হাত দিয়া হত্যা হইতে দিয়া বিধাতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, হিন্দুদের কৃষ্টির গর্বের মূল্য কতটুকু এবং মুসলমানদের নিকট প্রমাণ করাইয়াছেন যে মুসলমান তাঁহার কত আপন। এই ভাবে হিন্দুর হাতে, হিন্দুর গুলিতে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণ যে গেল ইহা বিধাতারই ইচ্ছা। তাঁহার প্রিয় ভক্তকে তিনি এই গৌরবময় মৃত্যু পথে নিজের নিকট টানিয়া লইয়াছেন। এই হেতু বলিব যে, গান্ধীজীর পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠতম সম্মান যাহা বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করার নাই। রাজা দশরথের মৃত্যুতে গুরু বশিষ্ঠ যাহা ভরতকে বলেন তাহা স্মরণ করার যোগ্য—

> সুনহু ভরত ভাবী প্রবল এ বিলখি কেহউ মুনিনাথ।
> হানি লাভু জীবনু মরণু জসু অপজসু বিধি হাথ।

হে ভরত, শোন। ভবিতব্যতা প্রবল আর লাভ ক্ষতি, জীবন মরণ, ভাল মন্দ, এ সকলই বিধাতার হাতে।

> অস বিচারি কেহি দেইয় দোষু।
> ব্যরথ কাহি পর কীজিয় রোষু।
> তাত বিচারু করহু মন মাহীঁ।
> সোচজোগু দসরথু নৃপু নাহীঁ।

এই কথা বিচার করিয়া কাহাকে আর দোষ দেওয়া যায়, মিছা

কাহার উপর রাগ করা যায়, হে তাত, মনে মনে ভাবিয়া দেখ, রাজা দশরথ শোকের যোগ্য নহেন।

সোচিয় বিপ্র জো বেদবিহীনা।
তজি নিজ ধরম্ বিষয় লয়লীনা॥
সোচিয় নৃপতি জো নীতি না জানা।
জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রাণসমানা॥

যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য ও নিজের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিষয়-ভোগে ডুবিয়া আছে, সে শোকের পাত্র। যে রাজা রাজধর্ম অনুসারে চলে না, যাহার কাছে প্রজা প্রাণের সমান প্রিয় নয়, সেই রাজা শোকের যোগ্য।

সোচনীয় নহি কোসলরাউ।
ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ॥
ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা।
ভুপ ভরত জস পিতা তুম্হারা॥
বিধি হরি হর সুরপতি দিসিনাথা।
বরনহিঁ সব দশরথ গুন গাথা॥

কোশলরাজ ত শোকের যোগ্য নহেন। চৌদ্দ ভুবনে তাঁহার প্রভাব প্রকাশিত আছে। হে ভরত, তোমার পিতার মত রাজা হয় নাই, হইবেও না। বিষ্ণু শিব ইন্দ্র ও দিকপালগণ সকলেই দশরথের গুণগান করেন।

সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী।
বাদি বিবাদ করিয় তেহি লাগী॥
এহ সুনি সমুঝি সোচু পরিহরহু।
সির ধরি রাজরজায়সু করহু॥

সকল রকমেই রাজা বড় ভাগ্যবান ছিলেন। তাঁহার জন্য দুঃখ করা মিথ্যা। ইহা বুঝিয়া শোক ত্যাগ কর, রাজাজ্ঞা মাথায় লইয়া রাজত্ব কর।

গান্ধীজী জীবিতকালে আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, যে মৃত্যু পরম বন্ধু, মৃত্যু সর্বতাপহারী, মৃতের জন্য শোক কেবল স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। যে এই দুঃখময় সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে সে এবারকার মত দুঃখের পরপারে গিয়াছে। তবে আর শোক কেন।

আমরাও গান্ধীজীর মৃত্যুতে শোক করিব না। বরঞ্চ হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিব তিনি এত অতর্কিতে গেলেন কেন? তিনি তো যাইতে চাহেন নাই। দিল্লীতে উপবাসের পূর্বে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া মৃত্যুই চাহিতেছিলেন। কিন্তু উপবাস কালে সর্বত্র হইতে যে প্রেম পাইয়াছিলেন, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব উৎপন্ন হওয়ার যে নিদর্শন পাইয়াছিলেন তাহাতে আনন্দিত হইয়া গান্ধীজী বলেন যে তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি বাঁচিতে চাহেন—পূর্ণ পরমায়ু ভোগ করিতে চাহেন—১২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকিয়া জনসেবা করিতে চাহেন। তবে কেন বিধাতা তাঁহাকে লইলেন, কোথায় ত্রুটি ছিল। ত্রুটি যদি আমাদের মধ্যেই থাকে তবে সে ত্রুটি কি তাহা আমাদের বিশ্লেষণ করা, জানা ও পরিহার করা দরকার।

নোয়াখালীতে পা দিয়াই গান্ধীজী আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি নোয়াখালীর ও পূর্ব-বংগের স্থায়ী বাসেন্দা হইয়া গেলেন। তিনি ১৯৪৬ সালের নবেম্বরে যখন আসেন তখন কলিকাতা, কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, চাঁদপুর, লাকসাম প্রভৃতি স্থানে সমবেত জনতাকে এই কথাই বলিতেন যে একটি হিন্দু বালিকাও যতক্ষণ নির্ভয়ে চলা ফেরা না করিতে পারিতেছে ততদিন তিনি এদেশে থাকিবেন। তারপর হাইমচর গ্রাম হইতে ১৯৪৭ সালের ২রা মার্চ এই বলিয়া বিহারে যান যে তিনি তিন সপ্তাহে ফিরিবেন। অগস্ত্য যাত্রা হইল। তিনি আর ফিরিলেন না। কিন্তু এই সত্যসন্ধ ঋষির বাক্য মিথ্যা হয় না। গান্ধীজী যখন জীবিত ছিলেন তখনো তিনি মনোজগতে নোয়াখালীতেই বাস করিতেছিলেন, ইহার সাক্ষ্য আমি দিতে পারি। আজ অশরীরী গান্ধীজী অবশ্যই নোয়াখালীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন ও আমাদের কৃতি লক্ষ্য করিতেছেন এবং আমাদের প্রত্যেক সৎ চেষ্টার প্রতি পূর্বের ন্যায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিতেছেন।

তিনি নোয়াখালীতে পা দেবার পূর্ব হইতেই হিন্দুদের ছোট বড় আলাদা এলেকা করার প্রস্তাব বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হইতে আসিতেছিল—কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের পক্ষ হইতে ও হিন্দুসভার পক্ষ হইতে। অন্যথায় ইহারা স্থানান্তর গমনের পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধীজী এই ধারণার বিরুদ্ধ মত জানাইয়া আসিয়াছেন। তিনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে এক এক দল লোকের সম্প্রদায়গত মহল্লা কোনও গভর্ণমেণ্ট করিতে দিতে পারেন না, দিলেও উহাতে শান্তি রক্ষা হইবে না—অশান্তিই বাড়িবে। আর বাসেন্দার অদল বদল করা—সে তো গবর্ণমেণ্টই করিতে পারে। সেজন্য দুই গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা করিয়া যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার এবং সে কাজ নিষ্পন্ন করা খুবই কঠিন।

তাঁহার এই উপদেশ দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। যাহারা হিন্দু পকেট বা বিশেষ মণ্ডল গঠন করিতে চায় তাহারা যে হিংসার পথেই চলিতেছে তাহা গত কয়েক মাসের ঘটনায় ও শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজীকে হত্যা করা দ্বারা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আর যাহারা বাসেন্দা অদল বদল চাহেন তাঁহারা দেখিতেছেন যে বাসেন্দা অদল বদল নয়, বাসেন্দা নির্মূল করাই হইতেছে। তথাপি সকলকার দৃষ্টি সাফ হয় নাই।

গান্ধীজীর তরফ হইতে একই আবেদন নোয়াখালী ও পূর্ব-বংগবাসীর নিকট ছিল, সে হইতেছে তাহারা মরণ পণ করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে এবং কোনও ক্রমেই নিজ বাস্তু ত্যাগ করিবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায় বাস্তু ত্যাগ করিতেছে, ধনী সম্প্রদায়ও করিতেছে। নোয়াখালী হইতে হিন্দুদের বাস্তুত্যাগ ধীর ও নিশ্চয় গতিতে চলিতেছে। যে যাইতেছে সে যে সমাজদ্রোহ করিতেছে সে

জ্ঞান তাহার আসা আবশ্যক। সমাজ-দ্রোহ এই জন্ত যে সে নিজে নিকট আত্মীয় লইয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সমাজের অপর যাহারা রহিল তাহাদের অবস্থা ইহাতে আরো খারাপ হইতেছে।

আজ গান্ধীজী শরীরে আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার জন্ত শোক না করিয়া আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার যে আমাদের এই সমাজ-দ্রোহিতাও কি তাঁহার মৃত্যুর জন্ত দায়ী নহে!

তিনি তো আরো ৫০ বৎসর বাঁচিতে চাহিয়াও, আমাদের দুর্বলতায় পীড়িত হইয়া মৃত্যু কামনা করিয়াছেন এবং আবার সাধারণের পরিবর্ত্তিত মনোভাব দেখিয়া, সেবা করার অবকাশ পাইবার আগ্রহে পুনঃ দীর্ঘায়ু লাভ করার সংকল্প লইয়াছেন। অবশেষে আমাদের অবহেলায় তাঁহাকে মৃত্যুর ক্রোড়েই ঠেলিয়া দিয়াছি।

নোয়াখালির হিন্দু মুসলমানের আজ ঐক্য বদ্ধ হইবার জন্ত সংকল্প দৃঢ় করার দিন। হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা বর্জন স্বীকার করার এই তো দিন—আর যাহারা নোয়াখালীতে অস্থির মনে আছেন, চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াও নিজ বাস্তু ত্যাগ না করার সংকল্প লওয়ার দিন। এইরূপ করিয়াই আমরা গান্ধীজীর পুণ্য স্মৃতি তর্পণ করিতে পারি।

গান্ধী-ভক্তদের কর্ত্তব্য

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন দত্ত

মহাত্মা গান্ধী মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আমার মতন লোকের কিছু লেখা ধৃষ্টতা। তাঁর গুণাবলীর অনেক আলোচনা হচ্ছে। আমার মনে হয় তাঁর কথা লিখবার বা বলার এখনও সময় হয় নাই। আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা—কত বৎসর পরে জানিনা—গান্ধীজী কি ছিলেন এবং জগতের উপর তাঁর প্রকৃত প্রভাব কি বুঝতে পারবে। বর্ত্তমান কালের লোকেরা যদি তাঁকে বুঝতে ও চিনতে পারতেন তবে আজ ৭৯ বৎসর বয়সের বৃদ্ধকে স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে আততায়ীর হস্তে এ ভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হ'ত না।

বর্ত্তমানে গান্ধীজীর গুণপনার আলোচনা না ক'রে এই গত ২৭ বৎসরে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক খেলা চলেছে, তাতে যাঁরা কম বেশী ভাগ নিয়েছেন এবং যে কাজের দরুণ বর্ত্তমানের স্বাধীন ভারত রূপ নিয়েছে এবং ছোট বড় কর্ম্মী ও দেশবাসী যে সুখ, সুবিধা, কি অসুবিধা ভোগ করেছেন তাদের নিজেদের চিত্তবিশ্লেষণ করে দেখাই মনে হয় সব চেয়ে দরকার এবং দেশের ভবিষ্যতের পক্ষেও তাহা প্রয়োজনীয়।

১৯২০ সালে মহাত্মাজী যখন জাতিকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জন্ত আহ্বান করেন, তখন বুঝে না বুঝে অনেকেই তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। যদিও সে আন্দোলন মুখ্যতঃ স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল তথাপি তিনি বলেছিলেন "My movement of non-violent non-co-operation is essentially a movement for self purification." আমি জানিনা ছোট বড় অসংখ্য কর্ম্মীর মধ্যে কজনের মনে এই কথা কটী স্থান পেয়েছিল এবং সেই ভাবে ভাবিত হয়ে কজন তাঁদের চিন্তা ও কার্য্য সেই পথে চালিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। মনে হয় খুব মুষ্টিমেয় লোকই গান্ধীজীর এই কথার সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। বর্ত্তমানে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের চতুর্দ্দিকের অবস্থা, বড় বড় কৃতী বলে পরিচিত কর্ম্মীদের লোভ, ক্ষমতা-লোলুপতা এবং চতুর্দ্দিকের মলিনতা দেখে ইহা স্বতঃই মনে হয় আমরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব পাবার অধিকারী ছিলাম না। শুধু হাওয়ার সঙ্গে তাল দিয়ে নিজেকে ও দেশকে ভুল বুঝিয়েছি যে আমরা গান্ধীজীর অনুগত দেশপ্রেমিক। এর চরম পরিণতি আজ দেশ বিভাগ, সর্ব্বত্র হাহাকার এবং আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজীর মৃত্যু এবং সমগ্র পৃথিবীর নিকট ভারতবর্ষ বিশেষতঃ হিন্দু ভারতবাসীর অধঃপতনের কালিমাময় চিত্র উদ্ঘাটন।

যাহা হবার হয়েছে। তা নিয়ে আর বেশী বলার প্রয়োজন নাই।

তবে এই চিত্রের পরও কি আমরা আমাদের ভুল বুঝেছি? আজও কি আমরা সকলে আত্মবিশ্লেষণে প্রস্তুত আছি? কেন এমন হল? হাজার হাজার বৎসরের কৃষ্টির অধিকারী ভারতবাসী আমরা —আজ আমাদের এমন অধঃপতন কেন হল? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা নিজের নিকট দাবী করতে প্রস্তুত আছি কি? এবং এই প্রশ্নের সমাধানের জন্ত নূতন করে সর্ব্বরকম ত্যাগ স্বীকার করেও অতীতের ভুল ত্রুটী স্বীকার করে নূতন ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে প্রস্তুত আছি কি?

এই প্রশ্নের যথাযথ সন্তোষজনক উত্তর এবং কার্য্যক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে অগ্রসর হলে বুঝব, গান্ধীজী জীবনে আমাদের মনে যে রেখাপাত করতে পারেন নাই মৃত্যু দ্বারা তাতে সফল হয়েছেন।

আমি আশাবাদী। যে মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে জন্মেছিলেন এবং নিজ আচরণ দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে কর্ত্তব্য পথ দেখিয়েছেন, তার পুণ্যফল দেশ একদিন পাবেই এ বিশ্বাস আছে। কিন্তু বর্ত্তমানের ঘন অন্ধকারে বর্ত্তমান ক্ষমতা অধিকারীদের দ্বারা ইহা কতদূর অগ্রসর হবে এ বিষয়ে দুর্ব্বল মনে সন্দেহ আসে। তবে সর্ব্বোপরি শ্রীভগবানের মঙ্গলময় ইচ্ছায় সব মেঘ কেটে যাবে, এই ভরসা নিয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করি।

'বাপুজী' আখ্যার যৌক্তিকতা

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার আশ্রমবাসীরা 'বাপুজী' বলিয়া ডাকিতেন, 'বাপু'র অর্থ পিতা বা জনক। তাঁহার মৃত্যুর পরে আরও অনেকে তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করেন এবং অনেকে তাঁহাকে ভারতীয় জাতির বাপু বা পিতাও বলেন। এই কথার যাথার্থ্য আছে কিনা কোন কোন ব্যক্তির মনে সন্দেহ হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। আমাদের নিজেদের পিতারা আমাদিগকে জন্ম দেন, কিছু জমি যায়গা ও টাকাকড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়া যাইবার চেষ্টা করেন এবং আমাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া জ্ঞানদানের চেষ্টা করেন। এই দিক দিয়া যদি বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে গান্ধীজীকে ভারতীয় জাতির পিতা বলা অত্যুক্তি হইবে না ; বরং উহা সত্যই হইবে।

গান্ধীজী আমাদের কাছে তাঁহার এক বিরাট ভাবধারা আনিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সত্য ও প্রেমের দিব্য স্রোতে স্নান করিয়া চলিতে পারিলে আমরা সংসারে নানা আবর্ত্তের মধ্যদিয়া প্রকৃত পথ ধরিতে পারিব। ভারতীয় পরিস্থিতি ও জাগতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের সত্যকার জ্ঞান জন্মিবে, মানবজাতির উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব এবং তদনুযায়ী চলিতে পারিলে মানবসমাজকে উন্নতস্তরে লইয়া যাইতে পারিব। জাতির এই পিতা যে আমাদিগকে শুধু ঐ শাশ্বত ভাবধারা দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে তিনি আমাদিগকে এক বিরাট দেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন। আমাদের পিতারা দুই পাঁচ বিঘা বা দুইশত পাঁচশত বিঘা জমি দিয়া পরলোক গমন করেন। এই পিতা আমাদিগকে কোটি কোটি বিঘাওয়ালা এই ভারতবর্ষ দিয়া গিয়াছেন। ইহার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণ কুমারিকা, পশ্চিমে পাঞ্জাব, পূর্ব্বে আসাম। কত নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত ; উর্বর ও অনুর্বর ক্ষেত্রে এই দেশ পরিশোভিত। কত ভাষা কত ধর্ম, কত আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া এই দেশ। এই বিরাট দেশ তাঁহার নিকট হইতে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছি। এই সম্পত্তিকে রক্ষা করিতে হইবে, ইহার শাসন বা সেবার ভার আমাদের হস্তে। হাজার হাজার বৎসরের মধ্যে এই রকম হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই দেশকে এখন পরিচালন করিতে হইবে—বড় করিতে হইবে, জগৎ সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হইবে। এতবড় বিরাট সম্পত্তি কোন্ পিতা আমাদিগকে দিতে পারেন? কাজেই মহাত্মা গান্ধীকে এই জাতির 'বাপুজী' বা জনক বলা অসঙ্গত নয়। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, স্মরণে রাখিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে পারিলে তাঁহার সন্তান এই জাতি ধন্য হইবে।

ভগবান আমাদিগকে সেই শক্তি দিন এবং বাপুজী আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

মহাপুরুষ

নিরুপমা দেবী

লক্ষ লক্ষ পাপ আছে জানি এ ধরায়
হিংসার নাহি আদি অন্ত
পঙ্কিল আবিলতা ক্ষুদ্রতা হীনতায়
স্বার্থ খুঁজিছে নিজ পন্থ !
তবুও তাহারি মাঝেও ধর্মী পুণ্যেই
মুছে নিলে সে পাপ অগণ্য
তোমার চরণযুগ স্পর্শ লভিয়া এই
মর্ত্ত্যের ধূলি হল ধন্য !
অন্ধ মানব যবে দ্বন্দ্ব করিয়া মরে
রক্ত লোলুপ তার দৃষ্টি
হিংস্র পুলকে মাতি পথে পথে ঘরে ঘরে
গ্রাসিতে চাহিছে শুভ কৃষ্টি !

মানবের মানবতা জাগায়ে তুলিলে যেই
পশুতা লুকাল কোথা মন্দ।
তোমার চরণ যুগ স্পর্শ লভিয়া এই
মর্ত্ত্যের ধূলি হল ধন্য !
তিক্ত গরল পানে জর্জ্জর এ ধরণী
ভুলেছিল অমৃতের সত্তা
সিক্ত রক্ত স্নানে কি দিবস কি রজনী
ডুবে ছিল মোহমদমত্তা।
ধ্যানীর মানস লোক স্বর্গ যে এখানেই
তাই শুধু দেখাবার জন্য
তোমার চরণ যুগ স্পর্শ লভিয়া এই
মর্ত্ত্যের ধূলি হল ধন্য !

বাপুজী

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

শুধু ভারতের নহে, পৃথিবীর এক সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বাপুজী আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। ইহা অত্যন্ত আকস্মিক, অভাবনীয় ও বিয়োগান্ত ঘটনা। তিনি কেবল জাতির পিতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয়দের অকৃত্রিম বন্ধু এবং পথপ্রদর্শক। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনিই আমাদের বিজয়ী করিয়াছেন। একটি পদানত জাতির স্বাধীনতা লাভের পক্ষে হিংস্র পন্থাই একমাত্র পন্থা নহে ইহা তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিকদের তিনি 'অহিংস-সত্যাগ্রহরূপ এক নূতন অস্ত্রের সন্ধান দিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষ তাঁহার ন্যায় নেতার আবির্ভাবে গর্ব্ব অনুভব করে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক যে তিনি তাঁহার প্রচেষ্টার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মতে পূর্ণ স্বাধীনতা হইতেছে 'স্বরাজ' যাহার মুখ্য লক্ষ্য কিষাণপ্রজা-মজদুররাজের স্থাপনা। ভারতের এবং পৃথিবীর কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল অহিংসপন্থায় ভারতে এমন এক সমাজব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা—যেখানে কেহ খুব বড় বা কেহ খুব ছোট থাকিবে না এবং যেখানে কেহ কাহাকেও শোষণ করিবে না। সুতরাং এই দিক হইতেও তিনি জগতকে এক নূতন পথের সন্ধান দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে অত্যন্ত অসময়ে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। তিনি ছিলেন সকলেরই বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী, কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা জাগ্রত দৃষ্টি ছিল ভারতের হরিজন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর। কেবল ভারতেরই নহে, পৃথিবীর সংখ্যালঘু জাতিগুলির শুভাশুভের প্রশ্নের সম্বন্ধেও তিনি নিজেকে ব্যগ্রভাবে জড়িত রাখিতেন। আধুনিক জগতে তিনি শান্তি, মৈত্রী ও সৌভ্রাত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না এবং ইহাতে যে কোনও ত্যাগস্বীকারে তিনি কার্পণ্য করেন নাই। ইহার জন্যই তিনি বহুবার আমরণ অনশন পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন। নোয়াখালি, বিহার, কলিকাতা বা দিল্লী সর্ব্বস্থানেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি মানুষে মানুষে ঘৃণা ও হানাহানি দেখিয়া এক মহান আত্মার কী বেদনাবোধ! ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর এমন এক মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি জীবনদান করিয়া গেলেন যাহা তাঁহার নিকট ছিল স্বাধীনতালাভেরই ন্যায় প্রিয়। তাহা হইল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। আমি অকপটে আশা ও বিশ্বাস রাখি যে তাঁহার ন্যায় শহীদের রক্ত বৃথা যাইবে না এবং ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি, মৈত্রী, শুভেচ্ছা ও পরমসহিষ্ণুতার ভিত্তিতে আজকের এই সংঘাতময় বর্ব্বর পৃথিবীতে এক নূতন যুগের সূচনা করিবে।

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়

জীবনটা নয় জীবন যাপন মৃত্যুটা নয় ভীষণ জঞ্জাল
বেঁচে থাকা সেবার তরে, ভীরুর কাছে সেইটা জোঁয়াল।
বাঁচতে হবে বাঁচার মত অপর সবাই বাঁচবে যাতে
ধর্ম সেত বুকের জিনিস চিত্ত পূত প্রার্থনাতে।
নিজের অধীন স্বাধীনতা, নিজেই নিজের অভাব মোচন
পেটের ভাত আর পরার কাপড় সাধ্যমত সমুৎপাদন।
রক্তশোষা বাদুড় সহর পল্লী যেন শোবার তরে
ব্যবসায়ীদের ব্যবসাদারীর, ধনীর ধনের সৌধগড়ে।
সৌধ ভাঙ্গি ধনের ভাঁড়ার বাইরে ঢেলে আনতে হবে
সব সমানের বিজয় কেতন বিশ্ব জুড়ে উড়বে তবে।
পল্লী প্রধান এই যে ভারত, পল্লী যাহার বুকের কাঁপন
পল্লী যদি সতেজ না রয়, স্বাধীনতা মুখের ভাষণ।
ভেক না হলে ভিখ না মিলে, কংগ্রেসটা নয় ভেকের সামিল
ভাঁওতা দিয়ে লোক ভুলানো সুযোগ বুঝে কাজের হাসিল।
সত্য যদি কংগ্রেসী হও তোমার জীবন সেবার তরে
এগিয়ে চল অহিংসা ও সত্য প্রেমের প্রদীপ ধরে।
সহর ছেড়ে প্রবেশ কর অন্ধকারে পল্লী গুহায়
কথাতে নয় কাজের দ্বারা বোঝাও তোমার যা বোঝাবার।
অহিংসা নয় অস্ত্র ভীরুর, বীর যে সে এর অধিকারী
ঈশ্বরেরই সৃষ্ট জগৎ যা করি সব করা তাঁরই।
বিশ্বাসী এর মর্ম বুঝে কর্ম করে গীতার মতে
ভক্ত যে পায় শক্তি বুকে রত জীবন ত্যাগের ব্রতে।
মানুষ মানুষ অভেদ সবাই ভেদ কিছু নাই তোমার আমার
খাব সবাই পরব সবাই বাঁচব সবাই ডাকব তাঁহার।
অভাব সবার মোচন হবে দূর হবে হীন বৃত্তি নিচয়
শাসিত আর শাসক একই শরীর মাথা বিভিন্ন নয়।
রামরাজত্ব স্থাপন করা তোমার আমার সবার হাতে
এস কে মোর অনুগামী কর এ হয় সকল যাতে।
অত্যাচারীর খড়্গ যেথায় সমুদ্যত সেথায় তুমি
মুক্তি কিসে জানিয়ে দিলে নিপীড়িতের মর্মভূমি।
অন্ধকারের মাণিক তুমি শক্তি তুমি মোদের বুকের
তোমার পথে চলব মোরা হদিস পাব স্বর্গ লোকের।
তোমার জীবন তোমার বাণী—তুমিই বাণীর মূর্তি ধরি
তবে তোমার মরণ কোথায়? ঋষি তোমায় প্রণাম করি।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সিপাহী অভ্যুত্থানের মধ্যে রূপায়িত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে। ঐ বৎসরই ১লা নভেম্বর তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় নানাবিধ পরিবর্ত্তনের বিষয় সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হইল। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই অভ্যুত্থানের পর হইতে তাঁহাদের ভারত-শাসনের নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতীয়দিগকে ইংরাজগণ তখন হইতে বিশেষ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে প্রগাঢ় সম্প্রীতি পরিস্ফুট হইয়াছিল, দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া সেই সম্প্রীতি দূরীভূত করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করাই ইংরাজদিগের প্রধান লক্ষ্য হইল। তদুপরি চলিল নানা আইন রচনা করিয়া ভারতীয়দিগের স্বাধীন মতামত প্রকাশ এবং শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিবার পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টির প্রয়াস। এইভাবে লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে Vernacular Press Act বিধিবদ্ধ করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে Arms Act প্রণয়ন করিয়া অনুমতি ব্যতীত ভারতবাসীর পক্ষে অস্ত্ররক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ভারতীয়দিগের অপমানের চরম হইয়াছিল এই লর্ড লিটনের শাসনকালেই। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের অধিরাজ্ঞী বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। ইহার ফলে, কার্য্যতঃ বৃটিশ অধিরাজত্ব স্বীকার করিলেও যে সকল দেশীয় নৃপতি শাসনতান্ত্রিক দিক দিয়া এতদিন মিত্ররাজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাঁহারাও প্রকারান্তরে বৃটিশের অধীন সামন্ত নৃপতিতে পরিণত হইলেন।

কিন্তু ভারতবাসীদিগকে দমিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মনে নূতন জাতীয় প্রেরণার সঞ্চার হইতে লাগিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের আমলে যে চেতনা ও বিক্ষোভ কেবলমাত্র সিপাহী, রাজ্যচ্যুত নৃপতি এবং প্রতিপত্তিবিহীন ভূস্বামী ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী ও ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—তাহা বিস্তারলাভ করিতে আরম্ভ করিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য ছাত্র-সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়েরও মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশময় একটা জাতীয়তাবোধ ও আত্মসম্মানবোধ যেন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীতে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব আমরা দেখিতে পাই। সময়ের প্রয়োজনেই যে এই সকল বিরাট পুরুষের আবির্ভাব এবং উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। এইভাবে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মপ্রচারক হিসাবে রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—রাজনীতিবিদ্ হিসাবে আনন্দমোহন বসু, ডবলিউ. সি. বনার্জি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল—সাহিত্যিক হিসাবে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদিকে পাইয়াছিলাম। বাংলা দেশের উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবের বিষয়। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে অপর নেতৃবৃন্দ তো ছিলেনই। তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইতে লাগিল।

লর্ড রিপনের আমলে এতদ্দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়দিগেরও বিচার করিবার অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়া ইলবার্ট বিল উত্থাপিত হয়। এই ন্যায়সঙ্গত বিলেরও বিরুদ্ধে কিন্তু ইউরোপীয়-সম্প্রদায় তীব্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন—কেননা, ভারতীয় বিচারকের নিকট আসামী হইয়া উপস্থিত হইতে তাঁহাদের দারুণ লজ্জা ও অসম্মান। শেষ পর্য্যন্ত বিলটি পরিত্যক্ত হইল। ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয়গণের প্রবল ঘৃণা ও অবিশ্বাস ইলবার্ট বিল আন্দোলন উপলক্ষে প্রকটিত হইল।

যাহা হউক, অসন্তোষ ও অভিযোগ প্রকাশিত হইবার ন্যায়সঙ্গত পন্থাগুলি নানা বিধিনিষেধের দ্বারা রুদ্ধ হইলে চতুর্দ্দিকে গুপ্ত অসন্তোষ সৃষ্টি হইতে লাগিল। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হইলে গুপ্ত-আন্দোলনের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী আশঙ্কা করিয়া ভারত গভর্ণমেন্টের তদানীন্তন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মিঃ এ. ডি. হিউমের পরামর্শ ও উদ্যোগে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হইল। ইংরাজি শিক্ষার প্রসার দ্বারা ভারতীয়দিগকে বৃটিশভক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সিপাহী বিদ্রোহের প্রাক্কালেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মেকলে ও তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিংয়ের চেষ্টায় তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নাগরিকের উদ্ভব ঘটাইবার জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট ও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। মিঃ হিউম ছিলেন লর্ড ক্যানিংয়ের বন্ধু। তিনি দেখিলেন, যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ইংরাজ-শাসনের মহিমায় মুগ্ধ না হইয়া বরং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছে। সুতরাং ইংলণ্ডেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রকাশ্য সভায় আবেদন-নিবেদনে রত একটি সীমাবদ্ধ আন্দোলনকারী নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মতান্ত্রিক দল হিসাবে মিঃ হিউমের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সৃষ্টি হইল ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিণের শাসনকালে।

নব প্রতিষ্ঠিত এই কংগ্রেসের দ্বারা কিন্তু দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিলাভ করিল না এবং দেশের সমস্যা সমাধানকল্পে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও কংগ্রেসের পরামর্শ গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। কংগ্রেসের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও কেবলমাত্র অতিশয় মোলায়েম ভাষায় বৃটিশের নিকট আবেদন-নিবেদনের মধ্যেই সমাপ্তিলাভ করিতে লাগিল। দেশের শিক্ষিত চরমপন্থী সম্প্রদায় ইহাতে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া দাবী আদায়ের অন্ত পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা যে পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন—সে পথ ছিল হিংসার।

রক্ত দান এবং রক্ত গ্রহণই সে মার্গের সাধনা। চরমপন্থীরা অনন্যোপায় হইয়া সেই পন্থাই অনুসরণের সঙ্কল্প করিলেন। গোখেল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, যে ভারতে ইংরাজগণের অনুসৃত নীতিতে হিংসার উদ্ভব হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফল হইল না। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে গুপ্ত-হত্যার সূত্রপাত হইল।

রক্তের বদলে রক্তে বিশ্বাসী এই বিপ্লবীর দল জানিতেন, যে বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তাঁহারা বৃটিশ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া মাতৃভূমির বন্ধনপাশ মোচন করিতে সক্ষম হইবেন না। তথাপি যে পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদের দালালরা ভারতীয় জনমতকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও পদদলিত করিয়া অবাধ প্রভুত্ব বিস্তারের দ্বারা রাজ্য শাসন করিতেছে, তাহাদিগকে খানিকটা শিক্ষা না দিয়াও তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। দেশ-প্রেমিকদের ক্ষুব্ধ চিত্ত ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল আংশিক সান্ত্বনা। আবেদন-নিবেদনের শোচনীয় ব্যর্থতায় তাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ত্যাগ করিলেন।

ইংরাজগণের কূট রাজনীতিও ইত্যবসরে সক্রিয় হইয়া উঠিল। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর হইতেই ভারতীয় সমাজ-শরীরে সাম্প্রদায়িক বিষ প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা চলিতেছিল। এই প্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে সাফল্যও লাভ করিল। কারণ পরাধীন দেশে এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে বিশেষ বেগ পাইবার কথা নয়। এই কারণেই মুসলমানদিগকে যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া আরম্ভ হইল এবং নূতন বিধি অনুযায়ী মসজিদের সম্মুখে হিন্দুর বাদ্যভাণ্ড নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একদল মুসলমানও ধীরে ধীরে ইংরাজদের দিকেই আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" রচনাকালে হিন্দুদের মনে মুসলমান বিদ্বেষ এই কারণেই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ কর্ত্তৃক "প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশন" নামে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ইহার পর ১৮৯৩ সালে বোম্বাইয়ে হিন্দু-মুসলমানে বাধিল দাঙ্গা এবং দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে হিন্দুদের মনে বৃটিশ ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হইল তিক্ত মনোভাব। মহারাষ্ট্রের পুণা নগরীতে চিৎপাবন ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন মহারাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয়। মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও আদর্শ তাঁহাদের মধ্যে ছিল পূর্ণরূপে প্রকাশমান। পেশোয়াগণের উদ্ভব হইয়াছিল এই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী হইতে এবং নানা ফাড়নবীশ, তিলক, গোখেল, রাণাড়ে, পরাঞ্জপে, চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ ইত্যাদি বহু বিজ্ঞ রাজনীতিবিদই ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। ইংরাজগণ বস্তুতঃপক্ষে এই ব্রাহ্মণ-বংশের সহিতই লড়াই করিয়া মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ইংরাজ-বিদ্বেষ এই দেশপ্রেমিক ব্রাহ্মণ বংশের অস্থি-মজ্জায় বর্ত্তমান ছিল এবং তাঁহারা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর নীতি ও কর্ম্ম-পন্থায় বিশ্বাসবান। শিবাজীর আদর্শ লইয়া পুণা, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও নাসিক ইত্যাদি স্থানে ধীরে ধীরে বহু সমিতি ও মেলার উদ্ভব হইতে লাগিল। ১৮৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব মহা ধুমধামের সহিত উদ্‌যাপিত হইতে আরম্ভ হইল। গণপতি উৎসবে লাঠি, তলোয়ার, বর্শা, মশাল ইত্যাদি লইয়া এক-একটি শোভাযাত্রা বাহির হইত। ১৮৯৫ সাল হইতে ছত্রপতি শিবাজীর জন্ম ও রাজ্যাভিষেক উৎসব অতিশয় আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার এবং মন্ত্রগুপ্তির শপথ এই সকল উৎসবে গ্রহণ করা হইত। বৃটিশ বিদ্বেষমূলক পুস্তিকা ও গান প্রচার এই সকল উৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গীতায় উল্লিখিত নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ বিপ্লবীদিগকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইত। ম্যাজিনী ও গ্যারিবল্ডীর ইতিহাস এবং আয়র্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার গুপ্ত-বিপ্লবান্দোলন তাঁহাদিগকে দিত কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ।

দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক পুণার সম্ভ্রান্ত চিৎপাবন বংশোদ্ভূত দুই ভ্রাতা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুধর্ম্মের অন্তরায়-অপসারণ-সমিতি" নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। জনগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বিধান এবং অস্ত্র-সাহায্যে শত্রুদের বিনাশ করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই উৎসাহে এই সমিতি কর্ত্তৃক ১৮৯৫ সাল হইতে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্লেগ দেখা দিল মহামারীরূপে। এই মহামারীকে উপলক্ষ করিয়া সরকারী ও সামরিক কর্ম্মচারীরা দুর্বিসহ অনাচার-অত্যাচার আরম্ভ করিল—যাহার ফলে জনসাধারণের চিত্ত হইয়া উঠিল বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত। প্লেগ দমনকল্পে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্লেগ কমিটির সভাপতি ছিলেন মিঃ র‍্যাণ্ড ও লেঃ আয়ার্ষ্ট ছিলেন ঐ কমিটির একজন সদস্য। ইউরোপীয় সৈন্যগণ উক্ত কমিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবার সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেছিল, তাহা ছিল এদেশীয় লোকাচার ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সম্পর্কে মহিলাগণের লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিষয়ও শুনা যাইতে লাগিল। হাইকোর্টের জজ রাণাড়ে মহাশয় এই সকল অনাচার ও অত্যাচারের বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতে গোখেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য

দিবার জন্য গোখলে ও দীনশা ইদলজী ওয়াচা তখন বিলাত গিয়াছিলেন। রাণাড়ের প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া গোখলে বিলাতে কতকগুলি অভিযোগের বিবরণ সাধারণ্যে প্রচারিত করিলেন। তাহার ফলে ভারতের বৈদেশিক শাসন-শক্তি তাঁহার উপর হইলেন রুষ্ট এবং গোখলে জাহাজযোগে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করা মাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা স্থির হইল। গোখলে ও ওয়াচা যখন ভারতের পথে এডেনে উপনীত হইলেন, তখন কোনও হিতৈষী ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্ণেই ওয়াচাকে গভর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্তের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ওয়াচা ও গোখলে পরামর্শ করিয়া তখন রাণাড়ের পত্রগুলি করিলেন অগ্নি-দগ্ধ; কারণ ঐরূপ না করিলে ঐ তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে রাণাড়েকেও জড়িত হইয়া পড়িতে হইত। তাঁহাদের জাহাজ অতঃপর যখন বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিল, তখন পুলিশের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া ত্রুটি স্বীকারের দ্বারা গোখলে পরিত্রাণ পাইলেন। ত্রুটি স্বীকার না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না; কারণ রাণাড়ের পত্রগুলি অগ্নি-দগ্ধ করিতে হওয়ায় অভিযোগ প্রমাণের সকল তথ্যই নষ্ট হইয়াছিল।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তখন মহারাষ্ট্রের সর্ব্বজনপূজ্য নেতা এবং তাঁহার সম্পাদনা ও পরিচালনায় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "কেশরী" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বহু উত্তেজনাপূর্ণ রচনা ইহাতে স্থান পাইত এবং অস্ত্রবলে শত্রু-উৎসাদনের বিষয়ে জনসাধারণকে ইহা উৎসাহিত করিত। প্রকৃতপক্ষে তখন "কেশরী" পত্রিকাই চরম ও বিপ্লব-পন্থীদের হইয়া উঠিয়াছিল মুখপত্র-স্বরূপ। ঐ পত্রিকাখানি বিপ্লবীদের সকল কাজেই সমর্থন জানাইত।

১৮৯৭ সালে প্লেগের ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের অনাচারের মাত্রা যখন তীব্র হইয়া উঠিল, তখন প্লেগ রেগুলেশনের অত্যাচার লইয়া "কেশরী" পত্রিকায় চলিতে লাগিল উহার কঠোর সমালোচনা। উহাতে লিখিত হইল,—"নগরে নর-রূপী প্লেগের অত্যাচার অপেক্ষা প্লেগ আমাদের নিকট বহুগুণে উত্তম।" ঐ সালেরই জুন মাসের ১৩ই তারিখে তিলকের সভাপতিত্বে যে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হইল, তাহাতে তিলক এক উদ্দীপনাপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করিলেন। উক্ত উৎসব ও সভার বিবরণ ১৫ই জুনের "কেশরী"তে প্রকাশিত হইল এবং লিখিত প্রবন্ধে সকলকে দেশের শত্রু-নিধনকল্পে শিবাজীর আদর্শ অনুকরণ করিতে আহ্বান জানান হইল। প্রকৃতপক্ষে ইহা বৃটিশেরই বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান।

ইহার কয়েকদিন পরেই অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিল। ২২শে জুন, ১৮৯৭। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে হীরক জুবিলীর আয়োজন হইল। বড় বড় নগরগুলি হইল রাত্রিকালে আলোকমালায় সজ্জিত। উৎসবানুষ্ঠানের পর বোম্বাইয়ের লাট ভবন হইতে মিঃ র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট সাহেব রাত্রিকালে যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের হস্তে তাঁহারা দুইজন প্রাণ হারাইলেন। দামোদর চাপেকার কর্ত্তৃক বোম্বাইয়ে অবস্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর মূর্ত্তিটিও আলকাতরা লেপনে বিকৃত হইল।

আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দামোদর চাপেকারের হইল প্রাণদণ্ড। "কেশরী" পত্রিকায় ১৫ই জুনের প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে তিলকের দেড় বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। এই সকল আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকার সন্দেহে পুণার নাটুভ্রাতৃদ্বয়ও নির্ব্বাসিত হইলেন।

১৮৯৮ সালে শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপের সম্পাদনায় "কাল" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকা এবং "বিহারী" নামে অপর একখানি জাতীয় পত্রিকা রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইল।

ইহার পর ১৮৯৯ সালে পুণার চীফ কনষ্টেবলকে হত্যা করিবার জন্য যে চেষ্টা করা হইল—তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। গোয়েন্দাগিরি করিয়া যে দুইটি ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে ধরাইয়া দিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহারা অকস্মাৎ নিহত হইল। এই সকল হত্যাকাণ্ডের ফলে চাপেকারভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত সমিতির চারিজন সদস্যের হইল ফাঁসি ও একজনের হইল দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কয়েক বৎসর পরে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা নামক কাথিয়াবাড়ের এক ব্যক্তি বোম্বাই হইতে লণ্ডনে গমন করিলেন এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেখানে India Home Rule Society নামক একটি সমিতি গঠন করিলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্য হইতে উক্ত সমিতির সদস্য সংগ্রহ চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রচেষ্টায় "Indian Sociologist" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। যাহাতে ভারতীয় ছাত্র, লেখক, সাংবাদিক ইত্যাদি উপযুক্ত ব্যক্তিগণ ইউরোপ আমেরিকায় গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালেই শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা এক হাজার টাকা হিসাবে কয়েকটি বৃত্তি দিবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন।

নাসিকনিবাসী ২২ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক বিনায়ক দামোদর সাভারকর শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মার ঐ বৃত্তি লইয়া ১৯০৬ সালে ইংলণ্ডে গমন করিয়া India Home Rule Society-র সভ্য হইলেন। পুণার ফারগুসন কলেজ হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কিন্তু অধিক দিন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিচালিত ইণ্ডিয়া হাউসকে বৃটিশ সরকার সুনজরে দেখিতেন না। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, বিলাতে থাকা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইল না। তিনি প্যারীতে চলিয়া গেলেন।

ছাত্র জীবনে বিনায়ক দামোদর সাভারকর "মিত্র মেলা" নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত সমিতির নাম "অভিনব-ভারত (Young India) রাখিয়া উক্ত সমিতিটিকে নূতনভাবে সংগঠিত করেন। ১৯০৬ সালে পুণার ছাত্রদের দ্বারা গঠিত একটি সমিতির সভাপতি-পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা প্যারীতে চলিয়া যাইবার পর ১৯০৯ সালে ইণ্ডিয়া হাউসের পরিচালনার ভার সাভারকরের উপরই পড়িল। ইণ্ডিয়া হাউসের সদস্যেরা রিভলভার চালনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিনায়কের ভ্রাতার নাম গণেশ সাভারকর। একখানি রাজ-দ্রোহাত্মক পদ্য-গ্রন্থ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ১৯০৯ সালের ৯ই জুন নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন কর্ত্তৃক গণেশ সাভারকর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার কয়েক দিন পরেই লণ্ডনে এক চমকপ্রদ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। মদনলাল ধিংড়া নামক এক ব্যক্তি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ইণ্ডিয়া হাউসের সদস্য ছিলেন। ইম্পিরিয়্যাল ইন্‌সটিটিউটের একটি সভায় অধিবেশনকালে মদনলাল ধিংড়া তদানীন্তন ভারত-সচিব লর্ড মর্লির A. D. C. কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জ্জন ওয়াইলীকে ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই গুলিবিদ্ধ করিয়া নিহত করিলেন। ওয়াইলীকে রক্ষা করিতে গিয়া ডাঃ লাল-কাকাও নিহত হইলেন। গ্রেপ্তারের সময় ধিংড়ার পকেট হইতে প্রাপ্ত একখানি লিপিতে তাঁহার এইরূপ স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় যে, ভারতীয় তরুণদের প্রতি প্রদত্ত কারা ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদস্বরূপ একান্তভাবে নিজেরই ইচ্ছায় তিনি ইংরাজ-রক্তপাতের চেষ্টা করিলেন! নরহত্যার অভিযোগে ধিংড়ার ফাঁসি হইল।

একজন ভারতীয়ের দ্বারা খাস লণ্ডন সহরে প্রকাশ্য সভায় এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সেখানকার ভারতীয়-সম্প্রদায় প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সভা আহ্বান করিয়া তাঁহারা এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিবেন। তদনুযায়ী একটি সভা আহ্বান করা হইল, কিন্তু সেই সভায় ওয়াইলী-হত্যার নিন্দাজ্ঞাপক একটি প্রস্তাব সর্ব্ববাদীসম্মত হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে বিনায়ক দামোদর সাভারকর দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে জানাইলেন যে, উক্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করিতেছেন। ইহার পরই বিনায়কের উপর চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ আরম্ভ হইল। সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া কোনও মতে তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ জাহাজযোগে বোম্বাই পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল।

দক্ষিণ ফ্রান্সের মার্সাই বন্দরের নিকট জাহাজখানি উপস্থিত হইলে সাভারকর এক অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া বসিলেন। জাহাজের স্নান-কক্ষের ছিদ্রপথ দিয়া তিনি সমুদ্রের বক্ষে দিলেন লাফ। তৎক্ষণাৎ জাহাজের উপর হইতে রক্ষীরা তাঁহার উপর গুলিবৃষ্টি করিতে সুরু করিল। দুর্জ্জয় সাহসে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া জলের তলদেশে আত্মগোপন করিয়া তিনি সাঁতার কাটিতে লাগিলেন এবং অতি কষ্টে ফ্রান্সের তীরে গিয়া উঠিলেন। বৃটিশ পুলিশের নিকট তিনি ধরা দিলেন না—ধরা দিলেন ফরাসী পুলিশের হস্তে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশের হস্ত হইতে রেহাই পাওয়া; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা হইল না। ফরাসী পুলিশ তাঁহাকে বৃটিশ পুলিশের নিকট অর্পণ করিল।

আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযায়ী তাঁহার বিচার নিষ্পন্ন করাইবার জন্য ইহার পর বহু আন্দোলন হয়—কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। বোম্বাইয়ের আদালতেই তিনি অভিযুক্ত হইলেন এবং বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে এইভাবে তাঁহার জীবনের অমূল্য চৌদ্দটি বৎসর আন্দামানে নির্ব্বাসিত অবস্থায় কাটিয়া যায়। ইহা ব্যতীত রাজবন্দী হিসাবে আরও চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয় তাঁহাকে রত্নগিরিতে।

বিলাতে থাকাকালে সাভারকর প্যারী হইতে কুড়িটি Browning Automatic পিস্তল বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনাসমূহের কিছুদিন পরে গণেশ সাভারকরের মামলার বিচারক নাসিকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জ্যাকসন আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন। জ্যাকসন-হত্যার তদন্তপ্রসঙ্গে পুলিশ একটি ব্যাপক ষড়্‌যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া মামলা রুজু করিলে বিচারে তিনজনের ফাঁসি হইল। ইহার পরই নাসিক ষড়্‌যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয়। সেই মামলায় প্রকাশ পাইল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ "অভিনব ভারত" সমিতির সদস্য—যাহার সহিত বিনায়ক সাভারকরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্ত্তমান ছিল। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের যে ফর্ম্মুলা টাইপ করা হইয়াছিল, তাহার একটি কপিও গণেশ সাভারকরের বাড়ী হইতে পাওয়া যায়। এই ষড়্‌যন্ত্র মামলায় সাতাশজনের কারাদণ্ড হইল। সাতারা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি স্থানের ষড়্‌যন্ত্রও ফাঁস হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পন্থ-প্রতিভূ

শ্রীমতী মীরা ভট্টাচার্য্য

অনল-ঝরা দিন তিমির-ভরা রাত্রি
স্বজন হীন পথ একাকী আমি যাত্রী।
কখনো ঝটিকারা বিকট করে ভঙ্গি
প্রলয় রণে মাতে করুণাহীন জঙ্গি।
জীবনে কেহ নাহি দুখের ধাতা ধাত্রী,
অনল-ঝরা দিন তিমির-ভরা রাত্রি।

আমার গতি নহে সরস-সুখ-পন্থে,
নিবিড় হাহাকার সকল ক্ষণ মন্থে।
উপল পথ ভাজি আমার মুহাযাত্রা,
অসহ বেদনার কোথায় পাব মাত্রা!
এসেছে অভিশাপ আসেনি বর দাত্রী
অনল-ঝরা দিন তিমির-ভরা রাত্রি।

বনফুল

১৭

শুনে দমে' গেলেন ছকুবাবু। চলে' গেলেন ভদ্রলোক। আফশোষ কি বাত!

"আপনি বলিয়া জেলার ভাষা বোঝেন?"

"না, আমি বুঝি না"

ভদ্রমহিলার সঙ্গে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আলাপ করে' যেতে হবে না কি ক্রমাগত! সর্ব্বনাশ। তাহলে তো শক্তি-সংগ্রহ করা দরকার। শক্তি-সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তিনি লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সান্ত্বনা কথা কয়ে উঠল।

"আমাদের বন্ধু সদায়ঙ্গবাবু খুব বিরক্ত করে' গেছেন নিশ্চয় আপনাকে"

"না, না বিরক্ত আর কি। আপনার কুকুরটা যে পাওয়া গেছে এতে খুশীই হয়েছি বরং"

"হ্যাঁ কুকুরটার জন্যে আমরা—বিশেষ করে' আমি—বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। সব শুনেছেন নিশ্চয়"

"নিশ্চয়। শুনতে কিছু বাকি নেই আর। সব শুনেছি। ভদ্রলোক শুনিয়ে তবে ছেড়েছেন"

সান্ত্বনা একটু ইতস্তত করতে লাগল, তারপর ছকুবাবুর দিকে মাথা নেড়ে এমন একটা প্রত্যাশাসূচক ভঙ্গী করে' রইল যার অর্থ—যা' শুনেছেন বলুন না সব।

"উঃ কি রাতই কেটেছে আপনাদের কাল"—মুচকি হেসে বললেন ছকুবাবু।

ঈষৎ আনুনাসিক আবদার-তরল-কণ্ঠে সান্ত্বনা বললে, "আপনি হাসছেন কিন্তু কাল রাত্রে কি বিপদেই যে পড়েছিলাম আমরা"—

"বহুবচনটা কি গৌরবে ব্যবহার করছেন? বিপদে তো পড়েছিলেন আপনার স্বামী ভদ্রলোক। শীতকালে রাতদুপুরে বিছানা ছেড়ে কুকুর আনতে দৌড়ানো—অ্যাঁ? হা হা হা"—

"হা—হা—হা"—কলকণ্ঠে সান্ত্বনাও হেসে উঠল—"হ্যাঁ তা দৌড়েছিলেন বটে। কুকুরটা এত কাঁদছিল আমরা ঘুমুতেই পারছিলাম না যে"

"তাই ভদ্রলোক বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। সমঝেছি। আমারও এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল একবার। কিন্তু কুকুরের জন্য নয়, শেরের, মানে বাঘের জন্য। দিল ঘাবড়ে দিয়েছিল একেবারে"

"ও"—সান্ত্বনার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

"পোখমনবাবুর সঙ্গে শিকারে যেতে হত কি না। বাঘের সে কি আবাজ—ভর রাত বসে কাটাতে হয়েছে—ডরে দিল কাঁপছে। আপনার স্বামী একটা বিপদে পড়েন নি। কুকুরটাকে খুলে দিয়ে এসে বিছানায় আবার এসে তখখুনি শুলেন তো—দু'চার লহমার ব্যাপার—"

চোখ মটকে আবার হাসলেন ছকুবাবু।

"আপনাদের কাণ্ড সব শুনেছি, কি ভাবছেন, সব জানি! হা-হা-হা—"

মুখে স্মিত হাসি ফুটিয়ে আনত নয়নে বসে রইল সান্ত্বনা। ছকুবাবু সোৎসাহে লাইব্রেরির দিকে চলে গেলেন।

খাশা মেয়ে। অচেনা এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে বিকেলটা কেমনভাবে কাটবে ভাবনায় পড়েছিলেন ছকুবাবু। এখন মনে হচ্ছে—খাশা কাটবে। চোঁ চোঁ করে' তিনি সান্ত্বনার স্বাস্থ্য পান করে' ফেললেন খানিকটা।

…একটু পরে তিনি দেখলেন সান্ত্বনা কাপড়চোপড় বদলে একটি বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে লনের দিকে মুখ করে' বারান্দায় এসে বসল। বেশ ছিমছাম মেয়েটি। ছকুবাবু তর্জ্জনীটি নাকের উপর লঘুভাবে রেখে লাইব্রেরির জানলা থেকে সান্ত্বনার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। সান্ত্বনাও যেন বুঝতে পারছিল আড়াল থেকে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। আড়ষ্টতাটা কিছুতেই সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠছিল।

…আকাশটা কেমন যেন ঘোলাটে গোছের। বাতাসে ইউক্যালিপটাস্ গাছের ডালপালাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। চীৎকার করে' চলেছে একদল দাঁড়কাক। সান্ত্বনার কিন্তু প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ করার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। জটিল পরিস্থিতিটার কথাই সে ভাবছিল লনের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে কি জটই না সে পাকিয়ে তুলেছে। কি করে যে এখন ছাড়ানো যায়! ভ্রূকুঞ্চিত করে' নিবিষ্টচিত্তে ভাবছিল সে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোন অদৃশ্য দাবার ছকের দিকে চেয়ে চাল ভাবছে। দিগ্বিজয়বাবুর পল্লীভবনের নিবিড় শান্তি কিন্তু ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করছিল তার মনে। অর্দ্ধ-বিস্মৃত রূপকথালোকের স্নিগ্ধ মায়া চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার জ্বালাকে জুড়িয়ে দিচ্ছে যেন। সান্ত্বনার ছেলেবেলার খানিকটা এখানে কেটেছে। কোলকাতার অত্যুগ্র কোলাহলের পর এখানকার শান্তি যে কি মধুর তা' অজানা নেই তার। চুপ করে' বসে রইল সে। গাছের মর্ম্মর আর পাখীর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। অনেক দূরে একটা মালী ফুলের গামলাগুলো নিয়ে কি যেন করছে। আরও দূরে একটা ছোটবাছুর মনের উল্লাসে ছুটে বেড়াচ্ছে লেজ তুলে। নানা রকম দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে চোখ বুজে এল সান্ত্বনার। পল্লীপ্রকৃতির স্নেহ-ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করল সে ধীরে ধীরে।

…এখানে কেউ ছল চাতুরি করবে কেন? কিসের প্রয়োজন? কুকুর হারিয়ে গিয়েছিল—একজন বন্ধু সেটা পেয়ে ফেরত দিয়ে গেছেন—এ আর এমন কি একটা ঘটনা, যার জন্যে তার গত চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধির তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন? ভাবনা কি! তাকে কেউ জেরা করতেও আসছে না। মাসীমাকে সমস্ত ঘটনাটা খুলেই বলবে সে লুকিয়ে। আর বাকি সকলের জন্য অত মিথ্যার জাল বোনবার দরকারই বা কি!

…নিজের স্বামীর উপর তার আস্থা আছে। মনে মনে ছবিটা কল্পনা করছিল সে। সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে' শুনবে, তারপর ছোট্ট হাসির আভায় মিলিয়ে যাবে সমস্ত ভ্রূকুটি।

…গোঁসাইজির সঙ্গে জীবনে আর দেখাই হবে না হয় তো।

…সদারঙ্গবিহারীলাল? হ্যাঁ, ও ভদ্রলোককে সামলাতে হবে। মোটরবাইকে চড়ে' আর অধিক দূর অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই ওকে রুখতে হবে। ওঁকে সঙ্গে করে' নিয়ে গেলেই হবে না হয় তাঁর বাড়িতে একদিন। এখান থেকে কত দূরই বা। কিন্তু না, একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। গোঁসাইজির হিন্দু পান্থনিবাসে অবস্থিত সেই অতিকায় ছাপ্পর খাটে যে রহস্য নিহিত আছে তার খবরটা ভদ্রলোক জানেন যে। একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে বই কি। যিনি তাঁদের একখাটে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি ছাড়া সদারঙ্গবিহারীলালই এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়ঙ্কর সাক্ষী। পরেশ কিম্বা ছকুবাবু তার সাজানো-স্বামীটিকে চাক্ষুষ করে নি বটে, কিন্তু সদারঙ্গবিহারীলাল রীতিমত গল্প করেছেন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে' উচ্ছ্বসিত হয়ে। গোঁসাইজি নিশ্চয় তাঁর কাছে তাদের পাশাপাশি শুয়ে থাকার গল্পটাও করেছেন। গোঁসাইজি যে রকম নিখুঁত প্রকৃতির লোক—নিজের গল্পকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য সদারঙ্গবিহারীলালকে উপরে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ছাপ্পর খাটটা দেখিয়েওছেন হয়তো। মোট কথা, যা জানবার সবই তিনি জেনেছেন এবং যে রকম উর্ব্বরমস্তিষ্ক উৎসাহী লোক, হয় তো অনেক কিছু রংও চড়িয়েছেন তাতে কল্পনা থেকে। না, সদারঙ্গবিহারীলাল সম্বন্ধে সাবধানতার খুবই প্রয়োজন আছে।

…সুশোভনের সম্বন্ধেও। ওই স্বল্পবুদ্ধি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটিকে রীতিমত তালিম না দিয়ে অমন হুড়মুড় করে পাঠানোটা ঠিক হয় নি মোটেই। কোন অবস্থায় কি বলতে হবে, তা অন্তত বলে' দেওয়া উচিত ছিল। অনীতার

কাছে সাফাই গাইবার জন্ম উলটো-পালটা যা-তা বলে' বসবে হয় তো।

…ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর মাথায় আকাশটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে এল বেশ। দাঁড়কাকগুলো আরও জোরে চীৎকার করছে। মালীটা ঘাড় তুলে চেয়ে দেখলে একবার, তারপর টবটা মাটিতে নাবিয়ে ছুটল তার ঘরের দিকে। বাছুরটাও ছুটে পালাল। বৃষ্টি এল। মানুষের বহুবিধ ভ্রান্তির জন্ম রোষে ক্ষোভে দুঃখে প্রকৃতি যেন কেঁদে ফেললেন।

সান্ত্বনা উঠে ভিতরে গেল। তার চিত্ত তখন রীতিমত বিচলিত।…

পরেশ এসে সসম্ভ্রমে খবর দিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। সান্ত্বনা গিয়ে দেখলে ছকুবাবুও চায়ের টেবিলে সমাসীন। সান্ত্বনার হাব-ভাব দেখে দমে' গেলেন কিন্তু ছকুবাবু। যে রকম উচ্ছলতা তিনি আশা করেছিলেন তাতো মোটেই নেই। মিইয়ে গেল কেন হঠাৎ! তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। নানাপ্রসঙ্গ উত্থাপন করে' ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ছোট ছেলের সঙ্গে ভাব করবার জন্তে লোকে যেমন নানা উপায় উদ্ভাবন করে, ব্যাপারটা অনেকটা সেই গোছের দাঁড়াল। কিন্তু তেমন জুত করতে পারলেন না তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল একটা অদৃশ্য যবনিকা যেন সান্ত্বনার মনকে তাঁর রসিকতা-কিরণ থেকে আড়াল করে' রাখছে। মনে মনে চটতে লাগলেন খুব, অথচ মুখে দেঁতো হাসি হেসে নানা রকম রসিকতাও করে' যেতে লাগলেন। সান্ত্বনাও গম্ভীরভাবে শুনে যেতে লাগল। খাদ্যপ্রসঙ্গে অবতীর্ণ হলেন শেষে ছকুবাবু। কোনও দিক থেকে সুবিধে করতে না পেরে মনের নেপথ্যলোকে রাগটা জমে' উঠেছিল বেশ। ঝালটা ঝাড়লেন ডালের উপর। লুচির সঙ্গে ঘন বুটের ডাল ছিল খানিকটা।

"ডালটা ভাল লাগছে আপনার? রাম কহো, এর নাম কি ডাল! এরা কি ডালের মর্ম্ম বোঝে! বুটের ডাল বলে' চেনবার উপায় আছে! ঘেঁটেঘুঁটে লেই বানিয়েছে একটা। আমার 'খাওয়াশ'টা যদি থাকত, ডাল কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম আপনাদের। আপনাদের 'খাওয়াশ' কি বাঙালী? 'খাওয়াশ' আছে নিশ্চয়"

"না বোধহয়। 'খাওয়াশ' জিনিসটা কি"

"সীতারাম, আপনি বুঝি বাইরে এক ডেগও যান নি। 'খাওয়াশ' মানে চাকর"

"ও। না, বাংলার বাইরে আমি যাই নি কখনও"

"তাহলে ডালের মর্ম্মই বোঝেন নি। ওদেশের বুটের ডাল, বুটের হালুয়া, পুদিনার চাটনি, লিট্টি, ডালরুটি, তিলুয়া, ঠেকুয়া, সিদ্ধির সরবৎ—অপূর্ব্ব জিনিস সব। আবার ওদেশে ফিরতে হবে দেখছি। ডালই আমাকে তাড়াবে এ দেশ থেকে"—

"ওদেশের ডাল খুব ভাল বুঝি"

"বেশক্"

"শুনে আমারও যেতে লোভ হচ্ছে"

মুচকি হেসে বললে বটে সান্ত্বনা, কিন্তু তার একটুও ভাল লাগছিল না। একটু আগে সামনের বারান্দার বেতের চেয়ারটিতে একা বসে তার মনে যে শান্ত স্নিগ্ধ ভাবটি এসেছিল তা যেন খিঁচড়ে গেল। একটা অজানা আশঙ্কা তার মনের শান্তিকে বিঘ্নিত করছিল, এই ছকুবাবু লোকটির অসহ্য আস্ফালনও নষ্ট করছিল এখানকার নির্জ্জন স্নিগ্ধতাকে। মনে হচ্ছিল একটা বাঁদর যেন এসে মন্দিরে ঢুকেছে।

আহারান্তে ছকুবাবু উঠলেন এবং দাঁড়ালেন গিয়ে জানলার ধারে। বৃষ্টিটা থেমেছে। একটু-আধটু রোদও দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতির মেজাজটা একটু যেন প্রসন্ন হয়েছে মনে হল। ছকুবাবুর মেজাজও প্রসন্ন হয়েছিল। সে কথা বললেনও তিনি। এমন কি বৈকালিক ভ্রমণের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। বললেন—"দেখে আসি ওরা কোনদিকে গেল। আপনি যাবেন? চলুন না"। সান্ত্বনা ভদ্রভাবে অসম্মতিজ্ঞাপন করাতে একাই বেরিয়ে পড়লেন তিনি।… বারান্দায় সূর্য্যালোক এসে পড়ল আবার। মালীটা তার ঘর থেকে বেরিয়ে আবার গামলাগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। সুরেশ্বরী দেবীর বুড়ো স্প্যানিয়েলটা থাবার উপর মুখ রেখে শুয়েছিল গম্ভীরভাবে। ঝুনু তার চারদিকে লাফালাফি করে' তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু উৎসাহের কোনও লক্ষণ প্রকাশ করল না সে। প্রবীণ দাদামশাই দামাল নাতনীর দুরন্তপনা সহ্য করেন যেমন ভাবে—তেমনি একটা মুখভাব করে' সে থাবার

উপর মুখ রেখেই শুয়ে রইল। সাইকেল দেখা গেল দূরে একটা। টেলিগ্রাফ পিওন। সুরেশ্বরী দেবীর নামে টেলিগ্রাম। সান্ত্বনাই সই করে' নিলে। হলদে খামটার দিকে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে'। কার টেলিগ্রাম হতে পারে? খুলবে? না, সেটা উচিত হবে না। ভিতরে গিয়ে পরেশের হাতে দিয়ে দিলে সেটা। পরেশ সুরেশ্বরী দেবীর চিঠি লেখার টেবিলে এমনভাবে সেটা রেখে দিলে—যাতে এসেই তিনি দেখতে পান।

মৃত্যুর সম্বন্ধে যেমন ঝড়বৃষ্টির সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। প্রত্যেক মানুষের ধারণা আমি ঠিক বেঁচে যাব। বৃষ্টিটা অপ্রত্যাশিতভাবে মোটেই আসে নি। আকাশ অনেকক্ষণ থেকেই ঘনঘোর হয়েছিল। তবু কিন্তু অনেকগুলি লোক ভিজে গেলেন এতে। রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় একজন। সুরেশ্বরী দেবী আর একজন। মাধব গোমস্তার বাড়ি থেকে বেরিয়েই বৃষ্টিটা পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি ফিরলেন না, কারণ একটু-আধটু বৃষ্টিতে ভিজলে তাঁর কিছু হয় না, এই তাঁর ধারণা। দ্বিতীয় কারণ শিকারীদের জন্যে যে খাবার তিনি এনেছেন তিনি না গেলে সেগুলো অভুক্তই পড়ে থাকবে। গ্রামের আরও যে দু'জন লোক শিকারে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরাও ভিজেছিলেন বেশ। গোবর্দ্ধনবাবু ভিজে ন্যাতা হয়ে গিয়েছিলেন বললেই হয়। শিকারের উৎসাহ-বহ্নিতেও জল পড়েছিল প্রচুর। প্যাচপেচে কাদায় ছপ ছপ করতে করতে একটা বড় গাছতলায় সবাই সমবেত হলেন এসে!

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড"—দিগ্বিজয় বললেন সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে—"এঃ—বড্ড ভিজে গেলে যে তুমি। আর শিকারে কাজ নেই, চল বাড়ি ফেরা যাক"

"আমি? আমি কিচ্ছু ভিজি নি। কিন্তু আমার মনে হয় ফেরাই ভাল; তুমি বড্ড ভিজেছ—এঁরাও—"

"কি যে বল, আমি একটুও ভিজিনি"

"তোমার গা থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি বলছ ভিজিনি!"

"টপ টপ করে' জল পড়ছে ওয়াটার প্রুফ বেয়ে। ভাগ্যে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম। ভিতরে কিছু ভেজেনি আমার। শোন, গাড়ি ক'রে তুমি বরং ফিরে যাও, তোমার শাড়ি ভিজে সপসপ করছে"

সুরেশ্বরী দেবী চুপ করে' রইলেন।

"সত্যি, তোমাদের শিকারটা মাটি হল"

"বিশ্রী দিন আজ। কিচ্ছু ভালো লাগছে না আমার"

এ সুযোগ সুরেশ্বরী দেবী উপেক্ষা করলেন না। দিগ্বিজয় নিজমুখে স্বীকার করেছেন তাঁর কিছু ভাল লাগছে না!

"চল তবে ফেরাই যাক"

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিজয়িনীসুলভ সুর বেজে উঠল।

অন্যান্য পথিকরাও ভিজেছিলেন এ বৃষ্টিতে। একটি বুড়ো চাষা ভিজতে ভিজতে ছুটছিল। শুধু ছুটছিল না, চীৎকারও করছিল প্রাণপণে।

গণেশ খুব ভেজেনি। তার গাড়ির রেডিয়েটার আবার খারাপ হয়েছিল। ঝুঁকে তারই তদারক করছিল সে, এমন সময় বৃষ্টিটা এল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভিতর ঢুকে সে জানলার কাচগুলো তুলে দিলে—আর বিরক্ত মুখে ভাবতে লাগল কি অশুভক্ষণেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল!

সুশোভন বেশ ভিজেছিল। কিন্তু নিজের চিন্তাতেই এত তন্ময় ছিল সে যে বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না তার। সে হাঁটছিল। দ্রুতবেগে হাঁটছিল ফাৎনা-ফিরিঙ্গিপুর অভিমুখে। আর মনে মনে ভাববার চেষ্টা করছিল কোন ট্রেণ কখন পাওয়া যাবে, কাকে কি টেলিগ্রাম করবে, আর ফোন করবার সুযোগ যদি পাওয়া যায় কি বলবে ফোনে।

স্বয়ম্প্রভা দেবী যে ট্রেণটায় আসছিলেন সেটাও ভিজেছিল বৃষ্টিতে। জিতুবাবু সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তুমি বাজে কথা বলে' অন্যদিকে আমার মন ফেরাবার চেষ্টা করছ বুঝতে পারছি। কিন্তু অন্য কোনও কথা ভাবব না আমি এখন। ভাবতে চাই না"—জিতু সরকার আর কিছু না বলে বাতায়ন পথে বাইরের দিকে চেয়ে রইলেন। সেই একই ট্রেণে—ঠিক তিনটি কামরা পরে—অধ্যাপক ব্রজেশ্বরবাবুও ছিলেন। তিনি এককোনে বসে' সেদিনকার কাগজটা পড়ছিলেন নিবিষ্টচিত্তে। কাচের জানালাটা বন্ধ ছিল। বৃষ্টির সঙ্গে

বাইরের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' চাইলেন তিনি একবার, তারপর আবার কাগজে মন দিলেন।

বাইক-বিহারী সদারঙ্গবিহারীলালেরই সব চেয়ে বেশী ভেজা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি উর্দ্ধশ্বাসে বাইক চালিয়ে হনুমানপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন ঠিক। বিশেষ ভেজেন নি।

যাঁর ভেজবার কথা নয়, যিনি কখনও কোনও উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চান না, সেই গোঁসাইজি ভীষণভাবে পড়ে গেলেন এই উচ্ছৃঙ্খল ঝড় বৃষ্টির খাম-খেয়ালী খপ্পরে। গোঁসাইজি কদাচিৎ বাড়ি থেকে বের হন। কিন্তু সেদিন প্রিয়বন্ধু নিতাই বৈরাগী নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে। বাড়িটা একটু দূরে হওয়াতে যাবেন কি না ইতস্তত করছিলেন—কিন্তু জনৈক সহৃদয় গাড়োয়ান বিনা ভাড়ায় নিজের গরুর গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল যখন, তখন আর দ্বিধা রইল না। ফিরতি মুখে গাড়োয়ান নিয়েও আসবে তাঁকে। তিনি কদকা এবং পার্শ্ববর্ত্তী তাড়ির দোকানের চাকর গোকুলের হাতে তাঁর হিন্দু পান্থনিবাস ও অসুস্থ গুরুভগ্নীর ভার দিয়ে নিতাই বৈরাগীর সঙ্গসুখ লাভ করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটি ছাতাও ছিল তাঁর—রেলিব্রাদার্সের বৃহত্তম ছাতা, উপরে শাদা কাপড়ের মলাট দেওয়া—তবু কিন্তু তিনি রক্ষা পেলেন না। ঝড়-বৃষ্টির সমস্ত তোড়টা তাঁর উপর পড়ল এসে। (ক্রমশঃ)

মহাপ্রয়াণে

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

দেবতাত্মা হিমবান্ পর্বতের পাদদেশে আসমুদ্র বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ নামে এক দেশ আছে। সেই হিমবান্ পর্বতে দেবতারা কখনও কখনও লীলার ছলে অবতরণ করেন। গঙ্গাযমুনাসিন্ধুকাবেরীর কলঝঙ্কারে তাঁহাদের নূপুরশিঞ্জিত শোনা যায়। হিমালয়ের তুহিন প্রপাতে তাঁহাদের শুভ্র চরণ চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। ধূপের গন্ধের মতো, হোমানলের লীলায়িত শিখার মতো সেই দেবতাদের গমন ছিল উর্দ্ধমুখী।

কিন্তু মুনি-ঋষি-অধ্যুষিত পবিত্র ধাম, যোগী তপস্বীদের সাধন ক্ষেত্র, ভক্তকোবিদগণের লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষ বিপন্ন, সন্ত্রস্ত, পরপীড়নে লাঞ্ছিত দেখিয়া একটি প্রধান দেবতা নামিয়া আসিলেন শৈলশিখর হইতে আমাদেরই এই মর্ত্ত্যধামে। তাঁহার আবির্ভাবে বুঝি জলদ গর্জন করিয়াছিল, পর্বত টলিয়াছিল, প্রসন্নসলিলা নির্ঝরিণী ছুটিয়াছিল। কত সাধক, কত ধ্যানী, যতীব্রতী দেবত্বের আরাধনায়, অহিংসার অর্চনায় নিবিষ্ট হইল।

রাজার রাজসিংহাসন সহসা টলিয়া উঠিল, অত্যাচারের হস্ত হইতে বজ্র অকস্মাৎ খসিয়া পড়িল, উদ্যত শাণিত ছুরিকা কোষবদ্ধ হইল, রক্তপিপাসু আততায়ী প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আলিঙ্গন করিল, চিরদরিদ্র অন্নহীন বস্ত্রহীন সুখের স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিল। সেই দেবতার মস্তকে আকাশ হইতে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইল।

ভারতবর্ষ মহান্ দেশ। মহান্ তার আত্মা। সেই দেবতা যখন জলদ মথিত করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে উদিত হইলেন, তখন দশদিক্ প্রসন্ন হইল—সমস্ত গ্লানি কলঙ্ক কালিমা মুছাইয়া নির্মল বায়ু প্রবাহিত হইল। ইনি ভারতের আত্মা? হাঁ, এই দেবতাই ভারতাত্মা মহাত্মা। দীনদুঃখী কাঙ্গালের কানে কানে কে আশার বাণী বলিল? কে চাহিল তাহাদের মুখের পানে করুণায় বিগলিত হইয়া? কে চাহিল অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়া ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী করিতে? কী দেখিলাম! হিংসা মাথা নত করিল, সত্য মাথা উঁচু করিল, ভয় পলাইল ভয়ে। অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, অথচ হিমালয়ের দৃঢ়তা, পাষাণের মতো অচল অটল! দুর্বলের যে বল আছে, তাহা কে জানাইয়া ছিল? সেই বলের কাছে রাজশক্তি পরাভব মানিল, ধনমদ রাজপদ কৌলীন্য ভাসিয়া গেল। অস্পৃশ্য নিরন্ন মলিন যে, তাহার জন্য কে কোল পাতিয়া দিল? ভারতের মানচিত্রে সোনালী রঙ ধরিল। আবার ভারত রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখিল। কোটী কোটী জয়ধ্বনি করিয়া চারিদিকে ছুটিল; আসমুদ্র হিমাচল প্রাণের প্রাচুর্যে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুদূর পল্লীবাসী নিরক্ষর দীনাতিদীন ব্যক্তিও সেই মহাত্মাকে জানিল, বুঝিল, প্রণাম করিল। বিরাট জনসংঘ—এক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ছুটিল এক আলোকলোকের পানে, যেখানে উচ্চ নীচ নাই, যেখানে ধনী দরিদ্র নাই, যেখানে সাম্য, মৈত্রী, শান্তি বিরাজ করে। থামাও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা—এই যুদ্ধে পশুবলের স্থান নাই। বিশ্ববাসী বিস্ময়ে দেখিল তপস্যার বল, অহিংসার কল, দেখিল মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল গরিমা। দিকে দিকে পড়িয়া গেল সাড়া। রাজা, রাজপুরুষ, সেনাধ্যক্ষ, ধর্মযাজক, কোটীপতি সকলে চাহিয়া দেখিল অর্দ্ধনগ্ন ফকির বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী। কত কুসুমগুচ্ছ পথে আস্তীর্ণ হইল, কত তোরণে

তোরণে পতাকা উড়িল, ধরণীর ধুলা পবিত্র হইয়া গেল—শান্তির এই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহের পদরজে। জগতের রক্তরাঙা আকাশে ভাসিয়া উঠিল একটি অমলধবল নিষ্কলুষ মূর্ত্তি—বিশ্ব তাঁহাকে ভারতের আত্মা বলিয়া বন্দনা করিল।

কিন্তু পুণ্যভূমি ভারতের সৌভাগ্য সূর্য্য মধ্যাহ্নে অস্তমিত হইল। আলোকের পথচারী, অহিংসা মন্ত্রের ঋষি, সর্বদেশের সর্বকালের পবিত্র ধ্যানমূর্ত্তি হিংসার কবলে ঢলিয়া পড়িল। শ্বেত শতদল রক্তে ভাসিয়া গেল—যিনি জগৎ হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিতে আসিয়াছিলেন, বিধাতা তাঁর অমলিন রক্ত বলিরূপে গ্রহণ করিলেন। যুগে যুগে দেবতা মানুষের পাপের চিতানলে আত্মাহুতি দিয়াছেন। আবার কালচক্রের আবর্ত্তনে অতীতের পুনরাবৃত্তি হইল।

যাহাদের জন্য তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল দুর্দিনের মাঝে, যাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তিনি দুঃখকে চিরসাথী করিয়াছিলেন, যাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি কারাবরণ করিয়াছিলেন, অনেক সময় আমরণ অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাদের রক্তরঞ্জিত পল্লীপথে পুরীষকণ্টককঙ্করের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন বিচরণ করিয়া আসন্ন-মৃত্যুভয়ের মধ্যে আশার বাণী বহন করিয়াছিলেন, সেই আমাদেরই একজন একদিন সন্ধ্যায় চাহিল তাঁহার অমূল্য প্রাণ। পদতলে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিল তাঁহার মৃত্যু। অগ্নিবাণে ঝরিল বিমল নিষ্কলুষ শোণিত-গঙ্গা—এমন অমল পবিত্র নিষ্কলঙ্ক রক্তনির্ঝর আর কখনও বুঝি ধরণী চুম্বন করে নাই। হায়, হায়, কী লজ্জা, কী বিড়ম্বনা, কী নিষ্ঠুর নির্মম নৃশংসতা! পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত কত পাহাড় পর্বত নদীসমুদ্র পার হইয়া বিদ্যুৎ ঝলকে ভারতের সেই মহাপাতকের কাহিনী, সেই দুরপনেয় কলঙ্কের বার্ত্তা নিমেষ মধ্যে প্রচারিত হইল। জগৎ হইল নিস্তব্ধ, বিশ্ববাসী হইল চকিত, ত্রস্ত, শোকার্ত্ত; অভিশপ্ত ভারতের গগনে পবনে উঠিল হাহাকার!

জীবনে যিনি ছিলেন মহাত্মা, মরণে তিনি হইলেন দেবতা। তাঁহার নিরস্ত্র সংগ্রাম দেখিয়া যাহারা একদিন উপেক্ষা ভরে বলিয়াছিল, পাগল, স্বপ্নবিলাসী, অবাস্তবের পূজারী—তাহারাই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—দেবতা; মরজগতের অমৃত শিশু। তিনি চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু কান পাতিয়া শোনো দেবতারা বলিতেছেন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। বিশ্বমানব ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া একতান বাদ্য বাজাইতেছে—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। জীবনের সাধনা কি এতদিনে ফলিবে? তোমার জীবনের মহাদান—একতা, মৈত্রী, শান্তি—সার্থক হউক। আমরা তোমার যোগ্য সন্তান হইতে পারি নাই, এ দুঃখ আমাদের চিরদিন বহন করিতে হইবে। উপায় নাই। ভবিষ্যতের বংশধরেরা গাহিবে:

> যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।

যার বিশালতটে ভারতের বিশাল আত্মা, বিশ্বমানবের মুকুটমণির চিতাস্থলী কোটী কোটী নরনারীর তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নরের দানব-রূপ হ'ল সপ্রকাশ—
ঘাতকের গুপ্ত-খড়্গ ঝলসি উঠিল আরবার;
ধরণী রচিল পুনঃ ঘৃণ্য-ইতিহাস।
বৃহত্তের বৃহত্ত্বেরে করি অস্বীকার!
শতাব্দীর কাল-স্রোতে যত নিপীড়ন,
মধ্যযুগের বর্ব্বরতার উন্মাদ উৎসাহে;
যুগে যুগে শুধু চলে সমুদ্র মন্থন,
দেবাসুর দ্বন্দ্বের অনন্ত-প্রবাহে।
ভারত মথিত করি উঠিল গরল,
নীলকণ্ঠ তুমি এলে বরাভয় লয়ে;
আকণ্ঠ করিলে পান তীব্র হলাহল।
মূল্যবান ধরিত্রীর অশুভ সঞ্চয়ে।
হে গান্ধী, হে দীপ্ত সূর্য্য তব অস্তাচল,
সত্যেরে দানিল পুনঃ উচ্চ সিংহাসন!
অপার্থিব ত্যাগ-রশ্মি দারুণ উজ্জ্বল,
ছিন্ন করি অসত্যের মূঢ়তা বন্ধন!

গান্ধী-প্রয়াণে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

তুমিও চলিলে ছাড়ি'? কে রহিল আর!
আজি এ ভারত জুড়ে সান্দ্র অন্ধকার
ঘনাইছে ধীরে।
হায়, ওরে মূঢ় দেশ,
এ দুর্দ্দিনে ধরি' শিরে কাহার নির্দ্দেশ
চলিবি সমুখপানে? ওগো কর্ণধার,
টলমল এ তরণী কে রাখিবে আর
উদ্দাম আবর্ত্ত মাঝে তোমার বিহনে?

হিংসা দ্বেষ লোভ পাপ মাৎসর্য্য দহনে
দগ্ধ এ জাতির মাঝে তব সম নিধি
অজস্র পুণ্যের ফলে দিয়েছিল বিধি
আমাদের। কাচ মূল্যে লভিয়া কাঞ্চন—
দূরে ফেলে দেয় ছুঁড়ে বর্ব্বর যে জন!
এমনি বর্ব্বর মোরা; আজি তুমি নাই,—
পথে পথে কেঁদে তোমা খুঁজিয়া বেড়াই!

শহীদ সূর্য সেন

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ১৯৩০ সাল এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা ক'রে গেছে। রক্তাক্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে সে কাহিনী পৃথিবীর মাটির বুকে—লেখা আছে মানুষের মনের পাতায়। ইতিহাস আনত-শ্রদ্ধায় বহন করবে চিরদিন সেই গৌরবমণ্ডিত সংগ্রাম কাহিনী।

উদয়াচলের রক্তলেখার মতই জ্বলে উঠেছিল সেদিন এই বাংলার বুকে বিপ্লবের বহ্নিশিখা। দুর্বার হ'য়ে উঠেছিল জাতীয় জীবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ বঞ্চিত জাতির প্রাণতন্ত্রে ঝংকার দিয়ে উঠেছিল মুক্তির মহা আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল বাংলার মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায়—শাসন-শোষণ দুষ্ট জীবনের গ্লানি অসম্মান ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল তাদের সবুজ অন্তর। অধীনতার কলংক মোচনে তাই হ'য়ে উঠেছিল তারা দুর্বার দুর্বিনীত। দেশ-মাতৃকার মুক্তি সাধনায় জীবন মরণ পণ ক'রে তাই চালিয়েছিল তারা শিকল ছেঁড়ার ভয়াল ভীষণ অভিযান। মনে ছিল তাদের ব্রত উদ্‌যাপনের অক্ষয় সংকল্প, স্বাধীনতার অপরূপ স্বপ্ন—চক্ষে ছিল অটলতার গভীর দীপ্তি। জীবনের জয়গান শাশ্বত হ'য়ে আছে তাদের মর্মছেঁড়া বেদনা আর অকুণ্ঠ সাধনার মধ্যে।······

সেদিন চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে বুকের তপ্ত শোণিত ঢেলে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাময়িক পরাজিত করতে সমর্থ হ'য়েছিল তাদের অধিনায়ক ছিলেন চট্টলের নোয়াপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত রাজমণি সেনের পুত্র সূর্য সেন।

কবে এবং কেমন ক'রে সূর্য সেন বিপ্লব-ধর্মে দীক্ষিত হ'য়েছিলেন তার কোন সঠিক বিবরণ জানা যায় না; তবে অনুমান হয় বাল্যকাল থেকেই তাঁর অন্তরে বিপ্লবের অংকুর-উন্মেষ হ'য়েছিল। তাঁর কর্মনিষ্ঠার প্রথম পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বহরমপুর কলেজের ছাত্রজীবনেই। তখন থেকেই এই স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী কর্মীটির প্রতি ভারতের রাজনীতিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তার পরে বহরমপুর থেকে শিক্ষাশেষ ক'রে চট্টগ্রামে ফিরে শিক্ষকতা শুরু করলেন তিনি। সেই সঙ্গে শুরু করলেন তরুণদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষাদান তাঁর সার্থক হ'য়ে উঠলো—সার্থক হ'য়ে উঠলো তাঁর বিপ্লববাদ প্রচার। তরুণদলের সবুজ প্রাণে বিদ্রোহের যে বীজ ধীরে ধীরে রোপন করলেন তিনি, স্বল্পকালের ভেতরই তাতে অংকুর উদ্‌গম হ'ল। রাজনৈতিক বিপ্লববাদ ও রাষ্ট্রিক আদর্শকে পুরোভাগে রেখে এগিয়ে চললেন তিনি দুঃখ জয়ের পথে। প্রাণের বিপুল আকাংক্ষায়, হৃদয়ের সমস্ত আকাশে, আত্মার সর্ব অভ্যুত্থানে সূর্য সেন চেয়েছিলেন তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ সার্থক করে তুলতে। এই খাটো মানুষটিকে কেন্দ্র ক'রেই সেদিন সারা চট্টগ্রামে অনুভূত হ'য়েছিল এক প্রচণ্ড বৈপ্লবিক স্পন্দন—সাফল্যগৌরবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল সেই রোমাঞ্চকর বিপ্লব প্রচেষ্টা।

মানুষকে ভালোবাসতে জানতেন সূর্য সেন—ভালোবেসেই মানুষকে মানুষের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি। জনসাধারণের প্রতি গভীর মমতা, পীড়িত অসমর্থ মানুষের প্রতি সহজাত সহানুভূতি সূর্যবাবুকে একান্ত আপনার ক'রে তুলেছিল সাধারণের কাছে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরের অন্তর জয় ক'রে নিয়েছিলেন সূর্যবাবু। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালোবেসেই শুধু সুখী হ'তে পারেনি—দেবতা জ্ঞানে পূজা ক'রেও ধন্য হ'য়েছে।

বৈদেশিক বণিকরাজের শোষণ-শাসনে শ্রান্ত নিরীহ ভীরু ভারত-বাসীর শান্ত জীবন-সরোবরে সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক চেতনা এনেছিলেন প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। অত্যাচারী শ্বেত জাতির পদ-পেষণে নিপীড়িত ভারতবাসী অপমান জর্জর বক্ষে শুধু প্রাণেই বেঁচে ছিল কোনরকমে—নিজেদের সর্ববিষয়ে নিঃশেষ করে। সে অপমানের প্রথম প্রতি-শোধ নিতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন মজঃফরপুরে প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম। তাঁদের হাতের বোমা মজঃফরপুরের রাঙা মাটিতে যে ভীষণ শব্দ তুলে-ছিল, তার প্রতিধ্বনি জেগেছিল সারা ভারতের জাতীয় জীবনে। সেই বিস্ফোরণের দিগন্তব্যাপী প্রতিশব্দে জড়িয়ে ছিল জাতির প্রতি জাগরণের বিপুল আহ্বান—জীবন-মৃত্যু পণ ক'রে ভারতের বন্ধন-মুক্তির জন্ম জাতির প্রতিটি যুবকের হৃদয় দ্বারে আহ্বান। তারপর দেখা দিলেন যতীন্দ্রনাথ—অপূর্ব বিপ্লবী বীর শহীদ যতীন্দ্রনাথ। তিনি সন্ধান দিলেন দেশকে নতুন পথের। জানিয়ে দিলেন—জাতিকে শুধু জাগালেই চলবে না, সেই জাগরণের সঙ্গে তাকে প্রস্তুত হ'তে হবে যুদ্ধের জন্ম। কেবল মাত্র বাণী প্রচার ক'রেই নিরস্ত হননি যতীন্দ্রনাথ—সে বাণীকে কার্যে পরিণত করতে গিয়ে বিদ্রোহীবীর যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিলেন বালেশ্বরে—নবভারতের নতুন হলদিঘাটে।

তারপর দেখতে দেখতে সারা ভারতের মাটিতে জ্বলে উঠলো বিপ্লবের আগুন—কেঁপে উঠলো পরাধীন দেশের প্রাণ। বিপ্লব আর শুধু শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না, জনগণের মধ্যেও দেখা দিল জাগরণ। এই নতুন বিপ্লবের ক্ষেত্রেই প্রথম দেখা দিলেন সূর্য সেন। সেটা ছিল ১৯১৭ সাল। বহরমপুরে যতীন্দ্রনাথের 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সে-সময় সূর্য সেন জড়িত। যতীন্দ্রনাথ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত এবং তাঁর বহরমপুরের সহকর্মী অতুল ঘোষ আর সতীশ চক্রবর্তী পলাতক। কিন্তু ভাঙা দল তখনো সক্রিয়। যতীন্দ্রনাথের আদর্শে সূর্য সেন তৈরী করেছিলেন নিজেকে। যে বিপ্লব ঐতিহ্যের মধ্যে সূর্য

সেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন তাতে শুধু বিপ্লব আর আন্দোলনেরই স্থান ছিল না—যুদ্ধের প্রেরণাও তার সঙ্গে জড়িত ছিল। সেই আদর্শকেই সাথী করে তিনি বহরমপুর থেকে চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে একটি বিশেষ বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে তাঁর নেতৃত্বে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যে। সূর্যবাবুও এই সময় কংগ্রেসে যোগ দেন—চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকরূপে। যুগান্তরের কর্মীরা তখন কংগ্রেসের কাজের ফাঁকেই বাংলার নানাস্থানে অনেকগুলি আশ্রম স্থাপন ক'রে ফেলেন। সূর্যবাবুও 'সাম্যাশ্রম' নামে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন চট্টগ্রামে কর্মী গড়ে তোলার জন্য। জালালাবাদের যুদ্ধে চট্টগ্রামের যে সব বিপ্লবী বীর শহীদ হ'য়েছেন তাঁরা সকলেই এই সাম্যাশ্রমের কর্মী ছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বিদেশী শাসকগোষ্ঠী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশংকায়। সন্ত্রাসবাদীদের উৎখাত করার জন্য তাই সরকারের পক্ষ থেকে চলে ছিল অবাধ দমননীতি। এই সময় প্রায়ই কলকাতায় আসা যাওয়া করতে হ'ত সূর্য সেনকে, বাইরের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ও স্থানীয় সংঘ গুলিকে উজ্জীবিত ক'রে তোলার জন্য। এই সময়েই তাঁর সংগঠন প্রতিভা আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে কোন দিনই আটকায় নি তাঁর। সর্বক্ষেত্রেই দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাঁর সুপরিস্ফুট।

চট্টগ্রামের 'সাম্যাশ্রম' 'যুগান্তর' দলেরই একটি অংশ বিশেষ ছিল। চট্টগ্রামে ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মী, চট্টগ্রাম শাখা নামে অপর একটি বিপ্লবী সংঘও ছিল, যার সভাপতি ছিলেন মাষ্টারদা সূর্য সেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান 'অনুশীলনে'র কর্মীগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন সূর্য সেন নিজের মধুর ব্যবহার ও প্রতিভা বলে।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের সম্মুখে, জাতির সম্মুখে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের আদর্শ স্থাপন করলেন মহাত্মাজী। ফলে বিপ্লবীরা কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও সংহতভাবে আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তোলার কাজে এগিয়ে এলো। গোপন কার্যকলাপে ভাটা পড়লো তাই সাময়িকভাবে। তারপর যখন চৌরীচৌরার ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থানে গান্ধীজী বিনাসর্তে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন, বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি কিন্তু সায় দিলে না তাতে। ১৯২৩ সাল থেকে আবার তৎপর হ'য়ে উঠলো সন্ত্রাসবাদীদল। সরকারের চণ্ডনীতিও উগ্ররূপ ধারণ করলে। ১৯২৪ সালে বাংলার বহু তরুণকে আইন ও শৃংখলার নামে বিনাবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল। সূর্য সেনও এ নিগ্রহ এড়াতে পারেন নি। প্রথমে তাঁকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে এবং পরে বোম্বায়ের রত্নগিরি ও বেলগাঁও জেলে রাখা হয়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি চট্টলের আরো অনেক বীরকেই সেই সঙ্গে সরকার আটক করেন।

১৯২৮ সালে জেল থেকে বেরিয়েই পুনরায় বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন সূর্য সেনের দল। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সম্মেলন হল, সেই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ, প্রকাশ্যে শরীরচর্চা ছাড়াও বিশেষ কিছু শিক্ষা দেবার গোপন ব্যবস্থাও স্থিরীকৃত হল। বন্দুক ছোঁড়া, তরবারী চালনা, মোটর চালানো প্রভৃতি আরো অনেক কিছুই সেই বিশেষ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত ছিল। বোমা প্রস্তুত করার কাজ বাছাই করা ছেলেদের দেওয়া হ'ত। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে ধুলো দিয়ে তাঁরা এক ব্যাপক পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করার চেষ্টায় সচেষ্ট হ'য়ে উঠলেন। বিপ্লবের জন্য চাই ব্যাপক প্রস্তুতি আর সেই সঙ্গে বিপুল প্রয়াস; সীমাবদ্ধ প্রয়াসের ক্ষণিক সাফল্যের উত্তেজনাকে কখনোই প্রশ্রয় দেন নি সূর্যবাবু, তাই আগ্রহী হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি বাইরের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে। আশা করেছিলেন—দেশের একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যদি এক সঙ্গে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সূচিত হয়, তাহলে সে সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়বে অনিবার্যরূপে দেশের সর্বত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাইরের সমকর্মীদের সহযোগিতা আশানুরূপ লাভ করেন নি তিনি। তথাপি নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হয় নি সূর্য সেনের দল। চট্টগ্রামের মাটির ওপর দিয়ে বিদ্রোহীদলের সশস্ত্র অভিযান স্বাধীনতার ইতিহাসে আপন স্বাক্ষর রচিত ক'রে গেছে।......

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সারা ভারতবর্ষে উৎসাহের বন্যা বয়ে গেল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংঘও রীতিমত তৎপর হ'য়ে উঠলো চূড়ান্ত সংগ্রামের একটা বিরাট আয়োজনে।

১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল সাম্রাজ্যবাদী স্পর্ধার ওপর চরম আঘাত দেবার জন্য শুরু হ'ল গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে নবতমরূপে প্রতিভাত হ'লেন ভারতের মহামানব—অর্ধনগ্ন ফকির গান্ধীজী। একগাছি যষ্টিমাত্র হাতে নিয়ে জাতির জনক মহাত্মাজী একাকী বার হ'লেন পথে লবণ সত্যাগ্রহের জন্য। কৃশকায় কৌপীন-পিনদ্ধ সন্ন্যাসীর পদভরে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি। মুখর হ'য়ে উঠলো জনহীন পথপ্রান্তর। এক প্রান্ত থেকে ভারতের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বয়ে গেল একটা মহা আলোড়ন। অত্যাচার প্রপীড়িত পরাধীন জাতির জীবনে বয়ে গেল যেন একটা প্রতপ্লনের বিপুল উচ্ছ্বাস। ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখবরণের জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠলো দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষ।

১৭ই এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের এক বৈঠক বসলো, সে বৈঠকে স্থির হ'ল ১৯শে এপ্রিল জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি অম্বিকা চক্রবর্তী, সম্পাদক সূর্য সেন এবং নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ প্রভৃতি কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যগণ সরকারের আইন অমান্য করবেন। একথা প্রচার হ'তে দেরি হল না। জেলা কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো ১৯ তারিখের পরে। কিন্তু অকস্মাৎ ১৮ই তারিখে সারা চট্টগ্রামের বুক কাঁপিয়ে ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে গেল।

১৮ই এপ্রিল তারিখেই রাত্রি আন্দাজ দশটার কিছু পরে একখানি

মোটর এসে দাঁড়ালো চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখে। উচ্চপদস্থ সৈনিকের মত সুসজ্জিত পোষাকে মোটর থেকে নেমে এলেন লোকনাথ বল। অস্ত্রাগারের অলিন্দে উঠতেই একটা প্রহরী সন্দেহ ক'রে তাঁকে বাধা দিলে—চ্যালেঞ্জ করলে তাঁকে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই বাধাদানকারী প্রহরী মৃত্যুযন্ত্রণায় বুক চেপে তাঁর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লো। লোকনাথের সঙ্গী ছিলেন অনেকেই এবং তাঁরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় তাঁর আশেপাশেই অবস্থান করছিলেন। পিস্তলের আওয়াজে অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত সার্জেণ্ট মেজর ফারেল বাইরে বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হ'য়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গুলীবিদ্ধ বুকখানাকে চেপে তিনিও লুটিয়ে পড়লেন সেইখানে। অন্যান্য প্রহরীরা প্রাণভয়ে সে স্থান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের কপাট ভেঙে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মোটরে তুলে নিলেন। তারপর অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে রওনা হ'লেন পুলিস হেড কোয়ার্টারের দিকে।

যথাসময়ে আক্রান্ত হল পুলিসের হেড কোয়ার্টার। একজন শান্ত্রী সাংঘাতিক আহত হ'ল, আর সকলে আকস্মিক আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কায় বিভ্রান্ত হ'য়ে যে দিকে পারলে আত্মরক্ষা করলে পালিয়ে। তারপর একে একে সেই বিপ্লবীদল অম্বিকা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে দখল ক'রে নিলেন টেলিগ্রাম ও টেলিফোন অফিস—ভেঙে চুরমার ক'রে ফেললেন তাঁরা এক্সচেঞ্জ বোর্ড। দু'তিনদিন পূর্ব থেকেই বেরিয়ে পড়েছিলেন কয়েকজন বিপ্লবী রেল লাইন নষ্ট ক'রে দিয়ে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। ১৮ই এপ্রিল মধ্যরাত্রে ধুম আর নাঙ্গলকোটের মধ্যবর্তী রেল পথকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেললেন তাঁরা। চট্টগ্রামের দিকে আসবার সময় একখানা মাল গাড়ি উল্টে গেল ভাঙা লাইনে পড়ে। ফলে পথও গেল বন্ধ হয়ে।

সেই মহা উত্তেজনাকর সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটলো অল্পকালের মধ্যেই। প্রথম প্রচেষ্টা সার্থক হ'তেই বিপ্লবীরা বিপুল উল্লাসের ধ্বনি করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে দিতে লাগলেন আলোক সংকেতের নিশানা। অন্যান্য বিপ্লবীরা সে সংকেত বুঝতে পেরে একে একে এসে জমায়েত হ'তে লাগলেন পুলিসের হেড কোয়ার্টারে। সেই রাত্রেই সেই স্থানে চট্টগ্রামের বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনকে প্রেসিডেণ্ট ক'রে গঠিত হ'ল সন্ত্রাসবাদীদের অস্থায়ী সরকার।

রাত্রি দুইটা উত্তীর্ণ প্রায়। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে মত্ত। কোলাহল-মুখর হ'য়ে উঠেছে পুলিস-ব্যারাক। ঠিক এমনই সময় অকস্মাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে গর্জে উঠলো পুলিস বাহিনীর কামান। ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন বিপ্লবীরা। তাঁরা বুঝলেন সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজসাধ্য নয়। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ তাঁরা তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং জালালাবাদের পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন গোপনে। এই সময় পুলিসব্যারাকে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে একজন কর্মী সাংঘাতিক-ভাবে অগ্নিদগ্ধ হ'লেন। তাঁর নাম—হিমাংশু সেন। গোপনে তাঁকে শহরের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু তিনদিন পরে তিনি মারা গেলেন।

সূর্য সেন যখন পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন তখন তাঁর সঙ্গী বেশী ছিল না। কারণ যারা পুলিসের সন্দেহভাজন হয়নি তাদের শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি পূর্বেই। অবশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়েই পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি। খাদ্য এবং পানীয়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না তাঁদের সঙ্গে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, যদিও লোকবল ছিল অত্যন্ত নগণ্য।

২২শে এপ্রিল পাল্টা আক্রমণ শুরু হ'ল সরকার পক্ষের। জালালাবাদ পাহাড়টাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো সরকারী পুলিশ ও সৈন্যদল। প্রচণ্ডবেগে বাধা দিতে লাগলেন বিপ্লবীরা। বারুদের ধূমে আকাশ বাতাস ধূমায়িত হ'য়ে উঠলো। একদিকে বিদেশী সরকারের নিমকভোগী সৈন্য, অপরদিকে শতাব্দীর শাসনপীড়িত স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী দল। একটা বিরাট শক্তির বিপক্ষে সামান্য কয়েকটি প্রাণীর সে কি ভয়ংকর সংগ্রাম!

বিপ্লবী বীর শহীদ সূর্য সেন (মাষ্টারদা')

বৃটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদমানসে সে কি প্রাণান্তকর প্রয়াস! সারা চট্টগ্রাম ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছিল বিস্ফোরণের সেই ভীষণ শব্দে, বন্দুকের অবিশ্রান্ত আওয়াজে, কামানের গভীর গর্জনে। সৈন্যদের গুলীর মুখে দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল কয়েকটি অমূল্য প্রাণ। তাঁদের মধ্যে—পরেশ রায়, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, মতিলাল কানুনগো, নির্মল লালা, প্রভাস বল, শশাংক দত্ত, যতীন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, ত্রিপুরা সেন, হরিগোপাল বল, বিধু ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছিলেন। এঁরাই সেই রণক্ষেত্রে জালালাবাদের মাটিকে তীর্থে পরিণত করে গেছেন।

এতগুলি সঙ্গীর মৃত্যুর পরেও কিন্তু শান্ত বা ভীত হননি বিদ্রোহীরা। একই ভাবে তাঁরা প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন সৈন্যদের আক্রমণ। তাঁদের সেই রক্তদান, সেই ঐকান্তিকতা ব্যর্থ হ'ল না—

রাত্রি আন্দাজ ৮।৯টার সময় ইংরেজ সৈন্তরা ভঙ্গ দিলে রণে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বিপ্লবীদল বিজয় ঘোষণা করলেন তাঁদের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় ইতিহাস রক্তাক্ষরে অংকিত হ'য়ে গেল জালালাবাদ পাহাড়ের বুকে। বিপ্লব সাধনা সার্থক হ'ল তুলনা-বিহীন আত্মদান আর ঐকান্তিকতার মধ্যে!

কিন্তু বিরাট বৃটিশ সৈন্তদের বিরুদ্ধে দীর্ঘসময় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া বিপ্লবীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, আয়োজন তাঁদের অতি সামান্ত—লোকবলও নগণ্য। সুতরাং গেরিলা-রণ-কৌশল অনুসরণ করাই স্থির করলেন তাঁরা। সেই রাত্রেই সদলে বিপ্লবীরা নেমে এলেন সমতল ভূমিতে এবং দলে দলে জেলার নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়লেন।

সূর্য সেন এবং তাঁর সহকর্মীদের এইসময়কার জীবন রাত্রির অন্ধকারের মতই রহস্তজনক। মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিদ্রোহীরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্ত রীতিমত আত্মগোপন ক'রে চলাফেরা করতে লাগলেন। গ্রাম ও শহরের লোকেরা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাঁদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিরাপত্তার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করেছেন! পরিচয় জানারও প্রয়োজন বোধ করেন নি কেউ।

এই সময় পুলিশের নির্মম অত্যাচারে চট্টগ্রামের জনসাধারণের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। সে অত্যাচার, সে উৎপীড়ন বর্ণনার অতীত। নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের ধরবার জন্ত চট্টগ্রামের প্রতি গৃহে চললো পুলিসের তল্লাসী, চললো নিষ্ঠুর নিপীড়ন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো গোয়েন্দা—বিপ্লবীদের সন্ধানে। এক একটি বিপ্লবীকে ধরিয়ে দেবার জন্ত সরকার পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলে। তারপর পুরস্কারের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিলে। সূর্য সেনের মাথার ওপর দশ হাজার টাকা—অনন্ত সিংহ আর গণেশ ঘোষের ওপর ছয় হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হ'ল। নিরীহ চট্টলবাসীদের ওপর চলতে লাগলো পুলিসের অকথ্য অত্যাচার। ক্রমেই সে অত্যাচার বাড়তে লাগলো। শেষে চট্টলবাসীদের সেই অমানুষিক পীড়নের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ত আত্মপ্রকাশ করলেন অনন্ত সিংহ—আত্মসমর্পণ করলেন তিনি পুলিসের হাতে। যুগে যুগে বাঙালী স্মরণ করবে সেই বিদ্রোহী বীরের মহান হৃদয়ের কথা।

বৃটিশ-পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে জীবন ঘোষাল সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসী চন্দননগরে নিহত হন। লোকনাথ, আনন্দ আর গণেশ বন্দী হন। কিন্তু তবুও নিবৃত্তি নেই। ১৯৩১ সালে জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় এক ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন এঁরা, যাতে চট্টগ্রামের সমস্ত শাসনযন্ত্রটাকে মুহূর্তেই বানচাল ক'রে দেওয়া চলে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের অভাব ঘটেনি কোনদিন কোন কাজে—এক্ষেত্রেও কোন সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি।

চট্টগ্রামের ধলঘাট নামক গ্রামে এই সময় সাবিত্রী দেবী বলে এক বিধবার গৃহে অবস্থান করছিলেন সূর্য সেন। সঙ্গে ছিলেন—নির্মল সেন, অপূর্ব সেন, প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার এবং কল্পনা দত্ত। পুলিস এখানে সূর্য সেনের সন্ধান পায়।

সেদিন রাত্রি ১০টার সময় বৃটিশ-সৈন্ত বাড়ী ঘেরাও করলে। সৈন্তবাহিনী পরিচালনা করছিলেন ক্যাপটেন ক্যামারণ। বিপ্লবীর গুলীতে সেইখানেই তিনি মারা যান। নির্মল আর অপূর্ব এই যুদ্ধে প্রাণ হারান। সূর্য সেন, কল্পনা আর প্রীতিলতাকে নিয়ে সৈন্তদের বেষ্টনী ভেদ ক'রে পলায়ন করেন।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তী ১৯৩০ সালের শেষভাগে ধরা পড়লেন। কিন্তু মাষ্টারদাকে তখনো ধরা পুলিসের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের ছলনার জাল বিস্তৃত চারিদিকে মাষ্টারদাকে ধরার জন্ত—মাষ্টারদার চিত্তেও নিত্য নতুন পরিকল্পনা বৃটিশ বিতাড়নের। এইখানেই সূর্য সেন আশ্চর্য, অদ্ভুত, অতুলনীয়। বিপ্লবী সূর্য সেনের বীরত্ব এইখানেই। একদিকে যেমন পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন ক'রে বেড়াচ্ছেন তিনি, অন্তদিকে তেমনি সুযোগ খুঁজছেন আক্রমণের। যতদিন পর্যন্ত না ধরা পড়েছিলেন তিনি, সাম্রাজ্যলোলুপ বৃটিশের চোখে সুখ নিদ্রা লোপ পেয়েছিল ততদিন।……

সাবিত্রী দেবীর বাড়ী থেকে বার হয়েই তাঁরা স্থির করলেন—চট্টগ্রামের উপকূলস্থ পাহাড়তলীতে য়ুরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করতে হবে। এই আক্রমণের নেতৃত্বের ভার পড়েছিল বীরকন্যা প্রীতিলতার পরে। প্রীতিলতা এই সংঘর্ষে সাংঘাতিক আহত হন এবং পরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সূর্য সেন এ যাবৎ সাফল্যের সঙ্গেই পুলিশকে এড়িয়ে চলছিলেন। শুধু জীবনের অতি সামান্ত মাত্র কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে গৈরলা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ীতে তখন বাস করছিলেন তিনি। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় যখন তিনজন সঙ্গীসহ তিনি বাড়ী থেকে বের হ'তে যাবেন, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ বাধা পেলেন বাড়ীর দরজার কাছে। সামনেই গুর্খা প্রহরীদের বেষ্টনী দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। মুহূর্ত মধ্যে শুরু হ'য়ে গেল অগ্নিবৃষ্টি—মুহুর্মুহুঃ গর্জে উঠতে লাগলো দুই পক্ষের বন্দুক পিস্তল। গৃহকর্তা পূর্ণ তালুকদার আর তাঁর ছোট ভাই প্রথমেই নিহত হ'লেন সৈন্তদের গুলীতে। ধরা পড়লেন সূর্য সেন—বহুক্ষণ যুদ্ধ চালাবার পর—পালাতে পারলেন না। কল্পনা দত্ত, মণি দত্ত এবং শান্তি চক্রবর্তী সুকৌশলে বেরিয়ে গেলেন পুলিসের বেড়াজাল ভেঙে। জুন মাসে তারকেশ্বর আর কল্পনা ধরা পড়লেন।

বৃটিশের আদালত 'মাষ্টারদা' সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসীর হুকুম দিলেন—কল্পনা দত্তের হ'ল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অত্যাচারী বিদেশী রাজের চরম নির্দেশ ঘোষিত হ'ল বিপ্লবীদের প্রতি।

বাঙালীর জীবনে ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব নেই। কিন্তু মাষ্টারদার জীবন ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাঙালীর পক্ষে অনন্তসাধারণ। তাঁর সহকর্মীগণ অনেকক্ষেত্রে অনেক রকম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন—অপূর্ব কর্মশক্তি, অনবদ্য-দক্ষতা দেখিয়েছেন, সে সব কথা স্মরণ করতে গেলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আরো বিস্ময় লাগে যখন ভাবা যায় এ মহান

সাম্যের বিধানে, সমন্বয় সাধনে, মাষ্টারদার অপূর্ব ব্যক্তিত্বের কথা। তাঁর কর্মতৎপরতা, বুদ্ধির স্থিরতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা বাস্তবিকই তুলনারহিত। তাঁর নির্দেশের অভাব ঘটলে বোধ হয় চট্টগ্রামের সেই বৈপ্লবিক আন্দোলন অংকুরেই বিনষ্ট হ'য়ে যেত। তা ছাড়া সূর্যবাবু শুধু বিপ্লবধর্মীই ছিলেন না—শুধু বিপ্লবী যোদ্ধা বা সেনানায়কই ছিলেন না, সেই সঙ্গে শিক্ষকতার একটা দিকও ছিল তাঁর মধ্যে। ভাবীকালের জাতিকে গোড়ে তোলার একটা মৌলিক পরিকল্পনা ছিল তাঁর অন্তরে। সে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লিখিত একটি রচনার মধ্যে।

যতীন্দ্রনাথের যেমন রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল একটি পাণ্ডুলিপির মধ্যে, যা চসাখণ্ডের পথে হরিণবার জঙ্গলে তিনি ফেলে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবেই সূর্যবাবুরও একটি স্বরচিত পাণ্ডুলিপির কতকাংশ পাওয়া যায় ধলঘাটে তাঁর আশ্রয় শিবির সংলগ্ন একটা পুকুরের মধ্যে বাক্স বন্ধ অবস্থায়। উভয় বিপ্লবীর সেই অমূল্য লেখা দুটি সম্ভবত নষ্ট ক'রে ফেলেছে সাম্রাজ্যবাদীরা, নইলে সে দুটি স্বাধীন ভারতের মহামূল্য সম্পদ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ছিল।

সে রচনার মধ্যে সূর্যবাবু বিপ্লবপদ্ধতির আলোচনা করেন নি—বিপ্লবের পরে সমাজ গড়ে তোলার একটি সুকল্পিত মন্তব্যই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। লিখেছিলেন তিনি—জনগণের শাসিত, স্বাবলম্বী, পরস্পরের সহযোগিতা-সমৃদ্ধ এক স্বাধীন পঞ্চায়েত রাষ্ট্রের কথা। ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এক নব পরিকল্পনার।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের যে ভাঙা-গড়ার আন্দোলন চলেছিল, তার মধ্য দিয়েই আমাদের জনগণের কাছে জাগরণের আবেদন পৌঁছে গিয়েছিল। নিষ্পেষণের উন্মত্ততায় প্রমত্ত বিদেশী রাজশক্তির স্বরূপ স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল একান্ত সাধারণ ভারতবাসীর কাছেও অভাবের তাড়না ইতিমধ্যেই অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল ভারতবাসীদের জীবনে। ঠিক এমনি সময়েই সূর্যবাবু রেখে গেলেন তাঁর শেষ দান জনগণের কাছে—নবসমাজের নবকল্পনার ইঙ্গিত রেখে গেলেন দারিদ্র্য-নিপীড়িত সর্বহারা ভারতবাসীর কাছে।

ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের সার্থক গান সত্যই গেয়ে গেছেন বিপ্লবী সূর্য সেন। তাঁর কল্পনার সুর সূর্যের কিরণের মতই আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে আছে।—ছড়িয়ে আছে জনগণের আশার আকাংক্ষায় আর স্বপ্নে। ফাঁসীর রজ্জু পৃথিবীর মাটি থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু দেশবাসীর মনভূমিতে চির অমর তিনি। তাঁর মৃত্যু নেই।

১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রে বন্দীশালার এক নিভৃততম প্রকোষ্ঠে জীবনদীপ চিরতরে নির্বাপিত হ'ল বীর বিপ্লবী সূর্য সেনের। নির্বাপিত হ'ল ভারতের এক গৌরবদীপ্ত তারকার সমুজ্জ্বল জ্যোতি। হারিয়ে গেল বাংলার এক সুসন্তান।

শতাব্দী-সঞ্চিত অত্যাচার গ্লানি ক্লেদ আর ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সেদিন যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দেশজননীর বন্ধন মোচনের অটুট সংকল্প নিয়ে, তাঁদের সাধনা আজ সফল হ'য়েছে। শাসন, শোষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মৃত্যু-ভীরু জাতিকে অন্ধকার যুগে যাঁরা জীবনের পথে এগিয়ে চলার পথ নির্দেশ দান ক'রেছিলেন তাঁরা যুগে যুগে স্মরণীয়, বরণীয়—তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়। জাতীয় সাধনার ঐতিহ্যকে বুকের তাজা খুনে অক্ষুন্ন রেখে গেছেন তাঁরা। তাঁদের অধিকার, তাঁদের স্মরণ ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই শহীদ সূর্য সেনকে।

জয়হিন্দ...

মহাত্মাজীর বিদায়

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অগ্নির মাঝে যার জন্মের কোলটি,
দোলাইল জীবনের কর্ম্মের দোলটি।
গোলাপের বদলে যে বেছে নিল ধুত্‌রা,
তারে কারা চিন্‌বে রে?—দেব্‌তা না ভূতরা।
যাত্রার পথ যার কঙ্কর-তপ্ত,
সমাজের ঘৃণ্য ও যত অভিশপ্ত,
নরনারী যার কাছে ছিল ভাইভগ্নী,
মানুষের দুঃখের হাহাকার অগ্নি,—
তাই দিয়া পাতা যার জীবনের শয্যা,
অহিংসা মাঝে যার পরম প্রব্রজ্যা।

চলবার পথ যার বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝা,
আদর্শে ছুটি' যায় খুশীমত মন তা'।
স্পর্শমণি সে পায়—লোকে বলে সর্প,
করে তারে বিদ্রূপ মানুষের দর্প!
মহান সে স্মিতমুখে বালকের হাতে,
নিজ প্রাণ বিলাইল তাহাদেরি দাতে।
চলমান জগতের ঘৃণা আর লজ্জা।
কাঁটার মুকুট বহি পরিল সে সজ্জা।
এসেছিল বহি সে যে মানুষের সব দুখ,
বিদায়েতে নিল বুকে মানুষেরি বন্দুক!

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অলোক আলোকতীর্থের তীরে যোগমগ্ন ভগবানের ধ্যানভঙ্গ হল আকস্মিক অন্তরবেদনায়। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্ত শূন্যের কূলে কূলে অসংখ্য কোটি গ্রহলোক, বিপুল বিস্তার নীহারিকাপুঞ্জ তাঁরই নিয়ন্ত্রিত তালে তালে নিজ নিজ কক্ষ-আবর্ত্তনে রত। চেয়ে দেখতে দেখতে দৃষ্টি পড়ল স্নিগ্ধ সবুজ একটি আলোর দিকে। তাঁর পরম আদরের সৃষ্টি ওটি। ওটিকে সৃষ্টি করেছিলেন একদিন এক বেদনার মুহূর্ত্তে। বেদনায় দু চোখ থেকে দু ফোঁটা জল পড়েছিল। তার এক ফোঁটায় গড়েছিলেন পৃথিবী, আর এক ফোঁটা থেকে আপনিই রূপ নিয়েছিল এক চির-কিশোর। অমর প্রেম সে।

পৃথিবী রচনা করেই তিনি সে খেলা শেষ করেন নাই। পৃথিবীতে থাকবার জন্যে গড়েছিলেন মানুষকে আপনার প্রতিবিম্ব দেখে। তাদের বুকে দিয়েছিলেন আপনার বুকের সব বেদনা আর আনন্দের অংশ। কামনা করেছিলেন তারা আপনার মনে খেলা করতে করতে একদিন তাঁরই মত হয়ে উঠবে। সেদিন আবার আদর করে সেই বড় আদরের খেলনাটি তুলে রেখে দেবেন আপনার বুকের মধ্যে। কিন্তু মানুষদের নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দেখলেন—কোথায় ভুল ঘটেছে যেন। তারা তাঁর মত হতে গিয়ে ভুল করছে বার বার, কোন্ এক তাড়নায় আঘাত করছে পরস্পরকে। আজও তাকিয়ে দেখলেন—আবার তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে চাইছে পরস্পরের দিকে। পরমুহূর্ত্তেই আঘাত করবে পরস্পরকে। ক্রোধে তাঁর মুখ কালো হয়ে উঠল, চোখ জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামনে আবির্ভূত হল পিঙ্গল, রুক্ষ, শীর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ এক পুরুষ। চোখে তার ভ্রূকুটি। আরক্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। উদ্ধত ভঙ্গিতে বিধাতার দিকে চেয়ে বললে—ডাকলে কেন আমাকে? আমি ক্রোধ। যাব, ধ্বংস করে দিয়ে আসব তোমার ঐ খেলনাটাকে। বল ?

মুহূর্ত্তে বিধাতার মন ব্যথিত হয়ে উঠল, বললেন—না, না, যাও তুমি। তোমায় ডাকিনি আমি।

সে চলে গেল। মানুষের ভ্রান্তিতে আর নিজের অনুশোচনায় মন তাঁর বড় ব্যথিত হয়ে উঠল। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল টপ করে। অমনি সামনে এসে দাঁড়াল এক কিশোর। সেই চির-কিশোর অমর প্রেম। তার বড় বড় চোখ দুটি করুণায়, মমতায় আর আশায় সকরুণ, মুখে সস্মিত প্রসন্ন হাসি। সে হাত জোড় করে বললে—আমায় ডাকলেন কেন পিতা?

তাকে দেখেই ভগবানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—তাকিয়ে দেখ পৃথিবীর দিকে। মানুষদের দিকে চেয়ে দেখ। আবার যুথবদ্ধ হয়ে উঠে পরস্পরকে আঘাতে উদ্যত হয়েছে তারা। তাদের সংশোধন করে, তাদের ক্রোধ আর হিংসা ভুলিয়ে প্রসন্ন হাস্যে পরস্পরকে ভালবাসতে শেখাবার জন্যে বার বার ওখানে পাঠিয়েছি তোমাকে। কিন্তু আজও ওদিকে প্রেমিক করে তুলতে পার নাই তুমি। তোমাকে বহুরূপে বহুবার পাঠিয়েছি। কখনও পাঠিয়েছি সম্পদশালী করে, রাজার বেশে। কখনও পাঠিয়েছি বিপুল প্রতিভা দিয়ে, কখনও রূপে গুণে সর্ব্বগুণান্বিত করে। এবার তোমায় দিলাম না কিছুই আমার আশীর্ব্বাদ ছাড়া। এবার তুমি যাও সাধারণ মানুষের বেশে। তোমার যাবার প্রয়োজন হয়েছে আবার। তুমি আবার যাও।

সলজ্জ হয়ে অপরাধীর মত কিশোর দাঁড়াল মাথা নীচু করে। বিধাতা বললেন—লজ্জা কি পুত্র! তোমার পরাজয় তো শুধু মানুষেরই পরাজয় নয়, আমারও পরাজয়। বলে আবার তার মাথায় দিলেন হাত বুলিয়ে। বল্লেন—আমার বল দিলাম তোমার হৃদয়ে, আমার মমতা দিলাম তোমার চোখে। হে আমার আদরের বীর কিশোর, তুমি যাও। জন্ম নাও অপমানিত প্রাচীদিগন্তে। তোমার জন্যে হাত বাড়িয়ে আমি অপেক্ষা করে থাকব। যাও পুত্র।

বিস্মৃতির যবনিকা নেমে এল সেই চির-কিশোরের মনে।

*   *   *   *

তারপর। ভগবানের নির্দ্দেশে তিনি জন্ম নিলেন এক অতি প্রাচীন ভূমিখণ্ডে প্রাচীদিগন্তে, বহুকালাবধি অপমানিত, নিষ্যাতীত, কৃষ্ণকায় আর তাম্রাভ মানুষের ঘরে। পিতার নির্দ্দেশে বার বার এ ভূমিতে এসেছিলেন তিনি। আবার এলেন।

বিচিত্র দেশ। বার বার মানুষকে ভালবাসবার আর ক্ষমা করবার যে বাণী এ মাটিতে ছড়িয়েছিল, তার কিছুই হারায় নাই এরা। সব ধরে রেখেছে কালো-দেহের অন্তরালে হৃদয়ের মণিপেটিকায়। তবু বহু শতাব্দীর গ্রন্থিবন্ধন শক্ত হয়ে বসে গেছে, ধুলো পড়েছে তার উপর, শেষে ভুলেই গেছে যে তার কি ছিল। অনন্ত সম্পদের অধিকারী, তবু দরিদ্র, দুর্ব্বল। শুধু কি তাই? বিচিত্র শস্যশ্যামল তার ভূমি, প্রতিটি শস্যে পরিপূর্ণ ফল, ভাণ্ডারে তার অফুরন্ত ধনমাণিক্য। তারই লোভে ভিন্ন ভূমি থেকে বার বার এসেছে লোভীর দল। পরুষ হাতে লুণ্ঠন করেছে, তারপর ধর্ষিতার মত ত্যাগ করে গেছে। কিন্তু কতকগুলি লোক এ মাটিকে মা বলে এরই মমতায় থেকেই গেছে এই ভূমিতে। একদল লোভাতুর মানুষ গেছে, আবার এসেছে আর একদল। পরম অপহরণের উন্মত্ততায় লোভাতুর হস্তে সম্পদ আহরণ করেছে, নিদারুণ হিংসায় আঘাত করেছে তাকে যে বলেছে—এ দেশ আমার, এ সম্পদ আমার দেশের, হে বিদেশী তোমার অধিকার নাই এতে। শেষে যারা এল তারা হিংসায় নির্য্যাতন করেই ক্ষান্ত হয় নি, শেষে পশ্চিম সমুদ্রপার থেকে পূর্ব্ব

সাগরের এই শস্তশ্যামলা ভূমিকে করায়ত্ত করে সে ভূমির স্বামী হয়ে বসল তারা।

শাসক হয়ে এল যারা তারা নীল চোখে, আর সাদা হাতে নিয়ে এসেছিল শাসন আর হিংসা। পশ্চিম সমুদ্র পারে তাদের দেশে তখন তারই কর্ষণ আরম্ভ হয়েছিল। আঘাতের পর আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে তারা যূথবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করলে আঘাতকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলে যূথবদ্ধতার সঙ্ঘশক্তি। তার সঙ্গে তরুণ যৌবনের সৃষ্টির উন্মাদনায় গড়লে নানানতরো খেলনা। নিজের দেহের আর মনের শক্তিই যথেষ্ট মনে হল না তাদের কাছে। অপরিসীম শক্তিলাভের মত্ত কামনায় জাগ্রত করলে নূতন নূতন শক্তিকে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পৃথিবীর শান্ত প্রান্তে প্রান্তে লোভ-জর্জ্জর দৃষ্টি, আর হিংসায় কঠিন মন নিয়ে।

পশ্চিম সমুদ্রপারের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকচ্ছটা পড়ল এসে পূর্ব্ব-দিগন্তের মানুষদের চোখে। তাদের দেহ তখন হিংসার আঘাতে জর্জ্জর, চোখের দৃষ্টি বহুযুগের কুসংস্কারে আর ধর্ম্মান্ধতায় আবিল, প্রায় অন্ধ। এমনি সময়ে সেই চির-কিশোর আবার এলেন মানবীর কোলে, পৃথিবীর মাটিতে। কিন্তু কোথায় গেল পিতৃদত্ত অমোঘ আয়ুধ! শক্তিহীন মানবশিশু তিল তিল করে শক্তিসঞ্চয় করতে লাগলেন মাটির বুক থেকে, মানুষের মুখ থেকে, নিজের অন্তরলোক হতে।

ছোট্ট লাজুক ছেলেটা সঙ্গিহীন হয়ে একা একা গাছের তলায় আলোর ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়। মনে পড়ে যায় যেন কোথাকার কথা। ঘুমের ঘোরে দেখা স্বপ্নের মত। এক একদিন কাকে যেন মনে পড়ে আবছা আবছা। অথচ মনে পড়ে না ভাল করে। মন কেমন আতুর হয়ে ওঠে। অকস্মাৎ মনের প্রান্তদেশে যেন আষাঢ়ের আসন্ন-বর্ষণ আকাশজোড়া মেঘের মত, কচি ঘাসের শ্যামলতা নিয়ে দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে করে আবির্ভাব হয়। কোন্ আসন্নের যেন পদধ্বনি শুনতে পায় সে এক দুরান্ত থেকে। কে সে বুঝতে পারে না সে। তবু বড় ভাল লাগে। মন প্রগাঢ় শান্তিতে ভরে যায়।

সময় সময় ভয় লাগে তার। নানান জীবের ভয়, প্রেতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, অজানার ভয় তার ছোট্ট জীবনটিকে বিপর্য্যস্ত করে। সে মূকের মত থাকে চুপটি করে। ভয়ার্ত্ত বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সে। এমনি ভয়ের মুহূর্ত্তে একদিন অকস্মাৎ সেই পরম প্রার্থিতের আবির্ভাব ঘটল। এক ভয়ার্ত্ত মুহূর্ত্তে তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটল সম্পূর্ণ নূতন রূপে। সে শুনলে সত্যসন্ধ ভয়হারী পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রের কথা। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম আষাঢ়ের ঘন মেঘের মত কান্তি তাঁর। মুখে ক্ষমার হাসি।

জন্ম নিয়ে সে হারিয়েছিল যাকে, হারিয়েও যে লুকোচুরি খেলত তার সঙ্গে, তাকে ফিরে পেলে সে। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়কে জয় করার মন্ত্র পেলে। আর পেলে সত্যকে। পিতা আসবার সময় যে দিব্য আয়ুধগুলি তাকে দিয়েছিলেন তার সবগুলিকে হারিয়ে আবার নূতন করে সে অর্জ্জন করলে। সত্যাগ্রহী আর অভীক হল সে। প্রেমের অক্ষয় তূণীর নিয়ে সে জন্মেছিল। তাতে সঞ্চিত হল দুটি দিব্য আয়ুধ।

পিতার নির্দ্দেশ। তার পতিতপাবন শ্রীরামের নির্দ্দেশ। বালক থেকে তরুণ হয়ে উঠল সে। পূর্ব্ব সমুদ্রের তটভূমি থেকে সে চলল পশ্চিম সমুদ্রের পারে। সেখানে বিচরণ করে গঠন করতে লাগল সে নিজেকে। সেখানকার যারা মানুষ, তারাই শাসক তার দেশের। তাদের দেখলে সে ভাল করে।

তাদের দেখলে, বুঝলে, চিনলে সে। আর দেখলে কি উন্মাদ মারণ-মন্ত্রে এরা পাগল হয়ে উঠেছে। তৃপ্তিহীন তৃষ্ণায় এরা বাড়িয়ে চলেছে তাদের বাহ্যিক শক্তি, বাহ্যিক সম্পদ, আর বাহ্যিক সম্মান। তারই উপর ভর করে রক্তচক্ষু হয়ে একদল আর একদলকে আস্ফালন করছে, আর পরিতৃপ্ত করতে চাইছে আপনার অসার দম্ভকে। মনের শান্তি, বুকের বিশ্বাস আর মুখের হাসি হারিয়ে নিদারুণ ভবিতব্যের দিকে উন্মাদের মত ছুটে চলেছে এরা।

আর এক আয়ুধ সংগৃহীত হল তার তূণে। অভিজ্ঞতার অস্ত্র। সে কি জানত কি কাজে লাগবে এ সব? তবু পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রেরই এই অভিপ্রায় ছিল বুঝি?

ফিরে এলেন সেই যুবক আপনার মাতৃভূমিতে। এবার আবার যেতে হল নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে আর এক দেশে। পার্থিব উদ্দেশ্য ছিল জীবদেহধারী মানুষটির। কিন্তু আবার ইচ্ছা পূর্ণ হল তাঁর জীবন-দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের। সেখানে গিয়ে যুবকটি দেখলেন তাঁরই মত অনেক মানুষ, কালো কালো দেহ, জড়ের মত তারা। তারা দিবারাত্র অপমানিত আর নির্য্যাতীত হয়ে অশ্রুতে অন্ধ চক্ষু, আর বেদনায় কাতর হৃদয় নিয়ে সেবা করে চলেছে শক্তিগর্ব্বী উদ্ধত সাদা মানুষের। করুণাহত হলেন তিনি।

নেমে এলেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধারূপে। কণ্ঠে ধ্বনিত হল নববাণী। মানুষ মানুষই। তার সমান অধিকার চাই। প্রয়োগ করলেন আপনার অস্ত্র—প্রথম পরীক্ষা হল তাঁর অস্ত্রের। তাঁর অহিংসার। শক্তির স্পর্দ্ধিত উগ্র দৃষ্টিকে, আর স্পর্দ্ধিত শাসনের ভয়াল তর্জ্জনীকে উপেক্ষা করে তিনি অগ্রসর হলেন। তিনি আঘাত পেলেন। আঘাত ফিরে দিলেন না। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন তাকে। পরীক্ষায় প্রমাণ পেলেন তাঁর দিব্যায়ুধের শক্তির।

তিনি আবিষ্কার করলেন নবতর সত্যকে—সাদা মানুষ আর কালো মানুষকে মনে মনে পাশাপাশি রেখে। তিনি দেখতে পেলেন—কই, তারা তো পরস্পরের দিকে প্রেম আর বিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে নাই? সমান মর্য্যাদার ভিত্তি ভিন্ন তা কি সম্ভব? এদের একদল অপমানিত, আর একদল অপমানকারী। একজনের দৃষ্টি ভীতি আর বিদ্বেষে আবিল, আর একজন তাকিয়ে আছে কঠিন শাসনের কুটিল ভ্রূভঙ্গি করে। দুজনের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে সুগভীর হিংসা। নিজের মাতৃভূমির কথা মনে পড়ল তাঁর। সেখানেও এই দশা। তিনি উপলব্ধি করলেন যদি তারা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর মাতৃভূমি ছেড়ে চলে না যায় তবে

কারোই মঙ্গল নাই। না শাদা মানুষের, না কালো মানুষের। তিনি বুঝলেন তাঁর স্থান তাঁর মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমি অপেক্ষা করে আছে তাঁর জন্তে।

এমনি সময়ে পশ্চিম সমুদ্রপারে যে যুথবদ্ধ হিংসা যুদ্ধোন্মত্ত হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সেই হিংসায় হিংসায় প্রচণ্ড সংঘাত বাধল। যুথবদ্ধ হয়ে এতকাল যারা হিংসার অস্ত্রে শান দিচ্ছিল প্রকাশ্যে আর গোপনে, তারাই পরস্পরের গলা কামড়ে ধরেছে আজ উন্মত্ত হিংসায়। তিনি বুঝলেন হিংসা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। আজ তাঁর স্থান তাঁর মাতৃভূমিতে। মাতৃভূমির আহ্বান পৌঁছুল তাঁর মনোলোকে। তারই মধ্য দিয়ে পূর্ণ হল শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছা। তিনি স্বভূমিতে ফিরে এলেন।

ফিরে এলেন তিনি নিজের দেশে। এলেন যোদ্ধার বেশে। নূতনতর যোদ্ধা, নূতনতর তাঁর আদর্শ। এ যোদ্ধা সংগ্রাম করবেন না, করবেন সেবা। সুপ্রাচীন সুবৃহৎ দেশ, অতি প্রাচীন আর মহৎ তার শিক্ষা, জীবনাদর্শ, তার চিন্তা। তবু মানুষগুলি রয়েছে মৃতের মত, জন্তুর মত। কুসংস্কারে অন্ধ, অহমিকায় মূঢ়, আত্মপরতন্ত্রতায় কুটিল, জড়বুদ্ধি। তার উপরে দরিদ্র, অপমানিত, লাঞ্ছিত, পতিত।

তাদের সেবায় নামলেন তিনি। কিন্তু কালো মান-হারা মানুষগুলিকে স্বমর্য্যাদায় আর সচ্ছবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লাগল সংঘাত, এল মনোমালিন্য। এতদিনে দেশের প্রান্তদেশ ভাগে ভাগে পশ্চিমপারের সেই তাম্র-রেখা অস্তগামী সভ্যতার আলোক রেখায় রঞ্জিত হয়ে কতকগুলি মানুষ জেগেছে। তাদের একদল স্বাধিকার লাভের নামে হয় বীর্য্যহীন, নয় অর্থহীন কর্ম্মে ব্যস্ত। আর একদল গ্রহণ করেছে সেই হিংসার অস্ত্র যাতে তার স্রষ্টারাই আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নূতন যোদ্ধা সবিনয়ে উপস্থাপিত করলেন তাঁর অস্ত্রটিকে। কঠিন যুক্তি দিয়ে, করুণ আবেদনে বোঝালেন তাদের—এ পথ আমাদের নয়, এ পথ শ্রেয় পথ নয়। তারা বুঝল, এই নবীন যোদ্ধাকে সেনাপতি করে বরণ করলে সকলে। আবার পরীক্ষা হল তাঁর অস্ত্রের।

সেই অস্ত্র নিয়ে শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে নামলেন পরম মিত্রের মত। ডাকলেন দেশের সকল মানুষকে। ডাকলেন স্বধর্ম্মীকে, ডাক দিলেন ভিন্ন ধর্ম্মীকে। এল তারা। এল ধনী, এল দরিদ্র, এল উচ্চ, এল নীচ; এল পণ্ডিত, এল মূর্খ। সূর্য্যালোকের আহ্বানে বীজ হতে অঙ্কুরের অভ্যুত্থানের মত সব ছুটে এল। বিপক্ষকে বোঝালেন তিনি। বোঝালেন তাদের যে অপরের দেশে উভয় পক্ষের কল্যাণে সেই দেশবাসীদের হাতেই স্বাধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু বুঝল না তারা। ক্রোধে তাদের নীল চোখ জ্বলে উঠল অগ্নিপিণ্ডের মত, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র থেকে অগ্নিশিখার মত ঘন ঘন ক্রুদ্ধ নিশ্বাস পড়তে লাগল, ক্রোধে মুখ উঠল বিকৃত হয়ে। কিন্তু ভয়হীন তিনি। হাসি মুখে হাত জোড় করে হিংসাকে সম্বৃত করার মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অগ্রসর হলেন। হিংসার উদ্যত দণ্ড পড়ল তাঁর উপর। তিনি হাসি মুখে গ্রহণ করলেন তাকে।

এমনি একবার নয়, বার বার তিনবার। তিনি শত্রুকে পরম মিত্র জ্ঞানে বন্ধুর মত বার বার হাসি মুখে এই-ই বোঝাতে চাইলেন—এ দেশ তোমাদের নয়, এ দেশ এই অপমানিত মানুষগুলির। এ দেশ পরিত্যাগ করলে তোমার আর এদের দুইয়েরই সমান কল্যাণ হবে। তুমি এদের পরিত্যাগ করে যাও, দেখবে তোমার মনে প্রসন্নতা আর শান্তি ফিরে এসেছে, মুখে হাসি এসেছে, ঈশ্বরের প্রসাদ পাবে অন্তরে। এরা বুঝবে এরা অপমানিত নয়, সকলের সঙ্গে সমান মর্য্যাদায় অভিষিক্ত, এরা ফিরে পাবে লুপ্ত মনুষ্যত্ব। সংসার শান্তি আর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে পতিতপাবন রামের রাজ্যভূমি হয়ে উঠবে।

আত্মপরতন্ত্রতার অহমিকায় মূঢ় তারা, লোভে আর হিংসায় অন্ধ তারা। তারা শুনলে না তাঁর বাণী। তাঁকে শত্রু ভেবে বার বার আঘাত করলে, নির্য্যাতন করলে, কারারুদ্ধ করলে। তবু তিনি থামলেন না। তিনি অসহযোগ করলেন তাদের হিংসাময় শাসনের সঙ্গে, তাদের হিংসাময় শাসন বাক্যকে ভঙ্গ করলেন, সর্ব্বশেষে তীব্রকণ্ঠে বললেন—তোমরা পরিত্যাগ করো এ দেশ। তিনি অগ্রসর হলেন সংগ্রামের পথে। তাঁর পদপাতে মাটির বুকে তৃণ রোমাঞ্চিত হল, জলে জলে বিচিত্র শিহরণ জাগল, বনানীশীর্ষ কম্পিত হল, মানুষের বুক নিদারুণ দুঃখে উথলে উঠল বার বার।

শেষে জয় হল সেনাপতির। জয় হল কালো মানুষের। সাদা মানুষরা মিত্রের মতই পরিত্যাগ করলে এ দেশ। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে এ কি করে গেল তারা? তবে কি প্রেমের সঙ্গে হিংসারও জয় হল। বিজয়ী সেনাপতি ব্যথায় স্তম্ভিত হলেন।

তিনি ভেবেছিলেন বুঝি হিংসা মরে গেছে। কিন্তু এক রূপে সমাপ্ত হতেই আবার আর এক রূপে আত্মপ্রকাশ করল হিংসা। এতকালের সংগ্রামে আর সেবায় যারা পাশে ছিল বিশ্বস্ত প্রেমিক অনুচর, সহকর্ম্মী আর বন্ধু হয়ে—তাদেরই মধ্যে অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলে সন্দেহ আর বিদ্বেষ। সেবা আর সংগ্রামের অবসরে কোন্ গোপনে তিলে তিলে সঞ্চিত হচ্ছিল যে হিংসা—তাই প্রথমে আত্মপ্রকাশ করলে সন্দেহের মধ্য দিয়ে। তিনি দেখেই চিনতে পারলেন তাকে। তিনি শিউরে উঠলেন, আর্ত্ত মর্ম্মবেদনায় মন হাহাকার করে উঠল। যাকে ভেবেছিলেন মৃত বলে—সে ত মরে নাই! সে অতি ধীরে ধীরে আবার আত্মপ্রকাশ করছে। মনে হল তবে কি তাঁর আয়ুধ অশক্ত হয়ে গেল? নবীন বিশ্বাসে আবার তিনি সেবায় নামলেন। এ আয়ুধ বহুবার পরীক্ষিত, অহিংসা আর সত্য দিয়ে এর সৃষ্টি। ভগবানের আদেশে এর ব্যবহার।

সন্দেহ থেকে বিদ্বেষ, বিদ্বেষ থেকে হিংসা উঠল জাগ্রত হয়ে। তাঁর যোদ্ধার দল আবার দাঁড়াল যুধ্যমান হয়ে। বিভক্ত হয়ে গেল অখণ্ড দেশ, সঙ্গে সঙ্গে বিভক্ত হল মানুষ। প্রেমিক, বিশ্বাসপরায়ণ মানুষটি আতুরের মত হাত জোড় করে বিপক্ষের কাছে কাতর অনুনয় আর আবেদন নিয়ে ছুটে গেলেন। বার বার বোঝাতে চাইলেন—

বিশ্বাস কর বন্ধু বিশ্বাস কর, কারও বিশেষ স্বার্থে নয়, প্রতিটি মানুষের সমান স্বার্থের নামে বলছি, বিশ্বাস কর।

হিংসাই জয় হল বুঝি। অবিশ্বাসে আর হিংসায় বিভক্ত একই দেহের দুটি পৃথক অংশ পরস্পরের দিকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ জ্বলে উঠল হিংসা উন্মাদ দাহ নিয়ে, নিদারুণ অট্টহাস্যে মানুষের বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করে।

ব্যথিত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মানুষটি। মন অসহায় হয়ে উঠল। হতাশায় ভরে গেল মন। ভাবলেন—তবে কি তাঁকে দিয়ে ঈশ্বরের প্রয়োজন সমাপ্ত হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তাই হোক। কিন্তু যতক্ষণ তাঁর দেহ আছে ততক্ষণ প্রার্থনা জানাবেন মানুষের কাছে, ভগবানের কাছে।

আগুন জ্বলে উঠেছে দিকে দিকে। হিংসায় উন্মত্ত মানুষ উন্মাদের মত হত্যা করছে মানুষকে। দুর্ব্বল, ক্ষীণ দেহ নিয়ে তিনি ছুটলেন আগুনের মাঝে হৃদয়ের অক্ষয় প্রেমের কলস নিয়ে। তাদের বোঝালেন, তাদের হয়ে প্রার্থনা জানালেন ভগবানের কাছে, তাদের হৃদয়ের শাশ্বত প্রেমের কাছে। অনশনে অনশনে ক্ষয় করলেন আপনার ক্ষীণ দুর্ব্বল দেহ তাদের ভ্রান্তি ক্ষালনের জন্যে, শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করবার জন্যে। যেখানে গেলেন সেখানেই শান্তিবারি সিঞ্চন করলেন হৃদয়ের কলস হতে। অগ্নি নির্ব্বাপিত হল।

আবার জ্বলে উঠল আগুন দেশের কেন্দ্রস্থলে। গভীর হতাশায় মুহ্যমান হলেন তিনি। কিছুতেই কি এ আগুন নিভবে না? হিংসা নিবৃত্ত হবে না? দীপের হবির মত দেহ দিনে দিনে ক্ষয় পেয়ে সমাপ্তির মুখে এগিয়ে চলেছে বুঝতে পারছেন তিনি। যদি না নেভে, যদি হৃদয়ের প্রেম দিয়ে আর অহিংসা দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করতে না পারেন তবে তাকে নির্ব্বাপিত করবেন তাঁর শেষতম সঞ্চয় দিয়ে। গোপনে কঠিনতম সংকল্প গ্রহণ করে দুর্ব্বল দেহ নিয়ে তিনি চললেন অগ্রসর হয়ে জলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে দেহ দিয়ে তাকে নির্ব্বাপিত করতে।

সেদিন ঘনিয়ে এল। সূর্য্য বসেছেন সন্ধ্যা সাগরের তীরে ধ্যানমগ্ন হয়ে। সে ধ্যানের দিব্য স্নিগ্ধতায় আকাশলোক থেকে মর্ত্তলোক উঠেছে রঞ্জিত হয়ে। এগিয়ে চললেন মাটির সন্তান মাটির বুকে, মুখে অক্ষয় হাসি নিয়ে। উন্মাদ হিংসা এসে দাঁড়াল সম্মুখে অগ্নিপিণ্ডের মত চক্ষু নিয়ে, কঠিন ওষ্ঠাধরে বিকৃত হাস্য নিয়ে, হাতে সাপের মত হিংসার অস্ত্র নিয়ে। হাতজোড় করে হাসি মুখে তাঁর জীবনদেবতা শ্রীরামকে স্মরণ করে হিংসাকে শেষবার পরাজিত করবার, প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রামে নিজের দেহকে নৈবেদ্যের মত সাজিয়ে দিলেন। শেষে যেটুকু দেবার বাকী ছিল তাই নিবেদন করে গেলেন তিনি নিঃশেষে।

*　　　*　　　*

আবার গিয়ে দাঁড়াল সেই চির-কিশোর তার পিতার সম্মুখে হাত-জোড় করে, মাথা নত করে। লজ্জায় অস্ফুট কণ্ঠে সে পিতার পদযুগলের দিকে চেয়ে বললে—এবারও আমি পারিনি। আমার দেহও দান করেছিলাম পিতা। তবু পারিনি।

উত্তরে পিতা তাকে বুকে তুলে নিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—তাতে লজ্জা কি? আবার যাবে তুমি ওদের মধ্যে। বার বার ওরা ভুল করবে, নিশ্চিত সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে যাবে। তখন তুমি । । যতদিন না ওরা সর্ব্বগ্লানি-মুক্ত হয়ে ওঠে ততদিন যেতে হবে তোমাকে। যেদিন আমার ঐ খেলার পুতুল মানুষগুলি আমারই মত হয়ে উঠবে, সেদিন তুমি ওদের হাতে ধরে এনে আমার সামনে উপস্থিত করবে। আমি তাদের কাছে দাঁড়াব শ্রদ্ধাভরে মাথা নীচু করে। সেদিন তোমার ছুটি। এই তো আমার খেলা।

বলে পিতা　　প্রিয়তম পুত্রকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

স্বাধীনতার নবজন্ম

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মদেশ—(৩)

১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর আলোকোজ্জ্বল প্রভাত অভিনব বর্ণচ্ছটা নিয়ে জেগে উঠল ব্রহ্মবাসীদের স্বপ্নমাখা চোখের সম্মুখে। পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার অভিযান সার্থক হল তাদের। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মদেশের জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ফিরিয়ে দিলেন দেশের শাসনভার। ব্রহ্মদেশের প্রতি নাগরিকের গৃহশীর্ষে মহোল্লাসে উড্ডীন হল জাতীয় পতাকা। সরকারী ভবনগুলির শীর্ষদেশ থেকে অপসারিত হল ইউনিয়ান জ্যাক। লণ্ডনে ব্রহ্মের হাইকমিশনারের ভবনে ও ব্রহ্মের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ান জ্যাকের স্থান গ্রহণ করল। এশিয়ার আর একটি দেশে স্বাধীনতার নবজন্ম হল। এখন থেকে ব্রহ্মবাসীরা ৪ঠা জানুয়ারীকে স্মরণ করবে অতি শ্রদ্ধাভরে। আগামী কালের ব্রহ্মবাসী প্রতি বছর প্রণাম পাঠাবে এই দিনটির উদ্দেশে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসীর কাছে যেরূপ বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছে, ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তেমনি রূপে দেখা দিল ব্রহ্মবাসীর কাছে।

ব্রহ্মদেশ ভারতের চেয়ে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী এই কারণে যে ভারতবর্ষের মত সুদীর্ঘকাল তাকে বৃটীশের নাগপাশে আবদ্ধ থাকতে হয় নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মকালের এক বৎসর পরে

(১৮৮৬) ব্রহ্মদেশ বৃটীশের পদানত হয়। সেই থেকে ব্রহ্মদেশ বৃটীশ ভারতের এলাকাভুক্ত হয়ে শাসিত হতে থাকে। ভারত শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী চলতে থাকে তার রাজনৈতিক জীবন। ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতেরই অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম তারও স্বাধীনতার সংগ্রাম বলেই স্বীকৃত হয়। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে ব্রহ্মের মুক্তি আন্দোলনের নেতারা উদ্বুদ্ধ হন। কংগ্রেসের পতাকাতলে চলতে থাকে উভয় দেশের মুক্তি-সংগ্রাম। চতুর বৃটীশরাজ এই আন্দোলনকে হীনবল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। ১৯৩৭ সালে ব্রহ্মদেশে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়।

ইংরাজরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রহ্মকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন, তা সিদ্ধ হল না। তার প্রধান কারণ ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করলেন। এর পরই এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ব্রহ্মদেশ এই যুদ্ধের একটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। জাপ আক্রমণে বৃটীশ শক্তি পূর্ব্ব-এশিয়ায় পর্য্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে পলায়ন করে। ১৯৪৫ সালে জাপানের পরাজয়ের পর ইংরাজরা আবার ফিরে আসে এবং পুনরায় নির্ল্লজ্জভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাসমরের কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত সাম্রাজ্যবাদ তখনও খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। এশিয়ার দেশগুলি ও ইউরোপীয় শক্তির শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠে। 'এশিয়া এশিয়াবাসীদের' জাপানের এই শ্লোগান তাদের সকলের চোখ খুলে দেয়। ব্রহ্মদেশেও ইংরাজ তাই আর পোক্ত হয়ে বসতে পারে নি।

যুদ্ধের সময় ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী নেতারা বৃটেনের দুর্ব্বলতা সম্যক বুঝতে পেরে চালাতে থাকেন তীব্র আন্দোলন। তাদের মধ্যে ছাত্র-আন্দোলনের নেতা তরুণ আউঙ্গসান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণের স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুলেন। নেতাজীর মতই তিনি দেশ থেকে বৃটীশ শক্তি উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে বাইরের সাহায্য ও সহযোগিতা গ্রহণের নীতি গ্রহণ করলেন। দেখতে দেখতে প্রায় ত্রিশ হাজার ব্রহ্মবাসী তাঁর স্বেচ্ছাবাহিনীতে যোগ দিল। ব্রহ্মে তখন ডাঃ বা-ম জাপ-তাঁবেদার মন্ত্রিসভা গঠন করে কাজ চালাচ্ছেন। আউঙ্গসান তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা চান। মনে মনে এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ব্রহ্মের বামপন্থী দলগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। কম্যুনিষ্ট নেতা থাকিন নো এই বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আউঙ্গ সান বাইরে ভাব দেখাতে লাগলেন যে তিনি জাপানের সমর্থক। জাপানীদের কাছ থেকে তিনি এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করলেন।

এদিকে মিত্রপক্ষ তখন ব্রহ্ম পুনরুদ্ধারের অভিযান সুরু করেছেন। আউঙ্গসান সুযোগ বুঝে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে জাপানীদের বিতাড়িত করলেন ব্রহ্মদেশ থেকে এবং বৃটীশ সেনানী জেঃ উইনগেট তাঁর চতুর্দ্দশ বাহিনী নিয়ে আসবার আগেই রেঙ্গুন অধিকার করলেন অতি দক্ষতার সঙ্গে। ইংরাজরা আউঙ্গসানের দক্ষতা ও প্রভাব দেখে তাঁকে হাত করবার চেষ্টা করলেন। আউঙ্গসান এই সময় যে রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সিংহলে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কমাণ্ডের সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড মাউন্টব্যাটেনের (বর্ত্তমান ভারতের গভর্ণর জেনারেল) সঙ্গে এক চুক্তি করলেন। তাতে ঠিক হল আউঙ্গসানের সেনাবাহিনীর একাংশকে ব্রহ্মবাহিনীর (বৃটীশ কম্যাণ্ডের অধীন) অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে আর এক অংশ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। আউঙ্গসান দেখলেন যে বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় মহাসমরের আঘাতে হীনবল। কোনরূপে জের টেনে চলেছে তারা। তাছাড়া বৃটেনের সাধারণ নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করে শ্রমিকদল মন্ত্রিসভা গঠন করেছে। এটলী মন্ত্রিসভা বৃটীশ সাম্রাজ্য-ভার লাঘবের নীতি ঘোষণা করেছেন তখন। তাহলেও ব্রহ্মের তদানীন্তন গভর্ণর যে শাসনপরিষদ গঠন করলেন তাতে আউঙ্গসানের ফ্যাসীবিরোধী লীগকে মাত্র ছয়টি আসন দেওয়া হল। ব্রহ্মের জনসাধারণ এতে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে রেঙ্গুনে এক বিরাট জনসভায় আউঙ্গসানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে এবং শাসনপরিষদ ভেঙ্গে দেবার দাবী করে এক প্রস্তাব গৃহীত হল। এইভাবে আরম্ভ হয় এক তীব্র আন্দোলন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্যাসী-বিরোধী স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে গণপরিষদের গঠনের জন্য অবিলম্বে নির্ব্বাচন দাবী করা হয়। আরও দাবী করা হয় যে এই নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য গঠন করতে হবে এক জনপ্রিয় গভর্ণমেণ্ট। এই আন্দোলনে সারা দেশময় তুমুল আলোড়ন দেখা দিল। মুমূর্ষু সাম্রাজ্য-বাদের প্রতিনিধি স্যর ডরম্যান স্মিথ কঠোর দমননীতি চালাতে লাগলেন। ফলে তাকে ব্রহ্ম থেকে বিদায় নিতে হল। নূতন গভর্ণর স্যর হিউবার্ট র‍্যান্স বাধ্য হয়ে শাসন পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন এবং নূতন পরিষদ গঠনের জন্য আউঙ্গসানের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। ফ্যাসী-বিরোধী লীগকে শাসন পরিষদে সংখ্যাধিক্য দেওয়া হল। আউঙ্গসান ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শাসন পরিষদে যোগ দিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে। ভারতেও তার কিছুদিন আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হয়েছে। আউঙ্গসান ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে বর্ত্তমান অবস্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়ে উঠেছে।

কম্যুনিষ্টরা আউঙ্গসানের নীতিতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা বিরোধিতা করতে লাগলেন। দেশময় ধর্ম্মঘট, শ্রমিক বিক্ষোভ চলতে থাকে, স্থানে স্থানে দেখা দেয় অরাজকতা। এমন সময় সকলকে স্তম্ভিত করে ফ্যাসী বিরোধী লীগের পক্ষ থেকে ঘোষিত হল—"শাসন পরিষদকে যদি অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় সরকারের মর্য্যাদা দেওয়া না হয়, গণপরিষদ গঠনের উদ্দেশ্যে যদি এপ্রিল মাসের মধ্যে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা না হয় এবং ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার

করে ঘোষণা প্রচার করা না হয় তাহলে ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ফ্যাসী বিরোধী লীগের সদস্যরা শাসন পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসবে।"

বৃটেনের এই ঘোষণায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ব্রহ্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনার জন্য শাসন-পরিষদের এক প্রতিনিধি দলকে আহ্বান করলেন লণ্ডনে। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে আউঙ্গসানের নেতৃত্বে ব্রহ্ম শাসন পরিষদের এক প্রতিনিধি দল লণ্ডনে গেলেন। লণ্ডন বৈঠকে বৃটীশ সরকার যে প্রস্তাব করলেন তাতে মোটামুটীভাবে ফ্যাসী বিরোধী লীগের দাবীগুলি সমর্থিত হয়। আউঙ্গসান বৃটীশ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু মহাবামা দলের ডাঃ বা-ম, দোবামা দলের থাকিন-বা-সীন এবং মায়োচিৎ দলের উ-স বৃটীশ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারলেন না। বৃটীশ প্রস্তাবের ক্রটী এই ছিল যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবার কথা তাতে উল্লেখ করা ছিল না। আউঙ্গসান এই ক্রটী সত্বেও প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এইজন্য যে—গণপরিষদের মারফৎ তাঁরা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করতে পারবেন। চুক্তি নিষ্পন্ন করে দেশে ফিরে এলেন নেতারা। আয়োজন চলল গণ-পরিষদ নির্ব্বাচনের। নির্ব্বাচনে আউঙ্গসানের ফ্যাসী বিরোধী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্য লাভ করে। (ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ দ্রষ্টব্য) তারপর গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হলে আউঙ্গসানের নেতৃত্বে গণপরিষদ ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন তারিখে এক সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে বৃটীশ কমন ওয়েলথের বহির্ভূত পূর্ণ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। কিন্তু হীন রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে এই মহান দেশপ্রেমিক নেতাকেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়। আউঙ্গসানের আততায়ীরা অবশ্য ধরা পড়েন এবং বিচারে তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। উ-সর নেতৃত্বেই চক্রান্তকারীরা পরিষদ ভবনে হানা দিয়ে আউঙ্গসান্ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের হত্যা করে। উ-স ও তাঁর অপর আটজন সহযোগীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। এই চক্রান্তে যে বৃটীশ অফিসারগণও জড়িত তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আউঙ্গসনের মৃত্যুতে তাঁর সহকর্ম্মী থাকিন-নু নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। স্বাধীন ব্রহ্মের মন্ত্রিসভা ফ্যাসী-বিরোধী লীগের অন্তর্ভূক্ত নব-গঠিত মার্কসিষ্ট লীগপন্থীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে। সোস্যালিষ্ট ও গণ-স্বেচ্ছাবাহিনীর একটা অংশ নিয়ে এই মার্কসিষ্ট লীগ গঠিত গণপরিষদের সদস্যদের শতকরা ৮০জন এই দলের। পরিষদের বিরোধী দলে রয়েছে কম্যুনিষ্টগণ। অবশ্য শাসনতন্ত্রের দিক দিয়ে এই বিরোধিতা কার্য্যকরী নয়। তবে মধ্য-ব্রহ্মে কম্যুনিষ্টদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। প্রধান মন্ত্রী থাকিননুর অভিমত—মধ্যব্রহ্মের গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার মূলে কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনা রয়েছে।

গত জুলাইমাসে আউঙ্গসানের হ ৎকাণ্ডের পর ব্রহ্মের রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। মায়োচিৎ দলের নেতা উ-স তো এখন ফাঁসীর আসামী। মহাবামা দলের নেতা ডাঃ বা-ম পাঁচ মাস পরে সদ্য জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। দোবামা দলের নেতা থাকিন-বা-সীন এখন কারারুদ্ধ। এই দলের আরও অনেক বিশিষ্ট নেতাও বন্দী হয়ে আছেন। কাজেই ফ্যাসীবিরোধী দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের বিরোধিতাকে মোটেই আমল দেওয়া চলে না।

ফ্যাসীবিরোধী লীগ ক্রমে ক্রমে ষ্টেট সোস্যালিজমের পক্ষপাতী। কম্যুনিষ্টরা রাতারাতি সোস্যালিজম চায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ব্রহ্মকে এক বিরাট ঝুঁকি নিয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তার বুকের উপর দিয়ে যে ধ্বংসলীলা চলে গেছে তার থেকে উদ্ধার পেতে হলে তাকে বিরাট পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। এই জন্য ধীর মস্তিষ্কে বিচার করে চলা দরকার। ফ্যাসীবিরোধী লীগ ঠিক পথই নিয়েছেন।

প্রতিটি ভারতবাসী তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রতি এই মহান কার্য্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা পোষণ করে। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন ব্রহ্মের সৌহার্দ্দ্যকে তারা গভীরতর দেখতে চায়। স্বাধীন ব্রহ্মের সমৃদ্ধিতে এশিয়ার সমৃদ্ধি। স্বাধীনতার নবজন্ম সার্থক হোক।

সব হারানো

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

তোমারে হেরেছি হৃদয়ে আমার
বাহিরে তুমি যে নাই ;
অন্তর মাঝে অসীম হইয়া
লভেছ নীরব ঠাঁই।
পরাণে আমার দিয়েছ নিবিড়
গভীর সাগর দোলা,
বক্ষ-দরজা উদার-অসীম
রয়েছে তাইতো খোলা।

দিকে দিকে তাই ছুটিছে পরাণ,
ছুটিছে আকাশ পানে ;
সেথা যেন শত জ্যোতির মোহনা,
কি যেন কি করে টানে।
বাহিরে ভিতরে হেরেছি আজিকে
একটি পরম ধারা,
বাসনা কামনা যত ছিল মোর
হয়ে গেছি সব হারা।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মায়ের নজর কিন্তু যেমন কড়া, তেমনি সজাগ। খিড়কি দরজা দিয়ে নিরাপদে সরে পড়ছিল, মা ঠিক ধরে ফেললেন যথাসময়ে।

—এই ছেলে, মাথায় ফেট্টি বেঁধে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

—একটু মনসাতলায় যাবো মা—তো-তো করে জবাব দিলে মঞ্জু।

—ঠিক মনসাতলায় তো? একটুও এদিক ওদিক নয়?

জোর করে মিথ্যে কথা বললে মঞ্জু। সাধারণত মিথ্যেটা মুখে আসে না, কেমন বোকার মতো ধরা পড়ে যায়। কিন্তু আজ বলে ফেলল, আর বললে যেন অবলীলাক্রমেই। মনের মধ্যে অন্য রকম জোর এসেছে একটা, বুকের মধ্যে কী একটা জিনিস টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, চিরদিনের নিরাহ ভালো ছেলেটির ভেতরে ঘূর্ণি হাওয়ার মাতলামির মতো ঘটে গেছে কেমন বিপর্যয় ব্যাপার।

—না মা—সজোর গলায় মঞ্জু বললে, আর কোথাও যাব না।

—মনে থাকে যেন। আর সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে হবে—কেমন?

—আচ্ছা।

পথে বেরুতেই খাঁচার পাখির মতো ছাড়া পেল মন। শরীরটা একটু আড়ষ্ট বোধ হচ্ছিল, আঘাতের গ্লানিটা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে যায়নি এখনো। তবু এই আড়ষ্টতাটা কাটাবার জন্তেই যেন সে হেঁটে চলল আরো জোর পায়ে।

—উকু—উকু—উকু—

ঠিক যেন বানরের ডাক। শূন্য থেকে ভেসে এল বলে মনে হল। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মঞ্জু, তাকালো চারদিকে।

—উকু—উকু—হুক্কা—হুয়া—

বানর আর শেয়াল এক সঙ্গে ডাকছে। কিন্তু তারা তো পাখি নয় যে আকাশ থেকে ডাকবে। তা হলে নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু ডাকছে কোত্থেকে?

হতভম্বভাবে চারদিক তাকাতেই প্রশ্নটার জবাব মিলল। রেলওয়ে গুমটিটার পাশে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটার মাথা সজোরে দুলছে। তার ওপর দিয়ে গুটি তিনেক বানরের মতো মুখ কাঁচা তেঁতুল চিবুতে চিবুতে দাঁত খিঁচোচ্ছে মঞ্জুকে। ভোনা অ্যাণ্ড্‌ পার্টি! বেশ আছে।

ভোনা চীৎকার করে 'বাহে' ভাষায় বললে, কুনঠে থাকি মাথা কাটাই আইলু বাহে? ও গঙ্গাফড়িং, শুনিছেন?

নষ্টচন্দ্রের ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চটে আছে ওর ওপরে। তাই অকারণ পুলকে এই পেছু-লাগা। জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে মঞ্জু হনহনিয়ে চলে গেল।

—হুক্কা—হুয়া—হুয়া—ধ্বনিটা যেন পেছন থেকে তাড়া করে আসতে লাগল।

কিন্তু যেটা আসল সমস্যা সেটা দেখা দিল এর পরে। এতক্ষণ মনে ছিল না কিন্তু ভারী অস্বস্তি লাগল এবারে। একে তো বড়লোকের বাড়ি, আদব-কায়দা নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। এ সব বাড়ির সামনে আসতে ভয় করে মঞ্জুর, কেমন নার্ভাস বোধ হয় নিজেকে। তার ওপর আবার ডাকতে হবে পরিমলকে। পরিমলের বাবা বড়লোক, দুর্দান্ত মেজাজ, হঠাৎ চাকর লেলিয়ে দেবেন কিনা কে জানে। আর তার সেই অপ্রস্তুত অপদস্থ অবস্থাটা যদি মিতার চোখে পড়ে তা হলেই বা ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াবে?

শেষ কথাটা ভাবতেই রাঙা হয়ে উঠল কপাল, ঝুঁকড়ে গেল সমস্ত উৎসাহ। সব সহ্য হবে, কিন্তু মিতার চোখের সামনে অপমানিত হওয়াটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার—মৃত্যুর চাইতেও তা সাংঘাতিক। অথচ—

রাস্তার ওপরে ল্যাম্প-পোষ্টটার তলার দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল মঞ্জু।

সামনে ফুলেভরা বাগান। প্রজাপতি উড়ছে, অল্প অল্প বাতাস লেগে একটা গোলাপের পাপড়ি ঝরে পড়ল ঝুরু-ঝুরু করে। ঢেউ-তোলা পাঁচীলটার ওপরে একটা দোয়েল যেন মঞ্জুর বিব্রত অবস্থা দেখে কৌতুকে লেজ নাচাতে লাগল।

বাড়িটার দিকে মধ্যে মধ্যে অনুসন্ধিৎসু আর আকুল দৃষ্টি ফেলতে লাগল সে। ওই তো দোতলায় পরিমলের পড়বার ঘর, জানালাটা খোলা, তার সামনেকার টেবিলটাকেও এখান থেকে স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মঞ্জু ভাবল ওখানে যদি একবার পরিমল এসে দাঁড়ায়, তবে একটা হাতছানি দিয়েও অন্তত—

নাঃ, বৃথা। পরিমল যেন পণ করেছে জানালার সামনে এসে দাঁড়াবে না। এত বড় বাড়িতে কি একটা জনমানুষও নেই। একবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল একটা পশ্চিমা চাকর, উৎসাহভরে মঞ্জু তাকে ডাকতে যাবে, কিন্তু বরাত খারাপ, কী মনে করে লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

কতক্ষণ এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বেকুবের মতো? ইতিমধ্যে আবার উকিল সারদাবাবুর ঢ্যাঙা ফোর্ড গাড়িটা ঘটর ঘটর করে চলে গেল রাস্তা দিয়ে—লাল ধুলোর একেবারে স্নান করিয়ে গেল মঞ্জুকে। খক্-খক্-খক্। নাকে মুখে একরাশ ধুলো এসে ঢুকেছে।

আর তো পারা যায় না। এগিয়ে গিয়ে একবার ডাক দেবে নাকি বুক ঠুকে? নাকি ফিরে চলে যাবে, অথবা সোজা চলে যাবে তরুণ-সমিতির জিমন্যাষ্টিক ক্লাবের উদ্দেশ্যে? কিন্তু সেও পরাজয়—আত্মসম্মানে ভয়ঙ্কর বাধছে। মহা ঝামেলাতেই পড়া গেল যা হোক।

কিন্তু এই ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল যেন যাদুমন্ত্রের বলে।

—নমস্কার—

কানের কাছে যেন কাঞ্চন-নদীর ছোট্ট একটি ঢেউ ছলাৎ শব্দে ভেঙে পড়ল।

পরণে নীল রঙের শাড়ী, কপালে কাঁচপোকার টিপ, পায়ে শাদা স্ট্র্যাপের বর্মা চটি। হাতে উল আর ক্রুশ-কাঁটা, কোথা থেকে যেন সেলাই শিখে এল—কুমারী সংঘমিত্রা লাহিড়ী।

চমকটা সামলে নিলে মঞ্জু, দ্বিতীয়বারের সাক্ষাতে খানিকটা সহজভাব এসে পড়েছে নিজের মধ্যে। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু কিশোরী মেয়ে মিতা আসতে আসতে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করেছে। হাসিমুখে বললে, এখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কেন বলুন তো?

—এই, এই—মানে—

—দাদাকে ডাকছিলেন, না?

একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল, কিন্তু কেমন একটা লজ্জার চোখ তুলে তাকানো যাচ্ছে না মিতার দিকে। মঞ্জু তেম্‌নি বিব্রতভাবে বললে, হ্যাঁ, এই—

—তবে রাস্তার দাঁড়িয়েছিলেন কেন? ডাকলেই পারতেন।

—এই ভাবছিলাম—

—চলুন, চলুন, আসুন আমার সঙ্গে—

বার্মা চটির একটা মৃদু শব্দে খোয়া ওঠা পথটা মুখর করে মিতা বাড়ির দিকে চলল, মঞ্জু অনুসরণ করল তাকে।

—আপনি ভারী লাজুক।

মেয়েদের কাছ থেকে লাজুক অপবাদ পৌরুষে ঘা দেয়। কিশোর মঞ্জুর মনের ওপর থেকে বোঝা সরে গেল। এবারে সে সোজা দৃষ্টি তুলে ধরল মিতার দিকে: কেন বলছেন এ কথা।

—বাঃ, সেদিন কী রকম ছুটে পালিয়ে গেলেন। আজ আবার এসে রাস্তার ধারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন!—গেটের কবাটটা খুলতে খুলতে মিতা বলে ফেলল: কবিদের বুঝি এই রকম লজ্জা থাকে?

—কবি!—মঞ্জু থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, কবি।—মিতা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল: কিছু জানিনা ভাবছেন? সব শুনেছি দাদার কাছে। চমৎকার কবিতা লেখেন আপনি—একদিন আপনার কবিতা শোনাতে হবে।

—বাজে কথা—ঘর্মাক্ত হয়ে জবাব দিলে মঞ্জু।

—বাজে কথা বই কি। আপনি তো স্বীকার করবেনই না—যা আপনার লজ্জা! আমিই না হয় একদিন আপনাদের

বাড়ি গিয়ে কবিতার খাতা চুরি করে আনব। জানেন, কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসি আমি।

জানে রঞ্জু। 'কথা ও কাহিনা'র পাতা উলটেই তা বুঝতে পেরেছে।

মিতা বললে, বসুন এই বাইরের ঘরে। দাদাকে ডেকে দিচ্ছি আমি।

হলঘরের মাঝখানে বিহ্বল রঞ্জুকে দাঁড় করিয়ে রেখে সিঁড়ি দিয়ে চটুল ছন্দে উঠে গেল ওপরে—চটির শব্দটা ক্রমে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে এল তার।

দাঁড়িয়ে থাকবে কি বসে পড়বে ভাবতে ভাবতে দেখল কখন এক ফাঁকে একটা গদীমোড়া চেয়ারেই বসে পড়েছে। নরম কুশনের আরামে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে মনে হল যেন অনেকক্ষণ কঠিন পরিশ্রমের পরে এই মাত্র বিশ্রাম পেল সে। তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল ঘরটাকে। তেমনি সুন্দর করে সাজানো, বাইরের বাগানটার ফুল আর পাতার বিন্যাসের সঙ্গে ঘরের সজ্জাও যেন সুর মিলিয়েছে। আজকে সে ধূপের গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে না—কিন্তু তার রেশ যেন মূর্ছিত হয়ে আছে চারিদিকে। পাথরের মূর্তিগুলো তেম্‌নি শোভা পাচ্ছে ছোটবড়ো টিপয়ের ওপরে। সব চাইতে ভালো লাগল এক কোণে একটা নতুন মূর্তি—যেটা আগের দিন চোখে পড়েনি। ও মূর্তিটা চেনা—নটরাজ, একটা মাসিকপত্রে ওর ছবি দেখেছে। অপূর্ব লাগে ওই মূর্তির ভঙ্গিটা, কেমন রোমাঞ্চ জাগে ওর চারদিকের শিখা-বিচ্ছুরিত বহ্নি-বলয়ের দিকে তাকিয়ে।

কিন্তু মিতা একটা কেমন চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়েছে মনের ভেতরে—জলে দোলা লাগবার মতো কেমন ছলছলিয়ে উঠছে শরীর। কবি রঞ্জুর পরিচয় পেয়েছে, কৌতুক করেছে তাই নিয়ে। যেটা তার একান্ত নিজের জিনিস, যা খানিকটা করুণ বেদনার মতো সে সযত্নে আগলে রেখেছে তাকে নিয়ে পরিহাস করাটা কেমন নিষ্ঠুরতা বলে বোধ হয়, যেন আশা করা যায় না মিতার কাছ থেকে। কিন্তু ইচ্ছা করেই কি এই নিষ্ঠুরতা করেছে মিতা, না সত্যি সত্যিই সে কবিতা লেখে শুনে শ্রদ্ধাবোধ করেছে তার সম্পর্কে ?

আবার মিতার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে চেষ্টা করল, একসঙ্গে ভাবতে চেষ্টা করল অনেক কিছু। আসবার সময় তো আজ বাগানে হরিণটাকে চোখে পড়ল না। নিশ্চয় বাড়ির ভেতরে আছে হরিণটা। কী নীল ওর চোখ দুটো—ভোরবেলাকার আকাশের সঙ্গে মিল আছে সে চোখের, ভিজে ভিজে নীল—যেন সকালের শিশির-ধোয়া আকাশের রঙ। ওই নটরাজ মূর্তির যে ছবি দেখেছিল পত্রিকার পাতায়—কী যেন একটা কবিতার লাইন লেখা ছিল তার নীচে ? প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে—এত দেরী করছে কেন পরিমল ?

মিতা—না মিতার সম্পর্কে আর ভাববে না রঞ্জু। হঠাৎ ছেলেবেলার একটা ছবি দেখা দিল চোখে। ঊষা। আঙুলের ডগায় তেঁতুলের আচার চাটতে চাটতে আসছে। বিয়ে দিয়েছিল অশ্বিনী, কচুবনে ছাত্‌নাতলা করে বিয়ে দিয়েছিল তার সঙ্গে—আর মন্ত্র পড়েছিল। কী চমৎকার সে মন্ত্র। তারপর বিয়ের শোভাযাত্রা, আর তার বিয়োগান্ত পরিণতি!

আবছা একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। তার বৌ। এখন তারই মতো বড়ো হয়েছে নিশ্চয়, আর কারো বৌও হয়েছে কিনা কে বলবে। আচ্ছা, ঊষার রঙও বেশ টুকটুকে ফর্সা ছিল। মনে হয় যেন তার সঙ্গে মিতার মিল আছে, যেন সেদিনের ঊষাই আজ কুমারী সংঘমিত্রা হয়ে—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভাবতে ভাবতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে মন! নিজেকে বোধ হতে লাগল অত্যন্ত অসভ্য, অপরিসীম বর্বর। সেও কি ভোনার স্তরে গিয়ে নামল, রায়-বাড়ির বিমলিকে নিয়ে যে কুৎসিৎ কথা ওরা বলাবলি করেছিল, ও যেন প্রায় ওই ছেলেগুলোর পর্যায়েই নেমে এসেছে। ছিঃ ছিঃ—এ বাড়িতে আসবার সে অযোগ্য, ভদ্রসমাজে মেশা তার উচিত নয়। ভোনাদের সঙ্গে ওই তেঁতুল গাছের ডগায় উঠে বসাই উচিত ছিল তার।

আত্মধিক্কারের পর্বটা শেষ হওয়ার আগেই সিঁড়ির মাথায় শোনা গেল পায়ের আওয়াজ। ধক্ করে উঠল বুক—মিতা ? রঞ্জুর যেন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে করল চেয়ারের কুশনের ভেতরে—যে ভাবনা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে তার—কেমন করে কথা বলবে সে মিতার সঙ্গে ? কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে শব্দটা আরো একটু নীচে নামতেই

গরম তৃপ্তিতে খানিকটা বাতাস টেনে নিলে ফুসফুসে। এ মিতার পায়ের আওয়াজ নয়, সে লঘুতা নেই এতে। পরিমল নামছে বোধ হয়।

সত্যই পরিমল।

জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে পরিমল নামল: একটু দেরী হল। কিন্তু মিতা যে বললে তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলি, সত্যি নাকি রে?

—ধ্যেৎ।

—শোন্, লজ্জার কিছু নেই। এখানে এসে সোজা ডাক দিবি আমাকে—কেউ কিচ্ছু বলবে না। কিন্তু উঠে পড়লি যে? বোস, চা খেয়ে নিই।

—না ভাই, আজ আর চা খাবো না—

—কেন, আপত্তি কী?

—এমনিই।

কিন্তু এমনিই নয়। এ বাড়িতে আর বসতে ইচ্ছে করছে না রঞ্জুর—বেরিয়ে যেতে পারলেই খুশি হয়। একটু আগেকার বিশ্রী ভাবনাটার রেশ কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না, এখানে যতক্ষণ থাকবে যাবেও না।

—তবে চল্—

দুজনে রাস্তায় এসে পা দিল। আঃ, বাঁচা গেল যেন। চেনা, অভ্যস্ত, নিজস্ব জগৎ। মাথার ওপরের আকাশটা, ধুলো আর ধোঁয়ায় ভরা পথ, কাঠের উইয়ে-খাওয়া পোস্টের ওপরে ফাটা আর কালিমাখা কেরোসিনের আলো।

—লাইব্রেরীতে যাবি তো?

—সেই জন্যেই তো এলাম।

—বাড়িতে কেউ কিছু বলেনি?

—মা ধরেছিলেন। ফাঁকি দিয়ে এলাম।

পরিমল হাসল, কিন্তু বিষণ্ণভাবে।

—আমার মা নেই, তাই ফাঁকি দেওয়ার দরকার হয় না কাউকে।

মা নেই শুনলে কষ্ট হয়। আরো পরিমলের মা। রঞ্জু পড়ার ঘরে তাঁর ছবি দেখেছে। অমন সুন্দর মাকে হারানো সত্যি সত্যি দুর্ভাগ্যের কথা, পরিমলের জন্যে সহানুভূতি বোধ হল।

—কতদিন মারা গেছেন তোমার মা?

—অনেক দিন। ভালো করে মনেও পড়ে না।—পরিমল মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলল।

রঞ্জু ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল। নিজের মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল মনের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে করুণাদিও। আজ একবার গেলে কেমন হয় করুণাদির ওখানে? কিন্তু কে জানে তিনি কী ভাববেন!

পথ চলতে লাগল দুজনে। একটা খয়েরী রঙের কোট-পরা লোক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল সাইকেলে, অনর্থক ক্রিং ক্রিং করে বেলটা বাজালো একবার। পরিমলের চলার ভঙ্গিটা শিথিল হয়ে এল, কঠিন তীব্র-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল সাইকেলটার দিকে—যতক্ষণ না পথের একটা মোড় ঘুরে মিলিয়ে গেল সেটা।

পরিমলের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করলে রঞ্জু।

—চিনিস লোকটাকে?

—হুঁ।

—কে ও?

পরিমলের দৃষ্টি এবার সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল রঞ্জুর মুখে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বললে, কুকুর।

—কুকুর! সে কি?

—পরে বুঝবি—পরিমল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করে শব্দ করলে: একদিন ওই বুলডগগুলোকে ঠাণ্ডা করতে হবে। চিরকাল এভাবে তো চলবে না, আমাদের দিনও আসবে। সেদিন সব চাইতে আগে ধনেশ্বরের পালা।

—ধনেশ্বর কে?

—সবচেয়ে খেঁকে কুকুরটা।

—কিছুই বুঝলাম না ভাই—হতাশভাবে রঞ্জু জবাব দিলে।

—তুই কবিতা লিখলে কী হবে, ভারী মোটা মগজ তোর—কথায় সুরে মৃদু তিরস্কার মিশিয়ে পরিমল বললে, ওরা টিকটিকির দল—দিনরাত শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেশের কথা যারা এতটুকু ভাবতে চেষ্টা করে, তাদের গলা টিপে ধরাই এদের পেশা। আর প্রভুভক্তির পুরস্কার পায় কিছু হাড়-মাংস, দুনিয়ার সব চাইতে কুৎসিৎ জানোয়ার।

এতক্ষণে কথাটা বুঝল রঞ্জু। কেমন ছম ছম করে উঠল মন। তাদের পেছনেই লাগেনি তো লোকটা?

বাজেয়াপ্ত বই পড়াশুনো করে সে—ফাঁসির ডাক, শহীদ সত্যেন। আইনের দিক থেকে এগুলো অপরাধ—পরিমলই বলে দিয়েছে ধরা পড়লে খুব সুখের দাঁড়াবে না অবস্থাটা।

যেমন ভয় করল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি একটা প্রখর বিদ্বেষ বিষিয়ে উঠল মুখ-না-দেখা খয়েরী রঙের কোট-পরা সেই অপরিচিত সাইকেলের আরোহী সম্পর্কে। লোকটা যেন শনিগ্রহের মতো মনের দিগন্তে সঞ্চার করে দিয়ে গেল অশুভ-সংকেত।

—বাংলা দেশের বিপ্লবীরা তো কত লোককে মেরেছে, ঠাণ্ডা করে দিতে পারে না এদের ?

—দেবে, দেবে।—নির্জন পথটাকে ভালো করে লক্ষ্য করে নিলে পরিমল: সকলের হিসেবই তৈরী আছে, কেউ বাদ যাবে না। ওদের বিচারের সময়ও আসবে।

রঞ্জু আস্তে আস্তে বললে, যদি আজ কানাইলাল থাকত—

—কানাইলাল শুধু কি একজন ? চারদিকে হাজার হাজার কানাইলাল তৈরীই আছে—শুধু সময় আর সুযোগের অপেক্ষা। কিন্তু—পরিমল নিজের উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিলে: রাস্তার এসব আলোচনা নয় রঞ্জু, মুস্কিল হতে পারে।

রঞ্জুর বুকের ভেতরে লাফাতে লাগল। ভুল নেই আর, সংশয়ের অবকাশ নেই কণামাত্র। একটু একটু করে নিজের অজ্ঞাতেই পরিমল ধরা দিচ্ছে তার কাছে, আত্মপ্রকাশ করছে। এইবার শুধু আস্তে আস্তে জেনে নিতে হবে চিচিং ফাঁকের মন্ত্রটা। তাড়াতাড়ি করলে হবে না, পরিমল বলবে, আর একদিন। তা ছাড়া তরুণ সমিতি সম্বন্ধে দারোগা যা বলেছেন—

সদর রাস্তা ছেড়ে দুজনে পাড়ার মধ্যে ঢুকল। প্রায় অচেনা পাড়া, কালে ভদ্রে এসেছে দু একবার, বারোয়ারী সরস্বতী কিংবা দুর্গাঠাকুর দেখতে। পাড়ার দুটি চারটি ছেলের চেনা মুখও চোখে পড়ল, কিন্তু আলাপ নেই রঞ্জুর। এমনিতেই তার নিরালা আর ভীরু স্বভাব—নিজের পাড়াতেই তার ঘনিষ্ঠতাটা সীমাবদ্ধ। তরুণ-সমিতির চার পাঁচটি ছেলেও তার ওই রকম মুখ-চেনা, তাদের দুজন রঞ্জুদের স্কুলেই পড়ে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে।

কয়েকখানা বাড়ি পেরোতেই চোখে পড়ল সাইন বোর্ড। তরুণ-সমিতি পাঠাগার, ১৩৩৬ সাল।

মাটির দেওয়াল, টিনের চাল। ভেতরে খানকয়েক বেঞ্চি আর একটা লম্বা টেবিল দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে। সেই টেবিলটার দুদিকে বসে একদল ছেলে হল্লা জমিয়েছে।

পরিমল বললে,এই আমাদের লাইব্রেরী। আর ভেতরে।

ওরা ভেতরে ঢুকল। ভীরু চোখে রঞ্জু একবার দেখে নিলে এই নতুন পরিবেশটাকে। ঘরের দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষে গোটা চারেক বড় বড় বইয়ের আলমারি। এক-দিকে একখানা ছোট টেবিলের সামনে চশমা-পরা আধবুড়ো একজন ভদ্রলোক খাতায় লিখে লিখে বই দিচ্ছেন দু তিনটি ছেলেকে। জনকয়েক সামনের লম্বা টেবিলটায় বসে খবরের কাগজ আর মাসিকপত্রিকা পড়ছে, একজন একখানা পত্রিকা উঁচু করে ধরে জোর গলায় কী পড়ে শোনাচ্ছে আর একজনকে। পত্রিকাটার প্রচ্ছদপট রঞ্জু দেখতে পেল, তার নাম স্বাধীনতা, একটি বলিষ্ঠ দেহ পুরুষ—বেণুদার মতো চেহারা—দুহাতে বাঁধা লোহার শিকল ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলছে।

দেওয়ালে কতগুলো ছবি—মানুষের ছবি। তাদের কাউকে কাউকে রঞ্জু চিনেছে, একজন ছেলেবেলা থেকেই তার সঙ্গে পরিচিত, অবিনাশবাবু চিনিয়ে দিয়েছিলেন—মহাত্মা গান্ধী। আর একজনকেও চিনেছে, সত্যবতী গোয়েঙ্কা, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজ তাঁর ছবিতে ছবিতে ছেয়ে গিয়েছিল—সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যিনি প্রথম কারাবরণ করেছিলেন বাংলা দেশ থেকে। তা ছাড়া দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র বসু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, রবীন্দ্রনাথও আছেন। তা ছাড়া বাকী যাঁরা, তাঁদের না চিনলেও তাঁরা যে সবাই মস্ত বড় মানুষ এটা বুঝতে কষ্ট হল না।

ছবি ছাড়াও লাল-নীল কালিতে লেখা নানা রকমের পোস্টার।

—বন্দে মাতরম্—

—ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে

মোদের বাঁধন টুটবে—

—ওরে তুই ওঠ্ আজি,

আগুন লেগেছে কোথা, কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি ?

—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।

—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার—

—আমরা ঘুচাব মা তোর কলিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—

—দিন আগত ওই,
ভারত তবু কই ?

এমনি সব লেখা—দেওয়াল একেবারে ছেয়ে রেখেছে। আধ ঘণ্টা ধরে ওগুলোই পড়া যায় মন দিয়ে। ইংরেজিও আছে :

—Freedom is our birthright
—Equality, Liberty and Fraternity—
—Arise, awake and stop not till
the goal is reached—

প্রত্যেকটি লেখার ভেতরেই একটা মিশ্রিত দৃঢ়তা, নিষ্ঠুর সংকল্প যেন ব্যঞ্জিত হয়ে পড়ছে। ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই তরুণ-সমিতি যেন চোখে আঙুল দিয়ে বলে দিচ্ছে, শুধু গল্প আর উপন্যাস পড়া, শুধু বসে বসে আড্ডা দেওয়া আর বথামি করা—এইটেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। সত্যও নয়। মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, দেশের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে নিজেকে। জিমন্যাষ্টিক ক্লাবে গিয়ে দেখেছিল শরীরকে ভালো করবার আয়োজন, এখানে এসে দেখল মনকেও সুস্থ ও প্রশস্ত করে নেওয়ার ব্যবস্থা।

বড় ভালো লাগল।

ওরা ঘরে ঢুকতে কেউ কেউ ওদের দিকে তাকালে, কিন্তু কোনো কথা বললে না। শুধু দুএকজনের জিজ্ঞাসু চোখের জবাবে মৃদু হাসল পরিমল, তারপর বললে, চল রঞ্জু, তোকে আলাপ করিয়ে দিই আমাদের লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে। (ক্রমশ)

চরৈবেতি

সূর্য্য যায় অস্তাচলে।
যমুনার কালো জলে
লাল আলো পাংশু হয়ে আ..
রাত্রির নিঃশ্বাসে।
তৃণখণ্ড হতে বৃদ্ধ বনস্পতি গোধূলি বেলায়,
ভাবে বুঝি সূর্য্য নিভে যায়,—
কার সপ্ত বরণের ঋণ
পাতায় সবুজ হবে, ফুলে ফলে রহিবে বিলীন
বিবিধ বিচিত্র সাজে!
তাই নিত্য সাঁঝে
আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে নত হয়ে আসে পত্ররাজি,
বুঝিলাম আজি।
পড়িতে পারে না ওরা গোধূলি-আকাশে
অনন্ত আশ্বাসে
সূর্য্যের স্বাক্ষরে লেখা আগামী দিনের বরাভয়
—তোমার বিশ্বের কেন্দ্রে আমি যে অব্যয়,
হে তৃণ, হে বনস্পতি, আমি ধ্রুব, আমি চিরস্থির।
জননী পৃথ্বীর
শ্রান্তিহীন পরিক্রমা আলোকের চির-তপস্যায়
ব্যর্থ নাহি যায়।

সূর্য্য ফিরে আসে
তৃণখণ্ড বনস্পতি হাসে।
যমুনার-তীরে
যুগের প্রদীপ্ত সূর্য্য হিংসাকুল রাত্রির তিমিরে
গেল অস্তাচলে।
ভারতের মহাকাশে গোধূলির শোকাভাস জ্বলে।
সংখ্যাতীত খদ্যোতের আলোক-সজ্জায়
একচন্দ্র বিবর্ণ লজ্জায়।
এই হাহাকার মাঝে শুনেছি সূর্য্যের প্রত্যাদেশ—
দিয়েছি নিঃশেষ ;
তোমার প্রাণের কেন্দ্রে তবু আমি আছি পূর্ণ হয়ে—
যেখানে তোমার প্রেম আপনি নিঃশঙ্ক পরিচয়
সহস্র শতাব্দী ধরে মানুষ গড়েছে তিলে তিলে
বিধাতার মিলে।
সে ভালবাসারে ঘিরে রাত্রি হতে দিন
মানুষের ইতিহাস কোটী কল্প করে প্রদক্ষিণ।
রাখিও বিশ্বাস,
রাত্রির তপস্যা হতে তোমার চলিষ্ণু ইতিহাস
প্রভাত আনিবে ফিরে
শোণিতাক্ত যমুনার তীরে।

হিংস্র মানব

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (মাদ্রাজ)
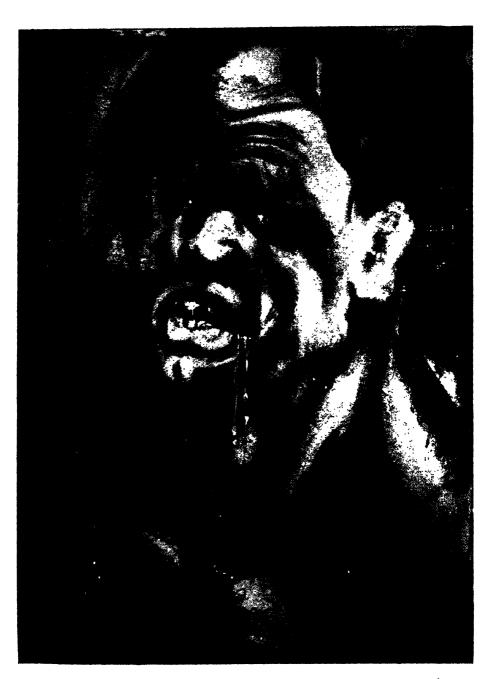
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই—ছায়ার মত কায়াগুলি চলিয়াছে আশ্রয়ের সন্ধানে—বিপদসঙ্কুল পথে। ওরা কোন দেশের মানুষ? কে করিল ওদের ঘরছাড়া?
শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী (মাদ্রাজ)

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

উদয়পুর

যোধপুরের ষ্টেশন মাষ্টার একজন য়ুরোপিয়ান। ধীরেনভায়া তাঁকে বলে রাজ অতিথিদের জন্ত একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলেন। একেবারে যোধপুর থেকে সোজা উদয়পুর যাওয়া যাবে। পথে কোথাও গাড়ী বদলের হাঙ্গামা নেই। আমরা খুব খুশী হয়ে ধীরেনভায়াকে অজস্র সকৃতজ্ঞ ধন্তবাদ ও আশীর্ব্বাদ জানিয়ে আমাদের লটবহর ও মালপত্র সব গাড়ীতে তুলে নিলুম। কুলি বিদায় ক'রে শ্রীমান ভোলানাথ যখন বিছানাগুলি পাতবার ব্যবস্থা করছিল, অধ্যাপক নন্দী বললেন—একটা অনুরোধ রাখতে হবে। প্রসন্ন মনে বললুম—আদেশ করুন। তিনি একখানি প্রথম সংস্করণের 'ওমর খৈয়াম' বই বার ক'রে বললেন—বইখানির উপর আপনাকে একটি 'অটোগ্রাফ' দিতে হবে। 'তথাস্তু' বলে নন্দী মহাশয়ের অভিলাষ পূর্ণ করলুম।

গাড়ী ছাড়তে আর দেরী নেই. এমন সময় ট্রেন-ইন্স্পেক্টর ও গার্ড সাহেব এসে সবিনয়ে বললেন, আপনারা অনুগ্রহ করে ট্রেনের অন্ত কোনো কামরায় চলে যান। এ বগী-খানি কেটে রাখতে হবে। কথাটা শুনে সকলেই বিস্মিত ও দুঃখিত হয়ে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করছিলুম। ডাঃ বিজয়কিশন্ চটে উঠলেন। ভ্রম-ক্রমে এঁর নাম পূর্ব্ব পরিচ্ছেদগুলিতে 'ডাঃ বিজয়লাল' বলে উল্লিখিত হয়েছে। এঁর নাম ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার, কিন্তু সমগ্র রাজপুতানায় ইনি 'ডাক্তার বিজয়কিশন্' নামেই পরিচিত। ধীরেনভায়া ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কারণ সে ট্রেনে ঐ একখানি মাত্রই বগী—যেটি সোজা উদয়পুর পর্য্যন্ত কেন, চিতোরগড় পর্য্যন্ত যায়। অন্ত কোনো কামরায় প্রথমতঃ জায়গা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ, দ্বিতীয়তঃ মাঝরাত্রে গাড়ী বদলের হাঙ্গামা আছে।

ডাঃ বিজয়কিশন বললেন—সে হবে না। ট্রেন ছাড়বার আর সময় নেই। ধীরেনভায়াকে বললেন—তুমি যাও, ষ্টেশন মাষ্টারকে আমার নাম করে বলে এঁদের এই গাড়ীতেই যাবার ব্যবস্থা পাকা করে এসো।

ধীরেনভায়া তৎক্ষণাৎ ছুটলেন। ডাঃ বিজয়কিশনের নিষেধ সত্ত্বেও শ্রীমান ভোলানাথ আবার জনকতক কুলি ডেকে এনে গাড়ী থেকে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর আমাদের জিনিসপত্র নামাতে শুরু করে দিলে।

ধীরেনভায়া হস্ত-দন্ত হয়ে ফিরে এলেন। বললেন—এ গাড়ীখানা আহমেদাবাদ থেকে আসছে। এই খ. বগীটাতেই দুর্ভাগ্যক্রমে 'হট্ এ্যাক্সল' হয়েছে, অর্থাৎ কলকব্জা সব তেতে উঠেছে। ষ্টেশন মাষ্টার বললেন—এখানাকে আজ বিশ্রাম দিতেই হবে। এর পরিবর্ত্তে আর একখানি বগী বিশেষ ভাবে এঁদের জন্ত গাড়ীর পিছন দিকে জুড়ে দেবার ব্যবস্থা করে এসেছি। সেখানিও 'খ.' যাবে। গাড়ী বদলের প্রয়োজন হবে না।

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো। ট্রেনের পুচ্ছদেশে আর একখানি বগী জোড়বামাত্র আমরা গিয়ে সেটি দখল ক'রে ফেললুম। গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়ল। দ্বিতীয় দফার কুলিরা তাড়া করছিল। তাদের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিলুম। লোকসানের মধ্যে এইটুকুই যা।

শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল। ভোলানাথের দেখা নেই। সেই যে

কৈলাস হ্রদের পথে—(আমরা ও মিঃ গুপ্ত)…উষ্ট্রের পৃষ্ঠে নবনীতা

মাটির কুঁজো আর এ্যালুমিনিয়মের বড় প্যাঁচদার ঘটি নিয়ে সে পানীয় জল আনতে গেছে এখনও ফেরেনি। গার্ডের বাঁশী তীব্র ধ্বনি ক'রে উঠলো। হাতে তার সবুজ আলো ঘন ঘন দুলতে লাগলো। ট্রেন নড়ছে! ভোলানাথের তখনও পাত্তা নেই।

ডাঃ বিজয়কিশন্ ব্যস্ত হয়ে উঠে ধীরেনভায়াকে বললেন—তাই তো গাড়ী ছেড়ে দিলে যে! কি ফ্যাসাদ! লোকটা প'ড়ে থাকবে? না না, তুমি্ যাও, ষ্টেশন মাষ্টারকে ব'লে গাড়ী **detain** করাও—

বুঝলুম—দেশীয় রাজ্যের রাজকর্ম-চারীদের কতখানি প্রতাপ। একবার দার্জ্জিলিঙ্ যাবার সময় এ-অভিজ্ঞতা হয়েছিল। টাইম ওভার হ'য়ে গেল, তবুও ট্রেন ছাড়ে না। মিনিট পনেরো কেটে গেল। শেষে অতিষ্ঠ হ'য়ে গার্ড সাহেবকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করে জানলুম—এই ট্রেনেই কুচবিহারের মহারাজা সদলে কলকাতা থেকে ফিরে যাচ্ছেন। তাঁর ষ্টাফ এসে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু মহারাজা এখনও আসেন নি। প্রাইভেট সেক্রেটারী আগেই এসে ষ্টেশনে জানিয়েছেন—মহারাজার আসতে আরও মিনিট পনেরো দেরী হবে। গাড়ী যেন ছাড়া না হয়। অতএব দার্জ্জিলিঙ্ মেল সেদিন টাইমটেবল অগ্রাহ্য করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল! কিন্তু. ভোলা-নাথের জন্ত ডাক্তার বিজয় কিশনকে গাড়ী **detain** করাতে হল না। জানালায় মুখ বাড়িয়ে যতদূর দেখা যায়, আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে ব্যাকুল হ'য়ে তাকে খুঁজছিলুম। হঠাৎ দেখা গেল শ্রীমান ভোলানাথ ছুটতে ছুটতে আসছেন! বাঁদিকের বগলে কুঁজোটা বাগিয়ে নিয়ে, বাঁ হাতেই জলের ঘটিটা ঝুলিয়ে ডান হাতে সে চলন্ত গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধ'রে সামনের একখানা কামরায় বেশ অবলীলাক্রমে উঠে পড়লো!

গুপ্ত সাহেব এবং ডাঃ বিজয়কিশন আমাদের যোধপুরে আরও কিছুদিন থেকে যাবার জন্ত অনেক অনুরোধ করেছিলেন। বিশেষ করে এ সময় উদয়পুরে যেতে ডাঃ বিজয়কিশন একরকম নিষেধই করেছিলেন। আমরা কিছুতেই আর যোধপুরে থাকতে রাজি নয় দেখে, অগত্যা তিনি বলেছিলেন—আপনারা না হয় উপস্থিত বিকানীর চলে যান, কিম্বা একেবারে চিতোরগড়ে গিয়ে উঠুন। উদয়পুরে এখন যাবেন না।
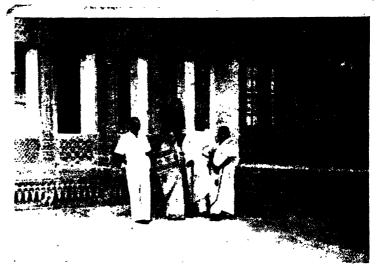
উদ্যানবাটীর এক কোণে—(আমরা ও মিঃ গুপ্ত)

রাজপুতের দেশের কূপ

সেখানে সমস্ত নেটিভ ষ্টেটের রাজা মহারাজাদের কনফারেন্স বসছে পরশু। আপনাদের সঙ্গে এই গাড়ীতেই যোধপুর মহারাজার এডিকং ও 'এ্যাডভান্স ষ্টাফ' আজ উদয়পুরে যাচ্ছে মহারাজার জন্ত সব

ব্যবস্থা করে রাখতে। মহারাজা নিজে পরশুদিন সকালে যাচ্ছেন By Air।

এই রকম ৫।৭টি 'রুলিং চীফ্' অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা তাঁদের লটবহর নিয়ে উদয়পুরের উপর চড়াও হ'য়েছেন। যতগুলি রাজপ্রাসাদ, অতিথিশালা, হোটেল প্রভৃতি আছে সেখানে, এমন কি ভাল ভাল ধর্মশালাগুলি পর্য্যন্ত এই সব রাজন্তবর্গের তাল-বেতাল অনুচর ও সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। খুব সম্ভব এখন কোথাও আশ্রয় পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়বে। গাড়ী ঘোড়াও পাবেন না একখানিও। উদয়পুরে ট্যাক্সী পাওয়া যায় না। অন্য সময় বিশিষ্ট অতিথিদের ব্যবহারের জন্য ষ্টেট্ থেকেও মোটর দেওয়া হয়। কিন্তু, এখন এ সময় সমস্ত যানবাহনই রাজন্তবর্গ ও তাঁদের সহচরগণের জন্যই রিজার্ভ

'ফত্তে-মেমোরিয়্যাল'

থাকবে। বাইরের লোকের পক্ষে একখানি গাড়ী পাওয়াও এখন সম্ভব নয়।

বন্ধুবর ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উদয়পুরের একমাত্র বাঙালী মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে আমাদের একখানি পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন এবং ভরসা দিয়েছিলেন যে প্রভাসবাবু আপনাদের কোথাও যেতে দেবেন না। তিনি আপনাদের তাঁর নিজের বাড়ীতেই মহাসমাদরে রাখবেন। উদয়পুরের দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন। তিনি স্বজাতিপ্রিয়, অমায়িক ও অতিশয় ভদ্রলোক। চিঠিখানি বার করে ডাঃ বিজয়কিশন ও গুপ্তভায়াকে দেখাতে তাঁরা চমকে উঠে বলেছিলেন—সর্বনাশ! এই চিঠির উপর নির্ভর করে এমন ডামা-ডোলের ভিতর উদয়পুরে চলেছেন? ইনি যে এই কিছুদিন আগে স্বর্গলাভ করেছেন! এখনও বোধহয় এক মাস পূর্ণ হয়নি!

আমরা এ দুঃসংবাদ শুনে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলুম। কারণ, এই চিঠিখানিই ভরসা ক'রে আমরা এত জোরের সঙ্গে যোধপুরের এমন আরামের রাজ-আতিথ্য ছেড়ে উদয়পুর রওনা হচ্ছিলাম। উদয়পুরে আমাদের আর কোনও পরিচিত লোক নেই শুনে —ডাঃ বিজয়কিশন ব্যস্ত হয়ে উদয়পুরের চীফ মিনিষ্টারের নামে আমাদের কাছে একখানি চিঠি দিলেন। আর গুপ্তভায়া স্বর্গীয় সচিব প্রভাসবাবুর সুযোগ্যপুত্র সুরেশবাবুর নামে আমাদের কাছে একখানি চিঠি দিলেন।

ফত্তে মেমোরিয়্যালের ভিতরের প্রাঙ্গণ

এছাড়া, যোধপুরের মহারাজার এডিকং যিনি এই ট্রেনেই আমাদের সঙ্গে উদয়পুর যাচ্ছিলেন ডাঃ বিজয়কিশন তাঁকে ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে দিলেন, উদয়পুর ষ্টেশনে আমাদের মালপত্র যেন কাষ্টম্ ও এক্সাইজ থেকে পরীক্ষা করা না হয়। আপনি বলে দেবেন যে—এঁরা যোধপুরের ষ্টেট-গেষ্ট্! ডাক্তার বিজয়কিশন ওখানকার 'ফত্তে মেমোরিয়াল' নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতিথিশালার ম্যানেজারকেও একখানি পত্র দিলেন, যাতে তিনি আমাদের জন্য যেমন ক'রে হোক একটি ভালো কোয়ার্টারের ব্যবস্থা করেন।

যোধপুরপ্রবাসী এই দুটি বাঙালী বন্ধুর প্রতি আমাদের

ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। কে বলে বাঙালী স্বজাতি-বৎসল নয়? এঁদের এই আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে হয়ত আমরা ঐ সময় উদয়পুর যেতে সাহস করতাম না।

রাত্রি প্রায় ন'টা নাগাদ আমরা যোধপুর ছেড়ে পরদিন সকালে উদয়পুর ষ্টেশনে গিয়ে নামলাম। বেলা তখন দশটা। সকালের দিকেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হলদিঘাট ও আরাবল্লি গিরিবর্ত্ম এবং রাজস্থানের বিখ্যাত জৌবারী কটক উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের ট্রেন ভারত-গৌরব মেবারের রাজধানী উদয়পুরে গিয়ে পৌঁছল। বীরের তীর্থক্ষেত্র—কত অগণিত রাজপুত রাণাদের শৌর্য্য ও বীর্য্যের লীলাভূমি এই উদয়পুরে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধানত মন নিয়ে প্রবেশ করলুম। আনন্দ শিহরণে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠছিল।

যোধপুরের মহারাজার সুশিক্ষিত এডিকং ঠিক সময়ে এসে আমাদের সঙ্গের সমস্ত লগেজগুলি আবগারী ও শুল্ক বিভাগের পরীক্ষার শ্যেনদৃষ্টি থেকে মুক্ত করে দিয়ে আমাদের সোজা 'ফতে মেমো-রিয়্যাল' অতিথিশালায় চলে যেতে বললেন। তাঁকে এখনি একবার বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে যোধপুর ক্যাম্পে উপস্থিত হ'তে হবে খবর এসেছে। ওখান থেকে কাজ সেরে তিনি ফতে মেমো-রিয়্যালে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন বললেন। ষ্টেশনে টংগা ছাড়া আর কোনো গাড়ী ছিলনা। আমরা ছ'জন লোক সঙ্গে তেইশটি লগেজ, কারণ যোধপুর থেকে মাড়োয়াড়ী সাড়ী, নাগরা জুতোর বাণ্ডিল এবং একটি জলের কুঁজো বেড়েছে। তামার উপর রূপালি কলাই করা জলের কুঁজোটি ভারিসুন্দর। রম্য রাজপুতকলার সুচারু নিদর্শন। উটের পিঠে চড়ে মরুভূমি পার হবার সময় এই জলের কুঁজো সম্বল করে মরুপথযাত্রী বীরেরা বেরিয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন তাঁরা তপ্ত বালুকা সাগর পাড়ি দিয়ে কত দুস্তর গিরি কান্তার বন উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছান। কুঁজোর মুখে একটি সুগঠিত গেলাস আঁটা। জল ঢালার সুবিধার জন্ত মুখে একটি সুদৃশ্য সরু নল লাগানো আছে। আবার জল ভরবার সময় সরুমুখ নলের ঢাকনাটি খুলে ফেললেই চওড়া কাঁদের হাঁড়োল মুখ বেরিয়ে পড়বে। কুঁজোর জল ঠাণ্ডা থাকবে বলে বাইরে থেকে কুঁজোর পেটে বরফ রাখবার একটি পয়কোটর আছে, এবং এর সর্ব্বাঙ্গে সূক্ষ্ম শিল্প কলা সমৃদ্ধ রঙীণ ঘেরাটোপ ঢাকা আছে। গলায়, পিঠে বা কাঁধে ঝুলিয়ে অথবা ঘোড়ার পিঠে কি উটের পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্ত কুঁজোর গায়ে রীতিমত বগ্‌লস আঁটা লম্বা ষ্ট্র্যাপ্‌ লাগানো আছে।

তিনখানি টংগা নিয়ে আমরা আধ ডজন মানুষ দু' ডজন মাল সমেত উদয়পুর ষ্টেশন থেকে 'ফতে মেমোরিয়্যাল' অতিথিশালা অভিমুখে রওনা হলুম। তিনখানি টংগার ভাড়া ঠিক হয়েছিল ২৲ হিসাবে ৬৲ টাকা। ফতে মেমোরিয়্যালে পৌঁছে মালপত্র নামিয়ে গাড়ীভাড়া চুকিয়ে ভিতরে গেলুম ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। তখন বেলা প্রায় ১২টা বাজে। পরিচয় পত্রখানি দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কোথায় আমাদের স্থান দেবেন। প্রাসাদতুল্য বিরাট ফতে মেমোরিয়্যাল বাড়ীটির এমন একখানি ঘরও খালি নেই, যেখানে তিনি আমাদের থাকার ব্যবস্থা ক'রতে পারেন।

উদয়পুরের রাজপথ

খাতা-পত্র ঘেঁটে তিনি বললেন ফার্ষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশ ঘরগুলি সবই 'হিজ হাইনেসের' অতিথিদের জন্ম রিজার্ভ করা রয়েছে। ইণ্টার ক্লাশ ও থার্ড ক্লাশ ঘরগুলি সব যাত্রীতে ভরা। তবে, ইণ্টার ক্লাশ ৯ নং ঘরখানি দেখছি ১২৷৽টা ১টার মধ্যেই খালি হ'য়ে যাবে। ঐটি আপনারা নিতে পারেন। যদিও ওয়েটিং লিষ্টে আপনাদের আগে থেকে এসে অপেক্ষা করছেন এমন যাত্রীরাও রয়েছেন, তবে তাঁরা দেশওয়ালী। আপনারা বিদেশী অতিথি, তাদেরই দেশে এসেছেন, সুতরাং, তাঁরা না হয় একটু কষ্টই করবেন।

যাই হোক, এখন এই ১২টা থেকে একটা পর্য্যন্ত ৬টা প্রাণী স্নানাহার হয়নি, সঙ্গে ২৩টা লগেজ, থাকি কোথা—রাখি কোথা—খাই কি—দাঁড়াই কোথা? মনে মনে ভাবলুম ডাঃ বিজয়কিশন ও গুপ্তভায়ার পরামর্শ ও অনুরোধ না শুনে এ সময় উদয়পুর আসাটা খুবই

অন্যায় হ'য়েছে। ম্যানেজারকে আমাদের অসুবিধার কথা জানালুম। ম্যানেজার বললেন—কিছু যদি মনে না করেন তাহ'লে আপনারা এই ঘণ্টাখানেক সময় আমাদের 'সেণ্টার হলে' যাপন করতে পারেন। ওটি আমাদের এখানকার যাত্রীদের 'ওয়েটিং রুম'। ঘর খালি না হওয়া পর্য্যন্ত সকলেই জিনিসপত্র নিয়ে ওইখানেই অপেক্ষা করেন। বাজারের খাবার কিনে তাঁরা কাজ চালান।

অগত্যা গুটিগুটি নব সেণ্টার হল বা ওয়েটিংরূমে গিয়ে প্রবেশ করা হল। ফতে মেমোরিয়ালের সামনে কুলি ও টংগা হামেহাল হাজির। কুলি এনে আমাদের সমস্ত মালপত্র অতিথিশালার প্রবেশপথ থেকে টেনে সেণ্টার হলে তোলা হল।

হ্যাঁ। ওয়েটিংরুমই বটে! হলটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাত্রী ও তাঁদের বিচিত্র বোচকা বুচকি, ট্রাঙ্ক ও বেডিংয়ে ঘরটি বোঝাই হয়ে রয়েছে। তারই একপাশে আমাদের ২৩টি মাল যখন একে একে প্রবেশ করতে লাগল সেখানে অপেক্ষমান স্ত্রী পুরুষের

উদয়পুর নগরী

আমাদের প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে বোঝা গেল যে তারা কেউই সেটা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ব্যক্তির চেয়ে বস্তুর প্রতিই তাদের বিরাগ বেশী বোঝা গেল। ৩টি ষ্টীলট্রাঙ্ক, ৩টি সুটকেস, একটি এ্যাটাচীকেস, ৩টি হোল্ড্-অল, একটি কিট-ব্যাগ, ২টি বেতের বাস্কেট, ১টি বড় বালতি, ১টি মগ, ১টি ঘটি, একটি খাবার জলের সোরাই, ১টি থার্মোফ্লাস্ক, একটি দুধের ক্যান, একটি টিফিন ক্যারিয়ার, একটি ইকমিক কুকার, একটি স্নানের ব্যাগ এবং শ্রীমান ভোলানাথের এক প্রস্থ বিছানা বাক্সর বাণ্ডিল। এই ২৩ দফা মাল একটির পর একটি যখন জনাকীর্ণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল, আগে হতেই যাঁরা ঘরটি দখল করে ছিলেন তাঁদের পক্ষে চঞ্চল হ'য়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে ঐরূপ অবস্থায় আমরাও নিশ্চয়ই নবাগতদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠতুম। রেলের কামরা হ'লে, হয়ত ঢুকতেই দিতুম না। একই ঘরে এতগুলি বিরক্ত হ'য়ে-ওঠা, সহানুভূতি-শূন্য স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থাকাটা অস্বাচ্ছন্দ্যকর মনে হওয়ায় শ্রীমান ভোলানাথকে জিনিসপত্রের পাহারায় রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লুম মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করতে। 'লক্ষ্মী-নিবাস' হোটেলের নামটা শুনেছিলুম ম্যানেজারের মুখে। ঐটি নাকি উদয়পুরের একেবারে 'মহৎ আশ্রম'—অর্থাৎ বিশুদ্ধ হিন্দু ভোজনালয়। ফতে মেমোরিয়াল থেকে বেশী দূর নয়। সেইখানেই বায়না দিয়ে আসা গেল আমাদের জন্য থালাবাটি সাজিয়ে দাল ভাত তরকারী চাটনি ও দই মিষ্টি নিয়ে আসবে। দাম বেশী নয়,—মাথা পিছু পাঁচ সিকা!

ফতে মেমোরিয়ালে ফিরে আসতেই ম্যানেজার খবর দিলেন,

ডাঃ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মজুমদার

দ্বিতলের পূর্ব'দক্ষিণ ব্লকে ৯নং ইণ্টার ক্লাশ কামরা এইমাত্র খালি হয়েছে, আপনার গিয়ে দখল করতে পারেন।

যেমনি শোনা অমনি আর কথাবার্তা নয়, কুলিডেকে হুড়মুড় করে সব জিনসপত্র নিয়ে ঐ ৯ নং ইণ্টার ক্লাশ কামরাখানি দখল করতে ছুটলুম। কিন্তু ঘরে পৌছে, তার চেহারা দেখে একেবারে দমে গেলুম। ঘরখানি ১২´×১৪´র বেশী হবে না। ঘরে প্রবেশের একটা মাত্র দরজা, এবং তারই রুদ্ধ রুদ্ধ একটি মাত্র জানালা, অবশ্য দুপাল্লা খড়খড়ি লাগানো খোলা বড় জানালা। জানালার কোলে একটু ছোট 'ব্যালকনি'।

ফার্নিচারের মধ্যে একখানি চারপাই, একটা কম্বাইনড্ ড্রেসিং ও রাইটিং টেবল এবং একখানি চেয়ার। আল্না আছে দেওয়ালের

পারে আঁটা। একজন লোকের পক্ষে ঘরখানি মন্দ নয়, কিন্তু আধডজন লোকের পক্ষে 'ব্ল্যাক-হোল' বলা যায়! মন আরও খারাপ হ'য়ে গেল ঘরের কোনও সংলগ্ন বাথরূম নেই এবং ঘরখানা ভয়ানক নোংরা দেখে। রাত্রে এঘরে আমাদের বাস করা কিছুতেই চলতে পারে না। এমনকি সেটা কল্পনাও করা যায় না। অতএব, খেয়ে উঠেই অন্যত্র কোথাও বাসা ঠিক করতে যেতেই হবে স্থির হয়ে গেল। উপস্থিত কিছুক্ষণ মাথা গোঁজবার মতো এই গহ্বরটিকেই গ্রাহ্য করে নিতে হ'ল।

(ক্রমশঃ)

১৩৫৫ সাল

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

গত ৭ই চৈত্র ১৩৫৪ সাল ইংরাজি ২০শে মার্চ ১৯৪৮ শনিবার ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড সময় রাত্রি ১০টা ২৭ মিনিটে সূর্য বিষুব রেখার উপর এসেছেন। এই সময়ের গ্রহ সংস্থান আগামী এক বৎসরের জন্য পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন করবে। এ সময়ের গ্রহ সংস্থান এই রকম ছিল—

প্র ২৯।১০	শু ২০।৫৪ রা০ ২১।৩৮	র ৬ ৫২ বু ৯।২৬
চ ৫।৪০ বৃ ১৯।৩৮ বং শ ২৩।১৮ বং ম ২৫।২৭ বং		
ব ১৮।৪৯ বং	কে ২১।৩৮	বৃ ৪।৪৭

এবৎসর রবি নানা গ্রহের শক্রপ্রেক্ষায় পীড়িত, কিন্তু চন্দ্র পাপ গ্রহযুক্ত হ'লেও বলবান্ এবং রবিকে মিত্রপ্রেক্ষায় অনুগৃহীত করছে। এর ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নানারকম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, সাময়িকভাবে প্রজাসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁরা পেতে পারেন কিন্তু প্রত্যেক দেশেই নানা শ্রেণীর বিরুদ্ধ প্রভাবে কর্তৃপক্ষের সংগঠন চেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হবে। সব দেশেই কর্তৃপক্ষ প্রজাসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু নানারকম বাধা দানের ফলে সে চেষ্টা কোন মতেই সার্থক হ'য়ে উঠবে না। প্রত্যেক দেশেই কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা হবে, কিন্তু কতক উৎপাদন বৃদ্ধি হ'লেও, দৈব দুর্বিপাক, চলাচলের বিঘ্ন, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সহযোগিতার অভাব, পরস্পরের গোপন বা প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের কোন শৃঙ্খলা থাকবে না এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বহু অপচয় ঘটবে।

আর্থিক ব্যাপারে সর্বত্রই একটা অনিশ্চয়তার ভাব লক্ষিত হবে, কোন কোন দেশে একাধিকবার আর্থিক নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

প্রত্যেক দেশকেই নিজের নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে এমনিই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হবে যে, অপর দেশের দিকে সহানুভূতি-পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ কেউ পাবে না। প্রত্যেকদেশের বৈদেশিক নীতিতে একটা হৃদয়হীন উদাসীনতা লক্ষিত হবে।

এবৎসর ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্থান উভয়েরই লগ্ন হয়েছে তুলা, কিন্তু ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে রবি এবং পাকিস্তানের মঙ্গল।

ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ রবি ষষ্ঠস্থ। এক চন্দ্র ছাড়া অপর কোন গ্রহের শুভ প্রেক্ষা তার উপর নেই। রবি লগ্নস্থ কেতুর অশুভ-প্রেক্ষা থেকে বিযুক্ত হয়ে দশমস্থ শনির অশুভ প্রেক্ষায় যুক্ত হচ্ছে। সুতরাং বছরটিকে ভারতের পক্ষে মোটেই সুবৎসর বলা চলে না। জ্যোতিষের মতে ষষ্ঠভাব নির্দেশ করে; সেই সব ব্যাপার—যার সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্য, অন্ন-বস্ত্র, দেশের শ্রম-শক্তি, সৈন্যবল, দেশরক্ষার চেষ্টা ইত্যাদির সংস্রব আছে। সূর্য একাদশ ভাবের অধিপতি এবং একাদশ ভাব নির্দেশ করে রাষ্ট্র পরিষদ বা আইন সভা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে ভারতীয় রাষ্ট্রপরিষদকে দেশের খাদ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে নানারকমে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে এবং এ বিষয়ে নানা রকমের চেষ্টা হলেও তা সুপরিকল্পিত বা সুপ্রযুক্ত হ'তে পারবে না। ভারতীয় রাষ্ট্রের নেতাদের পক্ষে বছরটি মোটেই সুবিধার নয়। যদিও আইন-সভার সভ্য ও নেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতারা আইন সভার সমর্থন ও আনুগত্য পাবেন, তাহ'লেও অদূরদর্শী নীতির জন্য সাধারণের কাছে তাঁদের প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা।

ভারতের রাশি চক্রে এ বছর লগ্নে কেতু এবং তা তার ভাগ্যনিয়ন্তা ষষ্ঠস্থ রবির অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। কেতু একদিকে যেমন নির্দেশ করে সর্বহারা, পঙ্গু, অক্ষম, অসহায়—নিরাশ্রয়কে, অপরদিকে তা নির্দেশ করে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী, দুর্নীতিপরায়ণ, দস্যু, রাহাজান প্রভৃতি শ্রেণীর জীবকে। তা ছাড়া দেশের সাধারণ অনুন্নত সম্প্রদায়, আদিবাসী, পাহাড়ী ইত্যাদি এবং বুদ্ধিবিবেচনাহীন গোড়ামির সূচকও কেতু। সুতরাং এই

সংস্রবে নানাধরণের অপ্রীতিকর ব্যাপার দেশের মধ্যে ঘটবে এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এ বছর কোনমতেই ঠিকভাবে তার মীমাংসা করতে পারবেন না। এ বছর বেকার সমস্যা এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান ও নিগৃহীত স্ত্রীলোকের ব্যাপার দেশের একটা প্রধান সমস্যা হ'য়ে উঠবে। রাষ্ট্রনায়কদের এ নিয়ে খুবই বিব্রত হ'তে হবে।

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার পক্ষ থেকে দেশের শ্রমিক ও ধনিকদের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা যতই হোক, তা কোন মতেই সম্পূর্ণ সফল হবে না।

রাষ্ট্রনায়কেরা মনে রাখলে ভাল করবেন যে এ বৎসর তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক ব্যাপারে নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে বটে, কিন্তু সবচেয়ে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে শ্রমিক ও দেশরক্ষার সমস্যা। যুদ্ধজাহাজ, সামরিক বিমান ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য দেশের মধ্যে সুশিক্ষিত বাহিনী গঠনের আয়োজন যদিও হবে, তবুও বাহিরের ও ভিতরের বাধায় তা সুশৃঙ্খল ভাবে গ'ড়ে উঠবে না।

ভারতের তৃতীয়ে বৃহস্পতি ও পঞ্চমে বুধ থাকায় শিক্ষার ব্যাপারে কিছু উন্নতি সূচনা করে, কিন্তু পঞ্চমস্থ বুধের কোন জোরালো শুভ সম্বন্ধ না থাকায় শিক্ষার ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার সম্ভব হবে না এবং তা কতকটা গতানুগতিক ভাবেই চলবে। উক্ত বৃহস্পতির সঙ্গে রবির ও শনির অশুভ প্রেক্ষা থাকায় অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করবেন এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য স্বাধীন মতপ্রকাশের অছিলায় কর্তৃপক্ষকে হেয় করার কিম্বা কোন রকম গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টাও হবে। তৃতীয়ে বৃহস্পতি চলাচলের এবং পূর্ত ও স্থাপত্যের ব্যাপারে কর্মতৎপরতা নির্দেশ করে। সুতরাং নূতন রাস্তাঘাট তৈরী, পুরানো রাস্তার সংস্কার, নূতন গৃহাদি নির্মাণ ইত্যাদির জন্য সরকারীভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক চেষ্টা চলবে। এ সংস্রবে যথেষ্ট কাজও হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে কাজের অনুপাতে ব্যয় খুব বেশী হবে এবং চেষ্টা সত্ত্বেও দুর্নীতিমূলক অপব্যয় ও অপচয় এড়ানো যাবে না।

ষষ্ঠস্থ রবির সঙ্গে দ্বাদশস্থ বরুণের সম্বন্ধ আছে এবং চন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ মিত্রপ্রেক্ষা আছে, এ ছাড়া আর কোন শুভপ্রেক্ষা তার উপর নেই। ষষ্ঠপতি বৃহস্পতি বলবান হলেও নানা ভাবে পীড়িত সুতরাং নানা রকম বিভ্রাটের জন্য জাতিগঠনমূলক কাজের সকল চেষ্টা পিছিয়ে যাবে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য চেষ্টা হলেও স্বাস্থ্যের অবনতিই ঘটবে এবং নানা রকম সংক্রামক ব্যাধিতে ও মারীতে দেশ প্রপীড়িত হবে। বছরের শেষের দিকে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে কিছু উন্নতি হওয়া সম্ভব।

লগ্নপতি শুক্র সপ্তমে থাকায় ভারতের বৈদেশিক নীতিতে সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পাবে এবং অপর দেশের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক নানা রকম চুক্তি করার চেষ্টাও চলবে, কিন্তু শুক্র পীড়িত হওয়ায় অনেকক্ষেত্রে সে সকল চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হবে না। বহুক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্ত ষড়যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা ভারতের স্বার্থহানি ঘটবে ও অনেক সময় কোন কোন বিদেশী রাষ্ট্র ভারতের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচারেও কুণ্ঠিত হবে না। পার্শ্ববর্তী কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদ হওয়া সম্ভব—এমন কি শক্তিপরীক্ষার উপক্রম হওয়া অসম্ভব নয়। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির ব্যাপারেও নানারকম গণ্ডগোল দেখা যাবে এবং অনেক সময় রপ্তানী মালের ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাবে না, ও আমদানী মালের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে, যাতে ক'রে রাষ্ট্রের অযথা বহু ক্ষতি হবে।

প্রজাপতি অষ্টমে থাকায় অর্থাভাবে সংস্কারমূলক কোন কাজ অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু প্রজাপতি দশমস্থ মঙ্গলের শুভপ্রেক্ষা পাওয়ায় যুদ্ধ সজ্জা ও সামরিক ব্যাপারে কিছু সংস্কার আশা করা যায়। যুদ্ধসজ্জা ও সামরিক কার্য্যকারিতার জন্য ব্যয় বাহুল্য ঘটবেই। তা ছাড়া সাধারণত ব্যয়বাহুল্যের জন্য সরকারকে নূতন করও বসাতে হবে এবং নূতন ঋণও গ্রহণ করতে হবে। অষ্টমস্থ প্রজাপতি অকস্মাৎ মৃত্যুর ও অপঘাতের সূচক, সুতরাং এ বছরে ঐ ধরণের মৃত্যুর আধিক্য ঘটবে। বিশেষতঃ যানবাহন ও রেলপথে দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাবে।

দশমে চন্দ্র স্বক্ষেত্রে আছে এবং সেখানে রুদ্র, শনি ও নীচস্থ মঙ্গলও আছে এবং এ তিনটি গ্রহই বক্রী। দশমে চন্দ্র বলবান হওয়ায় এবং তা রবির শুভপ্রেক্ষা পাওয়ায় এ বছর গণপরিষদের প্রণীত রাষ্ট্রতন্ত্র নেতাদের দ্বারা সমর্থিত ও গৃহীত হবে এবং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণাও করা হবে; কিন্তু সে রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধিবিধান জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না—প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। দশমে রুদ্র ও শনি বক্রী হওয়ায় রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ সৃষ্টির নানারকম অপচেষ্টা হ'তে পারে যা দমনের জন্য বিশেষ আইন বা অর্ডিনান্স করা প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া, প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজন্যবর্গের স্বেচ্ছাচার ও শক্তিপ্রিয়তা প্রভৃতির সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের পরিচালকদের বিশেষভাবে বিব্রত হ'তে হবে। নানা দিকে ব্যস্ত হ'য়ে ও নানা ভাবে বিব্রত হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করতে পারবেন না এবং অনেকক্ষেত্রেই তাঁদের নীতি ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে দ্বিধা, সংশয়, অস্পষ্টতা ও ইতস্তত ভাব লক্ষিত হবে। অবশ্য দশমপতি চন্দ্র দশমে থাকায় শেষ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে রাষ্ট্রনেতাদের প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা পুনরায় অর্জিত হতে পারে কিন্তু নেতাদের সামনে এ বছর যে একটা মস্ত বড় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপস্থিত হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

একাদশপতি ষষ্ঠে থাকায় এ বছর সাধারণের নির্বাচনের জন্য সাধারণের পক্ষ থেকে সরকারের উপর চাপ পড়তে পারে, কিন্তু নির্বাচন কোনমতেই সম্ভব হবে না। দেশের মধ্যে নানারকম স্বার্থের সংঘাতে যথার্থ ঐক্য গ'ড়ে উঠতে পারবে না এবং ঐক্যের নামে একটা যোড়াতালি দেওয়া ব্যবস্থাই চালু করার চেষ্টা হবে কিন্তু তাতে সমস্যা মিটবে না—ভিতরে ভিতরে একটা অসন্তোষ ধূমায়িত হ'তে থাকবে।

দ্বাদশে বরুণ বক্রী এবং তা ভাগ্যনিয়ন্তা রবির সঙ্গে সম্বন্ধ করছে

আর তার ঘনিষ্ঠ শুভপ্রেক্ষা হচ্ছে দশম রুদ্রের সঙ্গে। রুদ্র নির্দেশ করে কোটিপতি ধনিককে এবং বরুণও দ্বাদশভাব দুইই নির্দেশ করে গুপ্ত কার্যকলাপ ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে এ বছরও ধনিক রাজত্বই চলবে এবং গণতান্ত্রিক বা সংস্কারমূলক সব আন্দোলনের গতিই ব্যাহত হবে। দ্বাদশে বরুণ থাকায় জনহিতকর কতকগুলি কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হবে—যেমন দাতব্য চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, রাস্তাঘাট তৈরী, খাল কাটা ইত্যাদি, কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকবে, যাতে করে এই সব জনহিতকর কাজের মধ্যেও ধনিকের শোষণ ক্রিয়ার পথ খোলা থাকে। বিবেচনাহীন সমালোচনা এবং বৃথা দ্বন্দ্ব দেশের সমস্যাকে আরও জটিল ক'রে তুলবে বলে মনে হয়।

এক হিসাবে পাকিস্তানের ভাগ্য এ বছর ভারতের চেয়ে ভাল বলতে হবে। পাকিস্তানকেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে বটে, কিন্তু দশমস্থ মঙ্গল তার ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়াতে, বিচার বিবেচনার চেয়ে গায়ের জোরেই সে তার সব মীমাংসা করতে চাইবে। মঙ্গল বক্রী এবং নীচস্থ হলেও তা দশমস্থ এবং শনির সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে রাজযোগ-কারক হয়েছে ও প্রজাপতির সঙ্গে তার প্রথম সংযোগী শুভপ্রেক্ষা।

যাঁরা আমার লেখা "ফলিত জ্যোতিষের মূলসূত্র" পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে, রবি বিজ্ঞানময়ের, অর্থাৎ বুদ্ধিবিবেচনার কেন্দ্র, তার মূলসূত্রে হচ্ছে সাম্য, উদারতা এবং উচ্চতর নীতিবোধ ও সংস্কৃতি; অপর ক্ষেত্রে মঙ্গল প্রাণময়ের অর্থাৎ শক্তির কেন্দ্র; তার মূলমন্ত্র হচ্ছে অহং ও পরমত অসহিষ্ণুতা, শক্তির দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা। দুঃস্থানগত ও পীড়িত রবি ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায়, ভারত তার অনুসৃত উদার নীতির জন্য হয়ত প্রশংসা অর্জন করবে। কিন্তু এই নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যে তাকে কম-বেশী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে মঙ্গল ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় পাকিস্তানের অনুসৃত নীতি হবে শক্তির নীতি, তার মধ্যে প্রকট হবে একনায়কত্ব ও সামরিক শাসন। তার ভেদ-দ্বন্দ্ব, দলাদলি ইত্যাদি সকল ব্যাপারের মীমাংসা হবে শক্তির জোরে। তার নীতি উচ্চতর সংস্কৃতি বা নীতিবোধকে পীড়িত করলেও তা শক্তির ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করবে অন্ততঃ বর্তমান বর্ষে। শক্তির এই অপব্যবহারে যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না অথবা স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠালাভ হয় না, তা বলাই বাহুল্য।

ভর

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

ব্যাপারটা খুব তুচ্ছ সূত্র ধরেই আরম্ভ হোল।

বাবুদের বাড়ীর মুচি-ঝি "দাসী" মানুষটা নিতান্তই সাধা-সিধা সাধারণ শ্রমিক-শ্রেণীর নারী। অতিশয় নিরীহভাবে নির্ব্বিবাদে "গতর খাটিয়ে" এতদিন জীবিকা নির্ব্বাহ করছিল। প্রকৃতিতে ক্রূরতা কুটিলতা বেশ-কিছু থাকলেও ঠাকুর দেবতা বা অধ্যাত্মতত্ত্ব নিয়ে কোনও জ্ঞান বা ভক্তির মাতামাতি তার ছিল না। আকৃতিতে বেঁটে খাটো ক্ষয়া-ক্ষয়া চেহারা। শ্যামবর্ণ। বয়সে নাতি নাতনীদের দিদিমা হলেও খর্ব্ব ক্ষয়া চেহারার জন্য তাকে অল্পবয়স্কার মত দেখাত। অন্ততঃ নিজে সে তাই মনে করত। সে সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব-ঘটিত তর্ক ও যুক্তি আপাততঃ আলোচনা না করাই ভাল।

মেয়ে জামাইয়ের ঘরে বাস করত। জামাতা শ্রীমান বক্রী বাবাজীও শ্রমিক এবং উগ্র মাত্রায় গঞ্জিকাসেবী। তাদের দু একটি সন্তানও হয়েছিল, কিন্তু বাঁচে নি। সম্প্রতি কন্যার আবার সন্তান হবার সম্ভাবনায় দাসী মাস খানেকের জন্য মনিব বাড়ী থেকে ছুটি নিয়েছিল।

যথাকালে তার কন্যার নির্ব্বিঘ্নে একটি সন্তান হয়েছে খবর পাওয়া গেল এবং দিন কতক পরে দাসী এসে আবার বাবুদের বাড়ীর কাজে ভর্ত্তি হোল।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মত ঘর ধুয়ে, বাসন মেজে, গরু বাছুরের সেবা করে, হাট বাজার করলে। কিন্তু থেকে থেকে কেমন-যেন চমকে উঠতে লাগল। কাজ করতে করতে হঠাৎ থমকে আড়ষ্ট-কাঠ হয়ে দাঁড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে নিজের মনে এলো মেলো কথা বলতে লাগল। কেমন যেন বিশৃঙ্খল-চিত্ততার পরিচয় দিতে লাগল।

বাড়ীর সকলের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হোল। সকলে বিস্ময় বোধ করলেন।

বাড়ীর অবিবাহিতা মেয়ে দুটি অতিশয় কোমলহৃদয়া। দাসীর ভাবান্তর লক্ষ্য করে তাঁরা—বিশেষতঃ বড় নতুন

দিদি অত্যন্ত সমবেদনা বোধ করলেন। সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি বললেন "দাসী, তোমার শরীরটা কি ভাল নাই ?"

দাসী হাতের কাজ ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে ভীষণ রহস্য-ব্যঞ্জক স্বরে বল্লে—"চার দিন পরে আমার মেয়ের আঁতুড় উঠবে। তারপর আগে গঙ্গা-নেয়ে আসি, এসে সব বলব।"

ছোট দিদি ম্যাট্রীক পরীক্ষার্থিনী। কথাটা কানে যেতেই বই খাতা ফেলে ছুটে এলেন। ব্যগ্র কৌতূহলে বললেন "কেন দাসী ? কি হয়েছে ? এখন তা বলতে নেই কেন ?"

দাসী স্থির-গাম্ভীর্য্যে বললে "গঙ্গা নাওয়ার আগে সে সব কথা বলতে "দেবোতা" বারণ করেছে। গঙ্গা নাওয়ার পর তিনি আমাকে ছেড়ে যাবেন। তখন সব বলব।"

দু চক্ষু কপালে তুলে নতুন দিদি বললেন "দেবোতা ! দেবোতা কোথা পেলে গো ? এঁ্যা ? কি বলছ ? কি রকম দেবতা ?"

ছোট দিদি বললেন "দেবোতা তোমায় ছেড়ে যাবেন ? মানে ? কোনও দেবতা তোমায় আশ্রয় করেছেন বুঝি ?"

ফেনের বোক্‌নো নিয়ে দাসী গোরুকে ফেন খাওয়াতে যাচ্ছিল। দিদিদের প্রশ্ন শুনে বোক্‌নো নামিয়ে রাখলে। রোয়াকের প্রান্তে ঝাঁকিয়ে বসল। দাসী জানত, দুই দিদিই পরম সহৃদয়া এবং অতিশয় ধৈর্য্যশীলা শ্রোত্রী। যদিও তার তথা কথিত 'দেবোতার' নিষেধ—কিন্তু অবরুদ্ধ মানসিক-উত্তেজনার বাষ্পোত্তাপ উন্মোচন করার জন্য প্রাণটা তার রীতিমত আন্‌চান করছিল। অতএব নিরাহ নিষ্কপট নতুন দি' ও ছোটদির কাছে, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে নিজের হৃদ্‌গুরুভার লঘু করাই উচিত বোধ করলে ? তাতে দেবতার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য সম্ভবতঃ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না।

গুরু-গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত মুখে, এক টানা সুরে সে বলতে লাগল তার সুদীর্ঘ কাহিনী ! শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য-হীন, অদ্ভুত, অলৌকিক ব্যাপার !

কাহিনীর মূল মর্ম্মার্থ :—তার কন্যার সূতিকাগারের পরিচর্য্যা কালে অকস্মাৎ এক 'দেবোতা'—(তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা আপাততঃ নিষেধ) তার স্কন্ধে কিম্বা মুণ্ডে, তাও ঠিক বুঝতে পারছে না—তবে "ভর" যে তিনি করেছেন সেটা সুনিশ্চিত।......না, সে আর বেশীদিন ঝি-এর কাজ করবে না। শীঘ্রই উক্ত 'দেবোতা' তাকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করবেন। তার জামাইকেও এক জালা মোহর দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন (সম্ভবতঃ স্বেচ্ছায় নয়, দাসীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে !)......হাঁ তাদের ঘরের কোণে মাটী ফেঁপে উঠেছে। সেই খান থেকেই মোহরের জালাটা মাটী ফুঁড়ে আগামী মঙ্গলবার দিন উঠবে। মোহরের জালাটা করায়ত্ত করার জন্য, জামাতা বাবাজীকে বিন্দু মাত্র পরিশ্রম করতে হবে না। শুধু একটি মাত্র কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করতে হবে। সেই দিন—শুধু সেই দিন মাত্র তার গঞ্জিকা সেবন নিষিদ্ধ ! গঞ্জিকা সেবন না করে, ফাঁপা মাটীর মধ্যে হাত দিলেই মোহরের জালা হাতে ঠেকবে। স্বচ্ছন্দে তুলে নিলেই, জালা শুদ্ধ মোহর পাবে।......

সহসা-দৃষ্টি কঠোর করে উগ্র স্বরে দাসী বললে "কিন্তুন্ যদি গাঁজা খেয়ে জালা তুলতে যায় তাহলে মোহরের জালা সাত হাত মাটীর নীচে চলে যাবে !"

বিরাট ব্যাপার ত ! দিদিরা মুগ্ধ অভিভূত ! ভয়ে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল ! মনে হোল মোহরের জালাটা তাঁদেরই হাত ফস্কে সদ্যঃ সদ্যঃ সাত হাত মাটীর নাচে চলে গেল ! সে মাটী খোঁড়বার ক্ষমতা বেচারাদের নাই !

প্রথমে বাক্য স্ফূর্ত্তির সাহস হোল না। ক্রমে দাসীর একটানা আরও নানাবিধ কাহিনা শুনতে শুনতে সাহস বাড়ল।

নতুন দি পরম শ্রদ্ধাভরে সুকোমল কণ্ঠে সৎ পরামর্শ দিলেন—"তা এক জালা মোহর যদি পায় তাহলে নেই বা একদিন গাঁজা খেলে তোমার জামাই ! তাকে বারণ কোরো যেন মঙ্গলবার দিন গাঁজা না খায়, বুঝলে ?"

যেন দাসী সে তত্ত্ব জানে না এবং বারণ করতেও বাকী রেখেছে ! হায় রে ! ওই গাঁজার ধূমে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে তার কন্যার সংসার যে উচ্ছন্নের পথে যেতে বসেছে, মূঢ়মতি জামাতা বাবাজীকে সে যে কোন মতেই দুর্ম্মতি ত্যাগ করাতে পারছে না, সে মর্ম্মব্যথার নিষ্পীড়ন দিদিরা বুঝবে কি করে ? ঘরোয়া দুর্ঘটনা দাসী বলেই বা কোন মুখে ?... ...দাসী গুম্ হয়ে রইল।

ছোট দিদি ততক্ষণে ম্যাট্রিকের অঙ্ক শাস্ত্র স্মরণ করে

বিজ্ঞ ভাবে হিতোপদেশ দান করলেন "এক জালা মোহর! সে যে অনেক টাকা! দেবতার কৃপায় তাহলে তোমার জামাই বড়লোক হয়ে যাবে। তাকে বুঝিয়ে বোল, মঙ্গলবার দিন যেন কোন মতেই গাঁজা না খায়।"

অকস্মাৎ দাসী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল! গলার শিরা ফুলিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জামাতার বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ ঘোষণা করলে?

দিদিরা তার জামাতাকে চিনতেন না। এবার দাসীর কথা শুনে চিনলেন!······'দেবোতায়' শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাসী—তার যা কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি, তা শুধু গাঁজার উপর!

এমন দুর্বিনীত দুষ্টকে দেবতার কৃপায় মোহর পাওয়ানো দুষ্কর বটে! শুধু দাসী নয়, দিদিরাও যেন নিজেদের অসহায় ও বিপন্ন বোধ করলেন!

দাসীর বাকপ্রবাহ অবাধে অনর্গল স্রোতে বয়ে চলল। থামায় কার সাধ্য?

দেখতে দেখতে এবাড়ী, ওবাড়ীর অন্যান্য দিদিরা বৌদিদিরা কাজ ফেলে দাসীর কাছে দাঁড়ালেন। মোহরের জালাটার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।·· দৈব-কৃপা-পুষ্ট দাসীর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাও বাড়ল!

শুধু ও-বাড়ীর ছোটদিদি মুচকে মুচকে হাসতে আরম্ভ করলেন!—তিনি একটু স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ। ছাপার বই থেকে ধার-করা-বিদ্যার ধার বড় ধারেন না। কিন্তু বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান বেশ তীক্ষ্ণ। গুরুজনদের অন্যায়কেও ক্ষমা করেন না—'চোট পাট' শুনিয়ে দেন। সময় বিশেষে বাক্ সংযম ক্ষমতাও যথেষ্ট।

দাসীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি রাম-রহিম কিছুই বললেন না। শুধু বোনেদের ও বৌদিদিদের লক্ষ্য করে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

তাঁর রকম-সকম দেখে সকলের শ্রদ্ধা ক্রমে সন্দেহ, পরে রীতিমত শঙ্কায় রূপান্তরিত হোল। একে একে ভিড় পাতলা হতে লাগল।

মা পূজাহ্নিক সেরে ঠাকুর ঘর থেকে বেরুলেন। ক্ষণকাল দাসীর দিকে চেয়ে থেকে শান্ত স্বরে বললেন "দাসি, যাও আগে গোরুকে ফ্যান খাইয়ে এস। তারপর তেল মেখে নেয়ে এসে আগে একটু শরবৎ খাও। তোমার এখন শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা থাওয়া দরকার। ওসব কথা ছেড়ে দাও।"

মাকে দাসী অত্যন্ত সমীহ করে। আদেশ মাত্রেই বোক্‌নো নিয়ে গোয়ালে চলে গেল। আর কথা কইলে না।

সে অদৃশ্য হতেই মা দৃঢ় কণ্ঠে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করলেন, দাসীকে যেন ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে কোন কৌতূহলী প্রশ্ন না করা হয়। যেহেতু প্রশ্নের সুযোগ পেলেই সে কাজকর্ম্ম ভুলে অর্থহীন ভাষায় বক্তৃতা করবে। মাথাটা ওর গরম হয়েছে সন্দেহ নাই। এখন ওকে তেল মাখিয়ে স্নান করিয়ে শরবৎ খাইয়ে ঠাণ্ডা করাই কর্ত্তব্য।

২

দিদিদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে দাসী তেল মাখলে, স্নান করলে, শরবৎ খেলে। কিন্তু সুলক্ষণের পরিবর্ত্তে দুর্লক্ষণ-গুলা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানাবিধ অবস্থান্তর ঘটতে লাগল। কখনো সভয়ে বললে 'দেবোতা' তাকে কাজ করতে নিষেধ করছে। কখনো দেখা গেল ধনুষ্টঙ্কার রোগগ্রস্তের মত, স্নায়বিক বিক্ষেপে তার দুই হাত পিঠের দিকে বেঁকে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে—'দেবোতা' তার হাত পিছন দিকে টেনে রেখেছে, বাসন মাজতে দিচ্ছে না।···আবার দেখা যেত কিছুক্ষণ পরে সে আপনা-আপনি প্রকৃতিস্থ হয়ে কাজ করছে, গান গাইছে। আবার কখনো পুকুর ঘাট থেকে কাঁদতে কাঁদতে এসে জানালে—'তার হাত থেকে বাসন কেড়ে নিয়ে 'দেবোতা' পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছিলেন! সে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলে নেমে বহুকষ্টে হাৎড়ে হাৎড়ে সেই বাসন তুলে আনলে।···সে আর পারে না বাপু···ইত্যাদি!

দেবতার উপদ্রবে দিদিরাও বিব্রত! দাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে 'দেবোতা'র নষ্টামীর বিরুদ্ধে তাঁরাও কটু সমালোচনা আরম্ভ করলেন। নাঃ, ধনসম্পত্তি যা-ই দিক, আপাতত: দাসী বেচারাকে এতটা কষ্ট দেওয়া 'দেবতা'র পক্ষে মোটেই ভদ্রোচিত কাজ হচ্ছে না!···তবে দেবোতাদের কাণ্ড! কি উদ্দেশ্যে তিনি এমন করছেন—তার মূল রহস্য বোঝা দুষ্কর!

নির্দ্দিষ্ট দিনে জামাতার তত্ত্বাবধানে ট্রেণে চড়ে ত্রিবেণীতে গিয়ে দাসী গঙ্গা স্নান করে এল। কিন্তু দেবতা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে দাসীকে অব্যাহতি দান করা দূরে

থাকুক, আরও যেন বেশী মাত্রার বিশ্বাসঘাতকতা করে দাসীকে সম্পূর্ণ অধিকার করলেন।

শোনা গেল তার দিন-রাত ঘন ঘন "ভর" হচ্ছে। কোনও কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব! অতএব সে কদিন কাজ করতে এল না।

দিদিদের উদ্বেগের সীমা নাই। নিজেদের পক্ষে সেখানে অর্থাৎ মুচি বাড়ী যাওয়া সম্ভব নয়, অতএব বার্ত্তাবহদের ধরে প্রত্যহ দু বেলা দাসীর কাছে পাঠানো হতে লাগল। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত খবর আসতে লাগল। সেগুলার অর্থ বিশ্লেষণ না করাই ভাল!

নির্দিষ্ট মঙ্গলবারও উত্তীর্ণ হোল।

উৎকণ্ঠিতা দিদিদের কাছে এসে এক ভগ্নদূত বিষাদ স্বরে সংবাদ ঘোষণা করলে—অবাধ্য জামাতা সেদিন গঞ্জিকা সেবনান্তে মোহরের জালা ঘরের কোণের মাটী সরিয়ে তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু তার মূঢ়তাকে উপহাস করে জালা সাত হাত মাটীর অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেছে! আশা ভঙ্গে ক্রুদ্ধ হয়ে জামাতা, দৈবী-কৃপা-বলদৃপ্তা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে নির্ম্মম ভাবে উত্তম-মধ্যম দিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে!···দাসী না কি কোন কুটুম বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে!

'দেবোতা'র পরিহাস দেখে দিদিরা হতাশ, মুহ্যমান! দাসীর জন্য তাঁরা অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন।

৩

কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ দাসী গুটি গুটি চরণে এসে আবির্ভূত! বিনাবাক্যে কাজকর্ম্ম আরম্ভ করলে। যেহেতু কুটুম্বরা তাকে অন্নদানে আর ইচ্ছুক নয়—অতএব অন্ন চাই।

মার নিষেধাজ্ঞা স্মরণ করে দিদিরা, বৌদিদিরা, কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করলে না। দাসী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থের মত নির্দ্দিষ্ট কাজগুলি নীরবে সম্পাদন করলে। কোথাও কোন ত্রুটি দেখা গেল না।···সকলের আশা হোল, জামাতার প্রহারের চোটে দাসীর স্কন্ধ বা মুণ্ড ত্যাগ করে দেবতা মহাশয় অন্তর্হিত হয়েছেন!

কিন্তু ভুল সে আশা! পঞ্চম দিনে সহৃদয়া নতুন-দিদিকে আড়ালে একা পেয়ে দাসী বিনা প্রশ্নেই আরম্ভ করলে। চুপি চুপি বললে "আমাকে যিনি "ভর" করেছেন, তিনি কে জানো?"

জানা অসম্ভব। ঘাবড়ে গিয়ে নতুন-দিদি ভীতকণ্ঠে বললেন "কে?"

গম্ভীর মুখে দাসী বললে "পীর সায়েব।"

"পীর সায়েব!"

"হাঁ।"

"ওমা সে কি গো? এমন তো কখনো শুনি নি।"

অধিকতর গম্ভীর মুখে দাসী বললে "কাল পীর সায়েবের সঙ্গে দেবোতাদের খুব মারামারি হয়ে গেছে। বিষম মারামারি, জানো?"

নতুন-দি আশ্বস্ত হলেন। সময়টা তখন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের আরম্ভ কাল। ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানে রুদ্র রোষে হানাহানি চলছে। দাঙ্গাবাজ দল অধঃপাতের নিম্নতম স্তরে নেমে চলেছে।···এ বাজারে পীর সাহেবের সঙ্গে দেবতাদের মারামারি লাগা অতিশয় সঙ্গত এবং শোভন ব্যাপার! স্বর্গলোকে স্বর্গীয় জমিদারী সেরেস্তার ভাগ বাঁটোয়ারা ব্যাপারে গোলমাল ঘটা এ সময় নিতান্তই প্রয়োজন! দাসীর সংবাদ অতিশয় যুক্তিসঙ্গত!

সুনিশ্চিত ভাবে ব্যাপারটা বোঝবার জন্য নতুনদি সাগ্রহে বললেন "কেন মারামারি হোল?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীর মুখে দাসী বললে "পীরসায়েব দেবোতাদের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি আমাকে "ভর" করেছেন। শুনে দেবোতারা বললেন—"সে কি? তুমি মুচির মেয়েকে "ভর" করেছ? তাহলে তোমার জাত গেছে!"

দু চক্ষু কপালে তুলে নতুনদি বললেন "সে কি গো? দেবতাদের কি জাত আছে? যে যাবে?"

সান্ত্বনাদায়ক কণ্ঠে বিজ্ঞভাবে দাসী বললে "আছে দিদি, আছে। ওদেরও সব আছে। পীর সায়েব তাই রেগে গিয়ে বলেছে—আমাকে তোমরা 'ঠেকো' করবে? বটে! এত আস্পদ্দা!···তোমাদের মেলায় যত 'যাত্তিরি' আসবে, আমি সব ভাড়িয়ে নিয়ে যাব। দাসীর কাছে আলাদা মেলা বসাব। সব যাত্তিরিকে লুচি সন্দেশ খাওয়াব, তাহলে সবাই দাসীর কাছেই যাবে। তোমাদের মেলা বন্ধ হয়ে যাবে!"

নতুনদির স্মরণ হোল তাঁদের গ্রামের বুড়া শিবের কাছে

শিবরাত্রি ও গাজনের সময় প্রতি বৎসর জাঁকিয়ে মেলা বসে। যাত্রা, থিয়েটার, জুয়াখেলা, পাপর ভাজা, তেলে ভাজা ও মাটীর পুতুল—সে মেলায় বিশেষ আকর্ষণ। চারি-পাশের পল্লীগ্রাম থেকে এবং সহর থেকেও সে সময় বিস্তর যাত্রীর শুভাগমন হয়। সম্ভবতঃ সেই সমারোহ উৎসবের স্মৃতিই দাসীর দুষ্ট-ব্যাধি বিকৃত মস্তিষ্কে অলক্ষ্যে কল্পনার কুহক জাল রচনা করেছে। তার অবচেতন-মন, পীর সাহেবের দ্বারা মেলার যাত্রী সংগ্রহের উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে নতুনদি বললেন "বাবা! পীর সায়েবের রাগ ত কম নয়! দেবতাদের জাত মারবার ব্যবস্থা করছেন! ত মারামারি ত হল। শেষ পর্য্যন্ত জিতলে কে?"

ওকালতির সুরে দাসী বললে "পীর সায়েবের গায়ে খুব জোর। কিন্তু দেবোতারা সবাই মিলে মারামারি করলেন কি না? তাই পীর সায়েব হেরে গেলেন। রেগে টং হয়ে তিনি বলেছেন আর চারদিন পরেই, আমাকে পরী করে দেবেন।"

"পরী?"

"হাঁ। আমি পরী হয়ে গেলে তোমরা আর কেউ আমাকে দেখতে পাবে না দিদি, জানলে?"

শোকাকুল কণ্ঠে নতুনদি বললেন "আহা, সে কি! তোমায় আর দেখতে পাব না?"

অধিকতর গম্ভীর হয়ে দাসী বললে "না, পাবে না। কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকে দেখতে পাব···আমার কাছে মস্ত মেলা বসবে। তোমরা যেও সেখানে। লুচি সন্দেশ খেয়ে এস।"

হেনকালে মাতৃদেবী সামনে এসে দাঁড়ালেন। দৃঢ়কণ্ঠে বললেন "যাও দাসী, ক্ষার সিদ্ধ কাপড়গুলা আগে কেচে আনো।"

সুখ সৌভাগ্যের গল্পে বাধা পড়ায় দাসী ক্ষুব্ধ হোল। কিন্তু মার আদেশ অবহেলা করার সামর্থ্য ছিল না। অতএব ক্ষার-সিদ্ধ কাপড়ের বালতি তুলে নিয়ে দু'পা গিয়ে দাসী আবার ফিরে দাঁড়াল। বললে "আজকের মত কাজ করে যাই মা। কাল থেকে আর আসব না।"

মা বললেন "কেন আসবে না? কি হোল আবার?"

দাসী নির্ব্বিকার মুখে বললে "কাল থেকে আমি একটু একটু করে পরী হব কি না? আসব কি করে?"

অদূরে দাঁড়িয়ে কাকীমা মনোযোগ দিয়ে দাসীর ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করছিলেন। স্মিতমুখে এবার বললেন "পরী? সে ত সুন্দরী উপদেবতা! তুমি তাই হবে?"

"হ্যাঁ মা, পীর সায়েব বলে দিয়েছে।"

ক্ষার-সিদ্ধ কাপড়গুলার দিকে পুনশ্চ দাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে মা বললেন—"বলাবলির কথা পরে শোনা যাবে। এখন কাপড়গুলা কেচে আনো।"

দাসীর মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন ভাবী সুখ সৌভাগ্যের কল্পনার প্রচণ্ড উত্তেজনার জোয়ার এসেছে। সে কি থামতে পারে? বালতি নিয়ে পুনরায় দু'পা গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল। উত্তেজিত দ্রুত কণ্ঠে বললে "যাই মা। হ্যাঁ পীর সায়েব বলেছে, আমাকে 'মাতা' থেকে পা পর্য্যন্ত সোনায় মুড়ে দেবে। 'মাতায়' মুকুট দেবে, সারা গায়ে গয়না দেবে। আমার আজ্ঞেয় বোবার বোল ফুটবে। কানার চোখ হবে। খোঁড়ার পা হবে। আমি যাকে বলব তোর কুঠ হোক, তার কুষ্ঠ ব্যাধি হবে। যাকে বলব তোর মুখে রক্ত উঠুক, তার রক্ত উঠবে।···হ্যাঁ, আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। তবে তোমাকে মা বলি কি না? তুমি শুধু দেখতে পাবে। তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসব। যখন আসব, আমাকে বসতে আসন দিও। যদি আসন না দাও, তবে তুমি কিচ্ছু পাবে না। যদি আসন দাও, তাহলে আমি সেই আসনে বসব। আমি চলে গেলে দেখবে সেটা সোনা হয়ে গেছে। - সেই সোনাটা শুধু তোমায় দেব।"

ও-বাড়ীর জ্যাঠাইমা এসে অদূরে দাঁড়িয়ে নীরবে দাসীকে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর দিকে চেয়ে মা একটু হেসে বললেন "যদি সোনা পাওয়া যায়, মন্দ কি? খুব বড় একটা পীঁড়ে তোমায় বসতে দেব—"

হিসাব জ্ঞানে জ্যাঠাইমা পাকা গিন্নি। বাধা দিয়ে ভুল সংশোধন করে বললেন "পীঁড়ে কেন? ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিও। খাটটা সোনা হয়ে গেলে বেশী সোনা পাবে।"

তৎক্ষণাৎ দাসী দ্রুত কণ্ঠে বললে "হ্যাঁ, সেই সোনাটাই শুধু তোমায় দেব মা, আর বেশী কিছু দিতে পারব না। তোমায় মা বলি, তাই ওইটে তোমায় দেব—"

বাধা দিয়ে মা বললেন "আচ্ছা, এখন যাও। ক্ষার কেচে আনো।"

"যাই মা যাই—" দাসী প্রস্থান করলে।

৪

পরদিন দাসী কাজ করতে এল না। তাকে ডেকে আনবার জন্ম 'কচি' নামক চাকরকে পাঠান হোল। সে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে জানাল, দাসী তার প্রহারদাতা জামাতার দাওয়ায় নিশ্চিন্ত নির্ভীক ভাবে বসে রয়েছে! আকৃতি প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। কচির আহ্বানের উত্তরে জানিয়েছে—"সে আজ অর্দ্ধেকটা পরী হয়েছে। আর চারদিন পরে সম্পূর্ণ পরীত্ব লাভ করবে। অতএব ঝি'এর কাজ আর করবে না।"

কচিকে অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাবিষ্ট এবং ভক্ত-জনোচিত শ্রদ্ধাশীলের মত দেখাতে লাগল। অর্থাৎ ব্যাপার গুরুতর! সবাই অবাক!

দিন চার পরে, একদিন প্রাতঃকালে দাসী তার নবজাত দৌহিত্রীকে বাঁ হাতে বুকের কাছে নিয়ে, ধীর মন্থর গমনে বাবুদের বাড়ী ঢুকল। তার মাথায় কাপড় নাই। খাটো চুলগুলি পিঠের উপর এলানো। ডান হাতখানি সর্প ফণাকারে ঈষৎ বক্র ভাবে ডান কাণের সমান্তরালে উঁচু করা রয়েছে। চোখ দুটি ভাবে কিম্বা কোনও নেশার প্রভাবে ঈষৎ ঢুলু ঢুলু।

গৃহিণীরা তখন যে যার নিজ গৃহে পূজাহ্নিকে ব্যাপৃত। দাসী উঠানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কোমল কণ্ঠে ডাকলে "মা—"

নতুনদি ছুটে এসে সাহ্লাদে বললেন "মা পূজো করছেন। তুমি এসেছ? বেশ বেশ। কাজ কর।"

দাসী বিনয় নম্র বচনে বললে "কাজ করতে আসি নি দিদি, আমি মায়েদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আজ থেকে আর তো কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। তাই শেষ দেখা দিতে এনু।"

"কেউ তোমায় দেখতে পাবে না?

"না। আমি অদ্দেকটা পরী হয়েছি, আজ রাত ন'টার সময় গোটাটা পরী হব।"

"তারপর কি হবে?"

"পীর সায়েবের সঙ্গে আমার যুগল-মিলন হবে।"

রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনের বিগ্রহ ও ছবিগুলির স্মৃতি নতুনদির স্মরণ হোল। ভয়ে ও ভক্তিতে গা ছম্ ছম্ করতে লাগল।...না জানি দাসীর ও তার 'দেবোত্তা' পীর সায়েবের যুগল মিলন আবার কি রকম রোমাঞ্চকর মনোরম হয়! দেবতার কথা নাকি অবিশ্বাস করা অপরাধ। তার চেয়ে চোখ কান বুজে বিশ্বাস করাই মঙ্গল।...

পরমশ্রদ্ধাভরে নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ দাসীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে নতুনদি তার পরীজনোচিত রূপান্তর কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সকরুণ কণ্ঠে ভয়ে ভয়ে বললেন—"তা—হ্যাগো, তুমি যে পরী হয়েছ—তা কই—কিছু তো বোঝা যাচ্ছে না।"

দাসী নির্ব্বিকার মুখে উত্তর দিলে "এই যে দিদি, চুল এলিয়ে দিইছি, আর হাত উঁচু করে রেকেছি!"

অব্যর্থ প্রমাণ!—নতুনদির স্মরণ হোল এ পর্য্যন্ত জ্যান্ত পরী কখনো দেখেন নি বটে, কিন্তু পাথরে খোদাই, মাটীর তৈরী, ও ছবিতে আঁকা যত পরীমূর্ত্তি দেখেছেন, সবগুলির চুল খোলাই বটে। আর তাদের করমুদ্রার ভঙ্গিও প্রায় দাসীর অনুরূপ। অতএব অবিশ্বাস করা উচিত নয়।

কিন্তু স্নানের সময় এবং রোদে চুল শুকাবার সময় তারাও ত সবাই চুল এলিয়ে দেয়!

যাক! আজ রাত্রেই যখন দাসী পূর্ণ পরীত্ব লাভ করে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী হচ্ছে, তখন তর্ক করা নিষ্ফল। নতুনদি চুপ করে রইলেন।

দাসী গম্ভীর মুখে পুনশ্চ বললে "এখুনি ঢ্যাড়া দিতে আসবে, তখন শুনবে সব। সারা গাঁয়ে ঢ্যাড়া দেওরা হবে। আজ ওইখেনে মেলা বসবে। গাঁর ষোল-আনা নোক যাবে। তোমরাও যেও সব। আসি এখন। আর ত দেখা হবে না। এই শেষ। নমস্কার।"

দাসী পায়ে পায়ে জড়িয়ে বিভোর বিভ্রান্তের মত ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হোল।

দাসীর রকম-সকম দেখে চণ্ডাল-নন্দন শ্রীমান কচি চাকর মুগ্ধ হয়ে উল্লসিত কণ্ঠে বললে "আঁ—আঁ—আমুও এবার সা—সা—সাদু হয়ে কাঁ—কাঁ—কাঁউরূপ যাব। ম—ম—মন্তোর শিখে আসব। আমুও সাদু হব। যাবই কাঁ—কাঁউরূপ!—"

মা পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে দৃঢ় আদেশ ব্যঞ্জক কণ্ঠে বললেন—"আচ্ছা যাস্। এখন গোরুগুলোকে চরিয়ে আন।"

কাকীমা দূর থেকে হাসতে হাসতে বললেন—"ঘরে থেকে আপনাকেও ত খুব গোরু চরাতে হচ্ছে মেজদি!"

কচির দিকে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মা বললেন "গোরু? এদের গাধা বললে গাধাকেও অপমান করা হবে! বুঝলে ভাই, এরা এমন জন্তু! দাসী ক্ষেপেছে দেখে ওরও ক্ষ্যাপবার সখ জেগেছে। মন্ত্র শিখতে চলল কামরূপ!"

মাকে ক্রুদ্ধ হতে দেখেই কচির মত্ততা নিমেষে অন্তর্হিত হোল। ভাল মানুষের মত গোয়ালের দিকে তৎক্ষণাৎ রওনা হোল।

তখন জানা যায় নি বটে, কিন্তু বহুদিন পরে কচি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে দাসী তাকে গোপনে "কাঁউরূপ কামিক্যের" ভূত প্রেতের মন্ত্র শিখিয়ে, সে সময় নিজের শিষ্য—তথা প্রচার-সচিব পদে নিযুক্ত করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু মার ধমক ও পরবর্ত্তী ঘটনা-সংঘাত মাহাত্ম্যে কচির চৈতন্যোদয় হয়।

৫

সেই দিনে ঠিক-দুপুরের সময় অকস্মাৎ গ্রামশুদ্ধ লোক চমকে উঠলেন! শোনা গেল প্রবল বেগে ঢোল পিটানো হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়!

ছুটোছুটি করে নিষ্কর্ম্মা পুরুষ ও বালকদল রাস্তায় বেরুলেন। দেখা গেল দাসীর গঞ্জিকাসক্ত জামাতা ষষ্ঠী মুচি, উত্তেজনারক্ত মুখে, অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়, ঢ্যাড়া বাদকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বাদ্যধ্বনিসহ পথিকদের জ্ঞাপন করছে, "আজ সন্ধ্যায় তার শশ্রুমাতা—বাবুদের বাড়ীর ঝি—'দাসী' পশ্বীত্ব ওরফে দেবীত্ব লাভ করবে। অতএব দয়া করে সবাই সন্ধ্যাকালে তার দীন ভবনে পদার্পণ করবেন।...সেখানে সতীমার আবির্ভাব হবে।...মন্দির উঠবে।...মেলা বসবে।...তার বাসগৃহের নিকটস্থ 'ঘোষ পুকুর' নামক পুষ্করিণীতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হবেন। সে জলে স্নান করা মাত্রেই সকলের সব আধিব্যাধি আপদ বিপদ দূর হবে। ধরাতলে স্বর্গের সুখ সম্পদ ভোগ করবে! ...স্বর্গীয় সমারোহ উৎসব!...কারুর কাছে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করা নিষেধ! তবে নিজ-বিবেচনায় শ্রদ্ধা ভক্তিভরে যিনি যা সাহায্য করবেন, তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। এ হেন স্বর্গীয় ব্যাপারে যিনিই দান করবেন তাঁর অজস্র পুণ্য হবে! অক্ষয় স্বর্গ হবে...ইত্যাদি, ইত্যাদি!"

পল্লীবাসীর দল চমকিত! ব্যাপারটার অর্থ বোঝবার জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত!

গ্রাম্য পুরোহিত কপিল ঠাকুর সজ্জন ব্যক্তি। ষষ্ঠীর আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে শান্তকণ্ঠে বললেন—"এখন ওসব কথা থাক ষষ্ঠী, তুমি চান করে ভাত খেয়ে বিশ্রাম করগে। আগে মাথা ঠাণ্ডা কর।"

ষষ্ঠী যোড়হাতে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বললে—"খাব কি বাবা ঠাকুর, মাথা ঠাণ্ডা করার কি যো আছে? এখন আমার শাউড়ীকে 'ভর' ছেড়ে গেইচে। এখন আমাকে ঘন ঘন 'ভর' হতে নেগেচে। 'ভরের' সময় ঢ্যাড়া দিতে হুকুম হয়। তা 'পেত্থমটা' গেরাজ্জি করি নি। 'দোনা-মোনা' করেছিনু।—তা বললে পিত্যয় যাবে নি, এই দ্যাকো! আবার 'ভর' হোল। দোনা-মোনা করেছিনু বলে ঢুঁই ঢুঁই করে মাতা ঠুকে দিলে।"

দেখা গেল সত্যই তার কপালটা ফুলে উঠেছে। পুরোহিত ঠাকুর নির্ব্বাক!

প্রত্যক্ষদর্শীরা দূরে দাঁড়িয়ে বলাবলি করতে লাগল, সত্যই ষষ্ঠীর যথা নিয়মে "ভর" হয়েছিল। ভীষণ বেগে ঘাড়ের উপর মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে ষষ্ঠী দুহাতে নিজের দু গাল চেপে ধরলে। তার পর নিজেই নিজের মাথাটা ঠক্ ঠক্ করে মাটীতে ঠুকে দিলে। অনর্গল ভাষায় নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেই উত্তেজিত কণ্ঠে ধমক দিতে লাগল "এখনো দোনামোনা? এখনো দোনামোনা? যা ঢ্যাড়া দি' গে। যা বলচি—যা—" ইত্যাদি!

টিফিনের সময় স্কুলের ছাত্রেরা পথে বেরিয়েছিল। তাঁরা সব শুনে গিয়ে শিক্ষকদের বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে "এ কি ব্যাপার স্যর?"

প্রথম শিক্ষক বললেন—"সম্ভবতঃ Self-Hypnotised"

দ্বিতীয় শিক্ষক বললেন "কিম্বা গঞ্জিকা-মাহাত্ম্যও হতে পারে।"

তৃতীয় শিক্ষক বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। চিন্তিত ভাবে বললেন "হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত গ্রহণ করলে খুব সম্ভব তাঁরা বলবেন—

পুরুষানুক্রমিক কুৎসিত ব্যাধির বিষে এখন সহসা এদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে!"

ছেলেরা বললে "সন্ধ্যাবেলা কি ঘটে, আমরা দেখতে যাব স্যর্?"

শিক্ষক মহাশয়রা বললেন "অনর্থক সময় নষ্ট! অবশ্য কৌতূহল চরিতার্থ করতে চাও, যেও। তবে সাবধান! এদের ঘনিষ্ঠ সংস্রব থেকে দূরে থেক। আর এদের স্পর্শিত খাদ্য পানীয় কদাচ গ্রহণ কোর না।...এদের দেহে রয়েছে ভয়াবহ বিষাক্ত ব্যাধি! সে ব্যাধি পুরুষানুক্রমে সমস্ত সমাজ-জীবনকে অভিশপ্ত করার ক্ষমতা রাখে!"

অন্য এক প্রবীণ শিক্ষক বললেন—"ঠিক বলেছেন। সেই ব্যাধির eruptionই মগজে হয়েছে। নইলে এত বাড়াবাড়ি হওয়া সম্ভব নয়।"

৬

বৈকাল থেকেই ভিড় জমতে আরম্ভ হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ষষ্ঠীর কুটীর প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হোল।

যত্নপূর্ব্বক সারা উঠানে সেদিন গোময় লেপন করা হয়েছিল। মৃৎকুটীরের দাওয়ায় বদ্ধাঞ্জলি হয়ে সুখাসনে বসেছিল দাসী। তার সামনে আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণ ঘট!

সমাগত নরনারীবৃন্দের উদ্দেশে দাসী গলবস্ত্র হয়ে বিনীতভাবে প্রণাম করলে। তারপর ঘটের উদ্দেশে শোক বিহ্বল সুরে খেদোক্তি করে গান আরম্ভ করলে। গানটা তার নিজস্ব মৌলিক রচনা। শৃঙ্খলা সামঞ্জস্যহীন প্রলাপোক্তির মূল ভাবার্থ:—"দাসী আজ থেকে পরী হয়ে যাবে। দাসীকে আর কেউ দেখতে পাবে না।...... দাসীর সঙ্গে পীর সায়েবের যুগল মিলন হবে......" ইত্যাদি ইত্যাদি!

গান শেষ হোল। ষষ্ঠী সদ্যঃ স্নাত হয়ে সজল বস্ত্রে সিক্ত মস্তকে দাওয়ায় উঠে ঘট প্রণাম করলে। তার পর যুক্ত-করে দাসীর উদ্দেশে সসম্ভ্রমে বললে "মা এখন আনব?"

দাসী বললে "না, এখন নয়।"

তারপর যাত্রাদলের জুড়ি গায়কদের মত মুখ নেড়ে সুমিষ্ট ঝঙ্কার তুলে দাসী পুনরায় গান ধরলে:—

"শোন শোন নর-মনিষ্যি, দেবোতার কতা—
এ কতা শুনিলে কানে, যাবে মনের ব্যতা!"

পূর্ব্বেই স্কুলের ছাত্রগণ এসে একপাশে স্থান গ্রহণ করেছিল। দাসীর ভাবাবেগ বিহ্বলতা উত্তরোত্তর বাড়ছে দেখে একটি ছাত্র চুপি চুপি আর একটি ছাত্রকে বললে—"জানিস ভাই, আমাদের গাঁয়েও ক'বছর আগে একটা বাগ্দী না চাঁড়ালের মেয়ে অমনিভাবে "কালী" পেয়েছিল। তারও ঘন ঘন 'ভর' হোত। ভরের ঝোঁকে ক্রমাগত বলত 'সে নর বলি দিয়ে আবার তাকে বাঁচিয়ে দেবে।' বলে একদিন নিজের ভাইকে কেটে ফেললে। কিন্তু বাঁচাতে আর পারলে না। শেষে পুলিশ এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।"

একজন উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিমান ছাত্র নিম্নকণ্ঠে বললে—"এখানেও বোধ হয় তাই!"

আর একজন ছাত্র বললে "নর-বলি সুরু হবে না কি?"

"আশ্চর্য্য কি?"

"তাহলে উপায়?"

"ধনঞ্জয়! পাগলের উন্মাদনা শান্ত করার মস্ত ওষুধ—প্রহার! পাগল যুক্তি তর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রণাকে সম্মান করে। শোন নি? ওই জন্যে ক্ষ্যাপা হাতীর পায়ে বন্দুকের গুলি মারা হয়। তাতেই সে ঠাণ্ডা হয়!"

"কিন্তু, এ যে স্ত্রীলোক!"

"ওর জামাইটা স্ত্রীলোক নয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওটা-ও ক্ষিপ্ত হয়ে এর সহকারিতা করছে। ওটাকে ঠ্যাঙালেই এর কাণ্ড জ্ঞান সচেতন হবে আশা করি।"

"আরে শোন শোন, গান শেষ হয়েছে। আবার কি বলছে।"

দেখা গেল—গান শেষ করে দাসী ভূমিষ্ঠ হয়ে আবার ঘট প্রণাম করলে এবং ষষ্ঠী, সজল-বস্ত্র গলায় জড়িয়ে সকাতরে পুনশ্চ প্রার্থনা জানাচ্ছে—"মা এবার আনব?"

মাথা চালতে চালতে, অর্থাৎ সবেগে মাথা ঘোরাতে ঘোরাতে দাসী বললে—'আনো, আনো। দেবোতার ভোগ দাও, দেবোতার ভোগ দাও......ভোগ...ভোগ!"

ষষ্ঠী ঘরে ঢুকে এক থালা পাটালি গুড় নিয়ে এসে ঘটের সামনে রাখলে। দাসী মাটীতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে "নাও নাও দেবোতা, ভোগ নাও...! দাও দাও নর-মনিষ্যিকে পেসাদ দাও, পেসাদ দাও!—"

তারপর থালা থেকে কতকগুলা পাটালি গুড় তুলে

টুকরা টুকরা করে জনতার উদ্দেশে হরির লুটের মত ছুঁড়ে দিলে। ছোট ছেলেরা কেউ কেউ তা তুলে নিলে।

তারপর অকস্মাৎ দাসীর নবতর ভাবান্তর উপস্থিত হোল! সহসা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সবেগে মাথা চালতে চালতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে দাসী বললে "নর বলি চাই, নর বলি চাই! দেবোতা নরবলি চান,......দাও দেবোতার কাছে নর-বলি! ষষ্ঠীর ওই বৈমাত্তর ভাইকে নরবলি দিতে বলচেন দেবোতা! দাও ওকে নরবলি—ষষ্ঠের ভাইকে নরবলি দাও—"

নরবলি প্রসঙ্গ আলোচনাকারী ছাত্রের দল ত্রস্তে ঘাড় তুলে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়াল! তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারা দাসী ও ষষ্ঠীর ভাব নিরীক্ষণ করতে লাগল।

ষষ্ঠীর একটা মাত্র বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। বয়স তার বছর দশ বারো। শিশুকালে পিতা মাতার মৃত্যু হওয়ায় সে ষষ্ঠীর গলগ্রহ হয়ে তার সংসারে বাস করত। ষষ্ঠীর শশ্রূ মাতা পরীত্ব লাভ করে, দেবতার প্রীত্যর্থে হঠাৎ তাকে নরবলির জন্য নির্ব্বাচন করে বসলেন!

জনতার মধ্যে এক দল লোক হতভম্ব হয়ে গেল!...এই জন্য এত আড়ম্বর!...আর এক দল মৃদু গুঞ্জনে দাসীর বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করে উঠল!

ষষ্ঠী তৎক্ষণে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"নরবলি দিতে হবে? আমার ভাইকে? আচ্ছা মা, দেব। কখন নরবলি দেব মা?"

ভীষণ বেগে মাথা চালাতে চালাতে দাসী বললে "আজই আজই! এখুনি, এখুনি......"

বিস্মিত কণ্ঠে ষষ্ঠী বললে "এখুনি? এই খানেই?"

"হাঁ এই খানেই, এই খানেই—এখুনি—"

জনতা আতঙ্কে স্তব্ধ!

ষষ্ঠী বোধ হয়—"এইখানে" এবং "এখুনি"র আয়োজন উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে অগ্রসর হোল। অকস্মাৎ স্কুল-ছাত্রের দল ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করে উঠল "তবে রে ব্যাটা গেঁজেল! নরবলি দিবি? আর আমরা সবাই মিলে আজ তোকেই এখানে নরবলি দিচ্ছি!"

লাফ দিয়ে দাওয়ায় উঠে, তারা ষষ্ঠীকে টেনে উঠানে নামালে। তার ঘাড়ে পিঠে দমাদ্দম শব্দে কিল চড় বর্ষণ করতে করতে বললে "এই নরবলি নাম্বার ওয়ান্—টু—থ্রি!...কেমন লাগচে বাছা ধন?"

ষষ্ঠী প্রথমটা হকচকিয়ে গেল! তারপর নবোদ্যমে বাবুরা যখন পুনরায় তার অঙ্গসেবা আরম্ভ করলেন, তখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলে—গা-গতর চূর্ণ হতে আর বেশী বিলম্ব নাই। আতঙ্কে তার "ভর" ও শশ্রূ-ভক্তি যুগপৎ উড়ে গেল! বাস্তব জ্ঞান ফিরে এল। সত্রাসে যোড় হাতে বললে "দোহাই বাবু, আর এমন কথা বলবু নি।"

জামাতার আকস্মিক লাঞ্ছনা দর্শনে—দাসীর অসঙ্কুচিত-ভাবে-বর্দ্ধিত দৈবী-ভাব-প্রবাহ সহসা বাধাপ্রাপ্ত হোল। দাওয়ার বসে সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ চক্ষে চেয়ে, "নর মনিস্যিদের" হঠাৎ মতিগতি বিগড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলে। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। সে তার পৃষ্ঠপোষক "পীর সায়েব" ও "দেবোতা" গণকে আহ্বান করলে। যেন তাঁরা তদণ্ডে এসে এই দুর্ব্বৃত্তগণকে শাস্তি দান করেন।

কিন্তু হায়! তাঁরা কেউ এলেন না! দাসীর অনুমান হোল—উত্তম ভক্ষ্য ভোজ্য না পেলে তাঁরা রণক্ষেত্রে আসতে রাজি ন'ন। তাঁদের লোভ বর্দ্ধনের জন্য দাসী আবেগভরে উচ্চ কণ্ঠে বললে "দোহাই দেবোতা, দোহাই পীর সায়েব—নর বলি দেব, নর বলি দেব—"

ঠিক সেই সময় মোটা লাঠি হাতে আর এক ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন! তিনি দেবোতা ন'ন, পীর সায়েব ন'ন—গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী কোঙার মশাই! তিনি মানুষ চরিয়ে চুল পাকিয়েছেন। জবরদস্ত জন-সেবক বলে সুখ্যাতিও আছে। 'কর্ম্মবীর' বলে সবাই তাঁকে সম্মান করে।

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে তিনি উচ্চ নিনাদে বললেন—"জামায়ের বৈমাত্তর ভাইকে যিনি নর বলি দিতে চান, সেই দয়াময়ী পরী ঠাকরুণকে আগে দাওয়াই দাও। কইরে বাগ্দী পাড়ার ছেলেগুলো কই? এই যে, আর ত বাবা তোকে দুটো টাকা দেব। আমার এই লাঠিটা নিয়ে, ওই দয়াময়ীর পিঠে ঘা-কতক ধরিয়ে দেত! বেটির মাথা থেকে ভূত নামিয়ে দে।"

বলরাম বাগ্দী পাড়ার যাত্রা দলের নর্ত্তক। উত্তম নৃত্য কৌশল প্রদর্শনে অভ্যস্ত। কোঙার মশাই তাকে ভাল বাসতেন। লাঠিটা তার হাতে দিলেন।

বলরাম লাঠি হাতে গম্ভীর মুখে দাওয়ার দিকে চলল।

দাসী সত্রাসে চেঁচিয়ে উঠল "নরবলি দেবোতা, নরবলি দেব।"

বলরাম দাওয়ায় উঠে লাঠি ঠুকে বললে "ফের!"

"নরবলি চান—দেবতা চান—নরবলি!"

"বেশ! নাও তবে নরবলি! কিম্বা নারীবলি?"

ঘা-কতক পিঠে পড়ল! শারীরিক যন্ত্রণায় দাসীর উন্মাদনা-বিহ্বল স্নায়ু মণ্ডলী সহসা প্রকৃতিস্থ হোল! 'নর বলির' আব্দার সে ত্যাগ করলে।

ধর্ম্মোন্মাদনা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতির অজুহাতে পরের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করলে, তার নিজের দৈহিক অবস্থা যে সঙ্গে সঙ্গে বিপদাক্রান্ত হবে এবং কোঙার মশাই ও বাবুরা যে কাছাকাছির মধ্যেই আছেন ও থাকবেন, তা সে বুঝলে। তার দেবোতা ও পীর সায়েবের চেয়ে এই সব "নর-মনিষ্যির" দল যে বেশী শক্তিশালী দেবতা, তা সে সসম্ভ্রমে স্বীকার করলে!

মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘুচলেও, সে আপাতত: শান্ত!

* * * * *

সমস্ত ব্যাপার দেখে এসে প্রত্যক্ষদর্শী বার্ত্তাবহ দল সমস্ত ঘটনা নতুনদিদি ও ছোটদিদির কাছে নিবেদন করলে।

দুই দিদিই স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি! পরীক্ষের পরিণাম শেষে —এই!

অবশেষে সম্বিৎ ফিরে এল। বিনা বাক্যে নতুনদি নিভৃতে গিয়ে তাঁর অর্দ্ধসমাপ্ত স্কার্ফটা ক্ষিপ্র হস্তে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বুনতে লাগলেন। ছোটদিদি নিঃশব্দে দোতলায় গিয়ে টেবিলের কাছে বসলেন। ঘাড় গুঁজে এক মনে ম্যাট্রিকের পড়া তৈরী করতে লাগলেন। কচি চাকরের "কাঁউরূপ" যাওয়া ও মন্ত্র শিখে "সাদু" হওয়ার উদ্দাম-উৎসাহও সেই সঙ্গে অপঘাত মৃত্যু লাভ করলে!— কচি একেবারে স্তব্ধ!

মনে হোল, শুধু দাসীর নয়—তাদের মাথা থেকেও আজ ভূত নেমে গেছে!

পাঁচ বৎসর

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কলিকাতা সহরের দেওয়ালে, পাঁচিলে পতাকা উড্ডীন কর; তাহাতে লিখিয়া দাও—পাঁচ বৎসর। সহরের ট্রামের গায়ে বাসের গায়ে মোটা হরপে লিখিয়া রাখ—পাঁচ বৎসর। কলিকাতায় যে দুইটি রেল ষ্টেশন আছে, তাহাদের অঙ্গে নামাবলী পরাইয়া দাও, তাহাতে লেখা থাক্—পাঁচ বৎসর। জাহাজে, জাহাজঘাটে খোদিত হোক —পাঁচ বৎসর। ডাকখানা চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ মারে মারুক, তাহারই সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ছাপিয়া দিক, পাঁচ বৎসর। টেলিগ্রাফের তারও বহন করিয়া বেড়াক্—পাঁচ বৎসর। বেতার সকাল সন্ধ্যা সময় পাইবামাত্র স্মরণ করাইয়া দিক্—পাঁচ বৎসর। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকে ঐ কথা লিখিত হোক—পাঁচ বৎসর। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে, জ্ঞানে অজ্ঞানে অহর্নিশ ঐ দু'টি শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক— পাঁচ বৎসর! পাঁচ বৎসর!

বিদ্যালয়ে (স্কুল) বালক শিখিতে থাকুক, জন্মের দিন হইতেই সে মাতৃপদে উৎসর্গীকৃত। বিদ্যাভবনে (কলেজ) তরুণ বুঝিতে শিখুন, তিনি স্বাধীন দেশের নাগরিক; নূতন দায় নূতন দায়িত্ব বর্ত্তিয়াছে; মান বাড়িয়াছে, কাজও বাড়িয়াছে। তরুণীগণ পিছনের দিকে চাহিলে ভুল করিবেন। অতীত বিলুপ্ত হইয়াছে; চিহ্নমাত্র নাই। তাহাকেও সম্মুখে চাহিতে হইবে। স্বাধীনতা কেবল পুরুষেই অর্জ্জন করে নাই; স্বাধীনতা সম্ভোগের অধিকার পুরুষ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত নহে। প্রকৃতি আজ আবার সৃষ্টিরহস্য যুগপৎ নর ও নারীর সম্মুখে পুনরুদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। সৃষ্টির এমনই বিচিত্র কৌশল যে, উভয়ের সহযোগিতা ভিন্ন সৃষ্টি অচল।

আমাদের সমস্যা, অশিক্ষা। বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লেখা আছে, পাঁচ বৎসর। ছাত্র শিক্ষককে প্রশ্ন করিল, পাঁচ বৎসর অর্থে কি বুঝিব?

শিক্ষক অবশ্যই বুঝাইতে পারিবেন—পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে অশিক্ষা দূর করিতে হইবে?

"কিরূপে?"

"প্রত্যেক ছাত্রকে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, একটি হোক, দুইটি হোক, পাঁচটি হোক অশিক্ষিত, সুযোগবঞ্চিত অভাগাকে হাত ধরিয়া, যত্নসহকারে 'আলোক নিকেতনে' আনয়ন করিতে হইবে। দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রত ধারণ, পালন ও ব্রত

উদযাপনের মন্ত্রের ঝঙ্কারে দেশ ধ্বনিত, হোমকুণ্ডের অনল শিখায় দেশ প্রভাসিত হোক। সময়—মেয়াদ—ঐ পাঁচ বৎসর। ঐ পাঁচ বৎসর শনি রবি নাই, গ্রীষ্মাবকাশ পূজাবকাশ নাই, ঈদ, বকর-ঈদ ও মহরম নাই, অলস-অবসর বিনোদনের অবকাশ নাই! মানুষের জীবনে পাঁচ বৎসর দীর্ঘকাল নহে; বুদ্বুদের মত উত্থিত হয়, চকিতে বিলীন হয়। পাঁচ বৎসর পরে কোনও হতভাগ্য না বঞ্চিত থাকে। চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে, পাঁচ বৎসর; কাজের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছে পাঁচ বৎসর; চিত্তের তারে তারে ঝঙ্কৃত হইতেছে, পাঁচ বৎসর।"

আমাদের সমস্যা—অস্বাস্থ্য। স্মরণ রাখিতে হইবে, পাঁচ বৎসর! পাঁচ বৎসর পরে দেশরক্ষার প্রয়োজনে তোমাকে হে তরুণ, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইতে পারে। তোমার স্বাধীন দেশ, তোমার দেশ সুজলা সুফলা, তোমার দেশ বিশ্বের অন্নদাত্রী, তোমার দেশের জলে অমৃত, স্থলে স্বর্ণ, রসাতলে মণিমাণক্য। এই দেশের পরে হা-ভাতে হা-ঘরের শ্যেনদৃষ্টি না থাকিতে পারে এমন নহে। তুমি তোমার দেশের রক্ষক, সতর্ক প্রহরী। তুমি রক্ষা করিতে পার, দেশ সুরক্ষিত; না পারিলে পুনঃ দাসত্ব। তোমাকে, তোমার আত্মীয়স্বজন প্রিয়জন-পরিজন, তোমার গৃহ, তোমার গ্রাম, তোমার নগর, তোমার দেশ —তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে—দায়িত্ব তোমার। একদিন সে দায়িত্ব ভুলিয়াছিলে; মুর্শিদাবাদ জেলার পলাশীর প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্রোতস্বিনী ভাগীরথীর জলে দায়িত্ব বিসর্জন করিয়াছিলে, জাহ্নবীর জল শুকাইয়াছে, তোমার চোখের জল শুকায় নাই; দুইশত বর্ষকালের প্রায়শ্চিত্তে যদি বা পাপ বিধৌত হইয়া থাকে, সাবধান আর সে ভ্রমে পতিত হইও না। ঐ দেখ, লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসর মধ্যে স্বাস্থ্য অর্জন করিয়া স্বাস্থ্যবান হইতে হইবে। নিজে স্বাস্থ্যবান হইয়া, আর দুইজনকে স্বাস্থ্য অর্জনে সহায়তা করিবার ভার তোমার। সময় পাঁচ বৎসর; দায়িত্ব গুরুতর। একটি মুহূর্ত্ত আলস্যে ক্ষেপণ করিবার অবসর কোথায়?

আর, নারী তুমি! মানসনেত্রে ক্ষণেকের তরে তুমি সেই দৃশ্য কল্পনা কর। পুরুষ জাতি দেশরক্ষায় জীবন উৎসর্গ করিতে গিয়াছে; কিন্তু দেশ, দেশের ঘর, দেশের ক্ষুধা, দেশের তৃষ্ণা তাহার ঝুলিতে ভরিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই; দেশের কৃষি, দেশের শিল্প, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য দেশেই রাখিয়া গিয়াছে; বিদ্যালয় আছে, চিকিৎসাগার আছে, আরোগ্যশালা রহিয়াছে। কে চালাইবে? কাল, তুমি ভগিনী, তোমার ক্ষুদ্র গৃহ, ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, তোমার দারিদ্র্য, অনটন, তোমার কৃশ দেহ, দুর্ব্বল শরীর ও জরানিপীড়িত স্বাস্থ্য লইয়া বিব্রত ব্যস্ত ছিলে। আজও কি তাহাই থাকিতে পারিবে? পুরুষ প্রাণ বলি দিয়া যে দেশ রক্ষা করিতে গিয়াছে, সেই দেশ তুমি অযত্নে অবহেলায় উৎসন্ন দিবে? স্বাধীন দেশের নারী, দেহে প্রাণ থাকিতে তাহা পারিবে কি? স্বাধীন দেশের ইতিহাস তুমি অবশ্যই পাঠ করিয়াছ। তোমার ত অজানা নাই এমন দিন আসিয়াছে, নারী কৃষি কার্য্য করিয়া সৈনিকের রসদ উপার্জ্জন করিয়াছে, ডাকহরকরা হইয়া ডাক বিলি করিয়াছে, কারখানায় ঢুকিয়া গোলা বারুদ উৎপাদন করিয়াছে, গো-শালা রক্ষা করিয়াছে, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন করিয়া দেশের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছে, আবার সন্তানের মুখে স্তন্য দান করিয়াছে। রেলের ইঞ্জিনে কয়লা দিয়াছে, কল চালাইয়াছে, নাবিক হইয়া উপকূল বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছে, বিমান বাহনে সরবরাহ অব্যাহত রাখিয়াছে; আবার দেশ দেবী অন্নপূর্ণা হইয়া অক্ষম-আতুরের মুখে অন্ন ব্যঞ্জন তুলিয়া দিয়াছে। ইহাকে যদি ভাগ্য বল, ভাগ্য তোমার দ্বারে উপনীত; সৌভাগ্য বলিতে ইচ্ছা কর, তাহাও বলিতে পরে, সৌভাগ্য সমাগত। যেদিন দিকচক্রবালে স্বাধীনতার স্বর্ণউষার আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই দিনই প্রভাত সমীরণ তোমার কাণে সে বার্ত্তা কহিয়া গিয়াছে; প্রভাতের পক্ষী-কূজন কি তুমি শুন নাই? কিন্তু তোমার স্বাস্থ্য নাই। ছিল না, তাহা জানি। আজ প্রয়োজন হইয়াছে, স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিতে হইবে। মেয়াদ—পাঁচ বৎসর। তপঃক্লিষ্টা শুষ্কপত্রসমা অপর্ণা প্রয়োজনকালে মহিষমর্দ্দিনী জগদ্ধাত্রী হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে, শক্তিস্বরূপিণী শক্তিময়ী নারী, তোমাকেও বরাভয়দায়িনী হইতে হইবে। তাই তোমার গৃহদ্বারে, ঐ দেখ, লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর।

আমাদের সমস্যা, খাদ্যাভাব। খাদ্যাভাব, খাদ্যাভাব, খাদ্যাভাব—শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গিয়াছে, চিত্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বুঝি ইহাই অদৃষ্ট—বুঝি বিধাতার বিধান, ব্যতিক্রম নাই, খণ্ডন নাই, ইহাই মানিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাস দেখি, বিপরীত সাক্ষ্য দেয়; কাহিনী অন্য কথা বলে; গল্প উপন্যাস, গাথা, উপকথা উপহাস করে। যে দেশে এত খাদ্যাভাব, সে দেশে বার মাসে তের পার্ব্বণে দীয়তাং ভুজ্যতাং সমারোহ কিরূপে অনুষ্ঠিত হইত? এত যাত্রাগান, মনসার গান, পিঠেপুলির গান, নবান্নের গান, ইতু ঘেঁটু শীতলার গান কি খালি পেটে গাহিয়া বেড়াইত? এত জলসত্র, এত অন্নসত্র, এত দেবত্র, এ কি বুভুক্ষু সমাজ-জীবনের আলেখ্য? হা-ভাতের অঙ্গসৌষ্ঠব-জন্য কি ঢাকার জোলা মসলিন বুনিত? ঢাকার তাঁতি ঢাকাই বস্ত্র বয়ন করিত? দুই শত বৎসরের দৈন্যও যে শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার কারু-শিল্পের সৌকর্য্য সংহার করিতে পারে নাই, সেই শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার প্রতিষ্ঠা কি শূন্য উদরে হইয়াছিল? খাদ্যাভাব ছিল না; থাকিবার কথাও নহে। উপেক্ষিতা পল্লী খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ। সেখানেও ঐ লেখা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসর কাল "পল্লী চলো" করিতে হইবে। পতিত জমি উদ্ধার, এঁদো পুষ্করিণী সংস্কার, জঙ্গল পরিষ্কার—ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। ব্রজে একদিন কানু ছাড়া কথা ছিল না; আজ বাঙ্গলা দেশে পাঁচ বৎসর ছাড়া কথা নাই। সবাই বলে, পাঁচ বৎসর। অত্যুৎসাহী ছেলের দল যাত্রার দল গড়িয়াছে—যাত্রার পালার নাম দিয়াছে, পাঁচ বৎসর। গান বাঁধিয়াছে,

পাঁচ বৎসর। পাঁচ বৎসর, পাঁচ বৎসর ধরে যাহারা বড় বেশী মাতিয়া উঠিল, লোকে তাহাদের পিতৃমাতৃদত্ত নাম বিস্মৃত হইয়া পাঁচ বছুরে দাদা কাকা বানাইয়া দিল। রসিকতা আরও কত নীচে নামিল শুনিবেন? নলিন দাশের বুধি গায়ের সদ্যঃপ্রসূত এঁড়ে বাছুর মা মা রবে ক্ষেত খামার গ্রাম লাফালাফি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া নলিন দাশের বৃদ্ধ পিতা কহিলেন, বেটা যেন পাঁচ বছুরে এঁড়ে রে! সেই পুং বৎস বড় হইল, অস্ত্রোপচার বরদাস্ত করিল, লাঙ্গল চষিল, সারের গাড়ী বহিল, মই টানিল, শস্য 'মাড়াইল' কিন্তু দুর্নামটা ঘুচাইতে পারিল না। পান হইতে চূণ খসিবামাত্র যেই কেন অপরাধ করিয়া থাকুন না দুরন্ত ও দামাল্ পাঁচ বছরের রাশ নাম ধরিয়া টানাটানি চলিত। মধুমতী মাইতি কোন্ সৌখীন নগর-নগরী হইতে লোভনীয় বেণী বন্ধন শিখিয়া আসিয়াছে—তাহাতে সময় লাগে সামান্য, শোভা বৃদ্ধি হয় অসামান্য, দশখানা গ্রামে বার্ত্তা রটিল পাঁচ বৎসরী খোঁপা দেখিতে চাও ত মধুমতীর শরণ লও। হাতিকান্দা রুকুশপুরের দো-সীমানার সাতার বিঘা জলকরের কচুরীপানার বিরুদ্ধে যেদিন দু'টি গ্রামের আবালবৃদ্ধ-যুবা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া একদিনে 'ডানকার্ক' করিয়া ফেলিয়াছিল, সেইদিন দশখানা গ্রামের লোককে ডাকিয়া হাঁকিয়া পাঁচ বৎসরের মর্য্যাদাটাও বুঝাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, পাঁচ বৎসর মস্ত লম্বা সময়, তাহাতেও যদি না পারি, তবে আর এ কাঠামোয় পারিলাম না!

আমাদের সমস্যা, শ্রমিক অসন্তোষ। তাহারই ফলে, উৎপাদন হ্রাস। কারখানার প্রাচীরে লেখা, পাঁচ বৎসর, প্রত্যেকটি কলের গায়ে খোদা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর; ভোঁ বাজে, বলে পাঁচ বৎসর। মালিকে-শ্রমিকে চুক্তি পাঁচ বৎসরের। পাঁচ বৎসর পরে বোঝা-পড়া, পাঁচ বৎসর পরে, হিসাব নিকাশ—কৈফিয়ৎ টানা।

ক্ষেত্রে কৃষক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—পাঁচ বৎসর কাল নিজেও বিশ্রাম করিবে না, জমিকেও বিশ্রাম দিবে না; সে দেখিতে চাহে, বসুমতী কত ধন উৎপাদন করিতে পারেন! খনির মজুর দিব্বিদিলেসা গালিয়াছে, পাঁচ বৎসরে খনি উজাড় করিয়া ফেলিবে! রেলের কর্ম্মচারী কড়ার করিয়াছে, পাঁচ বৎসর গাড়ির চাকা সে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণিত রাখিবে। মৎস্যজীবীর প্রতিজ্ঞা, পাঁচ বৎসর নদী নালা ছাঁকিয়া তুলিবে।

লোকে ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবার অবসর পায় না—সকলেই বলে, সবুর। পাঁচটা বৎসর বৈ ত নয়! বুড়া বুড়ীরা তীর্থ ধর্ম্মে বাহির হইতে চাহে না—বলে, না-হয় পাঁচ বৎসর পরেই যাইব! বিষয় আসয় লইয়া মামলা মোকর্দ্দমার ফুর্সৎ মিলে না—বলে, পাঁচ বৎসর পরে করিব। সকলের মুখে এক কথা—পাঁচ বৎসর!

পাঁচ বৎসরে দেশ শিক্ষকে ভরিয়া গেল; পাঁচ বৎসরে দেশ চিকিৎসকে ভরিয়া গেল; শুশ্রূষাকারিণীর অভাব ঘুচিয়া গেল। লৌহ এত উৎপন্ন হইয়াছে যে, কাজ না বাড়াইতে পারিলে স্থানাভাব। কয়লা এত উঠিয়াছে কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি না পাইলে, বিপদ। আমেরিকা আর্জ্জেণ্টিন পাট কিনিয়া কুলাইতে পারিতেছে না। কিন্তু তখনও নগর নামাবলী পরিয়া বসিয়া আছে—পাঁচ বৎসর! কারখানার বাঁশী তখনও ফুকারিতেছে—পাঁচ বৎসর। পল্লীগ্রামের কৃষক পাঁজি-পুঁথীর খবর রাখে না, তখনও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে, মগজের মধ্যে ঘুরিতেছে, পাঁচ বৎসর।

রাজমহল

শ্রীলীলাময় দে

গিরি-গঙ্গার উপকূল ঘিরে
সেথায় অতীত যুগে
উঠেছিল গড়ে বিশাল বিরাট
বাংলার রাজধানী,
এখন সেথায় পরম আরামে
হীনবীর্য্যেরা সুখে
কাটাতেছে কাল অতীতের ঘরে
স্মৃতি-যবনিকা টানি।

বাঙালীর শ্রেয় শেস স্বাধীনতা
'উদয়নালা'র জলে
চিরতরে হায় ধুয়ে মুছে গেল
নামিল সূর্য্য পাটে!
বঙ্গজননী আজিও কাঁদিছে
সেই বন্ধন তলে
মুক্তি কোথায়? মুক্তি বিকালো
জীবনের এই বাটে।

'সাহ-সুজা' হেথা শাসন দণ্ডে
শাসিল বঙ্গ দেশ
মীর-কাশিমের নবাবী আমল
লুটালো ধূলার পরে
বর্গী সেনা বীর পদভরে
ইহারই অঙ্কে শেষ
বাঙালীর বীর-কাব্য-গাঁথা
এঁকে দিল থরে থরে।

সেই সে স্বাধীন চির পুরাতন
'রাজমহলের' বুকে
খনে খনে জাগে দারুণ বিষাদ
অশ্রু সলিলে ভাসি।
স্মৃতি-প্রবাহিনী বহিয়া চলেছে
রিক্ততা ভরা দুখে
কুলু কুলু তান ওঠে নাকো আর
তরংগে উদ্ভাসি।

এরই প্রান্তর জুড়িয়া জুড়িয়া
বাংলার ইতিকথা
কত না রূপেতে উঠেছে গড়িয়া
মানব মনের ত্রাস!
মোগল যুগের নবাবী যুগের
যত গৌরব গাঁথা
ভগ্ন প্রাসাদে ইটের পাঁজরে
ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।

ক্রূর কৃতঘ্ন মিরণের সেই
বুক ফাটা হাহাকার
কবরের বুকে কেঁপে কেঁপে ওঠে
মিলায় মাটির তলে:
আজও শোনা যায় 'বেগম মহলে'
বীভৎস চীৎকার
কা'রা যেন ব'সে নীরবে নিশীথে
ভাসিছে অশ্রুজলে।

মানসিংহের হতমান বুকে
সিংহদালান কাঁদে
নবাবী আমল ভরিয়া উঠেছে
জংগলে জংগলে;
বেগম সরসী শুকায়ে গিয়াছে
প্রখর সূর্য্য তাতে
'রাজমহলের' রাজারা ম'রেছে
তি কাঁদে কংকালে।

সংস্কৃতি ও সংস্কার

অধ্যাপক শ্রীজানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য এম-এ, পিএচ্-ডি

(২)

আমরা যদি কোন বৈদেশিক কৃষ্টি বলপূর্ব্বক ভারতের সমাজে বসাইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। প্রাচীন সংস্কারের স্তূপ আমাদের মজ্জাগত। নূতন শিক্ষাদীক্ষা বিপরীত সংস্কার সৃষ্টি করিবে। এই দুই বিপরীতমুখী সংস্কারের অন্তর্দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য। এই অন্তর দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিও হইবে জনসমাজে। প্রাচীন-পন্থী ও নবীনপন্থীর মধ্যে ঘোরতর বিরোধ সৃষ্টি হইবে। কবি মধুসূদনের দৃষ্টান্ত আমরা অনুসরণ করিব। কবিবর বিদেশিনী ধাত্রী মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া গেলেন। কেন গেলেন? প্রাচীন সংস্কারই প্রবলতর বলিয়া নয় কি?

প্রাচীনের পরিবর্ত্তে নবীনকে অধিক ভালবাসার পূর্ব্বে এই দুইটী কৃষ্টির পরস্পর তুলনা আবশ্যক, কারণ অন্ধ অনুকরণ কোন পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। এই তুলনা করিতে হইলেও প্রাচীনের জ্ঞান প্রয়োজনীয়। এই অবস্থায় আমরা কোন মতেই প্রাচীনকে ত্যাগ করিতে পারি না, বরং স্বাধীন ও নির্ভীক দৃষ্টিতে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের আলোচনা করিবার এই প্রকৃত অবসর।

বাংলা ভাষা প্রাদেশিক ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও এখনও পূর্ণাবয়ব হয় নাই। ইহাকে আরও উন্নত করিতে হইবে। প্রাচীন সাহিত্যের ও বিদেশী সাহিত্যের বহু গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধতর করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় দর্শনশাস্ত্র লিখিতে হইবে। দর্শনের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। এই পরিভাষার উৎস সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। বাংলা ভাষায় মনস্তত্ত্বের গ্রন্থ লিখিতে হইবে। সংস্কৃত রসশাস্ত্রের আলোচনা না করিলে আমরা চিন্তার ধারার কোন সন্ধানই পাইব না। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে পরিভাষা আহরণ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত ভাষা এখনও অনেক কাল ধরিয়া বাংলা ভাষার মহাজনের কাজ করিবে। বিদেশী শব্দ অপরিহার্য্য না হইলে বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করা অন্যায়। এইরূপভাবে উচ্ছৃঙ্খল ঋণগ্রহণ কেবল সুধীসমাজের অজ্ঞতার পরিচায়ক। অতএব বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত সাহিত্য সেবা নিতান্ত আবশ্যক।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ এখনও অতি শিশু। ব্যাকরণের দর্শন এখনও গড়িয়া উঠে নাই। পদ ও বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের রীতি আয়ত্ত করিতে হইবে। ভাষার প্রাণ ইহার অর্থসম্পৎ। এই প্রাণশক্তির স্ফুরণ নির্ভর করে ব্যাকরণের দর্শনের উপর। এক কথায় বাংলা ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠাই এখনও হয় নাই। এ কার্য্যটী করিতে পারেন একমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত ও বিচক্ষণ সমালোচক। এই অবস্থায় সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বৈরাগ্য ও অনাদর বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটাইবে।

হিন্দু রাজশক্তির অভাবে হিন্দুর সমাজের অভিব্যক্তি হইয়াছে অসম্পূর্ণ। প্রাচীন হিন্দু সমাজে ও চিন্তা জগতে নানা সঙ্ঘাতের পরে আমরা জাতীয় জীবনে সুচারু সমন্বয় আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণে আমাদের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। এখন আমরা নূতন পরিবেশের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন আমাদের জাতীয় জীবনের গন্তব্য স্থল অর্থাৎ আদর্শ নিরূপণ করিতে হইবে এবং ইহজগতে স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিবার উপায়ও আয়ত্ত করিতে হইবে। এক কথায় বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার অভিশাপ দূরে পরিহার করিতে হইবে। দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে এবং ধর্ম্ম ও নীতি-জীবনের ভিতর দিয়া সেই নূতন সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইবে। সাহিত্য, শিল্প, স্মৃতি, সঙ্গীত প্রভৃতির ভিতর দিয়া এই নূতন সত্যকে রূপ দিতে হইবে। কিন্তু এই সত্যকে প্রাচীন সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বলিয়া দেখাইতে হইবে। সংস্কৃতি নদীর মত নিত্য প্রবহনশীল। উৎপত্তি স্থলের সহিত নিঃসম্বন্ধ হইলে নদী শুকাইয়া যায়। সংস্কৃতি ও অতীতকে বহন করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সেই অতীতের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইলে সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়। এই জন্যই প্রাচীন শিক্ষাকে জীবিত রাখিতে হইবে। প্রাচীনের বর্ত্তমানের সহিত যোগ স্থাপন করিতে হইবে। এই যোগ স্থাপন হইবে বাংলা ভাষার সাহায্যে।

এখন অনেকে আশঙ্কা করেন যে প্রাচীন আদর্শগুলি বর্ত্তমান সমাজে অচল। তাঁহাদের আশঙ্কা অমূলক, কারণ মহাত্মা গান্ধীর জীবন এই আশঙ্কার জীবন্ত প্রত্যুত্তর। বুদ্ধদেবের অহিংসা মন্ত্র যে মৃত হয় নাই তাহা মহাত্মাজী দেখান নাই কি? প্রাচীন উপনিষদের সত্য মন্ত্রের মহিমা যে অপূর্ব্ব তাহা প্রমাণিত হয় নাই কি? ব্রিটিশ শঠ রাজনীতি-বিদদের ছলনার মুখোস সত্যের আলোকে ধরা পড়িয়াছে কিনা? ব্রহ্মচর্য্যের অসীম বল এখন স্থূল প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। মৌনব্রত ভণ্ডের ধর্ম্ম নয়। উপবাস অন্ধ সংস্কার নয়। আহার বিহার প্রভৃতির সংযম অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়, বরং অপূর্ব্ব শক্তিরই উৎস। প্রেম কাপুরুষের ধর্ম্ম নয়, বরং ঠিক্ বিপরীতের ধর্ম্ম অর্থাৎ বীরের ধর্ম্ম। আদর্শনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, চরিত্রের দৃঢ়তা, ক্ষমা, ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরে অচল বিশ্বাস প্রভৃতি প্রাচীন সত্যসমূহ মহাত্মা গান্ধীকে আধাররূপে পাইয়া আপনাদের অবিনশ্বরতা প্রমাণ করিতেছে এই যুগে।

কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর নয় এবং বাঞ্ছনীয় নয়। কেবলমাত্র বিজ্ঞান চর্চ্চায় দেশের লোকের সকল ক্ষুধা মিটিতে পারে না। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, স্মৃতি, ধর্ম্ম প্রভৃতির শিক্ষাও অবিসংবাদিতভাবে প্রয়োজনীয়। শহরের

শিক্ষা হয় এক ধরণের, আর পল্লীর শিক্ষা হয় আর এক ধরণের। পল্লী-সমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের ও আচার ব্যবহারের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এই সমাজ সংস্কৃতজ্ঞদের দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত। আমাদের মনে হয়, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া চতুষ্পাঠীর সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। চতুষ্পাঠীর সহিত বর্ত্তমান অশিক্ষিত সমাজের ঘনিষ্ঠতা থাকিয়াও প্রাণের যোগ নাই। অশিক্ষিতদের এই বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু শিখিবার সুযোগ নাই। এই সুযোগ না থাকায় তাহাদের শাস্ত্রের প্রতি ভয় জন্মিয়াছে। ইহার ফলে সাধারণ লোক পণ্ডিতদের নিকট কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ লন্ কিন্তু শাস্ত্রকে ভয় করেন। সংস্কৃতে শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিদের পল্লীর জনসাধারণের সহিত নিত্য সাহচর্য্য ও নিকটতর সম্পর্ক আছে। এই সকল লোকদিগকে পল্লী সংস্কারে লাগাইতে হইবে। আমাদের পরিকল্পনা গৃহীত হইলে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে অভিযান সম্ভবপর হইবে।

ইহার ফলে অতীত ও বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। এইভাবে চলিলে জাতীয় জীবনে আবশ্যক মত সংস্কার সাধনের পথ সহজ হইবে। জাতীয় দুর্দ্দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দল অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রাচীন সংস্কৃতিকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে তাঁহারা সানন্দে জাতির কল্যাণসাধনে জ্ঞানের প্রদীপ হস্তে উপেক্ষিত পল্লী সমাজকে পথ দেখাইতে কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।

এই সকল চতুষ্পাঠী বর্ত্তমান স্কুল ও কলেজের মত হইবে। একজন অধ্যাপক সমস্ত বিষয় পড়াইতে পারিবেন না। ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক থাকিবেন। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি সেই বিষয় পড়াইবেন। প্রত্যেক জিলায় অনেকগুলি এরূপ সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এই বিদ্যালয়সমূহ গ্রামে স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এইখানেই বাস করিবেন। এই সকল বিদ্যালয়ে সর্ব্বশ্রেণীর ছাত্র পড়িতে পারিবে। প্রত্যেক সংস্কৃত বিদ্যালয় গৃহটী সাধারণ পল্লীর গৃহের মত হইবে, কোন আড়ম্বর থাকিবে না। ছাত্রাবাস ও অধ্যাপকদিগের বাসস্থান বিদ্যালয়ের সংলগ্ন হইবে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের এই স্থানে বাস করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সহিত কবিরাজি চিকিৎসালয় সংলগ্ন থাকিবে। দেশীয় মতে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকিবে। এই সকল কবিরাজেরা রক্ত প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে ও ইনজেকসন্ দিতে জানিবেন এবং ধাত্রী বিদ্যার সহিতও পরিচিত হইবেন। পশু চিকিৎসায় (দেশীয় মতে) বিশেষজ্ঞ একজন থাকিবেন। যশোহর জিলায় এরূপ লোক পাওয়া যায়।

ছাত্রেরা নিজেদের উপযোগী শাক, সব্জি ও ফল, মূল প্রভৃতি উৎপাদন করিবে (অভিজ্ঞ অধ্যাপকের মতে)। ছাত্রেরা আপনাদের বস্ত্র বয়ন করিবে। ধানের জমিতে চাষীরা চাষ করিবে এবং ছাত্রেরা কৃষি-শিক্ষকের উপদেশানুসারে 'সার' দিবার ব্যবস্থা করিবে। পানীয় জলের জন্য পুষ্করিণী অথবা প্রশস্ত কূপ থাকিবে। ছাত্রেরা ইহার পরিচ্ছন্নতার প্রতি সবত্ন দৃষ্টি রাখিবে। স্নানের জন্য পৃথক্ পুষ্করিণী থাকিবে (নদী না থাকিলে)। নদীর সংস্কারের ভার লইতে হইবে এই বিদ্যালয়কে। পুষ্করিণীতে ছাত্রেরা মাছের চাষ করিবে এবং ছাত্রাবাসের মাছ যাহাতে নিজেরাই সংগ্রহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। ছাত্রেরা গরু, ছাগল ও হাঁস পুষিবে। পুষ্টিকর খাদ্যের কোনই অভাব হইবে না। ছাত্রাবাসের জন্য ভৃত্য অথবা পাচক অল্পসংখ্যক থাকিবে, কারণ ছাত্রদের প্রথম হইতেই স্বাবলম্বন শিক্ষা দিতে হইবে। এই সকল ছাত্রদের মধ্যে যাহারা গীত বাদ্য অভিনয় প্রভৃতি শিখিবে তাহারা বিভিন্ন গ্রামে অভিনয় করিয়া অথবা মিছিল বাহির করিয়া গ্রামবাসীদের শিক্ষা দিবে। ছায়া-চিত্রের সাহায্যে ছাত্রেরা অশিক্ষিত গ্রামবাসীকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবে। এই ভাবে আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিবে এবং শিক্ষার অনুকূলে ব্যাপকভাবে জনমত সৃষ্টি হইবে।

উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা করিবে এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। চাষীদের সঙ্গে মিলিয়া ছাত্রেরা সাধারণ জনহিতকর কার্য্য করিবে।

প্রথম পরীক্ষার্থি-ছাত্রদের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত ভাষা বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে না তাহাদের স্বল্প বেতন দিতে হইবে এবং ছাত্রাবাসের ব্যয় বহন করিতে হইবে। মধ্যম ও উপাধির ছাত্রদের কোন বেতন লাগিবে না।

প্রথমে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। শিক্ষকদের বেতন অল্প হইলে চলিবে, কারণ তাঁহাদের ব্যয় অধিক হইবে না (তাঁহারা সপরিবারে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান পাইবেন।) মফঃস্বল সহরের বাহিরে একটী বড় বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে হইবে সেখানে উপাধির ছাত্রদের পড়ান হইবে। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে উপাধি পড়ান সম্ভবপর নয়, কারণ বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে না। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রদের জন্য গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে বর্ত্তমান সংস্কৃত কলেজে। এই ভাবে শিক্ষিত ছাত্ররা শিক্ষা জগতে ও সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্ত্তন আনিবে।

উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা ইচ্ছা করিলে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। ইঁহারা রাষ্ট্রের কাজেরও উপযুক্ত হইবেন। দেশের প্রগতির ইঁহারা অগ্রদূতও হইতে পারিবেন। সংস্কৃত পুঁথিসমূহের সংস্কার ও বিশদ সূচি পত্র করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই কাজ সুচারুরূপে করিতে পারিবেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইবে। এই কাজে ইঁহাদেরই অধিকার। বিভিন্ন দেশে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন কৃষ্টি প্রচার করিতে হইবে। সে কাজেও ইঁহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। মনঃ শিক্ষায় যাঁহারা পারদর্শী হইবেন তাঁহারা জগতের পরম হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিচিত হইবেন। ছায়া-চিত্রের সাহায্যে অল্প শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নরনারীর শিক্ষা দিবেন এই কৃতী ছাত্রের দল। নূতন ধরণের যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করিয়া পল্লী সমাজকে উৎসব-মুখর করিয়া ইঁহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। বিদেশীয়

দর্শনের, ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহার, ভিন্ন ধর্মের ও সঙ্কীর্ণ নীতির সমালোচনা করিবার প্রকৃতপক্ষে যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাবান পণ্ডিত ব্যক্তিরা। সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক জগতে বিপ্লব আনিবেন ইঁহারাই। শান্ত, ধীর ও মেধাবী ছাত্রেরা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবেন। যে সব ছাত্রেরা দেশসেবা করিতে চাহেন তাঁহারাও তাহা করিতে পারিবেন, কারণ ছাত্র জীবন হইতে তাঁহারা কৃষকদের সহিত পরিচিত এবং পল্লীর হিতৈষী বন্ধু রূপে পরিজ্ঞাত। এই শিক্ষায় শিক্ষিত নারীরাও স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইবেন। সমাজ ও দেশ সেবার সুযোগ তাঁহারাও পাইবেন। এই শিক্ষার ফলে সমাজে নূতন কর্ম-শক্তির প্রবাহ বহিবে। ভারতীয় সমাজে এই শিক্ষার পরিবর্ত্তন আনিবে। সমাজের (জনসাধারণের) কল্যাণ সাধন করিবে এই শিক্ষা। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই শিক্ষার জাতীয় জীবনের লক্ষ্যস্থল। এই মহৎ কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিবেন এই সংস্কৃতের কৃতী ছাত্রদল।

বর্ত্তমানে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িতে ১০+৪=১৪ বৎসর লাগে।

আমাদের এই পরীক্ষায় উপাধি লাভ করিতে ৫+৪+৬=১৫ বৎসর লাগিবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ইংরাজ ভারত ছাড়িল কেন ?

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এস্‌সি

অধ্যাপক রমেশ মজুমদার মহাশয়ের ভারতবর্ষে (মাঘ, ১৩৫৪) প্রকাশিত সুলিখিত ও সুচিন্তিত প্রবন্ধটির পরে নিম্নাংশ যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে আর পূর্ব্বের মত একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। ভারতে এত লোক বাড়িয়াছে যে উহা হইতে আর ইংলণ্ডে খাদ্য প্রেরণ করা সম্ভব নহে। বরং দুর্ভিক্ষে লোক মরিলে বিশ্বজনের নিকট নিন্দা ভাজন হইতে হয়।

ইংরাজের যে আর্থিক দুর্গতি হইয়াছে তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে বিবিধ ইন্‌ডাষ্ট্রিতে অনেক লোক প্রয়োজন। যুদ্ধে যে সকল লোক লিপ্ত থাকে তাহারা দ্রব্যোৎপাদন কার্য্য করে না, দ্রব্যক্ষয়ই করে। বর্ত্তমানে ইংরাজকে বহু সৈন্য ইউরোপে রাখিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করায় বহু লোক ইন্‌ডাষ্ট্রিতে যোগ দিয়া দেশের অর্থোৎপাদন কার্য্য করিবে।

ভারতে বস্ত্রশিল্প দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের বস্ত্র শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নহে। চীন দেশ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ঐ দুই দেশ দ্রুত ইনডাষ্ট্রিয়ালাইজড হইবে। উহাদের বস্ত্রশিল্প পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে আরও ২০।২৫ বৎসর সময় লাগিবে। ইংলণ্ড এই সময় যন্ত্র বিক্রয় করিয়া প্রভূত লাভ করিবে এবং নিজের আর্থিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবে।

সমস্ত ইউরোপ ইংলণ্ডের অপেক্ষা অধিকতর যুদ্ধবিধ্বস্ত বলিয়া ইংলণ্ড ঐ সকল দেশের সহিত ব্যবসায় করিয়া এবং ঐ সকল দেশের পূর্ব্ব ব্যবসায়-কেন্দ্র অধিকার করিয়া লাভবান হইবে। এই জন্যই ইংলণ্ডের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প রাষ্ট্রাধীন হইয়াছে।

তা ছাড়া এ যুদ্ধে ইংলণ্ডের আফ্রিকায় যথেষ্ট শিল্প দ্রব্য প্রাপ্তি ও প্রচুর শিল্প দ্রব্য বিক্রয় স্থান লাভ হইয়াছে।

ভারতকে পরাধীন রাখিলে উহা ক্রমশ রাশিয়ার আওতায় আসিবে, এই সম্ভাবনাও ইংরাজের ভারত ত্যাগের অন্যতম কারণ।

মজুমদার মহাশয় ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্যের জন্য যে তিন জনের নাম (মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, হিটলার) করিয়াছেন তাহার সহ আমি আর দুইটি নাম যোগ দিই।

তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বৈপ্লবিক ভারতীয়গণের মধ্যে তিলক আদি পুরুষ, অরবিন্দ মধ্য ও সুভাষ উত্তর পুরুষ। বৈপ্লবিকগণের কার্য্য লোকলোচনের অন্তরালে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা ততটা খ্যাতি লাভ করেন নাই।

স্বাধীনতার পক্ষে হিন্দুমহাসভার সাহায্য নিতান্ত সামান্য নহে। যুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে ইংরাজের সাহায্যার্থ যুদ্ধে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাবারকার, মুঞ্জে, শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি হিন্দুসভার নেতৃবৃন্দ হিন্দু-জনসাধারণকে যুদ্ধে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিলেন জার্ম্মানি আমাদের শত্রু নহে, জাপান আমাদের শত্রু নহে, কিন্তু আমরা ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিব—আমরা ইংরাজের ভক্ত বলিয়া নয়, যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া। যে কারণেই হউক হিন্দুরা যুদ্ধে দলে দলে যোগ দেয়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় সৈন্য দলে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় খুব বেশী ছিল না, কিন্তু যুদ্ধের পরে খুব বেশী হইয়াছে। কংগ্রেসী মতানুসারে যদি হিন্দুরা যুদ্ধে যোগ না দিত—শুধু মুসলমানরাই দিত তাহা হইলে মুসলমান সৈন্যসংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিকই হইয়া যাইত। এই দুর্দ্দিনে ঐ অবস্থা যুক্ত ভারতের পক্ষে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

শান্ত উপায় (non-violence) দ্বারা যে রাজ্যশাসন চলে না তাহা প্রমাণ হইয়াছে। কোনও সম্পূর্ণীকৃত শান্ত উপায়ের কৌশল (technique of non-violence) যে আবিষ্কার হইয়াছে তাহার আমরা এ যাবৎ কাল কোনও প্রমাণ পাই নাই। কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে হিন্দু শিখের আক্রমণ হইতে মুসলমানকে রক্ষা করিতে, কাশ্মীর বা জুনাগড় রক্ষা করিতে অশান্ত উপায়ই (violence) অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন ৪ঠা মে। ঘুম থেকে উঠতে বেশ একটু বেলা হল, প্রাতের আহার সেরে চিঠি লিখতে বসলাম। তারপর একটু বেলায় রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে দেখি দলে দলে শিশুদের ঠেলাগাড়ী চলেছে। শিশুদের দেখে বয়স বোঝা যায় না—যেমন মোটা তেমনই বড়সড়। এদেশের শিশুর ওজন আমাদের দেশের প্রায় দ্বিগুণ। সুইডিশদের স্বাস্থ্যও ভালো, আয়ুও খুব বেশী, ৮০।৮৫ বৎসর বয়সের নরনারী রাস্তায় অনেক দেখা যায়, তখনও তারা বেশ কার্য্যক্ষম থাকে।

সুইডেনের অতি আধুনিক হাসপাতাল

উনি বল্লেন—গতকাল হাসপাতালে একজন রোগী এসেছিল—বয়স ১০৫ বৎসর মাত্র।

আমরা বেড়িয়ে হোটেলে ফিরলাম। রাত্রে অপেরায় গেলাম। জাঁকজমকের ঘটা দেখে চমক লাগে, প্রকাণ্ড বড় ষ্টেজ, অদ্ভুত দৃশ্যপট, দৃশ্য পরিবর্ত্তনের কায়দাই এক আশ্চর্য্য রকমের। অনেক রাতে ফিরলাম।

৫ই মে। আজ সকালে এক জার্ণালিষ্টের পাল্লায় পড়লাম, তারা ছবি নিতে চায়, আপ্যায়িতের অন্ত নেই। খুকু বল্লে—"বাবা কাগজে তো তোমার কপালে টিপ দিয়েছে, যদি বইতেও দেয়"। সুতরাং ছবি তোলার আগে ঐ টিপের কথা বলে দিলাম, ছবি তোলা হল, তারপর আমরা

ষ্টকহলম—লেকের ধার

তাদের সাথে এখানকার Skanson দেখতে গেলাম। সেখানে বরফের দেশের সাদা লোমে ঢাকা ভালুক ও জলের মধ্যে নীলে মাছ দেখে খুকু লাফিয়ে উঠলো, বল্লো, ঠাণ্ডা দেশের আরো কয়েকটা জীবজন্তুও দেখলাম। অল্প উচু ছোট একটি পাহাড়ের চূড়ায় এই Skanson অবস্থিত। এখান থেকে সহরের দৃশ্য ছবির মত দেখায়। বহু প্রাচীন কয়েকটি সুইডিশ কটেজও এখানে স্মৃতিস্বরূপ রাখা হয়েছে। তার ভিতর রয়েছে তখনকার লোকেদের ব্যবহারের জিনিষপত্তর, তখনকার পোষাক, গহনা ও আসবাবে বেশ সূক্ষ্ম কাজকরা রয়েছে। যুদ্ধের জন্য পিতলের বর্ম্ম ও আরো নানা রকম সাজসজ্জাও ব্যবহার করা হত। মোট কথা—দেখা যায় সুইডিশ সভ্যতা আজকের নতুন নয়। কালের

ষ্টকহল্‌ম—সাধারণ উদ্যান

ষ্টকহল্‌মের বিখ্যাত রেডিয়ম হাসপাতাল

স্রোতে কি ভাবে কোথায় ভেসে গিয়েছিল জানা নেই, আজ আবার নূতন করে সব গড়ে উঠেছে। আমরা পাহাড়ের ধারে বেড়িয়ে একটু পরেই ফিরে এলাম। আজ রাতে প্রফেসার Bervanda-র বাড়ী নিমন্ত্রণ। আমরা ৭টায় সেখানে উপস্থিত হলাম, হ্রদের ধারে ছোট একটি ফ্ল্যাটে তিনিও তাঁর স্ত্রী থাকেন, জায়গাটি অতি সুন্দর। প্রফেসারের স্ত্রী সুন্দর পিয়ানো বাজালেন; বড় ভালো মানুষ; আমাদের খুবই আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। আমরা খেয়ে অল্পক্ষণ গল্প-স্বল্প করে হোটেলে ফিরলাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি—আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, হ্রদের জলে রূপালী রং ঝকমক করছে; ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ায় বেশীক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। গাড়ীতে করে হোটেলে ফিরে গেলাম।

৬ই ও ৭ই মে আমরা সামান্য সামান্য বেড়িয়ে কাটিয়েছি। একটু ঠাণ্ডা লেগে শরীর অসুস্থ হয়েছিল। যাহোক্‌, অল্পের উপর দিয়েই গেল। আমরা মাত্র কালকের দিনটি এখানে আছি।

পরদিন ৮ই মে—আমরা সকালে গেলাম হাসপাতাল দেখতে। প্রকাণ্ড বাড়ী, ভিতরে চমৎকার ব্যবস্থা। মহিলা সেক্রেটারী আমাদের সাথে করে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন, শেষে গেলাম রান্নাবাড়ীতে। রান্নাবাড়ীটি একটি কারখানা বিশেষ, সেখানে যন্ত্রের সাহায্যে কি না হচ্ছে। ২০০০ রোগীর রান্না মাত্র কয়েকজন মিলে করছে। সেক্রেটারি মিঠাপুরী এনে আমাদের খেতে দিলেন। আমরা বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। বিকেলে একটি হোটেলের রেষ্টুরেণ্টে কয়েকজন প্রফেসার ও তাঁদের স্ত্রীদের চায়ের নিমন্ত্রণ করেছি। খুকু একটু নাচ দেখালো, খুকুর নাচ দেখে তারা ভারি খুশী। এবারকার মত সকলকার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম নিলাম। দিনের আলো এখানে রাত ১টা অবধি থাকে। শীতকালে এদেশে দিন ছোট হতে হতে প্রায় ১ ঘণ্টায় দাঁড়ায়—সূর্য্য বেলা ২টায় উঠে ৩টায় অস্ত যায়; তেমনি আবার গ্রীষ্মকালে রাত ছোট হতে হতে

প্রায় ১ঘণ্টা মাত্র অন্ধকার হয়—সূর্য্য রাত ৩টের সময় উঠে, তারপর দিন রাত ২টায় অস্ত যায়।

আমরা জানলার পরদা টেনে শুয়ে পড়লাম, তখনও দিনের আলো আকাশে রয়েছে।

পরদিন ৯ই মে, আমরা সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বাক্স গুছিয়ে নিলাম। হোটেলের হিসাব চুকিয়ে সকাল ৮টায় সময় এয়ার টারমিনালে গেলাম। ৯টার সময় A. B. A এর একটি বড় বিমানে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলাম।

মানিনী

ভাস্কর

ওগো মানিনী, অভিমানিনি!
কম্পিত অধর, ভ্রূভঙ্গী বঙ্কিম,
নাসারন্ধ্র ওঠে ফুলে ফুলে,
নয়নের কোণে শুভ্র অশ্রু ওঠে জমে
কেন? কোথায় বেজেছে বল,
বল, কখন তোমার ওই হৃদয় কোরকে
দংশন করেছে কীট।
অহর্নিশি আছ তুমি নিজেরে ডুবায়ে
আমারি সত্তার মাঝে। কেমনে পশিল
সেই নিশ্ছিদ্র স্বপন মাঝে
সংশয় কণ্টক জ্বালা?
মনে পড়ে সেই অতীত গোধূলী লগন,
প্রকৃতির মৃদু হাসি, আকাশের অলক্তক সাজ,
বনানীর স্নিগ্ধ মায়া, কুসুমের মোহ,
বিহঙ্গের চতুর কাকলী!
এসেছিল নেমে মনের প্রান্তর প্রান্তে
রঙীণ স্বপন মেঘ। বরষি অঝোরে
কল্পনার বিন্দু রাশি রাশি
এঁকেছিল মনের গহনে কত বিচিত্র
রামধনু। সেই দিন হ'তে
তোমার মায়ার ডোর
লূতাতন্তুসম জড়ায়েছে পরতে পরতে
আমার জীবনখানি
প্রভাত-অরুণ-রাগে, মধ্যাহ্নের তাপে
সায়াহ্নের প্রশান্ত আকাশে,
নিশীথের নিস্তব্ধ আঁধারে,
পূর্ণিমার শুভ্রালোকে, অমানিশা-মাঝে,
মলয় সমীরে, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায়,
প্রশান্ত সুষুপ্তি মাঝে, তীব্র অশান্ত জাগরণে,
সর্ব কর্ম, সর্ব চিন্তা, সর্বসাধনায়
রয়েছ জড়ায়ে
আপনার মায়ামোহ নিগড়ে বাঁধিয়া
এ ক্ষুদ্র হৃদয়তরী।
জীবনের যত আশা, যত তৃষা,
যত সকল প্রয়াস, যত ভ্রান্ত মরীচিকা,
দিবানিশি শ্রমক্লান্ত গভীর উদ্বেগ,
অথবা প্রসন্নচিত্তে স্বপন-আবেশ,
তোমারি মৃদুল হাস্তে মায়ার পরশে
সহনীয় বরণীয় হয়েছে জীবনে।
তুমি কি জান না সখি,
নিজেরে কি ভুলেছ এমনি?
সংসার-আবর্ত-মাঝে কণ্টকিত পথে
ছায়াসম প্রতিপদে চলেছ নির্ভয়ে
কণ্টকে কুসুম মানি'। ভুলেছ পথের ক্লান্তি,
চাও নাই কভু শ্রান্তির বিরাম।
যত ধূলি, যত ধূম, যত ক্লিন্ন আবর্জনা
দুহাতে সরায়ে মোর গমনের পথ
সরল করেছ তুমি।
জীবনের ঘূর্ণ্যাবর্তে কর্মের মন্থনে
ফেনায়ে উঠেছে যত বিষাদ-গরল,
নীলকণ্ঠসম তায় নিঃশেষে করিয়া পান
শুধুই অমৃতটুকু পরম আদরে
অধরে ধরেছ তুলি'।
কতক্ষণ রবে অভিমান;
ওই তো ললাটে দেখি
ধীরে ধীরে চক্ররেখা যায় মিলাইয়া।
ওই তো নয়নকোণে চপল চাহনি
অধরে হাসির রেখা।
ওঠ, যাও, ভুলে যাও সংশয়-কল্পনা,
আপনার স্নিগ্ধ শান্ত অমিয় পরশ
বুলাও আমার প্রাণে। হাসিয়া উঠুক
আকাশ বাতাস তোমারি হাসির ঘায়ে।
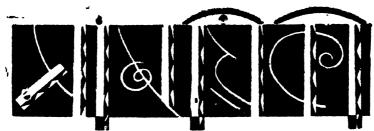
পশ্চিম বাঙ্গলা সম্প্রসারণ—

পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত বিহারের কতকগুলি বাঙলা-ভাষাভাষী অঞ্চল ও সেরাইকেলারাজ্য যোগ করিয়া দিবার জন্ম আবেদন করা হইয়াছে এবং সে বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে। সেই অঞ্চলগুলি এইরূপ—(১) সমগ্র মানভূম জেলা (২) সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমা সহ জামসেদপুর সহর ও সেরাইকেলা রাজ্য (৩) সাঁওতাল পরগণার সমগ্র জামতাড়া ও পাকুড় মহকুমা এবং দুমকা ও রাজমহল মহকুমার অধিকাংশ এবং সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমাংশ (যাহাতে মিহিজাম, মধুপুর ও দেওঘর অবস্থিত ও যাহা হাজারিবাগ জেলার সহিত সংলগ্ন), (৪) হাজারিবাগ জেলার গোলা, কাসমার ও রামগড় থানাগুলি (৫) রাঁচি জেলায় ৫ পরগণা অঞ্চল—যেখানে কুণ্ডু, বড়াণ্ডা, রাহে, তামার ও সিল্লি অবস্থিত (৬) পূর্ণিয়া জেলার মহানন্দা, মনিহারী রাস্তার পূর্ব্বস্থিত অঞ্চল। ঐ অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত যুক্ত করিবার অকাট্য যুক্তি আছে। এখন বিচার তার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার যানবাহন ব্যবস্থা—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা সহর ও সহরতলীর যানবাহনের সুব্যবস্থা করিবার জন্ম সত্বর একটি ট্রান্সপোর্ট সিণ্ডিকেট গঠন করিবেন। সিণ্ডিকেট ১ কোটি টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবে—তন্মধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ মূলধন গভর্ণমেণ্ট দিবেন—সে জন্ম ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিণ্ডিকেট নূতন ৪০০ বাস শীঘ্রই কলিকাতা ও সহরতলীর পথে চালাইতে দিবেন।

বেসরকারী একটি কমিটী ইহার পরিচালনভার প্রাপ্ত হইবে। সহর ও সহরতলীর বর্ত্তমান যানবাহন ব্যবস্থা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। কাজেই অবিলম্বে সিণ্ডিকেটের কার্য্যারম্ভ প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

মধ্যবিত্তদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ—

পশ্চিম বাংলার গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের গৃহনির্ম্মাণ বাবদ সাহায্য দানের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। কলিকাতার চারিদিকে সরকার হইতে জমী সংগ্রহ করিয়া সেই জমী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারকে দেওয়া হইবে ও তাহার উপর গৃহনির্ম্মাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে টাকা ধার দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা সত্বর কার্য্যে পরিণত হওয়া প্রয়োজন।

কর্পোরেশন সম্বন্ধে অভিযোগ—

কলিকাতা কর্পোরেশনের আলো, ড্রেন, জলসরবরাহ, ময়লা পরিষ্কার, টীকা দেওয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল অধিবাসীকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিযোগ সরাসরী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে—১নং ডিষ্ট্রিক্ট—চিফ এঞ্জিনিয়ার মিঃ ডি-এন গাঙ্গুলী। ২নং ডিষ্ট্রিক্ট—সেকেণ্ড ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এম রায়। ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট—প্রথম ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এ সত্তার। ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট—চিফ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।

রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটী—

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালচারী সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নববর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত হইয়াছেন—সভাপতি ডাঃ ডবলিউ-ডি-ওয়েষ্ট, সহসভাপতি ডাক্তার বিমলাচরণ লাহা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার উদয়চাঁদ মহাতব, ডাঃ মেঘনাদ সাহা ও সার বি-এন-মিত্র। সাধারণ সম্পাদক—ডাঃ কে-এন-বাগচী ও লাইব্রেরী সম্পাদক—ডাঃ বি-এস-গুহ।

কলিকাতা লাটপ্রাসাদে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন

ফটো—শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

যক্ষ্মা নিবারণ ব্যবস্থা—

পশ্চিম বাঙ্গালায় যক্ষ্মা নিবারণ ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত ও সুপরিচালিত করিবার জন্ত গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তি-

গণকে লইয়া একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন—সভাপতি—প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সদস্য—কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ এ-সি-উকীল, ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার ডাঃ ডি-পি-দত্ত, বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণ সমিতির সম্পাদক ডাঃ পি-কে-সেন ও যক্ষ্মা কণ্ট্রোল অফিসার ডাঃ এস-এম-মজুমদার। বাঙ্গালা দেশ যক্ষ্মা রোগে পূর্ণ হইয়াছে—রোগীদের অবিলম্বে ব্যাপকভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম—

কলিকাতায় বিরাট যাদুঘর 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম' নামে পরিচিত। আমাদের বিশ্বাস অচিরে উহার নাম পরিবর্তিত হইয়া কোন বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইবে। গত ৮ই মার্চ্চ উহার কার্য্য নির্ব্বাহকদের বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের গড়িয়াস্থিত (২৪ পরগণা) রক্ষীদল শিক্ষাকেন্দ্র

সভাপতি—সার আবদুল হালিম গজনভী, সহসভাপতি—শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার, সম্পাদক—শ্রীযুত এস-এন-বস এবং কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসি-শিবরামমূর্ত্তি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—

১৯৪৮ সালের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিম্নলিখিত-রূপ নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়, চেয়ারম্যান—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, সম্পাদক—শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীবিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীএল-পি-সুকুল, প্রমীলচন্দ্র বসু, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জীবানন্দ সাহা, ষোড়শীকুমার সরস্বতী, তিনকড়ি দত্ত ও এ-কে-রায় চৌধুরী। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের জন্য ৫টি সাব কমিটীও নির্ব্বাচিত হইয়াছে। পরিষদের সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশবাসী ও জাতীয় সরকারকে সচেতন হইতে আবেদন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধান ও গ্রামে গ্রামে নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া বর্ত্তমানে শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এই সমস্যা সম্বন্ধে

বিরাট দান—

দক্ষিণ ভারতের করাকাণ্ডি সহরের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ডক্টর আলাগাপ্পা চেটিয়ার ২১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া করাকাণ্ডি সহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ঐ কলেজের সহিত একটি ইলেক্‌ট্রো—কেমিকেল ইনিষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে ১৫ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজিকাল কলেজ, আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকনোলজিকাল কলেজ, কোচিন এর্ণাকুলামে ফার্ম্মাসিউটিকাল কলেজ, ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তামিল গবেষণা, ঠক্কর বাবা বিদ্যালয় প্রভৃতিতেও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

সিমলায় বাঙ্গালী কমিশনার—

ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স ইউনিয়নের হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিমলায় পূর্ব্ব পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্যসমূহের আঞ্চলিক কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায়ের সম্মান—

ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কলের পরিচালক বোর্ডের সভাপতি ও আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় ১৯৪৮ সালের জন্য বঙ্গীয় কাপড় কল-মালিক সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সুরেশবাবু খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

দিল্লী ক্যান্টনমেণ্টে মিলিটারী হাসপাতালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু

বাঙ্গালী সম্মানিত—

বেঙ্গল নাগপুর রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ কেম্ব্রিজ অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে বিদায় গ্রহণ করায় তাঁহার স্থানে ই-আই রেলের ডিভিসনাল সুপারিণ্টেডেণ্ট শ্রীযুক্ত পি-সি মুখোপাধ্যায় বি-এন রেলের অস্থায়ী জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর এই গৌরবে বাঙ্গালী মাত্রই সুখী হইবেন।

হাইকোর্টে নূতন বিচারপতি—

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত ডবলি-উল-এম-সি-সার্প ছুটী লওয়ায় শ্রীযুত কমলচন্দ্র চন্দ্র আই-সি-এস নূতন বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতার খ্যাতনামা এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের পৌত্র ও প্রসিদ্ধ দেশসেবক শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের অনুজ। কলিকাতা হাইকোর্টের সিভিলিয়ান জজ মিঃ এজলী ছুটী লওয়ায় খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ নূতন জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতি-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রধান অধ্যাপকের নাম "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রাজনীতি অধ্যাপক" নামকরণ করিয়া রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কম্যুনিষ্টদল বে-আইনি ঘোষিত—

গত ২৬শে মার্চ্চ পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল ও তাহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শত কম্যুনিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন—মুজঃফর আহমদ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, আবদার রাজাক খাঁ, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য জ্যোতি বসু, গোপাল হালদার, সতীশ পাকড়াশী, মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ বসু, শিশির গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন হাজরা, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন। দৈনিক স্বাধীনতা কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্টের মতে নানাস্থানে শ্রমিক চাঞ্চল্যের ফলে এরূপ করা প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাকিস্থানের ডাকমাশুল বৃদ্ধি—

কেন্দ্রীয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট ১লা এপ্রিল হইতে ভারত হইতে পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ এবং পারস্য উপসাগরের বৃটীশ পোষ্ট অফিস এজেন্সির এলাকাধীন পহরাইন, দিবা, কোয়ায়েৎ ও মস্কটে প্রেরিতব্য চিঠিপত্রাদির মাশুলের হার বিদেশী ডাকমাশুলের সমান করিয়াছেন। যথা—(ক) চিঠি—অনধিক এক আউন্স—সাড়ে তিন আনা, অতিরিক্ত প্রতি আউন্স—২ আনা (খ) মুদ্রিত কাগজ (পাকিস্থান ও ব্রহ্মে প্রেরিতব্য সংবাদপত্র ছাড়া) —প্রতি ২ আউন্স—৩ পয়সা। সংবাদপত্রের হার বর্ত্তমানের মতই থাকিবে। (গ) পোষ্ট কার্ড—২ আনা। রিপ্লাই কার্ড—৪ আনা। (ঘ) ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি—অনধিক ১০ আউন্স—সাড়ে তিন আনা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স—তিন পয়সা। (ঙ) নমুনা প্যাকেট—অনধিক ৪ আউন্স—৬ পয়সা; অতিরিক্ত প্রতি ২ আউন্স—তিন পয়সা। বিমান ডাকের হার ও ঐ দিন হইতে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে—চিঠি ও প্যাকেট প্রতি আউন্স—ছয় আনা। পোষ্ট কার্ড—প্রতিটি ৩ আনা। পাকিস্থান ও পারস্য উপসাগরস্থিত বৃটীশ পোষ্ট অফিস এজেন্সির এলাকাধীন অঞ্চলসমূহে প্রেরিতব্য পার্শ্বেলের মাশুলের হার নিম্নলিখিত রূপ হইয়াছে—পাকিস্থান অনধিক ২ পাউণ্ড ওজনের ১ টাকা ১০ আনা। অনধিক ৩ পাউণ্ড ওজনের ১ টাকা ১৫ আনা। অনধিক ৭ পাউণ্ড ওজনের ২ টাকা ৭ আনা। অনধিক ১১ পাউণ্ড ওজনের ২ টাকা ১৫ আনা —অনধিক ২২ পাউণ্ড ওজনের ৪ টাকা ১৩ আনা। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল—অনধিক ২ পাউণ্ড ১ টাকা ৪ আনা, অনধিক ৩ পাউণ্ড—২ টাকা ৪ আনা। অনধিক ১১ পাউণ্ড ৪ টাকা। অনধিক ২২ পাউণ্ড—৬ টাকা। ব্রহ্মদেশে প্রেরিতব্য পার্শ্বেলের মাশুল বাড়ে নাই।

দমদম বিমান-ঘাঁটিতে ভাইস্-চ্যান্সেলার ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিল্লী যাত্রার উদ্দেশে দমদম বিমান ঘাঁটিতে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

পূর্ব্ব পাঞ্জাবে নেতা নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি পূর্ব্ব পাঞ্জাবের ব্যবস্থা পরিষদের পন্থিক দলের

২৩ জন সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছেন। ফলে পরিষদের মোট ৭৯ জন সদস্যের সকলেই কংগ্রেস দলের লোক। গত ২৪শে মার্চ্চ বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার গোপীচাঁদ ভার্গব পুনরায় দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচনে বিরোধী দলের ২৮ জন সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেন নাই।

রাজস্থান রাজ্যমণ্ডল—

২৬শে মার্চ্চ কোটায় নিম্নলিখিত ৯টি দেশীয় রাজ্য লইয়া নূতন রাজস্থান রাজ্যমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—(১) কোটা, (২) বুন্দী, (৩) ডুনঘরপুর, (৪) ঝালোয়ার, (৫) বাসোয়ার, (৬) প্রতাপগড়, (৭) টঙ্ক, (৮) কিষেণগড় ও (৯) শাহপুরা। উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর ও বিকানীর এখনও রাজ্যমণ্ডলে যোগদান করে নাই। নূতন রাজ্যমণ্ডলের আয়তন ১৬ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২৩ লক্ষ ও বার্ষিক আয় প্রায় ২ কোটি টাকা।

দিল্লী ক্যাণ্টনমেণ্টে মিলিটারী হাসপাতালে উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট সামরিক কর্মীদের পত্নীগণ কর্তৃক জম্মু ও কাশ্মীরের উপদ্রুত এলাকা হইতে আগত আহত ব্যক্তিদের সমাচার সংগ্রহ

পরলোকে বেণীমাধব বড়ুয়া—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া গত ২৪শে মার্চ্চ বুধবার ৫৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে তাঁহার জন্ম হয়—১৯১৩ সালে এম-এ পাশ করিয়া ১৯১৪ সালে সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন। ১৯১৭ সালে ফিরিয়া ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে তিনি পালি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বক্তৃতা দানের জন্য সিংহলে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন বাতিল—

গত ২৪শে মার্চ্চ হইতে এক বৎসরের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার বিশেষ আইন করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই এক বৎসরকাল নির্ব্বাচিত কাউন্সিলারগণের দ্বারা কর্পোরেশন পরিচালিত হইবে না। সরকার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান ও গভর্ণরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত এস-এন-রায়কে কর্পোরেশনের পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় শাসন-ভার গ্রহণের পর হইতেই সকল বিভাগের কার্য্যে তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী—

গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র, ডাক্তার হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তকুমার দাস, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ, শ্রীভুবনানন্দ দাস ও শ্রীরামনারায়ণ সিং—৮ জনে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আবেদন জানাইয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও পুনর্বসতি মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র

নিয়োগীর নিকট এক পত্র দিয়াছেন। পত্রে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কুচবিহার ও ত্রিপুরারাজ্যে পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে পুনর্বসতি সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা দিতে বলা হইয়াছে। পশ্চিম পাঞ্জাব সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধেও সেরূপ ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে গ্রাম-রক্ষী সেবক-বাহিনী—

পশ্চিম বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করিয়াছেন যে 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' নামে গ্রাম রক্ষী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের জন্য গভর্ণমেণ্ট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। সীমান্তের ৩৩০টি গ্রামের প্রত্যেকটি হইতে ২০ জন পল্লীবাসীকে উক্ত বাহিনাতে গ্রহণ করা হইবে। পল্লীবাসীদিগকে ট্রেণিং দিবার জন্য ১০০ শিক্ষক শিক্ষালাভ করিতেছেন। ১ বৎসরে ৬ হাজার পল্লীবাসী ট্রেণিং লাভ করিবে। বাহিনী গঠিত হইলে তাহা জরুরী কার্য্যের সময় পুলিসকে সাহায্য করিবে। অস্ত্র পাওয়া গেলে বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে একটি করিয়া রাইফেল দেওয়া হইবে। স্কুল ও কলেজ হইতে ৫ শত ছাত্রকেও ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী হিন্দুদের সমস্যা—

সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু হিতসাধন সমিতির একজন প্রতিনিধি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও পুনর্বসতি সচিব শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর সহিত দেখা
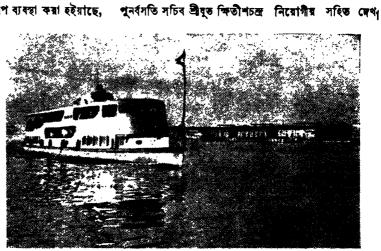
মস্কো ভল্গা ক্যানেলের একাংশ—খিমকী লেকে ভাসমান জাহাজ 'মলকভ'

মস্কো ভল্গা ক্যানেলের দশম বার্ষিকী অনুষ্ঠান। ভল্গা ক্যানেলের কৃত্রিম হ্রদ খিমকীর তীরস্থিত বন্দর

করিয়া নিম্নলিখিত দাবীগুলি উপস্থিত করিয়াছেন—(১) সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগের তথ্যানুসন্ধানের একটি শাখা অবিলম্বে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা (২) কেন্দ্রীয় সরকারের

সাহায্য ও পুনর্বসতি ব্যবস্থাদির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সহ পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের রেজিষ্ট্রেসন ব্যবস্থা (৪) কেন্দ্রীয় সরকার বা পশ্চিম বঙ্গ সরকার বাঙ্গালার উন্নয়নমূলক যে সকল পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবেন, পূর্ব্ব পাকিস্থান হইতে আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের তাহাতে যথাযোগ্য পদে নিয়োগ। আসাম ও ভারতের অন্যান্য স্থানের উন্নয়নমূলক কার্যেও তাহাদের চাকরী দান। শ্রীহট্ট ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আশ্রয়-প্রার্থীদিগকে অনুরূপ সাহায্য দান। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষও এক দীর্ঘ আবেদনে এ বিষয়ে ভারত সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অর্থনীতিক চাপ ও নূতন সামাজিক সংস্থা গড়িয়া উঠার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিম বঙ্গে হিন্দুরা চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের সাহায্যদানের জন্য অর্থদান প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সাধ্যে কুলাইবে না। ইহার জন্য প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দাবী করা যায় না। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য করা উচিত। পশ্চিম বাঙ্গালায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দু আগমনের ফলে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, অবিলম্বে তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা না করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালাকেও দিল্লীর মত অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ ইন্সপেক্টার ডাঃ বিনোদবিহারী দত্ত

পরলোকে দেবীপ্রসাদ খৈতান—

কলিকাতার খ্যাতনামা অধিবাসী দেবীপ্রসাদ খৈতান গত ২রা মার্চ্চ ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা ২৫ বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের গৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু দিন কলিকাতা কর্পোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতির সদস্য ছিলেন—সম্প্রতি তিনি গণপরিষদের সদস্যরূপে কাজ করিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে এটর্ণী ও পরে ব্যবসায়ীরূপে সুপরিচিত হন। তাঁহার মত সুপণ্ডিত ও সুবক্তা এযুগে বিরল।

মহাত্মা গান্ধী— শিল্পী—শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়
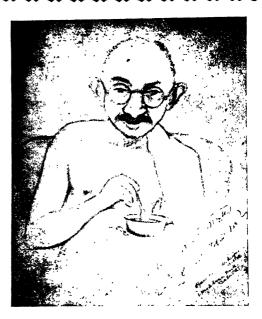
ছাত্রীর কৃতিত্ব—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও প্রবীণ দেশসেবক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন মহাশয়ের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী বাসনা

শ্রীমতী বাসনা সেন এম-এ

সেন এ বৎসর এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত বেদান্তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়

পূর্ণিয়ায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮৩তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দ ফটো—রায় ষ্টুডিও (পূর্ণিয়া)

দিয়াছেন। গত বৎসর তিনি কাব্যতীর্থ পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে মাখনবাবু তাঁহার কন্যাকে সংস্কৃত শিক্ষা দানের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সমাবর্ত্তনে সম্মান দান—

গত ২০শে মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পদকাদি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে—(১) মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্ল্যাকেট—সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সুবর্ণ পদক (২) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (৩) শ্রীমতী শান্তা দেবী—ভুবনমোহিনী দাস স্বর্ণপদক (৪) অধ্যাপক সুশীলকুমার দে—সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (৫) শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—শরৎচন্দ্র স্মৃতি স্বর্ণপদক (৬) ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ বসু (৭) ডাঃ গণপতি পাঁজা ও (৮) ডাঃ প্রেমাঙ্কুর দে—কোটস্ স্বর্ণপদক (৯) শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য ও (১০) শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জুবিলী রিসার্চ স্বর্ণপদক (১১) শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ ও (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বর্ণপদক (১৩) শ্রীমতী সীতা দেবী—লীলা পুরস্কার ও (১৪) আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য—আধুনিক ভারতীয় ভাষা
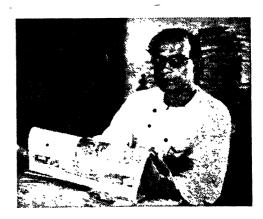
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক। আমরা সকলকে তাঁহাদের এই সম্মানলাভে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

বেঙ্গল প্রেস এ্যাডভাইসরি কমিটীর পক্ষ হইতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন—মধ্যভাগে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ এবং দুই পার্শ্বে লর্ড ও লেডি মাউন্টব্যাটেন

জাগরণ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

ঘুমন্ত ধরণীরে
শ্রাবণ গহন তিমির হইতে
কে জাগালো ধীরে ধীরে।

কত জয়গান, কত কলরোল
কত উৎসব ছন্দ-হিল্লোল,
নবীন সূর্য্য গৌরবে আজ
রাঙিয়া উঠিল কি রে!

পরাধীনতার শত লাঞ্ছনা
হয়ে গেল অবসান ;—
ধরণীর বুকে ধ্বনিয়া উঠিল
ভারতের জয়গান!
স্বাধীন আমরা, স্বাধীন ভারত
বিজয় দীপ্ত তার জয়রথ
ছুটিল বহ্নি বাণ সম ঘন
আঁধারের বুক চিরে।

আদর্শ মনুষ্যত্ব

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, ডি-লিট

আততায়ীর হস্তে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কি ভারতবর্ষেও এরূপ ঘটনা অভূতপূর্ব্ব নহে। খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল তাঁহারই স্বজাতির ষড়যন্ত্রে, মহম্মদকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাঁহারই স্বগোত্র কুরেকোরা, গুরু গোবিন্দ সিংহ নিহত হইয়াছিলেন শত্রুর ছুরিকাঘাতে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে লিঙ্কন ও আরকীণ্ডের অপমৃত্যুও এই শ্রেণীর অপকার্য্যের দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মের নামে যে সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়াছে তাহার সংখ্যা আরও বেশী।

মানুষের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মহাপুরুষেরা নশ্বর দেহত্যাগের পরও অমর হইয়া থাকেন আপনাদের আদর্শে। সুতরাং মহাত্মাজীর মৃত্যু যতই মর্ম্মান্তিক হউক তাঁহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে কিনা তাহাই প্রধান প্রশ্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাত্মাজী কোন স্থান অধিকার করিবেন তাহা বিচার করিবার সময় এখনও হয় নাই। সমসাময়িক লোকের পক্ষে ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগের প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন। মহাত্মাজীর অকৃত্রিম ভক্তের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কেহ কেহ যে তাঁহার কণ্ঠে প্রচারিত নীতির অত্যন্ত প্রতিকূলে তাহার প্রমাণ ত ৩০শে জানুয়ারীর সন্ধ্যায়ই পাওয়া গেল। দেশের অধিকাংশ লোক মহাত্মাজীর অনুসৃত অহিংসা নীতি গ্রহণ না করিলে তাঁহার দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নৈতিক মৃত্যুও ঘটিয়াছে মনে করিতে হইবে।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে মহাত্মাজীর জীবিতকালে বা তাঁহার পরলোকগমনের পরে তাঁহার জীবনের আদর্শ সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও দেশের অধিকাংশ লোককেই অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই। তাহার জীবিতকালে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও তিনি সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে যাহারা পূর্ব্বে কখনও তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করে নাই বোম্বাই প্রদেশের সেই অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা আততায়ীর স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে নির্য্যাতনের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

এই অবাঞ্ছিত মনোভাবের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। জীবজগতে মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা হিংস্র। বহু শতাব্দীর সাধনার ফলে মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি কতকটা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন শত্রুপক্ষকে হত্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। মধ্যযুগে যখন মানুষের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ছিল তখন যুদ্ধের নৃশংসতা নিবারণের জন্য কতকগুলি বিধান প্রচলিত হইয়াছিল। সেকালে নিরস্ত্র ব্যক্তিকে, নারী অথবা শিশুকে যুদ্ধের মাঝে হত্যা করা কাপুরুষতা বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মানুষ এই সকল নিয়মকে কেবল অনাবশ্যক নয় অনুচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ধর্ম্মের কোন অনুশাসনই যুযুৎসুদিগকে স্ত্রীপুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে শত্রু হনন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আমি ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করি নাই। কিন্তু ইতিহাস অনুসারে ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যেরা যুদ্ধ-বিরাগী ছিলেন এরূপ বলা যায় না। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট উভয়েই হিংসা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাতিদিগের বিজিগীষা মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম নহে। নাগাসাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ মানুষের সভ্যতার নিকৃষ্ট স্বরূপ এমন ভাবে উন্মোচন করিয়াছে যে ভবিষ্যতে যে এরূপ নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি হইবে না এমন ভরসা করা কঠিন। যদি মানুষ মনে করিত যে এরূপ নির্ব্বিচার নরহত্যা কল্যাণের পরিপন্থী তাহা হইলে হয়ত ভবিষ্যতে শান্তির আশা করা যাইতে পারিত। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদী বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে যুদ্ধ প্রকৃতির নিয়ম এবং বিজয়ী পক্ষই বর্ত্তমান সভ্যতার যোগ্য অভিভাবক। আমাদের যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিগত যুগের মহাপুরুষেরা যে অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন মহাত্মা নিজের জীবনে দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে কারণে শান্তিবাদী বুদ্ধ ও খৃষ্টের শিষ্যেরা মৌখিক ভাবে তাহাদের নীতি গ্রহণ করিয়াও কার্য্যতঃ তাহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের অন্যথা করিতেছেন, সেই কারণেই বহু গান্ধীবাদী কার্য্যে, বাক্যে এবং মনে অহিংস হইতে পারেন নাই।

পৃথিবীতে আবার যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ না হইতে হইতেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। লোকক্ষয় যদি লোককল্যাণের একমাত্র পন্থা না হয়, মানুষের ঐহিক মঙ্গলের জন্য যদি শান্তির প্রয়োজন থাকে তবে মহাত্মাজীর আদর্শই মানুষের একমাত্র মঙ্গলের পথ। কিন্তু সকল দেশে সকল মানুষ যদি সেই পথের যাত্রী না হয় তাহা হইলে যুদ্ধ ও তাহার আনুষঙ্গিক বর্ব্বরতা অনিবার্য্য। বিগত কয়েক বৎসরে দেখা গিয়াছে যে একপক্ষ অহিংস হইবার চেষ্টা করিলে অপর পক্ষ হিংসার সাহায্যে আপনার সুবিধা করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। এই জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাত্মাজী শ্রদ্ধা পাইয়াছেন কিন্তু শিষ্য পান নাই।

যদি ইহাই প্রকৃতির নিয়ম হয়, মানুষ যদি জাতিগত ভাবে আপনার স্বভাব সংশোধন করিতে না পারে তবে মহাত্মাজীও কালক্রমে বুদ্ধ ও খৃষ্টের ন্যায় দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত হইবেন। মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, হয়ত তাঁহার নামে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টিও হইবে কিন্তু যে আদর্শের জন্য তিনি জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি অনশনে দেহক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে আদর্শ জয়যুক্ত হইবে না, সে উদ্দেশ্য বিফল হইবে। আদিম মনুষ্যত্বের নিকট আদর্শ মনুষ্যত্ব পরাজিত হইবে।

মহাত্মা স্মরণে

মহারাজকুমারী শ্রীপূর্ণিমা ব্রহ্মচারী

ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল ক্ষমা কর সবে বলে গেল ভালোবাস
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশ।

আজ আমার মন খালি এলোমেলো অগোছাল কথা বলতে চায়, কিই বা লিখব কথা, আমার লেখনি আজ পরাজয় স্বীকার ক'রেছে আমারই মত। লেখার মাঝে নেই কোন আনন্দ, কোন উৎসাহ। আজ শুধু অন্তর মন্থন ক'রে বেরিয়ে আসে করুণ ক্রন্দন; যে কান্নার ভারে মন আমার শুকিয়ে কুঁকড়ে বাসি ফুলের মত হয়ে যায়। এ আত্ম-অবমাননা কেন স্বীকার করে নিতে হয়, পৃথিবীতে অস্তিত্বের কি কোন মূল্যই নেই। মানুষের মন থেকে কতদিনে পশু প্রবৃত্তি যাবে, সেই দিনটার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌বো, যতদিন না মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডাক দেয়। যত পার কর অধীনতা স্বীকার, তা হ'লেই পাবে যশ, পাবে খ্যাতি। ব্যক্তিত্বর কোন দাম দেবে না তোমায়। কি বিষাক্ত মানুষের মন! যে দুর্ব্বল, কর তাকে যত পার আঘাত, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের নিপীড়ন—এই চ'লে আস্‌ছে যুগ যুগ ধরে। সভ্যতাও হার মানল, সে পারল না—পরিবর্ত্তন করতে মানুষের আদিম মনোবৃত্তি। যে সবল তার অধিকার আছে সব সময় চিৎকার ক'রে বলার,—ওগো তোমরা নিরীহের দল, কেন তোমরা মাথা তুলতে চাও মিছামিছি, তোমাদের স্থান যে আমাদের পায়ের তলায়। স্বাধীনতার দাবী তোমাদের মুখে পাগলের প্রলাপের মতই শোনায়। তাই বলি তোমাদের—থাক তোমরা চুপটী ক'রে অবোধ শিশুর মতই আমাদের দাসত্ব স্বীকার ক'রে। এত অত্যাচার অপমান হয়ত ঈশ্বরেরও সহ্য হল না, তাই তিনি পাঠালেন তার প্রতিনিধি,—আমাদের বাপুজিকে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের দূতকে পারলাম না চিনতে, দিলাম তাঁকে জোর করে বিদায়। যে ঋষি এসেছিলেন আমাদের মাঝে—অহিংসা—ত্যাগের ব্রত নিয়ে, তাঁর অনশন অস্ত্রের কাছে তীক্ষ্ণ তরবারীর কোন শক্তিই ছিলনা। তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ, তিনি ছিলেন বীর, তাই মৃত্যুকেও গ্রহণ করলেন বীরের মত। সেই মহাপুরুষ মহাত্মাকে পারলাম না আমরা চিনতে।

সেদিন ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার ঘড়িতে তখন বেজেছে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ, এই সঙ্কট মুহূর্ত্তের কথা কোনদিন মন থেকে মুছে যাবে না। এই সময়টি কি নিদারুণ খবর শোনাল বিশ্ববাসীকে, যা কারো কোনদিন কল্পনায়ও আসে নি। চারদিক থেকে শুধু ধ্বনিত হতে লাগল, বাপুজি আর নেই, তাঁকে হত্যা করেছে। সমস্ত সহর যেন চকিতে মুহ্যমান হ'য়ে গেল। লক্ষ লক্ষ নরনারী শোকে নিস্তব্ধ হ'ল; কারো মুখে কোন প্রশ্ন নেই। দু-চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে জল। যিনি ছিলেন শান্তির প্রতীক, তাঁকেই হিংসা দিয়ে হত্যা করা হ'ল। মহাত্মাজী যাচ্ছিলেন প্রার্থনা সভায়, সেই প্রার্থনা সভাতেই, এক মারাঠি যুবক নাথুরাম বিনায়ক গড়সে পর পর তাঁকে তিনটি গুলি ক'রে, মহাত্মাজী হে রাম হে রাম ব'লে লুটিয়ে পড়েন মাটিতে। তাঁর বুকের শোণিতে লাল হয়ে উঠল দিল্লীর মাটি। বহু লোকের বুকের রক্তে দিল্লীর যে মাটি অভিশপ্ত হয়েছিল, মহামানবের রক্তে সিক্ত হয়ে সে ভূমি পুণ্যময় হয়ে উঠ্‌ল। কে আজ অমর বাণী শুনিয়ে তোমার অশান্ত ছেলেদের শান্ত করবে, কে চাইবে সাম্য-মৈত্রী, কে জ্বালবে আলো দুর্গম পথে, কে বাসবে এমনি ক'রে ভাল? বহু যুগের সাধনার রাষ্ট্র ও সাধারণের যে স্বাধীনতা আজ ফিরে এসেছে কে তাকে রক্ষা করবে। আবার ফিরে এসো বাপুজী আমাদের মাঝে—অবোধ শিশুদের তোমার জ্ঞানের আলোকে মানুষ করে গড়তে। যে কলঙ্ক হিন্দুজাতি আজ মাথায় তুলে নিয়েছে, সে কালিমা কি কোনদিন আর মুছবে। তুমি আজ নেই, কিন্তু তোমার বাণী তোমার আদর্শ রেখে গেছ, তোমার ভাবী বংশধরদের জন্য। এখন তারা যেন তোমার আদর্শে গড়ে উঠে দেশকে রক্ষা করতে পারে। এইটুকুই কর তুমি আশীর্ব্বাদ। পরদিন মহাত্মাজীর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হল বিড়লা প্রাসাদ থেকে যমুনার তীরে, চিরনিদ্রায় শায়িত বাপুজী। সামনে ব'য়ে চলেছে যমুনা, নির্ব্বাক দর্শকের মত দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ নরনারী। চোখে নেমেছে শ্রাবণের ধারা। আগুনের লেলিহান শিখা ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠে, আমাদের প্রিয় বাপুজীর শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি ঢেকে দিচ্ছে আমাদের সম্মুখে থেকে চিরদিনের মত। আকাশে তখনও সূর্য্যের শেষ রশ্মিটুকু দেখা যাচ্ছে।

বল শান্তি, বল শান্তি—দেহ সাথে সব ক্লান্তি পুড়ে হোক ছাই।

গান ও স্বরলিপি

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে ;
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে।
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীইন্দিরা দেবীচৌধুরানী

II মা জ্ঞা রা | জ্ঞা জ্ঞরা | সা রা I জ্ঞা রা সা | -া -া | -া -া I
বা জি বে স থী॰ বাঁ শী বা জি বে • • • •

I সা গা গা | গা গা | গসা গা I মা গা মা | -া -া | -গমা -গপা II
হৃ দ য় রা জ হৃ॰ দে রা জি বে • • •• ••

II মা ধা ধা | ণা ণধা | পা মা I গা মা মা গা মা | গা মা I
ব ন চ রা শি॰ রা শি কো থা যে যা বে ভা সি
(৪) ম র মে মু র॰ ছি য়া মি লা তে চা বে হি য়া

I ণ্া ধ্া ণ্া | সা সা | রা রা I জ্ঞা রা জ্ঞা | -া -া | -মা -জ্ঞমপা II
অ ধ রে লা জ হা সি সা জি বে • • • •••
(৪) সে ই চ র ণ যু গ রা জী বে • • • •••

[সা]
I { ণ্া রা রা | জ্ঞা জ্ঞরা | সা রা I জ্ঞা জ্ঞপা মা | জ্ঞমা জ্ঞা | রা সণ্ধ্া } I
ন য় নে আঁ খি॰ জ ল ক রি॰ বে ছ॰ ল ছ ল••

I সা গা গা | গা গা | গসা গা I মা গা মা | -া -া | -া -া I
সু খ বে দ না ম॰ নে বা জি বে • • • •

রবীন্দ্র-সংগীত স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার জন্য ঔৎসুক্য দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তদনুপাতিক সত্বরতার সহিত স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া, বিশ্বভারতী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক নিযুক্ত স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হইবে। ভারতবর্ষ পত্রিকায়ও ভবিষ্যতে এইরূপ স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক, ভারতবর্ষ

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয় হকি দল ঃ

বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় হকি দল পূর্ব্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের হকি দলের সঙ্গে মোট ২৮টি প্রতিনিধিত্বমূলক ম্যাচ খেলে সগৌরবে দেশে ফিরেছে। এই ২৮টি খেলায় ভারতীয় দল কোন খেলাতেই পরাজিত হয়নি। সমস্ত খেলায় মোট ২৮৫ গোল দিয়েছে এবং বিপক্ষে মাত্র ৯টি গোল খেয়েছে।

সমস্ত খেলার ফলাফল

নিম্নলিখিত দলগুলিকে ভারতীয় দলকে কিভাবে পরাজিত করিয়াছে—

১৬ই ডিসেম্বর, মোম্বাসা : মোম্বাসা সম্মিলিত দলকে ৭-০ গোলে।

২০শে ডিসেম্বর, নাইরবি : এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে ৫-০ গোলে।

২২শে ডিসেম্বর, নাইরবি : কেনিয়ার হকি এসোসিয়েশনকে ৯-১ গোলে।

২৪শে ডিসেম্বর নাইরবি : নাইরবি সম্মিলিত দলকে ৪-০ গোলে।

২৯শে ডিসেম্বর, নাকুরু : এশিয়ান সম্মিলিত দলকে ৯-০ গোলে।

৩০শে ডিসেম্বর, নাকুরা : ইউরোপীয়ান সম্মিলিত দলকে ১৪-১ গোলে।

৩১শে ডিসেম্বর, কিসুমু : কিসুমু সম্মিলিত দলকে ১৬-০গোলে।

২রা জানুয়ারী, কিসুমু : কিসুমু সম্মিলিত দলকে ১৭-০ গোলে।

৩রা জানুয়ারী, জিঞ্জা : উগাণ্ডা পূর্ব্ব প্রদেশ দলকে ৯-০ গোলে।

৪ঠা জানুয়ারী, জিঞ্জা : উগাণ্ডা একাদশকে ৬-০ গোলে।

৬ই জানুয়ারী, কাম্পালা : উগাণ্ডা গোয়ান একাদশকে ১৭-০ গোলে।

৭ই জানুয়ারী,—কাম্পালা : উগাণ্ডা ইউরোপীয়ান একাদশকে ৯-১ গোলে।

৮ই জানুয়ারী,—কাম্পালা : উগাণ্ডা ভারতীয় একাদশকে ১২-০ গোলে।

১০ই জানুয়ারী,—সমগ্র উগাণ্ডা যুক্তদলকে ১১-০ গোলে।

১৫ই জানুয়ারী,—বেল : সম্মিলিত একাদশকে ১৩-১ গোলে।

১৬ই জানুয়ারী,—এলডোরেট : এলডোরেট সম্মিলিত দলকে ৯-১ গোলে।

১৭ই জানুয়ারী,—কিটেল : কিটেল সম্মিলিত দলকে ১১-০ গোলে।

২০শে জানুয়ারী, নাইরবি : এশিয়ান স্পোর্টস এসোসিয়েশনকে ১০-০ গোলে।

২২শে জানুয়ারী, নাইরবি : নাইরবি সম্মিলিত দলকে ১৩-০ গোলে।

২৪শে জানুয়ারী, নাইরবি : কেনিয়া একাদশকে ৫-০ গোলে।

২৬শে জানুয়ারী, নাইরবি : কেনিয়া ও উগাণ্ডা দলকে ৭-০ গোলে।

৩০শে জানুয়ারী, আরুসা সম্মিলিত দলকে ১২-০ গোলে।

৩১শে জানুয়ারী, ডি সালাম সম্মিলিত দলকে ১০-২ গোলে।

২রা ফেব্রুয়ারী, ডি সালাম সম্মিলিত দলকে ১০-০ গোলে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ঝান্জিবার সম্মিলিত দলকে ১০-০ গোলে।

৫ই ফেব্রুয়ারী, টাঙ্গা সম্মিলিত দলকে ১৪-০ গোলে।

৭ই ফেব্রুয়ারী, মোম্বাসা : মোম্বাসা সম্মিলিত দলকে ৫-০ গোলে।

গোলদাতাদের নাম

ভারতীয় দলের পক্ষে গোলদাতাদের নাম, গোলসংখ্যা :

ডি সিং ওয়কে বাবু (যুক্তপ্রদেশ)	৭০
ধ্যানচাঁদ (সৈন্যবিভাগ)	৬১
পি জ্যানসেন (বাঙ্গলা)	৫৬
লেঃ সাকুর (ভূপাল)	৪০
কিষেণলাল (বোম্বাই)	১৬
আর কার (বাঙ্গলা)	১৪
গুরবচন সিং (ফরিদকোট)	১১
রাজাগোপাল (বাঙ্গালোর)	৬
লেঃ মান্না সিং (গোয়ালিয়র)	৫
জেণ্টল (দিল্লী)	৪
কে সি দত্ত (পাঞ্জাব)	২

ভারতীয় খেলোয়াড়গণ :—ধ্যানচাঁদ (অধিনায়ক), আর কার সহঃ অধিনায়ক (বাঙ্গলা), বাবু (যুক্তপ্রদেশ), পি জ্যানসেন (বাঙ্গলা), লেঃ সাকুর (ভূপাল), কিষেণলাল (বোম্বাই), গুরবচন সিং (ফরিদকোট), রাজাগোপাল (বাঙ্গালোর), লেঃ মান্না সিং (গোয়ালিয়র), জেণ্টল (দিল্লী), কে সি দত্ত (পাঞ্জাব), এস ভাজ (বোম্বাই), বি কাপুর (বাঙ্গলা), ডব্লিউ ডি' সুজা (বোম্বাই), লিও পিণ্টো (বোম্বাই), ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ), মুস্তাক আমেদ (বাঙ্গলা)। এস কে সিংহ (বাঙ্গলা) ও সি পিয়ার্স (যুগ্ম ম্যানেজার)।

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট ঃ

আন্তঃ প্রাদেশিক রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে এবছর হোলকার দল ৯ উইকেটে বোম্বাই দলকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে হোলকার দল ১৯৪৫-৪৬ সালের ফাইনালে বরোদা দলকে পরাজিত করেছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৪-৪৫ সালের ফাইনালে বোম্বাই-হোলকার দলের ফাইনাল খেলায় বোম্বাই বিজয়ী হয়েছিল।

বোম্বাই ঃ ১৯১ ও ২৬১

হোলকার ঃ ৩৬১ ও ৯৫ (১ উইকেট)

বোম্বাই প্রথমে টসে জিতে ব্যাটিং আরম্ভ করে। উভয় দলের উভয় ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ ২৬ রাণ করেছিলেন হোলকার দলের সি এস নাইডু; বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসে ইব্রাহিম ৪৯ এবং মন্দনেকার ৪২, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় মন্ত্রী ৬২, কাদকার ৫৫ এবং ইব্রাহিম ৫২ রাণ করেন। অপরদিকে হোলকার দলের গাইকোয়াদের মারাত্মক বোলিংয়ের দরুণ বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৬১ রাণে শেষ হয়। গাইকোয়াদ ৯০ রাণে ৬টি উইকেট নিয়ে উভয় দলের বোলারদের মধ্যে এক ইনিংসে বেশী উইকেট পাওয়ার সম্মান লাভ করেন। সদ্য অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত সি এস নাইডু এবং সারভাতে হোলকার দলে এবং মন্দনেকার ও কাদকার বোম্বাই দলের পক্ষে খেলেছিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিজয়ী বিজিতদল

	বিজয়ী	রানার্স আপ
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	উত্তর ভারত
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাঙ্গলা
১৯৩৭-৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর
১৯৩৮-৩৯	বাঙ্গলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৪২-৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	বাঙ্গলা
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরোদা
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	হোলকার

লণ্ডন অলিম্পিকে নির্ব্বাচিত ভারতীয় দল ঃ

লণ্ডনে যে পৃথিবীর অলিম্পিক গেম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন খেলায় যোগদানের জন্ত নিম্নলিখিত ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনোনয়ন করা হয়েছে।

১০০ মিটার দৌড়—ই ফিলিপস (মাদ্রাজ)
লং জাম্প—বলদেও সিং (বোম্বাই)
ম্যারাথন রেস—ছোট্টাসিং (পাতিয়ালা)
হাইজাম্প—গুরনামসিং (পাতিয়ালা)
১১০ মিটার হার্ডল—জে ভিকার্স (বোম্বাই)
ফেদারওয়েট (কুস্তি)—সূর্য্যবংশী (বোম্বাই)
লাইটওয়েট (কুস্তি) বন্তসিং (পাতিয়ালা)
পোলভল্ট—মুসার ক হোসেন (ইউ পি)
মিডলওয়েট (কুস্তি)—কে পি রাই (ইউ পি)
ওয়েল্টারওয়েট (কুস্তি)—এ আর ভার্গব (ঐ)
হপ ষ্টেপ ও জাম্প—এইচ রেবেলো (মহীশূর)
ফ্লাই ওয়েট (কুস্তি)—কে ডি যাদব (কোলাপুর)
ব্যাণ্টম ওয়েট (কুস্তি)—নির্ম্মল বসু (বাঙ্গলা)

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ঃ

ইংলণ্ড বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ক্রিকেট টেষ্ট খেলায় এবছর 'রবার' পেয়েছে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল। সুদীর্ঘ চোদ্দ বছর পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পুনরায় 'রবার' পেল। এবছর উভয় দলের ১ম ও ২য় টেষ্ট ম্যাচ খেলা ড্র যায়। শেষ দুটি টেষ্ট খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ টেষ্ট ম্যাচ খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১০ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে।

ব্র্যাডম্যান কর্ত্তৃক ভারতীয় দলের প্রশংসা ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বাছাই ক্রিকেট দল ডন ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা ক'রে বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়গণের পক্ষ থেকে এই দলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ডন ব্র্যাডম্যান অষ্ট্রেলিয়া প্রত্যাগত ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলায় প্রশংসা করেন। তিনি নিজ মুখে বলেন—"It was one of the happiest and most popular teams that ever visited our country. I Could never remember so much genuine sympathy for any visiting team. The Australian public appeared to be anxious that the Indian team should win matches." অষ্ট্রেলিয়াতে অমরনাথ ও হাজারের ব্যাটিংয়ের দক্ষতা উল্লেখ করে বলেন, "ব্যাটিংয়ে ভারতীয়দের চিন্তার বিশেষ কারণ নেই তবে বোলিং আরও উন্নত হওয়া দরকার। ভারতীয় খেলোয়াড় বিজয় মার্চ্চেণ্ট সম্পর্কে তিনি বলেন—"We were sorry that your great batsman, Merchant, could not make the trip. Had he been able to do so, I am afraid the bowling averages of our bowlers would not have been as good as they were."

কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড রেস ঃ

কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ৯১ বাৎসরিক ৪½ মাইল বোট রেস প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ৫ লেংথে অক্সফোর্ডকে পরাজিত ক'রে ১৭ মিনিট ৫০ সেকেণ্ডের নূতন রেকর্ড করেছে। পূর্ব্বের রেকর্ড ছিল ১৮ মিঃ ৩ সেকেণ্ডের এবং ১৯০৪ সালে কেম্ব্রিজই তা করেছিল। ১৮২৯ সালে কেম্ব্রিজ বনাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এই বোট রেস প্রথম আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছে ১৪বার, কেম্ব্রিজ ২৮বার। ১৯১৮-১৯ সাল পর্য্যন্ত কোন বোট রেস হয়নি। পর্য্যায়ক্রমে কেম্ব্রিজ বিজয়ী হয়েছে ১৩বার, অক্সফোর্ড ৫বার।

ব্যাডমিণ্টন খেলা ঃ

কৃষ্ণনগর ইয়ং ইউনিয়ন ব্যাডমিণ্টন ক্লাব পরিচালিত উমেশচন্দ্র স্মৃতি কাপ প্রতিযোগিতায় ডাবলস্ ফাইন্যাল খেলা বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার সহিত 'কৃষ্ণনগর গুপ্ত নিবাস' গ্রাউণ্ডে কৃষ্ণমোহন পাল ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বনাম ব্রজেন্দ্র মল্লিক ও লক্ষ্মী সেনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় প্রথমোক্ত দলটী ১৫-৮, ১৫-৭, ১৫-৮ ষ্ট্রেট সেটে জয়লাভ করেন। বিশেষ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্ত রবিন ব্যানার্জিকে একটি রৌপ্যপদক দেওয়া হয়। সমস্ত প্রতিযোগিতার মধ্যে অনুরূপ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্ত অশোকচন্দ্র খাসনবিশকে একটি রৌপ্য কাপ দেওয়া হয়।

খেলা-ধূলা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌ ঃ

এ্যাথ্‌লেটিক্‌সে ভারতীয়গণ পাশ্চাত্যের এ্যাথ্‌লেটদের তুলনায় অনেক পেছিয়ে আছে। এই পিছনে পড়ে থাকার প্রধান কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলনের অভাব। তারপর হচ্ছে স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তির অভাব। যে কোন আউটডোর গেমে এই শারীরিক শক্তির অল্প-বিস্তর দরকার হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য্য। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী না হ'লে ভাল এ্যাথ্‌লেট হওয়া খুবই শক্ত, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ক'জন? তার উপর ভারতবর্ষ শীতপ্রধান দেশ নয় বলে বৎসরের সকল সময়েই এ্যাথ্‌লেটিক্‌স্‌ বা অন্যান্য খেলাধূলার চর্চ্চা গরমের জন্য করতে পারা যায় না। শীত-প্রধান পাশ্চাত্য দেশগুলির আবহাওয়া শরীর চর্চ্চার পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য সেখানকার এ্যাথ্‌লেটদের স্বাস্থ্যও হয় অটুট। তার উপর আছে বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন। ভারতবর্ষের আবহাওয়াকে বদলে ঠাণ্ডা করা যাবে না, কিন্তু এ্যাথ্‌-লেটদের পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দেওয়া অসম্ভব নয়।

এ্যাথ্‌লেটদের পক্ষে পুষ্টিকর ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এর অভাব হ'লে এ্যাথ্‌লেটদের স্বাস্থ্য রক্ষা করা দুরূহ হয়ে উঠে। তখন শুধু ট্রেনিং দিয়ে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্যকারী এই পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য আজকাল দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠেছে আর নির্ভেজাল খাদ্যবস্তু তো স্বপ্নের জগতে স্থান পেয়েছে। বেশীর ভাগ এ্যাথ্‌লেটই ধনী নন এবং তাঁদের পক্ষে এই দুর্ম্মূল্যের ও ভেজালের বাজারে পুষ্টিকর ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে পড়েছে। শুধু এ্যাথ্‌লেটদেরই এই অসুবিধা নয়। যাঁরা বক্সিং, কুস্তি, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি শ্রমসাধ্য খেলাগুলির চর্চ্চা ক'রে থাকেন তাঁদেরও স্বাস্থ্য রক্ষা করতে নির্ভেজাল ও পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। শ্রমিকেরা যাতে তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পায় তার জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করছেন। এর জন্য আন্দোলনেরও অন্ত নাই। কিন্তু কঠিন শ্রমসাধ্য খেলা যে সব খেলোয়াড়রা খেলে থাকেন এবং যাঁদের অবস্থা স্বচ্ছল নয় তাঁরা এই দুর্ম্মূল্য ও ভেজালের বাজারে যে কি ভাবে খাঁটি ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করে তাঁদের শ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় নিবারণ করে স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন তা' গভর্ণমেণ্ট বা খেলাধূলার কর্ম্মকর্ত্তাগণ ভাবছেন বলে মনে হয় না। জাতীয় জীবনের দিক থেকে একজন শ্রমিকের দাম একজন এ্যাথ্‌লেটের চেয়ে যে অনেক বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা' বলে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন একজন এ্যাথ্‌লেটের একজন শ্রমিকের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। যদি ভারতীয় এ্যাথ্‌লেটিক্‌সের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়িয়ে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ করতে হয় তা হ'লে উদীয়মান এ্যাথ্‌লেটদের বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং দেওয়া এবং তাঁদের অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলার দিকে ভার-তীয় এ্যাথ্‌লেটিক্‌সের কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আশা করি জাতীয় গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে সাহায্য করবেন। আমাদের বরেণ্য নেতাগণকে অনুরোধ যেন তাঁরা আন্তর্জাতিক খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে পেছিয়ে পড়তে না দেন। বাংলার ক্রীড়ানুরাগী মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দৃষ্টিও আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। আশা করি প্রধান মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ণধাররূপে তিনি এ বিষয়ে এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন যা' ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অনুসৃত হবে।

•

এবার লণ্ডনে যে বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে তাতে যোগদান করবার জন্য ভারত থেকে সাতজন এ্যাথ্‌লেট পাঠান হচ্ছে। তাঁরা যে বিশেষ ভাল ফল দেখাতে পারবেন তা' মনে হয় না। তবে 'হপ্‌-ষ্টেপ্‌ এণ্ড জাম্প'এ মহীশূরের এইচ, রেবেলো খানিকটা সফলতা লাভ করবেন বলে আশা হয়। ১০০০০ মিটার ওয়াকিং রেস্‌ বিজয়ী বাংলার সুবোধ সিংহকে ভারতীয় দলে স্থান না

দেওয়ায় অনেকেই হয়ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন; কিন্তু ট্রায়ালে প্রথম হলেই যে অলিম্পিকগামী দলে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করা যায় তা নয়। তবে সুবোধ সিংহকে ট্রেনিংএ রেখে তিনি আরও উন্নতি করতে পারেন কিনা সেটা দেখা যেতে পারত। যাই হোক, ভারতের যে প্রতিনিধিগণ অলিম্পিকে যোগদান করতে যাচ্ছেন তাঁদের সাফল্য কামনা করি। তাঁরা যদি আংশিক সাফল্যও লাভ করে সসম্মানে ফিরে আসতে পারেন তা' হ'লে সেটাও ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করবে।

ক্রিকেট ঃ

হোলকার ক্রিকেটদল কৃতিত্বপূর্ণ ভাবে বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে এইবার রঞ্জি ট্রফি লাভ করেছে। হোলকার দল এমনিতেই শক্তিশালী, তার উপর অভিজ্ঞ অধিনায়ক কর্ণেল নাইডুর পরিচালনায় হোলকার দল হয়ে

কর্ণেল সি, কে, নাইডু ফটো—শৈলেন চট্টোপাধ্যায়

উঠেছে দুর্দ্ধর্ষ। সাধারণ খেলোয়াড়ও যেন নাইডুর পরিচালনায় অসাধারণ হয়ে উঠে। হোলকার দলের বৈশিষ্ট্য তাঁদের একাদশ ব্যক্তি পর্য্যন্ত ভাল ব্যাট করতে পারেন। ব্যাটিংএর দিক দিয়ে হোলকার দল একেবারে নিখুঁত বলা চলে এবং এর জন্ম দায়ী কর্ণেল নাইডুর ট্রেণিং। সারভাতে ও সি, এস, নাইডু অষ্ট্রেলিয়া সফরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। সি, এস, নাইডু তাঁর এই ফর্ম যদি অষ্ট্রেলিয়ায় দেখাতে পারতেন তা' হলে আমরা খুবই খুসী হতুম। দেখা যায় সি, এস নিজ দেশে যে রকম খেলেন বাইরে সফরে গেলে তার অর্দ্ধেকও খেলতে পারেন না। এর কারণ কি? তাঁর নার্ভের অভাব না স্ট্যামিনার? সেটা তিনি নিজেই ভাল জানেন। অবশ্য এই অষ্ট্রেলিয়ান টুরে তাঁর স্বপক্ষে বলবার আছে যে তিনি বেশী বল করবার সুযোগ পান নি। যাই হোক তাঁর খেলার আরও উন্নতি করতে না পারলে হয়ত ভবিষ্যতে ভারতীয় টেষ্ট দলে স্থান পাবার সুযোগ তিনি হারাবেন।

ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভারতের সুপ্রবীণ খেলোয়াড় কর্ণেল সি, কে নাইডু, ও তাঁর দল লাভ করায় আমরা খুবই সুখী হয়েছি। আমরা কর্ণেল নাইডু ও হোলকার দলকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরও বহুদিন আমরা ভারতীয় ক্রিকেটের এই প্রবীণ যোদ্ধাকে ভারতের নানা ক্রিকেট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করব।

* * * *

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ডন্ ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে ইংলণ্ডের দিকে যাত্রা করেছেন। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই ঐতিহাসিক ক্রিকেট যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুনরায় ইংলণ্ডের মাটিতে আরম্ভ হতে চলেছে। পৃথিবীর ক্রিকেট মহলের দৃষ্টি আবার ক্রিকেটের জন্মভূমির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহলে এসেছে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা। পূর্ব্ব থেকেই খেলার ফলাফল সম্বন্ধে অনেক মতামত শোনা যাচ্ছে। ইংলণ্ড নিজের দেশে খেলে 'এ্যাশেস' লাভ করে অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের শোচনীয় পরাজয়ের শোধ নিতে পারবে, না আবার পরাজয়ের গ্লানি তাঁদের স্পর্শ করবে—এই নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলেছে। ইংলণ্ডের যে টিম্ বর্ত্তমানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে খেলেছে তাদের উপর নির্ভর করে ইংলণ্ডের প্রকৃত শক্তির বিচার করা চলে না। ইংলণ্ডের এই দলটি যে বিশেষ দুর্ব্বল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরের তালিকাভুক্ত খেলার একটিতেও তাদের জয়লাভ করতে না পারায় এবং চারটির মধ্যে দুটি টেষ্টে পরাজিত হয়ে রবার হারানোয়। তবে ইংলণ্ডের পুরা শক্তি নিয়ে যে এই দলটি গঠিত হয় নি তা সবাই জানেন। দলটির বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই নূতন ও অনভিজ্ঞ। এম, সি, সি কর্ত্তৃপক্ষ

নিজেদের দলের শক্তি ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না বলেই মনে হয়। তা না হলে এরকম দুর্ব্বল দল পাঠিয়ে ইংলণ্ডের সুপ্রতিষ্ঠিত ক্রিকেট মর্য্যাদা এভাবে ক্ষুণ্ণ করতেন না। যাই হোক, ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তার সমগ্র শক্তি যে নিয়োগ করবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতেও ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে পারবে কিনা সন্দেহের বিষয়। আমাদের মনে হয় স্বাভাবিক উইকেটে ইংলণ্ডের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়াকে টেষ্ট ম্যাচে পরাজিত করা সম্ভব হবে না। তবে যদি ভাগ্যলক্ষ্মী ইংলণ্ডের প্রতি প্রসন্না হন তা হলে বৃষ্টিপাতের সহায়তায় ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করলেও করতে পারে এবং সে সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়।

ইংলণ্ডকে ব্যাটিংএর দিক দিয়ে নির্ভর করতে হবে, কম্পটন, হাটন, এডরিচ, ওয়াসব্রুক ও ইয়ার্ডলের উপর। নূতনদের মধ্যে যাঁদের দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের মধ্যে প্রেস, আইকিন, ফ্রেসার এবং ওয়াটকিংএর উপরও কিছুটা নির্ভর করা যেতে পারবে বলে মনে হয়। কিন্তু বোলিংএর দিক দিয়ে ইংলণ্ডের এমন কোনও বোলার নেই যাঁর উপর ইংলণ্ড সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে এবং যাঁর সহায়তায় অষ্ট্রেলিয়ার রাণ সংখ্যাকে সাধারণের পর্য্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। বোলিংএর দিক দিয়ে ইংলণ্ডকে নির্ভর করতে হবে এডরিচ, ইয়ার্ডলে, কম্পটন এবং বেডসারের উপর। এর মধ্যে বেডসার আবার দলে স্থান পাবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। নূতনদের মধ্যে ল্যাকার, ইয়ঙ, হাওয়ার্থ ও কুক্এর উপরও খানিকটা নির্ভর করা চলবে। অবশ্য তাঁরা যদি দলে স্থান পান। দেখা গেছে পুরাণ খেলোয়াড়দের মধ্যে গত অষ্ট্রেলিয়ান টুরে এডরিচ ও কম্পটন ছাড়া আর কেউই বিশেষ ভাল খেলতে পারেন নি। নূতন খেলোয়াড়রা কেহই অষ্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে খেলেনি। তাই তাদের কথা বাদ দেওয়াই ভাল। তা হলে সেই এডরিচ ও কম্পটনের উপরই ইংলণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হবে এবং মাত্র দুজন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে ব্র্যাডম্যান পরিচালিত দুর্দ্ধর্ষ অষ্ট্রেলিয়ান দলের বিপক্ষে টেষ্ট ম্যাচে জয় লাভের আশা দুরাশা বলেই মনে হয়। তবে আগেই বলেছি বৃষ্টিসিক্ত উইকেটের সাহায্যে বা ইংলণ্ডের নবাগত খেলোয়াড়রা যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে ভাল খেলেন কিংবা অন্য কোনও ভাগ্যপ্রেরিত সাহায্যে ইংলণ্ড জয়লাভ করলেও করতে পারে।

* * * *

আগামী শীতকালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে খেলতে আসছেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তি যে নগণ্য নয় তার প্রমাণ আমরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম এম, সি, সি, দলের খেলার ফলাফল থেকেই পেয়েছি। এম, সি, সি'র ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরকারী দলটি যে বিশেষ দুর্ব্বল ছিল তাতে কোন সন্দেহই নাই। এই দলে হাটন, হার্ডষ্টাফ ও এ্যালেন ছাড়া ইংলণ্ডের পুরান ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় প্রায় কেহই ছিলেন না এবং সেই জন্যেই যে ইংলণ্ডের অবস্থা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল তাও সত্য। কিন্তু তাই বলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের শক্তিকে অবহেলা করলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রতি অবিচার করা হবে। বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান জর্জ্জ হেড্‌লি পরিচালিত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল যথেষ্ট শক্তিশালী বলেই মনে হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এইটাই হবে সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় সফর। ভারতীয় খেলোয়াড় এবং ভারতবর্ষের উইকেট সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই। তার উপর ভারতীয় খেলোয়াড়গণ অষ্ট্রেলিয়া থেকে প্রচুর অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরেছেন। সুতরাং নিজেদের দেশে, প্রথম সফরকারী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে বিশ্বের ক্রিকেট মহলে ভারতবর্ষের ক্রিকেট মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করবার যথেষ্ট সুযোগ ভারতবর্ষ পাবে বলেই মনে হয় এবং আশা করি ভারতবর্ষ এই সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবে। কিন্তু আগেই বলেছি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের শক্তি মোটেই নগণ্য নয় এবং তাঁদের পরাজিত করতে হলে পূর্ব্ব থেকেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের বিশেষ করে প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রস্তুত হওয়া শুধু ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করবার জন্যই যে একান্ত দরকার তা নয়; ভাল রকম ভাবে প্রস্তুত হতে না পারলে আমাদের নিজেদেরও পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এখন থেকেই সমস্ত প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির এই প্রস্তুতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তোড়জোড় করা উচিত। প্রত্যেক প্রদেশ থেকেই যে সব খেলোয়াড়ের ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের প্র্যাকটিস ও ট্রেনিং

দেওয়ার উপর প্রাদেশিক এসোসিয়েশনগুলির বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে মনে হয়। আমাদের 'ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল'এর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ তাঁরা যেন এখন থেকেই তৎপর হন এবং বাংলাদেশ থেকে যে সব খেলোয়াড়ের ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের উপর বিশেষ দৃষ্টি দেন। এসোসিয়েশনের কর্তব্য খালি ট্রায়ালের ব্যবস্থা করে খেলোয়াড়দের পরীক্ষা করাতেই সীমাবদ্ধ নয়। খেলোয়াড়দের ভাল ট্রেনিং দিয়ে উপযুক্ত করে তাঁরা যাতে সর্ব্বভারতীয় দলে স্থান পান তার জন্য চেষ্টা করাও এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষের কর্তব্যের অঙ্গ বলে মনে হয়। খেলোয়াড়দেরও যদি তাঁদের মধ্যে কেউ ভারতীয় দলে স্থান পেতে চান, এখন থেকেই উঠে পড়ে লেগে তাঁদের খেলার উন্নতির চেষ্টা করা উচিত।

বাংলা থেকে পি, সেন ছাড়া নির্ম্মল চ্যাটার্জি, পঙ্কোজ রায়, এন চৌধুরী ও এস ব্যানার্জির সর্ব্বভারতীয় দলে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আশা করি বাংলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এঁদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত "মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান"—১৲
শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "মুক্তির ডাক"—১।০
শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত "ভাষার ভিত্তিতে বঙ্গদেশ"—১৲
স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি প্রণীত "Vedic Culture"—৭।০
শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যাত্রাপথে"—২৲
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "প্রেতাত্মার প্রতিশোধ"—৸০
শ্রীরাখালদাস সোম প্রণীত "স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা"—৩৲
শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "সোনার খনি"—১৲
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "আমাদের বাপুজী"—১।০
সুবোধ বসু প্রণীত উপন্যাস "পাথির বাসা"—২।০
ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত
"শ্রীশ্রীজগবন্ধু-হরি লীলামৃত (১১শ খণ্ড)—১।০

হিজ মাষ্টারস ভয়েসের নব-প্রকাশিত রেকর্ড

হিজ মাষ্টারস ভয়েসের নব-প্রকাশিত রেকর্ডগুলি এবার নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ। গান্ধীজীর রামধুন ও তাঁর জীবনাদর্শ সম্পর্কিত, উদয়শঙ্করের "কল্পনা" নৃত্যনাট্যের সেরা সঙ্গীতগুলির এবং রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ডগুলি বিশেষ উপভোগ্য। গান্ধীজীর প্রিয় "রামধুন" আমাদের জাতির জীবনে একটা বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকবে। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কের গানগুলির সঙ্গে একটা গভীর বেদনাময় স্মৃতি জড়িত। এই রেকর্ডগুলির ভাবব্যঞ্জনা বিশেষ মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে সেই কারণেই। উদয়শঙ্করের "কল্পনা"র রেকর্ডগুলির মধ্যে নৃত্য-নাট্য-লীলায় সেরা সঙ্গীতকে ধরে রাখা হয়েছে। এই রেকর্ড ক'খানিতে মহৎ চিন্তা ও ভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। এগুলি গেয়েছেন :—
সুকৃতি সেন, রমা দেবী ইত্যাদি "রামধুন" N 16933, কমল দাশগুপ্ত ও যুথিকা রায়, "ডুব গিয়া কিসমৎ" N 16934, কৃষ্ণচন্দ্র দে "শ্রীগান্ধীজী কি" N 16935 ও "তব জীবনের হোমানলে" P 11890, সুকৃতি সেন "হে মহাত্মা হে দধিচী" N 27827, জগন্ময় মিত্র "গান্ধীজী মোদের কর্ণধার" N 27826 ; রবীন্দ্রসঙ্গীত—কুমারী সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তবে একলা চলরে" N 27823, কল্পনা নৃত্য-নাট্যের—"ছন্দের স্বপ্ন" ও "নৃত্যছন্দ" N 16774, "শাশ্বত সঙ্গীত" ও "কার্ত্তিকের" N 16773, "লোকসঙ্গীত" ও "রাসলীলা" N 16775, "ভাতিজা" ও "ক্যোয়া কঁহু" N 16772, "দীপ জ্বালাও" ও "ভারত জয়" N 16770, "কথা-পুতলী" ও হাল সং" N 16771

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিশ্বাস | প্রভাত ও সন্ধ্যা | ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৫

দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চত্রিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

পরীক্ষা

শ্রীসুজাতা রায় এম-এ, এম্-এড্ (লীড্‌স্)

শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে পরীক্ষা প্রথা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে, এমন কি স্কুল জীবনে প্রত্যেক বৎসরে ছাত্রদের জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করে দেয় পরীক্ষা। তাছাড়াও নানা ব্যবসায়ে এবং নানা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ-অধিকার পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার ওপরে নির্ভর করে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে পরীক্ষা ব্যাপারটির প্রভাব আমাদের জীবনে কম নয়। কার্য্যতঃ স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা মাত্র পাঁচ দিন সময় নিলেও ছাত্র বৎসরের বাকী ৩৬০ দিন এই চিন্তাই করে—পরীক্ষায় কি লিখ্‌তে হবে এবং কোন্ জিনিষ না লিখলে বা না শিখলেও চলে যায়। কাজেই শেখার থেকে ফাঁকির ব্যাপারটাই জীবনে বড় হয়ে ওঠে। তাই এখন আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে বর্ত্তমান পরীক্ষা প্রথাটা কি এবং সে বিষয়ে সংশোধনের কোনও প্রয়োজন এবং অবকাশ আছে কি না।

আমেরিকার কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি কার্নেগী করপোরেশনের সহায়তায় উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। সেই সভাতে যোগ দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, স্কটল্যাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড এবং আমেরিকা। এই সভার ফলে প্রত্যেক জাতি নিজের দেশে তিন বছর ধরে পরীক্ষা সম্বন্ধে গবেষণার কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সনে সকলে তাঁদের কার্য্য বিবরণ দাখিল করেছিলেন। আমরা আজ যে আলোচনা করবো তার খানিকটা ভিত্তি হবে ইংল্যাণ্ডের এই বিষয়ের কার্য্য বিবরণ।

বিভিন্ন পরীক্ষক একখানি পরীক্ষার কাগজে কি নম্বর দেন তা স্থির করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল।

ইংল্যাণ্ডের শিক্ষাবিদ্‌রা যেভাবে গবেষণা করেছিলেন তার প্রণালীটি সম্বন্ধে আগে বলে নিই, তার পরে ফলাফলের কথা বলব।

১। এই কাজের জন্য যে সব কাগজ গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটী কোনও প্রকৃত পরীক্ষায় গৃহীত কাগজ?

২। নিম্নলিখিত পরীক্ষার কাগজগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল।

(ক) স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। ন্যূনাধিক ১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দেয় এবং এই পরীক্ষার ফলে তারা অনেক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং নানা ব্যবসায়ে প্রবেশ-অধিকার পায়। প্রত্যেক বৎসর এ পরীক্ষায় ছাত্রের সংখ্যা হয় ৬০,০০০ থেকে ৭০,০০০।

(খ) বিশেষ পরীক্ষা (Special place Examination)।

১০ থেকে ১২ বৎসরের ছাত্রেরা এই পরীক্ষা দেয়। এই পরীক্ষার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রত্যেক বছর ৪,০০০০০ থেকে ৫,০০০০০।

(গ) অক্সফোর্ড অথবা কেম্‌ব্রিজের কোনও কলেজে পড়বার বৃত্তির জন্য "মাতৃভাষায় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।"

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রে অনার্স পরীক্ষা।

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অনার্স পরীক্ষা।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ছোট বড় সব রকম পরীক্ষাকেই যাচাই ক'রে দেখা হয়েছিল।

৩। নূতন পরীক্ষকের কাছে খাতা পাঠাবার আগে পূর্ব্বের পরীক্ষার নম্বর সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৪। পরীক্ষকেরা প্রত্যেকেই (সেই বিষয়ের পরীক্ষায়) অভিজ্ঞ লোক ছিলেন। স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার চারিটি বিষয়ে এমন পরীক্ষক গ্রহণ করা হয়েছিল, যাঁরা এক সঙ্গে কাজ করে অভ্যস্ত। (মহিলা এবং পুরুষ দুই রকম লোকই ছিলেন।)

৫। পরীক্ষা করবার সময় সম্বন্ধে কোন রকম তাড়াহুড়ো করা হয়নি, কাজেই সময়ের অভাবে সিদ্ধান্তে গোলমাল হওয়ার অবকাশ ছিল না।

৬। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল যাতে প্রশ্নের উত্তর কোনও ক্ষেত্রে পরীক্ষক অনবধানতাবশত: উপেক্ষা করে না যেতে পারেন এবং সন্দেহের কারণ ঘটলেই পরীক্ষকের কাছে কাগজ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৭। পরীক্ষা করবার জন্য পরীক্ষককে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক সাধারণভাবে দেওয়া হয়, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ অথবা কিছু বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছিল। বিনা পারিশ্রমিকে উপযুক্ত অনেক পরীক্ষক পাওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তাহলে এই পরীক্ষাগুলির প্রকৃতি কৃত্রিম হয়ে পড়তো, সেই জন্য তা করা হয়নি।

এই নম্বরগুলি একত্রীকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ রোডস (Dr. Rhodes) করেছিলেন। এর ফলে প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার একটা বই তৈরী হয়েছিল। তার প্রথম ভাগে প্রত্যেকটী পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ ও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল এবং দ্বিতীয় ভাগে দেখানো হয়েছিল যে পরীক্ষার নম্বরের পার্থক্য কিভাবে বিভিন্ন পরীক্ষকের বিভিন্ন মান (Standard) গ্রহণের ওপর নির্ভর করে; আবার একজন পরীক্ষকেরই নিজেরমানের থেকেও হঠাৎ কি রকম ভাবে বিচ্যুতি ঘটে।

৩৫০ পৃষ্ঠার বইয়ের কথা বলবার সময় আমাদের নেই এবং প্রয়োজনও নেই। এখানে শুধু দু'তিনটী মাত্র উদাহরণ আমরা আলোচনা ক'রব। সেইগুলি বুঝলেই সমস্ত বইটার সার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে।

স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় মাঝারি রকমের নম্বর পেয়েছিল এমন ১৫ খানি খাতা ১৪ জন পরীক্ষক আবার পরীক্ষা করেন। তারপরে বছর খানেক পরে তাঁরা দ্বিতীয়বার সেই খাতাগুলি পরীক্ষা করলেন, প্রথমবারের কোনও নম্বর তাঁরা নিজেদের কাছে রাখেন নি। একেবারে মূল পরীক্ষায় এই খাতাগুলি মাঝারি রকমের নম্বর পেয়েছিল, মানে ধরুন ৪০।৪৫ পেয়েছিল—কিন্তু গবেষণামূলক প্রথম পরীক্ষায় কেউ পেল ২১ এবং কেউ ৭০; গবেষণামূলক দ্বিতীয় পরীক্ষায় নীচের দিকের নম্বর হয়েছিল ১৬, আর উপরের দিকের নম্বর হয়েছিল ৭১; ১৪ × ১৫ = ২১০টী মতামতের মধ্যে ৯২টী ক্ষেত্রে এই পরীক্ষকেরা প্রথমবারে যা নম্বর দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বারে অন্য রকম দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র নম্বর হিসাবে পার্থক্য হয়নি, অনেকেই একই ছাত্রকে কোনও বার পাশ কোনওবার ফেল করিয়েছিলেন।

এই রকম ভাবে উপরিউক্ত সব পরীক্ষাগুলির সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাজ করে দেখা গেল যে পরীক্ষকদের নিজেদের মধ্যে এবং একই পরীক্ষকের বিভিন্ন সময়ে দেওয়া নম্বরের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। পরীক্ষকদের মধ্যে এই বিভেদ প্রত্যেক বিষয়েই দেখা গেল। আমরা মনে করতে পারি যে অঙ্কের খাতা পরীক্ষায় অন্ততঃ মতের পার্থক্য খুব বেশী হয়নি। কয়েকখানি অঙ্কের খাতার ফলাফল একই রকম হয়েছিল তা ঠিক্; কিন্তু একটি অঙ্কের প্রশ্নের ফলের কথা জানলে একটু আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সেই প্রশ্নটির পূর্ণ সংখ্যা ছিল ১৫; ১০ জন পরীক্ষকের মধ্যে একজন তাতে ১৫-ই দিয়েছিলেন, ৩ জন ১২, ২ জন ৮, ২ জন ৭ এবং আর ২ জন ৪ দিয়েছিলেন।

মোট কথা পরীক্ষকদের কাজ পরীক্ষা করে দেখা গেল যে কেউ কেউ সব সময়েই বেশী নম্বর দেন, কেউ কেউ সব সময়েই কম দেন এবং অনেক সময়ে একজন লোকই কখনো বেশী কখনো কম দেন।

লিখিত পরীক্ষা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষায় দুই দল পরীক্ষক কি ভাবে নম্বর দিয়েছিলেন তার ফলাফলও বিশেষ বিবেচনাযোগ্য। মৌখিক পরীক্ষা সাধারণতঃ নেওয়া হয় পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি বিবেচনা ও সাধারণ জ্ঞান দেখ্‌বার জন্যে। খুব নামজাদা লোকেদের নিয়ে পরীক্ষকদের দুটী বোর্ড সংগঠন করা হয়েছিল। এঁরা প্রত্যেকে নিজেরা একবার নম্বর দিয়েছিলেন এবং তারপরে এক সঙ্গে হয়ে বোর্ডের মত হিসেবে প্রত্যেকটী পরীক্ষার্থী সম্বন্ধে দুই বোর্ডের আলাদা মত জানিয়েছিলেন। কোনও একটী ছাত্র সম্বন্ধেও সকলের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য ঘটেনি। ঐক্যের কাছাকাছি এসেছিল এই রকম দুটী এবং বিশেষ পার্থক্য ঘটেছিল এ রকম দুটী উদাহরণ এইখানে দিয়ে যাচ্ছি।

ছাত্র	১নং বোর্ড পরীক্ষক					একত্র মত	২নং বোর্ড পরীক্ষক				একত্র মত
	ক	খ	গ	ঘ	ঙ		চ	ছ	জ	ঝ	
১	২২০	২৪০	১৭০	২২০	২৫০	২৩০	২৫০	২৭০	২০০	২১০	২৩২
২	১৮০	১০০	১৩০	১৮০	২৪০	১৭০	২২০	২০০	১৫০	১৯০	১৭৫
৩	২৩০	২৩০	২৫০	২৩০	২৫০	২৩০	২০০	২১০	২০০	১৪০	১৯০
৪	২১০	১৮০	১৫০	২২৫	২০০	২০০	২৭০	২৮০	২৮০	২৩০	২৭০

এ রকম সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের পার্থক্য দেখে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে দৈবের (chance এর) প্রভাব অত্যন্ত বেশী। পরীক্ষকের পরিবর্ত্তন ঘটলেই পরীক্ষার্থীর ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

পরীক্ষার নম্বর দিতে পরীক্ষকদের মধ্যে মতের এরকম পার্থক্য হয় কেন, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। এই চিন্তার ফলে মনে হয় নিম্নলিখিত কারণ গুলি দায়ী হতে পারে:—

১। একই পরীক্ষক যখন এই খাতাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নম্বর দেন তখন আমাদের বুঝ্‌তে হবে যে তাঁর শারীরিক বা মানসিক কোনও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। অনেক সময়ে হজমের পরিপাক ক্রিয়ার গোলমালের জন্য অথবা কোনও অপ্রিয় ব্যাপার আলোচনার জন্য মানুষের মন খারাপ হয়ে যায় এবং মনের মধ্যে এমন একটা অনুদারতা এসে পড়ে যে সে সময়ে পরীক্ষার কাগজে নম্বর কম দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। আবার যখন স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কিম্বা কোনও কারণে মন প্রসন্ন থাকে তখন পরীক্ষার খাতায় বেশী নম্বর দিয়ে ফেলা অসম্ভব নয়।

২। শরীর বা মনের বিকার ছাড়াও অন্য যে কারণে পরীক্ষার নম্বরে পার্থক্য হওয়া সম্ভব তা' হচ্ছে পরীক্ষকের মনে আদর্শ উত্তর সম্বন্ধে ঠিক ধারণা নেই। ধরে নেওয়া যাক্ যে Class X এর ছাত্রদের বসন্ত ঋতু সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষকের কোনও সময় মনে হতে পারে যে এ বিষয়ে ছাত্র নিজে যা লিখেছে তাই যথেষ্ট; কোনও সময় মনে হতে পারে যে তা যথেষ্ট নয়, রবীন্দ্রনাথ থেকে কবিতা উদ্ধৃত করা উচিত ছিল; আবার কোনও সময় মনে হতে পারে যে কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথ কেন কালিদাস, সেক্সপীয়র ইত্যাদি কবির কথাই বা লিখ্‌লে না কেন? এই রকম ভাবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন সম্বন্ধেই প্রায় বিভিন্ন রকমের ভাবা যায়। পরীক্ষক যে সব সময়েই এক আদর্শ সামনে রাখতে পারবেন, এমন কোনও নিশ্চয়তা নাই; কাজেই পরীক্ষার ফলে পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নয়।

৩। একই পরীক্ষকের মনে বিভিন্ন সময়ে নানা আদর্শ আসা সম্ভব হলে বিভিন্ন পরীক্ষকের যে আদর্শের তফাৎ হবে এটা সহজেই বুঝ্‌তে পারা যায়। এই সঙ্গে আরও একটি নিগূঢ় কথা ভেবে দেখা দরকার। প্রত্যেকটা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখ্‌লে দেখা যায় যে তার মধ্যে অনেকগুলি ভাগ আছে। যে রকম একটি রচনার মধ্যে আছে (ক) ভাব (খ) পরিকল্পনা (গ) বানান (ঘ) ব্যাকরণ (ঙ) বাক্য সম্পদ (চ) বাক্য বিভাগ ইত্যাদি। একটি ছাত্র হয়তো অন্য সকল অংশ ভাল করলো, কিন্তু অসম্ভব বানান ভুল করলো। অন্য আর একজন একটিও বানান ভুল করলো না কিন্তু তার রচনায় কোনও রকম ভাব নেই। আর একজনের রচনায় ভাব যথেষ্ট আছে, কিন্তু তার ভাষায় মাধুর্য্য নেই। আর একজনের হয়তো একেবারেই ব্যাকরণ জ্ঞান নেই। এর মধ্যে কোন্ দোষটার জন্য কত নম্বর কেটে নিতে হবে সেকথা কেউ ঠিক্ করে দেয় না। প্রত্যেক পরীক্ষকই নিজের মত অনুসারে সে বিষয়ে স্থির করেন। এরকম অবস্থায় আমরা পরীক্ষার নম্বরের ঐক্য কি করে আশা করতে পারি?

কেবল মাত্র রচনায় যে এরকম বৈষম্য ঘটে তা নয়, প্রত্যেকটা পরীক্ষার বিষয়েই এই বৈষম্যের সম্ভাবনা আছে। অঙ্ক পরীক্ষায় এই সম্ভাবনা নেই মনে করলে ভুল হবে। সব থেকে যে সরল অঙ্ক, একটি সাধারণ যোগ, তাই নিয়েই দেখা যাক্। যদি তিন সংখ্যার যোগ দেওয়া হয় এবং ছাত্র প্রথম দুইটী সংখ্যা ঠিক্ যোগ করে তৃতীয় সংখ্যাটাতে ভুল করে তাহলে তার সম্পূর্ণ নম্বর কেটে নেওয়া হবে কিনা—এ বিষয়ে তর্ক উঠ্‌তে পারে। সাধারণ প্রথা হচ্ছে সব নম্বরটাই কেটে নেওয়া, কিন্তু যে শিশু সবে মাত্র যোগ শিখ্‌ছে আরম্ভ করেছে প্রথম দুটী লাইন ঠিক্ করে কষবার জন্য কোনও নম্বর না দেওয়া কি সুবিচার করা হয়?

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্রশ্ন বিশ্লেষণ না করে বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে কাগজ দিলে পরীক্ষার ফলে ঐক্য আশা করা যায় না এবং বিশ্লেষণ করে দিলেও দৈবের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া যায় না।

পরীক্ষা সম্বন্ধে যে গবেষণামূলক কমিটি বসেছিল তার কাজের ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারা গেল যে পরীক্ষার ফলের ওপরে খুব বেশী আস্থা রাখা যায় না। নম্বর সম্বন্ধে একমত না হলেও পাশ ফেল্ সম্বন্ধে, ধরে নেওয়া যাক্ ৭০টী ছাত্রের বিষয় পরীক্ষকেরা একমত হলেন। কিন্তু বাকী ৩০টীকে হয়তো কেউ পাশ করালেন কেউ ফেল করালেন। যে ৭০টী সম্বন্ধে একমত হয়েছেন তাদেরও বিভাগ সম্বন্ধে বেশীর ভাগেরই ভিন্ন মত। পরীক্ষার ফলের ওপরে ছাত্রদের জীবন অনেক রকমে নির্ভর করে। কাজেই এর প্রণালী পরিবর্ত্তন করে পরীক্ষাকে দৈবের ব্যাপার না রেখে প্রকৃত হিসাব নিকাশের ব্যাপার করে তোলা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে হয়।

পরীক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কয়েকটি নূতন প্রণালীর পরীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ বিষয়ে যে রকম ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিচ্ছি।

নূতন প্রথায় যে পরীক্ষাগুলি প্রণয়ন করা হচ্ছে তাদের তিনটী বিশেষত্ব আছে।

১। যে প্রশ্নটী করা হবে তার উত্তরটার বিষয়ে কোনও বিতর্ক থাক্‌বে না। যেমন, ২+৩=৫ এ বিষয়ে মনে কোনও সন্দেহ থাকে না, সেই রকম সব প্রশ্নেরই উত্তর হবে।

২। উত্তরটী যখন স্বতঃসিদ্ধ তখন পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত দিয়ে কোনও মীমাংসা হবে না। যে উত্তর ঠিক্ করা আছে তিনি কেবলমাত্র সেই উত্তরই গ্রাহ্য করবেন।

৩। পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরী করবার আগে ভেবে দেখ্‌তে হবে যে, যে বয়সের ছাত্রের জন্য প্রশ্নটী করা হচ্ছে সে বয়সের ছাত্রের পক্ষে তা উপযুক্ত হবে কি-না। এই কাজটী কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে অনেক

গবেষণা হয়ে গিয়েছে এবং বয়স অনুযায়ী আদর্শ প্রশ্ন অনেক রকম তৈরী হয়েছে। এই কাজগুলি কি ভাবে করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষকের শিখে নেওয়া দরকার।

পরীক্ষামূলক নতুন কাজকে দুভাগে ভাগ করা যায়।

(১) Intelligence tests অথবা বুদ্ধি পরিমাপক পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য বয়স আন্দাজে ছাত্রের বুদ্ধি কতখানি প্রখর তার পরিমাপ করা। ছাত্র কতখানি শিখেছে এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে তা মাপবার চেষ্টা করা হয় না, কেবলমাত্র তার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রখরতা দেখা হয়। এই পরীক্ষার ফলে এমন হতে পারে—লেখা পড়া শেখেনি এমন একটি ছেলে যথেষ্ট শিক্ষিত অন্য আরেকটী ছেলের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ হয়ে গেল।

(২) School subjects tests অথবা স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে দেখা হয় যে ছাত্রের পড়াশুনা কতদূর হয়েছে। কিন্তু স্কুলের মামুলী পরীক্ষার থেকে এগুলি সম্পূর্ণ অন্যরকম। নূতন প্রণালীর পরীক্ষার যে তিনটি বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন আগে বলা হয়েছে এগুলির তা আছে।

বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে এই পরীক্ষাগুলি নেওয়া হয় তার নমুনা এখানে কিছু দিচ্ছি।

১। সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা (True False Test) নির্দেশ—নিম্নলিখিত কথাগুলির প্রায় অর্দ্ধেক সত্য এবং অর্দ্ধেক মিথ্যা। সত্য কথাগুলির প্রত্যেকটী লাইনের বামদিকে একটি যোগ চিহ্ন দাও, মিথ্যা কথাগুলির (যাহা আংশিক বা সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহার) প্রত্যেকটি লাইনের বামদিকে একটি শূন্য চিহ্ন দাও। না জানিলে কথাগুলিতে কোনও চিহ্ন দিও না।

কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না।

উদাহরণ।

+। আকবর তাইমুরের বংশধর ছিলেন।

০। বাবর আকবরের পিতা ছিলেন।

১। আকবর যৌবনের অধিক সময় দিল্লীর রাজধানীতে কাটাইতেন।

২। আকবর নিজেকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' নাম দিয়াছিলেন।

৩। আকবর যখন সম্রাট হন তখন তাঁহার বয়স খুব কম ছিল।

৪। শেরশাহ্ আকবরের প্রতিনিধি ছিলেন।

৫। বিদ্রোহী বৈরামের প্রতি আকবর সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৬। আকবর যখন সিংহাসনারোহণ করেন তখন তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার পিতামহের সাম্রাজ্যের অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।

৭। আকবরের সাম্রাজ্য কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

৮। আকবর একটি নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৯। আকবর তাঁহার রাজত্বের বড় বড় পদগুলি মুসলমানদের জন্য রাখিয়াছিলেন।

১০। আকবরের রাজত্বের অধিকাংশ প্রণালী আজ পর্য্যন্তও চলিতেছে।

সত্য-মিথ্যা পরীক্ষার প্রকার ভেদ করে আর একরকম পরীক্ষা করা যায় তার নাম "হাঁ" ও "না"।

(১) মঙ্গোলিয়ানরাই কি প্রথম অশ্বকে মানুষের ব্যবহারে লাগিয়েছিলেন? হাঁ না

(২) মহারাজ অশোকের সময়ে কি প্রথম শকটের ব্যবহার হয়েছিল? হাঁ না

(৩) বারুদের আবিষ্কার কি চীনদেশে হয়েছিল? হাঁ না

ছাত্র যে উত্তরটা ঠিক্ মনে করবে সে উত্তরটার তলায় বা পাশে দাগ দেবে।

২। The Multiple-choice Test : বহুর মধ্যে আসল-নির্ণয়

এই পরীক্ষাতে চার রকম উত্তর দেওয়া আছে, তার মধ্যে একটি মাত্র ঠিক্। যেটি ঠিক্ তার পাশে + চিহ্ন দাও।

(১) আকবরের জন্ম পিতার প্রাসাদে হয়নি, তিনি সিন্ধুদেশে জন্মেছিলেন ; কারণ (ক) তাঁর মাতামহ সেখানে ছিলেন, (খ) সেখানে ভাল হাঁসপাতাল ছিল, (গ) শেরশাহের আক্রমণের ভয়ে তাঁর পিতামাতা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, (ঘ) তাঁর পিতামাতা সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

(২) আকবর নূতন ধর্ম্ম প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন ; কারণ (ক) তিনি পুরাতন ধর্ম্মকে মিথ্যা মনে করেছিলেন, (খ) তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মের লোককে এক করতে চেয়েছিলেন, (গ) তিনি স্বপ্নে এই আদেশ পেয়েছিলেন, (ঘ) তিনি নিজের নাম প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

(৩) আকবরের রাজত্ব কাল ছিল (ক) পঁচিশ বছর, (খ) ছত্রিশ বছর, (গ) দশ বছর, (ঘ) উনপঞ্চাশ বছর।

The Matching Test : কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ পরীক্ষা—

কতকগুলি কথা দুই ভাগ করে সাজানো হবে। একদিকে থাকবে কারণ, আর একদিকে থাকবে কার্য্য। কারণগুলির পাশে সংখ্যা নির্দ্দেশ করা থাকবে, সেই সংখ্যাগুলি উপযুক্ত কার্য্যের পাশে বসাতে হবে।

১	২
কারণ	কার্য্য
১। বন্যা	ভূমিকম্প
২। বিদ্যুৎ	জোয়ার ভাঁটা
৩। শুষ্ক আবহাওয়া	বজ্রপাত
৪। জলীয় আবহাওয়া	দিনে গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা
৫। আগ্নেয়গিরির কাজ	পলিপড়া
৬। চন্দ্রের আকর্ষণ	নিবিড় অরণ্য

The Completion Test : শূন্য-পূরণ পরীক্ষা—

এই পরীক্ষাটি সাধারণ ভাবে সকলেই জানে। সনাতন প্রথার পরীক্ষাতেও অনেক সময়েই দেওয়া হয় "শূন্য স্থান পূর্ণ কর"। এই পরীক্ষায় সাবধান হওয়া দরকার যে উত্তর একরকমের বেশী দুরকম কিছুতেই না হতে পারে।

(১) আকবরের পিতার নাম—ছিল।

(২) হুমায়ুন—দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই ধরণের প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এরই প্রকার ভেদ করা যায় একটি ছবির মধ্যে কোনও একটি অংশ বাকী রেখে; যেমন একটি মুখ এঁকে নাক অথবা কান বাকী রেখে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে এ ছবিতে কি নেই। পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরীক্ষা হিসাবে এই রকমের প্রশ্ন খুব কাজে লাগে।

Classification Test : জাতি-পর্য্যায় পরীক্ষা

অনেকগুলি একধরণের একজাতীয় জিনিষের নাম দিয়ে মাঝখানে অন্য জাতীয় একটি জিনিষের নাম দিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রকে বলা হয় যে বিজাতীয় জিনিষের নামটী কেটে দাও। উদাহরণ :—

১। বেড়াল, ঘোড়া, গরু, আম, কুকুর।

২। নর্ম্মদা, বঙ্গোপসাগর, গঙ্গা, সিন্ধু, মহানদী।

৩। কাশ্মীর, গোয়ালিয়র, হায়দরাবাদ, বাংলা, মহীশূর।

এই তিনটি লাইনে আম, বঙ্গোপসাগর এবং বাংলা কেটে দিতে হবে, কারণ এগুলি অন্যগুলির থেকে বিজাতীয় শব্দ।

এই রকমভাবে আরও অনেক নতুন ধরণের পরীক্ষা করা যায়। স্কুল পাঠ্য বিষয়ের একটি বিষয়ের মধ্যে ৪।৫ রকমের নতুন ধরণের পরীক্ষা দিয়ে দিলে সে বিষয়টি সম্বন্ধে খুব চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা হ'য়ে যায়।

এই পরীক্ষাগুলির একটা মজা আছে। প্রশ্নগুলি দেখ্‌তে খুব সহজ এবং পরীক্ষকের পক্ষে এগুলি আরামদায়ক বটে; কিন্তু প্রশ্ন-কর্ত্তার কাজটি সহজ নয়। এরকমের প্রশ্ন করতে অনেক ভেবে করতে হয় এবং পাশের মানও সাধারণ পরীক্ষার মানের মত একটা নিজের খেয়ালমত নম্বর (arbitrary marks) ঠিক্ করে রাখা যায় না, অনেক বিচার করে সেটা ঠিক্ করতে হয়। একবার সব ঠিক্ হয়ে গেলে তারপরের কাজ অবিশ্যি খুবই সোজা।

নূতন ধরণের পরীক্ষা—

গুণ ও দোষ—

গুণ।

১। এই পরীক্ষার বিচার পরীক্ষকের মতের ওপরে নির্ভর করে না। প্রত্যেকটি প্রশ্ন এমন ভাবে তৈরী হয় যে ইচ্ছা করলে একটি কল দিয়ে পর্য্যন্ত এ পরীক্ষার নম্বর ঠিক্ করা যায়। কোনও কোনও জায়গায় কল ব্যবহারের চেষ্টাও হয়েছে কিন্তু তা ব্যয়সাধ্য এবং একটু অসাধারণ ব্যাপার হয়ে পড়ে। এগুলির উত্তরে নম্বর দিতে পরীক্ষক নিজেই কলের মত কাজ করে যেতে পারেন।

২। পুরাতন প্রথায় পরীক্ষা করলে একটি বিষয়ের খানিকটা অংশ মাত্র পরীক্ষা করা যায়। কারণ ছাত্রের উত্তর লিখ্‌তে এত বেশী সময় চলে যায় যে বিষয়টা সমগ্রভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। তার ফলে এই হয় যে ছাত্রেরা সাধারণতঃ বিষয়ের খানিকটা অংশ মুখস্থ করে রাখে, আর বাকী অংশটা শেখে না। কাজেই ব্যাপারটা লটারীর মত দাঁড়িয়ে যায়। ছাত্র যে অংশটা মুখস্থ করেছে প্রশ্ন দৈবক্রমে সেখান থেকে এলে ছাত্র পাশ হয়ে যায়, না এলে ছাত্র ফেল হয়, কিন্তু নতুন প্রণালীর পরীক্ষায় এই রকম লটারীর অবসর থাকে না। বিষয়টী সমস্তটা ভাল করে না শিখ্‌লে ছাত্রের পাশের সম্ভাবনা থাকে না।

৩। যদিও নতুন ব্যবস্থায় ছাত্রের বিষয়টি ভাল করে শেখা প্রয়োজন হয়, তবুও ছাত্রেরা এই রকমের পরীক্ষা অনেক বেশী পছন্দ করে। কারণ এই রকম পরীক্ষায় লিখবার পরিশ্রম অনেক কম হয় এবং পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্ব করবার কোনও সুযোগ থাকে না। পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে অনেক সময়ে অকারণ ভয়ও থাকে; এক্ষেত্রে পরীক্ষক সেই অকারণ সন্দেহের দায় থেকে রক্ষা পান।

৪। এই প্রথায় পরীক্ষা পরীক্ষকের পক্ষেও খুব সুবিধাজনক। পরীক্ষার কাগজ দেখা একটা কতদূর বিরক্তিকর ব্যাপার, তা পরীক্ষকেরা সকলেই জানেন। এই রকমের পরীক্ষায় একটি আদর্শ উত্তর পরীক্ষার্থীর কাগজের সামনে অথবা পাশে রাখলেই পরীক্ষক অতি সহজে নম্বর গুলি দিয়ে যেতে পারেন।

৫। পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষকের সুবিধা ছাড়াও শিক্ষাদানের দিক থেকে দেখলে এই পরীক্ষাগুলির প্রশংসা করতে হয়। এগুলি শুধু বৎসরের শেষে পরীক্ষা নেবার জন্য ব্যবহার না করে ক্লাশের পড়াটা ঠিক্ ভাবে শেখানো হচ্ছে কিনা তা বোঝ্‌বার জন্যও ব্যবহার করা যায়। এই রকম একটি পরীক্ষা ক্লাশে নিয়ে শিক্ষক যদি নিজে উত্তর গুলিতে নম্বর না দিয়ে ছাত্রদের কাছেই সেগুলি পরীক্ষা করতে বিতরণ করে দেন তাহলে ছাত্রেরা খুব সহজে নিজেদের ভুল ত্রুটী বুঝ্‌তে পারে।

আমাদের দেশে বৎসরের শেষের পরীক্ষার আদর্শের ওপরেই সারা বৎসরের শিক্ষার গতি নির্ভর করে। সেই জন্য নতুন ধরণের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার ধরণ পরিবর্ত্তন করে ফেলা যায়।

দোষ।

এই পরীক্ষাগুলির আরও অনেকরকম গুণ আছে। এখানে তা নিয়ে আর আলোচনা করবার দরকার নেই। এইবারে এই গুলির একটি বিশেষ অসুবিধার কথা বলব। এই পরীক্ষাগুলি দিয়ে ছাত্রদের জ্ঞানের পরিমাণ এবং শুদ্ধতা ভাল ভাবেই বুঝে নেওয়া যায়, কিন্তু তাদের রচনা শক্তি বা সংগঠন শক্তি সম্বন্ধে কিছু বোঝা যায় না। রচনা ও সংগঠন শক্তির পরিমাপ না করা হলে ছাত্রকে পরীক্ষা করা সম্পূর্ণ হ'ল এমন কথা বলা যায় না।

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতির যদি আমরা উন্নতি করতে চাই, তবে এই নূতন পদ্ধতির পরীক্ষাগুলি এবং পুরাতন প্রথার পরীক্ষা দুই রকম মিলিয়ে পরীক্ষা নেওয়া উচিত। ছাত্রের বয়স যখন কম তখন রচনা শক্তির ওপর সামান্য নম্বর রেখে তার জ্ঞানের পরিমাণ বোঝবার জন্য নূতন পদ্ধতির পরীক্ষাই বেশী করা উচিত। ছাত্রের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রচনা ও সংগঠনের ওপর জোর বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তবে এই রচনা পরীক্ষার জন্য আমাদের আর একটু বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা দরকার। পরীক্ষার হলে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে একটা রচনা করতে না দিয়ে যদি ছাত্রকে ক্লাশে বেশী সময় দিয়ে এবং নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করবার সুযোগ দিয়ে রচনা করবার অবসর

দেওয়া হয় তবে সেই কাজ দুই এক ঘণ্টার মধ্যে তাড়াতাড়ি করে লিখে দেওয়া রচনার থেকে বেশী মূল্যবান জিনিষ হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তবে যে ক্ষেত্রে আমরা ছাত্রের কেবলমাত্র উপস্থিত বুদ্ধি, উপস্থিত রচনার শক্তি ও স্মরণ শক্তির পরীক্ষা করতে চাই সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বর্ত্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা নেওয়াই প্রয়োজন। কাজেই আমাদের ভালভাবে চিন্তা করে পরীক্ষার প্রশ্ন ও ব্যবস্থা করা দরকার। আমাদের দেখতে হবে, কোন্ বয়সের ছাত্র আমরা পরীক্ষা করছি এবং তার বয়স অনুসারে (১) তার জ্ঞান (২) তার রচনা করবার শক্তি এবং (৩) তার উপস্থিত রচনা ও স্মরণশক্তি, কোন জিনিষটি কতখানি পরীক্ষা করতে চাই, সেই অনুসারে পরীক্ষার প্রশ্ন তৈয়ারী করা দরকার। (৩) সম্বন্ধে আরও একটু কথা বলা দরকার। এই রকম পরীক্ষার বাইরের আদর্শ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিচার করা সম্ভব নয় কাজেই পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত এখানে গ্রহন করা ছাড়া উপায় নেই; কিন্তু অনেক আগে একটি কথা বলেছিলাম যে একটি রচনার মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যেমন (ক) ভাব (খ) পরিকল্পনা (গ) বানান (ঘ) ব্যাকরণ (ঙ) বাক্য সম্পদ (চ) বাক্য বিভাগ ইত্যাদি—এইগুলিতে রচনা ভাগ করে নিয়ে কোন্ ভাগের জন্য কত নম্বর বেঁধে দেওয়া হবে সে বিষয়ে পরীক্ষকদের মধ্যে বিশদ আলোচনা হয়ে যাওয়া দরকার। এই কাজটা করে নিলে এই রকমের পরীক্ষার ফলও অনেকখানি ঐক্যের পথে এসে যায়। পরীক্ষা নেওয়া একটি বিষম দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এর উপরে ছাত্রদের জীবনের গতি এবং অনেক সময়ে জীবন-মরণ পর্য্যন্ত নির্ভর করে। আমরা যদি ধরেও নিই যে বেশীর ভাগ ছাত্র সম্বন্ধে অবিচার হয় না তবুও দু' চারটী ছাত্র সম্বন্ধে অবিচার ঘটতে দেওয়া পরীক্ষকের পক্ষে দায়িত্বশূন্য কাজ। তাছাড়া পরীক্ষাই যখন আমাদের সারা বছরের শিক্ষার গতি নির্দ্দেশ করে দেয় তখন পরীক্ষা পদ্ধতিকে গতানুগতিক না রেখে সুশৃঙ্খল পথে চালিত করবার দায় শিক্ষকদের ওপরেই রয়েছে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করতে এবং অবিলম্বে আমাদের পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থায় সাহায্য করতে দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষককে অনুরোধ ক'রছি।

সোমনাথ মন্দির

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তব দেউলের পতনের সনে দেশের অধঃপাত—
জাতির জীবনে দারুণ বজ্রাঘাত।
বিরাট বিশাল দেব মন্দির,
গুরু গৌরব যুগ সঞ্চির,
স্ফীত উন্মাদ দানবের দল করে দিল ভূমিসাৎ।

উঠিত ভূমার যেথা গম্ভীর শঙ্খ ঘণ্টা রব,
সাগর গাহিত মহামহিম্ন স্তব,
স্নিগ্ধ দিব্য পুণ্য আলোক,
সুদূর হইতে জুড়াইত চোখ,
দীপান্বিত যে প্রভাস বেলায় মুছে গেল গৌরব।

অনন্ত যাঁর মূর্ত্তি এবং অনন্ত রূপ যাঁর—
শিলা ভাঙ্গি' করে দম্ভীরা চীৎকার।
বিজাতীয় বিষ ঝঞ্ঝা প্রবল,
বিষাক্ত করি গেল থল জল,
ছড়াইয়া পচা আমিষগন্ধী ঘন অমা আঁধিয়ার।

কে নাশে তোমারে? তুমি কালজয়ী, জাতীর হৃদয়ে রাজো
ভক্ত রক্তে রাঙা হয়ে আছ আজও।
নয়নে ও মনে তব ছায়া ছবি,
সতত সিক্ত আঁখিধারা লভি,
কোণ জুড়ি দিলে, গোটা ভারতের মন জুড়ি তুমি আছ।

কেরে, তাণ্ডব নৃত্য করিয়া প্রলয়ঙ্কর শিব,
গড় মণিকোঠা জ্বালো আরতির দীপ।
নয় শতাব্দী চলে গেছে জানি
লয়ে অশান্তি অশিবের বাণী,
পাষাণ পেয়েছে সম্বিৎ ফিরে আর নাহি নির্জীব।

অস্থি মজ্জা রক্তে যে ব্যথা বহিছে নিরন্তর,
যে চূড়ার কথা ভোলেনি নীলাম্বর,
রক্তেতে রাঙা রাঙা-পাথরের
স্তবকেতে রচ বেদী আদরের,
কোটি মর্ম্মের মর্ম্মর ভূমে বসুন মহেশ্বর।

নূতন ভুবন যে গড়ে গড়ুক তাহাতে দুঃখ নাই,
ও দেউল মোরা নূতন গড়িতে চাই।
এসো পুরাতন মহিমায় পুনঃ
কোটী কণ্ঠের আহ্বান শুনো,
এসো হে জগন্মঙ্গল শিব তব পূজা দেখে যাই।

বিধর্ম্মী ভাই, ভাঙার সনদ দেখিল সেদিন যেই—
গড়ার সনদ আজি পাঠায়েছে সেই।
মহৎ সৃষ্টি বিনাশই যে পাপ,
ভাঙাকে গড়ায় আসি অনুতাপ,
পূর্ণ করায় গৌরব আছে চূর্ণ করার নেই।

বনফুল

১৮

সদারঙ্গবিহারীলাল যে ঐতিহাসিক মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ সুশোভনের কাছে করেছিলেন সেগুলি দেখতে হলে যে স্টেশনে নাবা দরকার সেই স্টেশনে নেবেই মুচুকুন্দ কুন্তলেশ্বরীর জন্যও গাড়ি বদল করতে হয়। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে সুতরাং সেই স্টেশনে নেবেছিলেন। নেবে নিজের খদ্দরী ঝোলা থেকে কিছু ফলমূল বের করে' এবং স্টেশনের নিকটবর্ত্তী দোকানটা থেকে কিছু লুচি ভাজিয়ে নিয়ে আহারটা সমাধা করে' নিলেন তিনি প্রথমে। তারপর হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ট্রেণের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে এখনও। স্টেশনের দেওয়ালে টাঙানো টাইম-টেবিলটা দেখলেন আর একবার। হ্যাঁ, এখনও অনেক দেরি আছে ট্রেণের। স্টেশন মাস্টারের কাছে গেলেন। তাঁর কাছে নিজের খদ্দরের ঝোলাটি এবং স্যুটকেসটি গচ্ছিত রেখে বেরিয়ে পড়লেন তিনি স্টেশন থেকে। বেশ দ্রুত পদক্ষেপেই বেরিয়ে পড়লেন। অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে আস্তে হাঁটেন না কখনও। ঐতিহাসিক মানুষ তিনি। রাউতপুরের উক্ত প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির কথা তিনিও শুনেছিলেন। এ সুযোগ ত্যাগ করা অনুচিত হবে তাঁর মনে হল। একটু দূর গিয়ে স্থানীয় একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল তাঁর। লোকটি তাঁকে সোজা একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এ রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হবে একটু, মাঠামাঠি গেলে শিগ্‌গির পৌঁছবেন।" অধ্যাপক ব্রজেশ্বর দে মাঠে নেবে পড়লেন।

…মন্দিরের কাছে পৌঁছে হাতঘড়িটার দিকে চাইলেন একবার। তারপর চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। আর একবার হাতঘড়িটা দেখলেন। অবাক হলেন একটু। মোটে তিন মিনিট কাটল। হঠাৎ তাঁর মনে হল সুবিশাল মন্দিরটা যেন আধুনিকতার সমস্ত হৈ চৈ হুড়োমুড়িকে অগ্রাহ্য করে' অচঞ্চল গাম্ভীর্য্যসহকারে সময়ের গতিরোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে! কথাটা মনে হতেই তাঁর ডানদিকের ভ্রূর শেষ প্রান্তটা তড়াক করে' উপরের দিকে উঠে গেল খানিকটা। তারপর সচেতন হলেন তিনি—সময় নষ্ট হচ্ছে—কবিত্ব করে' সময় নষ্ট না করে' মন্দিরটাকে দেখা উচিত আগে ভাল করে' নানাদিক থেকে।

একটু এগিয়ে একটা কোণ ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হল তাঁকে। যা চোখে পড়ল তা অপ্রত্যাশিত। সামনেই একটা মোটর বাইক স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনেই মন্দিরের একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশেই প্রকাণ্ড একটা সুড়ঙ্গ-গোছের, মাটির নীচে চলে গেছে। তার ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছেন কে একজন। তাঁর দেহের নিম্নার্দ্ধ—বিশেষ করে' পশ্চাদভাগটা—দেখা যাচ্ছে কেবল। এখন এই সুযোগে একটা ছোঁড়া পা দিয়ে তাঁর মোটর-বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। ব্রজেশ্বরবাবুর বুঝতে দেরি হল না যে মোটর-বাইক ওই ভদ্রলোকের, ছোঁড়াটা দুষ্টুমি করবার চেষ্টায় আছে। বাইকটা পড়ে' গেলে জখম হতে পারে। পরুষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি—"এই কি হচ্ছে—"

ছোঁড়াটা ছুটে পালাল এবং নানা রকম কসরৎ করে' সুড়ঙ্গ থেকে নিজের দেহকে অতি-কষ্টে মুক্ত করে' বেরিয়ে এলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। হাতে টর্চ।

"কি! বলছেন কি! সুড়ঙ্গের ভিতরও খানিকটা কারুকার্য্য আছে কি না আমি সেইটে দেখছিলাম। মানে, আশা করি অন্যায় হয় নি তাতে কিছু। আপনি কি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কেউ?"

"না। আমি—"

"এই মন্দিরের কারুকার্য্য সম্বন্ধে কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে আমার। আপনি যদি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কেউ না হন তাহলে হঠাৎ অমন ধমকে উঠলেন যে! মাথাটা এমন ঠুকে গেছে আমার। উঃ—"

মাথার পিছন দিকে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। "আমি আপনাকে কিছুই বলি নি। এ মোটর-বাইক কি আপনার?"

"হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু এ কথাই বা জিগ্যেস করছেন কেন তাও তো বুঝতে পারছি না। আমি এ নিয়ে চটাচটি করতে চাই না, কিন্তু অমন আচমকা চীৎকার করবার সত্যি কি কোনও দরকার ছিল? আমার মোটর-বাইক নিশ্চয় আপনার কোনও ক্ষতি করে নি। আশেপাশে প্রচুর জায়গা রয়েছে, স্বচ্ছন্দে আপনি চলে' যেতে পারতেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু ওখানে মোটর-বাইক আমি কেন রাখতে পাব না তা আমি বুঝতে পারছি না। বিশেষ আপনি যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কেউ নন তখন অমন করে' চেঁচাবার—"

"মশাই, আমার কথাটা শুনুন আগে শেষ পর্য্যন্ত। শুনলে হয় তো আপনার রাগ আর থাকবে না—"

"না, না, রাগ আমার হয় নি, রাগের প্রশ্নই উঠছে না। আপনার চীৎকারে আমি এমন চমকে উঠেছি যে মাথাটা ঠুকে গেছে। সুড়ঙ্গের ভিতর সব পাথর কিনা—"

"একটা ছোঁড়া আপনার বাইকটা ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল, আমি তাকেই একটা ধমক দিয়েছিলাম"

"ও, তাই না কি! আরে বাঃ—সো সরি, কিছু মনে করবেন না মশাই, ক্ষমা করুন, মানে করতেই হবে। ছি ছি ধারণার অতীত ছিল—ঠিক—মানে, আচমকা মাথা ঠুকে গেলে মানসিক অবস্থাটা একটু—বুঝতেই পারছেন। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য"

এগিয়ে এসে বাইকটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন একবার। ব্রজেশ্বরবাবু লক্ষ্য করলেন তাঁর দুটি হাতেই প্রচুর কাদা-মাটি লেগে রয়েছে। গবেষণার ফল সম্ভবত। সদারঙ্গ-বিহারীলাল ব্রজেশ্বরবাবুর মুখের দিকে ক্ষমা-প্রার্থনা-ব্যঞ্জক অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হাসলেন একটা। যেন হারমোনিয়ামের একটা 'রীড'কে প্যাঁক করে টিপে দিলে কে একবার। ব্রজেশ্বরবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন কেবল। তাঁর মুখে কোমলতার কোনও আভাস ফুটল না।

"আপনার মাথায় চোট লেগেছে অবশ্য, কিন্তু আপনার বাইকটা চোট থেকে বেঁচেছে"

"নিশ্চয়, আর কোনও ক্ষোভ নেই আমার—একদম না। ছোঁড়াটা গেল কোন দিকে? ছোঁড়া?"

ব্রজেশ্বরবাবু ঘাড় নাড়লেন।

"এ অঞ্চলের ছোঁড়া ছুঁড়ি সব পাজি। আপাদমস্তক। পরশু দিন বাইকটা রাস্তায় রেখে একজনের বাড়িতে গেছি ইতিমধ্যে একটা ছোট্ট ছুঁড়ি এসে হর্ণটা বাজাতে সুরু করেছে। আর একটা গ্যাং বাইকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই দে ছুট। হা-হা-হা—"

"এটা ছোঁড়া। আমার ধমক খেয়ে ছুটে পালাল"

"পালিয়ে বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন"—পাশের ঘন ঝোপটার দিকে চেয়ে সদারঙ্গবিহারীলাল বললেন। এমন-ভাবে বললেন যেন ছোঁড়াটা পাশের ঝোপেই লুকিয়ে আছে এবং তাঁর কথা শুনছে।

"প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উচিত এই সব হতভাগা ছোঁড়াদের এখানে ঢুকতে না দেওয়া। এখানে গরু চরাচ্ছে, ছাগল চরাচ্ছে—যা তা। একদিন দেখি একটা ছোঁড়া দমাদ্দম্ কাটি ঠুকছে মন্দিরের গায়ে—একটা চমৎকার বিষ্ণুমূর্ত্তি ছিল সেখানে—বিষ্ণুর কপাল ফেটে চৌচির—দেখবেন? আসুন না। প্রত্নতত্ত্ববিভাগে লেখা উচিত। লিখব ভাবছি। একে ধর্ষণ বললে কিছু অন্যায় হয় না। হয়?"

বলা বাহুল্য সদারঙ্গবিহারীলাল একটা আলঙ্কারিক উপমা মাত্র দিয়েছিলেন। এই আগন্তুক ভদ্রলোক কিন্তু যে ভাবে সেটা নিলেন তা অপ্রত্যাশিত। রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল। দ্বিতীয়বার যেন তাঁর মাথা ঠুকে গেল।

"হয়"—ব্রজেশ্বরবাবু বললেন—"আপনি যখন প্রশ্ন করলেন তখন আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই।"

অপ্রস্তুত সদারঙ্গবিহারীলাল সবিস্ময়ে এই খদ্দর-পরিহিত ব্যক্তিটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন বার দুই। আশ্চর্য্য! বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই যে আসলে ইনি এতবড় একটি কালাপাহাড়।

"মিল নেই? সত্যি? প্রত্যাশা করি নি। ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু"

"আপনাদের মতো লোকই কেবল এসব জায়গায় আসতে পারবে, অন্য কেউ পারবে না—এটা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না আমার"

"হয় না? আশ্চর্য্য কাণ্ড। এটা নিশ্চয়ই আপনাকে মানতে হবে অতীতের এই গৌরবময় মন্দিরে এমন লোকের প্রবেশ করা উচিত নয় যারা এর মূল্য সম্বন্ধে সচেতন নয় এবং সেই জন্যেই যারা সশ্রদ্ধ নয়, মানে, এককথায় চাষার স্থান এ নয়। চাষারা এখানে এসে যে কি কাণ্ড করে—উঃ কি সাংঘাতিক জানেন? কে একজন হারাধন বসাক ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করেছে একটা মূর্ত্তির পেটের উপর। চোয়াড়ের দল সব! স্বচ্ছন্দে সরে' থাকলেই পারে। অতীতের প্রতি যাদের শ্রদ্ধাই নেই তাদের এখানে দরকার কি—তারা আসবেই বা কেন! হারাধন বসাকের দল যখন এসুর্বের দফা নিকেশ করে দেবে তখন কি হবে বলুন তো? আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? এসব কি বাজারে পাওয়া যায় যে আর একটা কিনে এনে বসিয়ে দিলেই চলবে? আমার মতে এমন কোনও বাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয় যারা এসবের মর্ম্ম বোঝে না, এসবকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না—"

সদারঙ্গবিহারীলালের কণ্ঠস্বরে উষ্মা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আসলে যে সুর তাতে বাজছিল তার উদ্দেশ্য এই অদ্ভুত প্রকৃতির আগন্তুকটিকে স্বমতে আনয়ন করা।

ব্রজেশ্বরবাবু মন্দিরের ভগ্নস্তূপের দিকে অতিশয় তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন একবার। তারপর পরিষ্কার শান্তকণ্ঠে বললেন, "মাপ করবেন, এই সব চুণ-সুরকির স্তূপকে শ্রদ্ধা করতে আমি প্রস্তুত নই"

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বললেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে চাইলেন। সদারঙ্গবিহারীলাল নাকের মাঝখানটা চুলকুলেন একবার এবং যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লেন হঠাৎ। নির্ব্বাক হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। লোকটা বলে কি!

ব্রজেশ্বর পুনরায় মুখ ফেরালেন এবং নিজের দৃষ্টিকে ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত করলেন সদারঙ্গবিহারীলালের রশ্মিবিকিরণশীল চশমার উপর। একটা অতি ক্ষীণ হাসি—বা ঠিক হাসি নয়, হাসির আভাষ—তাঁর অধরে ফুটি ফুটি করেও যেন ফুটল না।

"না"—নিজের চিন্তাধারাকে বাঙ্ময় করে' তিনি যেন বললেন—"এমন সব মন্দির আছে যার গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত কাটতে পারে না কেউ—ধ্বংস করা দূরে থাক। কিন্তু সে সব মন্দির হাতে-তৈরি চুণ-সুরকির মন্দির নয়। বিজ্ঞানের মন্দির, সাহিত্যের মন্দির, যে সব মন্দিরে পূজারীরা জ্ঞানলাভ করে' প্রকৃত আনন্দ পান সেই সব মন্দিরই পবিত্র, সেই সব মন্দিরকেই আমি শ্রদ্ধা করি। একটা পচা পুরোনো শিবমন্দির বা বিষ্ণু মন্দির"—ভগ্নস্তূপের দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন তিনি—"থাকল বা গেল কি এসে যায় তাতে। একটা হাত পা ভাঙা মূর্ত্তির চেয়ে জীবন্ত হারাধন বসাক ঢের বেশী শ্রদ্ধেয় আমার চোখে—"

সদারঙ্গবিহারীলাল ঈষৎ ব্যাদত আননে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। অদ্ভুত লোক! আর একবার কৌতূহলভরে আড়চোখে চেয়ে দেখলেন দীর্ঘাকৃতি লোকটির দিকে। এদেরই কি গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে? অসম্ভব নয়। সরু লম্বা মুখখানা। মনে হয় ছেলেবেলায় সমস্ত মুখখানা ধরে' লেবুর মতো নিংড়ে দিয়েছে কেউ যেন। ছুঁচলো থুতনিটাতে ফুটে উঠেছে ভদ্রলোকের চরিত্র—ঠিক দৃঢ়তা নয়—একগুঁয়েমি। চোখ দুটি কিন্তু ঠিক উলটো। আশ্চর্য্য! যদিও বসা কিন্তু চোখে একগুঁয়েমি বা রুক্ষতার কোনও চিহ্ন নেই। বরং দৃষ্টি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা স্নিগ্ধ। সদারঙ্গবিহারীলাল এ-ও লক্ষ্য করলেন ভদ্রলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুব। খদ্দরের জামা কাপড় ধপধপ করছে। পোষাকে আড়ম্বর নেই, কিন্তু মার্জ্জিত রুচির পরিচয় আছে। এঁকে দেখে তো মনে হয় না যে ইনি কোনও মূর্ত্তি নষ্ট করতে পারেন বা কোনও অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণায় বাধা দিতে পারেন। মোটেই মনে হয় না। অথচ কথাবার্ত্তা থেকে—। আশ্চর্য্য!

এ কথাটা ব্রজেশ্বরবাবুরও মনে হল সম্ভবত। কারণ এর পরই তিনি যা বললেন তার সুর অন্যরকম। বেশ নরমই—অনেকটা ক্ষমাপ্রার্থনার মতো শোনাল।

"আমার মতামত তা বলে' জোর করে' চাপাতে চাই না আপনার ঘাড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের মত পোষণ করবার অধিকার আছে"

"তা আছে বই কি! বাঃ। ভাল লাগল এ কথাটা—" চশমাটা ঠিক করে' নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন সদারঙ্গবিহারীলাল হাস্যোদ্ভাসিত মুখে।

ব্রজেশ্বরবাবু বললেন, "খাপছাড়াভাবে আমার অভিমতটা শুনে আপনার একটু বেখাপ্পা ঠেকছে বোধহয়। একটু হকচকিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে। যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে একটু পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে বলি"

"আপত্তি? মোটেই না। ভারী ইন্‌টেরেষ্টিং বরং"—

"আপনার কি ধর্ম্মবাই আছে? কারণ ও ব্যাধি আক্রমণ করেছে যাঁকে তাঁর কাছে যুক্তির অবতারণা করা বৃথা। তিনি চাইবেন সকলে তাঁর প্রলাপকে যুক্তিযুক্ত বলে' মেনে নিক"

সদারঙ্গবিহারীলালের হাসি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে উঠল।

"বিপক্ষের যুক্তিকে সবাই প্রলাপ বলে' প্রতিপন্ন করতে চায়। সে কথা যাক। আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন না। বেশ লাগছে"

"দেখুন"—ধীরে ধীরে সুরু করলেন ব্রজেশ্বরবাবু—"যে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধি প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মূলকথা, তার সঙ্গে এই পাথরের স্তূপের সম্পর্ক নির্ণয় করা একটু কঠিন নয় কি? ধর্ম্মটা হল আত্মিক ব্যাপার—আর এগুলো—পাথরের শিব-লিঙ্গই হোক বা সোনার ষাঁড়ই হোক—হাতে তৈরি স্থুল ব্যাপার—"

"এক মিনিট"—সোৎসাহে বলে' উঠলেন সদারঙ্গবিহারী—"থামুন—বাঃ চমৎকার জমবে মনে হচ্ছে। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা জিগ্যেস করে নি। আপনার এবং আমার ধর্ম্মমত কি এক"

"হওয়া সম্ভব বলে' মনে হয় না"

"ব্রাহ্ম না কি আপনি"

ব্রজেশ্বর ঘাড় নাড়লেন।

সদারঙ্গবাবু তাঁর মুখের দিকে ক্ষণকাল নির্নিমেষে চেয়ে থেকে আবার যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন।

"তা হোক। হিন্দু বলে' পরিচয় দেন নিশ্চয় নিজেকে"

"নিশ্চয়"

"ভারতীয় বলেও"

"অবশ্য"

"তাহলে, মানে, শুনুন আপনার কাছ থেকেও এরকম আচরণ তো প্রত্যাশা করা যায় না। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকতার তর্ক তুলব না—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পড়ে দেখুন গিয়ে—তুললে অনেক সময় নষ্ট হবে। আমি শুধু এই কথা বলছি যে এটা প্রত্যাশা করা যায় না আপনার কাছ থেকেও যে হিন্দু হয়ে আপনি হিন্দুত্বের গায়ে কাদা ছিটিয়ে বেড়াবেন, ভারতীয় হয়ে ভারতের গৌরব সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন। হারাধন বসাককে আপনি অলরেডি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখছেন, যে ছোঁড়াটা আমার বাইক ফেলে দেবার চেষ্টা করছিল তাকেও দলে টানবেন না কি!"

হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ। চোখ দুটো বুজে গেল।

ব্রজেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন, "টানতে আপত্তি নেই। আমি যদি বুঝতে পারতাম যে আপনি ওই সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে ভারতীয় হিন্দুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করছেন, তাহলে মৃদু প্রতিবাদস্বরূপ আমি নিজেই হয়তো আপনার সাইকেলকে লাথি মেরে ফেলে দিতাম"

"দিতেন? বাঃ, চমৎকার তো! ব্যাপার কি বলুন দেখি! আপনার মনোভাবটা বুঝতে পারছি না ঠিক"

"সংক্ষেপে তা হচ্ছে এই। আপনি যখন একটা ভাঙা কার্নিস বা অন্ধকার সুড়ঙ্গ নিয়ে আপনার হিন্দুশক্তি ব্যয় করেন তখন ভেবে দেখেন না যে আরও কত দরকারি কর্ত্তব্য অকৃত রয়েছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে, তামসিকতার বিরুদ্ধে কত যুদ্ধ করতে হবে—"

"ঠিক। এ সব তো জানিই—বাঃ"—উচ্ছ্বসিত হয়ে উর্দ্ধ কথা বলে ফেললেন সদারঙ্গ—"ওসবের বিরুদ্ধেই তো আমারও জেহাদ। আমিও যোদ্ধা একজন, পলাতক নই, রোজ যুদ্ধ করছি। কিন্তু এটা হচ্ছে বিশ্রাম—অবসর বিনোদন—ইংরেজিতে যাকে 'রিল্যাকসেশন' বলে"

"কিন্তু আপনার এই অবসর বিনোদন দেশের অনিষ্ট

করছে তা জানেন? যা আপনি মুগ্ধনেত্রে দেখছেন তাই প্রেরণা জোগাচ্ছে আপনার শত্রুপক্ষকে—সেই শত্রুপক্ষকে যারা কুসংস্কারের বেড়াজালে ঘিরে, ধর্ম্মের ভয় দেখিয়ে, নানারকম আইন অজুহাত খাড়া করে' লক্ষ লক্ষ লোকের শ্বাসরোধ করে' মেরে ফেলছে। তাদের সংস্কার-ধর্ম্ম-আইনও এই ধ্বংসস্তূপের মতো সেকেলে, কিন্তু একটু তফাত আছে—ধ্বংসস্তূপের মতো নিষ্ক্রিয় নয় সেগুলো, কারাগারের মতো ভীষণ। ভেবে দেখেছেন এসব কথা কখনও?"

সদারঙ্গবিহারীলাল কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু ব্রজেশ্বরবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে উচ্চতর কণ্ঠে বললেন, "আপনারা অতীত অতীত বলে' লাফিয়ে বেড়ান, কিন্তু ইতিহাস উল্টে দেখুন অতীতে আনন্দজনক তেমন কিছু নেই। ডাকাতদের লোমহর্ষণ কাহিনী কেবল। আমার মতে অতীতের অধিকাংশই পুঁছে ফেলা উচিত, উপড়ে ফেলা উচিত, বর্ত্তমানের জীবনযাত্রায় অতীতের ছায়া-পাত অসহ্য। অতীতের যেটুকু শ্রদ্ধের তার কথা আগেই বলেছি—সাহিত্য আর বিজ্ঞান। এই সব ইঁটের টুকরো, সুরকির গুঁড়ো, প্রথার হুমকি, কুসংস্কারের দাসত্ব—এরা প্রাণহীন মৃত এবং সেই জন্যেই অনিষ্টকর। এদের ঝেঁটিয়ে পুড়িয়ে ফেলে দিলে তবে আমাদের বর্ত্তমান জীবন হালকা ঝরঝরে হবে"

"সর্ব্বনাশ! আপনি কি সোশালিষ্ট?"

"নিশ্চয়। যদিও এই লেবেল গায়ে এঁটে দেশের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছেন অনেকে"

"অ্যা? আপনার চেয়েও বেশী ঝাঁঝালো সোশালিষ্ট আছে না কি! ও বাবা"

মৃদু হাসি ফুটে উঠল ব্রজেশ্বরের মুখে। চোখ দুটো মিটমিট করতে লাগল।

"কোন বিষয়েই বেশী ঝাঁজ আমি ভাল মনে করি না। আমি—"

কি একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করে থেমে গেলেন তিনি। নিজের কথা বলতে সঙ্কোচ হল বোধ হয়।

"কিছু যদি মনে না করেন, একটা কথা বলতে লোভ হচ্ছে"

"কি বলুন"

"প্রগতিশীল নামে আজকাল একটা যে দল হয়েছে আপনাকে সেই দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমার। ভুল করলাম বোধ হয়, না?"

"না মারাত্মক ভুল হয় নি। তবে এটাও ঠিক, তেমন প্রগতি হয় নি আমার। বেশী প্রগতি বরদাস্তই হয় না। কাজ করার চেয়ে হাততালির লোভ যাঁদের বেশী তাঁদেরই প্রগতি সুরু করে' বেড়ে যায়। হাঁপিয়েও পড়েন তাঁরা চট করে'। পেছিয়ে যান শেষে—প্রগতি পশ্চাৎ-গতি হয়ে দাঁড়ায় শেষটা। সত্যি যারা কর্ম্মী তারা হুড়োহুড়ি করে' এগিয়ে যেতে চায় না, পেছিয়েও পড়ে না। আমি কোনটাই করি নি"

"ও। যাক আপনাকে দেখে খুশী হয়েছি খুব। মানে, খুব। আমি রাজনৈতিক কর্ম্মী নই—সে যোগ্যতাই নেই সম্ভবত আমার। কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে কৌতূহল আছে,—ভীষণ। আমার ভাঙা তক্তাপোষের উপর বসেই রাজাউজির লাটবেলাট গান্ধি জহরলাল সব্বাইকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছি হরদম!"

(ক্রমশঃ)

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৯

বৈশাখী পূর্ণিমা আসিল। অস্ত সন্ধ্যায়, অথবা প্রথম যামের প্রথম পাদে আমরা যাত্রা করিব—আমরা তজ্জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আছি। মহাস্থবির গণনা করিয়া আমাদের যাত্রার সময় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন—বলিয়া পাঠাইয়াছেন, গণিত শুভক্ষণের মধ্যে যেন যাত্রা করা হয়। স্থির হইয়াছিল আমরা বাণিজ্যের ব্যপদেশে সংগৃহীত দ্রব্য সম্ভার লইয়া দুইজন অনুচরের সহিত নৌকাযোগে কপিষার স্রোতধারা বাহিয়া প্রথমে কপিষা নগরীতে গমন করিব। তথায় সুবর্ণবিহারে আমাদিগকে দিন কয়েক অবস্থান করিতে হইবে। সুবর্ণবিহারের সংঘস্থবির আমাদিগের বাহ্লিক গমনের সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। উত্তর ও প্রতীচ্যদেশযাত্রী বৌদ্ধ সার্থবাহ ও বণিকগণের পথে বিশ্রামের জন্য, কিংবা যাত্রার কোনও বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ গ্রহণোদ্দেশ্যে কপিষার সুবর্ণবিহারে সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে অবস্থিত ও প্রতীচ্যের দ্বারস্বরূপ এই কপিষার বণিকবীথিতে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া থাকে। বণিক ও সার্থবাহগণ কর্ত্তৃক আনীত অনেক দ্রব্য কপিষায় উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয় এবং সুযোগ বুঝিয়া অনেকে তাহাদের পণ্য অনেক সময়ে কপিষার বীথিতে বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক আপনাপন সম্ভার লঘু করিয়া লইয়া থাকে। আমাদেরও হয়ত এইরূপে আমাদের সংগৃহীত পণ্যসম্ভার পথিমধ্যে লঘু করিয়া লইতে হইবে। আমরা যথাসম্ভব আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া আমাদিগের তথাকথিত বাণিজ্যের পণ্যসমূহ বর্জ্জনপূর্ব্বক বাহ্লিকে প্রবেশ করিব। বাহ্লিকে আমরা বুদ্ধব্যবসায়ী যবন বলিয়া পরিচিত হইব। মহাস্থবিরের প্রদত্ত পরিচয় পত্র আমাদিগের এই অভিনব প্রচেষ্টা সমর্থন করিবে। বাহ্লিকে প্রজ্ঞা ও আমি সাম্রাজ্যের মহামাত্য মহাবলাধিকৃত ষ্ট্রাটেগস্ ফিলোষ্ট্রাটসের সহিত সম্মিলিত ও পরিচিত হইব। আর্য্য মহাস্থবির মহামাত্যের নিকট আমাদের যে পরিচয়পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি আমাদিগকে পুরুষপুরবাসী বৌদ্ধ যবন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রজ্ঞাকে ও আমাকে তিনি যথাক্রমে সফোনিডস্ ও থেওডোটস্ এবং আমাদের দুইজন অনুচরকে পালিঅস্ ও আওয়েফিলস্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দুই ব্যক্তি আমাদের প্রধান অনুচর হইবে।

পূর্ব্বাহ্নে মহাস্থবির ত্রাণ সংঘের দুই জন সদস্যসহ আমাদিগের নিকট আগমন করিলেন। সদস্যদ্বয় আমাদিগের অভিযানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ মহাস্থবিরের নির্দ্দেশানুসারে বহন করিয়া তাঁহার সহিত আসিল। ত্রাণসংঘের এই দুইজন সদস্য পুরুষপুরবাসী ও বৌদ্ধ সংঘের দুইজন শ্রমণ।

অভিযানের আনুষ্ঠানিক ও যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহাস্থবির আমাদের উভয়ের হস্তে ত্রিংশ সহস্র করিয়া ষষ্ঠি সহস্র সুবর্ণ দিনার অর্পণ করিলেন। আমাদিগের বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের কোনও অভাব হয় নাই। প্রাচ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে নানা প্রকার বহুমূল্য পণ্যসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। মহাচীন হইতে চীনাংশুক আসিয়াছিল, গৌড়, সমতট ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইতে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র, পট্ট ও ক্ষৌমবাস, মগধ ও গৌড় হইতে ইক্ষু, খর্জ্জুর ও তাল বৃক্ষ নির্য্যাস হইতে প্রস্তুত শর্করা ও মৎস্যণ্ডী, সমতট হইতে মধু সযত্নে সংগৃহীত ও আনীত হইয়া আমাদের বাণিজ্য সম্ভার সমৃদ্ধ করিল। এমন কি ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধের উপদেশ বাণীতে নিষিদ্ধ হইলেও প্রতীচ্যে সমাদৃত ও যবনদিগের বিলাসের জন্য প্রাচ্যের "সুরামেরয় মদ্য" পর্য্যন্ত আমাদিগের সংগৃহীত বাণিজ্য সামগ্রী মধ্যে উপেক্ষিত হয় নাই—গৌড়ী ও মাধ্বী সুবিখ্যাত প্রাচ্যসুরা বিক্রয়ের জন্য বংশ ও দারু নির্ম্মিত আধারে সযত্নে ও সতর্কতার সহিত রক্ষিত হইয়া আমাদের পণ্য দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। গৌড়দেশ হইতে আনীত তিনখানি সুবৃহৎ নৌকা আমাদের পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ও সজ্জিত হইল। পুরুষপুরের একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ও বাসোপযোগী সুসজ্জিত নৌকা মাসাবধিকাল পূর্ব্ব হইতে আনন্দ আমাদের ঘট্টার তীরতরুর আনত স্রোতবারি চুম্বিত বৃক্ষশাখার ঘন পল্লব ও পত্রাবলীর অন্তরালে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সেই খানিতে অভিযানের সময় আমাদের অবস্থানের জন্য স্থির হইল এবং তাহাতে দিবসে বসিবার ও আহারাদির জন্য এবং রাত্রে শয়ন ও বিশ্রামের জন্য শয্যারচনার ব্যবস্থা হইল। আনন্দের উপর নৌকাগুলি সৌষ্ঠবের সহিত সজ্জিত ও রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইল। আজি চারিদিন সে এই কার্য্যে ব্যাপৃত—বিশ্রাম নাই, কোনও প্রকারে দিনান্তে স্নানাহার সমাপন করিয়া লয়।

আমরা স্থির করিয়াছি যে কপিষার পণ্য বীথিকায় এবং পথে সুদূর পাশ্চাত্যদেশগামী সার্থবাহ ও বণিকগণের নিকট আমাদের সংগৃহীত পণ্যসমূহ বিক্রয় করিয়া আমরা তাহাদিগেরই সহিত বাহ্লিকাভিমুখে প্রয়াণ করিব এবং বহ্লিকনগরীতে আমাদের অভিযান আপাততঃ শেষ হইবে। কপিষার সুবর্ণবিহারে আমাদের কয়েক দিবসের অবস্থানের কথা উল্লেখ করিয়া পুরুষপুরবিহারের আর্য্য মহাস্থবির সুবর্ণবিহারের মহাস্থবিরকে সেই মর্ম্মে পত্র দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

অপরাহ্নে আর্য্য মহাস্থবির পুনর্ব্বার শ্রমণ বুদ্ধপালিতের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে অদ্য রাত্রের প্রথমপাদে উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসীতে অমৃতযোগে যাত্রা করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ নিষিদ্ধ। সায়াহ্নে সংঘারাম হইতে আরত্রিক মাঙ্গল্য আসিলে আমরা উহা গ্রহণ করিয়া যামিনীর প্রথমপাদে কৌমুদী-উদ্ভাসিত কপিষা-বক্ষে আমাদের তরণীর বন্ধন মুক্ত করিব।

অনুচর কাহাকে লইব তাহাই এখন বিবেচ্য। প্রজ্ঞা যাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে সে তাহার আশৈশব ক্রীড়াসঙ্গী এবং এখন তাহার পরিচারক ও সেবক। তীর্থকের উপর প্রজ্ঞার অপরিসীম বিশ্বাস ও নির্ভর। প্রজ্ঞার জন্য সে অনেকবার আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছে।

কিন্তু আমি কাহাকে সঙ্গে লইব? এখন সমস্যা তাহাই। আনন্দ কি যাইবে? সে ত এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পথের কষ্ট কি সহ্য করিতে পারিবে?

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে প্রজ্ঞা ও আমি সজ্জিত নৌকাসমূহ দেখিতে কপিষাতটে গমন করিলাম। দেখিলাম, আনন্দ তাহার কার্য্য শেষ করিয়া ঘট্টার সন্নিকট বৃক্ষচ্ছায়ায় একটি প্রস্তর বেদীতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। মুখে বিষাদ ও চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে। আমরা নৌকায় সজ্জিত পণ্যসম্ভার দেখিলাম। দেখিলাম, সকলই সুসজ্জিত ও সৌষ্টবের সহিত রক্ষিত। আমরা পণ্যসজ্জা পর্য্যবেক্ষণ সমাপন করিলাম। প্রজ্ঞা তীর্থকের সহিত গৃহে ফিরিল। আমি আনন্দের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

আমি আনন্দের পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহার হইয়াছে, আনন্দ?"

—হাঁ, ভাই, হইয়াছে।

—আজ এত বিষণ্ণ কেন, আনন্দ?—একেবারে মৌন, নির্ব্বাক—ব্যাপার কি—বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ কি?—বড় কষ্ট হইয়াছে, না? —আজ কয়দিন অবিরাম পরিশ্রম হইতেছে।

—আমাকে না কি তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে না স্থির করিয়াছ?

—এই বয়সে পথের কষ্ট কি সহ্য করিতে পারিবে?

—পারিব।—আমার শরীর এখনও ত বেশ ভালই আছে।—রুগ্ন ত নহি!

—কিন্তু, তুমি যাইবে কেন, আনন্দ?—আর সেখানে গিয়াই বা তুমি কি করিবে?—তুমি কি সেখানে যবনের ছদ্মবেশে—যবনের মত—থাকিতে পারিবে?—এমন কি, যবনের সঙ্গে—যবনের বাটীতে থাকিতে হইবে।—পারিবে কি?

—কেন পারিব না? পারিব বলিয়াই ত যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি। তুমি আর বাধা দিও না, দাদা!

—তার পর, ভায়া,—তুমি ত যবনের ভাষা জান না!

—লিখিতে পড়িতে পারি না—তবে পুরুষপুরে যবনদিগের সহিত বাল্যকাল হইতে মিশিতাম—আমি তাহাদের কথা বুঝিতে ও বলিতে পারি।

—সে-কি? তুমি তাহা হইলে যাবনিক ভাষা জান? আর তীর্থক'—প্রজ্ঞার অনুচর—সেও কি তোমার মত যাবনিক ভাষা জানে?

—সে আমারই মত জানে।

—পিতা কি তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন?

—দিবেন কি? দিয়াছেন। তুমি আমাদের নয়নের মণি—আমাদের সর্ব্বস্ব—স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনে চলিয়াছ। বিদেশে একেলা—না জানি কত কষ্ট পাইবে—আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারি কি? পিতা আমাকে তোমার সহিত যাইতে আদেশ করিয়াছেন।

—তুমি প্রৌঢ়বয়স্ক—পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে কি না জানি না,—তাহার পর তোমাদের সেখানে ছদ্মবেশে থাকিতে হইবে—সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতে হইবে—পারিবে কি? জানি না—হয়ত, গোলযোগের সৃষ্টি হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিলম্ব ঘটিবে।

—কোনও ভয় নাই, ভাই!—তোমাদের মত আমরাও যবনের বেশে—যবনের আচারে থাকিব। যবনের মত কথা কহিব। তাহাদের মত চলাফেরা করিব। কোনও গোলযোগের সৃষ্টি হইবে না। আমি প্রভুর সহিত অনেকবার প্রতীচ্যের যবন ও ম্লেচ্ছ দেশে গিয়াছিলাম। সেই দূর দেশের অনেক ব্যাপারই দেখিয়া আসিয়াছি। গত বৎসর গন্ধারে গিয়াছিলাম—সেখানকার অবস্থার সহিত আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সেখানকার অনেক যবন তাহাদের নিজের ভাষা ভাল জানে না, তাহাদের অনেকে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব। আমার এই বুড়া বয়সে আর কেন আমাকে কাঁদাইবে ভাই? আমার আর আছে কে বল ত? আর বাধা দিও না, ভাই! তীর্থক যাইতেছে; আমিও তোমার সঙ্গে যাইব—চল।

আমি ত বড় বিপদে পড়িলাম। আনন্দ যেরূপ সাগ্রহ দেখিতেছি তাহাকে নিবারণ করা একপ্রকার দুঃসাধ্য। যেরূপ দেখিতেছি, সে কোনও বারণ শুনিবে না। তীর্থকও শুনিলাম, এইরূপ আগ্রহের সহিত প্রজ্ঞার অনুগামী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমি আনন্দকে নিরস্ত করিবার অনেক নিষ্ফল চেষ্টা করিলাম। আমি আরও বলিলাম—"আনন্দ, তোমার এখন অনেক বয়স হইয়াছে—এখন বিশ্রামের আবশ্যক। পিতা তাহা বুঝেন—এবং সেইজন্য তিনি তোমাকে কোনও শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাটীতে সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। পথে অনেক কষ্ট পাইবে। অনেক বিপদের সম্ভাবনা। হয়ত তোমাকে লইয়া গণ্ডগোলে পড়িব।"

—না দাদা, কোনও বিপদে পড়িতে হইবে না। এখনও আমি তত নির্জ্জীব ও বলহীন হই নাই। তোমার কোনও চিন্তা নাই, ভাই! এখনও আমার শরীরে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা অবশিষ্ট আছে!

আনন্দ শৈলবেদিকা হইতে উঠিল এবং উহার উপরের সুবৃহৎ শিলাপট্টখণ্ড ধীরে ধীরে উচ্চে উত্তোলন করিয়া কিছুক্ষণ পরে পুনরায় উহা ধীরে ধীরে নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিল। বুঝিলাম যে

জীবনের অপরাহ্ণেও আনন্দের বাহুতে অনন্যসাধারণ শক্তি আছে। এরূপ বল বোধ হয় অনেক যৌবনতেজদৃপ্ত যুদ্ধব্যবসায়ী মল্লের বাহুতেও বিরল। তাহার এই বয়সে এইরূপ ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্মিত ও প্রীত হইলাম। আনন্দের লৌহ-কঠিন দেহ যে অপরিমিত শক্তিশালী তাহার পরিচয় ইহার পূর্ব্বেও অনেকবার পাইয়াছিলাম। আর, আমার প্রতি স্নেহও ছিল তাহার অপরিসীম। তাহার সেই সমগ্রজীবনব্যাপী ভালবাসা ও প্রীতি সৌর-কিরণের ন্যায় আশৈশব আমার জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া মাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

আবেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে আমার কম্পিত হস্ত আমি আনন্দের স্কন্ধে রাখিলাম; দেখিলাম, তাহার স্নেহোৎফুল্ল নয়ন প্রান্তে অশ্রু টলটল্ করিতেছে। লৌহদণ্ডোপম তাহার সুদৃঢ় বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তাহার বিশাল বক্ষের উপর সে আমাকে টানিয়া লইল। শৈশবে ও বাল্যে যেমন তাহার বাহু বন্ধনের মধ্যে আমি আশ্রয় লইতাম, অদ্য যৌবনের পূর্ব্বাহ্ণে ঠিক তেমনিভাবে তাহার নিবিড় স্নেহবেষ্টনীর মধ্যে শিশুর মত আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আমাকে মুক্ত করিয়া তাহার প্রশান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নয়ন প্রান্ত হইতে অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ডদ্বয় ও কপোল প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইল।

সে বলিল, "আমাকে সঙ্গে লইতে চাও না কেন, দাদা? আনন্দ কাছে না থাকিলে আগে ত অস্থির হইতে ভাই! আনন্দ না খাওয়াইলে যে তোমার খাওয়া হইত না। এখন বড় হইয়াছ, আনন্দকে আর ভাল লাগে না! কিন্তু আনন্দ আর এখন কি লইয়া থাকিবে ভাই? বলত! তার আর এখন কি আছে, দাদা?"

আমি বলিলাম, "না আনন্দ, আর দুঃখ করিও না! চল! তুমিত আমার সঙ্গে যাইবে।"

আমি আর কিছু বলিতে পারিলাম না। আমার বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ আর কোনও কথা উচ্চারণে অস্বীকৃত হইল।

আনন্দ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, "তবে কে বলে, দাদা, তুমি আর তোমার আনন্দকে ভালবাস না? তোমার আপত্তির কি আর আমি অপেক্ষা রাখি ভাই? আমি যাইবই ত—তুমি না লইয়া যাইতে চাহিলেও আমি যাইব। আমাকে ধরিয়া রাখে কে? আজ তিন দিন ধরিয়া যে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের পাদপীঠে আমি মাথা কুটিতেছি—তাহা কি কখনও বৃথা হয়? ভক্তবৎসল আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন—তাহাত জানিই।"

বৃদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের নয়ন হইতে অশ্রু দরবিগলিত ধারায় তাহার কপোল ও গণ্ড দেশ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল।

আমি আনন্দের প্রীতিপ্রফুল্ল ও স্নেহোদ্ভাসিত মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলাম—প্রৌঢ়ের মুখমণ্ডলে কি যেন একটা অজ্ঞাত অভূতপূর্ব্ব জ্যোতির বিচ্ছুরণে আমি একটু অভিভূত হইয়া পড়িলাম। হৃদয়ও আমার পূর্ণ হইয়া উঠিল—তখন আনন্দের স্নেহ ও প্রীতির প্লাবনে আমার প্রাণ কূলে কূলে পূর্ণ। অন্তরের মধ্যে তখন আমি জীবনের চরম মাধুর্য্য উপভোগ করিলাম—নয়ন অশ্রুতে প্লাবিত হইল। মুখে কথা আসিল না।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব শিলাতলে বসিয়া ভক্তিতে বিভোর হইয়া গান ধরিল—

"দিনের আলো নিভে আসে,
পার কর আমারে!
আজি একা বসে আছি নদীর কিনারে
সঙ্গে এসেছিল যারা
সবে ফেলে গেল তারা
এখন তোমার নায়ে নিয়ে চল
আমায় এই সুদূর পারে!
আঁধার ওই আসছে নেমে
পারের বাতাস যাবে থেমে
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে
সাঁঝের আঁধারে!"

* * * * * *

সায়াহ্নে শ্রমণ বুদ্ধপালিত বৈশাখী পূর্ণিমার আরত্রিক মাঙ্গল্য বহন করিয়া পুনরায় আসিলেন। আমরা তাঁহার হস্ত হইতে মাঙ্গল্য গ্রহণ করিলাম। আর্য্য মহাস্থবির তাঁহার সেই বিশ্বস্ত শ্রমণ দ্বারা তাঁহার আশীর্ব্বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। অদ্য সন্ধ্যায় তিনি সংঘারাম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে সমর্থ হইলেন না।

যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত আসিল। মাতাপিতা ও ভগ্নী চিত্রলেখার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। পিতামাতার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মঙ্গল কামনায় আমার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া লইলাম। আর্য্য পালকের গৃহে গমন করিলাম। তথায় বিদায় সম্ভাষণ শেষ করিয়া নাবারোহণোদ্দেশ্যে ঘট্টায় সজ্জিতা তরণীর সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলাম। আর্য পালকের গৃহ হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় প্রজ্ঞার ভগ্নী আমার বাগ্‌দত্তা প্রেয়সী সুনন্দার সহিত একান্তে মিলনের সুযোগ হইল। সে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিল—তাহার তপ্ত দুই বিন্দু অশ্রু আমার পায়ে পড়িল—অনুভব করিলাম। ঘট্টায় আসিয়া দেখিলাম যে তথায় আমাদিগের বাণিজ্য যাত্রা অবলোকন করিতে সকলেই সমবেত হইয়াছেন। সেখানে শেখর, সৌমিত্র ভট্ট ও শেখরের পিতৃষসা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের পুজারিণীও উপস্থিত আছেন দেখিলাম। পিসিমা জনতা হইতে অনতিদূরে বিরলে শিলাতলে বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া তাঁহার আশীষ গ্রহণ করিলাম। তাহার পর সকলের সহিত সম্ভাষণ ও সংলাপন শেষ করিয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকার বন্ধন মুক্ত হইল। মাঝি ও দাঁড়ীরা সকলে স্বস্থানে অবস্থান করিয়া স্ব-স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। তরণীর পাল খুলিয়া উহা বাত্যাভিমুখে সংরক্ষিত হইল। বাত্যাভিমুখী বিস্তৃত পাল বায়ুতে পূর্ণ ও স্ফীত হইয়া উঠিলে নৌকার গতি নিয়ন্ত্রণোদ্দেশ্যে পালের রজ্জু যথাস্থানে সংযোজিত হইল। আমাদের তরীগুলি বিস্তৃত পক্ষ মরালের মত কপিষার জলোচ্ছ্বাসের তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে ভাসিয়া চলিল।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে
বাণিজ্যাভিযান নামক
ঊনবিংশ বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

নামকো বাস্তে

শ্রীকানাই বসু

রাগলে অনিলের জ্ঞান থাকে না। শুয়ার গাধা ইস্টুপিড্ ড্যাম্ ফুল্ শেষে কাঁহাকা পর্যন্ত বলে ফেল্‌ল। এক ঘর ছেলের সামনে এ-রকম অপমান করলে কার মনে না লাগে। অনিলেরও লাগ্‌ল। কিন্তু কী করবে? বড় লোকের ছেলে অনিল, গায়েও জোর আছে, দলেও ভারি সে, আজ গালাগাল দিয়েছে, কাল চাঁটি মারবে, পরশু হয়তো তার জামাটাই ছিঁড়ে দেবে। বেচারা অনিল, দুর্বল দেহ, গরীব, নতুন ভর্তি হয়েছে, কে বা তাকে চেনে, কে-ই বা তার হয়ে একটা কথা বলবে। কী করবে সে, বলবেই বা কাকে। অসহায় অভিমানে অনিল কেঁদে ফেল্‌ল এবং এই চোখের জলের লজ্জা লুকোবার জন্তে অকস্মাৎ মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে স্কুলের বাইরে চলে গেল।

এ-রকম যুদ্ধ অনিল প্রত্যাশা করে নি। সে জানে গাল দেবে, গাল খাবে। চড়টা চাপড়টা আদান প্রদান হবে। তারপর শত্রু পরাজিত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলে তার পিছনে পিছনে হাত তালি দিয়ে সে সদলবলে জয়যাত্রা করবে। কিন্তু এমন করে যুদ্ধ ঘোষণা করবামাত্র যে শত্রু সমস্ত যুদ্ধায়োজন নিষ্ফল করে দিয়ে বিনাবাক্যে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে, পাল্‌টা আক্রমণের নাম গন্ধ না করে শুধু জলভরা চোখে আক্রমণকারীর মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চলে যায়, সে-শত্রুকে নিয়ে অনিল কী করতে পারে? আর কাঁদবার যে কী ছিল তা তো অনিলের মাথায় এল না। সে বারবার কল্পনা করল, তাকে কেউ ড্যাম রাস্কেল কাঁহাকা শুয়ার গাধা এমন কি কচ্ছপ ব্যাং বা জিরাফ পর্যন্ত বলছে। কিন্তু তাতে চোখে তো কই জল আসে না। ভেবে যখন কিছু ঠিক করতে পারল না, তখন সে ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌লেই ব্যাপার মেটে না। পার্টিশনের ওপারে স্কুলের লাইব্রেরী। তখন লাইব্রেরী বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই যে হেডমাষ্টার মশায় কী পুরোনো বই খুঁজতে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে বসেছিলেন তা কে জানে। তিনি পুরোনো ডাকসাইটে ছেলে অনিলকে চেনেন, তার গলাও চেনেন। পরাজিত ক্রন্দনশীল নতুন ছেলেটিকেও তিনি তক্তার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলেন। নতুন ছেলেদের নতুন নতুন কিছু দিন নাজেহাল করা কতকগুলো পুরোনো ছেলের যে অবশ্য-কর্তব্যের মধ্যে হয়ে পড়েছে তা-ও জানতে তাঁর বাকী নেই।

পরের দিন সকালে প্রথম ঘণ্টাতে হাজিরা ডেকে ক্লাস-টিচার অটলবাবু সবে বইখানি ধরেছেন, হেডমাষ্টারের বেয়ারা এসে একটা শ্লিপ কাগজ দিল। অটলবাবু ছুটলেন হেডমাষ্টারের ঘরে। ফিরে এসে যখন বসলেন তখন তাঁর কপালের নীচে ঝাঁকড়া ভ্রু দুটো একত্রিত হয়ে গেছে, চোখের কোল থেকে গলা পর্য্যন্ত যে চাঁপদাড়ির জঙ্গল, তা নড়তে শুরু করেছে। এটা অতি কুলক্ষণ। অটলবাবু চর্বণ শুরু করেছেন। অতিশয় রাগ হলেই অটলবাবু চিবোতে থাকেন। কী চিবোন, তা কেউ ভেবে পায় না। কেউ বলে নিজের জিবটাই চিবোন। কিন্তু দেখা গেছে জিব সুস্থ থাকে। তাই অনেক দেখে দেখে সকলে সিদ্ধান্ত করেছে তিনি দাঁতই চিবোন। নীচের দাঁত দিয়ে উপরের দাঁতকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরের দাঁত দিয়ে নীচের দাঁতকে।

চিবোতে চিবোতে অটলবাবু ক্লাসের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলেন। ছেলেদের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করে উঠ্‌ল। অটলবাবুর দাড়ি নড়ার ও ক্লাসের সর্বত্র চোখ বুলোনোর অর্থ অনিলের জানা নেই। ক্লাস সুদ্ধ থমথমে ভাব দেখে সে বিস্মিত কৌতূহলে চেয়ে রইল। কিন্তু অনিলের তো তা জানতে বাকী নেই। সে অটলবাবুকে জানে, তাঁর দাড়িও জানে। বুঝলে এইবার একটা কাণ্ড ঘটবে। ঘটলও।

সাধু ভাষায় যে স্বরকে বলে জলদমন্দ্র, সেই স্বরে অটলবাবু ডাকলেন—অনিলচন্দ্র মুখার্জী।

ইয়েস্ সার।

হোয়ার?

'এই যে সার' বলে অনিল উঠে দাঁড়ালো।

আবার মেঘ ডাকলো—কাম্ হিয়ার। এদিকে এস।

কুণ্ঠিতচিত্তে ও কম্পিত চরণে অনিল এসে অটলবাবুর টেবিলের অদূরে দাঁড়ালো। ক্লাস-সুদ্ধ ছেলে সভয় কৌতূহলে চেয়ে আছে, নতুন ছেলেটা মরে বুঝি আজ। অটলবাবুর কঠোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অঙ্কুশ কয়েকবার অনিলের কদমছাট চুল থেকে ঘোড়তোলা জুতো পর্য্যন্ত উঠানামা করলো। তারপর তিনি বল্লেন—ইউ আর অনিলচন্দ্র মুখার্জ্জী? হুম্। অনিলচন্দ্র মুখার্জ্জী তুমি?

অটলবাবুর বিশ্বাস এই উপায়ে তিনি ছেলেদের ইংরেজি জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেন। তিনি ইতিহাসের শিক্ষক, কিন্তু ইংরেজিতে ছেলেদের অজ্ঞতা দেখে কাতর হয়ে এই পন্থা ধরেছেন। ইংরেজি ভাষায় কথা কয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার তর্জমা করে দেন বাংলা ভাষায়।

অটলবাবু আবার বললেন, সো ইউ আর অনিলচন্দ্র মুখার্জি। হুম্। হু ডু ইউ থিঙ্ক ইউ আর? তুমি কে মনে কর?

এ প্রশ্নের কী জবাব দেবে অনিল?

অটলবাবু গর্জন করে উঠলেন, আন্‌সার মি। উত্তর দাও। হু ডু ইউ থিঙ্ক্ ইউ আর?

ভয়ে ভয়ে অনিল বল্লে—আই য়্যাম্ অনিলচন্দ্র মুখার্জি সার।

মেঘ ডাকলো—সে আমি জানি। কিন্তু তুমি নিজেকে কে মনে কর? আর ইউ দি গভর্ণর অফ্ বেঙ্গল, হিজ্ এক্‌সেলেন্‌সি মিষ্টার সি রাজাগোপালাচারিয়ার? না, ভারতবর্ষের কম্যাণ্ডার-ইন্-চিফ্? য়ঁ্যা?···আন্‌সার মি।

অনিল হতভম্ব নীরব রইল। আবার একবার তার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে অটলবাবু বললেন—আই ওয়ার্ণ্ ইউ মাই বয়। এ চলবে না, হু সিয়ার। ভবিষ্যতে যদি আর কোন দিন এ্ রকম শুনতে পাই, কারও সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছ, অভদ্র অসঙ্গত আচরণ করেছ বা কাকেও অপমান করেছ বলে শুনি, সেই মুহূর্তে এক্‌স্‌পেল্ করে দেব। দূর করে দেব স্কুল থেকে। বুঝেছ? নট্ ইভ্ন্ দি গড্‌স্ উইল সেভ্ ইউ। মনে রেখো। আকাশের দেবতারাও তোমাকে তখন রক্ষা করতে পারবে না। এ অটলের কথা, টলে না। যাও, ক্লাসের প্রত্যেক ছেলের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাও। বল, ভাই আমি অন্যায় করেছি, আমি অপরাধী, তুমি আমাকে 'মাপ কর। সকলের কাছে গিয়ে বলতে হবে। কারণ তোমার অপরাধ আপাতঃ দৃষ্টিতে একজনের প্রতি হলেও, প্রকৃত পক্ষে তুমি অপমান করেছ ক্লাসের সকল ছাত্রকে, স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে, সমগ্র ছাত্র সমাজকে, নিখিল মানব জাতিকে। গো, মাই বয়, গো এণ্ড আস্ক্ দেয়ার পার্ডন। যাও, ক্ষমা চাও। নচেৎ আমার ক্লাসে তোমার স্থান নেই। মনে রেখো মানুষকে গালি দেবার দিন চলে গেছে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার আর চলবে না।

ক্লাস স্তম্ভিত। অনিল বজ্রাহত। কিন্তু অটলবাবু কঠিন বিচারক। তাঁর গম্‌গমে কণ্ঠস্বরে ঘর আবার ভরে উঠল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। হে মোর দুর্ভাগা বালক, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। কী? পারবে না ক্ষমা চাইতে? এক মিনিট সময় দেওয়া হল তোমাকে অনিল, তার মধ্যে যদি তোমার ক্ষমা ভিক্ষা না সুরু হয়, তাহলে—তাহলে ইউ উইল বি কেয়ন্‌ড্ মাই বয়, এণ্ড্ ড্রিভ্ন্ আউট্ অফ্ দি ক্লাস। বেত খেয়ে তোমাকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এক মিনিট সময়।

অটলবাবু তাঁর গলার কার টেনে বুক পকেট হ'তে বৃহৎ ঘড়িটি বার করে টেবিলের উপর রাখলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘড়ির মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে বললেন—নাউ আই স্টার্ট কাউন্টিং দি সেকেণ্ড্‌স্। এবার সেকেণ্ড গুণ্‌তে আরম্ভ করছি আমি।

দাড়ির আবরণের ভিতর জোরে চর্বণ চলছে।

হতভম্ব অনিল সেই কম্পনশীল চাপ দাড়ির পানে চেয়ে কী বলতে চাইল—আমি—আমি—বেচারা আর বলতে পারল না। দাড়ির মধ্য থেকে কঠোর স্বর বেরোলো—নো আমি আমি। এ অটলের হুকুম। তেরো সেকেণ্ড্, চৌদ্দ সেকেণ্ড্, পনেরো—

হঠাৎ ঈষৎ চেঁচিয়ে ডাকলেন—হরিয়া, আমার বেতটা। তারপর আবার—আঠারো, উনিশ, কুড়ি—

অনিলের দুটি চোখ এই নির্মম অবিচার ও অকারণ শাস্তির আদেশ আর সহ্য করতে পারল না। জল ছাপিয়ে ক্রমে ঝরে পড়ল। অনিলের সঙ্গে সারা ক্লাসও বজ্রাহত।

বাজ পড়েছে একজনের মাথায়, কিন্তু এত কাছে চোখের সামনে বাজ পড়লে মানুষ বিহ্বল না হয়ে পারে না।

অটলবাবুর গণনা চলছে—সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ, ঊনচল্লিশ, টোইন্‌টি সেকেণ্ডস্ লেফ্‌ট্, নাইন্‌টিন এয়িটিন—

বাঙলা হতে অটলবাবু অকস্মাৎ ইংরেজিতে চলে গেলেন। গণনা অগ্রসর না হয়ে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে চলল। এ রকম পরিবর্তন অটলবাবুর স্বভাব। কিন্তু শাস্তির আদেশ তাঁর পরিবর্তিত হয় না। বলেন—হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। অটলের বাক্য অটল।

ওনলি টুয়েল্‌ভ ইলেভেন—আর দশ সেকেণ্ড্, নয়··· হরিয়া-া-া···সাত ছয়···

হরিয়া বেত এনে রাখল। শুধু আনল না, কোঁচার কাপড়ে পালিশ করতে করতে বেত নিয়ে এল দুর্বৃত্ত হরিয়া। চক্‌চকে লক্‌লকে লম্বা বেত। দেখলে গা শিউরে ওঠে। বোকা ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত বেতের গায়ে নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে, গালের উপর ধারার দাগ শুকোয় নি।

কুটুস্ শব্দে ঘড়ির ডালাটি বন্ধ করে অটলবাবু ঘোষণা করলেন—টাইম ইজ আপ্। সময় হয়েছে। কাম হিয়ার। ঘড়ি পকেটে রেখে অটলবাবু তাঁর ঝোপের মতো দুই ভ্রুর আশ্রিত গভীর চোখের দৃষ্টি হতভাগ্য অনিলের মুখের উপর স্থাপন করে বল্‌লেন—অব্‌ষ্টিনেট এণ্ড্ আনফরচুনেট বয়, আই য়্যাম্ সরি ফর্ ইউ। একগুঁয়ে হতভাগ্য বালক, তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে—

এইবার অটলবাবু উঠবেন। তারপর বাঘের থাবার মতো হাত দিয়ে দুর্বল অনিলের অসহায় ঘাড়টি ধরবেন, তারপর—উঃ, ভাবলে দেহ শিউরে ওঠে···অনিল আর থাকতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল—সার, আমি একটা কথা—

হোয়াট? হুঙ্কার দিয়ে অটলবাবু ফিরে অনিলের দিকে চাইলেন।

সার, ওর সম্বন্ধে—

ওর সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোনও কথা কইতে দেব না। টেক্ ইওর সিট্, আই টেল্ ইউ।

সার, আমি বলছি—

সিট্ ডাউন্।

সার, একটা কথা সার—

নো সার সার, নো একটা কথা। বসো—

অনিল বসে পড়ল।

অটলবাবু তখন ওদিকে ফিরে অনিলকে বল্‌লেন—আই পিটি ইউ, মাই বয়, তোমার ভবিষ্যত অন্ধকার। অন্যায় করে দোষ স্বীকার করতে যে পরাঙ্মুখ হয়, তাকে আমি মানুষ বলি না। আই ডোণ্ট্ কল হিম এ ম্যান। কাম হিয়ার। এগিয়ে এস, আই টেল ইউ।

বেচারা অনিল বড়ো বড়ো চোখে কেবল চেয়ে রইল সেই গম্ভীর গোঁফ, চাপ চাপ চাপদাড়ী ও ভীষণ ভ্রু-সমাকীর্ণ মুখখানার পানে। না পারল এগিয়ে আসতে, না পারল কথা কইতে।

তার সেই নির্বোধ চোখের চাউনি দেখে অনিল আবার উঠে দাঁড়ালো এবং মরিয়ার মতো চেঁচিয়ে বললে—না সার, এ হতে পারে না, কখ্‌খনো হতে—

বোমার মতো ফেটে গেলো অটলবাবু—গেট আউট, গেট আউট, বেরিয়ে যাও আমার ক্লাস থেকে তুমি, ইম্‌পার্টিনেণ্ট চ্যাপ, দুর্বিনীত বালক, বেরিয়ে যাও বলছি।

অনিল বেরিয়ে গেল।

ঘন ঘন চর্বণ চলছে। অটলবাবু বেত হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বার কয়েক হাওয়ার মধ্যে লিক্‌লিকে বেত গাছটা আস্ফালন করে শন্ শন্ শব্দের ঢেউ তুলে এগিয়ে গেলেন অনিলের দিকে। হাত দুটো পিছনে রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে অটলবাবু বললেন—

আই পিটি ইউ, মাই ডিয়ার বয়, বিলিভ মি, আই পিটি ইউ। তোমার দেহকে যন্ত্রণা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কী করব, আই হ্যাভ নো অলটারনেটিভ। আর দোসরা পথ কিছু নেই। কারণ তোমার অব্‌স্টিনেসিকে ভাঙতে হবে আমার, তোমার দুর্মতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে।

অতি উত্তেজনায় অটলবাবুর ভাষা সাধু সংস্কৃত ঘেঁষা হয়ে ওঠে। তিনি বল্‌লেন—চিকিৎসক যেমন তিক্ত ঔষধ দিয়ে রোগীর জিহ্বাকে দুঃখ দেন, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ ব্যাধিকে দূর করেন, তেমনি আজকের এই বেত্রাঘাত তোমার শরীরকে আহত করলেও তোমার চিত্তকে নির্মল নিরাময়

করবে। প্রার্থনা করি এই যেন তোমার জীবনে শেষ বেত্রাঘাত হয়।

বলির পশুর সামনে মন্ত্রোচ্চারণ করার মতো অটলবাবু তাঁর বক্তৃতা দিতে লাগলেন বেচারা অনিলকে লক্ষ্য করে। বক্তৃতা শেষ করে তিনি ক্লাসের ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন—মাই ডিয়ার বয়েজ, এ আসুরিক চিকিৎসা, তোমরা দেখো না, খবর্দার। তোমরা চোখ বুঁজে থাকো। অপরের যন্ত্রণা দেখবার আনন্দকে আমি বলি পৈশাচিক আনন্দ। আই কান্‌ট স্ট্যাণ্ড্ ইট্। এ আমি সইতে পারি না।

এই বলে অটলবাবু স্বীয় চক্ষু মুদ্রিত করে হাত ওঠালেন।

কিন্তু হাত নামাতে পারলেন না অটলবাবু। কিসে আটকালো দেখবার জন্য বিরক্ত অটলবাবু চোখ খুলে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে একব্যক্তি তাঁর বেত চেপে ধরেছেন। সেই ব্যক্তি হেড মাস্টার মহাশয়। হেড মাস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা, যাকে তিনি এইমাত্র ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছেন।

হেড মাস্টার বেতটি ছেড়ে দিয়ে শুধু বললেন—অটলবাবু, আমি বলেছিলুম অনিলকুমার মুখার্জির কথা। আর এই ছেলেটির একটা কথা দয়া করে শুনবেন—বলেই তিনি চলে গেলেন।

হতবুদ্ধি অটলবাবু কিছু বলবার আগেই অনিল বললে—সার, আমি প্রথমটা বুঝতে পারি নি। আমার নাম অনিল-কুমার মুখার্জি।

অটলবাবু বার দুই বললেন—অনিলকুমার মুখার্জি। অনিলচন্দ্র মুখার্জি। অনিলকুমার, অনিলচন্দ্র।

আপনার বিচার আমি মেনে নিচ্ছি সার। তুমি আমায় মাপ কর ভাই, তোমার কাছে আমি মাপ চাইছি। বলে অনিল এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বেচারা হাবা-গোবা অনিলের চোখ আবার জলে ভরে এল। অনিল বললে, এবার আমি ক্লাসের সকলের কাছে—

এমন সময় অটলবাবু এক কাণ্ড করে বসলেন! বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতদুটো জোড় করে অতি কাতর কণ্ঠে বললেন—আই আসক্ ইওর পার্ডন অনিলচন্দ্র, আমার হঠকারিতা, আমার ভুল অমার্জনীয়, তবু তুই আমায় মাপ কর বাবা। বল্ বাবা মাপ করলি?

মুখচোরা অনিল তবুও কথা কইতে পারলো না। কিন্তু তার ভরা চোখের জল আর চোখে ধরল না, ঝরে পড়ল গাল বেয়ে। অটলবাবু নিজের কোঁচার খুঁটে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন—কাঁদিসনে বাবা অনিলচন্দর কাঁদিসনে। এবং অপর হাত অনিলের মাথার ওপর দিয়ে বললেন—এণ্ড্ ইউ মাই ডিয়ার সন অনিলকুমার, তোকে কী বলে আশীর্ব্বাদ করব জানিনে, তুই আমাকে মহাপাতক থেকে রক্ষা করেছিস। ইউ আর নট্ ওনলি 'গুড্ বাট ইউ আর গ্রেট। ভাল ছেলের চেয়ে ভাল তুই, মহৎ ছেলে। তোর ভাল হবে, আমি বলছি তোর ভাল হবে। তুইও আমাকে মাপ কর।

মুখফোঁড় অনিলেরও সেই একই দশা, কোনও কথা বলতে পারলে না। অতঃপর অটলবাবু ছেলেদের উদ্দেশ করে বললেন—আমি ক্লাসের সকল ছাত্রের কাছে ক্ষমা চাইছি। সমস্ত ছাত্রসমাজের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, নিখিল মানবজাতির কাছে আমি অপরাধী, তাঁরা আমায় ক্ষমা করুন। আর ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন নামের দর্প যেন না করি কখনও। বলতে বলতে দুই অনিলকে তিনি বুকের কাছে দুই পাশে জড়িয়ে ধরলেন।

স্তম্ভিত ছেলের দল দেখলে ব্যাঘ্রসদৃশ করাল-বদন অটলবাবুর ঘন কর্কশ চাপদাড়ির কম্পন থেমে গেছে আর সেই স্থির দাড়ির উপর দু ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

টুক্‌রো কবিতা

শ্রীলীলাময় দে

জনম-মরণ কালের
কুসুম দু'টী

তারি মাঝে গাঁথা জীবনের
ভুল ত্রুটী।

তুমি ও আমি

কথা ও সুর :—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়   স্বরলিপি :—শ্রীশচীন দাশগুপ্ত

তাল—দাদরা

আধো আলো আধো ছায়া—
তোমার আমার মিলনের মাঝে—
রচিল কী নব মায়া !

তারায় তারায় করে কানাকানি,
আকাশে বাতাসে তারি জানাজানি ;—
স্বপন আবেশে তাই বুঝি মোর
সঙ্গীত পেল কায়া !

তুমি হও বাঁশী, আমি তা'র সুর
তুমি হাসি আমি গান—
তুমি যে নয়ন, আমি তা'র মণি
ভালবাসা অভিমান !

আমি ফুলহার, তুমি যে সুরভি,
প্রেমের তুলিতে আমি রাঙা ছবি ;
তুমি মোর কবি, আমি যে তোমারি
কল্পনা কবি-জায়া !

স্থায়ী II { সা গা মা | পা র্সা র্সা | র্সানি ধপা হ্মধা | পা -া -া | হ্ম পা পা |
আ ধো আ লো আ ধো ছা - - - - - য়া ঃ - তো মা র

পা রেহ্ম পাধা | পা পা পা | মা মা রে | রে পা পা | মা রে সানি |
আ মা - - র মি ল নে র মা ঝে র চি ল কী ন ব -

রে রে রে | সা -া -া | } II
মা - য়া - - ঃ

অন্তরা II গা পা পা | পা নিধা র্সা | র্সা -া -া | র্সানি ধানি র্সার্রে | র্সা -া -া |
তা রা য় তা রা - য় ক রে কা না - - - কা - নি - -

-া -া -া | মা গা র্রের্মা | র্গা র্রে র্সানি | র্রে র্সা র্সা | ধা ণ ধা |
- - - আ কা শে - বা তা সে - তা রি জা না - জা

পা -া -া | -া -া -া | II রে সা সা | ধাণ ধা পা | হ্ম পা পা |
নি - - - - - স্ব প ন আ - বে শে তা ই -

হ্ম পা ধা | পা মা -া | -া -া -া | পা পা মা | মা রে সা |
বু - ঝি মো - - - - - র স ং গী ত পে ল

মা মা গা | পা -া -া | গা মা পা | ধা নি র্সা | র্সানি ধাপা হ্মধা |
কা - - য়া - - আ ধো আ লো আ ধো ছা - - - - -

পা -া -া |
য়া - -

সঞ্চারী II সা সা রে | রে গামা রেগা | পা -া -া | মা গা রেসা | সা সা রে |
তু মি হ ও বাঁ - - - শী - - - - - - - তু মি হ

রে গামা রেগা | পা -া -া | হ্মপা ধানি র্সা — সা সা ধা | ণ ধা পা |
ও বাঁ - - - শী - - - - - - - আ মি তা র সু র

র্রে র্সা র্সা | ধাণ ধা পা | হ্ম পা ধা | মা -া -া | পা মা মা |
তু মি হা সি - আ মি গা - - - - - ন তু মি যে

রে সা সা | সা র্সা র্সা | মা মা -া | ধা ধা রে | রে সা সা |
ন য় ন আ মি তা র ম ণি ভা লো বা সা অ ভি

মা মা গা | পা -া -া II
মা - - ন - -

গা পা পা | পা নিধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সানি ধানি র্সার্রে | র্সা -া -া |
আ মি ফু ল হা - র তু মি যে সু - - - র - ভি - -

-া -া -া | পাহ্ম গাহ্ম পাধা | পা -া -া | সানি্ ধ্‌ানি্ সারে | সা -া -া |
- - - তু - - - মি - যে - - সু - - - র - ভি - -

গা পা পা | পা নিধা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সানি ধানি র্সার্রে | র্সা -া -া |
আ মি ফু ল হা - র তু মি যে সু - - - র - ভি - -

-া -া -া | র্সা র্গার্রে র্মা | র্গা র্রে র্সা | র্রে র্সা র্সা | ধা ণ ধা |
- - - প্রে মে - র তু লি তে আ মি রা ঙা - ই

পা -া -া | -া -া -া | র্রে র্সা র্সা | ধাণি ধা পা | হ্ম পা পা |
বি - - - - - তু মি মো - হ ক বি আ মি যে

হ্ম পা ধা | পা মা মা | -া -া -া | প পা রে | রে সা সা |
তো - মা রি - - - - - - ক ল্‌ প না ক বি

হ্মপা ধানি র্সার্সা | র্সা মা -া | II
তা - - - - - য়া -

একখানি কাঁথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

রাত চারিটায় কলিকাতাগামী ট্রেণখানি ঘস্ ঘস্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। শীতের রাত, দারুণ শীত। ঘন কুয়াশায় সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, গাছ লতা-পাতার উপর যেন এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—এমনি শিশির পড়িয়াছে। শীতার্ত্ত কুকুরের চীৎকার মাঝে মাঝে উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। চারিধার নিস্তব্ধ নিঝুম। পৌষ মাসের দুরন্ত শীতে মনে হইতেছে, সমস্ত পৃথিবী বুঝি জমিয়া বরফ হইয়া যাইবে। গ্রামের শেষ প্রান্তে বাউরী পাড়ায় ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি ঘন কুয়াশার মাঝে যেন হারাইয়া গিয়াছে। তাহাদের কুঁড়েগুলি বাঁশের কঞ্চির বেড়া ঘেরা কাহারও বা মাটীর দেওয়াল। ঘরের মাথা তালপাতার ছাওয়া, শীত ও ঠাণ্ডা কোনটাই আটকায় না।

অভিলাষের ছোট্ট কুঁড়ে-ঘর—চারিধারে কঞ্চির বেড়া। হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া কাঁপাইতেছে। ঐ একই ঘরে রান্না হয়, তাহারা ঘুমায় ও একটা কুকুর এবং দুটী শূয়োর উহাদের সহিত রাত্রি যাপন করে। মানুষ ও জন্তু শীতের রাত্রে জড়াজড়ি করিয়া ঠাণ্ডার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে।

বিন্দীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহার সমস্ত শরীর যেন বরফ হইয়া গিয়াছে। উনুনের পাশে কুকুরটি শুইয়া কাঁপিতেছে, বোধ হয় উনুনে আর আগুন নাই। বিন্দী ঠেলা দিয়া অভিলাষকে জাগাইল। অভিলাষ বলিল, কি হ'ল? উঃ গেলাম রে—

বিন্দী বলিল, শীতে জমে গেলাম গো। তোমার হ'ল কি?

—আমি—ওরে পা-টা বড্ড টাটাচ্ছে—অনেকটা কেটেছে। আর গবগবানি—বোধ হয় পাকবে। কিন্তু শীতে তো আর পারি নে। ছেঁড়া চটের থলের ভিতর, দুইজনে ঠিক ধান চালের মতই কুণ্ডলী হইয়া ঘুমাইতেছিল।

বিন্দী বলিল, রাত চারটের গাড়ী গেল। এখনও সূয্যি উঠতে অনেক দেরী। সূয্যি উঠলে হয়—সারা শরীর যেন বরফপানা হয়েছে। ইস্ মা কালিরে—হাড়ের ভেতরটা পর্য্যন্ত কন্ কন্ করছে। ওগো একটু উঠে আগুন করনা গো। তামুক খেলে জাড় অনেকটা কমবে। বাকী রাতটা আগুন পুইয়ে কাটিয়ে দেব—

অভিলাষ বলিল, কথাটা মন্দ নয়। 'উহুঃ' গা-গতরে সব যেন পাকা ফোঁড়ার মতন বেদনা। অভিলাষ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল। উনুনে ফুঁ পাড়িয়া পাড়িয়া দেখিল আগুন নাই। নূতন করিয়া আগুন করিয়া কতকগুলো শুকনো ডাল পাতা দিয়া দিল। আগুন গন্ গন্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেই বিন্দী আসিয়া উনুনের ধারে বসিল। ঘর আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। গরম পাইয়া কুকুরটি আরামে কেঁউ করিয়া ডাকিল। শূয়োর দুটি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ডাকিয়া আবার পাশ ফিরিল। অভিলাষ ও বিন্দী দুইজনে উনুনের পাড়ে পা ও হাত শেঁকিতে লাগিল।

বিন্দী বলিল, বাঁচ্‌লুন বাপু এতক্ষণে। একটুখানি তামুক খরাও গো। শরীরটা বড্ড বেজুত। এই ঢেঁকীপড়া রাতে উঠলে, আবার ভোরে কাঠ নিয়ে বাজারে যেতে পারব? বুঝলে, আজ বাবুদের বাড়া গেছনু, দেখি নোতুন নোতুন নেপ তোষক সব কলকাতা হ'তে এনিয়েছে। ওদের কি —কেমন নেপ তোষক, দিব্বী আরামে ঘুম—

অভিলাষ কলিকায় ফু দিতে দিতে বলিল, বড়লোক যে রে। টাকাতেই সব হয়। ওই মোনা দিন দু-টাকা করে কামাচ্ছে। শরীর ভাল খাটাতে পারে। কুড়ি গণ্ডা গাছ মেরেছে, রোজ গুড় নামাচ্ছে সাত আট সের। হিসেব কর দেখি—রোজ নিচ্চয় দু-তিন টাকা করে জমাচ্ছে। তখন বললুম্ আমিও গাছ মারি—তা তুই বারণ করলি—

বিন্দী বলিল, তুমি পারতে গো? এই ভোরবেলা গাছ থেকে রস নামিয়ে, সেই রস জাল দিয়ে গুড় করে বাজারে নিয়ে যেতে পারতে? ও শরীরে আর হয় না। এই বলে

মুনিষ খেটে এসেই রাতে তোমার গা গতর টন্ টন্ করে—আর ঐ কাজ তুমি পারতে? বিন্দী চুপ করিল। অভিলাষ এক মনে তামাক খাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর বিন্দী বলিল, আচ্ছা, হ্যাগা একখানা বড়-সড় কাঁথা হ'লে খুব ভাল হয় না? বেশ মোটা মোটা কাঁথা—

—কাঁথা? সে কে দেবে?

বিন্দী বলিল, কে আর দেবে? আমি তো শিখেছিনু। বামুনদিদির কাছ থেকে খেজুর ছড়ি কাঁথা বুনতে শিখেছিনু। কাপড় পেলে করি। চার পাঁচখানা ছেঁড়া কাপড় চাই—বেশ চওড়া পাড় থাকে, তার চারধার দিয়ে, বেশ করে মুড়িয়ে হলুদ দিয়ে খেজুর ছড়ি এঁকে সেলাই করি।

অভিলাষ হাসিয়া বলিল, কাপড় চাই যে পাগলী। মাত্র তোর ঐ একখানা আর আমার এই আধখানা। এ যদি কাঁথাতে দিই, তবে পরব কি?

বিন্দী মুখ ম্লান করিয়া বলিল, না তাই বলছি। আচ্ছা হ্যাগা, আজ না হয় পুরোণো দুখানা বস্তা বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে আন না। নইলে রাতে মরে যাব যে—

অভিলাষ হুঁকোটি বিন্দীর হাতে দিয়া বলিল—এই দুখানা দিয়েছে বাবুরা। আর কি কখনও দেয়। বিন্দী কিছুক্ষণ এক মনে তামাক টানিয়া বলিল, লোকে বলছিল, সরকার থেকে গরীব লোকেদের কাপড় দেবে কম্বল দেবে। তার কি হ'ল? কেষ্টমামু তো চৌকীদার সরকারী লোক—ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ না। যদি একখানা কম্বল আর একখানা কাপড় পাওয়া যায়—

অভিলাষ বলিল, পাগল—সে কি আমাদের দেবে? সে সব পাবে বাবুদের চেনা হাত-ধরা লোকেরা। গরীবরা কি কোন কালে কোন কিছু পায় রে—

বিন্দী বলিল, ভগবান্ দিলেই পাব। নইলে, মানুষে কি আর দিতে পারে? ভগবান দয়া করলে পাব। অভিলাষ বলিল, ভগবানও বড় লোকদের হাতধরা রে। বড় লোকেরাই ভাল জিনিষ পায়—ভগবান কটা গরীব-দুঃখীকে দিয়েছেন।

বিন্দী তামাক খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, ও কথা বলতে নেই গো। ভগবানের নাম নিয়ে—তোমার মতিগতি ভাল নয় তো—

রাত ভোর হইয়া আসিতেছে। বেড়ার ফাঁক দিয়া হু-হু করিয়া ঝলকে ঝলকে ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস আসিয়া কাঁপাইতেছে। উনুনের আগুনও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কুকুর ও শূয়োর দুটি আবার ডাকিয়া উঠিল। টপ্ টপ্ করিয়া গাছের পাতা হইতে ঠিক বৃষ্টির মতই শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। অভিলাষ বলিল, না—আর একটু গা গড়িয়ে নিই। সেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হ'বে তো—

বেলা দশটার সময়, বিন্দী বাবুদের বাড়ির বাসন মাজিয়া ও কাজ শেষ করিয়া আসিয়া দেখিল, অভিলাষ তখনও শুইয়া—সে ভয় পাইয়া বলিল, তবে কাজে যাওনি—কি হয়েছে?

অভিলাষ বলিল, জ্বর হয়েছে রে। আজকের রোজটাই মিছে মিছে কামাই গেল। তুই যে আজ সকাল সকাল এলি—ওসব কি রে—

বিন্দী বলিল, বাবুরা দিয়েছে। পিঠে, পুলি, সরুচুকলি অনেক কিছু। এ বেলা আর রাঁধব না। এই খেয়ে থাকবো। তুমিও দুখানা খেয়ো—আমি আবার একবার সহরের বাজারে যাব—

অভিলাষ বলিল, সহরের বাজারে? কেন রে—

বিন্দী বলিল—কাঠ নিয়ে যাব।

—তা আজ নাই গেলি। বিন্দীর মনে তখন কাঁথার কথাই ঘুরিতেছে, সে একমনে কাঠের বোঝা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, না—যাই বিক্রী করে আসি। কয়দিন বন হইতে শুকনো কাঠ ভাঙিয়া ভাঙিয়া জড় করিয়াছিল। আজ তাহাই বেশ করিয়া সাজাইয়া মস্ত এক বোঝা করিয়া বিন্দী সহরের বাজারে চলিল।

অভিলাষ বলিল, একটু তামুক আর কড়া বিড়ি এক-তাড়া নিয়ে আসিস। এখানকার বিড়ি ভারী পানসে—বিশ্রী। বিন্দী হাঁটিতে হাঁটিতে বলিল, আচ্ছা আনব—

শীতের দিন—দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। বিন্দী ফিরিল সেই সন্ধ্যায়। অভিলাষের জন্ত বিড়ি ও তামাক আনিয়াছে। আর আনিয়াছে দুপয়সার ফুলুরী দুই পয়সার একখানি আলুর চপ। অভিলাষ বলিল—ফুলুরী আর এটা চপ্—ওরে বাবা এ যে—তা তুই খেয়েছিস্। বিন্দী বলিল, বাঃ, সারাদিন কি উপোস করে আছি। মুড়ি খেয়েছি ফুলুরি দিয়ে—আর এই দেখ। বিন্দী তাহার

কাপড়ের তলা হইতে একখানি ফরসা পাড়ওয়ালা ছেঁড়া শাড়ী বাহির করিল। অভিলাষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কাপড়—তা পেলি কোথায় রে—

বিন্দী বলিল—না গো না—চুরি করিনি। ভগবান যেন কখনও সে মতি না দেন। বাজারে এক মিনসে এই সব ছেঁড়া কাপড় জামা বিক্রী করে। আমাদের মত গরীব দুঃখী কিনছে—এটা আনলাম বার গণ্ডা পয়সা দিয়ে। কি করব জান? কাঁথা—আরও চার পাঁচখানা হ'লে তবে হ'বে। পাড়টা বেশ খাসা নয়?

অভিলাষের এতক্ষণে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। কাঁথার স্বপ্ন বিন্দী ভোলে নাই—সত্যই সে একখানা খেজুর ছড়ি কাঁথা করিবে তাহ'লে।

—বুঝলে, বার গণ্ডা পয়সা বেঁচেছে। বিন্দী আপন-মনে তাহার কাঁথার কথাই বলিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে। কালো কালির মত অন্ধকার চারধারে যেন ছড়াইয়া পড়িতেছে। অদূরে পচুই মদের দোকানে মাতালেরা মদ খাইয়া গান ধরিয়াছে। তাহাদের ভক্তিরস উথলিয়া উঠিয়াছে। দম্‌ দম্‌ করিয়া বেতালা বাজনার সহিত তাহাদের সমবেত কণ্ঠের রামপ্রসাদী গান দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অভিলাষ ও বিন্দী এক পা এক পা করিয়া মদের দোকানের উদ্দেশ্যে চলিল।

দুজনে যখন ফিরিল—রাত তখন নটা। বাউড়ীপাড়া ইহার মধ্যেই নিঝুম হইয়া গিয়াছে। কোথাও একটুও সাড়াশব্দ নাই বা আলোর রেখা নাই। অন্ধকার কন্‌কনে শীতের রাতে গাছের পাতা বহিয়া টুপটাপ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে—

অভিলাষ ও বিন্দী ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, কুকুরটা উনুনের ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া রহিয়াছে। শূয়োর দুটী জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। উহাদের সাড়া পাইতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া উঠিল। অভিলাষ ও বিন্দী পেট ভরিয়া পচুই মদ খাইয়া আসিয়াছে। রাত্রের খাওয়ার দায় হইতে নিশ্চিন্ত। দুইজনে শুকনো খড়ের উপর চটের থলে গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িল।

বিন্দী বলিল, আর চারখানা কাপড়, তার মানে তিনটে টাকা। আর চারদিন বাজারে গেলেই কাঁথার কাপড় হয়ে যাবে। বড় দেখে সূঁচ আনব। তখন দেখবে কেমন কাঁথা করি—মস্ত বড়—ফরসা—কেমন খেজুর-ছড়ি কাঁথা হ'বে।

অভিলাষ গম্ভীর হইয়া বলিল, আরও তো চাই।

বিন্দী বলিল, আর কি হ'বে? বলে একখানা করতেই প্রাণ যাচ্ছে।

অভিলাষ হাসিয়া বলিল, কেন তোর ছেলের জন্যে—

বিন্দী ছেলেমানুষের মত হাসিয়া উঠিল—যাও গো। তা ছেলে যখন ভগবান দেবেন—তখন তার কাঁথার ব্যবস্থাও তিনি করবেন। বিন্দী শুইয়া শুইয়া তাহার কাঁথার স্বপ্ন দেখিতে থাকে। হঠাৎ দূরে বাঘ ডাকিয়া উঠিল। বিন্দী অভিলাষের অতি কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, বাঘ ডাকছে গো—হেই মা কি হ'বে।

—হ'বে আর কি? কিন্তু খুব কাছেই মনে হচ্ছে। অভিলাষ উঠিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল। কুকুর ও শূয়োর দুটী ডাকিয়া উঠিল। দূরে চাষীদের ক্ষেতে ঢং ঢং করিয়া টিন বাজিতে লাগিল। বাউড়ী পাড়ার ভিতর হইতে সমস্বরে চীৎকার হইতেই বাঘ ডাকিতে ডাকিতে দূরে চলিয়া গেল। আবার নিস্তব্ধ—কন্‌ কন্‌ করিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছে। শীতের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অভিলাষ ও বিন্দী দুইজনে শীতে ঠিক কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া শূয়োরগুলির গায়ের গরমে নিজেদের শরীর গরম করিতে লাগিল। শীতে মানুষ ও পশু এক হইয়া গিয়াছে। কয়দিন পরিশ্রম করিয়া বিন্দী তাহার কাঁথা প্রায় শেষ করিয়া আনিল। কাজের অবসরের মাঝে যখনই সময় পায়, তখনই সে সেলাই করে। তা সত্যিই বিন্দী কাঁথা করিতে জানে। বেশ মোটা মোটা—চারি-ধারে লাল কাল চওড়া পাড় দিয়া ধারগুলি সেলাই করিয়াছে। হলুদ দেওয়া খেজুর পাতা কাঁথার গায়ে আঁকিয়া, তাহাই নানান্‌ রঙের সূতার সাহায্যে সেলাই করিয়াছে। কাঁথাখানি যেন বিন্দীর এক মহামূল্য সম্পদ। আরও কয়দিন পর একদিন দুপুর বেলায় বিন্দী কাঁথা সমাধা করিল। বিন্দীর আনন্দ দেখে কে? কতবার কতভাবে কাঁথাখানি দেখিয়া অভিলাষকে বারবার দেখাইল। বাউরী পাড়ার সকলকে কাঁথা দেখাইয়া বিস্মিত করিল। সকলেই কাঁথা দেখিয়া প্রশংসা করিল। কাহারও কাহারও

হিংসাও হইল। অমন সুন্দর কাঁথা বিন্দী করিয়াছে। শীতের রাতে উহারা মহা-সুখে ঘুমাইবে। হিংসা ও লোভের চিহ্ন বিন্দী লক্ষ্য করিল না। তখন সে অসীম আনন্দে ভরপুর।

বিন্দী আর এক কাজ করিল। তাহার কেষ্ট-মামুকে দিয়া সহর হইতে একটা কপি ও কিছু আলু আনাইল। আজ রাতে সে রান্না করিবে। গরম গরম ভাত আর কপির তরকারী। আজ রাতটা যে তাহার উৎসব রাত্রি। বিন্দী সন্ধ্যার পরই রান্না চাপাইয়াছে। অভিলাষ গিয়াছে পচুই মদের দোকানে।

বিন্দী বলিল, সকাল সকাল ফিরো কিন্তুক। বেশী মদ খেওনা—ভাত রাঁধছি। আলু কপির তরকারী—

অভিলাষ বলিল—অ্যাঁঃ—আলু কপির তরকারী—এ যে বড়লোকী তরকারী—

ভাত হইয়া গিয়াছে—তরকারী চড়াইয়া বিন্দী দেখিল, একটুও নুন নাই। কী সর্ব্বনাশ নূতন আলু কপির তরকারী এই প্রথম আজ তাহারা খাইবে, আর এই দিনই নুন ফুরাইয়াছে? একটুখানি ভাবিয়া, বিন্দী তাহার ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, এক দৌড়ে পাড়ার ভিতর ছুটিল।

বেশীক্ষণ সময় যায় নাই। হয়তো পাঁচমিনিট মাত্র লাগিয়াছে। বিন্দী লবণ লইয়া আসিয়া দেখিল, তরকারী টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে। আন্দাজ মত লবণ দিয়া, বাকী তুলিয়া রাখিতেই তাহার নজরে পড়িল—কাঁথা নাই। একি! তাহার নূতন কাঁথা কোথায় গেল? বিন্দী লাফাইয়া উঠিল।

না—কোথাও নাই। এইটুকু একহাত ঘর—থাকিবে কোথায়? এই তো খড়ের বিছানার উপর তাহার নূতন কাঁথা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল—কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় গেল। সেই গল্পের দেওয়ালে আঁকা ছবির ময়ূরের সোনার হার গিলিবার মত হইল যে? বিন্দী হাত পা ছড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া ডুকরিয়া ককাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সমস্ত অন্ধকারকে—শীতের রাত্রিকে—ঘন কুয়াশাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া—খান্ খান্ করিয়া তাহার মর্ম্মভেদী কান্না রাত্রির বুকে বাজিয়া উঠিল। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল। অভিলাষ হন্তদন্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিল—ভাবিল বাঘ পড়িল নাকি?

বুক চাপড়াইয়া বিন্দী বলিল—সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—কাঁথা—আমার নূতন কাঁথা চুরী হয়েছে—উঃ, আমার কাঁথা। বিন্দী চুল ছিঁড়িতে থাকে।

অভিলাষ বলিল—বলিস কি? চুরী হয়ে গেছে—অমন কাঁথা—অ্যাঁঃ! কি করে হ'ল? বিন্দী তখন মাটিতে লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। রাত্রির বুকে শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া—আর অভিলাষের হাতের মধ্যে বিন্দার লবণাক্ত তপ্ত অশ্রু-জল ঝরিয়া পড়িতেছে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া। তাহার দিনরাতের স্বপ্ন—তাহার বহু আশা বহু পরিশ্রমের জিনিষ—নাই। সে যে বহু পরিশ্রমে—বহু কষ্ট করিয়া দিনরাত খাটিয়া উহা তৈয়ারী করিয়াছিল। শীতের রাতে তাহারা দুইজনে যে গায়ে দিবে—হায় সব আশা নিঃশেষ হইল।

অভিলাষ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, কাঁদিসনে বিন্দী, কাঁদিসনে। বুঝলাম আমাদের চেয়েও দুঃখী লোক, অভাবী লোক সংসারে আছে। নিক্—সেই নিয়ে গায়ে দিক্। তুই কাঁদিসনে। কিন্তু বিন্দীর কান্না বন্ধ হইল না, সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হিংসা কিংবা প্রতিহিংসা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

হিংসা কিংবা প্রতিহিংসা একবার অসংযত মনে হলে উত্তেজিত
সুকৌশলী হিতবাক্যে প্রাণহীন, হয় নাক একেবারে প্রশমিত।
তুষের আগুন যেন অন্তরে অন্তরে জ্বলে, বাতাসে প্রকাশ পায়,
নিজে পুড়ে প্রতিক্ষণ, ক্ষণমাত্র প্রাণান্তক আঁচ লাগে অন্য গায়।
শান্তির আগারে রচে অশান্তির অকরুণ ভয়াবহ কারাগার;
আশঙ্কিত প্রতিপদে সন্দেহের বেড়াজাল,—জ্বালাময় এ সংসার!
আঘাত ও প্রত্যাঘাত প্রশান্তির যে ব্যাঘাত ঘটায় প্রমত্তক্ষণে
শান্তি ও শৃঙ্খলা নাশে, এনে দেয় নানা ভীতি শান্তিপ্রিয় সুস্থ মনে।
সভ্যতার যত্নে গড়া শতাব্দীর বনিয়াদে বিক্রমে আঘাত হানে;
দানবীয় উল্লাসেতে অপকর্ম্মে গৌরবের বীর ধর্ম্ম বলি' মানে।
রোষের বিষের স্রোতে অসহায় নিরীহের ভেসে যায় কত প্রাণ!
বাঁচিতে, বাঁচাতে প্রাণ প্রাণপণে, তরুণের ভয়হীন প্রাণ দান।
সভ্যতার ইতিবৃত্তে দুর্ব্বৃত্তের হীন কর্ম্ম কলঙ্ক রাখিয়া যায়;
বেদনার অবদান ত্যাগের মহিমালোকে সগৌরবে শোভা পায়।

রাজপুতের দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কতে মেমোরিয়্যালের দোতলায় কলপাইখানা আছে এবং অনেকগুলিই আছে। কিন্তু সেগুলি একসঙ্গে পাশাপাশি একজায়গায় এবং এক একটি ব্লকের ইণ্টার ও থার্ডক্লাস কামরার সমস্ত যাত্রীরই ব্যবহারের জন্য। অগত্যা আমরা সে পাইকারী গোসলখানা বর্জ্জন করে একটি সেকেণ্ড ক্লাস বাথরূম বেছে নিয়ে স্নানাদি পর্ব শেষ করে ফেললুম। এগুলির সুবিধা এই—একটি ঘরের মধ্যেই আধখানিতে একটি কল,

উদয়পুরের মহারাণা শ্রীভূপাল সিংহজী বাহাদুর

আধখানিতে পাইখানা। দরজা বন্ধ করে দিলেই একেবারে নিজস্ব! আমরা একে একে পালা করে এটি ব্যবহার করলুম। স্যানিটারী ফিটিং ও ফ্লাশিং সিস্টেম থাকায় আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি।

স্নান সেরে বসে আছি। বেলা ১টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। খিদের পেট জলছে, কিন্তু লক্ষ্মীনিবাস থেকে খানা এসে পৌঁছায়নি তখনো। এমন সময় এক বৃদ্ধ রাজপুত ব্রাহ্মণ একলিঙ্গজীর প্রসাদ এসে হাজির। আমরা নেবনা বললুম, কিন্তু সে ছাড়লে না। প্রসাদ রেখে চলে গেল। বলে গেল, এর জন্য পয়সা লাগবে না। প্রসাদ প্রত্যহ যাত্রীদের বিনামূল্যেই বিতরণ করা হয়।

শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। জয় বাবা একলিঙ্গজী! খিদের চোটে তখন চোখে অন্ধকার দেখছিলুম। একলিঙ্গজী যে জাগ্রত দেবতা—সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ রইল না। তাঁর রাজ্যে অতিথি
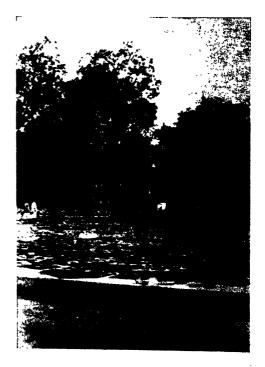
শৈলাবাগের সর্ব্ববৃহৎ জলযন্ত্র

হয়ে অভুক্ত আছি আমরা, আমাদের অবস্থা বুঝে ঠিক সময়ে প্রসাদ পাঠিয়েছেন। শোনা যায় সমগ্র উদয়পুর রাজ্যই নাকি একলিঙ্গজীর দেবোত্তর সম্পত্তি। তিনিই প্রকৃত রাজা। মহারাণারা তাঁর সেবাইৎ স্বরূপ রাজ্য পরিচালনা করেন মাত্র। যাই হোক, প্রসাদ মুখে দিতে না দিতেই হাতে হাতে সুফল পাওয়া গেল! অর্থাৎ লক্ষ্মীনিবাস থেকে গরম গরম ডালভাত তরি তরকারি ও দই মিষ্টি এসে উপস্থিত হল। আঃ! সে কি পরিতৃপ্তির সঙ্গেই না খাওয়া গেল।

খেয়ে উঠতে আমাদের বেলা ২টা বেজে গেল। কিন্তু বিশ্রাম না করে বেরিয়ে পড়া গেল—বাসা খুঁজতে। প্রথমেই পরলোকগত মন্ত্রী প্রভাসবাবুর বাড়ী গেলুম। তাঁর ছেলে সুরেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—ধীরেন ভায়ার দেওয়া চিঠিখানি নিয়ে। গিয়ে শুনলুম সুরেশবাবু বাড়ী নেই। বিকানীরের মহারাজার সংবর্দ্ধনা সভায় গেছেন। কখন আসবেন বাড়ীর কেউ বলতে পারলে না। অগত্যা বললুম—হেঁই পর সমসে বঁড়িয়া যো বেশী সরাই খানা হায় হুঁয়া লে চলো।

উদয়পুর শৈলাবাগ

'বহুৎ আচ্ছা হুজুর!' বলে টংগাওয়াল। আমাদের সারা শহর ঘুরিয়ে যেসব বঁড়িয়া সরাইখানা দেখালে তার কোনটাতেই কোনও ভদ্র লোক বাস করতে পারে না। অগত্যা হতাশ হয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলুম আবার সেই ফতে মেমোরিয়্যালের ৯ নং ইণ্টার ক্লাস কামরায়। মন তখন দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। এ ঘরে রাত কাটবে কেমন করে? শুনলুম ইতিমধ্যে যোধপুর মহরাজের এডিকং তাঁর কথা মতো এসে আমাদের খোঁজ-খবর নিয়ে গেছেন এবং শ্রীমতীর মুখে আমাদের অসুবিধার কথাও শুনেছেন। 'ফতে মেমোরিয়্যালের' ম্যানেজারকে ডাকিয়ে তিনি কি যেন বলে গেছেন। ডাঃ বিজয়কিশন্ উদয়পুরের চীফ্ মিনিষ্টারের নামে যে পত্রখানি দিয়েছিলেন আমরা বুদ্ধি ক'রে যোধপুরের মহারাজার এই এডিকং সাহেবের হাত দিয়েই সেখানি

বাড়ী-বাগ। (শৈলাবাগ সরোবরের মধ্যে জলের ফোয়ারা ঘেরা শীতল ঘাট)

ধীরেন ভায়ার চিঠিখানি ও তার সঙ্গে আমরাও একখানি করুণ আবেদন লিখে বাড়ীর লোককে দিয়ে এলুম। টংগা-ওয়ালাকে

পিচোলা হ্রদের মধ্যস্থ প্রাসাদ

প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের সকাশে প্রেরণ করেছিলুম। কারণ, জানি যে রাজদ্বারে গিয়ে অপরিচিত বিদেশী মানুষ আমাদের পক্ষে মন্ত্রীমহাশয়ের নাগাল পাওয়া সম্ভব হবে না।

ইতিমধ্যে খবর এলো ম্যানেজার সাহেব দেখা করতে চাইছেন। দুশ্চিন্তা নিয়েই গেলুম তাঁর কাছে। আশঙ্কা হচ্ছিল, বোধহয় এঘর-খানিও ছেড়ে দেবার হুকুম হবে। মহারাজার কোনও নূতন অতিথি

হয়ত সমাগত হ'য়েছেন। কারণ, বেলা ১২টা থেকে ৬টে পর্য্যন্ত আমরা দেখে গেছি—সুন্দরী বাঈজীরা আসছেন। বড় বড় ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়েরা আসছেন। কেরল কলাভবনের প্রসিদ্ধ নর্ত্তকেরা আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারসাহেব শশব্যস্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে এক এক খানি ঘর খুলে খুলে দিচ্ছেন।

বিরক্ত হয়ে তাঁকে একটু রূঢ়ভাবেই বলেছিলুম—বহুদূর থেকে পরদেশী অতিথি এসেছে আপনাদের এই সুন্দর দেশ দেখতে। পরিচয়পত্র থেকেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয় আমরা সাধারণ তীর্থযাত্রীর দলভুক্ত নই। আপনি এই সব পেশাদার নাচিয়ে গাহিয়ের দলকে ভাল ভাল ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন অথচ—

ম্যানেজার আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের মতো বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত অতিথিদের উপযুক্ত স্থান দিতে পারছিনি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। আমাকে ক্ষমা করুন। সমস্ত ভাল ভাল ঘর ও ফার্ষ্ট ক্লাশ কোয়ার্টারগুলি মহারাজার আদেশে রিজার্ভ হয়ে আছে—ষ্টেট্ গেষ্টদের জন্য। এরা প্রত্যেকে দরবারের হুকুমনামা নিয়ে এসেছে। উদয়পুরে সমাগত রাজা মহারাজাদের entertain করবার জন্য এদের আনানো হয়েছে। আমি নিরুপায়!—এদের স্থান না দিতে পারলে আমায় চাকরিটি খোয়াতে হবে।

একজন গুজরাটি ভদ্রলোক, বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী বলে মনে হল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা রয়েছেন। তাঁদের মূল্যবান শাড়ী, হীরাজহরতের অলঙ্কার ও অসামান্য রূপলাবণ্য সুস্পষ্টই প্রমাণ করছে যে তাঁরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষ। ভদ্র লোক রেগে উঠে বলেছিলেন—যো রাজমে রেণ্ডী আউর নাচনাওয়ালা দালাল আদমিয়োঁকে ইৎনা ইজ্জৎ, উসকো নাশ্ হোনা চাই জরুর!

ম্যানেজারটি ভদ্র খুব। দেখতেও সুপুরুষ। বয়স বেশী নয়, তিরিশের মধ্যে হবে। চোস্ত ইংরাজী ভাষায় কথা বলেন। নিজেই উপরে উঠে এসে আমাদের ৯নং ঘরের সামনে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঘর থেকে বেরুতেই একমুখ হেসে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললেন—সারাদিন আপনাদের কষ্ট দিয়েছি, মাপ করবেন। আপনাদের জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসুন। রাজদরবার থেকে চীফ্ মিনিষ্টারের আদেশ এসেছে 'ফতে মেমোরিয়্যালের best apartments আপনাদের দেবার জন্য। ফার্ষ্ট ক্লাস কোয়ার্টার নং থ্রী আপনাদের জন্য ঝাড়িয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছি। এই নিন তার চাবী! অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে ম্যানেজারকে বিদায় করলুম। মন তখন উল্লাসে নৃত্য করছে। যাক্! বাবা একলিঙ্গদেব তাঁর রাজ্যে তাহলে আমাদের রাত্রিবাসেরও সুব্যবস্থা করে দিলেন! সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বিজয় কিষণজীর ও জয়ধ্বনি দিলুম!

ঘরের মধ্যে সবাই এতক্ষণ দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ মুখ নিয়ে উৎকণ্ঠিত

উদয়পুর প্রাসাদ থেকে পিচোলা হ্রদের দৃশ্য

চিত্তে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল—তাইত! এমন অসময়ে ম্যানেজার কী বলতে চায় আবার—? সুখবরটা শুনেই ঘর শুদ্ধ সবাই হুড়মুড় করে ছুটলো ফার্ষ্ট-ক্লাশ কোয়ার্টার নম্বর থ্রী খুঁজতে। সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলের প্রশস্ত বারান্দায় উঠে বাঁহাতি এই কোয়ার্টার নং থ্রী। ফার্ষ্ট ক্লাশই বটে। প্রকাণ্ড একটি হল; মেঝের কার্পেট পাতা, টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো। তারপরই মস্ত বড় একটি বেডরুম। ডবল খাট পাতা। সঙ্গে এ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। এর বাথরুমটাই আমাদের এই মাত্র ছেড়ে আসা ৯নং ইণ্টার ক্লাস ঘরের চেয়ে বড়। ঘরের পিছন দিয়ে সরু গলি পথ। তার অপর প্রান্তে ষ্টোর রুম ও কিচেন্। কোণে একটি ছাদ। কাপড় চোপড় কেচে শুকানো চলবে বেশ।

মেয়েরা ভোলানাথও কুলিমারফৎ সমস্ত জিনিসপত্র ৯নং ঘর থেকে আনিয়ে নিয়ে মহা উৎসাহে নূতন বাসা সাজাতে বসলেন। যা

ব্যবস্থা দেখা গেল, একটি ভদ্রপরিবার বেশ আরামে এখানে বাস করতে পারে। প্রত্যেক ঘরের কোলে একটি করে 'ব্যালকনি' বা ছোট বারান্দা। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক্ লাইট। জানলা দরজায় পর্দা। আমাদের সঙ্গে যা কিছু ষ্টোর ছিল তা রান্নাঘরেই ধরে গেল। ভাঁড়ার ঘরটাকে করা হল শ্রীমান ভোলানাথের সার্ভাণ্টস্ কোয়ার্টার! সবেমাত্র ঘরদোর গুছিয়ে নিয়ে সভপাতা বিছানায় শুয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে বিশ্রাম করছি। বাইরের ভেজিয়ে রাখা দরজায় টোকা পড়লো।

"কে?"

"May I come in?"

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি সামনে এক রাজপুতবেশী রাজপুত্তুর দাঁড়িয়ে। পায়ে যোধপুরী পায়জামা ও জরীর নাগরা, গায়ে বুটিদার আচকান হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। মাথায় শিরপ্যাচ কব্জাদার জরীর পাগড়ী। তার একপ্রান্ত ফুলের মতো কানের পাশে কাঁপছে। অপরপ্রান্ত, পিঠের দিকে ঝুলে পড়ে দুলছে!

ছাড়বার আর আমি অবসর পাই নি। এ বেয়াদবিটা মাপ করে নেবেন। আপনার চিঠি পেয়েই আমি সম্ভাব্য নানান জায়গায় আপনাদের থাকবার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা খুঁজে বেড়িয়েছি। কোথাও স্থান নেই। আধ ডজন নেটিভ চীফ্ এসেছেন। এক একজনের সঙ্গে প্রায় পাঁচশো রেটিনিউ। সর্ব্বত্র স্থানাভাব। অসংখ্য ক্যাম্প্ ফেলেও কুলিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে না। অতি কষ্টে আমি এখানকার best হোটেল Towerএ আপনাদের জন্ত একখানা 'ফোর-সীটেড' রুম ঠিক করে এসেছি। একেবারে লেকের ধারেই এই হোটেল। চমৎকার ভীউ পাবেন আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর। রেটও আজকের বাজারে খুব সুবিধা—মাথাপিছু দৈনিক মাত্র ১২্ টাকা!

মনে মনে নামতা ক'সে ঠিক করে ফেললুম আমাদের ছ'জনের সে হোটেলে দৈনিক খরচ পড়বে ৭২্ টাকা হিসাবে। যদি দিন দশেক থাকি—হোটেল চার্জ্জই দিতে হবে ৭২০্ টাকা! এ ভাবে চললে তো দেউলে হ'য়ে বাড়ী ফিরতে হবে!

হ্রদের ওপার থেকে উদয়পুর প্রাসাদ

উদয়পুর রাজপ্রাসাদ

'জয়হিন্দ্।' বলে একটা স্যালুট দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "আপ কিসকো মাঙ্তে হেঁ?"

পরিষ্কার বাংলায় রাজপুতবেশী রাজপুত্তুরটি বললেন—নমস্কার। আপনিই বোধ করি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব। আমার নাম শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

আর বলতে হ'ল না। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হলঘরে এনে বসালুম।

ইনিই উদয়পুরের স্বর্গগত রাজস্ব মন্ত্রী জনপ্রিয় প্রভাসবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। বললেন—এইমাত্র আমি বিকানীরের মহারাজার সংবর্ধনা সভা থেকে বাড়ী ফিরে আপনার চিঠি পেলুম। এখানকার দরবারী পোষাক হচ্ছে এই। ষ্টেটফাংশনে ধুতি পাঞ্জাবী পরে যাওয়া নিষেধ। য়ুরোপীয় পোষাকে যেতে বাধা নেই বটে, কিন্তু সে বিদেশীদের বেলা! রাজকর্মচারীদের দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান এখানে বাধ্যতামূলক বিধি। কিন্তু এই ধড়াচুড়ো

সুরেশবাবু যে এতখানি কষ্ট নিয়ে—আমাদের জন্ত এই অসুবিধার মধ্যেও এমন সুব্যবস্থা করেছেন এর জন্ত তাঁকে অজস্র ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম—একটু আগেই আমরা এই ফাস্টক্লাস এপার্টমেন্টটা পেয়েছি। এখানে আমরা বেশ আরামেই থাকতে পারবো। আপনি শুধু অনুগ্রহ করে একখানা মোটরকার যাতে ভাড়া পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা একটু ঘুরে বেড়াতে চাই। গাড়ী পেলে আমরা কালই বেরিয়ে পড়বো জাগ্রত দেবতা বাবা একলিঙ্গজীকে দর্শন করতে।

সুরেশবাবু একটু হতাশভাবে বললেন—গাড়ী যোগাড় করাই এ সময় সবচেয়ে শক্ত কাজ। দেখি, একজন লোক এখানে তার প্রাইভেট কার মাঝে মাঝে ভাড়া দেয়, যদি পাওয়া যায়, কাল সকালে ৭টার মধ্যে পাঠাবো। না হ'লে একলিঙ্গ মন্দির ও নাথদ্বার পর্য্যন্ত যে বাস যায় তার ফার্ষ্ট ক্লাশ সীট ৬টা আপনাদের জন্ত রিজার্ভ করিয়ে

রাখবো। তাতে গেলেও আপনাদের একটুও অসুবিধা বা কষ্ট হবে না।

জানতে চাইলুম—বাস ধরতে হবে কোথায়? এখান থেকে বাস ষ্ট্যাণ্ড কতদূর?

তিনি হেসে বললেন—বাস যথাসময়ে আপনাদের দরজায় এসে আপনাদের তুলে নিয়ে যাবে। আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আপনাদের আর কি প্রয়োজন হ'তে পারে বলুন? কি কাজে লাগতে পারি?

বললুম—মাঝে মাঝে খবর নেবেন দয়া করে। আমরা এখানে একেবারে নির্ব্বান্ধব। আপনাদের ভরসাতেই রইলুম।

সিগারেট ও চা অফার করলুম। বললেন ধূম্র রসে বঞ্চিত। বিকানীরের মহারাজের দৌলতে প্রচুর চা ও জলযোগ হয়েছে। বরং আপনারা একদিন আসুন আমাদের ওখানে একটু চা খাবেন। আজ বিকেলে গিয়ে অমনি মুখে ফিরে এসেছেন শুনলুম। 'তথাস্তু' বলে' তাঁকে বিদায় দিলুম।

উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই! তাইত! শ্রীমতীরা গেলেন কোথা? রান্নাঘর থেকে একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ এলো কানে। সন্ধানে সেদিকে রওনা হলুম। দেখি সুগৃহিণীরা ষ্টোভ জ্বেলে ভাজা-ভুজি শুরু করেছেন। পাশেই ইক্‌মিক কুকারে কি চড়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই ঝঙ্কার দিয়ে গৃহিণী বললেন—খাবার সময় দেখো। পুরুষমানুষের তো এত কৌতূহল ভাল নয়।

অগত্যা পুরুষের অভিমান নিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে এলুম। (ক্রমশঃ)

হিন্দু

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

আমরা হিন্দু শত শতাব্দী রয়েছি ভারতবর্ষে;
সিন্ধুগঙ্গা তটিনীর তটে বাস করি মহাহর্ষে।
সমুদ্র আর পর্ব্বতমালা বেষ্টিয়া রাখে কৃষ্টি;
জীবনযাত্রা ছিল না কঠোর, করেছি কত না সৃষ্টি!
যেদিন ইহার শোভা-সম্পদে পড়িল ধরার নেত্র,
সেইদিন থেকে বিশ্ববাসীর হোলো বিচরণক্ষেত্র।
গিরিপথবাহী লুণ্ঠনকারী যুগে যুগে আসি' ভুঞ্জে;
সভ্যতা ক্রমে ছড়ালো জগতে, শত শত দ্বীপপুঞ্জে।

আসিয়াছে শক, পারদ, কুষাণ, হুন, কোল, ভীল, মুণ্ডা;
হিমালয় থেকে করিয়াছে বাস দক্ষিণে গোলকুণ্ডা।
লেপ্‌চা, ভুটিয়া, নাগা, খাসি, গারো সবাই জাতির অংশ;
সবার মাঝারে ছড়ায়ে রয়েছে বিরাট হিন্দুবংশ!
চীনা ও দ্রাবিড় মিশেছে আসিয়া আর্য্যশোণিত সঙ্গে;
সাক্ষ্য দিতেছে চোখ মুখ নাসা বর্ণ মোদের অঙ্গে।
আর্য্য এবং অনার্য্য মিলি' হয়ে আধুনিক হিন্দু
মোরা বসবাস করিয়াছি আগে যেথায় সপ্তসিন্ধু।

শান্ত এ জাতি রোধেনি অরাতি, ছিল না একতাবদ্ধ;
তার প্রতিফল পেয়েছে কেবল, দুঃখের নাহি হদ্দ।
হরপ্পা ও মো—হেঞ্জোদড়োতে যা-কিছু হয়েছে লভ্য,
তাতেই ধরণী পেয়েছে প্রমাণ—হিন্দুরা সেরা সভ্য।
ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ববেদ, বহু বেদাঙ্গ গ্রন্থ
রচিল আর্য্য মুনি ঋষিগণ; জ্ঞানের কোথায় অন্ত!
প্রকৃতির বহু বিভূতির মাঝে হেরিয়াছে মহাশক্তি;
পরমাত্মাই নিত্য বস্তু, তাঁহারে জানায় ভক্তি।

বিশ্বজগতে পরব্রহ্মের পূজা করি মোরা নিত্য;
বহু-র মাঝারে একেরে হেরিয়া আমরা করি যে নৃত্য!
অজ্ঞেরা কহে—"মূর্ত্তিপূজারী" ব্যাদান করিয়া আস্য,
প্রতীক কখনো নহে ভগবান্—জানে না এসব ভাষ্য।
মূর্ত্তি ভাঙিয়া মনে ভাবে তাই—ভেঙেছি হিন্দুধর্ম্ম;
ধর্ম্ম কখনো হয় না ধ্বংস, নহে এত সোজা কর্ম্ম।
"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্—" যাঁহাদের এই উক্তি,
মৃত্যু তাঁদের হবে না কখনো, দেহ থেকে পান মুক্তি।

দুধ ফল শাক-সব্জী মাংস যাহাদের ছিল খাদ্য,
নীবি, পরিধান, অধিবাসে যারা ছিল চির-সুখী বাধ্য,
অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ যারা মানে নি সমাজ-কার্য্যে,
বিনাশ করিতে পারিবে না সেই সবল শোভন আর্য্যে।
পুনর্বিবাহ ছিল বিধবার, সমাদর পেতো কন্যা,
সকল কার্য্যে সমাজে নারীরা ছিলেন অগ্রগণ্যা,
সে-জাতির ঘুম ভেঙেছে আবার, তারা কভু নহে ক্ষুদ্র;
বিন্দু বিন্দু হিন্দুর মাঝে প্রণমিনু মহারুদ্র!

হ'তে কৌপীনবস্ত্র বলি না, পরিতে বলি না কন্থা;
ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করো ধরা—ধরো সে প্রাচীন পন্থা!
যাযাবর হয়ে যেতেছ কোথায়, ডুবিও না আর পঙ্কে!
সদা আনন্দে বাস করো সবে জন্মভূমির অঙ্কে।
ছাড়ো অভিমান, ছাড়িও না মান, জীবন অতীব উচ্চ;
আঘাত যে করে ভালবাস তারে, ভেবো না তাহারে তুচ্ছ!
কালের বক্ষে মিলে মিশে যাবে বুদ্বুদ সম দ্বন্দ্ব;
পূর্ব্বগগনে উদিছে অরুণ, আর সাজিও না অন্ধ!

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কয়েক ঘণ্টা পরে গোটেনবার্গ (Gothenbrug) পৌঁছলাম। বিমান আবার আকাশে ছুটে চললো, সুইডেন পেরিয়ে ডেনমার্কের ছোট ছোট দ্বীপগুলির উপর এলাম। গত ফাল্গুন মাসে সুইডেনের লোক সংখ্যা

ব্রাইটন সমুদ্র-তীর

সম্বন্ধে একটু ভুল বলা হয়েছে। সুইডেনের লোকসংখ্যা ১৯৪১ সালের হুইটেকার্স এ্যালমানাক অনুসারে ৬৩,১০২১৪ জন। রাজধানী ষ্টকহল্মের লোকসংখ্যা ৫,৭০,৭৭১ বেনারসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। সুদূর বিস্তৃত খণ্ড খণ্ড ভূভাগের আঁকা-বাঁকা ভাঙ্গা তীরগুলি মানচিত্রের ছবির মত দেখায়। আমরা ডেনমার্ক ছেড়ে 'নর্থ-সি'র উপর দিয়ে ছুটেছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডের মাটী দেখা গেল

ব্রাইটন সমুদ্র-সৈকতে

বিমান নীচে নেমে চললো—ইংলণ্ডের দৃশ্য অতি সুস্পষ্ট—এক ছাঁচে গড়া ঢালু ছাদের অসংখ্য সারিবন্দী বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে, চারিদিকে পথ-ঘাট-মাঠ, সবুজ ক্ষেত, উঁচুনীচু জমিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সারা দেশটি যেন সাজানো বাগান।

ব্রাইটন সমুদ্র সৈকতে

প্রায় বেলা ৩টের সময় আমরা লণ্ডনের বিমানঘাঁটিতে নামলাম; তারপর কাষ্টমের কষ্টকর পরীক্ষা পার হয়ে লণ্ডন পৌঁছে Gloucester Roadএ Baileys Hotelএ গিয়ে উঠলাম।

লণ্ডনে এবার ৭দিন থাকার কথা। পরদিন শনিবার সকালে বেরিয়ে কিছু কাজ সারা গেল। বেলা ২টোয় শহরের দোকানপাট আপিস আদালত সব বন্ধ হল! রবিবার পুরো ছুটী; কাজ কর্ম্ম কিছু নেই, কি করা যায়, সমুদ্রতীরে বেড়াতে খুব ইচ্ছা হল। পোর্টারের কাছে

মোটর বোটে ব্রাইটন সমুদ্র বিহার

খবর নিয়ে জানা গেল Victoria Station থেকে fast trainএ করে একঘণ্টায় Brightonএ পৌছন যায়, Brightonএর সমুদ্রতীর ছুটীর দিনে এ দেশের লোকদের আনন্দ উপভোগের একটি বিশেষ স্থান!

কেম্ব্রিজের পথে

সকালের আহার সেরে খুব খুশী হয়ে আমরাও বেড়াতে গেলাম। পৌছে দেখি সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য, একে ছুটির দিন তায় আবার শীতের শেষ, বাড়ী থেকে সবাই বেরিয়ে পড়েছে সমুদ্রধারে রোদে বসে দিন কাটাবে বলে। তীরে বালি নেই, কেবল ছোট ছোট পাথরের নুড়ীতে ভর্ত্তি। আমরা ৩টে ডেক চেয়ার ভাড়া করে পেতে বসেছি, খুকু জলের ধারে বালি নিয়ে খেলতে গেল। বড় বড় মোটর লঞ্চগুলি অনবরত যাত্রী বোঝাই হয়ে সমুদ্রের বহুদূর অবধি ঘুরে বেড়িয়ে ফিরছে,

লণ্ডনের রাজপথে

খুকু দৌড়ে এল—মোটর লঞ্চে করে বেড়াতে যেতে হবে, বাড়ী ফেরার আগে সবাই মিলে একবার আমরা সমুদ্রে বেড়িয়ে এলাম! প্রায় ৫টার সময় হোটেলে ফিরেছি।

পরদিন ১২ই মে সোমবার। উনি হাসপাতালে কাজ দেখতে গেলেন। আমরা টিউব ট্রেনে করে Countyতে বেড়াতে গেলাম।
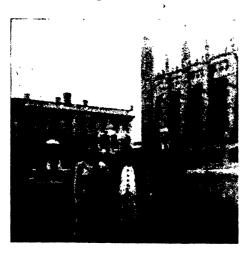
ষ্ট্রাটফোর্ড শহরে এভন নদী তীরে

আণ্ডার গ্রাউণ্ড ষ্টেশনের Escalatorএ (চলন্ত সিঁড়িতে) চড়তে খুকু ভীষণ ভালবাসে—সিঁড়ির একটি ধাপে পা দিয়ে দাঁড়ালেই হল—আপনিই উপরে উঠে আসবে। ১টার সময় আমরা বেড়িয়ে ফিরে হোটেলে লাঞ্চ খেলাম, কি অসম্ভব খারাপ খাবার, খিদেয় মরি, অথচ

মুখে আহার রোচে না। যুদ্ধের পর এ সব দেশে খাভাভাব খুবই বেশী হয়েছে—মাংস নেই, ডিম নেই, সব্জি, তরকারী; দুধ চিনি কিছুই মেলে না। গত বছর দারুণ শীতে কয়লার অভাবে এদের ভীষণ কষ্ট গিয়েছে, সামনে শীতের ভাবনা তারা এখন থেকেই ভাবছে, তার উপর বস্ত্রাভাব। এ হেন চরম দুর্দশাতেও এ দেশে বাংলার মতো দলে দলে

সেক্সপীয়রের গৃহদ্বারে

নরকঙ্কাল পথে পড়ে মরছে না। সরকারী মহলের সুব্যবস্থায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আহার্য্য পায়—তা' সে যতটুকু যেমনই হোক না কেন। দুঃখে দৈন্যে অভাবে সবাই কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তবুও একে অন্যের গ্রাস কেড়ে খায় না।

সেক্সপীয়র-পত্নী এন হ্যাথওয়ের গৃহে

আমরা বিকেলে বেড়িয়ে ৭টার মধ্যে ফিরে চিঠি পত্তর লিখতে বসলাম। এখানে রাত ১২টা অবধি সূর্য্যের আলো আকাশে থাকে, সে আলোয় তখনও বেশ বই পড়া যায়।

১৩ই মে মঙ্গলবার। আজ সকালে কেম্ব্রীজের Cavendish Laboratoryতে ওঁর "মিলিয়ান ভোল্ট্ এক্সরে মেসিন" দেখতে যাবার কথা। ফিলিপ কোম্পানীর সৌজন্যেই সে বন্দোবস্ত হয়েছে, আমরাও সেই সঙ্গে কেম্ব্রীজ বেড়াতে যাব। ঠিক সময়ে বেরিয়ে পড়া গেল। চমৎকার রাস্তা, কোথাও উঠেছে, কোথাও বা ঢালুর মত নীচে নেমে গেছে; উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে যেতে ভারি ভালো লাগে। রাস্তার দু'ধারে ছোট ছোট ক্ষেত, সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠে গরু ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে, চাষীর বাড়ীর চারিদিকে প্রতি আনাচ কানাচটিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা কেমব্রীজে পৌঁছে Cavendish Laboratoryতে গেলাম। সেখানে এক মিলিয়ান, দুই মিলিয়ান, ও ৫০ মিলিয়ান ভোল্টের এক্সরে মেসিন ৩টি দেখে বাইরে বেড়াতে বেরোলাম। রাস্তার ও-ধারে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, পাশেই একটি প্রকাণ্ড গীর্জা, তখন প্রার্থনার সময়। ছেলেমেয়েরা সরু গলায় প্রার্থনায় গান গাইছে। দূর থেকে শোনা যায়। আমরা মাঠে বেড়াতে লাগলাম। উনি গেলেন

লণ্ডনে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবির সম্মুখে

স্থানীয় এক প্রফেসারের (Prof. Mitchel) সাথে দেখা করতে। স্থানটিতে শিক্ষা ও গবেষণার আবহাওয়ায় বেশ সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে উনি ফিরে এসে হেসে বল্লেন যে প্রফেসারটি বড় ভালো মানুষ, এ হেন আবহাওয়ায় জীবন কাটিয়ে বাইরের বিশ্বজগতকে একেবারে ভুলে গেছেন, নিজেকেও কাজের ভিতর হারিয়ে ফেলেছেন। ওঁর উপস্থিতিতে তিনি তো খুব খুশী, স্থানকালপাত্র ভুলে জীবনের সমুদয় গবেষণার তালিকা নিয়ে ওঁকে বোঝাতে আরম্ভ করলেন। সময় বড় কম, তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে, তায় আবার আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি, সুতরাং উনি তো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। যাহোক কোনও রকমে শেষে ফিরে এলেন। আমরা আবার লণ্ডনের দিকে রওনা হলাম। প্রায় ১০০ মাইল মোটরে বেড়িয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে হোটেলে ফিরলাম। লণ্ডনে ঘুরে বেড়িয়ে দিনগুলি বেশ কাটছে। এখানকার Countyতে ছোট ছোট বাংলোগুলি ছবির মত দেখতে, প্রত্যেক বাড়ীর সামনে ছোট্ট একটু সবুজ মাঠ, পিছনে একটু জমিতে তরকারির বাগান।

১৬ই মে। আমরা সকালে বেরিয়ে প্রথমেই গেলাম Pan American Air officeএ। সেখানে কাজ সেরে টমাসকুকের অফিস হয়ে টিউব ট্রেণে চড়ে হোটেলে ফিরছি। অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর তীরের মত ট্রেণ ছুটেছে, ২।৩টা ষ্টেশন পার হয়ে South Kensington Stationএর দিকে চলেছি। হঠাৎ মাঝপথে ট্রেণ থেমে গেল। কি হল? বলে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো, গাড়ী ভর্ত্তি যাত্রী। স্থানাভাবে অর্দ্ধেক লোক দাঁড়িয়েই চলেছে। ইতিমধ্যে দেখি মিস্ত্রীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কামরার ভিতর ছোটাছুটি করছে, বুঝলাম কল বিগড়েছে।

আধঘণ্ট কাটলো, গাড়ী আর নড়ে না। ঘেমে মরি, চোখ জ্বালা করছে, গরমে ও পরিষ্কার বাতাসের অভাবে প্রাণ যায়—যেন ইঁদুর কলে পড়েছি। গাড়ীর ভিতর আবার কোথা থেকে ধোঁয়া আসতে আরম্ভ হল। সবাই ভয়ে অস্থির। বুঝি এইখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হল।

একটু পরে একজন রেল কর্ম্মচারী এসে বল্লেন যে আপনারা গাড়ীর ভিতর দিয়ে দিয়েই বরাবর হেঁটে চলে যান। ষ্টেশন অবধি পরপর ট্রেণ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। কামরার পর কামরা পেরিয়ে চলেছি, ইঞ্জিনের উত্তপ্ত কলকব্জার পাশ দিয়ে সরু পথে হেঁটে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। আমি খুকুর হাত চেপে ধরে কোনরকম করে পার হয়ে চলেছি। প্রায় দেড় মাইল ট্রেণের ভিতরে হেঁটে South Kensington Stationএ নেমে দাঁড়ালাম। বাইরে এসেই মাথা ঘুরে উঠলো। ২।৩ জন মহিলা তখনই ষ্টেশনে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমি ও খুকু একটু সেইখানে জিরিয়ে নিয়ে ওঁর সঙ্গে রাস্তায় উঠে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। আধঘণ্টা বিশ্রাম করে উনি রয়েল সোসাইটি অফ মেডিসিনে ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে চলে গেলেন।

১৭ই মে শনিবার। আজ আমাদের আমেরিকা যাত্রার দিন। সকালে উঠে খাওয়া শেষ করে একটু বাজারে বেরোব, এমন সময় রয়টারের একজন রিপোর্টার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। কথায় কথায় তিনি বল্লেন যে বিদেশে ভারতের খবর খুব কমই পাঠানো হয়, অর্থাৎ মোটেই ভালো প্রপাগাণ্ডা করা হয় না। এই সেদিন ভারতে এত বড় দুর্ভিক্ষ গেল, ভারত থেকে তার খবর বিশদভাবে কোথাও গেল না, কেউ জানতেই পারল না। জার্ম্মানীতে সেদিন কয়েকটামাত্র লোক খেতে পাইনি, কিন্তু তারা সারা পৃথিবীতে সে খবর রটিয়েছে। ফলে, হয় তো আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্যও মিলবে। এমন দরদী কথা শুনলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু খবর যে কেন যায় না সে তো জানি। কথায় কথায় কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই মনে করে উত্তর না দিয়ে দেখা সাক্ষাৎ শীঘ্র শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে সামান্য যা কিছু কাজ ছিল সেরে হোটেলে ফিরে এলাম। প্রায় বেলা ৬টায় আমরা বিমান ঘাঁটীতে উপস্থিত হলাম, আকাশে মেঘ জমেছে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়া সুরু হল। আমরা বিমান ঘাঁটীর মাঠে গিয়ে Pan American Airlineএর একটি বড় বিমানে উঠে পড়লাম। ৬৫জন আরোহী নিয়ে বিমানখানি আকাশে উড়লো। তার মধ্যে ৫২জন যাত্রী, ৯জন চালক এবং ৪জন ষ্টুয়ার্ড ও ষ্টুয়ার্ডেশ। সেই ৫২জন বিমান-যাত্রীর মধ্যে তিনটি মাত্র বাঙ্গালী, আর সবাই ইয়োরোপীয়ান। আকাশের আবহাওয়া খারাপ। বায়ু প্রতিকূলগামী। ইংলাণ্ড পার হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিমান আয়র্লাণ্ড Shanan বিমান ঘাঁটিতে এসে নামলো। এখানে আহারাদি শেষ করে আবার আকাশ পথে উড়ে চলেছি। সামনেই আটলাণ্টিক মহাসাগর, উন্মত্ত জলরাশি ফুলে উঠে পাড় ভেঙ্গে ফেনা ছড়িয়ে চলেছে। উপরে অনন্ত নীল আকাশ। নীচে সীমাহীন নীলাম্বুরাশি। আমরা যেন শূন্যে কোন এক নীল পরীর রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছুটেছি। সূর্য্য অস্ত প্রায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল, দূরে বহুদূরে আরো উপরে বিমান উড়ে চললো। পৃথিবীর ছবি মিলিয়ে এল। দূর থেকে দেখি সাগরের নীল জলে সাদা সাদা অসংখ্য ফেনার ফোঁটা ভাসছে। চারিদিকে অন্ধকারে ঢেকে গেল। বিমানে তখন জোর আলো জ্বলছে। আমি বই পড়ে সময় কাটাতে লাগলাম। রাত হল, যাত্রীরা সব একে একে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে গেল, আমি একা জেগে বসে আছি, ঘুম আর আসে না। জানলা দিয়ে দেখি—অন্ধকারের মাঝে বিমানের দু'দিকে দুটী ডানায় মিট্‌মিট্‌ করে আলো জ্বলছে আর নিভছে। হঠাৎ বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠল, ষ্টুয়ার্ডেশ এসে হাজির। যাত্রীরা অঘোরে ঘুমোচ্ছে দেখে কাউকে না জাগিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। বিমানে যখন দোলা দেখে আমার ভয় করতে লাগল, দেখতে দেখতে ঝোড়ো হাওয়ার স্তর নীচে ফেলে রেখে আমরা আরো উপরে উঠে পড়লাম। সারা রাত এমনি ভাবে কাটল। তখন প্রায় ৪টে বাজে, অন্ধকারের ভিতর নিউফাউন্‌ল্যাণ্ড দ্বীপে Gander এ বিমান ধীরে ধীরে নামলো। বাইরে বেরিয়ে দেখি ভীষণ কনকনে শীত, যথেষ্ট গরম কাপড় পরেছি, উপরে ওভার কোটও চাপিয়েছি কিন্তু তবুও শীতে বাইরে থাকা দায়। বিমান ঘাঁটীর গরম ঘরে আরামে প্রাতের আহার সেরে বড় কাঁচের জানলার ধারে এসে, দাঁড়ালাম, সবে তখন উষার আলো আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে। লাউড্‌স্পীকারের নির্দ্দেশ মত আবার আমরা ফিরে এসে বিমানে উঠ্‌লাম। আকাশপথে ছুটেছি—সারা মাঠে সাদা বরফের গুঁড়ো ছড়ানো। নদী ও জলাশয়গুলি জমে চক্‌চক্‌ করছে। গাছের ঝোপ ঝাড় বরফের ভারে নুইয়ে পড়েছে। খুকু বরফ দেখে ভারি খুশী; তার ইচ্ছে ছিল ভূগোলে পড়া সেই এস্‌কিমোল্যাণ্ডটা একবার সচক্ষে দেখে আসে, কিন্তু এবার তা আর হ'ল না। বেলা বাড়তে লাগল, আমরা নীল চশমা এঁটে পরদা টেনে বসে রইলাম। ষ্টুয়ার্ড বলে গেল প্রায় ১০॥টায় নিউইয়র্ক পৌঁছাব। আমরা তীরের মত ছুটেছি। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে কুয়াশা এসে আমাদের ঘিরে ফেলল, চারিদিক ভীষণ ঘন কুয়াশায় ভরা বিমানের ডানা ২টীও দেখা যায় না,—আমরা যেন কুয়াশার জালে পড়ে বেরোবার পথ পাচ্ছি না। সাদা ধোঁয়ার উপর সূর্য্যের আলো পড়ে চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে—চাওয়া যায় না। ১টা বেজে গেল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই, কুয়াশার পথ আর ফুরোয় না। বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলে উঠল, মনে মনে খুবই আনন্দ হল—এইবার

যাহোক আমরা আমেরিকার মাটিতে নামব। বিমান সেই ধোঁয়ার ভিতরই নীচের দিকে নেমেই চলেছে। হঠাৎ অনুভব করলাম বিমানখানা যেন উপরে মুখ তুলে সজোরে এক টান দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে পাখীর মত উপরে উঠে পড়ল। 'একি!' 'একি!' বলে যাত্রীরা সব একটু হৈ চৈ করে উঠল; ষ্টুয়ার্ডদের কাছে কোন খবরই মিলল না। নিরুপায় হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে চলেছি। ভাল লাগছে না। এমন সময় খেয়াল হল একবার ইঞ্জিনের ঘরটা দেখে এলে হয়। আমাদের অনুরোধে ষ্টুয়ার্ডেস চালকদের অনুমতি নিয়ে এল। আমরা একে একজন করে ইঞ্জিনের ঘরে ঢুকে দেখে এলাম। বিমানের সামনে ছোট্ট একটি কাঁচের ঘর। কতরকমের কালো কালো কলকবজায় ভরা। সেগুলি ঘিরে মধ্যভাগে বসে আছে পাইলট, তারপর প্রথম অফিসার, দ্বিতীয় অফিসার করে ক্রমপর্য্যায়ে ৮জন চালক বসে মাথায় 'হেড্-ফোন' এঁটে ক্রমাগত যন্ত্রপাতি নাড়ছে—একমনে তারা যে যার কাজ করে চলেছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

একটু পরে ষ্টুয়ার্ড খবর দিল যে ভীষণ কুয়াশার জন্য নিউইয়র্কে নামা গেল না। শীঘ্রই আমরা ওয়াশিংটনে নামব। প্রায় ৩টের সময় আমাদের বিমান ওয়াশিংটনের উপর এলো। আকাশ পরিষ্কার পেয়ে বিমান সেখানে নামতে শুরু করলো; দেখতে দেখতে আমরা আমেরিকার মাটীর উপর প্রথম এসে দাঁড়ালাম।

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা গান্ধী

শ্রীভুপতি মজুমদার

জানিনা কোন ভাগ্যসূত্রে অল্পবয়সেই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখি ও ঘর ছাড়িয়া অশান্ত ব্যগ্রতা লইয়া ছুটাছুটি আরম্ভ করি। কিন্তু একথা স্বীকার করিতে আজ একটুও দ্বিধা নাই যে, কংগ্রেসের কাজে ঢুকিবার পূর্ব্বে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ কি, কি রূপ লইয়া সে স্বাধীনতা বাস্তব জীবনে দেখা দিলে স্বাধীনতার সাধনা সফল হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝিতাম না। যাঁহাদের পদতলে প্রথম শিক্ষা পাই, সাধকের দূরদৃষ্টিতে তাঁহারা ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা বলিতেন—"প্রথমে দেশে ভয় তাড়াবার যুগ—তাই প্রথম দলকে নিজেদের পূর্ণ আহুতি দিয়ে দেশে ভয় ভাঙবার যজ্ঞ করতে হ'বে। তারপর একদিন আসবে যেদিন মৃতপ্রায় জাতির দেহে প্রাণ স্রোতের জোয়ার দেখা দেবে, আর তার সকল জড়তার সকল নিশ্চেষ্টতার অবসান ঘটবে।" প্রথম মহাযুদ্ধে শোষিত ভারতবর্ষের অর্থ ও সৈনিক লইয়া ছিনিমিনি খেলার সময় ইংরাজ অনেক কিছু ভালো কথা বলিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধান্তে ভারতের ভাগ্যে মিলিয়াছিল জাতীয় উদ্দীপনা ধ্বংস করিবার অস্ত্র রাওলাট এ্যাক্ট। এই সর্ব্বনাশা রাওলাট আইনের প্রতিবাদে ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। কিন্তু জেনারেল ডায়ারের পরিবেশিত হলাহলের সঙ্গে মিলিয়াছিল অমৃত—জাতীয়তাবোধ ও গান্ধীজীর অভিনব নেতৃত্ব।

দীর্ঘদিনের নির্ব্বাসন ও কারাবাসের পর যখন দেশে ফিরিলাম—দেখিলাম যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জনসাধারণের মনে জাতীয়তাবোধের উদ্দীপনা আসিয়াছে, আর সেই কংগ্রেসের কর্ণধার রূপে মহাত্মা গান্ধী জাতিকে আগাইয়া লইয়া চলিয়াছেন স্বাধীনতার পথে। হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাসী মন সহসা অহিংস অসহযোগের নীতি স্বীকার করিতে রাজী হইল না। কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে মানিলাম, যে মন্ত্রে মৃতপ্রায় জাতির বুকে মহাত্মা নূতন আশার স্পন্দন জাগাইয়াছেন—তাহাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলিবে না। তাই ১৯২০-২১ সালে নাগপুর অধিবেশনে আমরা কংগ্রেসে যোগদান করিলাম। নূতন পদ্ধতিতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হইল। পরাধীনতাই সকল দুঃখের কারণ—এই চেতনা কংগ্রেস দেশবাসীর মনে জাগাইল—আর যদি কোন দিন স্বাধীনতা আসে তাহা রক্ষা করা ও ভোগ করার জন্য সত্যকারের 'মানুষ' সৃষ্টি করার দায়িত্ব নিল কংগ্রেস। "মরব তবু মারব না—এবং এই করেই জয় হবে।" মহাত্মার এই বাণীকে শুধু প্রচার নয় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য কংগ্রেসকর্ম্মীরা বদ্ধপরিকর হইলেন। জাতীয় আন্দোলনের তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে লাগিল। স্বেচ্ছায় কারাবরণ ও সাম্রাজ্যবাদীর নিপীড়ন ও নিষ্পেষণের মধ্য দিয়া দেশ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। একদিকে যেমন সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত হইতে লাগিল, আর একদিকে মহাত্মাজী জনগণের সহিত কংগ্রেসের একাত্মবোধ জাগাইবার জন্য গঠনমূলক কর্ম্মসূচীর প্রবর্ত্তন করিলেন। বিদেশ হইতে আমদানী করা নানাবিধ বিলাসদ্রব্যের সহিত বস্ত্রের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য দেশ তখন পরমুখাপেক্ষী। অপরদিকে অনশনক্লিষ্ট গ্রামবাসী কৃষির প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতার ফলে মৃত্যুমুখী। মহাত্মা গান্ধী খদ্দর পরিধান কংগ্রেসকর্ম্মীর অবশ্য কর্ত্তব্য ঘোষণা করিয়া দুই সমস্যারই সমাধানের পথ দেখাইলেন। শিল্প হিসাবে খদ্দরের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের মনে তখনও দ্বিধা ছিল। কিন্তু শুধু জাতীয় **'uniform'** বা উর্দী হিসাবে নহে, আমাদের অপরিহার্য্য ব্যয়ের সামান্য অংশও যাহাতে দরিদ্র গ্রামবাসীর গৃহে পৌঁছাইতে পারে সেই কথা ভাবিয়া আমরা খদ্দরকেও মানিয়া লইলাম। কিন্তু যুদ্ধকালীন ও পরবর্ত্তী নিদারুণ বস্ত্রসংকটের সময় শিল্প হিসাবেও খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহা ভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভের সহিত নীতির দিক

দিয়াও খদ্দর ও কুটীর-শিল্পকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ মহাত্মাজী বৃহৎ যন্ত্র শিল্পের বিরোধী ছিলেন এই কারণে যে, যন্ত্রশিল্পের অবাধ প্রসারের ফলেই পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সমাজে মারাত্মক অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়াছে। একদিকে যন্ত্রের প্রভাবে মানুষের চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া মন জড়ত্ব পাইতে থাকে, অপরদিকে কায়িক পরিশ্রমকে অপ্রয়োজনীয় করিয়া যন্ত্রশিল্প বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। মূলতঃ যন্ত্রশিল্প মানবতার বিরোধী—এই কথাই মহাত্মাজী বারংবার বলিয়াছেন।

যাহা হউক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহার লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিল। বৎসরের পর বৎসর তাহার এই দাবী কংগ্রেস জানাইতে লাগিল—কোন অবজ্ঞার উপহাস—কোন নির্য্যাতন তাহাকে টলাইতে পারে নাই। তাহার স্বেচ্ছাকৃত দুঃখ, ধৈর্য্য ও ত্যাগের মহিমায় রূপান্তরিত হইল আত্মপ্রসাদে। গান্ধী নেতৃত্বই দেশকে এই অদম্য সাহস জোগাইয়াছে। বিদেশী রাজশক্তি বহুবার প্রয়াস পাইয়াছে ধর্ম্মের নামে—জাতি ভেদের নামে অপপ্রচারের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে। কিন্তু জীবনপণ করিয়াও সত্যাগ্রহী মহাত্মা তাহাদের চক্রান্ত বারবার ব্যর্থ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে আসিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কংগ্রেস কোন পথ লইবে তাহাই হইল সমস্যা। নির্ভুল নির্দ্দেশ আসিল নেতার নিকট হইতে। তিনি বলিলেন—যাহাতে চক্রশক্তির জয় হয় সে কাজ ভারতীয়ের কর্ত্তব্য নহে, আবার যাহাতে ভারতের স্বাধীনতার শত্রু ইংরাজ তাহার অধিকার চিরস্থায়ী করে তাহাও করা চলে না। গান্ধীজীর নির্দ্দেশ মতো কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য যুযুধান জাতিগুলির নিকট পাঠাইল অভিনন্দন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঘোষণা করিল যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। 'না একপাই, না এক ভাই' কিছু দিয়াই এই যুদ্ধে সহযোগিতা করা উচিৎ নয়। আদেশ হইল কংগ্রেসের নীতি প্রচার করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চ স্তর হইতে একটি একটি করিয়া সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিবেন। যাহাতে এই সঙ্কট সময়ে প্রতিষ্ঠান একেবারে ভাঙ্গিয়া না পড়ে তাহার জন্য ব্যাপক আন্দোলন ঐ সময় অযৌক্তিক হইত। কিন্তু অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত পুনরায় নেতা আহ্বান দিলেন জাতিকে—'করিব অথবা মরিব' মন্ত্রে শেষ সংগ্রামের জন্য। বাহির হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর আক্রমণ ও দেশের অভ্যন্তরে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন এই দুইয়ের সমবেত আঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষ তাহার হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল।

রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা যেমন দেশকে দিয়াছেন নির্ভুল নেতৃত্ব, অপরদিকে সমগ্র মানব সমাজকে তিনি দিয়াছেন নূতন পথের সন্ধান, দিয়াছেন নূতন ভাবধারা। মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ভৌগলিক পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন জাতি তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র অথবা জীবন দর্শন গড়িয়া তোলে। মানুষের অজ্ঞাতে ও অলক্ষ্যে যেমন তাহার পূর্ব্বপুরুষের রক্তকণিকা তাহার বাহ্যিক আকৃতি ও অন্তর প্রকৃতিকে গঠন করে, তেমনই এই ভৌগোলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য তাহার ব্যক্তিগত ও সমাজের আদর্শ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে এই সভ্যতার দুইটি বিপরীত-ধর্ম্মী ধারা আছে, একটি প্রেমধর্ম্মী—আর অপরটি স্পর্দ্ধাধর্ম্মী। ভারতবর্ষ সুদূর অতীতে গ্রহণ করিয়াছিল প্রেমধর্ম্ম—আর পাশ্চাত্য দেশে প্রচার হইয়াছিল স্পর্দ্ধা ধর্ম্মের। ভারতবর্ষ তাই বৈচিত্র্যের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছে ঐক্য ও সমন্বয়—বিরোধকে জয় করিয়াছে প্রেমের দ্বারা। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এই প্রেম ধর্ম্মের প্রতীক। ভারতবাসী তাই সহজেই তাঁহার ব্যক্তিত্বে খুঁজিয়া পাইয়াছে আপন সত্তাকে—তাঁহার মুখে শুনিয়াছে আপন অন্তরের কথা।

আজ পৃথিবী নূতন বিপদের সম্মুখীন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যবনিকা না পড়িতেই ইউরোপে নূতন যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে, দেশে দেশে আণবিক শক্তির প্রয়োগে শত্রুপক্ষের আবালবৃদ্ধবনিতাকে নিঃশেষে নির্ম্মূল করিবার অনুশীলন লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যের একটি কোণ হইতে যে সবল কণ্ঠ এতদিন ধরিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী হিংসার হাত হইতে মানবতাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বারংবার প্রেমের প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্বনিত হইতেছিল আজ তাহা নীরব হইয়া গিয়াছে। কোন শক্তিমান পৃথিবীর মানুষকে এখন ডাকিয়া বলিতে পারে—"থাম—ভাবিয়া দেখ" এ যুগে এক অশীতিপর মহামানব মহাত্মা গান্ধীই শুধু ছিলেন, তিনি ঘাতকের নির্ম্মমতা পঙ্কে আত্ম-বলিদানের শুভ্র শতদল ফুটাইয়া হাঁক দিয়া বলিয়া গেলেন "দাঁড়াও, রুদ্ধকর অভিযান।"

মহামানব কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষকে প্রকৃত কল্যাণ পথের সন্ধান দিয়াছেন—দিয়াছেন আশার অমৃতবাণী আর অপূর্ব্ব প্রেরণা।

মায়ার ছায়া

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

রসময়ের বউ মায়া সিঁথের সিঁদুর নিয়ে ভাগ্যবতীর মত সংসারের মায়া কাটিয়ে গেছে আজ সতের দিন। শ্মশান থেকে ফিরে রসময় সেই যে বাড়ীতে ঢুকেছে এ পর্যন্ত আর কেউ তাকে বেরুতে দেখে নি। সেই থেকে আফিস যাওয়া বন্ধ করেছে রসময়—আফিসের বন্ধুরা বাড়ী বয়ে খবর নিতে গেলে গা ঢাকা দেয়, দেখা হলেও ভাল করে কথা বলে না। রসময়ের এই শ্মশান-বৈরাগ্য নিয়ে সেদিন বন্ধুমহলে রীতিমত তর্কাতর্কি চলেছিল। রসময়ের অবস্থাটা যিনি সত্ত উপলব্ধি করে এসেছেন, তিনি একটু ভারিক্কিভাবেই বললেন; 'হ্যাঁ, স্ত্রীর অকালমৃত্যুতে রসময় অগাধ প্রেমের যে নমুনা দেখাল—সেটা স্ত্রী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা বটে!" পাশে বসেছিলেন শচীন ঘোষ, ভারি মুখফোড় লোক তিনি—মুখখানা বিকৃত করে বলে উঠলেন: "পরাকাষ্ঠা না পোড়াকাঠটা!" উপেন সেন তাঁর বাঁধানো সোনার দাঁতটি বের করে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: "তার মানে?"

মানেটা শোনবার জন্তে সবাই সোজা হয়ে বসলেন। হরিপদ মুখুজ্যে স্থূল দেহটি নিয়ে বিশ্বম্ভরের মত জেঁকে বসেছিলেন, আড়ামোড়া দিয়ে কষ্টে দেহটাকে একটু নাড়াচাড়া দিলেন। শচীন ঘোষ তখন মানেটা এই ভাবে ভেঙে দিলেন:

যে মায়ার শোকে রসময়ের আজ শ্মশান-বৈরাগ্য এসেছে, তার প্রতি ভায়ার ব্যবহারের ইতিহাসটা তাহলে বলি শোন।

শোনবার জন্তে সবাই উৎকর্ণ হলেন। শচীন ঘোষ বলতে লাগলেন: একদা গভীর রাতে মায়ার সংগে দাদার কি ঝগড়া; আর শেষ পর্যন্ত সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াল জান? উনানের পাশ থেকে একখানা পোড়া কাঠ এনে মায়ার কোমল অংগে রসময়দা'র কঠিন হাতের কঠোর আঘাত। ও—সে কি বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হে! তাই বলছিলাম—পরাকাষ্ঠা না পোড়া কাঠটা!

শচীন ঘোষের এই ব্যাখ্যানা আর বলার ভংগিটা আর সকলে উপভোগ করলেন, কেবল গোলাপ সেন নামে দলের তরুণ ছোকরাটি মুখখানা বেঁকিয়ে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, কথাগুলি ত বেশ বলে গেলেন এক নিশ্বেসে, কিন্তু পড়শীর হাঁড়ির এই গুপ্ত কথাটা আপনি কি করে জানলেন শচীনদা? প্রতিবাদ উঠতেই শচীন ঘোষের ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল, কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কথা বেরুবার আগেই উপেন সেন তাঁর সোনার দাঁতটি বের করে চোখে মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটিয়ে বললেন—আহা, বুঝছ না গোলাপ, শচীন হচ্ছে ব্যাচেলার লোক, রাতে ঘুম হয় কম। আর মেয়েদের খবরটাই রাখে বেশী—তাই পোড়াকাঠের রহস্য জেনেছিল!

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে শচীন মুখখানা ভার করে উঠে যাচ্ছিলেন, তাঁকে আটকালেন বৈদ্যনাথ সরকার। তিনি এতক্ষণ বাইরে ছিলেন, বৈঠকে সেঁধুতেই শচীনের ক্রুদ্ধভাবে গমন ভংগিটা তাঁর চোখে পড়েছিল। শচীনকে আটকে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপার কি? ব্যাপারটা দক্ষ অভিনেতার মত রসভাসে জানালেন—রাধারমণ। বেঁটে সেঁটে চেহারার লোক ইনি, সখের থিয়েটারে মেয়েলী কণ্ঠে নারীচরিত্র অভিনয় করতে ভারী ওস্তাদ। এঁর মুখে বৈঠকের ব্যাপারটা শুনে বৈদ্যনাথ তাঁর বাঁকা চোখ আরো বেঁকিয়ে বলে উঠলেন: এই কাণ্ড, আরে ছি! আমাদের বন্ধু রসময়ের শোকে কোথায় সহানুভূতি দেখাবে, না তা চুলোয় গেল—কবে কি হয়েছিল, তাই নিয়ে রসিকতা শুরু করেছ—তার ওপর সেই সূত্রে রাগারাগি? আরে ছি! হরিপদ এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এক টিপ নস্যি নাকে ঢুকিয়ে দিয়ে নাক পুঁছে বলে উঠলেন: তাহলে রসময়ের শোকে কি ভাবে সান্ত্বনা দেওয়া যায় তার একটা উপায় আপনিই বাতলে দিন দাদা! বৈদ্যনাথের বাঁকা চোখের খরদৃষ্টি তখন ঘরের কোণে উপবিষ্ট দুটি নির্লিপ্ত নিরীহ ব্যক্তিকে নিশানা করেছে; মুখেও হাসির একটু তীব্র ঝিলিক তুলে বললেন: কেন, তার জন্তে ভাবনা কি—দেখতে

পাচ্ছ না—প্রবোধ দাশগুপ্ত আর নগেন বাঁড়ুয্যেকে? এঁরা হচ্ছেন ওয়াকিভাল লোক, প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর পুনর্বিবাহ করেছেন। সান্ত্বনার ভাষা কিংবা কোন বাণী —ওঁদের মুখ থেকেই বেরুবে ভাল। প্রবোধ কথাটা শুনেও গায়ে মাখালেন না, একটিবার বক্তার দিকে চেয়ে গুম হয়ে গেলেন। কিন্তু নগেন বাঁড়ুয্যে বীরবিক্রমে উঠে বৈদ্যনাথের সামনে এসে হাতমুখ নেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার নামে আপনারা কি কইছেন? বড় ঘরখানার শেষের দিকে ভৈরবী শংকর এতক্ষণ বুঝি ঝিমুচ্ছিলেন। বাঁড়ুয্যের তর্জনে তাঁর তন্দ্রা ছুটে গেল, সংগে সংগে ভুঁড়ি দিয়ে বিশাল দেহটাকে নাড়া দিয়ে বললেন: কি হচ্ছে হে ওখানে—কিসের এত ভীড়? যেন মেছো হাট বসেছে! রাধারমণকেই ব্যাপারটা রসান দিয়ে বলতে হল; শুনে এক গাল হেসে ভৈরবীশংকর শান্তি জল ছড়িয়ে দিলেন একটা প্রবচন বলে—আরে এই নিয়ে এত তর্কাতর্কি! এর সমাধান ত শাস্ত্রকাররাই করে গেছেন; কেন, শোননি—'ভাগ্যিবানের বউ মরে—শুবে?' শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন—সভা ভঙ্গ হল।

—

রসময়ের শোকে বন্ধুদের মনোভাব যাই হোক—বাড়ীতে রসময়ের বুড়ী মা কিন্তু ছেলের অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। রাত্রে রসময় বিড় বিড় করে কি বকে—কখনও উচ্চৈস্বরে পদ্য পড়ে—আবার হাসে! অন্তরঙ্গ বন্ধু রমেন এসে বোঝায়। নানান রকম কথা শোনায়—অমুক লোকের সুন্দরী—অমুকের বিদুষী বউ মরেছে। তুই বেটাছেলে—জোয়ান লোক, তুই কেন শোকে কাতর হবি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? এদিকে আফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল। মা বললেন: বাবা রমু—ওঠ। খেয়ে দেয়ে আফিসে যা—কাজে, কথাবার্তায় অন্যমনস্ক থাকবি। রসময় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে: আমি আর সংসারে থাকবো না, যেদিকে দুই চোখ যাবে—বেরিয়ে পড়বো লোটা কম্বল নিয়ে।

মা সারদা ত শুনে কাঠ। মাথায় হাত দিয়ে আকাশ পাতাল ভাবেন—চোখে জল। প্রতিবেশিনী জ্ঞানদা এসে বলল: ও, দিদি! অমনি করে বসে কেন? সারদা মনের দুঃখে কেঁদে ফেলে বলেন: বউ মরেও গেল, মেরেও গেল বোন! আমি এখন কি করি? ছেলে ত বলে বিবাগী হবে। জ্ঞানদা কাছে এগিয়ে নিম্নকণ্ঠে সমবেদনার সুরে বলে: দিদি, জোয়ান ছেলে তাতে সুন্দরী বউ হারিয়েছে; আবার একটি সুন্দরী বউ ঘরে আনো—ছেলে ঢিট হয়ে যাবে। তা আবার একটা ছেলে আছে। আচ্ছা, বউমার কোন বড়সড় বোন নেই—তাহলে ছেলেটাকেও দেখবে আর—

কথাটা সারদার মনঃপুত হলো, মুখে বলল: তার আপন বোন নেই ভাই—একটা খুড়তুত বোন আছে শুনিছি, খুব নাকি সুন্দরী—পশ্চিমে থাকে।

সেদিনই সন্ধ্যার পরে ছেলের গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে মা বিয়ের কথাটা পাড়তেই ছেলে একবারে লাফিয়ে উঠে বলল: এখুনি আমি বাড়ী থেকে চলে যাব! মা তখন অঞ্চলে চোখের জল মুছে বললেন: তোর ছেলের কি হবে? আমি বুড়ী মা কি করব? কে কার কথা শোনে! "জানি না" বলে ছেলে ঘর থেকে সবেগে বেরিয়ে গেল—ছেলের ভাব দেখে সারদা অবাক!

সেদিন বন্ধু রমেন অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে রসময়কে দিয়ে টাইপ করা দরখাস্ত সই করিয়ে নিলো—ছুটির জন্য। রসময় বলে রমেনকে—চাকরী আর সে করবে না—মায়াই যখন চলে গেল তার বাঁচাই বৃথা! রমেন অবাক হয়ে বলে: তুই কি ক্ষেপলা নাকি রে? বউ তো অনেকের মরেছে কিন্তু তোর মত বাড়াবাড়ি কেউ করে নি? রসময় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে: মায়ার মত বউ কারু আছে? রমেন হেসে বলে: সকলের বউই মায়া! রসময় আশ্চর্য কণ্ঠে বলে: মানে? রমেন দুষ্টুমীভরা মুখে বলে: প্রত্যেকেই নিজের বউকে মায়ার মত সুন্দরী দেখে—এরা মায়া, মোহ, সংসারের বন্ধন! রসময় অবুঝের মত রমেনের দিকে তাকায়! রসময়ের দরখাস্ত পড়ে বড়বাবু বলেন: ওহে রমেন—এ যে দেখছি তিন মাসের ছুটি চাইছে? সাহেব ত এখুনি অধৈর্য হয়ে পড়েছে তার 'পার্সন্যাল'—কন্‌ফিডেন্‌সিয়াল ক্লার্কের অনুপস্থিতিতে। রমেন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বিনীত কণ্ঠে বলে: তার—বড়

মুষড়ে পড়েছে—আপনি ত সব বুঝছেন—বড়বাবু কিছুদিন পূর্বে বিপত্নীক হয়েছেন এবং আবার বিবাহ করেছেন!

সাহেবের কাছে দরখাস্ত পেশ করতেই তিনি ত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। বড়বাবুকে বললেন: একি হে! এ বড্ড বাড়াবাড়ি—তিন সপ্তাহে স্ত্রী বিয়োগের শোক সামলাতে পারলো না মিঃ বাসু? হাত কচলাতে কচলাতে বড়বাবু বললেন: এটা একটা বড্ড 'সক' স্যার!—সামলাতে পারে নি? সাহেব গর্বের সুরে বললেন: জানো, আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ যেদিন পৌছালো 'হোম' থেকে, আমি সেদিনও আফিসে এসেছি! বড়বাবু ফিক্ করে হেসে ফেললেন। তারপর সামলে নিয়ে মনে মনে বললেন: বউয়ের সঙ্গে তোমার তো কোন্ জন্মে সম্বন্ধ ছেদন হয়েছিল। সে থাকতো বিলেতে—তুমি থাকতে এখানে—মাস মাস এক গাদা টাকা পাঠাতে হতো তার খোরপোষের জন্য—মরে গিয়ে বেঁচেছ! মুখে বললেন: স্যার! আপনারা বীরজাতি—আপনাদের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা হয়! সাহেব এবারে খুশী হয়ে বললেন: আচ্ছা, তোমার 'টাইমে' ক'মাস ছুটি নিয়েছিলে? বড়বাবু ফিক্ করে হেসে বললেন: আড়াই মাস, স্যার!

রসময়ের ও শেষ পর্যন্ত আড়াই মাস ছুটি মঞ্জুর হলো।

কিন্তু হায়! কিছুতেই রসময়কে বোঝানো গেল না। একদিন রাত্রে সিদ্ধার্থের মত সে পুত্রের মায়াপাশ ছিন্ন করে গৃহত্যাগ করলো। বৃদ্ধা মা কান্নাকাটি করলেন, ক'দিন অন্নজল মুখে তুললেন না। পাড়াপ্রতিবেশীর অনুরোধে জানদার প্রবোধ বাক্যে, বিশেষ করে কচি নাতিটির মুখ চেয়ে আবার তাকে সামলে-সুমলে সবই করতে হ'ল। দুখানি বাড়ী ছিল কর্তার আমলের, সেই ভাড়া হতে দু'টি প্রাণীর ভরণপোষণ চলতে লাগলো কায়ক্লেশে। বৃদ্ধা দিনের বেলা আনমনা থাকেন, ছেলেটাকে বুকে পিঠে করে সব দুঃখ ভুলতে চান—রাত্রে কেঁদে কাটান। নিয়তির পরিহাস! প্রতিবেশিনীরা সারদাকে সান্ত্বনা দেয়: ভেব না দিদি, রসময় আবার ফিরে আসবেই। সারদা কি ভাবেন তিনিই জানেন।

কাশীই সর্বাগ্রে বিরাগীকে আকৃষ্ট করে। এই সনাতন নিয়মে ও আকর্ষণে রসময়ও সোজা এসে পৌছল কাশীধামে। সেখানে সাধুর সন্ধানে ফিরতে লাগল। মৌনা বাবা, নাগা বাবা, বাঘে গুরু প্রভৃতি হরেক রকম বাবাদের উদ্দেশ্যে ধর্ণা দিয়ে পড়ল। কারু জন্য গাঁজা সাজল, সিদ্ধি বাটল, ত্রিকূটের ছিলিমি নিয়ে কাউকে বা তোয়াজ করল, এমনি কত রকম তাঁবেদারী চলল। শেষে অভক্তি নিয়ে ফিরে এল। রসময়ের খুবই আশা ছিল—কাশীতে সাধুর কৃপা পাবে, সেই সংগে মিলবে পথের সন্ধান। কিন্তু তেমন সাধু ত তার বরাতে মিলল না—এরা শুধু ভোগের গোঁসাই! সেদিন সন্ধ্যার পর এই সব ভাবতে ভাবতে অসিঘাটে নদীর কিনারা ধরে চলেছে, হঠাৎ কে যেন তাকে ডাকল: শোন বেটা! রসময় চেয়ে দেখল, গঙ্গার তীর ঘেঁসে এক সাধু বসেছেন ধুপ ধুনো জ্বালিয়ে—সে ডাকছে রসময়কে। কাছে গেলে সাধু অগ্নিকুণ্ড থেকে একটু ছাই তুলে তার কপালে ঘষে দিয়ে বলল: বেটা, তোর মনে কিসের দুঃখু আছে—হামি জানে? তোর জেনানা—বলেই সাধু রসময়ের চোখমুখের দিকে তাক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। রসময় ভাবাবেগে কেঁদে বলল: হ্যাঁ—বাবা! সত্যি আমার প্রিয়তমা স্ত্রী মায়া আমায় ছেড়ে চলে গেছে—আমি সন্ন্যাসী হবো বাবা! আগেকার সাধু বাবাদের উপর রসময়ের অভক্তি হয়েছিল, কিন্তু এই অন্তর্যামী সাধুটিকে দেখে সে ভক্তিতে গদগদ হয়ে এই সাধুজীর শিষ্যত্ব স্বীকার করল। পরদিনই রসময় গেরুয়া পরল; হাতে কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে চন্দন, সর্বগায়ে মুখে ছাই মেখে পুরাদস্তুর সাধু সাজল। কে বলবে এই সেই রসময়। ভস্মের ভিতর থেকে রসময়ের কাঁচা হলুদের মত গৌরবর্ণ ঝিলিক দেয়—দিব্যকান্তি রসময়—নবীন মহাদেবের মূর্তি ধারণ করলো। তার চলবার সময় লোকে তার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। গুরু তার নামকরণ করলেন—ভোগানন্দ স্বামী।

হিমালয়ের পাদদেশে—হৃষিকেশ—লছমনঝোলার অপর পাড়ে কুলুকুলুনাদী জাহ্নবীর তীরের এক কুটীরে এক সাধু এসেছেন। দিব্যকান্তি সাধুবাবা পূজাপাঠ আরাধনায় সময় কাটান। অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করেন। নূতন সাধুবাবার আবির্ভাবে হরিদ্বারে চাঞ্চল্যের সাড়া তুলেছে। সবার মুখেই সাধুর কথা। স্থানীয় ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের

অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এসে বাবার আশ্রমে বসেন—তাঁর স্তোত্র—বেদগান—ধর্মগ্রন্থ পাঠ শ্রবণ করেন। কচিৎ কথা বলেন সাধুবাবা—তাও দুএকটি। সাধুবাবার অদ্ভুত বেদপাঠ প্রণালী এবং সুষ্ঠু আবৃত্তি শুনে সকলে বলাবলি করতে লাগলো—এতদিন পরে হরিদ্বারে এক সাধু এসেছেন বটে। যেন নবীন মহেশ্বর! কালীকমলীর আশ্রম থেকে বাবার ভোগের বরাদ্দ হলো। প্রচার হয়ে গেল, ইনি সিদ্ধবাক্। যাকে যা বলবেন, সিদ্ধ হবে! এরপরই তাঁর আশ্রমের দরজায় দু'চারজন মাথায় দামী পাগড়ী বাঁধা শেঠজীর আনাগোনা হতে লাগলো। একজন পাকা তুলসীমঞ্চ করে দিলেন, আর একজন পাহাড় কেটে একটি ছোট গুহার মত করে দিলো—শীতের দিনে সাধুবাবার আস্তানার জন্য। দেখতে দেখতে হৃষিকেশ, হরিদ্বার, কনখল, সাহারাণপুর, ডেরাডুন, মৌসুরী থেকে অনেক শেঠজী এসে জুটলো। খালি হাতে কেউ আসে না—দুধ, ঘি, আটা, ময়দা, কলা, বেল, হরেক রকম ফল, আরো কত কি প্রণামী পড়ে। সাধু কত খাবেন? কেউ বলে সাধুবাবা বায়ুভুক্—কিছুই খান না। কেউ বলে—উনি ক্ষুধাতৃষ্ণা জয় করেছেন! একদিন দিল্লী থেকে এক শেঠজী এসে ধর্ণা দিলো সাধুর দুয়ারে। নাছোড়বান্দা, রাত্রি হলো, তবু শেঠজী বসে। সন্ধ্যার পরে সেখানে কেউ থাকে না—হিংস্র পশুর ভয়ে! সাধুবাবার ধ্যান ভঙ্গ হলো মধ্য রাত্রে। হঠাৎ লোক দেখে ভড়কে গেলেন। শেঠজী বিনিদ্র নয়নে সাধুবাবার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সাধুবাবা চোখ খুলেছেন দেখে শেঠজী সোল্লাসে এগিয়ে এসে তাঁর চরণযুগল আঁকড়ে ধরলেন। প্রসন্ন হয়ে সাধুবাবা তাঁকে বসবার ইঙ্গিত করতেই, শেঠজী জানালেন তিনি গভর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ী—গভর্ণমেণ্ট তাঁর বিরুদ্ধে কালোবাজার—তঞ্চকতার বাজার, ঘুষের বাজার প্রভৃতির চার্জে মোকদ্দমা রুজু করেছে। দশ লক্ষ টাকার জামীনে খালাস আছে! এখন সাধুবাবা দয়া করে এমনি একটি মায়াজালের সৃষ্টি করে দিন যাতে পুলিশ আর হাকিমের মুণ্ড ঘুরে যায়। তাল বেতালকে পাঠিয়ে দিয়ে সব তাল-গোল পাকিয়ে দেন। শেঠজী এখানে মন্দির করে দেবেন সাধুবাবার নামে। পূজাপাঠ—গ্রহপূজা—শান্তি কবচ ইত্যাদি বাবদ সাধুবাবার পায়ের নীচে রেখে দিলো বৃহৎ একখণ্ড সোনা! সাধুবাবার চোখ দু'টো প্রথমে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই চোখ বন্ধ করে ধ্যানস্থ হলেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য! শেঠজী যুক্তকরে বসে আছেন—মুখে চোখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। দুই ঘণ্টা পরে সাধুর সমাধি ভঙ্গ হলো। শেঠজী হাতজোড় করে নির্নিমেশ নেত্রে সামনে বসে। জলদ গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো: পাপী! মহাপাপী!! ঠাৎ গুহা মধ্যে—নিস্তব্ধ রাত্রি—হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থানে এই ভীষণ ধ্বনি শুনে শেঠজী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে সাধুবাবার পদযুগল ধরে ভীতকণ্ঠে বলল: বাবা, হ্যাঁ, আমি পাপী—মহাপাপী। আমাকে এবারটি বাঁচান—আর কখনও পাপ কাজ করবো না। সাধুবাবা কিছুক্ষণ মৌনী থেকে শেঠজীর মাথায় হাত বুলিয়ে, কপালে বিভূতির টিপ দিয়ে বললেন: যা! এবার কোন ভয় নেই, কিন্তু আর কখনও আমার এখানে আসিস নি।

শেঠজীর মলিন মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে বেরুল। সাধুবাবার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে আশ্রম ত্যাগ করলো। বলা বাহুল্য এই সাধুবাবাই ভোগানন্দ স্বামী নামধারী রমনর।

পরের দিন। বৈকালে ভোগানন্দ স্বামী ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলেন—হঠাৎ তাঁর কানে এলো বামাকণ্ঠ: বাবা, এই যে এখানে—এস। বহুদিন পরে হিমাচলে বাঙালী মেয়ের কথার আওয়াজ পেয়ে স্বামীজি কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে দরজার দিকে চাইলেন—চারি চক্ষুর মিলন হলো! স্বামীজি হঠাৎ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলে উঠলেন: "মায়া—মায়া!" স্বামীজি মুহূর্তের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে ভাবলেন—কি অদ্ভুত সাদৃশ্য—সেই মুখশ্রী—সেই রং—সেই চেহারা! তরুণী বিস্মিতা হলো স্বামীজির আচরণে! তাঁর বাবা বললেন: মা, ছায়া, সাধুবাবা মায়াবাদ পাঠ করছেন, শুনলে না, মায়া--মায়া বলে ধ্যানস্থ হলেন। ইনিই সেই খ্যাতনামা সাধুবাবা! ছায়া পিতার কথার কোন জবাব দিলে না—বিভ্রান্তভাবে পিতার সঙ্গে মাথা নত করলেন—সাধুর উদ্দেশ্যে।

স্বামীজি চোখ খুলে দেখলেন, সেখানে কোন লোক নেই। তবে কি তার দৃষ্টি বিভ্রম হলো—একি স্বপ্ন!

তার হারানো স্মৃতির শোক আজ যেন তার বুকে পাথরের ন্যায় চেপে বসল।

ছায়ার বাবা কমল মিত্র ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে র‍্যাঞ্জার; ডেরাডুন থেকে সম্প্রতি ঋষিকেশে বদলী হয়ে এসেছেন। তিনি সাধু দর্শন করে কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে দেখলেন, একটি বাঙ্গালী যুবক তাঁর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। যুবকটি তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিলে। তিনি চিঠি পড়ে যুবককে সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। যুবক জানালো সে ডেরাডুনে গিয়েছিলো—সেখানে না পেয়ে এখানে এসেছে। কমলবাবু বললেন: হ্যাঁ—আমিও কিছুদিন পূর্বে আমার ভাইঝি মায়ার অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি; তারপর মায়ার বরের সঙ্গে আমার মেয়ে ছায়ার বিবাহের প্রস্তাবও হয়েছিল—আমার দাদা লিখেছিলেন। ছেলেটি নাকি দেখতে শুনতেও ভাল, আর খুব বিদ্বান। আহা! ছেলেটি শোকে কাতর হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে, বড়ই দুঃখের কথা। এখানে কোথায় খুঁজতে চাও বাবা?

যুবক বিনীত কণ্ঠে বলল: এখানকার পাহাড় পর্বত সন্ধান করব ভেবেছি। এই যুবকই আমাদের পূর্ব-পরিচিত রমেন। ছায়া পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। কমলবাবু বাড়ীর ভিতর ঢুকে স্ত্রীকে গিয়ে সব বললেন, ছায়া মায়ের পাশে ছিল। কমলবাবু হেসে বললেন: ভাখো—এদের কাণ্ড! এরা এই দেশে সেই বাঙ্গালী ছেলেকে খুঁজতে এসেছে, আর যায়গা পেলো না!—ছায়া নীচু হয়ে তার মায়ের কানের কাছে মুখ রেখে কি বলল। কমলবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: ছায়া মা, কি বলছে? স্ত্রী সহাস্তে বলল: ছায়া বলছে ওর মায়াদি'র বরকে এখানেই পাওয়া যাবে। কমলবাবু ভ্রু কুঞ্চিত করলেন।

দু'দিন পরে। সাধুবাবা—ভোগানন্দ স্বামীকে আর তাঁর আবাসে দেখতে পাওয়া গেল না—তাঁর গৈরিক বসন—পুঁথিপত্র সব পড়ে আছে কিন্তু সাধুবাবা নেই। সকলে বলাবলি করতে লাগল: ইনি সাক্ষাৎ মহাদেব, শ্বশুরের ভিটে দেখতে এসেছিলেন। কনখলে ত তিনি যাবেন না, সতীর স্মৃতি সেখানে যে! তাই, এখানে ক'দিন থেকে বিভূতি দেখিয়ে গেলেন। স্বর্গের ঠাকুর—এখানকার পোষাক পরিচ্ছদ এখানে রেখেই স্বর্গে চলে গেছেন! কালীকমলীর আশ্রম থেকে একজন সাধু এসে সাধুবাবার পোষাক-খড়ম নিয়ে গেলেন—সেগুলি রেখে দিলেন সেখানকার বিগ্রহের সিংহাসনে।

• • • • •

কয়েক দিন পর। রসময় সশরীরে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। মায়ের চরণে ভূমিষ্ট হয়ে সে একাই প্রণাম করল না—সেই সংগে ছায়াও। সারদা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু! একবার বউয়ের মুখের দিকে চান, তার পরেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকান। শেষে হতভম্বের মত হয়ে বললেন: এ তো দেখছি আমার বউ মা! এ কি স্বপ্ন দেখছি! বৃদ্ধা সারদামণি যেন ফাঁপরে পড়েছেন, হকচকিয়ে গেছেন—প্রত্যেকের মুখের দিকেই অসহায়ভাবে তাকাচ্ছেন। মায়ের অবস্থা বুঝতে পেরে রসময় হেসে বলল: মা, মায়ার ছায়া! বৃদ্ধা তবু বিহ্বলের মত চেয়ে থাকেন! রমেন স্নিগ্ধ স্বরে বলল: কাকীমা, এ মায়ার সেই বোন—ছায়া!

বুড়ী মা মনে মনে বলেন: কি আশ্চর্য সাদৃশ্য! বিভ্রান্ত হয়ে ভাবতে থাকেন! ওদের কথায় তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না!

খবর পেয়ে শচীন ঘোষ ছুটে এলেন, মুখে দুষ্টুমীভরা হাসি; ব্যজ স্বরে বললেন: এবারে একখানি "উদভ্রান্ত প্রেম" কি "হিমালয় পরিভ্রমণ" লিখে ফেল ভায়া। রসময় একগাল হেসে বলল: উঁহু! আমি লিখছি "ভোগানন্দ স্বামীর আত্মকাহিনী"! শচীন চেয়ে থাকেন অবাক হয়ে বোকার মত। রমেন হেসে বলল: ইনিই ভোগানন্দ স্বামী!

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাংলা দেশে বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত হয় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই। এই আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে কয়েকবারই কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপিত হয়, কিন্তু কোনটিই বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। না পারার কতকগুলি কারণও ছিল—তন্মধ্যে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব অন্যতম। কোনও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় সমিতিগুলির কার্য্যে তেমন শৃঙ্খলা ছিল না—এক দলের সহিত অপর দলের পারস্পরিক সহযোগিতার ছিল একান্ত অভাব। এইভাবেই কিছুদিন ধরিয়া বাংলা দেশে কিছু কিছু বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বরোদার রাজ-কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। বহুদিন ইংলণ্ডে কাটাইয়া আসিয়া উক্ত কার্য্যে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। অরবিন্দ বরোদায় যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন তরুণ বাঙ্গালী উক্ত ষ্টেটে সেনা-বিভাগে কাজ করিতেছিলেন। সেখানেই অরবিন্দের সহিত যতীন্দ্রের পরিচয় হইল। পুণার ঠাকুর সাহেবের গুপ্ত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠান হইতে অরবিন্দ বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তিলকের সহিতও তাঁহার সংযোগ স্থাপিত হয়। অরবিন্দের নিকট হইতে সরলা দেবীর নামে একখানি পত্র লইয়া বরোদার মহারাজার শরীর-রক্ষীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া ১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় বিপ্লব প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা। যুবকদের অন্যতম প্রধান নেতা ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্রের সহায়তায় তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার নিকটে ১০২ নং সার্কুলার রোডে একটি গুপ্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন।

ইহার পর যতীন্দ্রনাথ বাংলায় বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কার্য্যরত বহু গুপ্ত-সমিতির দ্বারা বহু সদস্য সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছে; বাঙ্গালীরা যদি উপযুক্ত সময়ে তাহাদের ন্যায় প্রস্তুত হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতে যোগ্য স্থান ও মর্য্যাদা লাভে তাহারা সক্ষম হইবে না। সর্ব্বভারতীয় বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য অবিলম্বে তাহাদের প্রস্তুতি আবশ্যক। অরবিন্দ শীঘ্রই বাংলায় আসিয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব লইবেন বলিয়াও তিনি ঘোষণা করিলেন।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় আসার কয়েক মাস পরে অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষও ১৯০৩ সালের প্রথম দিকে বাংলায় আসিলেন। তাঁহারও আগমন ঐ একই উদ্দেশ্যে। অরবিন্দও ঐ সালে একবার বাংলায় আসিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার দেওয়া কতকগুলি পুস্তক লইয়াই সার্কুলার রোডের বাড়ীতে একটি লাইব্রেরী ও রাজনীতির ক্লাস খোলা হইল।

অনুশীলন-সমিতি, যুগান্তর দল ইত্যাদি কয়েকটি দলই তখন অন্য দলগুলির মধ্যে প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিল। উক্ত সমিতিগুলির কার্য্যকরী প্রচেষ্টায় কলিকাতার নানা স্থানে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের নানা শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এই সমিতিগুলির শাখা পল্লী-অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে। বাহিরে শরীর চর্চ্চার দ্বারা সুস্থ-সবল দেহ-মন গঠন এবং ভিতরে ভিতরে অতি সংগোপনে বিপ্লবের বাণী প্রচারই এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ছিল। কর্ম্মী ও বিপ্লবী

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

সংগ্রহ করা হইত অতিশয় সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত, কারণ বিন্দুমাত্র অসাবধানতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমগ্র কর্ম্মপ্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা বর্ত্তমান ছিল। লোকের মনে বিপ্লববাদ জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিপ্লবাত্মক নানাবিধ পুস্তিকাও প্রচারিত হইতে লাগিল।

বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কীয় একটি ঘোষণার ফলে যেন বিপ্লবীরা এই সময় অতিরিক্ত মাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠিল।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য

প্রদেশসমূহ অপেক্ষা বাংলা প্রদেশই শিক্ষা-দীক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী এবং বাংলা দেশ হইতে উত্থিত দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই সমগ্র ভারতবর্ষ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিতেছে। সুতরাং ভারতে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে বৃহৎ বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই সাধু সঙ্কল্প অন্তরে লইয়াই স্বাম্য রক্ষণশীল লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা তখন এক প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামকে একত্রিত করিয়া আর একটি নূতন স্বতন্ত্র প্রদেশ সৃষ্টির অভিপ্রায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কার্জ্জন সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করিলেন। এই সর্ব্বনাশা প্রস্তাব শুনিবামাত্র দেশের জনসাধারণ যেন চকিত হইয়া উঠিল। বৃটিশ কূটনীতিবিদ্‌দের এই নূতন চক্রান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং প্রায় সকলেই একবাক্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু এত বিরোধিতা সত্ত্বেও লর্ড কার্জ্জন তাঁহার দুর্জ্জয় জিদ ত্যাগ করিলেন না। এ দেশের জনমতের বিন্দুমাত্র মূল্য তাঁহার নিকট ছিল না। তিনি ছিলেন সর্ব্বপ্রকার প্রগতি ও গণতন্ত্রের বিরোধী। ভারতীয়দিগকে দমন করিয়া খর্ব্ব করাই তাঁহার মূল নীতি ছিল। তাঁহার আমলে ১৮৯৯ সালে নূতন আইন রচনা করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়। ১৯০৪ সালে তিনি নূতন আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। নূতন পুলিশ আইনে তিনি পুলিশ-বিভাগের শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাঁহারই দ্বারা গোয়েন্দা বিভাগের সৃষ্টি হয়।

লর্ড কার্জ্জনের মতে ভারতবাসীরা ছিল উচ্চ ও দায়িত্বপূর্ণ পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কেবলমাত্র ভারতবাসীদিগকেই নহে—সকল এশিয়াবাসীকেই তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ১৯০৫ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্ত্তন বক্তৃতায় তিনি এশিয়াবাসীদিগকে প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী ও অসৎ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। সুতরাং এ হেন দাম্ভিক কার্জ্জনের নিকট বঙ্গ-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভের আশা দুরাশা মাত্র। পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদিগকে বুঝান হইতে লাগিল যে, এই বিভাগ দ্বারা তাহাদের অত্যন্ত সুবিধা হইবে।

১৯০৫ সালের ২০শে জুলাই বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে ভারত-সচিব সম্মতি দান করেন এবং ১৬ই অক্টোবর এই স্বতন্ত্রীকরণ সংঘটিত হইবে বলিয়া ঘোষিত হইল।

এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণায় দেশবাসী বুঝিতে পারিল যে, মুখের কথায় আর কোনও কাজ হইবে না—হাতে-কলমে অচিরেই কিছু করা দরকার। ভারত-শাসনের ব্যাপারে বৃটিশের ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ আর একবার যেন দিবালোকের স্থায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাঙ্গালীরা মনে করিয়াছিলেন, বাংলার এই অপমানকে জাতীয় কংগ্রেস একটি সর্ব্ব-ভারতীয় ব্যাপার এবং সমস্যা হিসাবে গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। আবেদন-নিবেদনের সহজ সরল পন্থা ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দায়িত্ব লইতে নরমপন্থীরা প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে ইহা লইয়া মত-বৈষম্য প্রকট হইয়া উঠিল এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া দুই দলে বেশ একটা বিরোধ উপস্থিত হইল। তখনকার চরমপন্থীদের মধ্যে লোকমান্য তিলক, পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়, মুঞ্জে, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশেষে নরমপন্থীরা একটা মিটমাটের আশায় সর্ব্বজনমান্য নেতা দাদাভাই নৌরজীকে বিলাত হইতে লইয়া আসিলেন এবং ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে তিনিই করিলেন সভাপতিত্ব। উক্ত অধিবেশনে ভারতবাসীদের অধিকার সম্বন্ধে সেইবারই সর্ব্বপ্রথম ঘোষিত হয়—স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রয়োজন হইলে স্থানবিশেষে "বয়কট আন্দোলন" চালান যাইতে পারিবে বলিয়াও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।

নানা সভা-সমিতিতে ইহার পরই আরম্ভ হইল তীব্র ভাষায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল সমগ্র দেশময় যেন আগুন ছড়াইতে লাগিলেন। স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন সারা দেশে অল্পদিনেই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিবাদস্বরূপ নানা স্থানে হরতালও পালিত হইতে লাগিল।

দুইটি আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাও এই সময় জনগণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজদের বিরুদ্ধে বুয়রদের সাফল্য এবং ক্ষুদ্র জাপানের হস্তে বৃহৎ রাশিয়ার পরাজয় তাহাদের মনে প্রেরণা সঞ্চারে সহায়তা করে।

নেতৃগণ এই সময় উপলব্ধি করিলেন যে, বিদেশী শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যক। এই বিষয়ে ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅরবিন্দ হইলেন অগ্রণী। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ইত্যাদির অর্থানুকূল্যে ইহার পর National Council of Education প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরবিন্দ বরোদা রাজ্যের মোটা মাহিনার চাকুরী ত্যাগ করিয়া অতি অল্প বেতনে ইহার অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৬ সালের আগষ্ট মাসে বাংলায় আসিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে যে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহা ক্রমশঃ একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ লইয়া জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল। বিপ্লবীদেরও ইহাতে অনেকটা সুবিধা হইল। এই প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাতে তাহারা আত্মগোপন করিয়া দ্রুত নিজেদের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিল। এইবারের আন্দোলনে ছাত্রসমাজই বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিল এবং এই ছাত্রসম্প্রদায় হইতেই বিপ্লবীরা প্রধানতঃ সদস্য ও কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে লাগিল। ছাত্রদিগকে দমন করিবার জন্য তাহাদের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয় এবং আদেশ অমান্যকারীদিগকে বেত্রাঘাত করা অথবা স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া চলিতে থাকে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল ধন-ভাণ্ডার খোলা

হইল এবং হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ রাখী-বন্ধন উৎসবের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসামের নূতন লেঃ গভর্ণর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সকলকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া ঘোষণা করিলেন, আন্দোলন দমন করিবার জন্য "bloodshed may be necessary" এবং প্রকাশ্যে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করা আদেশজারী করিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় "যুগান্তর" দল এবং ঢাকায় "অনুশীলন-সমিতির" প্রভাব ছিল খুব বেশি। "অনুশীলন-সমিতি" প্রতিষ্ঠার একটু ইতিহাস আছে। বিপিন পাল ও ব্যারিষ্টার প্রমথ মিত্র (পি, মিত্র) একবার ঢাকায় গিয়াছিলেন। পি, মিত্র ছিলেন সর্ব্বদাই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী। সেখানে পরামর্শের পর একটি বিপ্লবী দল স্থাপিত হয় এবং উকিল আনন্দ চক্রবর্ত্তীর অধিনায়কত্বে ও পুলিনবিহারী দাসের পরিচালনায় "অনুশীলন সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। পি, মিত্রের দ্বারা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতাতেও "অনুশীলন-সমিতি" গঠিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর "অনুশীলন" প্রবন্ধ হইতেই নাকি সমিতির ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। অপরপক্ষে ৺শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক উপন্যাসের নাম হইতে অপর বিপ্লবী দলটির নামকরণ হইয়াছিল "যুগান্তর"।

যে সকল পুস্তিকা এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে প্রচারিত হইত, তাহার কয়েকখানির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ লিখিত "ভবানী-মন্দির" ও "No compromise," সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা" ও "মুক্তি কোন্ পথে" এবং "বর্ত্তমান রণনীতি" ইত্যাদি পুস্তিকাসমূহ বিপ্লবীরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিত। "আনন্দ-মঠ" এবং "দেবী চৌধুরাণী" গ্রন্থও বিপ্লবীদিগের প্রিয় পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের কাহিনী বিপ্লবীদিগকে এতই প্রভাবিত করিয়াছিল, যে এই সময়কার বহু বিপ্লবীও সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষায় বিপ্লবের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইত এবং ঐরূপ বেশেই অনেকেই পুলিশের হাতে ধরাও পড়িয়াছিল! বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ বিপ্লবীদের মনে জাগাইয়া তুলিত বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস।

বিপ্লববাদকে সমর্থনকারী কতকগুলি সংবাদ-পত্রেরও এই সময় উদ্ভব হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় "সন্ধ্যায়", অরবিন্দ "বন্দেমাতরম্"এ এবং বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি "যুগান্তর" পত্রিকায় সরকারী নীতির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে বাঙ্গালীদের এই জাতীয় আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড দমন-নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। সুপ্রাচীন বিভেদ-নীতিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হইল। ১৯০৬ সালে যখন দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন চলিতেছিল, তখন ঢাকার নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদ-ভবনে সৃষ্ট হইতেছিল মুসলিম লীগ। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করা হইল; চতুর্দ্দিকে ইহা প্রচারিত হইল যে, হিন্দু-দলনের পশ্চাতে মুসলমানদের প্রতি ভারত-সরকারের সমর্থন আছে এবং হিন্দুদের দোকান-পত্র লুণ্ঠন ও নারী-হরণে (বিশেষ করিয়া বিধবা) সরকার শাস্তি দিবে না। নবগঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ছোটলাট স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার নির্লজ্জের মত প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিলেন—মুসলমানগণ তাঁহার "সুয়োরাণী"।

ফল যাহা হইবার—তাহাই হইল! প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় বিশেষ করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ কিছুদিন যাবৎ বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি নেতারা ইহাতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন "Purification by blood and fire"—নীতিতে বিশ্বাসী। ইহা ব্যতীত যে দেশের স্বাধীনতা আসিতে পারে না—তাহা তিনি জানিতেন। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে তিনি লিখিলেন—"If our people do not lift their finger or court death when seeing women violated before their eyes, they have morally ceased to exist. Long subjection has crushed the soul and left the mere corpse."

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টও পীড়নের মাত্রা বর্দ্ধিত করিলেন। বিপিনচন্দ্র প্রচার করিতে লাগিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী। দাদাভাই নৌরজীর ব্যাখ্যাত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পরিবর্ত্তে, ইংরাজ-বর্জ্জিত পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের দাবী বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন; সুতরাং তাঁহার মতে কেবল বিদেশী দ্রব্য বয়কট করিলেই চলিবে না, বিদেশী শাসনকেও সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা চাই।

১৯০৭ সালে গভর্ণমেণ্ট সংবাদ-পত্র দলনে তৎপর হইলেন। ঐ সালের ২০শে জুলাই তারিখে "যুগান্তর"-সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ইহার মাত্র কিছু দিন পরেই দুইটি অনুরূপ প্রবন্ধ "বন্দেমাতরম্" পত্রিকায় প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই মামলা পরিচালনার ভার পড়িল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর এবং বিপিন পাল ছিলেন এই মামলার একজন সাক্ষী। আদালতে বিপিনবাবু কোনও প্রশ্নের উত্তর দানে স্বীকৃত না হওয়ায় মামলা ফাঁসিয়া গিয়া অরবিন্দ মুক্তি পাইলেন। বিপিনবাবু কিন্তু রেহাই পাইলেন না। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁহার ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

বিপিনবাবুকে কারাদণ্ড প্রদানের দিন জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারী আদালতে সমবেত জনসাধারণের কয়েকজনকে ধাক্কা দিয়া ঘুসি মারে। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুশীল সেন নামক একটি অল্পবয়স্ক বালক উত্তেজিত হইয়া ঐ কর্ম্মচারীকে পাল্টা ঘুসি মারিয়া বসে। কলিকাতার তৎকালীন চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ড উক্ত অপরাধে বালকটির প্রতি ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ দিলেন।

১৯০৭ সালের শেষভাগে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার সম্পাদিত

"সন্ধ্যা" পত্রিকায় "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়" নামক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। আদালতে ব্রহ্মবান্ধব ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বিধাতার নির্দিষ্ট স্বরাজলাভের প্রচেষ্টায় তিনি যে সামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার জন্য কোনও বিদেশী সরকারের নিকট কোনও কৈফিয়ৎ তিনি দিবেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহাকে জেলে দেওয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যাতীত এবং মামলায় তিনি কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই। মামলা বিচারাধীন থাকা কালেই অন্ত্রে অস্ত্রোপচারের পর ব্রহ্মবান্ধব পরলোকগমন করেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া সত্যই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সাধ্যে কুলায় নাই।

১৯০৭ সালের ১লা নভেম্বর রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা-দমন-আইন প্রণয়ন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন ও সভা-সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ভারত-সচিব মর্লি এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘোষণায় জানাইলেন,—"The Government have been obliged to take measures of repression; they may be obliged to take more."

কলিকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে মুরারীপুকুর বাগানে একটি বড় রকমের গুপ্ত বিপ্লবী-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস (কানুনগো), উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র বসু, উল্লাসকর দত্ত ইত্যাদি নেতাগণ এই কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হেমচন্দ্র দাস ছিলেন মেদিনীপুরের একজন বিপ্লবী এবং তিনি ১৯০৬ সালে ফ্রান্সে গিয়াছিলেন বোমা তৈয়ারীর কৌশল আয়ত্ত করিতে। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া মুরারীপুকুর বাগান কেন্দ্রে যোগদান করেন। চন্দননগর ও রাজাবাজারেও বোমার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নানাবিধ বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ারী এবং পিস্তল ও রিভলবার সংগ্রহ পূর্ণ উদ্যমে চলিতে লাগিল।

এ দেশের জনমতকে উপেক্ষা করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গের বিষয় ঘোষণায় ইতিপূর্ব্বেই যেন বাংলার যুব-শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছিল। তাহার উপর চলিতেছিল 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'র মত মধ্যে মধ্যে শাসন-কর্ত্তাদের দম্ভোক্তি। অত্যাচার-উৎপীড়নও ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছিল। সমগ্র পরিস্থিতিটাই বিপ্লবীদের নিকট দুর্ব্বিসহ হইয়া দাঁড়াইল। সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ এবং বক্তৃতা-দমন আইনের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের উপায়ও অবশিষ্ট ছিল না। অনন্যোপায় যুব-শক্তি তখন রক্তদান ও রক্তপাতের বিঘ্ন-সঙ্কুল পথই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল।

১৯০৬ সাল হইতেই পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসামের অত্যাচারী ছোট লাট ফুলার সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা ও সমর্থক ছিলেন বিভক্ত পশ্চিম বঙ্গের ছোট লাট স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজার। বিপ্লবীদের ক্রোধটা তাহার পর তাঁহারই উপর পড়িল। ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে চন্দননগরের নিকটে উল্লাসকর দত্তের তৈয়ারী বোমায় তাঁহার ট্রেণ উড়াইয়া দিবার প্রথম চেষ্টা হইল। সে প্রচেষ্টা সফল হইল না। ছোট লাটের ট্রেণ ধ্বংসের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে। ঐদিন তিনি ট্রেণে চাপিয়া মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। নারায়ণগড় ষ্টেসনের নিকটে বিপ্লবীরা ট্রেণের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া উহা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিল। বোমার আঘাতে ট্রেণের কয়েকখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া গেলেও ফ্রেজার সে যাত্রাও রক্ষা পাইলেন।

এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদিগকে ধরিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয় এবং বিপ্লবীদের প্রচেষ্টাকে হেয় ও লঘু প্রতিপন্ন করিয়া চাপা দিবার জন্য অবশেষে জনকয়েক কুলীকে ধরিয়া স্বীকারোক্তি করাইয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়া হয়।

ঐ সালেই ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকার পূর্ব্বতন ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে হত্যা করিবার জন্য গোয়ালন্দ ষ্টেশনে দিনের বেলায় তাঁহার উপর রিভলবারের গুলি নিক্ষিপ্ত হইল—কিন্তু সে চেষ্টাও হইল ব্যর্থ। কুষ্টিয়ার পাদ্রী হিকেন সাহেবের উপর ইহার পর বিদ্রোহীরা গুলিবর্ষণ করে। ১৯০৮ সালের মার্চ্চ মাসে বাংলার ছোট লাটের ট্রেণ ধ্বংস করিবার জন্য আর একবার নিষ্ফল প্রচেষ্টা হইল।

চন্দননগরের মেয়র মঃ তার্দিভিল চন্দননগরে স্বদেশী-সভার অনুষ্ঠানে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেন এবং ফরাসী চন্দননগরে অস্ত্র-আইন না থাকায় বিপ্লবীদের অস্ত্র-সংগ্রহের যে সামান্য সুযোগ ছিল, তাহা একটি অস্ত্র-আইন পাশ করিয়া রহিত করিয়া দেন। ইহার ফলস্বরূপ চন্দননগরের মেয়রের গৃহে ১৯০৮ সালের ১১ই এপ্রিল বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। শিবপুরে একটি স্বদেশী ডাকাতিও এই মাসেই অনুষ্ঠিত হয়।

মিঃ কিংসফোর্ডের উপর বিপ্লবীদিগের ঘৃণা বহুদিন হইতেই সঞ্চিত ছিল। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিবার সময় হইতেই একজন জবরদস্ত বিচারক হিসাবে তিনি কুখ্যাত হইয়াছিলেন। তখনকার দিনের বহু রাজনৈতিক মামলার বিচার তাঁহার এজলাসেই নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং অভিযুক্তরা প্রায়ই কঠোর দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইত। "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্‌" এবং "সন্ধ্যা" পত্রিকার মামলার তিনিই ছিলেন বিচারক। রাজনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত ছাত্রগণকে তাঁহার নিকট প্রায়ই বেত্রদণ্ড লাভ করিতে হইত। সুশীল সেন নামক একটি অল্প বয়স্ক বালকের বেত্রদণ্ড লাভের কাহিনী পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই সকল কারণে বিপ্লবীরা তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। ১৯০৮ সালের প্রথম দিকেই মিঃ কিংসফোর্ড বদলী হইয়া মজঃফরপুরে যান; সেখানে গিয়াও তিনি কিন্তু রেহাই পাইলেন না—বিপ্লবীরা সেখানেও তাঁহার পিছু লইল। মিঃ কিংসফোর্ডের হত্যা-প্রচেষ্টায় যে দুইটি নাম অক্ষয় হইয়া আছে, তাঁহাদের কথা এখানে কিছু বলা যাইতেছে। সে দুইটি নাম শহীদ প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম বসুর।

(ক্রমশঃ)

ক্ষিপ্রলিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চশমা-পরা ভদ্রলোকটি তখন ছেলেদের বিদায় করে দিয়ে গম্ভীর মনোযোগে খাতার পাতা উলটে উল্‌টে কী দেখছিলেন। পরিমল সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ না তুলেই বললেন—হুঁ, কী বই ?

পরিমল হেসে উঠল : বই নয় ক্ষিতিশদা, মানুষ।

—মানুষ—অ্যাঁ ?—ক্ষিতীশদা এবারে চোখ তুললেন, বললেন, ও পরিমল ? বেশ, বেশ। তার পর, সঙ্গে এ কাকে এনেছ ? কোনোদিন দেখিনি তো একে—বন্ধু নাকি তোমাদের ?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধু রঞ্জন চ্যাটার্জি। মেম্বার হবে।

—মেম্বার হবে ? বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের এক পাশ থেকে একখানা রসিদ বই টেনে আনলেন : ভর্তি ফী আট আনা, আর এ মাসের চাঁদা দু আনা—এই দশ আনা লাগবে।

পরিমল এবারে জোরে হেসে উঠল : আচ্ছা মানুষ তো আপনি ক্ষিতীশদা! খালি বই আর চাঁদা, চাঁদা আর বই! ওকে নিয়ে এলাম কোথায় আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে, আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কাবলীওলার মতো চাঁদা চেয়ে বসলেন!

—ওহো, তাও তো, তাও তো—

যেন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন ক্ষিতীশদা। বললেন, বোসো, বোসো, ওই টুলদুটো টেনে নিয়ে বোসো দুজনে। বেশ বেশ।

বোঝা গেল বেশ বেশ কথাদুটো ক্ষিতীশদার মুদ্রাদোষ। ওরা বসতেই তিনি কেমন শান্ত আর নিরীহ চোখে চশমার মধ্য দিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটা উত্তেজিত উগ্র কণ্ঠস্বরে থেমে গেলেন তিনি, পরম বিরক্তিভরে ভ্রূকুটি করে তাকালেন আর একদিকে।

'স্বাধীনতা' পত্রিকায় পাঠক সেই ছেলেটি। পড়তে পড়তে তার উৎসাহ যেন আর বাগ মানছে না। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে বক্তৃতার ঢংয়ে শুরু করেছে :

'সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এ শিক্ষা আমরা ভুলব না। ভুলব না জাতির প্রাণশক্তির এই অকারণ অপব্যবহার। মহাত্মা গান্ধীর ভ্রান্ত নেতৃত্ব দেশকে দিনের পর দিন কাপুরুষতার পথেই ঠেলে দেবে। I have committed a Himalayan blunder বলে যিনি আজ নিজের অপরাধের বোঝা স্খালন করতে চাইছেন—

—ওরে থাম্ থাম্, কানের পোকা তাড়িয়ে ছাড়লি যে মণ্টু!

মণ্টু থামল। বললে, খুব জোর লিখেছে কিন্তু ক্ষিতীশদা।

—জোর লিখেছে বলেই অত জোরে জোরে পড়তে হবে নাকি ? একটু মনে মনে পড় বাপু, ঝালাপালা করে দিলি যে!

মণ্টু মনে মনে পড়ল না বটে, কিন্তু স্বর নামিয়ে নিলে। আর ক্ষিতীশদা লোকটিকে বেশ লাগল রঞ্জুর—যেমন নিরীহ, তেমনি গোবেচারা। ইস্কুলের ড্রয়িং মাষ্টার ড্রয়িং মাষ্টার ভাব, তরুণ সমিতির এই আগ্নেয় আর উগ্র পরিবেশের ভেতরে কেমন যেন আকস্মিক আর বেমানান বলে বোধ হয় তাঁকে।

ক্ষিতীশদা পকেট থেকে নস্যির ডিবে বার করে এক টান টেনে নিলেন। বললেন, কী নাম বললে যেন ? রঞ্জন চ্যাটার্জি, না ?

—হুঁ—রঞ্জুর হয়ে পরিমল জবাব দিলে : ও ভারী বই পড়তে ভালোবাসে। আপনাকে ভালো বই দেখে দিতে হবে।

—তা দেব, নিশ্চয়ই দেব। বেশ বেশ। অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাবলী আছে, ভূদেবের পারিবারিক প্রবন্ধ আছে—

—আঃ, আপনি একেবারে হোপ্‌লেস ক্ষিতীশদা।

ক্ষিতীশদা নস্যির আমেজে সর্দি টানার মতো একটা আরামের শব্দ করলেন নাকে।

—আমি একেবারে হোপ্‌লেস? বেশ বেশ। তা ওসব বই পছন্দ না হলে অন্য জিনিসও আছে—মেঘনাদবধ, বৃত্র-সংহার—

—উঃ, ক্ষিতীশদা থামুন। আপনি যে কেন মধুসূদনের যুগে জন্মাননি তাই ভাবি। ওসব ছাড়া একালে বুঝি আর পড়বার মতো বই নেই কিছু?

—একাল?—ক্ষিতীশদা একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন: ওই রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র? ওদের লেখা আমি পড়ি না, ওরা লিখতেই জানে না। যাই বলো, বঙ্কিম বিবেকানন্দের পরে বাংলা দেশে সাহিত্য বলে আর কিছু লেখাই হল না।

এমন করে কথাটা বললেন ক্ষিতীশদা যে, পরিমলের সঙ্গে রঞ্জুও হেসে উঠল এবারে। আচ্ছা মজার মানুষ তো। তরুণ-সমিতির মতো কড়া লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান হয়েও একেবারে সেকালে পড়ে আছেন—আশে পাশে সমস্ত পৃথিবীটাই যে বদলে যাচ্ছে দিনের পর দিন, খেয়ালই করেননি সেটা।

—হয়েছে, থাক—সদয়ভাবে পরিমল বললে, আপনাকে আর সাহিত্য-চর্চা করতে হবে না। কিন্তু আজ তো রঞ্জু চাঁদা আনেনি, কাজেই আমার কার্ডেই ওকে দুটো বই দিন।

—তোমার কার্ডে? তা বেশ বেশ।—ক্ষিতীশদা বড় খাতাটার পাতা উল্টে চললেন: কোনো বই-টই ইস্যু করা নেই তো?

—না, দেখুন না—

—খাতাটা উল্টে পাল্টে নিশ্চিন্ত হলেন ক্ষিতীশদা: বেশ, বলো কী বই নেবে?

পরিমল ক্যাটালগ খুলে চোখ বুলোতে লাগল।

—এটা আছে? শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ?'

—না, ইস্যুড্।

—বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী?

—ওটাও বাইরে।

—নির্বাসিতের আত্মকথা?

ক্ষিতীশদা একটা হাই তুলে বললেন, দিলীপ নিয়ে গেছে।

—ধ্যেৎ, ভালো বইগুলো সব বাইরে।—পরিমল বিরক্ত গলায় বললে, এটা—সিন্‌ফিন্?

—হুঁ, আছে।

—যাক, মন্দের ভালো। আর এটা পাওয়া যাবে—বিমল সেনের 'মা?'

—এইমাত্র ফেরৎ এল। একটু দেরী হলে আর পেতে না।

বই দুটো নিয়ে পরিমল বললে, নে রঞ্জু।

বাঃ, তুই নিবি না একখানাও?

—আমার ওসব পড়া।

ক্ষিতীশদা আবার একটা হাই তুললেন, তারপর আর এক হাতে তুড়ি বাজিয়ে বাড়িয়ে নিলেন নিজের আয়ুটাকে। অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, কী যে সব বাজে বই পড়—কিচ্ছু হয় না। তার চাইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত্র' নিয়ে যাও, পড়লে কাজ হবে।

—ও জ্ঞানটা আপনার জন্যেই তোলা থাকল ক্ষিতীশদা—পরিমল খোঁচা দিলে।

—আমার জন্যে? তা বেশ বেশ। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের দোষই এই—ভাল কথা কানে নিতে চায় না।

—হুঁ—দুঃখের কথাই বটে—সায় দিয়ে পরিমল বললে, চল রঞ্জু, এবার জিমনাস্টিক ক্লাবের দিকে যাওয়া যাক।

—জিমনাস্টিক ক্লাবে—এক মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করে নিলে রঞ্জু: কিন্তু আজ আর নয় ভাই। মাকে মিথ্যে কথা বলে চলে এসেছি, দেরী করে গেলে ধরা পড়ে যাব নিশ্চয়।

—তাও বটে। কিন্তু করুণাদির সঙ্গে দেখা করবি না একবার? তোকে যেতে বলেছিলেন কিন্তু।

করুণাদি! সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আবেগে আর আগ্রহে আকুল হয়ে উঠল। মায়ের মতো সেবা করেছিলেন, স্নেহ-ঝরা নরম আঙুল আহত কপালে বুলিয়ে দিয়ে যেন সমস্ত যন্ত্রণা তার মুছে নিয়েছিলেন। কী আশ্চর্য ভাবে দুজন দেখা দিয়েছে কিশোর রঞ্জুর জীবনের

দিকচক্রে। একজন মিতা, আর একজন করুণাদি। অতটুকু ছোট মেয়ে মিতা, বয়েসে তো তারই সমান, তবু মিতাকে কেমন ভয় করে—কেমন যেন নিজেকে অপ্রস্তুত আর বিপন্ন বলে বোধ হয় ওর সামনে দাঁড়ালে। আর করুণাদি। প্রথম পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্তরঙ্গতা হয়ে গেছে মনের, ছোড়দির মতো চেহারা, মায়ের মতো মন।

ক্ষিতীশদাকে নমস্কার জানিয়ে রঞ্জু উঠে পড়ল। ক্ষিতীশদা বললেন, চললে, বেশ বেশ। আবার কাল এসো। আর মনে করে দশ আনা পয়সা এনো, আট আনা ভর্তি ফী, আর দু আনা চাঁদা।

—উঃ, কী দুর্দান্ত লাইব্রেরীয়ান! এর চাইতে কাব্‌লীওলাও ভালো।

ক্ষিতীশদা জবাবে এক মুখ প্রসন্ন হাসি হাসলেন।

পথে বেরিয়ে রঞ্জু বললে, অনেক বই আছে তো লাইব্রেরীতে।

—তা মন্দ নয়, আরো বাড়বে—অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলে পরিমল।

পথ চলতে চলতে হাতের বই দুটো দেখছিল রঞ্জু। জিজ্ঞাসা করলে, সিন্‌কিন্ কী ভাই?

—পড়েই ছাখ না। তোর ওই দোষ রঞ্জু, ভারী অধৈর্য।

বেণুদার বাসার দরজায় কড়া নাড়ল পরিমল।

—কে?

তীক্ষ্ণস্বরে সাড়া এল বাইরের ঘর থেকে। বেণুদার গলা।

পরিমল সবিস্ময়ে বললে, ব্যাপার কী, বেণুদা এখনো ক্লাবে যাননি?

—কে?—আবার সাড়া এল তীক্ষ্ণ গলায়।

—আমি পরিমল, আর রঞ্জু।

—ওঃ, একটু দাঁড়াও।

মিনিট তিনেক চুপ চাপ বাইরে দাঁড়ানোর পর দরজা খুলে গেল। বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে বেরুল তিন চারজন ছেলে, ওরা এতক্ষণ কিছু আলোচনা করছিল ওখানে। ওদের দুজনকে চিনল রঞ্জু, জিমন্যাস্টিক ক্লাবে দেখেছে। বাকী দুজন একেবারে অচেনা। নীরবে বেরিয়ে এল ওরা, কোনোদিকে তাকালো না, হন হন করে এগিয়ে চলে গেল।

বেণুদা বললেন, এসো, ভেতরে এসো।

সেদিন শোবার ঘর দেখেছিল, আজ দেখল বাইরের ঘর। ঘরে চেয়ার টেবিল নেই, চওড়া খাটে ময়লা চাদর পাতা। কিন্তু খাটটা দেখে বোঝা যায় আর যাই হোক ওর ওপরে কেউ শোয় না, কারুর শোয়াও চলে না। রাশি রাশি বই আর খবরের কাগজ। খাটের বারো আনী বইতে ঢাকা, কতক ছড়িয়ে আছে মেজেতে। ঘরের একদিকে হেলান দেওয়া পিতলের তার দিয়ে গিঁটে গিঁটে বাঁধানো কালো কুচকুচে একখানা অতিকায় লাঠি। দেওয়ালে একটা হুকের সঙ্গে ঝকঝকে উজ্জ্বল একখানা ভোজালী ঝুলছে।

বইয়ের স্তূপ সরিয়ে বেণুদা ওদের বসতে দিলেন। কিন্তু প্রসন্নমুখ বেণুদার আজকের চেহারা দেখে দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। বেণুদার চোখে কেমন একটা লালের আভা—আগুনের দীপ্তির মতো কী যেন ঝকঝক করে খেলে যাচ্ছে সেখানে। চাপা দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, গেঞ্জীর নাচে দুলে দুলে উঠছে চওড়া বুকটা। যেন এই মাত্র খানিকটা কঠিন পরিশ্রম করেছেন তিনি—সমস্ত বুকে একটা তীব্র উত্তেজনা জ্বলজ্বল করছে।

—কী হয়েছে বেণুদা?

—উঁ? বেণুদা তীক্ষ্ণ চোখে পরিমলের দিকে তাকালেন।

—কী হল?

গভীর একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে বেণুদা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

মুখের চেহারা বদলে গেল পরিমলের। দরজা বন্ধ করবার জন্যে সে উঠে দাঁড়াল, আর সেই সঙ্গে কেমন তির্যকভাবে তাকালো রঞ্জুর দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারল রঞ্জু। কোনো বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, সে কথার ভেতরে তার থাকা উচিত নয়। অতএব—

রঞ্জু সূক্ষ্ম অভিমান নিয়ে উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি।

—দরকার নেই—বোসো।

মৃদু বিস্ময়ে পরিমল বললে, ও থাকবে?

—থাকুক।

চোখের কোণা দিয়ে পরিমল ইঙ্গিত করলে রঞ্জুকে। ভাবটা বুঝতে পারা গেল। রঞ্জু ভাগ্যবান, পরীক্ষার প্রথম ধাপটা সে অত্যন্ত সহজেই পার হয়ে গেছে।

করুণাদির কথা রঞ্জুর মনে মাথা চাড়া দিচ্ছিল—প্রশ্নও জেগেছিল। কিন্তু এখানে এসে স্বাভাবিক একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে তার। তাছাড়া বেণুদার মুখের এই থমথমে ভাব, এই কঠিন গাম্ভীর্য তাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। ঠিক এই রকম মুখের চেহারা সে দেখেছিল অবিনাশবাবুর—যেদিন তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যেই যেন তাঁর চড়াইয়ের নৌকো ভাসিয়েছিলেন বানে ভাসা আত্রাইয়ের ঘোলা স্রোতে। আর সেই রাত্রি—যেদিন উঠোনে স্তূপাকার বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব করেছিলেন বাবা—আগুনের শিখাগুলো থেকে থেকে তাঁর শ্বেত পাথরে গড়া প্রাণহীন মূর্তির মতো চেহারার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে খেলা করে গিয়েছিল।

বেণুদা বললেন, চট্টগ্রামের খবর শুনেছ?

—চট্টগ্রাম!

—হাঁ, চট্টগ্রাম। শোনোনি?

—না তো। কী হয়েছে?—বিস্মিত আর উদ্‌গ্রীব শোনালো পরিমলের স্বর।

—কাগজে এখনো কিছু বেরোয়নি—তেমনি চাপা দ্রুত নিশ্বাস পড়তে লাগল বেণুদার: কাগজে কিছু বেরোয় নি, গবর্ণমেণ্ট বেরুতে দেয়নি এ পর্যন্ত। কিন্তু মোহিনী এসেছে চাঁদপুর থেকে, সেই বললে।

—কী বললে?

—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগুন প্রথম চট্টগ্রামেই জ্বলল। ওরাই দেশকে পথ দেখাল। অথচ আমরা পেছনে পড়ে রইলাম, কিছুই করা গেল না।

ওরা দুজনে বেণুদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

—বাধা যন্ত্রের নাম ওরা রাখল। ওরাই দেখালো কেমন করে স্বাধীনতা আনতে হবে। আজ ওদের সঙ্গে সমস্ত ভারতবর্ষ যদি তার প্রান্তে প্রান্তে ঘা দিতে পারত, তাহলে ইংরেজ একদিনেই ভারতবর্ষ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পথ পেতনা।

বেণুদার কথা থেকে যেন একটা অজ্ঞাত আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল রঞ্জুর মনে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না অথচ তার সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। ঝড় আসবার আগে যেমন আকাশের এক কোণায় খানিকটা নিকষ কালো মেঘ ঘোষণা করে তার অনিবার্য সূচনা।

আকুল স্বরে পরিমল বললে, সবটা খুলে বলুন বেণুদা—

—বলছি—

বেণুদা বলতে শুরু করলেন। এ সেই আকাশ গঙ্গার ইতিহাস—রঞ্জুর কল্পনার ছায়া-পথের এক অপূর্ব কাহিনী। কিন্তু কোথায় লাগে এর কাছে শহীদ সত্যেন, ক্ষুদিরাম আর কানাইলাল। ফাঁসির ডাকে যে আগুন-ঝরা আহ্বান—সে আহ্বানের চাইতেও লক্ষ্য গুণ প্রবল হয়ে এ ডাক কানে এল যেন কামানের গর্জনের মতো। আকাশগঙ্গার ছায়াপথে জ্যোতির্ময়তা নয়—সেখানে আগুনের উত্তাল তরঙ্গ উঠছে। তিরিশ সালের বন্যা নয়, ঊনিশ শো তিরিশ সালে সত্যাগ্রহের প্রাণ বন্যাও নয়, এ যা এল তার নাম প্রলয়।

টর্চের আলোয় আর পিস্তলের গর্জনে মুখরিত হল অস্ত্রাগার। শাদা আফসার রিভলভার হাতে বিপ্লবীদের বাধা দিতে এলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই ফুসফুস ছিঁড়ে বুলেট গেল বেরিয়ে, বাধা দেবার আশা মিটে গেল তাঁর। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে সহরের বুকের ওপর চলতে লাগল স্বাধীনতার শিকল-ভাঙা তাণ্ডব। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, উপড়ে গেল রেলপথ। পলাশীর পাপের পর আর সিপাহী বিদ্রোহের ভুলের পর এই আবার নতুন করে জাগল আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বীর্যবান বিপুল ভারতবর্ষ—জাগল তার প্রাণশক্তি। এক রাত্রের মধ্যে চট্টগ্রামের বুকের ওপর থেকে পরাধীনতার কালো অপমান মুছে গেল—স্বাধীন, স্বতন্ত্র। 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা'—এ মন্ত্রকে সার্থক করল চট্টলা, তার পাহাড়ের চুড়োয় উড়তে লাগল মুক্তির রক্ত-পতাকা, আর তার ছায়া কাঁপতে লাগল কলোচ্ছলা কর্ণফুলীর জলে।

তিনদিন আগেকার খবর। এখনও সেখানে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধ চলছে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর। বীরের মতো তারা প্রাণ দিচ্ছে, প্রাণ নিচ্ছেও। ভারতবর্ষের আকাশে রক্ত-প্রদীপ—চট্টগ্রাম।

তীব্র চাপা গলায় কথাগুলো বলে গেলেন বেণুদা। গমগম করতে লাগল ঘর। তরল অন্ধকারের মতো ঘন ছায়া ঘরের মধ্যে, শুধু দেওয়াল আর ছাদের সংযোগে জাফ্‌রি কাটা ছোট ভাইলাইট থেকে একটা অস্পষ্ট আলো এসে ঝিলমিল করতে লাগল তোজালীর উজ্জ্বল ফলায়, তেল চকচকে লাঠির পিতল বাঁধানো গাঁটে গাঁটে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপরে হঠাৎ যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন বেণুদা, ফিরে এলেন তাঁর স্বাভাবিকতায়। ওদের দুজনকে অবাক করে দিয়ে তিনি হেসে উঠলেন, কালো মুখের ভিতরে ঝিকিয়ে উঠল শাদা দাঁতের সারি।

—ওই যাঃ—আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে। তারপর, রঞ্জন?

আচমকা একটা ধাক্কা লেগে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো রঞ্জু শিউরে উঠল।

—আমায় বলছেন?

—হাঁ—হাঁ।—একটু আগে যে বেণুদা কথা কইছিলেন একটা বারুদ ঠাসা কামানের মতো, তিনি যেন সম্পূর্ণ অন্য লোক: মাথার অবস্থা কেমন তোমার? সব ঠিক হয়ে গেছে।

রঞ্জু ঘাড় নাড়ল। ঠিক হয়ে গেছে।

—করুণা তোমার খবরের জন্যে ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আর খালি খালি বকাবকি করছিল আমাকে। যাক—এবারে আমি দায় থেকে রেহাই পেলাম। করুণাকে ডেকে দেখিয়ে দিই তার ফার্স্ট এইড্ বেশ কাজ দিয়েছে।

বেণুদা চেঁচিয়ে ডাকলেন, করুণা, করুণা—

—আসছি—করুণাদির সাড়া পাওয়া গেল। তারপর মিনিট খানেকের মধ্যেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে করুণাদি ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন।

বেণুদা বললেন, এই নে, তোর আসামী হাজির। কিচ্ছু ভয় নেই, একেবারে ঠিক হয়ে গেছে।

—ঠিক হয়ে গেছে? বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে!—সস্নেহে করুণাদি হাসলেন। মাথা নীচু করে রইল রঞ্জু। করুণাদির স্নেহ ভালো লাগে, কিন্তু সেই সঙ্গে অস্বস্তিও লাগে যেন। তেরো বছর বয়েস হল তার—একেবারে ছেলেমানুষ সে নয়; সে নমস্কার পেয়েছে পিতার কাছ থেকে, মনের ভেতরে এসেছে বড় হয়ে উঠবার গর্ববোধ—পৃথিবীর কাছে এখন সে দাবী করতে চায় পৌরুষের স্বীকৃতি। কিন্তু করুণাদির স্নেহে সে স্বীকার কোথাও নেই, আছে ছেলেমানুষের অসহায়তা আর দুর্বলতার ওপরে একটা নিবিড় মমত্ববোধ।

করুণাদি বললেন, যা রক্ত পড়ছিল তাতে একদিনেই এমন ভাজা হয়ে উঠবে ভাবতে পারিনি।

কথাটা কেড়ে নিলেন বেণুদা: হতেই হবে। কার জিমনাষ্টিক ক্লাবের মেম্বার সেটা দেখতে হবে তো। একদিন হাওয়া লাগলেই শরীর শক্ত হয়ে যায়।

—থাক, হয়েছে। ওকে আর হাওয়া লাগাতে হবে না তোমাকে। রঞ্জন, এসো তো ভাই।

বেণুদা বললেন, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?

—আমার জুরিসডিক্‌শনে। তোমার সংসর্গ থেকে ওকে বাঁচানো দরকার।—করুণাদি হাসলেন: কাল রাত্রে চা খায়নি, আজ গরম গরম সিঙাড়া ভাজছি, খেয়ে যাবে।

পরিমল কলরব করে বললে, বা-রে, একি পার্শিয়া-লিটি? মাথা ফাটিয়েই ও বুঝি সিঙাড়া খাওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে গেল? আর আমরা যে—

—দুষ্টু ছেলেদের আমি খেতে দিই না—দুষ্টুমি করে হাসলেন করুণাদি: তবে ভালো ছেলের বন্ধু হিসেবে দু একটা পেলেও পেতে পারো।

—ভেতরে আসব?

—উঁহু—রান্নাঘরে শুধু আমি আর রঞ্জন। এসো ভাই—

রঞ্জু অনুসরণ করল করুণাদিকে। ভুলে গেল দেরী হয়ে যাচ্ছে, মনে পড়ল না মাকে ফাঁকি দিয়ে আজ পালিয়ে এসেছে এখানে। তা ছাড়া চট্টগ্রামের যে আগুন একটু আগেই লক লক করছিল এই ঘরের মধ্যে, তার উত্তাপে যেন তখনো সমস্ত শরীরটা জলছিল রঞ্জুর। একটু ছায়া চাই—বিশ্রাম চাই একটুখানি। সে ছায়া আর বিশ্রামের আভাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে করুণাদির চোখে।

পরিমল পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললে, তোকে হিংসে হচ্ছে রঞ্জু। তিন বছরে আমি যা পারিনি, তুই যে এক দিনেই তা করে নিলি।

করুণাদি বললেন, তার জন্যে ভালো মানুষ হওয়া দরকার।

—আচ্ছা, আচ্ছা মনে থাকল।

—হুঁ, মনে থাকবে বই কি।—করুণাদি হাসলেন: কিন্তু এসো ভাই রঞ্জন, কড়াইতে ঘি পুড়ে যাচ্ছে আমার। ভেতরের উঠোনটায় পা দিতে শেষবারের জন্যে কানে এল পরিমলের অসহায় গলার আকুতি: ওরে পেটুক, সব সিঙাড়াগুলোই যেন খেয়ে ফেলিসনে, দুটো চারটে রাখিস আমাদের জন্যে—

সংঘমিত্রা আর করুণাদি। একজন সরিয়ে দেয়, একজন মায়ের মতো কাছে টেনে আনে।° শিলালিপির কঠিন পাথরের ওপরে রেখায়িত হয়ে ওঠে অপ্রত্যাশিত কবিতার ছন্দ। (ক্রমশ)

শহীদ প্রদ্যোতকুমার

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতের মুক্তি সাধনায় সেদিন যারা ফাঁসীর ফাঁস গলায় পরে হাসিমুখে জীবন-আহুতি দিয়ে গেছে—স্বাধীনতার সংগ্রামকে যারা অক্ষয় মর্যাদা দান ক'রে গেছে বিন্দু বিন্দু বুকের রক্ত সিঞ্চন ক'রে, তরুণ শহীদ প্রদ্যোতকুমার তাদেরই একজন। ভারতবর্ষের আকাশে আজ স্বাধীন সূর্যের উদয়াস্ত সম্ভব হয়েছে—অপসারিত হ'য়েছে পরাধীনতার কালো মেঘ, কিন্তু নিভৃত কারার অন্ধকারে বসে সেদিন যারা কঠিনতম তপস্যায় এই সূর্যকে আবাহন জানিয়েছিল আজ তারা নেই। সূচীভেদ্য অন্ধকারে দুর্গম দুরন্ত পথের যাত্রী ছিল যারা, যাদের মৃত্যুভয়লেশহীন উত্তাল মুক্তি অভিযানে সমগ্র জাতির জীবন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সেদিন—আজ তারা নেই। ইতিহাসের পাতায় শুধু জেগে আছে তাদের জলন্ত রক্তের স্বাক্ষর—তাদের ঐকান্তিকতার বাণী। বিপ্লবী প্রদ্যোতকুমারও আজ নেই, ইতিহাসের বক্ষপটে রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা আছে শুধু তাঁর বিপ্লব সাধনার গৌরবমণ্ডিত কাহিনী।

—'ভারতবর্ষ থেকে অত্যাচারী ইংরেজ জাতের উচ্ছেদ হউক। আমার প্রতি রক্ত বিন্দু ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবীর সৃষ্টি করুক। ভারত স্বাধীন হউক। জয় ভারতবর্ষের জয়।'—আজ থেকে ষোল বছর আগে মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসীমঞ্চে দাঁড়িয়ে আঠারো বছরের তরুণ প্রদ্যোতকুমার হাসিমুখে আবেগকম্পিত স্বরে বহ্নিব্রতের ওই মহামন্ত্র উচ্চারণ ক'রে গেছে।

১৯১৩ সালের ৩রা নভেম্বর (বাংলা ১৩২০ সালের ১৭ই কার্তিক) সোমবার রাত্রি ৯টা ৪৮ মিনিটে প্রদ্যোতকুমার জন্মগ্রহণ করেন গোকুলনগর গ্রামে তাঁর পিতৃভবনে। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় দাসপুর থানার এলাকাধীন গ্রাম এই গোকুলনগর। গ্রামখানির দক্ষিণে কংসাবতী নদী প্রবাহিতা।

প্রদ্যোতের পিতার নাম ভবতারণ ভট্টাচার্য, মাতা শ্রীমতী পঙ্কজিনী দেবী, পিতামহ ঈশানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। গৃহের নাম 'বিদ্যালঙ্কার ভবন'। প্রদ্যোত ভবতারণ ভট্টাচার্যের চতুর্থ সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র, শ্রীশক্তিপদ, শ্রীশর্বরীভূষণ এখনো জীবিত এবং তিনটি কনিষ্ঠ ভগিনী—লতিকা, কণিকা ও মণিকাও জীবিত। মাতৃকুল মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত আমলান গ্রামের প্রসিদ্ধ চক্রবর্তী বংশ। মাতামহ মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। চার মাতুল—শশিভূষণ, রমণীরঞ্জন, ক্ষীরোদনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র। সকলেই বর্তমানে স্বর্গত। একমাত্র মাসীমাতা সরোজিনী দেবীও স্বর্গতা।

প্রদ্যোতকুমারের পিতামহ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন তিনি। শান্ত ধীর নিরীহ স্বভাবের মানুষটি সহজেই সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন। সংস্কৃত অধ্যাপনাই ছিল তাঁর পেশা। এককালে তদানীন্তন নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁনের রাজ-দরবারের সভাপণ্ডিত ছিলেন তিনি শোনা যায়। পিতা ভবতারণ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর শহরের অলিগঞ্জ মহল্লায় রেভিন্যু এজেন্টের ব্যবসা করতেন। স্বভাবতই অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী ছিলেন তিনি। মাতুল শশিভূষণ ও ক্ষীরোদনাথ মেদিনীপুর শহরে অলিগঞ্জ মহল্লায় পৈত্রিক বাড়ীতে থেকেই মেদিনীপুর জেলা আদালতে ওকালতি করতেন।

এই অবেষ্টনীর মধ্যেই প্রদ্যোতকুমার লালিত পালিত। এইরূপ আবহাওয়ায় বর্ধিত হওয়ার ফলে প্রদ্যোতকুমারের মনেও রীতিমত জ্ঞানস্পৃহা দেখা দেয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালের মধ্যেই কৃতী ও মেধাবী ছাত্র হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করেন তিনি। আনুমানিক তিন বছর বয়সে হার্ডিঞ্জ এম-ই স্কুলে ভর্তি হন এবং তারপর মেদিনীপুরের হিন্দু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারই কিছুকাল পরে শহরে সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের জন্য হিন্দু স্কুল বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রদ্যোতকুমার মেদিনীপুর কলেজে আই-এস্-সি ক্লাসে ভর্তি হন। সেই সময়েই তিনি বিপ্লবীদলে যোগদান করেন ও স্থানীয় শাখার অন্যতম ভারপ্রাপ্ত কর্মীরূপে কাজ আরম্ভ করেন।

ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণ আন্দাজ ৬ ঘটিকার সময় প্রদ্যোতকুমার মেদিনীপুরের তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর ডগলাসকে হত্যার মামলায় আসামীরূপে পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। অতঃপর তাঁর পাঠ্যজীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে এইখানেই।

শিশুকাল থেকেই প্রদ্যোত হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান। প্রকৃতি সামান্য একটু চঞ্চল ছিল যদিও, কিন্তু ব্যবহার ছিল যথেষ্ট বিনয়ী এবং সর্বকাজে একটা নিয়মানুবর্তিতা ছিল। তা ছাড়া পরোপকার ও সেবাধর্মপরায়ণ ছিলেন তিনি। সমবয়সী ও সহপাঠীদের মধ্যে তাঁর নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল সমস্ত ব্যাপারে; সেইজন্য বন্ধুমহলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় সকলের। তাঁর চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি অল্পে তুষ্ট থাকতেন এবং কোন রকম বিলাস তাঁর মধ্যে ছিল না।

শোনা যায় পিতামহ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় একজন সাধু প্রকৃতির বিশিষ্ট নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রদ্যোতের জন্মের বহুপূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। পিতা ভবতারণ স্বয়ং খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। স্বদেশপ্রীতি তাঁদের বংশের বিশেষত্ব। তাঁদের

পরিবারে বিদেশী সামগ্রী সর্বদাই পরিত্যজ্য ছিল। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'লে প্রদ্যোতের পিতা গান্ধীজীর অত্যন্ত অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোন আন্দোলনে কখনো যোগ দেননি তিনি।

১৯২৩ সালের ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রদ্যোতের পিতৃবিয়োগ হয়। মাতা পঙ্কজিনী দেবী সেই শোকে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়েন। সাংসারিক ব্যাপারেও নানা বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন প্রদ্যোতের নবপরিণীতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ রাধারাণী ওরফে বনকুসুম দেবীর উপর প্রদ্যোত ও তার ছোট ভাইবোনগুলির দেখাশোনার সমুদয় ভার এসে পড়ে। সেই স্নেহময়ী মহিলা প্রকৃতই একটি আদর্শস্থানীয়া রমণী ছিলেন।...

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত প্রদ্যোতকুমার মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে কন্‌ডেমড্ সেলে আবদ্ধ অবস্থায়ও সুস্থ সবল নির্ভীক ও সদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। স্বাস্থ্য মোটেই ক্ষুন্ন হয়নি তাঁর। এই সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও কবি কাজী নজরুলের পুস্তকাবলী চেয়ে পাঠান তিনি। কিন্তু কাজী নজরুলের বই সরকারের অনুমতি পায়নি জেলের মধ্যে প্রবেশের, তাই রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ও শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁর নির্জন বন্দীবাসের একমাত্র সাথী ছিল। কারাজীবনে তাঁর দৈহিক ভার উত্তরোত্তর বর্ধিতই হ'য়েছিল, এমন কি জীবনের শেষ রাতটিতেও নাকি এক পাউণ্ড ওজন বেড়েছিল তাঁর।

বিপ্লবী প্রদ্যোতের অন্তর্জীবনের অপরাজেয় শক্তি ও চিত্তের গতিশীলতা, ভ্রাতৃবধূ বনকুসুম দেবীর নিকট কারাবাস থেকে লেখা একটি পত্রের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছিল। তিনি বৌদিদিকে লিখেছিলেন :

"দুঃখের সম্ভাবনাবিহীন স্থায়ী আনন্দের নাম সুখ এবং আমি সেই সুখে অত্যন্ত সুখী। আর এক কথা—সুখ দুঃখ কিছুই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, সম্পূর্ণতাই মনুষ্যত্বের লক্ষ্য—উন্নতিই জীবনের উদ্দেশ্য। এই উন্নতির মূলে গৌণভাবে বিরাজ করে সুখ। সুতরাং আমরা সুখের আশায় না ফিরিয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিবার জন্ত এই উন্নতির দিকেই যদি আমাদের শক্তি অর্পণ করি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুখ পাইতে পারি। পরে সুখকে উদ্দেশ্য করিয়া বাসনাচক্রে ঘুরিয়া বেড়াইলে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে। আমাদের জীবন জন্মান্তর রূপ বৃহৎ উন্নত গ্রন্থের এক একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ। কোন পরিচ্ছেদে হাহাকার, কোনটি মহানন্দময়। বিশ্ব নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের হইতে পারে না। আপনাদের এই দুঃখকষ্ট—এর অন্তরে যে একটা মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? আপনাদের স্নেহ ভালোবাসা আমাকে সুখে দুঃখে সমান করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানি না—জানি জানিতেও চাহি না—আমার কি ভালো এবং কি মন্দ। যুবা-জনমন তেজস্বী অশ্বের ন্যায় কাজ কাজ বলিয়া আকুল হইয়া উঠে, স্থবিরের মত স্থির হইয়া বসিয়া পাশের পড়া মুখস্থ করিয়াই যুবক তাহার উদীয়মান জীবন সূর্য্যকে অস্তপথে যাইতে দিতে চাহে না। সে তাহার দেহমনকে খাটাইয়া লইতে চায়। খাটিতে তাহার আনন্দ, খাটুনি দেখিতে তাহার আনন্দ, ভবিষ্যৎ ও অতীতের পানে চাহিতে সে জানে না—বর্তমানের পথেই সে ছুটিতে চায়। ভূত ভবিষ্যতের ঔৎসুক্য দূর হইলে, অনুধাবন শেষ হইলে সুখদুঃখের অবসান হয়। আমার এখন একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি নির্বাণ চাহি না, মোক্ষও কামনা করি না। আবার এই সোনার বাঙ্গলায় আসিতে চাই এবং মাতৃপূজার সেবায় অধিকারী হইতে চাই। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'—এই আমার কাম্য।"—

এছাড়া পত্রখানির অন্যত্রে লেখা ছিল :—"খোকাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দিবেন ও তাহাকে বলিবেন যেন সে পাপকে, অন্যায়কে ও উৎপীড়নকে সমস্ত মন প্রাণ দিয়া ঘৃণা করিতে শেখে এবং তাহাকে সমূলে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। ভালোভাবে লেখাপড়া করিতে বলিবেন।......এখন

শহীদ প্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য

আমি যাহা লিখিলাম তাহা আপনারই দান। আমার অযোগ্যতার জন্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। মায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।"

এই সামান্য পত্রখানির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় তরুণ বিপ্লবীর অন্তরের গভীরতম পরিচয়। বন্দী দেশজননীর ব্যথা বেদনা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়েই অনুভব ক'রেছিলেন তিনি—অনুভব করেছিলেন পরাধীন দেশের রিক্ততা, দীনতা, গ্লানি, অপমান। দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিল তাঁর শঠ, প্রবঞ্চক বিদেশী জাতির প্রভুত্ব। তাই জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই হ'য়ে ওঠেন তিনি অন্তরে বাহিরে দুরন্ত দুর্বার। দেশজননীর বন্ধন মুক্তির অটুট সংকল্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন দেশের কাজে। কোন বাধাই তাঁকে বাধা দিতে পারেনি।

মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের জন্ত ক্ষুদিরাম বসু আর আলিপুরে নরেন্দ্র গোস্বামীকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ফাঁসীর

অল্পকাল পরেই মেদিনীপুরে বোমা ষড়যন্ত্র নামে এক মামলা আরম্ভ হয়। মেদিনীপুর জেলায় বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি এইখানেই। ১৯৩১ সালে আবার তা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময় মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের একটি কক্ষে মিঃ পেডী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হন। ১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার লবণ সত্যাগ্রহীদের পরে অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই মিঃ পেডীকে হত্যা করা হ'য়েছিল। কিন্তু হত্যাকারীরা তখন ধরা পড়েনি।—সরকারের সমস্ত আয়োজন বিফল করে দিয়েছিল তারা আত্মগোপন ক'রে।

সে সময়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর মিঃ আর ডগলাসের আমলে সেই অত্যাচার, উৎপীড়ন আর নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। বিদ্রোহী তরুণদল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সে অত্যাচারে—প্রতিশোধ নেবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠলো তারা। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল আর এক মর্ম-বিদারক ঘটনা—হিজলী বন্দীবাসের আবদ্ধ বন্দীদের ওপর নির্বিচারে অকস্মাৎ হ'ল গুলিবর্ষণ। ফলে সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা গেলেন এবং অন্য অনেকেই হ'লেন আহত। সে ঘটনার পর আরো ভীষণভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো তরুণরা। গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে যে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করলেন তাতে পদস্থ কর্মচারী সকলেই রেহাই পেল, অপরাধী সাব্যস্ত হ'ল অধস্তন কয়েকজন কর্মচারী। বিপ্লবীরা কিন্তু তদন্ত কমিটির সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তাদের ধারণা মিঃ ডগলাসই মূলতঃ এই গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী এবং তিনিই তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসনের প্রচণ্ড ও দোর্দণ্ড প্রতাপ তখন পূর্ণমাত্রায় চলেছে দেশের ওপর। চণ্ডনীতির অত্যাচারে মেদিনীপুর জেলার দেহ-প্রাণ-মন যেন দাবানলের মত জ্বলতে শুরু করেছে। সে অসহ্য দাবদাহে মেদিনীপুর বুঝি ছারখার হ'য়ে যায়। ছাত্র ও যুবকরা আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর থেকেই একদিন শুরু হয়েছিল বিপ্লবের জয়াল ভীষণ অভিযান। সেই আদর্শ যুবকদের সামনে উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে আবার দাঁড়ালো। গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ আবার সক্রিয় হ'য়ে উঠলো—গোপন পথে বিপ্লব অভিযান শুরু হ'ল আবার নতুন ক'রে। দেশভক্ত প্রদ্যোতকুমারও স্থির থাকতে পারেনি।—

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর ডগলাস তখন সরকারী নীতিতে জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান। ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল শনিবার বিকালে স্থানীয় জেলাবোর্ড ভবনে জেলাবোর্ডের পূর্ণ অধিবেশন। মিঃ ডগলাস সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। সভ্যরা আলোচনায় ব্যাপৃত। অকস্মাৎ গর্জে উঠলো কোথা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র—রিভলবারের গুলির শব্দে ও ধূমে সভাকক্ষ আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। মুমূর্ষু অবস্থায় ডগলাস সামনের টেবিলের ওপর ঢলে পড়লেন দেখতে দেখতে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুক্ষণের জন্য সংবিদ্ হারিয়ে ফেলেছিল সভাস্থ সকলেই। তারপর ছোটাছুটি পড়ে গেল আক্রমণকারীর সন্ধানে। বোর্ড-গৃহের উত্তরের পথ দিয়ে দেখা গেল দুটি যুবককে পালাতে। সরকার পক্ষের বহু সশস্ত্র দেহরক্ষী ও কর্মচারী যুগপৎ ছুটলো তাদের ধরতে। অবশেষে বোর্ড প্রাঙ্গণের পূর্বদিককার প্রান্তরের মধ্যে এক ভাঙা কুটীরে ধরা পড়লেন যিনি, তিনি প্রদ্যোতকুমার—চারিদিকের বেষ্টনী ভেদ করে তিনি আর পালাতে পারলেন না। কিন্তু দেখা গেল, তাঁর হাতের রিভলবার কার্যকরী নয়। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য তা থেকে গুলি বর্ষণ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবুও হত্যার সমুদয় অপরাধ তাঁরই শিরে ন্যস্ত হ'ল। ইতিমধ্যে তাঁর সহকর্মী পালিয়েছেন। তাঁকে আর ধরা গেল না। মেদিনীপুর তখন পুলিসের জুলুমে আর অত্যাচারে জর্জরিত। বহু বালক যুবক, তরুণ-তরুণী পুলিসের সে বর্বর নীতির হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল। মেদিনীপুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সে অত্যাচারের দুর্বিসহ জ্বালায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সে দৌরাত্ম্যের রথচক্রে মথিত হ'য়ে গেল সারা মেদিনীপুর। আসামী প্রদ্যোতের তৃতীয় অগ্রজ শর্বরীভূষণও বাদ যাননি সেই নিদারুণ নির্যাতনের হাত থেকে। তারপর বহু তদ্বির ও অনুসন্ধানের পর একমাত্র প্রদ্যোতকেই অপরাধীরূপে বিচারাধীন করা হ'ল।

শ্রীযুক্ত কে-সি নাগকে প্রেসিডেণ্ট করে একটি ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে প্রদ্যোতকুমারের বিচার আরম্ভ হ'ল। কিন্তু সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন হ'ল যে, প্রদ্যোতের রিভলবার ঠিক ছিল না, নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির গুলিতেই ডগলাস নিহত হ'য়েছেন। সুতরাং প্রদ্যোত প্রকৃত হত্যাকারী নন। শ্রীযুক্ত এন-সি সেন, বি-এন শাসমল প্রভৃতি প্রদ্যোতের পক্ষ সমর্থন করেন। ট্রাইব্যুনালের তিনজন কমিশনারই প্রদ্যোতের অপরাধ সম্পর্কে একমত হ'য়ে দঃ বিঃ'র ৩০২।৩৪ ও ৩০২।১২০ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ১৯(খ) ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত করেন তাঁকে। শ্রীযুক্ত নাগ ও অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত মুন্সী তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত জে-দে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। আসামীর বয়স অল্প এবং ডগলাস হত্যার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁর না থাকার দরুণ তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের গরিষ্ঠ-সংখ্যক সদস্যদের অভিমতই বজায় থাকে শেষ পর্যন্ত।

হাইকোর্টে আপীল করা হ'ল, সেখানে শ্রীযুক্ত এন-সি সেন ও শ্রীযুক্ত জে-সি গুপ্ত আসামীর পক্ষ সমর্থন করলেন। কিন্তু জাষ্টিস সি-সি-ঘোষ ও জাষ্টিস জ্যাক আপীল নামঞ্জুর ক'রে বহাল রাখলেন মৃত্যুদণ্ড।—

হাইকোর্টে আপীল-মামলা বিচারাধীন থাকার সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ক'রে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক এবং মুদ্রাকর আদালতে অভিযুক্ত হন ও পাঁচশত টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড দিতে হয়।

এরপর প্রিভিকাউন্সিলেও আপীল করা হ'ল এবং সম্রাট, বড়লাট, ছোটলাট সকলের কাছেই বালক প্রদ্যোতের প্রাণভিক্ষায় আবেদন করা

হ'ল, কিন্তু সবই হ'ল বিফল। বৃটিশ সিংহ অটল অচল—প্রত্যোতের প্রাণ তাদের চাই।

১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী সকাল ৬টায় মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের এক অন্ধকার কক্ষে প্রদ্যোতের জীবন প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হ'য়ে গেল। ফাঁসীর ফাঁসে জীবনের শেষ গান গেয়ে বিদায় নিল তরুণ শহীদ প্রদ্যোতকুমার। দেশ-জননীর কোল থেকে হারিয়ে গেল একটি সুসন্তান।

কয়েকজন আত্মীয় মিলে জেলের বাইরে তাঁর প্রাণহীন দেহটিকে চোখের জলে নাইয়ে শেষ কাজ সম্পন্ন ক'রে ফিরে গেলেন।

তারপর…

ভারতের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা আজ এসেছে। কিন্তু স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত প্রাণ প্রদ্যোত আজ কোথায়? কোথায় আজ সেই স্বাধীনতাকামী তরুণ বিপ্লবী?

কেরাণীর মৃত্যু

শ্রীযামিনীমোহন কর

দাদার দোকানে বসে চা খাচ্ছিলুম। রেস্তর াঁর মালিকের নাম নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, কিন্তু আজ সে নাম কেউ জানে না। হয়ত' তিনি নিজেও ভুলে গেছেন। 'দাদা' নামেই তিনি পরিচিত।

সামনে দিয়ে হিন্দু সৎকার সমিতির লরী চলে গেল। দাদা বলে উঠলেন—"গোপাল বোস্ লেনের চণ্ডীবাবুকে নিয়ে গেল।"

আশ্চর্য্য হলুম। কোন মৃত ব্যক্তিকে লরী করে নিয়ে যায় না সাধারণত; তা সে যতই গরীব হোক। একলা থাকলেও বন্ধু বান্ধব নিশ্চয়ই থাকে। তাই প্রশ্ন করলুম,—"চণ্ডীবাবু কে? তাঁর কি কেউ নেই। লরী করেই বা মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে গেল কেন?"

দাদা গম্ভীর হয়ে বললেন,—"সে অনেক কথা।"

সকলে ধরে বসল—"বলতেই হবে।"

দাদা বললেন—"চণ্ডীবাবু কেরাণী—তিন পুরুষ ধরে। যাকে বলে বনেদী কেরাণী। বাপের অফিসে ঢুকেছিলেন। মার্চেন্ট অফিস। যুদ্ধের পর ছাটাই চ'ল বেদম ভাবে। চণ্ডীবাবু সাহেবকে অনেক ধরে করে কাজ বহাল রাখলেন, কিন্তু মাইনে গেল কমে। বাড়ীতে মা, দু'জন বিধবা বোন। অতএব আজকাল বাজারে বুঝতেই পারছ? সকাল ন'টা থেকে পাঁচটা অফিস। মাইনে ৪৫৲ টাকা। তারপর দুটো টুইশন। গোটা ৩৫৲ টাকা। এই আশী টাকা নিয়ে সংসার। বাড়ী ভাড়া আছে, খাওয়া পরা আছে। দুরবস্থার একশেষ। সর্ব্বত্রই ধার। আমারও বেশ কিছু পাওনা ছিল। কিন্তু তাগিদ করতে পারি নি। বেচারার মুখ দেখে মায়া হ'ত। তিনি মরে আমারও মেরে গেলেন।

বছর দু'য়েক আগে একদিন শুনলুম চণ্ডীবাবু প্রেমে পড়েছেন। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেরাণীও মানুষ। তারও জীবনে বসন্ত আসে। পাশের বাড়ীর এক মিস্ত্রীর মেয়ের সঙ্গে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন। এক মেয়ে। দেখতেও শুনেছি সুশ্রী। কায়স্থ। চণ্ডীবাবুর পাল্টা ঘর। মিস্ত্রী মাস গেলে শ'দুয়েক টাকা রোজগার করত। কিন্তু বিয়ে হ'ল না। মা বোন সকলে ছিঃ ছিঃ করতে লাগলেন। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে শেষে কিনা একটা মিস্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে। চণ্ডীবাবু জাত কেরাণী। কারো বিরুদ্ধে কথা কইতে সাহস করতেন না। বসন্ত চলে গেল বিফলে। ফুল ফুটল না।

মা অন্য জায়গায় বিয়ের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। কিন্তু বিয়ে করতে চণ্ডীবাবু রাজী হলেন না। বললেন যে নিজেরাই খেতে পাই না, বিয়ে করে বৌকে খাওয়াব কি? জীবনে বোধহয় ঐ একবারই বুদ্ধির এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তারপর খাটুনী আরও বাড়িয়ে দিলেন।

এদিকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, ওদিকে মা বোনের টিটকিরি—মিস্ত্রীর মেয়ের জন্য ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। মেয়েটিকেও মধ্যে মধ্যে কথা শুনতে হ'ত। শেষে তারা উঠে চলে গেল অন্যত্র। অত্যধিক পরিশ্রম এবং উপযুক্ত

আহারের অভাবে চণ্ডীবাবু শুকিয়ে যেতে লাগলেন। মা বোন মনে করলেন, বিরহে। বিদ্রূপ বেড়েই যেতে লাগল। শেষে চণ্ডীবাবু শয্যা নিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই কাবার।

দিনরাত শুধু খেটেছেন। কারো সঙ্গে মেশেন নি। বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। তাই গতি করতে এল হিন্দু সৎকার সমিতি। অথচ মিস্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করলে হয়ত' তিনি বেঁচে থাকতেন। মিস্ত্রী তাকে কাজে লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল; আশা দিয়েছিল শ'খানেক নিশ্চয়ই রোজগার হবে। হ'তও। কিন্তু কেরাণীগিরি ছেড়ে মিস্ত্রীর কাজ করলে নাকি মান ইজ্জৎ যাবে। এ কি মোহ!"

অনেকে অনেক কথা বললে। আমি চুপ করে সরে পড়লুম। কারণ আমিও কেরাণী।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ভিত্তি

ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় এম, আর সি, ও, জি (লণ্ডন)

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

এক কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—"জ্ঞানলাভ"—জ্ঞানলাভের মুখ্য উদ্দেশ্য পরাশান্তি লাভ।

"জ্ঞানংলব্ধা পরাংশান্তিমচিরে নাধিগচ্ছতি।"

—"গীতা"—

জ্ঞানদ্বিবিধ—পরা ও অপরা

পরাজ্ঞান—পরাবিদ্যা—ভূমা—আত্মবোধ। খণ্ডিতজীবন অতিক্রম করিয়া জীব অখণ্ড অনন্ত আনন্দঘন পরমতত্ত্বের বা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করে। ইহাই সত্যদর্শী পূজ্যপাদ ঋষিগণ কর্তৃক পরাজ্ঞান বা পরাবিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। এই জ্ঞানলাভই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য—ইহা লাভ হইলে, মরণশীল মানব অমৃতত্ব লাভ করে। তখন সে জন্মমৃত্যুর কবল হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানবজীবন সার্থক হয়।

অপরাজ্ঞান—অপরাবিদ্যা—অনাত্মবোধ

আত্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা ব্যতীত যাবতীয় জ্ঞান যথা—আয়ুর্বিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, অর্থকরী বিদ্যা ইত্যাদি, সমস্ত জ্ঞানই অপরা নামে অভিহিত হয়।

মানবজীবনের সার্থকতা ভোগে নয়—ত্যাগে। প্রবৃত্তিমার্গে নয়—নিবৃত্তিমার্গে। এই শিক্ষাই মানবজাতির প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মাত্র ভোগতৃপ্তিই মানবজীবনের একমাত্র কাম্য নয়। আহার-নিদ্রা-মৈথুন, মানবজীবনের কেবলমাত্র কাম্য নয়। পশু-পক্ষীরাও এই তিনটীর আচরণ করে। মানবদেহ ধারণ করিয়া—যাহারা কেবলমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত—তাহারা পশুরই সমান।

"আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুনঞ্চ।
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম।
ধর্ম্মোহিতেষাম্ অধিকো বিশেষো।
ধর্ম্মহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।" —মনুসংহিতা।

দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্ম্মধারা নিরূপণ করিবার জন্য পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ দিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে—আজ দেশের সর্ব্বত্রই "হাহাকার"। ঘরে ঘরে অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, অর্থাভাব, জ্ঞানাভাব, শিক্ষার অভাব—অভাব—অভাব—অভাব: অভাবের শিখা আজ প্রদীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধু ধু জ্বলিতেছে। এ অভাবের অভাব কবে হ'বে তা কে জানে?

"মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্"।

হীনবীর্য্যতা, পরশ্রীকাতরতা, উচ্ছৃঙ্খলতায় আজ দেশ সমাচ্ছন্ন। মানবকুল আজ অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত। এ দুর্দ্দশার মূলকারণ—"প্রকৃত-শিক্ষার" অভাব।

পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আজ আমরা মুক্ত হইলেও আমাদের মধ্যে এত আবিলতা, এত গলদ বর্ত্তমান যে তাহার আমূল সংস্কার না হইলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে না—হইতে পারে না।

বহিঃআবিলতা বিদূরিত করা সহজ—কিন্তু অন্তরের আবিলতা বিদূরিত করা সহজ নয়। অন্তরের আবিলতা তখনই বিদূরিত হইবে—যখন দেশের প্রত্যেক শিক্ষক, প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রত্যেক জননী ও প্রত্যেক সন্তান প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নবজীবনলাভ করতঃ ভারতের আকাশ বাতাস গরিমায় পূর্ণ করিবে। তখন ভারতমাতা পুনরায় তাঁহার প্রদীপ্তপ্রভায় সমগ্রপৃথিবী আলোকিত করিয়া জগতে

পুনরায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন। ভারতের লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শিক্ষার ভিত্তি

দেশে "প্রকৃতমানব" গঠিত না হইলে, "খাঁটি" মানুষ তৈয়ারী না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না।

আমাদের দেশ, ভগবানের দেশ। এ দেশের উন্নতিকল্পে যিনি যেদিক দিয়াই প্রচেষ্টা করুন—যতরকমেরই দেশহিত কল্পনা করুন, এ দেশের মজ্জাগত যে ভাব, যে কৃষ্টি, তাহা ভগবানমূলক। আমরা এ শিক্ষা সমুজ্জ্বল করিয়া ধরিবার দিকে যদি দৃষ্টি না রাখি—ভগবৎ-অভিমুখী সমাজ বিজ্ঞানের দিক্‌কে যদি অবহেলা করি—সমাজ পরিচালনে ভগবৎ বংশজাত বলিয়া যদি নিজেদের আত্মিক লক্ষ্য স্থাপন না করি এবং সেই জন্য মানববংশ ধারায় যদি "ঋষি" বা "অতিমানব" প্রসবের যোগ্যা "মা" দেখিতে না পাই তবে দেশের কিছুমাত্র কল্যাণ সাধিত হইল, ইহা আমরা দেখিতে পাইব না।

যেমন বিশ্বজননীর লক্ষ্য সন্তানকে ভুক্তি মুক্তি দান, মানবীমায়ের লক্ষ্যও ঠিক সেইরূপ দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে—যদি এ দেশের কৃষ্টি ও জগতের চিরকল্যাণদাতা মানব বংশধারা রক্ষা করিতে হয়।

এইরূপ প্রকৃতি তৈয়ারী করা যায় যদি, এই মায়েদের চিত্তে এ আশা যদি সুদৃঢ় বিজ্ঞানের যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া যায় যে, তাঁহাদের ঋতুকালীন আচরণ হইতে গর্ভাবস্থা ও প্রসবের পর সন্তান পালন, যেন এই তিনটী অবস্থায় তাঁহারা সতর্ক লক্ষ্যে সন্তানের দিকে চাহিয়া থাকিতে শিক্ষা করেন।

ঋতুকালই প্রকৃত সন্তান সৃষ্টি, সন্তান-প্রসব ও তাহাকে পালন করিয়া প্রকৃত মানবরূপে পরিণত করিবার উদ্যোগ পর্ব্ব।

নারীকে এই শিক্ষায় যদি দীক্ষিত করা যায় তবে নারী সহজেই চিরস্মরণীয় সন্তানরত্নের "মা" হওয়ার আশা করিতে পারেন এবং এইরূপে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে।

দেশকল্যাণকর কার্য্য Constructive Programme এর মধ্যে এটী যে অন্যতম এবং প্রধান ব্যবস্থা সে কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত।

তাই বলিতেছি যে, দেশকল্যাণকর প্রকৃত মানব গঠনের প্রথম ও প্রধান সোপান, মূলভিত্তি হইবে, নারীর শিক্ষা। শিক্ষার ভিত্তি যতই সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপরি নির্ম্মিত শিক্ষাসৌধও ততই দীর্ঘস্থায়ী ও সুরম্য হইবে। ইহার অন্যথায় দেশোদ্ধার হইবে না।

নারীর শিক্ষা

যতদিন দেশের নারীগণ আদর্শ রমণীরূপে গঠিত না হ'ন, ততদিন সুসন্তান জন্মিবে না। সুসন্তান না জন্মিলে—সুসন্তানে দেশ পরিপূর্ণ না হইলে দেশের কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না; বহু রক্তদান ও কারাবরণ দ্বারা অর্জ্জিত এই নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না।

বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে আমাদের বালিকাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা অনেকাংশেই অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ। নারী জীবনের যে সকল বিশেষত্ব ভগবানের সৃষ্টি, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রাপ্তবয়স্কা বালিকাগণকে সাধারণ জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পালনীয় নিয়মগুলিও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সকল নিয়ম না জানায় ও পালন না করায় বহুপ্রকার "স্ত্রীরোগের" সৃষ্টি হয়।

চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে, এদেশের মেয়েরা "ঋতুকালীন" "গর্ভাবস্থা" ও সন্তানপ্রসবান্তে পালনীয় নিয়মগুলি না জানায় এবং অনেকক্ষেত্রে জানিয়াও পালন না করায়—তাঁহারা অনেকেই দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হ'ন ও তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত সুসন্তান লাভে বঞ্চিত হ'ন।

ঋতুকালে নারীগণের যে নিয়ম পালন করা উচিত তাহা না করায় বহুনারী রোগগ্রস্ত হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃত অবস্থায় জীবনযাপন করেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—

"আর্ত্তবস্রাবদিবসাদহিংসা ব্রহ্মচারিণী।
শয়ীতদর্ভশয্যায়াং পশ্যেদপি পতিং ন চ॥
করে শরাবে পর্ণে বা হবিষ্যং ত্র্যহমাহরেৎ।
অশ্রুপাতং নখচ্ছেদং অভ্যঙ্গমনুলেপনম্॥
নেত্রয়োরঞ্জনং স্নানং দিবাস্বাপং প্রধাবনম্।
অত্যুচ্চশব্দশ্রবণং হসনং বহুভাষণম্॥
আয়াসং ভূমিখননং প্রবাতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ "রজঃস্বলা স্ত্রী রজঃনিঃসরণ দিবস হইতে তিনদিন হিংসা করিবে না, ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে, কুশাসনে শয়ন করিবে, পতিকে দর্শনও করিবে না—হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে; অশ্রুপাত, নখচ্ছেদ, অভ্যঙ্গ, অনুলেপন, নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন, স্নান, দিবানিদ্রা, প্রধাবন, হাস্য, বহুভাষণ, পরিশ্রম, অত্যুচ্চশব্দ শ্রবণ, ভূমিখনন ও প্রবল বাত সেবন এইগুলি বর্জ্জন করিবে।"

প্রসবের পর, সন্তানপালন কি ভাবে করিতে হয় তাহা আমাদের দেশের কয়জন জননী জানেন? "গর্ভধারিণী" হওয়া সহজ, কিন্তু "মা" হওয়া অত সহজ নয়।

শিশু পালন :—শিশুর প্রয়োজনীয়তা

শিশুই জাতীয়জীবনের ভবিষ্যৎ বল ও ভরসা। শিশু ভিন্ন অন্য কেহই কালে বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা বা দেশরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। তাই শিশুর এত প্রয়োজন। কিন্তু সেই শিশু যদি সুস্থ ও বলিষ্ঠ না হইয়া রুগ্ন ও দুর্ব্বল হয়, তাহার দ্বারা বংশরক্ষা, জাতিরক্ষা, বা দেশরক্ষা কোন কাজই হয় না; যদি শিশু চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ না হইয়া চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হয়, সে বংশের কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, দেশের

কলঙ্ক হইয়া দাঁড়ায়। সন্তান রুগ্ন, দুর্ব্বল, চরিত্রহীন ও অধার্ম্মিক হওয়া যে কি নিদারুণ, কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা—সে দুঃখ যে কি দুঃখ, পিতা মাতার সে যে কি জীবন্ত দহন—তাহা যাঁহাদের ঘটিয়াছে মাত্র তাঁহারাই জানেন। ইহা অন্যের ধারণা হওয়া সম্ভব নয়।

শিশু এরূপ হয় কেন ?

শিক্ষায় দোষে।

শিশুর শিক্ষা : যে সন্তান জীবনের প্রথম হইতে আহার বিহার ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে সৎশিক্ষা না পায় সে কখনও সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ হইতে পারে না। সন্তানকে মাত্র আহার ও পরিধান প্রদান করিলেই তাহাকে "পালন" করা পূর্ণ হয় না; সন্তানকে যথারীতি "পালন" করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্য-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। পিতামাতা নিজে সৎ হইয়া—সৎ-দৃষ্টান্ত না দেখাইলে, সন্তান সৎ হয় না—হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—গর্ভধারিণী হওয়া সহজ, কিন্তু "মা" হওয়া সহজ নয়।

বাল্যে মাতৃক্রোড়ে শিশুর যে শিক্ষা আরম্ভ হয়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাই তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়। বর্ত্তমান স্কুল, কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সন্তান অর্থকরী বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইতে পারে; কিন্তু যদি সে জীবনের প্রথম হইতেই সর্ব্ববিষয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা পালন করিতে শিক্ষা না পায় কালে সে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। এই উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন্ত ছবি আজ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

তাই, আজ আমার সকাতর নিবেদন যদি আমরা সুস্থ, বলিষ্ঠ চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সন্তান লাভ করিতে চাই—যদি আমাদের সন্তানকে বংশের গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব স্বরূপ দেখিতে চাই—তাহার জীবনের প্রথম দিন হইতেই তাহার আহার, নিদ্রা, প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সতর্ক হইতে হইবে। এই নির্দ্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করিলে, জন্মভূমির প্রতি গৃহ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ সুসন্তানে পরিপূর্ণ হইবে।

"আঁতুড়ে" জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয় এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। বাল্যের শিক্ষা যত সহজে অভ্যাস হয়, পরবর্ত্তীকালের শিক্ষা তত সহজে অভ্যাস হয় না—হইতে পারে না। বাল্যের শিক্ষা জীবনের সঙ্গে একেবারে এক হইয়া যায়; সে শিক্ষা সহজে ভুলা যায় না—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

স্কুল কলেজে সাধারণ জ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যালাভ হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তথায় মনুষ্যত্ব লাভ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় না। ইহা অতীব ক্ষোভের বিষয়।

বাল্যকাল হইতে শিশুকে সংযম শিক্ষা দিতে হইবে এবং লোভ, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিগুলি তাহার কোমলহৃদয়ে যাহাতে উদিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিশুর শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট কাল ও স্থান ; প্রকৃত-শিক্ষা—বাল্যের শিক্ষক :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "আঁতুড়ে" জীবনের প্রথম দিন হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা চলে। পিতৃমাতৃসন্নিধান ও পরিজনবেষ্টিত নিজ আলয়ই প্রকৃত শিক্ষালয়। শিশু যখন পাঠশালা যাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার চরিত্র গঠনের দায়িত্ব "গুরু" মহাশয়ের উপরও কতকাংশে ন্যস্ত হয়। কারণ তিনিও একজন বাল্যের অন্যতম শিক্ষক! পাঠশালাতে শিশুর গুরুকরণ আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে উপযুক্ত মাতৃগুণ লাভ করিবার পূর্ব্বেই যেমন অনেকেই "মা" হইয়া পড়েন, দুঃখের বিষয় উপযুক্ত গুরুগুণবিহীন হইয়াও অনেকে সেইরূপ গুরুপদবাচ্য হইয়া দাঁড়ান।

"মা-"ই হউন আর "গুরু"-মহাশয়ই হউন, যাঁহার নিজের চরিত্র গঠিত হয় নাই, তিনি অপরের বিশেষতঃ ভাল-মন্দজ্ঞানহীন শিশুর চরিত্র গঠনের ভার লইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

শিশুর নৈতিক শিক্ষা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আহার, নিদ্রা, মৈথুন মানবজীবনের কেবলমাত্র কর্ত্তব্য নয়। পশুপক্ষীরাও এই তিনটীর আচরণ করে। মনুষ্যত্বের পরিচয় ভোগে নয়—নিবৃত্তিমার্গে। মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তিতেই রত, তাহারা পশুর সমান।

সন্তানকে চরিত্রবান ও ধর্ম্মপ্রাণ করিতে হইলে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিম্নলিখিত বিষয়ে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে—

সৎসঙ্গ, সদাচার, সদ্ব্যবহার, সত্যবাদিতা, সরলতা, অহিংসা, পরপীড়া-বর্জ্জন, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সংযম, দানশীলতা, শ্রদ্ধাভক্তি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা :—

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার অবসান তখনই সম্ভব যখন সুশিক্ষিত, সুসংযত, সচ্চরিত্র, শিক্ষানিপুণ, সহৃদয় শিক্ষক-মণ্ডলী দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইবে; যখন স্বাস্থ্যবতী, সন্তান পালনে সুশিক্ষিতা, সুনিপুণা স্নেহময়ী মাতৃমণ্ডলী দ্বারা প্রতিগৃহ সুশোভিত হইবে। যখন দেশের যুবকবৃন্দ সুস্থ, বলিষ্ঠ, চরিত্রবান, ধর্ম্মপ্রাণ ও সুসংযত জীবন হইয়া সুগঠিত হইবে।

"ভারতমাতার লুপ্ত গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক—ইহাই প্রার্থনা।

"বন্দেমাতরম্"

মহাত্মার তিরোভাব ও গ্রহের প্রভাব

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

গত ৩০শে জানুয়ারি আততায়ীর হাতে মহাত্মার মহামূল্য জীবনের শোচনীয় অবসান নির্মল নীল আকাশ থেকে অশনিপাতের মত সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত ও বিমূঢ় ক'রে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছে এই মর্মান্তিক ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত হ'লেও, গ্রহ নক্ষত্র সংঘের মধ্যে কিন্তু এর জন্য প্রস্তুতি চলছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দেশের যাঁরা মাথার উপর আছেন সেই নেতাদের অনেকেই ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসকে অজ্ঞতা-প্রসূত একটা অন্ধ কুসংস্কার ব'লে মনে করেন। তাঁরা যদি জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন এবং গ্রহ নক্ষত্রের নির্দেশ হিসাবে সতর্ক হ'তে পারতেন, তাহ'লে হয়ত আরও কয়েক বৎসর তাঁকে আমাদের মধ্যে ধ'রে রাখা সম্ভব হত। গ্রহ-নক্ষত্র যে কী ভাবে এই শোকাবহ ঘটনার ইঙ্গিত করছিল, এই প্রবন্ধে তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়েছিল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর সকাল ৭টার সময়। তাঁর জন্ম সময়ের রাশিচক্র হয়েছিল এই রকম—

১০ম ৬।১।৫৬ ; ১১শ ৪।০।৩০ ; ১২শ ৫।৩।৫৮ ;
লং ৬।১।৩৪ ; ২য় ৭।০।৪০ ; ৩য় ৮।০।৫২

মহাত্মার ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ ছিল প্রজাপতি। এই প্রজাপতি মহাত্মার কুণ্ডলীতে তাঁর দশম ভাববিন্দুর সঙ্গে সংযুক্ত এবং রবি দশমস্থ হ'য়ে বলবান লগ্নপতির, বৃহস্পতির, মঙ্গলের ও রুদ্রের শুভপ্রেক্ষা পাওয়ায় তাঁর পৃথিবীব্যাপী অসাধারণ খ্যাতি-সূচনা করেছে। তাঁর তুলা-লগ্ন ও ভাগ্যনিয়ন্তা প্রজাপতির ফল তাঁর জীবনে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়েছিল। আমার লেখা 'লগ্নফল' গ্রন্থে তুলা লগ্নের যা ফল দেওয়া হয়েছে এবং 'ফলিত জ্যোতিষের মূল সূত্রে' প্রজাপতির যা স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে তা যদি কেউ প'ড়ে দেখেন তাহ'লে বুঝতে পারবেন যে মহাত্মার জীবনের ফল কী ভাবে তাঁর জন্মকালীন গ্রহ সংস্থানের দ্বারা সূচিত হয়েছে। এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত ক'রে দিলুম।

প্রথমে তুলা লগ্নের ফল

তিনি সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় ও আনন্দপ্রিয়, কিন্তু যে ব্যাপারে তাঁর ঝোঁক চাপে তার চরম ক'রে ছাড়েন।...অন্য লোকে যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মুহ্যমান হ'য়ে শুয়ে পড়ে, তিনি তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে অবহেলায় তা পার হ'য়ে যেতে পারেন...তাঁর সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে একটা সহানুভূতির ধারা দেখা যায়, অন্যের প্রতি ব্যবহার প্রায়ই শিষ্টতা, দয়া ও স্নেহের সঙ্গে জড়িত হ'য়ে থাকে।...তাঁর সামাজিক ব্যবহার শান্ত ও মধুর এবং তাঁর মধ্যে সহানুভূতি প্রবল।

যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জন দেন না। অন্য লোকের সাহচর্যে কাজ করতে ভালবাসেন বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তিনি বড় একটা অনুগামী হন না ; অধিকাংশ স্থলে নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে থাকেন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে একটা খোলাখুলি ভাব আছে এবং যদিও মধ্যে মধ্যে তিনি ব্যবসাদারী চাল চেলে থাকেন, তাহ'লেও পরক্ষণেই তা স্বীকার করতে তাঁর বাধে না।...তাঁর কর্মের সঙ্গে প্রায়ই জনসাধারণের কোন সংস্রব থাকে।...জাতক স্বদেশে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং প্রায়ই পরিবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে গণ্য হন। উচ্চ ও সম্ভ্রান্তবংশীয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকে।...জাতককে অনেক ভ্রমণ করতে হয়, দূরদেশে জলপথে ভ্রমণও অসম্ভব নয়।...জল ও জলীয় পদার্থ তাঁর দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।...তাঁর অনেক ব্যাধি জল চিকিৎসার দ্বারাই আরোগ্য হ'তে পারে।...জাতক বেশ লোকপ্রিয় হ'য়ে থাকেন। জনসাধারণকে তুষ্ট করার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়।...জাতক নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হ'তে পারেন।

ভাগ্যনিয়ন্তা প্রজাপতির স্বরূপ

প্রজাপতি শক্তির বেগে কাজ করতে চান। এই প্রচণ্ড বেগের জন্য প্রজাপতির মধ্যে একটা প্রবল ব্যক্তিত্ব প্রকটিত। সে ব্যক্তিত্ব এমনি প্রবল, এমনি প্রচণ্ড যে, সূর্যের মর্যাদা, বৃহস্পতির জ্ঞান-গৌরব, মঙ্গলের বীরত্ব ও শনির বার্ধক্যজাত গাম্ভীর্য, সকলকেই তার সামনে মাথা নত করতে হয়। তাঁর মধ্যে অনর্থক ক্রোধ নেই, কিন্তু তাঁর তেজ অদম্য। তিনি যে পথে অগ্রসর হন, সহস্র বাধা থাকলেও

তাঁর গতিরুদ্ধ হয় না, দৃঢ়, নির্ভীক অবিচলিত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে চলেন।

প্রজাপতির মধ্যে ভয় বা দ্বিধা ব'লে কিছু নেই—তাঁর বুলি "মন্ত্রম্বা সাধয়েয়ং শরীরম্বা পাতয়েয়ম্।" (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে)।

মঙ্গলের সাহস চঞ্চল। তার পিছনে ক্রোধ আছে তা অপরকে আঘাত করে এবং আত্মরক্ষায় সতর্ক। প্রজাপতির সাহস শান্ত অথচ বেগবান—তার মধ্যে ভয়ের একান্ত অভাব। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আত্মরক্ষার চিন্তা সে সাহসের মধ্য দিয়ে উঁকি মারে না। সে সাহস দৃঢ় নীরব, অচঞ্চল।

প্রজাপতির অধিকারে যাঁদের জন্ম তাঁদের জীবনে বহু ব্যাপার সহসা ও অতর্কিতভাবে ঘটে। তাঁদের মিলন হয় সহসা, বিচ্ছেদ হয় সহসা, উন্নতি হয় সহসা, অবনতি হয় সহসা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সহসা ঘটে।

উপরে যে কিছু কিছু উদ্ধৃত করলুম, তার মানে আমি দেখাতে চাই যে, মহাত্মার রাশি চক্রটি ঠিক। এটা দেখানো দরকার এই জন্ত যে, এই রাশি চক্রকে ভিত্তি করেই তাঁর শোচনীয় অবসানের ব্যাপারে গ্রহের প্রভাব কতখানি ছিল তা জানা যাবে। মহাত্মার কর্মবহুল বিচিত্র জীবনের জ্যোতিষিক বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়, তাঁর ৭৯ বর্ষে গ্রহের কী রকম প্রভাবের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটল শুধু সেইটুকুই বিচার করব। কিন্তু তার পূর্বে তাঁর জন্মকুণ্ডলীর মধ্যে এই রকম কোন দুর্ঘটনা সূচিত হয় কিনা, তা দেখা দরকার। কেন-না, জন্মচক্রে যে ঘটনার সম্ভাবনীয়তা নেই, সে রকম কোন ঘটনা কারো জীবনে ঘটে না।

সাধারণতঃ রক্তপাত সূচিত হয় জন্মকুণ্ডলীতে যদি ষষ্ঠ ও অষ্টমের কোন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ থাকে। এই যোগ থাকলে, অস্ত্রাঘাত অস্ত্রোপচার, দুর্ঘটনায় রক্তপাত, আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব প্রভৃতির কোনটা না কোনটা ঘটবেই; এবং তার সঙ্গে যদি লগ্ন জড়িত থাকে, তাহ'লে সে দুর্ঘটনায় মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে। মহাত্মার কুণ্ডলীতে ষষ্ঠপতি বৃহস্পতি ও অষ্টমপতি শুক্র পরস্পরকে শত্রুপ্রেক্ষায় পীড়িত করছে এবং এই শুক্র ও বৃহস্পতি আবার চন্দ্র, মঙ্গল ও রুদ্রের অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। শুক্র লগ্নপতিও বটে। অবশ্য তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ প্রজাপতি বলবান লগ্নপতি, অষ্টমপতি ও ষষ্ঠপতিকে শুভপ্রেক্ষায় অনুগৃহীত করায় এবং চন্দ্র স্বক্ষেত্রে থেকে দশমস্থ হওয়ায় মহাত্মার সুদীর্ঘ আয়ুর যোগ নির্দেশ করে। এ রকম ক্ষেত্রে যত্ন নিলে আয়ু অনেক সময় নব্বুইএর কোঠায় পৌঁছয়। কিন্তু মঙ্গল লগ্নে থেকে সপ্তমস্থ বক্রী রুদ্রের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হওয়ায় নিজের হঠকারিতা অথবা অসতর্ক উদাসীনতায় সহসা আয়ু খণ্ডিত হ'তে পারে। বিশেষতঃ যে সকল বর্ষে এই মঙ্গল ও রুদ্রের প্রভাব প্রবল সেই সকল বর্ষগুলিতে এই শ্রেণীর দুর্ঘটনার আশঙ্কা খুব বেশী। দেখা যাক মহাত্মার ৭৯ বর্ষের চালিত চক্রে গ্রহের প্রভাব কী ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল। মহাত্মাজীর ৭৯ বর্ষের চালিত কুণ্ডলী হয়েছিল এই রকম—

১০ম ৬|৭|৪৭ ; ১১শ ৭,৫|১ ; ১২শ ৭|২৯|১৮
লং ৮|২৩|৫৬ ; ২য় ৯|২৮|৫৯ ; ৩য় ১১|৫|২০

এই চালিত কুণ্ডলীর ফল শুরু হয়েছিল গত ২রা অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে। এই চক্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, লগ্ন-বিন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা হয়েছে মঙ্গল, রুদ্র ও বরুণের এবং এই লগ্ন-বিন্দুর প্রথম সংযোগী প্রেক্ষা হয়েছে রুদ্রের সঙ্গে; সুতরাং রুদ্রের প্রভাবই এ বৎসর সব চেয়ে বেশী। তাঁর জন্মকালে রুদ্রের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা ছিল লগ্ন ও অষ্টমপতি শুক্রের সঙ্গে এবং লগ্নস্থ মঙ্গল ঐ রুদ্রের ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ষষ্ঠপতি বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষায় যুক্ত হয়েছিল। রুদ্র ও মঙ্গলই মহাত্মার প্রবল মারক, কেন না তারা তাঁর দেহ (লগ্ন), স্বাস্থ্য (ষষ্ঠ) ও আয়ু (অষ্টম) এ তিনটির উপরই অশুভ প্রভাব স্থাপন করেছে। সুতরাং বর্ষটি যে মহাত্মার রিষ্ট বর্ষ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

জন্মকালে মহাত্মার লগ্ন, ষষ্ঠ ও অষ্টম রুদ্র ও মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হয়েছিল, ৭৯ বর্ষের চালিত চক্রেও, রুদ্র চালিত-লগ্ন, অষ্টম ও ষষ্ঠকে পীড়িত করেছিল। লগ্নস্থ রবি বুধ অষ্টমপতি চন্দ্র ও ষষ্ঠপতি শুক্র সবই রুদ্রের দ্বারা পীড়িত। তা ছাড়া জন্মলগ্নে যেমন লগ্ন, ষষ্ঠ ও অষ্টমের বিরুদ্ধ যোগ ছিল, চালিত চক্রেও সেই যোগ প্রবল। অষ্টমপতি চন্দ্র লগ্নপতি বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে ষষ্ঠপতি শুক্রের অশুভ প্রেক্ষায় যুক্ত হচ্ছে এবং এ সবগুলিই তাঁর বর্ষনিয়ন্তা রুদ্রের দ্বারা প্রপীড়িত।

রুদ্র কন্যারাশির অধিপতি, সুতরাং মহাত্মার কুণ্ডলীতে তা দ্বাদশপতি। এই দ্বাদশভাব নির্দেশ করে গুপ্ত শত্রু, গুপ্ত ষড়যন্ত্র ইত্যাদি এবং রুদ্র সপ্তমে আছে, যে সপ্তমভাব শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদির জ্ঞাপক। সুতরাং শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে কোন গুপ্তঘাতকের দ্বারা তাঁর জীবন বিপন্ন হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়।

এই ঘটনা বৎসরের কোন্ সময় ঘটবে, তা জানতে হ'লে, চালিত চক্রে লগ্ন ও চন্দ্রকে চালনা করতে হয় এবং সেই বর্ষের প্রত্যেক অমান্তের সময় গোচর ফল বিচার করতে হয়।

মহাত্মার ৭৯ বর্ষের চালিত কুণ্ডলীতে লগ্নের গতি ছিল প্রত্যেক মাসে ৫ কলা ক'রে এবং চন্দ্রের গতি ছিল প্রতি মাসে ১ অংশ ৬ কলা করে; সুতরাং ২রা জানুয়ারি (৩ মাস পরে) লগ্নবিন্দু হয় ধনুর ২৪ অংশ ১১ কলা এবং চন্দ্রের স্ফুট হয় মিথুনের ৯ অংশ ২৪ কলা। ২রা ফেব্রুয়ারি লগ্নবিন্দু ২৪ অংশ ১৬ কলা ও চন্দ্র ১০ অংশ ৩০ কলা।

চালিত রুদ্রের সঙ্গে চালিত লগ্নের যে শুভ প্রেক্ষা ছিল ২রা জানুয়ারি তারিখে তা সম্পূর্ণ হয় এবং তারপর লগ্ন অগ্রসর হ'তে থাকে মঙ্গল ও বরুণের অশুভ প্রেক্ষার দিকে।

চন্দ্র ২রা জানুয়ারির কয়েকদিন আগেই চালিত রুদ্রের অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এবং ঐ ২রা জানুয়ারিতেই জন্মকালীন লগ্ন ও অষ্টমপতির সঙ্গে অশুভ সেস্কোয়ার প্রেক্ষা সম্পূর্ণ করে। তারপর ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে জন্মকালীন রুদ্রের সঙ্গে তার অশুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হয়—তার অব্যবহিত পরেই তার অশুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হয় জন্মকালীন মঙ্গলের সঙ্গে ২০শে ফেব্রুয়ারি। সুতরাং ২রা জানুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি তাঁর অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়।

১১ই জানুয়ারি ১৯৪৮ যে অমান্ত হয়, তাতে দেখা যায় যে মহাত্মার লগ্নপতি ও অষ্টমপতি শুক্র মকরে চতুর্থ রাশিতে থেকে শনি ও রাহুর দ্বারা ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হয়েছে এবং জন্মকালীন বৃহস্পতির সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা। গোচরে বক্রী শনি জন্ম—বৃহস্পতির অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জন্ম-চন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে যাচ্ছে। সুতরাং এই অমান্তটিও যে বিশেষ অশুভের নির্দেশক, তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই অমান্তচক্রে একটি ভাল যোগ ছিল গোচরে শনি ও বৃহস্পতির শুভ প্রেক্ষা; কিন্তু ২৬শে জানুয়ারি ঐ শুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়ে বৃহস্পতি প্রজাপতির অশুভ প্রেক্ষার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। ঐ অশুভ প্রেক্ষা সম্পূর্ণ হয় ৬ই ফেব্রুয়ারি।

কাজেই ২৬শে জানুয়ারি থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাত্মার এ বছরে সব চেয়ে সঙ্কটপূর্ণ সময় ছিল।

বড়ই দুঃখ হয় যে, মহাত্মার নিজেরও ফলিত জ্যোতিষে আস্থা ছিল না এবং তাঁর যে সব ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করছেন, তাঁরাও জ্যোতিষকে আমল দেন না। এই নেতারা যদি জ্যোতিষে বিশ্বাস ক'রে ঐ ২৬শে জানুয়ারি থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাত্মাকে সযত্নে রক্ষা করতে পারতেন, তাহ'লে তাঁকে আমরা হারাতুম না। অবশ্য রুদ্র ও মঙ্গলের প্রতিকূল প্রভাবে মহাত্মার মধ্যে এ সম্বন্ধে উদাসীনতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পেতই; কিন্তু তাঁর বান্ধবদের কর্তব্য ছিল, এই কটা দিন যাতে তিনি কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্য সভায় যোগ না দেন এবং তাঁর বাসস্থান যাতে ভালভাবে রক্ষিত হয়, তার ব্যবস্থা করা।

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। অনেকে মনে করেন যে, গ্রহের শক্তিই একমাত্র শক্তি এবং গ্রহ যা নির্দেশ করে তার নড়চড় নেই। এই ধারণা একটা মস্ত বড় কুসংস্কার। বস্তুতঃ জ্যোতিষ থেকে আমরা নির্দেশ পাই, কোন্ কোন্ সময় গ্রহের প্রভাব কোন ব্যাপারের পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল। আমরা যদি তা বুঝে সেই হিসাবে আচরণ নিয়ন্ত্রিত করি, তা হ'লে গ্রহের প্রভাবের বহু কুফল এড়াতে পারি এবং শুভফল বাড়াতে পারি।

সে যা-ই হোক উপরে মহাত্মার কুণ্ডলী থেকে তাঁর মূল্যবান্ জীবনের শোচনীয় অবসান সম্বন্ধে গ্রহের প্রভাবের যে বিশ্লেষণ দিয়েছি, তাতে জ্যোতিষের ফলাদেশ যে আন্দাজি যা-তা বলা নয়, তার যে দস্তুর মত যুক্তিপূর্ণ বিচার-পদ্ধতি আছে, এ কথা যদি শিক্ষিত সমাজ বোঝেন, সেটাও একটা পরম লাভ। আমাদের নেতারা যাঁরা সময়ে অসময়ে আর্যসংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি ব'লে কলরব করেন, তাঁদের মনে রাখতে অনুরোধ করি যে, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে জ্যোতিষে বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এদিকে লক্ষ্য রাখলে, রাষ্ট্রকেও তাঁরা অনেক বিভ্রাটের ব্যাপার থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

বেশী বলা অনাবশ্যক।

বিস্ময়

শ্রীশান্তশীল দাশ

যেদিকে তাকাই বিস্ময় জাগে মনে,
অর্থ কিছুই পাই নাকো খুঁজে তার;
এদিকে মানুষ উচ্ছল অকারণে,
ওদিকে জাগিছে ক্রন্দন, হাহাকার।

একদিকে শুধু বিলাসের সম্ভার,
অপব্যয়ের নিতি নব আয়োজন;
আর দিকে দেখি দারিদ্র্য অনাহার,
তিলে তিলে চলে মরণের আবাহন।

প্রাসাদের মাঝে জীবনের জয়গান,
হাসি, আনন্দ, সংগীত অবিরত;
পথের ধুলায় লোটে সহস্র প্রাণ,
সৃষ্টির ধারা তবুও অব্যাহত!

কোন সে খেয়ালী অলখিতে বুঝি না-যে,
এ নিঠুর খেলা খেলিছে ধরণী মাঝে।

শ্রীপাদপদ্ম

পেটে খেলে পিঠে সয়

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী
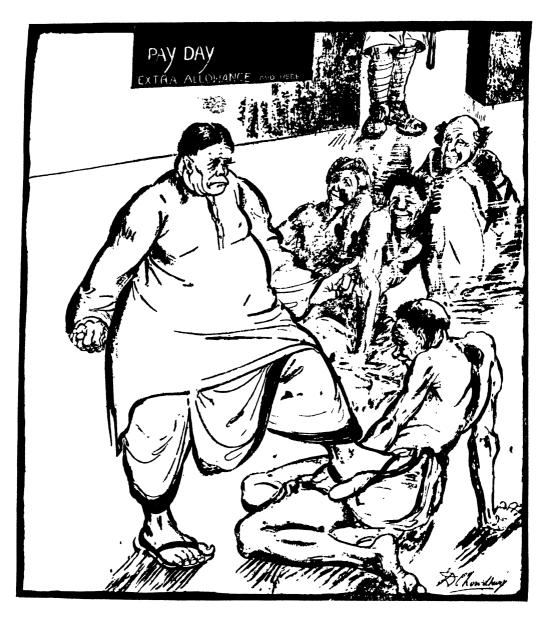
জাহানারার আত্মজীবনী*

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

(দ্বিতীয় স্তবক)

[আত্মকাহিনীর ছিন্নপত্রের পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায় নি। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের মধ্যে বহুদিনের কাহিনী অবলুপ্ত]

* * * *

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ; বাতাস মৃদুগতি, সুন্দর পুষ্পগন্ধে ধরণী আমোদিত হচ্ছে, আগ্রাপ্রাসাদের আঙ্গুরীবাগের(১) প্রত্যেকটি ফুলের সঙ্গে আমার একটি অতীত স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

রডোডেনড্রন ফুলের রক্তস্তবক দেখে মনে হচ্ছে যেন ভোজনাগারের পথে রক্ত-আলোর শিখা। আমার ভ্রাতাদের বিবাহের উৎসবে আমি কত রজনীতে এই রডোডেনড্রন গুচ্ছ দিয়ে বাসর ঘরের মালা গেঁথেছি। নীলাভ হেলিওট্রোপ মৃদু বাতাসে দুলছে—তাদের মিষ্টি গন্ধ বাতাসের সঙ্গে এক দুঃখের নিঃশ্বাস বয়ে আনছে, আমি অতীতের স্মৃতিভারে জড়িয়ে আছি।

দেওয়ান-ই-আমের(২) সঙ্গীত নিস্তব্ধ, কিন্তু সন্ধ্যার আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে এক করুণ সুর। মনে হচ্ছে যেন রক্তগোলাপের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে "দুলেরার"(৩) সঙ্গীত। তার ছন্দের শিহরণ এই দুর্গপ্রাচীর ভেদ করে আমার কামনার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছায়। আমি দুলেরার নাম দিয়েছি "বর"। দুলেরার বাহুপাশে আমি উত্তেজনাকে আনন্দমুহূর্ত্ত বলে কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গীত আমাকে নিয়ে গেছে সেই রাজ্যে যেখানে আমার চরণ কখনও ভূমিস্পর্শ করে নি। আজ তার রূপ আমার স্মৃতিপটে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু তার সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি......

দিল্লীর প্রাসাদে শালিমার বাগে মৌমাছির মত আমি উড়ে বেড়িয়েছি। মৌমাছি প্রতিমুহূর্ত্তে পুষ্পপাত্রে খুঁজে বেড়িয়েছে উত্তেজনা। প্রতিমুহূর্ত্তে সে উত্তেজনায় এগিয়ে এসেছে নিশীথিনীর প্রান্তে অন্ধকার মৃত্যুর অন্বেষণে। মণিমাণিক্যোজ্জ্বল মক্ষিরাণী স্বর্ণরেণু পাখায় মেখে নৃত্য করতে করতে সূর্য্যের দিকে ছুটে চলেছে ; চিরন্তন আলোর সাথে সে নব-জীবন লাভ করবে, সে মরবে না—কারণ আকাশে তারার মালা জ্বলছে।

আমি ভয়ে শিউরে উঠেছি, আমার রূপ আমি আমার কল্পলোকে পৌঁছবার আগেই যদি ম্লান হয়ে যায়, তখন ত আমি আর সেই বেগম জাহানারা থাকব না। আমার প্রিয়তমের হৃদয়রাণী হয়ে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত শেষ করতে পাব না। ভাগ্যদেবীর পানপাত্র পান করেছি আমি আকণ্ঠ। তবু আজও আমি তৃষাতুরা।

ঐ অস্তসূর্য্যের রক্তিমরশ্মি জীর্ণ পত্রশিরে সোণার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। তেমনি আমার প্রিয় "রাজার" (দুলেরার) শিরে আমি পরিয়ে দিচ্ছি স্মৃতির মুকুট।

আমি আজও সেই ছবি দেখছি—যেদিন দেওয়ান-ই-আমের দরবার কক্ষে আমার প্রিয়তম প্রথম সম্রাট শাহজাহানকে অভিবাদন করেছিল। সেদিন আমি ছিলাম তরুণী, ঘোড়সওয়ারের দল চোখের দৃষ্টি অতিক্রম করে চলে গেল। বাঁশীর সুর, করতল ধ্বনি শান্ত—চারিদিকে গভীর নীরবতা, আমি মহলের ঝারোকার(৪) পাশে দাঁড়িয়ে আছি। ঐ আমার রাজা ধীর পদক্ষেপে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার সমস্ত রক্ত জমাট হয়ে যাচ্ছে। একি? নিষাদরাজ নল(৫)? রাজা নল কি আবার মর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েছেন? তাঁর চক্ষে ভাসছে অপরূপ জ্যোতি—মনে হচ্ছে যেন অতিদূরে বহুদূরদৃষ্ট স্বপ্নের আবেশ। তাঁর আকৃতিতে রয়েছে তাঁর ক্ষাত্রবংশ মর্য্যাদার পরিচয়—ক্ষত্রিয় বংশই ভারতবর্ষ শাসন করার উপযুক্ত বটে। যে মুহূর্ত্তে চারণ তার বীণায় মৃত্যুর গানে ঝঙ্কার দেয়—রাজপুত কৃষ্ণকায় অশ্বকে যুদ্ধের জন্ম এগিয়ে আনে। দময়ন্তী যেমন একদিন দেবতাদের বাদ দিয়ে নলকে বরণ করেছিলেন আমিও আমার অন্তরে তেমনি এই রাজপুতের চরণে আমাকে নিবেদন করেছিলাম। এমন নতি এর আগে

(১) আগ্রা রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকাদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট দেওয়ান-ই-আমের অপর পার্শ্বে সংলগ্ন উদ্যান।

(২) মোঘল প্রাসাদের সাধারণ দরবার কক্ষ।

(৩) শাহজাহানের বিশ্বস্ত রাজপুত সামন্ত বুন্দীরাজ ছত্রসালের ছদ্মনাম।

(৪) মোঘল স্থপতিতে প্রাচীর ও জানালার পার্শ্বে পাথর কিংবা মশল্লা দিয়ে তৈরী জালের কাজ—অপরিবর্ত্তনীয় পর্দ্দার মত ব্যবহার করা যায়।

(৫) মহাভারত বর্ণিত রাজা নল, দময়ন্তীর স্বামী, স্বয়ম্বর সভায় দেবতাকে উপেক্ষা করে দময়ন্তী নলরাজাকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। জাহানারা হিন্দুশাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর জীবনীতে হিন্দু-শাস্ত্রালোচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

* গতবারে ভুলক্রমে জাহানারার আত্মজীবনীর প্রথম স্তবক "মোঘল রাজকুমারী" নামে প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যতে নতুন নামে প্রকাশিত হবে।

কারও কাছে স্বীকার করি নি—এর পরেও করি নি। প্রথম দরশনে আমি তাঁকে আমার হৃদয়ের পূজা সমর্পণ করলাম। প্রথম দরশনেই তিনি আমার অন্তরের দেবতা—আজও তিনি আমার দেবতাই আছেন।

প্রজাপতি সূর্য্যের আলোয় নৃত্য করছে—আমি আমার শাশ্বতের মধ্যে বিলীন হয়ে যাব, সাবিত্রীর মত মৃত্যুকে আমি জয় করব। পৃথিবীর অপর তীরে আমি আমার রাজার অনুসরণ করব আমার সীমাহীন কামনা রাজ্যের মধ্য দিয়ে—যেখানে আমার কোনও শঙ্কা নেই।

আমার ভ্রাতা আওরঙ্গজেব সঙ্গীত নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। সঙ্গীত-শিল্পীগণ তাদের বাদ্যযন্ত্র শবযাত্রার সমারোহে সমাধিস্থ করেছে(৬)। কিন্তু সম্রাটের কোনও অনুশাসনই আমার অন্তরের সঙ্গীতকে স্তব্ধ করতে পারে নি।

প্রাচীরের মত কঠোর অদৃষ্ট আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মোঘল রাজকুমারীর বিবাহ হবে না—এই ছিল সম্রাট আকবরের আদেশ। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সম্রাট আকবর মোঘল রাজকুমারীকে উৎসর্গ করেছিলেন।

দূরে ঐ ছাদের অপর প্রান্তে পাহাড়ের উপরে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই প্রাসাদের শুভ্র মর্ম্মর তোরণ আর সুবর্ণখচিত দ্বার শান্ত জলরাশির উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। জলধারার অন্তরে বাইরে অপার নিস্তব্ধতা। কারণ সেখানে তিনি আর নেই। কিন্তু সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে তাঁকে বেষ্টন করে আমি রচনা করতাম আমার রাজসভা। সেই সভায় মোঘল রাজকুমারীর ভোজ-উৎসবে স্বর্গের দেবতারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠতেন। সে ভোজন কক্ষে সুশীতল মর্ম্মর শিলাতলে নর্ত্তকীর নূপুরনিক্বণ কম্পন জাগাত। ভোজনের অবসরে কাবুল কাশ্মীরের রত্নখচিত পাত্রের সুরাধারা চিন্তার স্রোতকে স্তব্ধ করে দিত। না, না, আমি আমার ভ্রাতা দারার স্বপ্ন সফল করে দিতাম। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি—দুধারার মিলন করিয়ে দিতাম। মরমী সুফী সাধু সন্ত যোগীদের প্রেমবারি সিঞ্চন করে অমূল্য সুরাসার তৈরী করে দিতাম। সে সুরা রূপ নিত কাব্যের ঝঙ্কারে, ভাষার মূর্চ্ছনায়। মনে পড়ে একদিন সম্রাট আকবরের রাজসভায়……

ঐ শোন স্রোতস্বিনীর বুকে জলের মন্দ্র কলতান—অঙ্গুরী-বাগের পাশ দিয়ে চলেছে যমুনার স্বচ্ছ প্রান্ত জলধারা। পত্র মর্ম্মর শুনতে পাচ্ছি। আজ আমার কর্ণে এই শান্ত করুণ শব্দ দিল্লীর ঐক্যতানের মত মুখর হয়ে উঠছে। এই স্রোতস্বিনীর তানে আমার কাছে ফিরে আসছে ফিরোজশাহের পরিখার পাশে আমার উদ্যানবাটিকার পুরাতন স্মৃতি। ঐ করতালের কলরোল, ঐ বীণার ঝঙ্কার আজ যমুনার জলে ভেসে এসে আমার দিবাবসানে ঐ শ্মশানের চিতার ধূমশিখা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঐ দিল্লীর প্রাসাদের ঐক্যতান সঙ্গীত যেন আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় মানুষের আর্ত্তনাদ, আমার অভিশাপের অগ্রদূত।

তখনও আমার ভ্রাতা সুজা বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হন নি, তখনও সেই রাজপুরীর পাশ দিয়ে অসংখ্য নাগিনীর অভিযান(৭) তার দৃষ্টিপথে ধরা দেয় নি। অর্থলোভী গণক তাকে তখনও বলে নি যে ঐ ক্ষুদ্র শ্বেত সর্প যেটি বিরাট কাল ফণিনীর শিরে বসেছিল(৮) সেটা সুজার ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত। তখনও ভ্রাতৃবিরোধের শিখা জ্বলে ওঠে নি। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ছিল। উৎসব দিনের বিপণিতে সূর্য্যের শেষ রশ্মি-রেখার মত রাজপ্রাসাদে তার উৎসবের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্য দিয়ে।

আমার উদ্যানবাটিকায় আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম। আমার রাখী-বন্ধ ভাই(৯) কি আসবে না। যখন হিন্দুস্থানে সমস্ত বৈরীশক্তি উদ্দাম হয়ে উঠেছে সে কি আমার পাশে এসে দাঁড়াবে না? কোন নারী কি তাকে আমার চেয়ে মূল্যবান রাখীবন্ধন দিয়েছে? আমি আমার যুযুধান ভ্রাতাকে যে প্রীতির বাঁধনে বেঁধে দিয়েছি তার মূল্য যে অমূল্য।

আমার প্রিয়তম এসেছিল যখন প্রথম সান্ধ্যতারা আকাশে উঠেছিল—তখন সূর্য্যাস্তের সলজ্জ আকাশে রক্তিমরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর আগমনের পদধ্বনি শুনে আমি নতজানু হয়ে অভিবাদন করলাম।

(ক্রমশঃ)

---

(৬) আওরঙ্গজেব সঙ্গীত নিষিদ্ধ করার পর সঙ্গীতশিল্পীরা একদিন এক শবযাত্রা বের করে। কৌতূহলী হয়ে যখন আওরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন—"কার শবযাত্রা?" উত্তর পেলেন—"সঙ্গীতের।" আওরঙ্গজেব বললেন—"কবর যেন ভালভাবে দেওয়া হয়।"

(৭) কথিত আছে শাহ সুজার প্রমোদকক্ষের সম্মুখ দিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় এক সহস্র নারী পথ অতিক্রম করত। সে দৃশ্য সুজার নয়ন চরিতার্থ করত।

(৮) মোগল রাজবংশে জ্যোতিষ চর্চ্চার অত্যন্ত প্রসার ছিল। জীবনের প্রত্যেক ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য রাজজ্যোতিষকে আহ্বান করা হত। একদিন একটি কৃষ্ণসর্পের মস্তকোপরি সমাসীন একটি ক্ষুদ্র শ্বেতসর্প রাজপুরীর প্রাঙ্গণে দেখা যায়। এই অদ্ভুত দৃশ্য ব্যাখ্যার জন্য রাজজ্যোতিষী আহূত হন। জাহানারার জীবনীতে সেই ঘটনারই ইঙ্গিত রয়েছে।

(৯) মোগল সমাজ-জীবনে হিন্দুর রাখীবন্ধ উৎসব সাদরে সমাপন হত। প্রতি বৎসর নিকট আত্মীয় বা প্রিয়জনকে সখ্যের চিহ্নরূপে রাখী প্রেরণ করে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করা হত। বুন্দেলা পরিবারের সঙ্গে এমনি করে গড়ে উঠেছিল তৈমুর পরিবারের প্রীতির বন্ধন। জাহানারার রাখীবন্ধ ভাই ছত্রসাল বুন্দেলা বা "ছুলেরা"।

কংগ্রেসের নীতি বিবতন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মিলন-সঙ্ঘ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে স্বাধীন ভারতে আজ আবার নতুন নীতি গ্রহণ করেছে, তার নবযাত্রার পথে। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বৃটিশের কবল থেকে পরাধীন ভারতকে মুক্ত করা। কংগ্রেসের সেই মূল উদ্দেশ্য সফল হওয়ায়, এবার সে তার নীতি পরিবর্তন ক'রে চলেছে, গ্রামে-গাঁথা-ভারতের দুঃস্থ জনগণের সেবার পথে।

আজ হ'তে ৬৩ বছর আগে, ভারতের এই সুমহান প্রতিষ্ঠান প্রথম মিলিত হয়েছিল, বোম্বাইএর গোকুলদাস তেজপাল সংস্কৃত ভবনে। সেদিন সারা ভারতের মাত্র ৭২ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন সেই সম্মেলনে। তারপর কালের সঙ্গে সঙ্গে সেই নবোদ্গত প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতের দিকে দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তার ক'রে পরিণত হ'ল এক সুবিশাল ন্যগ্রোধে। শোষক শাসকের কাছ হ'তে নিরবচ্ছিন্ন নির্যাতন মাথায় নিয়ে, চলার পথ পরিবর্তন করতে করতে সেদিনের সে কংগ্রেস, কেমন ক'রে যে আজকের এই কংগ্রেসে পরিণত হয়েছে, সে ইতিহাস যেমনি রোমাঞ্চকর, তেমনি আবার মহা গর্বেরও।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইএ কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন বসেছিল, তাতে তখন কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল, তা হচ্ছে—(১) ভারতের বিভিন্ন স্থানের দেশসেবক কর্মীদের মধ্যে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। (২) পরিচয়ফলে জাতিগত, ধর্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দূর করা এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতাবোধের সৃষ্টি হয় তার পরিপুষ্টি সাধন করা। (৩) ভারতের সামাজিক সমস্যা সমাধানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অভিমত সংগ্রহ করা এবং (৪) পরবর্তী বৎসরের জন্য রাজনীতিবিদগণের কার্যপ্রণালী কি হবে, তা নির্ধারণ করা।

আর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(১) ভারতের শাসন কার্য সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করতে হবে। (২) ভারত সচিবের পরামর্শ পরিষদের বিলোপ সাধন করতে হবে। (৩) নির্বাচিত সদস্য গ্রহণ ক'রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সংস্কার করতে হবে। (৪) সামরিক ব্যয় কমাতে হবে। (৫) বিলাতের ন্যায় ভারতেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

কংগ্রেসের এই প্রথম বৈঠকের পর থেকে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হতে লাগল এবং নেতারা প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে, সরকারের নিকটে আবেদন নিবেদন জানাতে লাগলেন।

এই ভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। তার পর ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন বসল। এই সময় থেকে কংগ্রেসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল। কংগ্রেসের মধ্যে এক দল চরমপন্থী দেখা দিলেন। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক, মণীষী বিপিনচন্দ্র পাল, পাঞ্জাবের লালা রাজপত রায় প্রভৃতি এই চরমপন্থীদলের নেতা হলেন। কংগ্রেসের মধ্যেকার এই চরমপন্থী-দল আবেদন নিবেদন ছেড়ে কংগ্রেসকে সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়তে চাইলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থীরা এতে বাধা দিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে এই দুই দলের বাদানুবাদ চলল কিছুদিন।

এরপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাশীতে মহামতি গোখলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হল, তাতে বঙ্গভঙ্গের তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বিদেশী পণ্য বর্জনকে অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হল। পরবৎসর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসে, তাতেই সর্বপ্রথম স্বরাজ স্থাপনের দাবী জানান হয়।

তারপর আরও কয়েক বছর কেটে গেল। এল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। তখন পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ সবেমাত্র থেমেছে। ভারতবর্ষ এই মহাযুদ্ধে ইংরাজকে প্রায় দশ লক্ষ সৈন্য ও প্রভূত অর্থ সাহায্য ক'রে লাভ করল, রাউলাট আইন।

ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশের এই প্রত্যুপকারের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশবাসী একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। ভারতের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে এসে দেখা দিলেন, মহাত্মা গান্ধী। ইতিপূর্বে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে এক অভিনব পন্থায় সংগ্রাম চালিয়ে জয়যুক্ত হয়েছেন। এবার রাউলাট আইনের প্রতিবাদে সেই সত্যাগ্রহ নীতিতেই দেশবাসীকে আহ্বান জানালেন। তাঁর সেই উদাত্ত আহ্বানে আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারত মুহূর্তকাল মধ্যেই বহুকালের জড়তা ত্যাগ ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াল।

সেই থেকেই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সঙ্গে পুরাপুরিভাবে জড়িয়ে পড়লেন এবং কংগ্রেস ও গান্ধীজী ওতঃপ্রোতভাবে এক হয়ে গেল। গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগদান করলে তাঁর উপরেই কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের ভার দেওয়া হল। গান্ধীজী, তিলক ও দেশবন্ধুর মনোনীত দুজন সঙ্গীকে নিয়ে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনা করলেন।

গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগদানের পূর্বে কংগ্রেস একটি উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। জনসাধারণের প্রবেশ এর মধ্যে একরূপ ছিলই না। গান্ধীজীই একে প্রথম ভারতের সর্বজনসাধারণের

প্রতিষ্ঠান ক'রে তুললেন এবং কংগ্রেসের মুক্তির বাণী দূরতম পল্লীর নিভৃত কুটীরে পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা গ্রহণ করালেন। পরে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থিত হল এবং কংগ্রেসের মূলনীতি পরিবর্তন ক'রে স্থির করা হল—সকল প্রকার বৈধ ও নিরুপদ্রব উপায়ে ভারতের জনসাধারণের জন্ম স্বরাজ লাভ করাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

এই স্বরাজ সম্বন্ধে তখন বলা হয়েছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে অথবা আবশ্যক বোধে সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে স্বরাজ লাভ করতে হবে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের নীতি পুনরায় গৃহীত হয় এবং তাঁকে এই আন্দোলনের নেতা নির্বাচিত করা হয়। কংগ্রেস মহাত্মার এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করায় কংগ্রেসে এরপর থেকেই এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সুরু হল।

সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। বিদেশী বয়কট, বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব, খাজনা বন্ধ, স্কুল, কলেজ, আদালত প্রভৃতি বর্জন আরম্ভ হল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আন্দোলন দমন করবার জন্ম সত্যাগ্রহীদের উপর অকথ্য নির্যাতন সুরু করল। এই সময় চৌরীচৌরায় সত্যাগ্রহীরা ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন ক'রে ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারল। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীদের এই হিংসা পথ অবলম্বন করায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন তখনকার মত বন্ধ ক'রে দিলেন।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য ব'লে প্রথম ঘোষণা করা হল এবং এই সময়েই কংগ্রেসে স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণের নীতি প্রবর্তন করা হল। সেই অনুযায়ী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী প্রথম স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য গ্রহণ করা হয়। এর কয়েকদিন পরেই মহাত্মা গান্ধীর সবরমতী আশ্রমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসল এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্ম আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হবে স্থির করা হল। মহাত্মা গান্ধী এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লবণ আইন ভঙ্গ করাই স্থির করলেন। তিনি ১২ই মার্চ তারিখে ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে পায়ে হেঁটে ২০০ মাইল দূরে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডী অভিমুখে রওনা হলেন। ৫ই এপ্রিল সেখানে পৌঁছে তিনি লবণ-আইন অমান্য করলেন।

মহাত্মার ডাণ্ডি অভিযানে সমগ্র ভারতে আবার এক প্রবল সাড়া পড়ে গেল। ভারতের সর্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হল। বৃটিশ আন্দোলন বন্ধ করবার জন্ম শত অত্যাচার সুরু করল। কংগ্রেসের নেতা ও সত্যাগ্রহীদের নিয়ে কারাগার ভর্তি করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হল এই সময়ে এবং লোকের নিজ নিজ প্রয়োজনে লবণ প্রস্তুত করতে পারবে তা গবর্ণমেণ্ট মেনে নিল।

এর পর আরও কয়েক বছর কেটে গেল। গান্ধীজী কংগ্রেস কর্মীদের ছোটখাট সংগ্রাম ও নানাবিধ গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে আগিয়ে নিয়ে চললেন। আবার দেখা দিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। গান্ধীজী এই সময় ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন না ক'রে, ব্যক্তিগত ভাবে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা ক'রে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে নির্দেশ দিলেন। ফলে আবার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দসহ বহু কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হলেন।

এর কিছুদিন পরে ১৯৪২এর ৮ই আগষ্ট বোম্বাইএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ করল। কিন্তু ৯ই তারিখে গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের সকল নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। এই নিয়ে সমগ্র দেশে মহা বিপ্লব সুরু হয়ে গেল। ইহাই কংগ্রেসের ইতিহাসে আগষ্ট-বিপ্লব নামে খ্যাত।

কংগ্রেসের এই আগষ্ট-অধ্যায়ের পরবর্তী অধ্যায়ই হল স্বাধীনতার অধ্যায়।

এরপর বৃটিশ গুবর্ণমেণ্ট ভারতে মন্ত্রীমিশন পাঠাতে বাধ্য হয় এবং তারই ফলে মন্ত্রীমিশন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আপোষ আলোচনা ক'রে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যবস্থা করেন এবং বহুদিনের দীর্ঘ সংগ্রামের পর কংগ্রেস তার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়।

ভারতের স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, প্রচার ও পার্লামেণ্টারী কাজের পরিচালনায় যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেসের যে প্রয়োজন ছিল, তারও অবসান হল। কিন্তু কংগ্রেস দেশের কাছ থেকে যে মর্যাদা পেয়ে এসেছে, পাছে তার সেই মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে, তাই মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে একেবারে তুলে না দিয়ে, তার নীতি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করলেন। মহাত্মা গান্ধী ৩০শে জানুয়ারী তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন প্রাতে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্রের এক খসড়া রচনা ক'রে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদককে দিলেন।

এই গঠনতন্ত্রের খসড়ায় মহাত্মাজী প্রস্তাব করেছিলেন—কংগ্রেসকে এবার গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন ক'রে জনসেবক সংঘরূপে রূপান্তরিত করতে হবে। কংগ্রেসসেবীরা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের প্রকৃত সেবক হয়ে, লোকের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি অর্জনের সহায়ক হবে। এই সব কর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকেই নেতা ঠিক করবেন, সেই নেতারা আবার একজন সর্বভারতীয় নেতা বেছে নেবেন। তিনিই সকলকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবেন। কর্মীদের খাদি পরিধান, মাদকদ্রব্যবর্জন, সর্বধর্মে সমভাব ও নারী-পুরুষে ভেদমুক্ত এই সব নীতি পালন করতে হবে। কর্মীরা পল্লীবাসীদের কল্যাণে, তাদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও তাদের স্বাস্থ্যপালনে সহায়তা করবে এবং তাদের একটা না একটা রচনাত্মক কাজে নিযুক্ত থাকতে

হবে। নিখিল ভারত চরকাসংঘ, নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগসংঘ প্রভৃতি কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মহাত্মার তিরোধানের পর ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে অধিবেশন বসে, তাতে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথই মূলত গ্রহণ করা হয়।

পরে এই সেদিন ২৪শে এপ্রিল বোম্বাইএ গান্ধীনগরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির যে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়ে গেল, তাতে কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই গৃহীত গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে—

কংগ্রেস কর্মীদের যে সব জাতীয় বা গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে, নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন প্রতিষ্ঠান তা পরে নির্ধারণ করে দেবে। প্রাথমিক কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ গঠন করা হবে এবং তার কার্যকাল থাকবে তিন বৎসর। সদস্যদের নামের রেজিষ্ট্রার থাকবে এবং ২১ বৎসর বয়স্ক সকলেই ভোট দিতে পারবে। নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্যরা এক তৃতীয়াংশের অধিক থাকতে পারবেন না। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সংখ্যা সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষসহ মোট থাকবে ২০ জন।

কংগ্রেসের এই নূতন নীতি গ্রহণ করা হলে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনেই কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য যুগলকিশোর ঘোষণা করেছেন যে, কংগ্রেসের এই গঠনতন্ত্রকে কার্যকরী করতে অবশ্য কিছু সময় লাগবে।

দীর্ঘকাল পরাধীন থাকার পর ভারত আজ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ হলেও দেশের নৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তি এখনও লাভ হয়নি। তাই কংগ্রেস এবার তার নীতির পরিবর্তন ক'রে দেশের আভ্যন্তরীণ গলদ দূর করবার জন্য প্রকৃত জন-সেবক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। যে কংগ্রেস আমাদের আজকের এই ভারতীয় জাতিকে সৃষ্টি করেছে, সেই কংগ্রেসের পতাকার তলে থেকে দেশবাসী যে কংগ্রেসের এই নবতম উদ্যমকে সফল করতে এগিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের এই সুমহান আদর্শ সফল হলে আজকের ভারত আরও উন্নততর হয়ে জগত সভায় সগৌরবে নিজের মাথা তুলে দাঁড়াবে।

মোহন-বীর

মহারাজা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়

শঙ্কা-হরণ নাম যে তোমার
শঙ্কা কোথা বা থাকে।
শঙ্কা হর গো, শঙ্কা-হরণ!
যে জন তোমারে ডাকে।
চির-শঙ্কা যে, শরণ নিয়েছে
তোমারি চরণ-তলে,
তোমার চরণ শঙ্কারে দলে
প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে।
অভয়া-অভয় যুগ্ম নামেতে
বিরাজ সকল ঠাঁই,
যুগল-চরণে যে নেছে শরণ
শঙ্কা তাহার নাই!
এই কথা কহি ধীরে—
সব শঙ্কারে দূর যেন করি
এ-দুটী নয়ন নীরে।
মানবের রূপে দেবতা আশীষে
এসেছিলে ধরা-ধামে,
বিশ্ব-মানব চিরকাল যেন
জয় লভে তব নামে।

মোহন-চন্দ্র! কর্ম্ম-চন্দ্র!
স্নিগ্ধ-আলোকে ভরি
চন্দ্রলোকেতে গেলে কি গো তুমি
ধরাধাম পরিহরি?
যেখানেই থাক, জানি তুমি আছ
এই শুধু সম্বল,
মিথ্যা-কথা এ, শুধু শুধু কহি
এই তো পরম বল।
শ্রীরামচন্দ্র জানকী মাতার
চরণ-সেবার লাগি
মহাবীর সাথে মহাবীর তুমি
যুগল-শ্রীপদ মাগি!
চলে গেছ তুমি তবু তো বন্ধু!
মোরা তো ভালই জানি
ভারত-মাতার যুগ্ম-চরণ
বহু ভাগ্যেতে মানি
হৃদয়ে তোমার ধরে আছ সদা
ওগো বীর, মহাবীর!
আশীষ বরষ আমাদের সবে

যদি বহে আঁখি নীর
অপরের লাগি যেন তাহা বহে
ত্রিকাল-বিজয়ী বীর।
সম্পদে সদা বিপদ ভাবিয়া
সম্পদে রাখি দূরে
বিশ্ব মানবে সম-পদ ভাবি
বংশী বাজালে সুরে।
যে-সুর শুনিয়া সুর-লোক হতে
জয়-ধ্বনি উঠে ধীরে
নীরবে তোমারে সিঞ্চিত করে
মানব নয়ন-নীরে!
ওগো তুমি জয়ী, চিরকাল জয়ী
ত্রিকাল-বিজয়ী বীর
তোমারে অর্ঘ্য প্রদানিছে আজি
বিশ্ব-নয়ন-নীর
ক্ষুদ্র গৃহের নিরালা কোণেতে
বসি এ-বঙ্গ কবি
চিত্তে তাহার ধেয়ানিছে আজ
তোমারই অমর ছবি।

ভারতসরকারের শিল্প ও সরবরাহ সদস্য ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ৬ই এপ্রিল ভারতীয় পার্লামেন্টে যে সরকারী শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, ৭ই এপ্রিল পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক তাহা গৃহীত হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবার পরও ভারতবর্ষকে যে সব বিপদের ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে তন্মধ্যে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতার কথা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দেশে যুদ্ধকালীন ফাঁপাই টাকার চাপ এখনো পুরোপুরি রহিয়াছে, অথচ যুদ্ধের সময় লোকের অর্থাগমের যে সব পথ খুলিয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার অনেকগুলিই বন্ধ হইয়াছে বা বন্ধ হইবার উপক্রম করিয়াছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে সরকার আমদানী নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হইয়াছেন; এদিকে নূতন কলকারখানা না হওয়ায় এবং যন্ত্রপাতির অভাবে পুরাতন কলকারখানাগুলির একাংশ অকেজো হইয়া পড়ায় অন্তর্দ্দেশীয় চাহিদার সহিত পণ্য-উৎপাদনের হার কিছুতেই সমতা রাখিতে পারিতেছে না। ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় এবারও জগৎজোড়া যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিবে, এইরূপ ধারণা বর্ত্তমানে শিল্পপতি ও বিত্তবান শ্রেণীর মনে ক্রমেই সঞ্চারিত হইতেছে। বিশেষ করিয়া এইজন্য শিল্পপতিরা ব্যক্তিগত দায়িত্বে শিল্পপ্রসার বা পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতে সাহস করিতেছেন না।

এছাড়া শিল্প-সম্পর্কে ভারতসরকারের স্পষ্ট কোন নীতি এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এজন্যও শিল্পপতিরা অনিশ্চিত অবস্থায় ঝুঁকি লইয়া শিল্পক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে ইতস্ততঃ করিয়াছেন। বিদেশী সরকারের আমলে যাহাই হইয়া থাকুক, জাতীয় সরকারের আমলে ভারতীয় শিল্প কতটা ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটুকু জানিতে এদেশের ছোট বড় সকল শিল্পপতিই আগ্রহান্বিত ছিলেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এদিক হইতে দেখিলে ভারতসরকারের শিল্পনীতি ঘোষণার সময় ইতিপূর্ব্বেই উপস্থিত হইতেছিল, বর্ত্তমানে এই নীতি ঘোষিত হওয়ায় ভারতীয় শিল্পে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে।

ডাঃ মুখার্জ্জি কর্তৃক উপস্থাপিত শিল্পনীতিতে ভারতের প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করিয়া তিন শ্রেণীর শিল্পে তিনপ্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথম বা 'ক' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা ও রেলপথসমূহকে এবং বলা হইয়াছে যে এই শিল্পগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারী পরিচালনাধীনে থাকিবে। দ্বিতীয় বা 'খ' শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলি সংখ্যায় ছয়টি এবং ইহাদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইবে একটু বিচিত্র ধরণের। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, বিমান, জাহাজ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রাদি (রেডিও রিসিভার সমেত) এবং খনিজ তৈল এই শ্রেণীর শিল্প। বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে দেশে এই সব শিল্পের যে কারখানাগুলি আছে, সেগুলি উপস্থিত দশবৎসর এখনকার মতই বেসরকারী পরিচালনায় পরিচালিত হইবে, ১০ বৎসর পরে পরিবর্ত্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সঙ্গত মনে করিলে এগুলির পরিচালনাভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে অতঃপর এই শ্রেণীর যে সব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, সেগুলি সম্পূর্ণভাবে সরকারী দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে। তৃতীয় বা 'গ' শ্রেণীর শিল্পগুলিকে অবশ্য এখন বেসরকারী পরিচালনা ও মালিকানায় চলিতে দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই শ্রেণীর শিল্পের সংখ্যা ধরা হইয়াছে ১৮টি এবং ইহার মধ্যে লবণ, মোটরগাড়ী ও ট্রাক্টর, মূল রাসায়নিক পণ্যসমূহ, রাসায়নিক সার, ঔষধ, সূতি ও পশমবস্ত্র, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ বা নিউজপ্রিন্ট, খনিজদ্রব্য প্রভৃতি সংক্রান্ত শিল্প এবং জাহাজ ও বিমান ব্যবসা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব শিল্প এখন বেসরকারী পরিচালনাধীন থাকিবে বটে, তবে সরকার দেশের অবস্থা অনুসারে এইগুলির কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং ধীরে ধীরে এগুলির উপরও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করিবেন। এই সঙ্গে যন্ত্রশিল্প ছাড়া কুটির শিল্প সম্পর্কেও সরকারী নীতি ঘোষিত হইয়াছে। ভারতসরকার দেশের কুটিরশিল্প সমগ্রভাবে সমুন্নত করিতে চান এবং শিল্পনীতিতে বলা হইয়াছে যে সমবায়ের ভিত্তিতে কুটির শিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিবার জন্য শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরেট জেনারেলের বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার অধীনে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রাকার শিল্পগুলির জন্য একজন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইবে। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্বও সরকার নিজের হাতে রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সম্প্রতি ভারতে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ঘন ঘন সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় শিল্প প্রচেষ্টা এবং পণ্য উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। এই দুর্ভাগ্য হইতে দেশকে উদ্ধার না করিলে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত যে উত্তরোত্তর অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভারতসরকার তাঁহাদের আলোচ্য শিল্পনীতিতে এই নিদারুণ সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, দেশে পণ্য উৎপাদন বাড়ানো তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যের অনুপূরক হিসাবে তাঁহারা চান মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতির সৃষ্টি করিতে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁহারা গত ডিসেম্বর

মাসে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনে গৃহীত শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে মিলন-সূচক প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পণ্যব্যবহারকারী জনসাধারণের এবং প্রাথমিক পণ্য-উপাদান উৎপাদন-কারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার পর সরকার প্রয়োজনানুযায়ী করনীতি সংশোধনের সাহায্যে লক্ষ্য রাখিবেন—যাহাতে শিল্পে মুনাফা খুব বেশী না হয় এবং এই নিয়ন্ত্রিত মুনাফা হইতে শিল্প পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্ম প্রয়োজনীয় অর্থ সরাইয়া রাখিয়া বাকী টাকা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হইবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার সহিত ইহার প্রভেদ হইবে এই যে—বর্ত্তমানে শ্রমিককে ভৃত্য হিসাবে নিম্নতম পরিমাণ বেতন দিয়া মালিক সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা লুটিবার চেষ্টা করে। এখন হইতে শ্রমিক ভৃত্য না হইয়া মালিকের সহকারীরূপে কারবারের অংশীদার হইবে এবং কারবারের মুনাফার উপর তাহার ন্যায্য দাবী থাকিবে।

মহামনীষী ম্যাক্সিম গোর্কি পৃথিবীর জনসংখ্যাকে ইহুদি, জার্ম্মান, ইংরেজ, তুর্কী প্রভৃতি জাতিতে ভাগ না করিয়া ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে এই দুই শ্রেণীভুক্ত লোকেদের মধ্যে পরস্পরের সহিত কোনই মিল নাই। তাহাদের আচার-ব্যবহার, বেশবাস, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি সবই ভিন্ন প্রকার। গোর্কির এই অভিমত মুদ্রাস্ফীতির চাপে বিপন্ন ভারতবর্ষে সর্ব্বাংশে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সরকার শিল্পনীতি ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু অত্যন্ত আশঙ্কার কথা—এদেশে বিত্তবান বা দরিদ্র কোনশ্রেণীর লোকই তাঁহাদের এই শিল্পনীতিতে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে না। ধনী বা শিল্পপতিরা যে এই নীতি পছন্দ করেন নাই, তাহা শেয়ারবাজারসমূহের অবস্থার ক্রমাবনতি হইতেইস্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। প্রকাশ, ভারতসরকারের শিল্পনীতি ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে বোম্বাইয়ের শেয়ারবাজারে ৮ দিনের মধ্যে শেয়ারসমূহের গড়পড়তা মূল্য শতকরা ১৫ হইতে ২০ ভাগ কমিয়া যায়। (ফ্রী প্রেস জার্ণাল, ৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮) শিল্পপতিদের মতে ভারতসরকার যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্তিগত চেষ্টায় শিল্পসম্প্রসারণের সুযোগ একান্তভাবে কমিয়া গিয়াছে। 'ক' শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির উপর সরকারী পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য সমস্ত শিল্পে সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রণনীতি চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে শিল্পোৎসাহীদের মুনাফার হার অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। 'খ' শ্রেণীর ছয়টি চালু শিল্পপ্রসারের বা পরিচালনার ভার অবশ্য এখনো শিল্পপতিদের হাতে থাকিবে, তবে দশবৎসর পরে সরকার এগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া বিবেচনা করিবার কথা ঘোষণা করায় ব্যক্তিগত শিল্পোন্নয়ন-প্রয়াসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। 'গ' শ্রেণীর শিল্পও নিঃসন্দেহে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইবে এবং এইরূপ বিপুল আর্থিক দায়িত্বযুক্ত শিল্পের ক্ষেত্রে পরিচালকবৃন্দের স্বাধীনতা না থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে মূলধন বিনিয়োগে ইতস্ততঃ করা স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ভারতসরকারের শিল্পনীতি প্রকাশিত হইবার পর হইতে এদেশে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের ব্যাপারে বেশ একটু মন্দাভাব দেখা দিয়াছে।

আবার দরিদ্ররাও সরকারের শিল্পনীতিতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি একদা স্পষ্টভাষায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহের জাতীয়-করণের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দেশের শাসনাধিকার লাভ করার পর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সেই অভিমতের পূর্ণ মূল্য দিতে কার্পণ্য করিবেন, ইহা সত্যই কেহ আশা করে না। ভারত-সরকার 'খ' শ্রেণীর নূতন শিল্পগুলি এবং 'ক' শ্রেণীর শিল্প তিনটিকে নিজেরা পরিচালনা করিবেন বলিয়াছেন। এগুলি প্রায়ক্ষেত্রেই দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্প, কাজেই এগুলির সম্পর্কে সরকারের মনোযোগ প্রকাশে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু 'গ' শ্রেণীর ১৮টি শিল্পই দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এইগুলির জাতীয়করণের কোন ব্যবস্থাই হইল না। প্রকৃতপক্ষে চিনি, ঔষধ, সিমেন্ট, কাপড়,কাগজ প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যক পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প যদি মুনাফাখোর শিল্পপতিদের হাতে থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণের দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া এইসব শিল্পপতি ও ব্যবসাদারদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ক্রমশঃ অধিকতর স্ফীত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধের কল্যাণে এখন আর কাহারও জানিতে বাকী নাই যে ব্যবসাদার বা শিল্পপতিদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই জাতীয়তাবোধ বলিয়া কোন পদার্থ আছে এবং মুনাফা বেশী হইলে দেশের দুর্গত লোককে অত্যাবশ্যক পণ্য হইতে বঞ্চিত করিতে তাহাদের এতটুকু বাধে না। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক কে টি শা'র ন্যায় ব্যক্তিও ভারতসরকারের শিল্পনীতিতে খুসী হইতে পারেন নাই।

সরকারী শিল্পনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ—সরকারী শিল্পনীতিতে সোজাসুজি বা স্পষ্টভাবে কোন নির্দ্দিষ্টনীতি মানিয়া লওয়া হয় নাই। এই অভিযোগের যথার্থ্যতা অবশ্য একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে কিরূপ সঙ্কটজনক অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছে তাহাও স্মরণ রাখা দরকার। যুদ্ধের শেষদিকের তুলনায় সম্প্রতি এদেশে শিল্পপণ্য উৎপাদনের হার কিভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। আবার পণ্য উৎপাদন যখন কমিতেছে তখন দেশের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বৎসরে ৫৫ লক্ষ হারে। বিদেশ হইতে আমদানী এমনিই কম, তাছাড়া ডলার ইত্যাদি বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইহার উপর এখন সারাদেশ জুড়িয়া শিল্পপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সুরু হইয়াছে ব্যাপক সংঘর্ষ। এ অবস্থায় ভারতসরকারকে একরূপ বাধ্য হইয়াই ঘোষিত শিল্পনীতিতে মধ্যপথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পণ্ডিত নেহের প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ভাষণ হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ সরকারের নীতি, তবে উপস্থিত সাময়িক-

ভাবে প্রচলিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়িত্বগ্রহণ ভারতসরকার যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছেন না এবং এইজন্যই প্রচলিত 'খ' শ্রেণীর শিল্প এবং 'গ' শ্রেণীর শিল্পসমূহ হইতে তাঁহারা শিল্পপতিদের অবিলম্বে সরাইয়া দিতে চাহেন নাই। শ্রমিককে কারখানার অংশীদারের মর্য্যাদা দিয়া তাহারা যেমন শ্রমিকশ্রেণীকে দেশের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, তেমনি অধিকাংশ লাভজনক শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা অব্যাহত রাখিয়া তাঁহারা শিল্পপতিদের সন্তুষ্ট করিবারও আশা করিয়াছেন। শিল্পনীতি খুব দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারিত হয় নাই একথা সত্য, তবে বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে সকলকে খুসী করিবার যে দুঃসাধ্য চেষ্টা ভারতসরকার করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি না করিয়াই সারাদেশে এই শিল্পনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগিলে ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের হইবে।

সরকারী শিল্পনীতি সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইলে অনতিবিলম্বে দেশের পণ্য উৎপাদন শতকরা ২০ হইতে ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া শিল্পসদস্য ডাঃ মুখার্জ্জি আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রমিক ও মালিক উভয়ের যুক্তপ্রচেষ্টা ছাড়া এই সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। ডাঃ মুখার্জ্জি বলিয়াছেন, শ্রমিক যাহাতে উপযুক্ত বেতন পায় এবং মূলধন বাবদ আয় যাহাতে ন্যায্য হয়, সে সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শদানের যথোচিত ব্যবস্থা শীঘ্রই অবলম্বিত হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এ বিষয়ে সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থার জন্য সরকার শ্রমিক ও শিল্পপতিদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবেন এবং সর্ব্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যদি একান্ত অসম্ভব হয় তাহা হইলে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার আইন প্রণয়নের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। বলা বাহুল্য, শিল্প সদস্যের এই দৃঢ়তাসূচক ঘোষণার পর সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কে দেশবাসীর অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাব আমরা অবশ্যই আশা করি। পণ্ডিত নেহেরুর ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন জননেতা বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রের পুরোভাগে রহিয়াছেন, একথা সরকারী নীতি সমালোচনার সময় কাহারও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। শিশুরাষ্ট্রে শক্তিমান, বিত্তবান ও সঙ্ঘবদ্ধ শিল্পপতিদের ক্ষমতা কতখানি বিরাট, তাহাও লোকের বুঝা উচিত এবং এখনি শিল্পপতিদের বিরাগ-ভাজন হইলে কর্তৃপক্ষের কত অসুবিধা এবং পণ্যব্যবস্থার অনিশ্চয়তার ফলে দেশের জনসাধারণের কতখানি ক্ষতি অনিবার্য্য তাহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে গত ৭ই এপ্রিল শিল্পনীতি সম্পর্কে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু দেশের প্রচলিত শিল্পকাঠামোর উপর খুব বেশী আঘাত না হানিবার জন্য দেশবাসীর কাছে, আবেদন জানাইয়াছেন। আমাদের মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদনে দেশবাসী ন্যায্য সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধের সহিত সাড়া দিতেছেন না এবং ইহার ফলেই দেশে লক্ষণীয় অস্থিরতা দেখা যাইতেছে। সমগ্রভাবে দেশের স্বার্থেই এই অস্বস্তিকর অবস্থার অবিলম্বে পরিবর্ত্তন ঘটা দরকার।

ভারতে মোটর গাড়ী শিল্প

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর এদেশে মোটর গাড়ী, ট্রাক প্রভৃতির প্রয়োজন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বরাবরই ব্রিটেন আমেরিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতে মোটর গাড়ী ও ইহার যন্ত্রপাতি আমদানী হইয়া থাকে, স্বাধীনতা লাভের পরও যদি এইরূপ পরনির্ভরতা স্থায়ী হয়, তাহা সত্যই দুঃখের বিষয়। ভারতবর্ষে পাকা রাস্তার পরিমাণ বর্ত্তমানে এক লক্ষ মাইলের মত, ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা আড়াই গুণ বাড়াইবার একটি পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে এদেশে মোটর গাড়ীর প্রয়োজন যে আরও বাড়িয়া যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ হাজার, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩৬ হাজার ও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ হাজার মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইবে।

সকলেই জানেন, যুদ্ধের সময় ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প সংগঠনের একটা উৎসাহ দেখা দিয়াছিল এবং ইহার ফলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ বোম্বাইয়ে (প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস্) এবং শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা কলিকাতায় (হিন্দুস্থান মোটরস্)—দুইটি মোটরগাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা গঠনের আয়োজন করেন। ভারতসরকার দেশের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান দুইটিকে কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি এযুগের দুর্লভ জিনিষপত্র জোগাইয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠান দুইটি পূর্ণাঙ্গভাবে না হইলেও এখন অনেকটা সংগঠিত হইয়াছে এবং আশা করা যায় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই উক্ত কারখানার মোটরগাড়ী ও ট্রাক বাজারে পাওয়া যাইবে। ভারতে মোটরগাড়ী শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যাপারে স্বার্থবাদী ব্রিটিশ ও মার্কিণ মোটরগাড়ী নির্ম্মাতারা যে কিরূপ অসহযোগী মনোভাব পোষণ করেন, তাহা ভারতীয় শিল্প মিশনের সহিত লর্ড ন্যাফিল্ড প্রভৃতি শিল্পনায়কদের ব্যবহারেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই সব শিল্পপতি যদিও শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় মোটর গাড়ী শিল্প সংগঠনে সাহায্য করেন, এই সাহায্যের বিনিময়ে শিল্পটিতে কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করিতে তাঁহারা চেষ্টার ত্রুটী করিবেন না। এক্ষেত্রে ভারত সরকার ও ভারতীয় শিল্পপতিগণের উচিত মোটর-শিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উপর হইতে বিদেশী প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিতে এদেশে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কারখানার যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানারও প্রতিষ্ঠা করা। প্রকাশ এ পর্য্যন্ত উপরিউক্ত কারখানা দুইটিতে ২ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আরও ৩ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আসিবার কথা আছে। ইতিমধ্যেই মোটর গাড়ীর কারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে নির্ম্মাণ করিবার ব্যাপক চেষ্টা হওয়া দরকার। সম্প্রতি প্রকাশিত ভারত সরকারের শিল্পনীতিতে মোটর গাড়ী শিল্প 'গ' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং ইহার পরিচালনাভার উপস্থিত বেসরকারী পরিচালকবর্গের হাতে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। জাহাজ, বিমান প্রভৃতির মত এই প্রয়োজনীয় শিল্পটিকেও 'খ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিলেই ভারত সরকার ভাল করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, শিল্পপতিদের পরিচালনাধীনে এই শিল্প যাহাতে দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করিতে পারে, তজ্জন্য এখন ভারত সরকারের উচিত দূরদৃষ্টির সহিত শিল্পটিকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া সাহায্য করা। এই শিল্প যাহাতে ব্যক্তিগত মুনাফা লুটিবার ক্ষেত্র না হইয়া সত্যকার জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাও এখন বিশেষ দরকার।

আশা করা হইয়াছে শ্রীযুক্ত বালচাঁদ হীরাচাঁদ ও শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লার উল্লিখিত মোটর গাড়ীর কারখানা দুটি হইতে বৎসরে ৩০ হাজারের মত মোটর গাড়ী নির্ম্মিত হইবে। ৩।৫।৪৮

বাঙ্গালা দেশের আয়তন বৃদ্ধি—
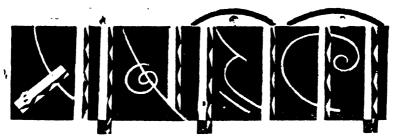
স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব বাঙ্গালা তথা পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বাঙ্গালী—প্রধানত হিন্দুদের, বাঙ্গালী মুসলমানদের সহিত—বসবাস ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠায় পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এত অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে যে বাঙ্গালার আয়তন বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গালীকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের বহু স্থান—বাঙ্গালা ভাষাভাষী ও বাঙ্গালা অধ্যুষিত অঞ্চল গত কয় বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহার ও আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ইংরাজ শাসনের সুবিধার কথা বলিয়া তাহা করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল—বাঙ্গালাকে বিভক্ত করিয়া দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া। ১৯১২ সালে পূর্ণিয়া, ভাগলপুর জেলার অংশ, সাওতাল পরগণা, মানভূম ও সিংহভূমের ধলভূম—বাঙ্গালী অধিবাসীদের প্রতিবাদ সত্বেও বাঙ্গালা হইতে পৃথক করিয়া বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করা হয়। পূর্ণিয়া জেলার তিনটি মহকুমার মধ্যে কিষণগঞ্জ ও সদর মহকুমায় বাঙ্গালা ভাষাভাষীর সংখ্যা অধিক। শুধু আয়ারিয়া মহকুমায় বিহারী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। ভাগলপুর জেলার পূর্ব্বাংশে ঢাকা নামক মহকুমায় কাজরেনী ও কোলাপুর অঞ্চলেও বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। সাওতাল পরগণার দুমকা, গোড্ডা, জামতাড়া, রাজমহল ও পাকুড়—সর্ব্বত্রই বাঙ্গালী অধিবাসী অধিক। ঐ জেলায় অধিকাংশ লোকই বিহারী ভাষা বলিতে বা বুঝিতে পারে না। ঐ জেলার সংলগ্ন হাজারিবাগ জেলার গুমিয়া, বাগোদার ও রামগড় থানায় বাঙ্গালা ভাষাভাষী লোক অধিক বাস করেন। রাঁচী জেলায় ৫টি থানাতেও—বুন্দু, বুকজু, টামার, সিল্লি ও বোয়ো—বাঙ্গালীই অধিক সংখ্যায় বাস করে—ঐ অঞ্চল মানভূম জেলার সংলগ্ন।

সিংহভূম জেলার ধলভূম মহকুমায় অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী বাস করে। উহা এক সময়ে মেদিনীপুরেরই অংশ ছিল। ঐ জেলায় ধলভূম ও সদর মহকুমার মধ্যে সেরাইকেল্লা ও খরসোয়ান রাজ্য দুইটিও বাঙ্গালী অধ্যুষিত প্রদেশ। ঐ স্থানগুলিরও বাঙ্গালার মধ্যে স্থান পাওয়া উচিত। ধলভূমের আদিবাসীরাও স্কুলে বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে। মানভূম জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ১২ লক্ষ লোক বাঙ্গালা ভাষা ও মাত্র ৩ লক্ষ লোক হিন্দী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ভৌগোলিক দৃষ্টিতেও বাঁকুড়া ও মানভূম এক ও অভিন্ন।

এই সকল হিসাব হইতে বেশ বুঝা যায়—উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে বাঙ্গালীরাই বাস করে এবং বাঙ্গালার সংস্কৃতি তথায় পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। এখন গণপরিষদ নূতন করিয়া প্রদেশ গঠন করিবেন। সে সময় যাহাতে উপরোক্ত অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, প্রত্যেক বাঙ্গালী জননায়ক ও চিন্তা-নায়কের সে জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আসাম ও বাঙ্গালা—

আসাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইলেও এবং তাহার নাম আসাম হইলেও ঐ প্রদেশে মাত্র তিনভাগের একভাগ লোক আসমিয়া ভাষা ব্যবহার করে ও দুইভাগ লোক বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করে। বিশেষ করিয়া গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলায় বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক। গোয়ালপাড়া ও কাছাড়কে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিতে বাঙ্গালার পক্ষে গারো পাহাড়, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ও লুসাই পাহাড় পাওয়া আবশ্যক। ঐ তিনটি পাহাড় জেলায় আসামী নাই বলিলেই চলে। ১৯৩১ সালে

কাছাড় জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৩৩৮১১২জন ও আসামীর সংখ্যা মাত্র ২২১৫জন।

কাছাড়ের সহিত যে থানাগুলি শ্রীহট্ট জেলা হইতে র‍্যাড্‌ক্লিফ এওয়ার্ডে বাদ গিয়াছে, সেই থানাগুলিও পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা উচিত। আসামে বর্ত্তমানে বাঙ্গালী-খেদা আন্দোলন হইতেছে ও আসামবাসী বাঙ্গালীদের অসমিয়ারা 'চোখের বালি' বলিয়া থাকে। এই আন্দোলন চলিলে আসাম ও পশ্চিম বাঙ্গালা উভয় প্রদেশই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং উভয় প্রদেশেরই উন্নতির পথ বন্ধ হইবে। আসামের উক্ত অঞ্চলগুলি পশ্চিম বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে পশ্চিম বাঙ্গালা সমৃদ্ধ হইবে ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা হইতে আগত হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীকেই পশ্চিম বাঙ্গালায় স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে। বাঙ্গালার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে এখন এ বিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রদেশ বিভাগ সম্পাদিত হইবে—তৎপূর্ব্বে যেন পশ্চিম বাঙ্গালায় এই দাবীগুলি উপযুক্তভাবে যথাস্থানে পেশ করার ব্যবস্থা হয়—ইহাই আমাদের নিবেদন।

আলমোড়ায় বাঙ্গালীদের বসন্ত উৎসব ফটো—দ্বিজেন মল্লিক

সিংহলে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্র—

১৮ই এপ্রিল সিংহলের রাজধানী কলম্বো সহরে এক উৎসবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত সেনানায়ক ঘোষণা করিয়াছেন যে সিংহলের কম্যুনিষ্টরা গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া সিংহল রাজ্যটি রুসিয়াকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিয়াছেন। সিংহল স্বাধীনতা লাভ করিলেও গৃহ-শত্রুর আক্রমণ এখনও তথায় বন্ধ হয় নাই।

চীনে নূতন সভাপতি—

১৯শে এপ্রিল চীনের রাজধানী নানকিং সহরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চিয়াং-কাই-সেক চীনের গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ২৪৩০ ভোট ও বিপক্ষে ২৬৯ ভোট হইয়াছিল। ওয়াসিংটনস্থ ভূতপূর্ব্ব চীনা রাষ্ট্রদূত ডাঃ হো সিনকে প্রধান মন্ত্রী করা হইবে এই সর্ত্তে চিয়াং সভাপতি-পদ গ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মে কম্যুনিষ্ট দলন—

মধ্য ব্রহ্মের পিনমানা জেলায় কম্যুনিষ্টরা প্রবল হইলে তাহাদের দমন করিতে যাইয়া সরকারী সৈন্যদল ৯০জন ব্রহ্মদেশীয় কম্যুনিষ্টকে হত্যা করিয়াছে ও তাহাদের নিকট হইতে ২শত বন্দুক উদ্ধার করিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র কম্যুনিষ্ট উপদ্রব চলিতেছে—ইহার পরিণতি কোথায়?

কারিগরী শিক্ষা পরিষদ—

গত ২৪শে এপ্রিল বোম্বাই শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কারিগরী শিক্ষা সম্মিলনে স্থির হইয়াছে যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সাহায্যে শীঘ্রই ১৪টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে ও সে জন্য ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। বাঙ্গালা দেশে হিজলীতে পূর্ব্ব আঞ্চলিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইবে—ঐ স্থান বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তেরও নিকটবর্ত্তী। ঐ বিষয়ে যাহাতে সত্বর কাজ আরম্ভ হয়—সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিশ্বসভার অর্থ-নৈতিক সম্মিলন—

বিশ্বসভার (ইউ-এন-ও) উদ্যোগে আগামী ১লা জুন দক্ষিণ ভারতের উতকামুণ্ডে প্রথম পূর্ব্ব-এসিয়া অর্থ-নৈতিক সম্মিলন হইবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাহার উদ্বোধন করিবেন। এসিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় সকলে কি ভাবে অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারেন, সম্মিলনে তাহাই স্থির করা হইবে। তিন সপ্তাহ ধরিয়া সম্মিলনের কাজ চলিবে।

প্রস্তাবিত ক্যান্সার ইনিষ্টিটিউট—

ভারতবর্ষে প্রায় ১০ লক্ষ লোক ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছে—কিন্তু তাহাদের চিকিৎসার কোন ভাল ব্যবস্থা নাই। সেজন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার সুবোধচন্দ্র মিত্র কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সহিত একটি ক্যান্সার চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছেন। ঐ কার্য্যে ৩০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন—গত ৩ বৎসরে ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত ১১ই বৈশাখ হুগলী ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ২৫ হাজার টাকা ঐ কার্য্যের জন্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে প্রদান করা হইয়াছে। হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতা পুলিসের তৎপরতা—

কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগ গত ১ মাসে তিন শত পকেটমারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সেজন্য শিয়ালদহ ষ্টেশন, এসপ্লানেড, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, বড়বাজার প্রভৃতি স্থানে পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ডাকাতি সম্পর্কেও কলিকাতা সহরে ৪১খানি বে-আইনি জিপগাড়ী ও একখানি মোটর সাইকেল সম্প্রতি ধরা হইয়াছে। ইটালী, ট্যাংরা, তালতলা ও চীনাপটীতে ঐ সকল জিপগাড়ী ছিল। গাড়ীর সহিত ৪৪জন লোকও ধৃত হইয়াছে।

চর্ম্মশিল্প গবেষণা মন্দির—

ভারত হইতে বৎসরে ৪ কোটি টাকা মূল্যের কাঁচা চামড়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ঐ চামড়া এ দেশে রাখিয়া কাজে লাগাইবার জন্য মাদ্রাজের গুইণ্ডিতে গত ২৪শে এপ্রিল ভারত সরকারের শিল্প-সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এক কেন্দ্রীয় চর্ম্ম গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহার জন্য এককালীন ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও বার্ষিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ—

বিশ্বসভা কাশ্মীর সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইবে না। কাজেই কাশ্মীর যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করিয়া কাশ্মীর হইতে হানাদারদের দূর করিয়া আবদুল্লার নবগঠিত জনপ্রিয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করার দায়িত্ব ভারত সরকার পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন।

য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরের ছাত্রদের দ্বারা রাজাজীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন

ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

হানাদারদের বিতাড়িত না করা পর্য্যন্ত কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের সম্ভাবনা নাই—কাজে গণভোট গ্রহণ সম্পর্কে বিশ্বসভার সাহায্যদানের প্রস্তাব ভারত সরকার প্রত্যাখ্যান করিবেন। অন্যদিকে যে কোন উপায়ে ভারত সরকার হায়দ্রাবাদকে ভারতের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য করিবেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—

স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা নেতা, ডন সোসাইটীর প্রবর্ত্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই এপ্রিল ৮৩ বৎসর বয়সে কাশীধামে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৯৩ সালে 'ডন' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে জাতীয়তা প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হইলে সতীশবাবু তাহার প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। ৫৫ বৎসর কাল তিনি একভাবে দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন।

ডাক্তার আম্বেদকরের তৃতীয় দল—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আইন-সচিব ডাক্তার বি-আর আম্বেদকর আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার

য়ুনিভার্সিটি কনভোকেশন সভায় কে-এম-মুন্সীর বক্তৃতা
ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

করিতেছেন। সমাজতন্ত্রী কর্ম্মীরা কংগ্রেস ত্যাগ করায় তিনি বলিয়াছেন—তপশীলীদের লইয়া তিনি তৃতীয় দল গঠন করিবেন—কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী দলে বিরোধের সময় তাঁহার তৃতীয় দল প্রবল হইবে ও তিনি যে দলে যোগদান করিবেন, সেই দলকে প্রধান দলে পরিণত করিয়া নিজে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। ইহা তাঁহার দিবাস্বপ্ন কিনা কে জানে।

গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ—

গত ১১ই বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় হাওড়া 'সালিখা হাউসে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের সভাপতিত্বে সালিখা 'গোবর্দ্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের' উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন ও সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় খ্যাতনামা ধনী শ্রীবাবুলাল জালান প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, স্থানীয় মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। সভ্যগণ কর্ত্তৃক 'বিজয়া' ও 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে 'কথা ও কাহিনী' নাম দিয়া সমাজের এক বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সভায় বিতরণ করা হইয়াছে। ইহাতে সমাজের ৩৭ বৎসরের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম—তাহাদের উৎসব বিরাট ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী—

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরের খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী গত ২৫শে এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে ঠুংরী গানে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। সঙ্গীতকে তিনি জীবনে সাধনারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি—

গত ২৬শে এপ্রিল ওয়াসিংটনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনানী-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ওমর ব্রাডলে বলিয়াছেন—যুদ্ধের আশঙ্কা গত তিন মাস অপেক্ষা আজ অধিক বাড়িয়াছে। শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আমরা ভীত হইয়াছি। রুসিয়ার ভয়ে সকল দেশ ভীত হইয়াছে ও রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আমেরিকা রণসজ্জা করিতেছে।

ছাত্রগণকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গের কলেজের ছাত্রদের লইয়া কতকগুলি দল গঠন করিবেন ও ছাত্রদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিবেন—একজন করিয়া অধ্যাপকের অধীনে ৩০জন করিয়া শিক্ষার্থী থাকিবে। যাদবপুর

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ, বেলগেছিয়া আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ, হুগলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, বর্দ্ধমান, জলপাইগুড়ি, হাওড়া ও শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্ররাও সুযোগ পাইবে। কলিকাতা কলেজের ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইবে। স্কুলের ছাত্রগণও শিক্ষার্থী হিসাবে গৃহীত হইবে। আপাততঃ

খড়দহে শত শ্রীখোল উৎসবে সম্মানিত অতিথিগণ

১০০ স্কুল শিক্ষক ও ৫১জন কলেজ-শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৫ই মে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। মোটের উপর এ বিষয়ে সত্বর কার্য্যারম্ভ করা প্রয়োজন ও দেশে বহু লোককে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষাদান আজ বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

খড়দহে শত শ্রীখোল উৎসব—

গত ২২শে চৈত্র রবিবার ২৪ পরগণা জেলার শ্রীপাট খড়দহে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বাসভবনে দক্ষিণেশ্বরবাসী ৺মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত শত শ্রীখোল উৎসবের চতুর্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে প্রায় দেড়শত কীর্ত্তনীয়া তাঁহাদের মৃদঙ্গ ও দল লইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলা ২টায় তথায় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বৈষ্ণব সভায় নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও শিক্ষা সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দান করিয়াছেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করেন ও কয়েকশত ভক্তকে প্রসাদ দান করা হইয়াছিল।

বস্ত্রাভাব—

২৮শে এপ্রিল বাঙ্গালায় কাপড়ের কলওয়ালা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় এক বক্তৃতায় এদেশে বস্ত্রাভাব ও তাহার প্রতীকারের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—দেশে বহু নূতন কাপড়ের কল তৈয়ার হইতেছে—কিন্তু নানা কারণে তাহাদের কাজ অগ্রসর হইতেছে না। কাজেই লোককে বস্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে

সংযমী হইতে হইবে। কণ্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ায় কাপড়ের দাম বাড়িয়াছে—এ অবস্থায় লোক যথাসম্ভব বস্ত্রক্রয় বন্ধ রাখিলে কাপড়ের দাম কমিয়া যাইবে। আর একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য—দেশে মিহি কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়াছে—কিন্তু মোটা কাপড় প্রচুর উৎপন্ন হয়। সেজন্য এখন কিছুকাল লোককে মোটা কাপড় পরিয়া দিন কাটাইতে হইবে। ক্রেতারা সাবধান হইলে আর চোরা-বাজারে কাপড় বিক্রয় সম্ভব হইবে না। শ্রীযুত রায় এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া কাজ করিলে লোকের মন হইতে আশঙ্কা চলিয়া যাইতে পারে।

পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীহরিপদ ভৌমিক। তদন্তের ফলে কি হয়, তাহার জন্য জনসাধারণ সাগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

কলিকাতায় প্লেগ ও কলেরা—

গত এপ্রিল মাসের প্রথম হইতেই কলিকাতা সহরে ব্যাপক প্রেগ ও কলেরা দেখা দিয়াছে। স্বাস্থ্য বিভাগের চেষ্টায় প্লেগ অধিক বিস্তৃত হয় নাই বটে, কিন্তু কলেরায় প্রত্যহ বহু লোক মারা গিয়াছে। নানাস্থান হইতে আশ্রয়-প্রার্থী আসায় কলিকাতা সহরের লোক সংখ্যা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে—তাহাদের জন্য প্রচুর জল সরবরাহের ব্যবস্থা নাই—ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থাও সন্তোষজনক নহে। তাহার উপর খাদ্যাভাবে লোক অখাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ স্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষ সহর হইতে লোক সরাইয়া গ্রামাঞ্চলে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা না করিলে কলিকাতা সহরকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা কঠিন হইবে।

দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সম্প্রসারণ কমিটীতে শ্রীরাজাগোপালাচারী

কর্পোরেশন তদন্ত কমিটী—

কলিকাতা কর্পোরেশনের অব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উপযুক্তভাবে পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ৩জনকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস—সভাপতি (২) বাঙ্গালার অবসরপ্রাপ্ত একাউণ্টেট জেনারেল শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী ও (৩) মাদ্রাজের অবসরপ্রাপ্ত

পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যাবস্থা—

গত ২৮শে এপ্রিল হইতে দিল্লীতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশের খাদ্য-মন্ত্রীরা সমবেত হইয়া খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ঐ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্যাবস্থাকে আশঙ্কাজনক বা আশাপ্রদ কোনটাই বলা যায় না। আউস ধান কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে, তাহার উপর অবস্থা অনেকটা নির্ভর করে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিমাণ লোক আসিতেছে, তাহাতে এখানকার খাদ্যাবস্থা বহুদিন অনিশ্চয় অবস্থায় থাকিবে—ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ না করিলে বাঙ্গালা দেশে খাদ্যাভাব দূর করা সম্ভব হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে অধিক খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বিপুল চেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয় করা প্রয়োজন।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র জন্ম-বার্ষিকী—

গত ১৫ই বৈশাখ বুধবার কলিকাতা শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের ১০৭তম জন্ম-বার্ষিক উপলক্ষে গভর্ণর শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ও সভাপতি প্রভৃতির বক্তৃতার পর গিরিশ সংঘের সম্পাদক শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন—গিরিশ-চন্দ্রের বাগবাজার ১৩নং বসুপাড়া লেনস্থ বাসভবন রাজপথ নির্ম্মাণের জন্য ভাঙ্গার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ গৃহের সহিত মহাকবির জীবনের বহু স্মৃতি জড়িত। কাজেই উহা রক্ষা করার ভার পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আমরা ভূতনাথবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করি ও আশা করি এ বিষয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর

পরিচ্ছন্ন কলিকাতা আন্দোলন—

কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুত প্রণব সেন গত ২৯শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতা সহরকে পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আন্দোলন

ও কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বৃহত্তম মহানগরী কলিকাতার রাস্তা ঘাটের অপরিচ্ছন্ন অবস্থা সত্যই শোচনীয়। স্থানে স্থানে ডাষ্টবিন উপচাইয়া ময়লা বাহিরে পড়িয়া থাকে, কোথাও ফুটপাথের উপর বিক্ষিপ্ত কলার খোলা অসতর্ক পথিকের বিপদ ঘটাইতেছে—ইহা হইল সর্ব্বদার ঘটনা। কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালক শ্রীযুত এস এন রায় এ বিষয়ে শ্রীযুত প্রণব সেনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। জনগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারিলেই কলিকাতার অপরিচ্ছন্নতা দূর হওয়া সম্ভব।

আন্তডোমিনিয়ন বৈঠকের পূর্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট, পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, কুচবিহার ও ত্রিপুরার সদস্যবৃন্দের ঘরোয়া সম্মেলন

মন্ত্রিদের খাস কারবার—

ব্রহ্ম সরকার আদেশ দেন—যাঁহারা মন্ত্রির পদগ্রহণ করিবেন তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব কোনও কারবারের সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবেন না। আমাদের মতে এই নিয়মটী রাষ্ট্রের পক্ষে হিতকর। ইহা না হইলে, মানুষের স্বভাব অনুযায়ী এই সকল কারবার মন্ত্রীদের অহেতুক কৃপালাভ করিবার সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া নিজের কারবারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ কাজে অবহেলা করাই স্বাভাবিক। একেই ভারতীয় শাসনযন্ত্রের নানা স্থানে দুর্ব্বল লোক আসন পাইয়া উহার মর্য্যাদাহানির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার পুনরভিনয় পশ্চিম বাঙ্গালা সরকারের মধ্যে দেখা দেয়, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। আমরা মনে করি এই দুধ ও তামাক "খাওয়া" নীতি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম বাঙ্গালা সরকার ভারতবর্ষে আদর্শ স্থাপন করিবেন। ব্রহ্ম সরকার যাহা করিতে পারিয়াছেন, বাঙ্গালা সরকার তাহা না পারিলে জগতের নিকট আমাদের মাথা হেঁট হইবে।

রাজনীতিকগণকে সাহায্য দান—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন বিভিন্ন শ্রেণীর নির্য্যাতীত অসহায় রাজনীতিক কর্ম্মী বা তাঁহার পরিবারকে মাসিক বৃত্তি ও ভাতা এবং এককালীন অর্থ সাহায্য করা হইবে। এই বৃত্তি, ভাতা বা এককালীন সাহায্যের

পরিমাণ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বনিম্ন বা সর্ব্বোচ্চ কোন হার নির্দ্দিষ্ট করিতে চাহেন না—কারণ প্রত্যেক আবেদনকারীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে দেয় ঐ সাহায্যের পরিমাণ স্থির করা হইবে।

শ্রীমতী সুহাসিনী সেন—

নাগপুর ন্যাশনাল কলেজের ইংরাজির অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুহাসিনী সেন এবার নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্যা নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন। এই প্রথম বাঙ্গালী মহিলা এই সম্মান পাইলেন এবং তিনি কোর্টের সর্ব্বকনিষ্ঠা সদস্যা। তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী আদরিণী সেনও নাগপুর এস-বি-সিটি কলেজের অধ্যাপিকা।

শিশু নৃত্য-শিল্পী—

সম্প্রতি কলিকাতায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে শিশু নৃত্য শিল্পী শিখারাণী বাগ শ্রীকৃষ্ণের লাস্য নৃত্য দেখাইয়া সমবেত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। বালিকার বয়স মাত্র চারি বৎসর; এত অল্প বয়সে এইরূপ উচ্চাঙ্গ নৃত্য সচরাচর দেখা যায় না।

কুমারী শিখারাণী বাগ

মথুরাপুর সেবাশ্রম—
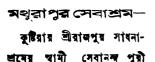
কুষ্টিয়ার শ্রীরামপুর সাধনাশ্রমের স্বামী সেবানন্দ পুরী বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গত জন্মতিথিতে ২৪পরগণা জেলার মথুরাপুরে নূতন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথায় বালিকা বিদ্যালয়, ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে ধর্ম্মসভার অনুষ্ঠান করিয়া ঐ অঞ্চলে নূতন আদর্শ প্রচার করিতেছেন।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

কলিকাতা বেলিয়াঘাটা ৪২নং তালপুকুরনিবাসী স্বর্গত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অপরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে সরকারী বৃত্তি লইয়া

তিনি বিলাত যান ও ৪ বৎসর পরে ফিরিয়া রেলে উচ্চপদ লাভ করেন—পরে তিনি চিফ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার হন ও কিছুদিন কাঁচড়াপাড়া কারখানার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হন। তিনি জনপ্রিয়তা ও কর্ম্মনিষ্ঠার জন্য সর্ব্বজন-পরিচিত ছিলেন।
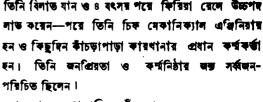
ডাক্তার গণপতি পাঁজা—

কলিকাতাস্থ ট্রপিকাল মেডিসিন স্কুলের জীবাণুবিদ্যা ও রোগনিদানের অধ্যাপক চিকিৎসা শাস্ত্রে নূতন গবেষণার

ডাঃ গণপতি পাঁজা

জন্য এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কোট্‌স মেডেল' লাভ করিয়াছেন। তিনি চর্ম্মরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ এবং কলিকাতায় একটি চর্ম্মরোগের হাসপাতাল ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন।

শিক্ষকের সম্মান—

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবার কবিশেখর শ্রীযুত কালিদাস রায় মহাশয়কে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। কালিদাসবাবু প্রবীণ শিক্ষক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক। এই সম্মান অতি নগণ্য হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কার্য্যে সকলে

প্রীত হইবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বহু পণ্ডিত ও মনীষীকে এখনও সম্মানিত করেন নাই! কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুত রাজশেখর বসু, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মত ব্যক্তিদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিলে তাঁহাদের সম্মান যত বাড়িবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব তদপেক্ষা অধিক হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার

বাঁকুড়ায় অধিবাসী সম্মিলন—

গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল বাঁকুড়া জেলায় রাণীবাঁধ থানার অন্তর্গত বুড়িস্থান গ্রামে ঐ জেলার আদিবাসী মহাসভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার অর্দ্ধেকের অধিক অধিবাসী আদিবাসী। মেদিনীপুর, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি হইতেও প্রায় ১০ হাজার আদিবাসী ঐ সম্মিলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আদিবাসী জাতির রাষ্ট্রজীবন, অর্থনীতিক জীবন ও সমাজ জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয় তথায় আলোচিত হইয়াছে। স্থানীয় স্পেশাল অফিসার শ্রীসুধীরকুমার ভট্টাচার্য্য সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আদিবাসীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কেমন করিয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে নিজেদের উন্নতি করিতে পারা যায়। আদিবাসীরা বুঝিয়াছে, বাঙ্গালী জাতির সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টা না করিলে তাহাদের উন্নতি সম্ভব হইবে না।

পরলোকে কমলা দেবী—

ব্যারিষ্টার ডাঃ সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্তের সহধর্ম্মিণী কমলা দেবী গত ৬ই চৈত্র কর্কট রোগে মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে

৺কমলা দেবী

পরলোক গমন করিয়াছেন। কমলা দেবী দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। গত যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের সেবায় ও দুর্ভিক্ষের সময় স্বহস্তে রন্ধন দ্বারা বুভুক্ষুদের অন্নদানে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী যুবকদের অস্ত্র শিক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের আই-বি বিভাগের ডি-আই-জি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার ১১ই এপ্রিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, দক্ষিণ কলিকাতার বাঙ্গালী যুবকগণকে বন্দুক চালনা শিক্ষা দিবার জন্য একটি রাইফেল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে অন্য সম্প্রদায়কে এ শিক্ষা দেওয়া হইত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের বন্দুক-চালনা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

যাদুকর পি-সি-সরকার—

গত বৎসরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ষ্টেজ ম্যাজিকের জন্য প্রসিদ্ধ ভারতীয় যাদুকর শ্রীযুত পি-সি-সরকারকে এবার নিউ ইয়র্ক হইতে 'ফিনিক্স মেডেল ১৯৪৮' প্রদান করা হইয়াছে।

যাদুকর পি-সি-সরকার

এবার এই পৃথিবী প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন হলাণ্ডের প্রসিদ্ধ যাদুকর ওকিটো সাহেব। ভারতের বেদিয়াদের ম্যাজিক বিশ্বের বিস্ময় ছিল—কিন্তু যাদুকর সরকার ষ্টেজ ম্যাজিকেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

গঙ্গার উপর বাঁধ নির্ম্মাণ—

দেশ বিভাগের ফলে যাতায়াতে কয়েকটি অসুবিধা হওয়ায় তাহা দূর করিবার জন্য ভারত সরকার গঙ্গা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত বাঁধ দ্বারা কলিকাতা ও গঙ্গার মধ্যে সর্ব্ব ঋতুতে ও সরাসরিভাবে যাতায়াতের একটি নৌ-পথ পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া উত্তর-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে বহু অনাবাদী জমী পড়িয়া আছে, তাহাও চাষযোগ্য হইবে। বাঁধ দ্বারা নিম্নলিখিতরূপ উপকার হইবে—(১) অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া একটি রেলপথ ও সেতু নির্ম্মাণ করা যাইবে। বাঁধ না বাঁধিয়া সেতু নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে (২) মৃতকল্প ভাগীরথী নদী এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলায় এই নদীর হাজামজা শাখাগুলিতে জল সরবরাহ করা যাইবে ও সেচের ব্যবস্থা হইবে। সেচের প্রধান লক্ষ্য হইল এই তিনটি জেলার পতিত জমিগুলিকে চাষযোগ্য করা। ইহাতে পূর্ব্ব বঙ্গের উদ্বাস্তগণের পুনর্বসতিরও বহুলাংশে সহায়তা হইবে। (৩) কলিকাতা বন্দরের উপকারের জন্য হুগলী নদীতে জল সরবরাহের উন্নতি করা যাইবে। কলিকাতা বঙ্গোপসাগরের মুখ হইতে ৯০ মাইল দূরে বলিয়া জেটি ও মধ্যবর্ত্তী জলধারার উপরই কলিকাতা বন্দরের অস্তিত্ব নির্ভর করে। (৪) কলিকাতা ও গঙ্গার মধ্যে সমস্ত ঋতুতেই সরাসরিভাবে নৌ-চলাচল করিতে পারিবে।

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এখন বস্তুতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা ও পাটনার (দিঘা) মধ্যে নিয়মিত জাহাজ চলাচল করে বটে, কিন্তু নদীয়ার নদীগুলি (ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও চুর্ণী) বৎসরের মধ্যে ৮ মাস শুষ্ক থাকে বলিয়া কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব পাকিস্থানের মধ্য দিয়া সাড়ে ৫ শত মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়। বর্ত্তমান পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হইবে ও নদীপথে ভারী মাল অল্প ব্যয়ে প্রেরণ করা যাইবে।

রহড়া বালকাশ্রমে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব

ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

রাজস্থান রাষ্ট্রসংঘ—

গত ১৮ই এপ্রিল পণ্ডিত জহরলাল নেহরু উদয়পুরে রাজস্থান রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, উদয়পুরের ৩৩

বৎসর বয়স্ক মহারাণা সংঘের রাজপ্রমুখ হইয়াছেন এবং কোটা, বুন্দী ও ডুঙ্গরপুরের শাসকগণ সহরাজপ্রমুখ হইয়াছেন। এই রাষ্ট্রসংঘ আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—৩০ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ৪২ লক্ষ ও বার্ষিক আয় তিন কোটি টাকা। ১০টি দেশীয় রাজ্য এই সংঘে যোগদান করিয়াছে। গণপরিষদের সদস্য শ্রীযুত মাণিক্যলাল বর্ম্মা সংঘের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

দমদম বিমান ঘাটিতে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি
ফটো—অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়

স্কুল শিক্ষার উন্নতি বিধান—

পশ্চিম বাঙ্গালায় স্কুল শিক্ষার উন্নতি বিধানের উপায় স্থির করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতি। জনাব তাগাহক আমেদ, ভাইস চ্যান্সেলার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডাঃ জি-চক্রবর্ত্তী, অনিলকুমার চন্দ, অপূর্ব্বকুমার চন্দ, হরিদাস গোস্বামী, কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীমতী সুজাতা রায়, ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন (শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী, নগেন্দ্রনাথ সেন (শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল) ত্রিগুণাচরণ সেন (যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপাল)—সদস্যগণ। শ্রীক্ষেত্রপাল দাসঘোষ—সম্পাদক।

দিল্লীতে বিজ্ঞান মন্দির—

১৯শে এপ্রিল পণ্ডিত জহরলাল নেহরু দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান ইনিষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ইনিষ্টিটিউটের সভাপতি হইলেন। নূতন মন্দিরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা মানুষের দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টা হইবে।

আসাম ও বাঙ্গালা—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রায় ২ লক্ষেরও অধিক লোক আসামে গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী। আসামে প্রতি বর্গ মাইলে মাত্র দেড়শত লোক বাস করে—সুতরাং তথায় এখন বহু লোককে বাস করিতে দেওয়া যায়। আমাদের সমতল অঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রায় ১ কোটি একর অনাবাদী জমী আছে। আসাম গভর্ণমেন্টের কৃষি ও রাজস্ববিভাগ এই সংবাদ দিয়াছেন। কিন্তু এত পতিত ও অনাবাদী জমী সত্বেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের তথায় বাসের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। এ সময়ে আসাম গভর্ণমেন্ট এমন কতকগুলি নিয়ম করিয়াছেন, যাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের অমুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের আসামে বসবাস করা অসম্ভব হইয়াছে। আসাম গভর্ণমেন্টের এই মনোভাবে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের ও কংগ্রেসের প্রতীকার-ব্যবস্থা করা উচিত।

পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালাই রাষ্ট্রভাষা—

৮ই এপ্রিল ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের প্রস্তাবে স্থির হইয়াছে—(১) পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে ইংরাজির স্থলে বাঙ্গালাই সরকারী ভাষা বলিয়া গণ্য করা উচিত ও (২) শিক্ষায়তনগুলিকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে যথাসম্ভব বাঙ্গালা ভাষা বা অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে -বাস্তব অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইলেই এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করা হইবে।

বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা সমস্যা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের ২২জন সদস্য গত ২২শে এপ্রিল দলপতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট পত্র লিখিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি কংগ্রেস দলের সভায় উত্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন—"যেহেতু বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভায় বাহিরের লোক আছেন, সেই হেতু উহা মূলতঃ কংগ্রেসভাবাপন্ন নহে এবং যেহেতু কংগ্রেসের লক্ষ্য ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে, তাহাতে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পদপ্রার্থীদের সাফল্য বিঘ্নিত হইতেছে এবং যেহেতু উহা ব্যাপকতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সেই হেতু আমরা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের নেতৃত্বে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি।" ডাক্তার রায় ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ৫ই মে বুধবার বিকাল ৪টার সময় তাঁহার গৃহে (৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট) দলের এক সভা ডাকিয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত হইয়া উক্ত ২২জন সদস্য তাঁহাদের প্রেরিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। উক্ত সদস্যদের নাম—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মোহিনীমোহন বর্ম্মণ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, দেবেন সেন, বঙ্কু-বিহারী মণ্ডল, অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যজ্ঞেশ্বর রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ,— কানাইলাল দে, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু নস্কর, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, হেমচন্দ্র নস্কর, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, বিমলকুমার ঘোষ, জে-সি-গুপ্ত, অরবিন্দ গায়েন, কুবের হালদার, শ্রীমতী বীণাদাস ভৌমিক ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হইলে সভার কার্য্য বন্ধ হয়। পরিষদ দলের অপর ৩১জন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন যে ২২জন সদস্যের প্রস্তাবে যে ইঙ্গিত আছে, তাহার সহিত তাঁহারা একমত নহেন। ঐ ৩১জন সদস্যের নাম—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাব, শ্রীআশুতোষ মল্লিক, কমলকৃষ্ণ রায়, হেমন্তকুমার বসু, সতীশচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র মোহান্তি, হরেন্দ্রনাথ দলুই, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, রজনীকান্ত প্রামাণিক, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, আনন্দীলাল পোদ্দার, কানাইলাল দাস, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, বসন্তলাল মুরারকা, নিশাপতি মাঝি, ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, রাধানাথ দাস, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, কালীপদ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও সুকুমার দত্ত। এই ৩০জন ছাড়া ডাক্তার রায় একজন। সভায় তিনজন সদস্য উপস্থিত হন নাই—তন্মধ্যে শ্রীঈশ্বরদাস জালান ও শ্রীভূপতি মজুমদার—দুইজন বিবাদের সময় নিরপেক্ষ থাকায় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ডাঃ রায়কে পত্র দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য অসুস্থ বলিয়া সভায় আসিতে পারেন নাই—তিনিও ডাক্তার রায়ের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে ডাক্তার রায়ের গৃহে দলের আর একটি সভা হয়। তাহাতে ৪৬জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের উপর দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তা মনোনয়নের ভার দেওয়া হইয়াছে।

বুধবার সভার পর রাত্রিকালে ডাক্তার রায় প্রদেশ পাল শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদত্যাগ করেন। পরদিন আবার তাঁহাকেই নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করিতে আহ্বান করা হইলে তিনি নিম্নলিখিত ১০জনকে লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন— (১) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (২) শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার (৩) শ্রীকিরণশঙ্কর রায় (৪) রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (৫) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (৬) শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (৭) শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ (৮) শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি (৯) শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার ও (১০) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার সদস্য শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মণ ডাক্তার রায়ের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করায় ও শ্রীভূপতি মজুমদার মন্ত্রী হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাঁহাদের নূতন মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয় নাই।

আন্তঃ ডোমিনিয়ান চুক্তি—

ওরা মে ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকার এক যুক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—১৯শে এপ্রিল তারিখে কলিকাতায় যে আন্তঃ-ডোমিনিয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিবার পর

ভারত সরকার ও পাকিস্থান সরকার এই কথা ঘোষণা করিতে চাহেন যে, তাঁহারা ঐ চুক্তি অনুমোদন করিয়াছেন এবং উভয় ডোমিনিয়নে ঐ চুক্তি কথায় ও কাজে তাঁহারা পালন করিবেন।

স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—

৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের কার্য্যারম্ভ করিয়া স্বর্গত সুধী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার দান চিরদিন বঙ্গভাষাভাষীদিগকে আনন্দ দান করিবে। সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল, সর্ব্বোপরি কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথা বাঙ্গালী কোন দিন বিস্মৃত হইবে না। আজ দেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর তাঁহাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করার সময় আসিয়াছে—কারণ জাতীয়তা প্রচারক দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীন জাতির জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমরা এই সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর পরে তাঁহার অমর দানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করি।

ভারত-পাকিস্থান চুক্তিনামা—

৫ দিন ধরিয়া কলিকাতায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক বসিয়াছিল এবং তাহা গত ১৯শে এপ্রিল শেষ হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠগণের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্ন সম্বন্ধে রচিত এক চুক্তিনামায় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ও পাকিস্থান প্রতিনিধিবর্গের নেতা মিঃ গোলাম মহম্মদ স্বাক্ষর করেন। উভয় পক্ষই এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ব্যাপক বাস্তু ত্যাগ কোন রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল নহে। উভয় রাষ্ট্রই সংখ্যালঘিষ্ঠদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের বাস্তু ত্যাগ প্রশমিত ও বাস্তুত্যাগীদের প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য সত্বর সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আরও ঠিক হইয়াছে সংখ্যালঘিষ্ঠদের পক্ষ হইতে যে ক্ষেত্রে এরূপ অভিযোগ করা হইবে যে, অনাচার ও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে তাঁহাদের আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কার্য্য করা হয় নাই, সে ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং সে বিষয়ে সত্বর প্রতীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রে কোন সরকারী কর্ম্মচারী সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, তাহা হইলে দৃষ্টান্তস্থানীয় কঠোর শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইবে। উভয় বঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ও বাস্তুত্যাগীদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বোর্ড গঠনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থিতাবস্থা চুক্তির বিরতির পরের অবস্থায় যাত্রী ও দ্রব্যাদির চলাচল সম্পর্কে অর্থনৈতিক কারণে আরোপিত বাধা নিষেধের ফলে জনসাধারণকে যে সকল দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা বন্ধ করার জন্য উভয় রাষ্ট্রই কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে অপর রাষ্ট্রকে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহের উদ্দেশে একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত করিতে হইবে। এই সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, তাজা ফল, সবজী, দুধ, দুগ্ধজাতদ্রব্য, হাঁস মুরগী, ডিম, স্থানীয় থালিপাত্র, বাঁশ, জ্বালানী কাঠ প্রভৃতি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চলাচল সম্বন্ধে যে বাধা নিষেধ ও শুল্ক বসান হইয়াছে, তাহা দূর করা হইবে। ভারত সরকার পূর্ব্ববঙ্গে সরিষার তৈল সরবরাহের ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন। যতদিন এ সকল বিষয়ে আলোচনা শেষ না হয়, ততদিন পাকিস্থান রাষ্ট্র বিনাশুল্কে পশ্চিম বাঙ্গলায় টাটকা ও শুষ্ক মৎস্য অবাধে চালান করিতে দিবেন। ডাক, তার, টেলিফোন প্রভৃতির হার, যাত্রী ও তাহাদের মালপত্র অনুসন্ধান প্রভৃতি সম্পর্কেও আবশ্যক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চুক্তিনামায় যে সকল সর্ত্ত স্থির হইয়াছে সে গুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উভয়েই আবশ্যক ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতবর্ষস্থ পাকিস্থানী হাই কমিশনার খাজা সাহাবুদ্দীন ও পাকিস্থানস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ উভয়েই ঐ চুক্তি সম্পর্কে পূর্ণ সহযোগিতা করিবার আশ্বাস দিয়াছেন। এইভাবে যে আপোষ হইল, ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের জনসাধারণ উপকৃত হইলে দেশের উন্নতিবিধান সম্ভব হইবে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব—

পশ্চিম বাঙ্গালায় সম্প্রতি দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। চাউল ছাড়া তরিতরকারী, দুধ, মাছ, ফলমূল প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য। তাহার কোনটিই এখন এদেশে পাওয়া যায় না। গত যুদ্ধের পর হইতে কৃষির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতেছে। তরিতরকারী এদেশে অপ্রচুর—কারণ চাষের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে ও খাইবার লোক বাড়িয়াছে। দুধ এক টাকা সের—মাছের সের সাড়ে তিন টাকা। ফলের বাগান আর কেহ করে না—কাজেই গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জামরুল প্রভৃতি ফল আর পাওয়া যায় না। সরিষার তেল দুই টাকা সের—ডাল এদেশে কম হয় বলিয়া প্রায় সকল ডাল এক টাকা সের। এ অবস্থায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না করিলে পশ্চিম বাঙ্গালার লোক বাঁচিবে না। পূর্ব্ব-বাঙ্গালা হইতে হয় ত ৫০ লক্ষ লোক পশ্চিম বাঙ্গালায় আসিয়াছে—অধিকাংশ লোক নানা কারণে সহর ও সহরতলীতে বাস করিতেছে—কেহ গ্রামে যাইতে চাহে না। সরকারী ব্যবস্থাও এদিকে অপ্রচুর। লোককে জোর করিয়া সহর বা সহরতলী হইতে গ্রামে ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এইভাবে চলিলে নানা ব্যাধিতে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাইবে।

ভারতের পরবর্ত্তী বড়লাট—

বিলাতের বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ১৯৪৮ সালের ২১শে জুন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কর্ম্ম ত্যাগ করিলে সেই পদে পশ্চিম-বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ—

গত ২৪শে এপ্রিল ভারতের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুত জগজীবন রাম ইন্দোরে এক সম্বর্দ্ধনা সভায় বলিয়াছেন—"আমরা পুঁজিপতিদের শত্রু নহি, তবে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেশ হইতে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।" শ্রীযুত জগজীবন রাম তাঁহার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে কতটা সফল হইবেন জানি না—তবে আজিকার দিনে ধনিক-শ্রমিক বিবাদ যখন চরম অবস্থায় উপনীত—তখন একথা সর্ব্বদা ঘোষণা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে।

শিক্ষার মাধ্যম স্থির—

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য ভারতের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারগণ এবং ডক্টর এস-এস-ভাটনগর ও ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া ভারতসরকার যে কমিটী গঠন করিয়াছিলেন গত ১লা ও ২রা মে দিল্লীতে তাহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতসরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ডক্টর তারাচাঁদ কমিটীর সভায় সভাপতিত্ব করেন। স্থির হইয়াছে যে আরও ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজি ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইবে। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রভাষার উন্নতি বিধানের ও ব্যবস্থা চলিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

অলিম্পিক ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

লণ্ডনে বিশ্ব-অলিম্পিক গেমসের ফুটবল খেলায় ভারতীয় ফুটবল দল যে যোগদান করবে তা একরূপ ঠিক হয়ে গেছে। সম্প্রতি দলের খেলোয়াড় মনোনয়ন কাজও শেষ হয়েছে। ক'লকাতায় মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল সম্মিলিত দলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ফুটবল খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত অলিম্পিক দলের একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। অলিম্পিকগামী ভারতায় ফুটবল দলকে আর্থিক সাহায্যদানের জন্যই এই খেলাটি চ্যারিটি করা হয়। খেলায় আশাতীত দর্শক সমাগম হয়েছিল কিন্তু খেলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিক থেকে সকলকে হতাশ হ'তে হয়েছে। খেলায় মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল সম্মিলিত দল ২-১ গোলে অলিম্পিক দলকে পরাজিত করে। অলিম্পিক দলের গুরুত্ব এই কারণে বেশী ছিল যে, সেদিনের খেলায় অলিম্পিক নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে এগারজন খেলোয়াড়ই অলিম্পিক দলে যোগদান করেছিল; অন্যদিকে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল দলে মাত্র একজন অলিম্পিক খেলোয়াড় খেলেছিল। খেলায় ২-১ গোলে পরাজিত হয়েছে বলেই আমরা অলিম্পিক দলের খেলায় হতাশা জ্ঞাপন করছি না। দলগত এবং ব্যক্তিগত খেলায় বিচার করার পর অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় দলের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে এতগুলি কথা লিখতে বসেছি। সত্য বলতে কি, আমাদের দেশের ফুটবল খেলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড অলিম্পিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সমান নয়, কি খেলোয়াড়দের দৈহিক শক্তি ও গঠন সৌষ্ঠবে কি খেলার দক্ষতায় দিক থেকে। প্রদর্শনী খেলায় এই দুইদিক থেকেই আমরা বারবার সে অভাব অনুভব করেছি। বলতে কি ফুটবল খেলা বাংলা দেশে জাতীয় খেলায় পরিণত হয়েছে এবং একথা বললে পক্ষপাতিত্ব হবে না যে, বাংলা দেশের ফুটবল খেলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ কেন সম্মিলিত প্রদেশগুলির ফুটবল খেলায় থেকে উন্নত। বাংলা প্রদেশ ভারতীয় ফুটবল খেলায় অধিকবারই নিজ প্রদেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এর অন্যতম কারণ বাংলা দেশে ফুটবল খেলায় প্রচলন বেশী, জনপ্রিয়তাও বেশী। আজ মানুষের জীবনের সর্ব্ববিষয়ের মান নিম্নগামী হয়েছে। বাংলায় ফুটবল খেলায় এর ব্যতিক্রমও হয়নি; তবু বাংলার ফুটবল শক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্মিলিত প্রদেশগুলির পরীক্ষা করে দেখলে বাংলা খুব বেশী লোক হাসাবে না বলেই আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস। একথা আমরা ঐ দিনের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী খেলায় ফলাফল এবং খেলার সর্ব্বদিক বিচার করেই বলতে পারি। দর্শকেরাও সে কথাই বলছিলেন, পূর্ব্বের তুলনায় ভারতীয় ফুটবল খেলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্নগামী, তার উপর খেলোয়াড় নির্ব্বাচনে নিরপেক্ষতা অবলম্বন না করায় অলিম্পিক দলে অনেক অযোগ্য খেলোয়াড়ের স্থানলাভ হয়েছে। ইহা দর্শকদের অনুমান মাত্র নয়—পরীক্ষা ক্ষেত্রেই তা প্রমাণিত হয়েছে। অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় ফুটবল দলের জয় সুদূর পরাহত, ইহাই কি নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ব্যাপারে ঔদাসীন্য এবং পক্ষপাতিত্ব অবলম্বনে উৎসাহিত করেছে? দু'একটি লোভনীয় পদের নির্ব্বাচন নির্ভর করেছিল বিভিন্ন প্রদেশের ফুটবল এসোসিয়েশনের ভোটের উপর। মাঠে

বহু দর্শকের মুখে একথা শুনা যাচ্ছিল সাধারণের অর্থে এই সুযোগে সুখকর বিদেশ ভ্রমণ হয়ে যাবে এবং তার জন্য ভোট সংগ্রহ করতে গিয়ে এ কেলেঙ্কারী হয়েছে। বহু অযোগ্য খেলোয়াড়কে দলে নির্ব্বাচন করা হয়েছে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে এবং দেশ ও দশের কাছে অনেকখানি সর্ব্ব-ভারতীয় দল হিসাবে মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে তা না হলে প্রাদেশিকতার কথা উঠবে, সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। ইহা নিন্দুকের কথা নয়—জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য প্রকৃত দেশাত্মবোধের কথা।

দৈনিক সংবাদ পত্রিকাগুলিতে এই খেলোয়াড় নির্ব্বাচন এবং খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে যে সমালোচনা বের হয়েছে তা খুবই সময়োচিত হয়েছে এবং জাতীয় সম্মানের দিক থেকে জনমত প্রকাশই হয়েছে। কোন কোন কাগজ এরূপ প্রস্তাব করেছে, বর্ত্তমান বৎসরে অলিম্পিক টীম পাঠিয়ে অর্থব্যয় না করে সেই অর্থে ভাল 'কোচ' এনে আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে। এ প্রস্তাব স্বার্থমুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন।

খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ক্রীড়ামোদী এরূপ সংবাদ পরিবেশন করেন যে, তাঁর সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষ মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট সভ্যের আলোচনা হয়েছিল। সভ্যের যুক্তি নাকি এরূপ, পরাজয় অবসম্ভাবী জেনেও অলিম্পিক গেমে ভারতীয় দলের যোগদান করা উচিত যেমন অন্য দেশ হকি খেলায় ভারতীয় হকি দলের সঙ্গে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করেও প্রতিবারের অলিম্পিকে যোগদান করে। একথা সত্য, ভারতীয় হকি খেলায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডের কাছে অন্য দেশ এ পর্য্যন্ত পৌছতে পারেনি। তবে ভারতবর্ষের হকি খেলা বাদ দিয়ে অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে খেলায় একটা অলিম্পিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড আছে এবং উচ্চাঙ্গ ক্রীড়ানৈপুণ্য অর্জ্জনের জন্য অন্য দেশের অনুশীলন এবং গবেষণার শেষ নেই। আমাদের ফুটবল খেলায় তার কোন বালাই নেই। খেলার জয়—পরাজয়ের উপর দলের প্রাধান্য স্বীকার করা হয়। সুতরাং এক দলের হার স্বীকার না হলে অপর দলের বিজয় গৌরব লাভ আর হয় না। পরাজয়ের কালিমা নিতে হবে একথা ভাবলে খেলায় যোগদান চলে না। পরাজয়ের মধ্যেও আত্মপ্রসাদ আছে বৈকি! তা না হলে 'গৌরবজনক পরাজয়' আখ্যা পেত না। খেলার উদ্দেশ্য হল শরীর ও মন সুস্থ রাখা এবং দর্শকদের আনন্দ দিয়ে তাদের খেলার অনুরাগী করা।

ভারতীয় ফুটবল দল আগামী অলিম্পিক প্রতিযোগিতার গিয়ে শোচনায় ব্যর্থতার নিজেরা আনন্দ না পেয়ে নিজেদের বহুবিধ অভাব ও দুর্ব্বলতার খেলার মাঠে সংয়ের নাচ নাচবে এবং এ নৃত্য দর্শকদের কাছে আনন্দের চেয়ে পীড়াদায়ক হবে। ইংলণ্ডের রেড ক্রশ সোসাইটির সুনাম পৃথিবী জুড়ে; তাদের কর্ম্মদক্ষতা এবং সেবা-আতিথ্য কার্য্য সুবিদিত; মাঠে উপস্থিত থাকার জন্য দলের সঙ্গে ভারতীয় রেড ক্রশ বাহিনা বহন করার অর্থব্যয় থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পাবে এই যা আমাদের সান্ত্বনা।

সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ডভঙ্গ ঃ

২০০ মিটার ব্রেষ্টষ্ট্রোকে ফিলাডেলফিয়ার লা সেলী কলেজের ছাত্র J Verdena দু'বার তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ১৯৪৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি উক্ত দূরত্ব ২ মিঃ ৩২ সেকেণ্ড সময়ে অতিক্রম করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। গত এপ্রিল মাসে ন্যাশনাল এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন ২ মিঃ ৩০·৩ সেকেণ্ডে। হিটে তাঁর সময় ছিল ২ মিঃ ৩১·৩ সেকেণ্ড।

লণ্ডনের এফ এ কাপ ফাইনাল ঃ

ইংলণ্ডের এফ এ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আকর্ষণ সারা পৃথিবীর ফুটবল খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদী জুড়ে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলার যে দর্শক সমাগম হয় তার সংখ্যা আমাদের দেশে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। এ বছর এফ এ কাপ ফাইনালে ম্যাঞ্চেষ্টার ইউনাইটেড ৪-২ গোলে ব্ল্যাকপুলকে পরাজিত ক'রে ১৯০৯ সাল থেকে খেলে এই প্রথম এফ এ কাপ বিজয়ী হয়েছে। উইম্বলি ষ্টেডিয়ামে ৯৯,০০০ হাজার দর্শক ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। রাজা ও রাণী, রাজকুমারী এবং বৃটিশ মন্ত্রীসভার মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

পৃথিবীর রেকর্ডভঙ্গ ঃ

আমেরিকার দু'জন নিগ্রো এ্যাথলেট Mr. Charles Founvill ও Mr. Harrison Diliard দু'টি বিষয়ে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

১৯৩৪ সালে নরওয়েতে সট পুটে আমেরিকান এ্যাথলেট Jack Torrance ৫৭ ফিট ১/২ ইঞ্চির রেকর্ড করেন। Mr. Fonville ১৬ পাউণ্ড ওজনের বল ৪৮ ফিট ১/২ ইঞ্চি দূরত্বে ছুড়ে উক্ত রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ১২০ গজ হার্ডল রেসে Mr. Forrest ও Mr. Fred Wolcott পৃথিবীর রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। Mr. Dillard উক্ত দূরত্ব ১৩.৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

অমরনাথের উক্তি ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় দলাদলি বেশ মাথা তুলে উঠেছে। দলাদলি সব দেশেই আছে। এই দলাদলি থেকে দূরে থাকা অনেক সময় সম্ভবও হয় না কিন্তু যেখানে জাতীয় সম্মান রক্ষার আহ্বান আসে সেখানে দলাদলি এবং স্বার্থ চিন্তা ভুলে জাতীয় সম্মান রক্ষায় জন্ত এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃত খেলোয়াড়চিত চরিত্র এবং মনুষ্যত্বের পরিচয়। প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট খেলায় দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচন এবং খেলোয়াড় মনোনয়ন ব্যাপারে আমাদের দেশে একাধিকবার ক্রিকেট মহলে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। এসব ব্যাপারে খেলোয়াড়রা প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা না ক'রে নানা অজুহাতে খেলায় যোগদান করে না, আবার খেলায় যোগদান করেও স্বাভাবিক ক্রীড়া প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া দেশ থেকে ভারতীয় ক্রিকেটদল ক্রিকেট খেলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে। উক্ত দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতবর্ষে খেলতে এলে তিনি যদি ভারতীয় দলে স্থান পান তাহলে যে কোন খেলোয়াড়ের অধিনায়কত্বে খেলতে প্রস্তুত আছেন। তিনি অপর খেলোয়াড়দের নিকট থেকেও অনুরূপ আচরণ পাবার জন্ত আশা পোষণ করেন। তিনি আরও বলেন, যদি দলের অধিনায়কের পদ না পাওয়ার জন্ত আমরা নিজ দলের বাইরে চলে যাই তাহলে আর ক্রিকেট খেলা হয় না। আমরা সকলকেই তাঁর উক্তির মর্ম্ম অনুধাবন করতে অনুরোধ করছি।

আগা খাঁ হকি ঃ

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত আগা খাঁ হকি খেলার ফাইনালে কিরকি ইউনাইটেডদল ৩-০ গোলে বি বি এ্যাণ্ড সি আই রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে উক্ত কাপবিজয়ী হয়েছে। বি বি এ্যাণ্ড সি আই রেলদল প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে কলিকাতায় পোর্ট কমিশনার দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল।

হকি ঃ প্রথম বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান—পোর্ট-কমিশনার। বাইটন কাপ ফাইনাল বিজয়ী—পোর্ট-কমিশনার ও ইউ পি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আগষ্ট বিপ্লব—১৯৪২"—২।০

ডাঃ শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ইণ্ডিয়াননা হিন্দু?"—।৶০

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "খেলোয়াড়"—১।০

শ্রীশিবনারায়ণ লালা প্রণীত "সুগম হিন্দী শিক্ষা"—১।০

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দত্ত প্রণীত "হিন্দী স্বয়ং-শিক্ষা" (১ম ভাগ)—।৶০

প্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত "বিজ্ঞানের যুগান্তর"—৸০

রাজ্জি মহারাজ প্রণীত "One Truth One People"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত